"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

১০৭

[উত্তরস]ূরি ২৭শ বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা

১৩৮৬ ৮৭

[আচা]র্য শৈলজারঞ্জনকে নিবেদিত
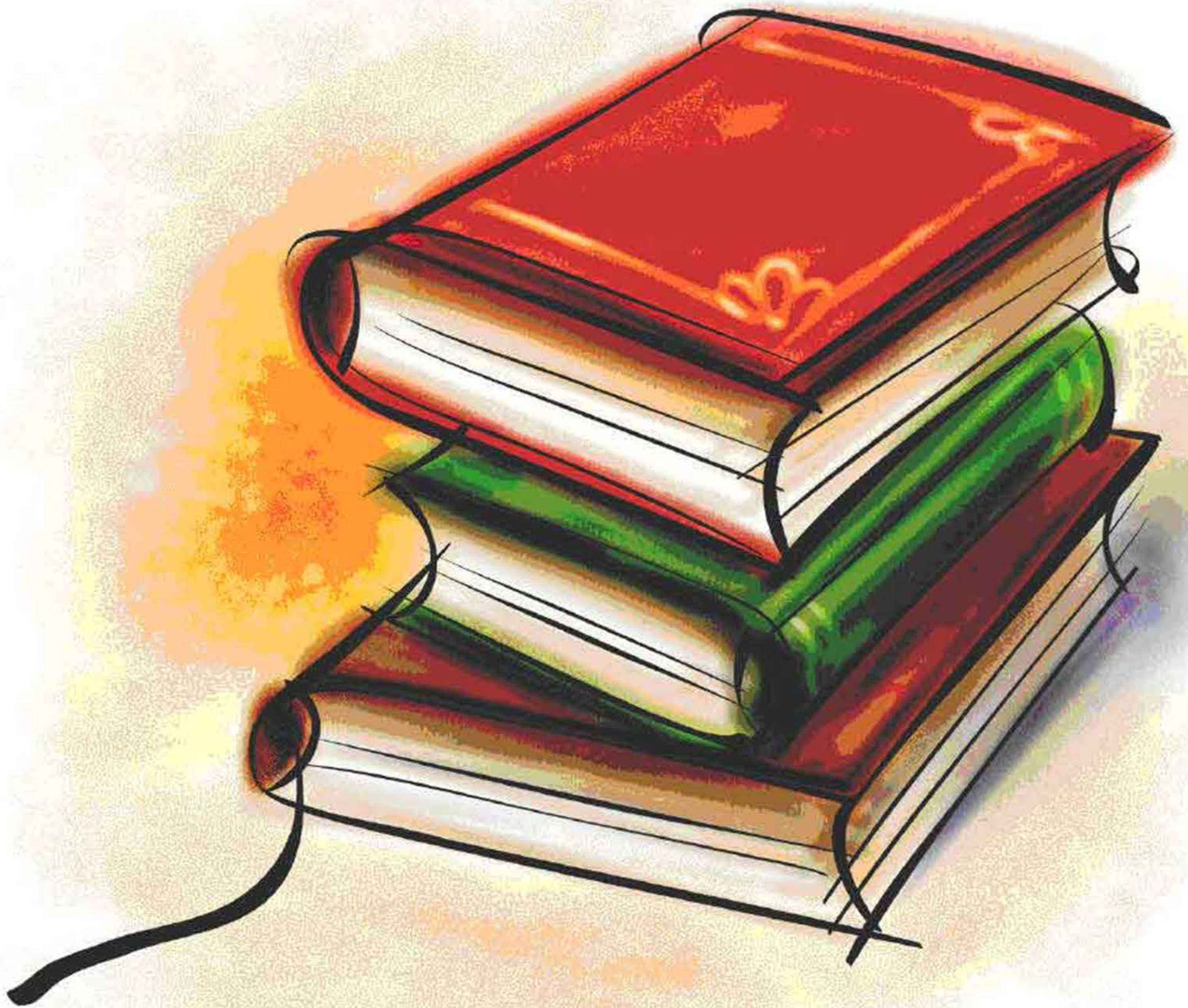
আচার্য শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের আত্মস্মৃতি। রবীন্দ্র-সংগীত-গায়কী বিষয়ে তাঁরই মূল্যবান লেখা। শৈলজারঞ্জন-কৃত স্বরলিপির তালিকা। আচার্যদেবের প্রতিকৃতি। রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে আরো মূল্যবান প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে অরুণ ভট্টাচার্যের একটি বিতর্কিত সমীক্ষা। তরুণ কবিদের কবিতাগুচ্ছ। রামপ্রসাদ সেনের কাব্য-বিশ্লেষণ। 'ছোট পত্রিকা' থেকে নির্বাচিত কবিতাবলী। 'উত্তরসূরির আবেদন'কে কেন্দ্র করে পত্রগুচ্ছ।

উত্তরসূরি

তরুণ [illegible]

কবিদের প্রতি অরুণ ভট্টাচার্য আবেদন

[illegible]

চল্লিশ বছরের শেষের দিনগুলি পার হয়েছে। বন্ধুগণ, এবার আপনারা বাংলা কবিতার [illegible]-পুকুরের মায়াকভস্কি থেকে ফিরে আসুন মহাজন পদাবলী। আর রামপ্রসাদের কবিতায়, শ্রীধর কথক আর নিধুবাবুর গানে।

উত্তরসূরি

ধর্মকে আবার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। ধর্ম মানে কুসংস্কার নয়, ধর্ম অর্থে চিত্তের সুস্থির প্রতিবিম্ব। আসুন, একবার মা বলে সবাই আমরা তরী ভাসাই।

নতুন লং প্লে রেকর্ড ১৯৮০

এল. পি (স্টিরিও)

আশা ভোঁসলে ECSD 2606

জগতে আনন্দযজ্ঞে/বড়ো আশা করে এসেছি গো/সহে না যাতনা/স্বপ্নে আমার মনে হল/কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন/ডেকো না আমারে ডেকো না ইত্যাদি

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

ECSD 2607

রোদনভরা এ বসন্ত/বনে যদি ফুটল কুসুম/ও যে মানে না মানা/বড়ো বিস্ময় লাগে/দূরে কোথায় দূরে দূরে ইত্যাদি

সুচিত্রা মিত্র ECSD 2604

নূতন প্রাণ দাও/আজ তালের বনের করতালি/মম মন-উপবনে/গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে ইত্যাদি

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

S/33 ESX 4266

বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল/মনে হল, যেন পেরিয়ে এলেম/আমি চঞ্চল হে/দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় ইত্যাদি

৪৫-এল. পি. (স্টিরিও)

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

S/45 NLP 2027

কাছে ছিলে দূরে গেলে/নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ/আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে/পাত্রখানা যায় যদি যাক ইত্যাদি

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

S/45 NLP 2026

কোন্ সে ঝড়ের ভুল/এপারে মুখর হল কেকা ওই/ওই জানালার কাছে বসে আছে/চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে ইত্যাদি

সাগর সেন S/45 NLP 2025

ওই ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে/আমি কী গান গাব যে/আমায় থাকতে দে-না/তারে দেখাতে পারি নে ইত্যাদি

রজত নন্দী ও দিলীপ রায়

গীটার ও বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর

S/45 NLP 2028

আমার সকল রসের ধারা/স্বপ্নে আমার মনে হল/হে নূতন, দেখা দিক ইত্যাদি

অরুণ ভট্টাচার্য প্রণীত

নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা

●

আশু-প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'শিল্পতত্ত্ব', 'সৌন্দর্যদর্শন' এবং 'সঙ্গীতে সুন্দরের ধারণা' বিষয়ক তিনটি বিভিন্ন পর্বে অতি দুরূহ বিষয় আলোচিত হয়েছে। স্বচ্ছ ও সহজ ভাষায় কাব্য নাটক সংগীত নৃত্য ও চিত্রকলা থেকে উদাহরণ সহ পরিকল্পিত এই গ্রন্থ লেখকের দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এক বিচিত্র আত্ম-আবিষ্কার। ভারতীয় রসতত্ত্ব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র অধ্যায় এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পী-সাহিত্যিক স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য।

সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থ

১. সংগীতচিন্তা — ১ম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়
২. রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক — ১ম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়
৩. রবীন্দ্রসংগীতে স্বর সংগতি ও সুরবৈচিত্র্য
৪. লৌকিক ও রাগসংগীতের উৎসসন্ধানে : এস. এন. রতনজংকার প্রণীত। (অনু : কৃষ্ণা বসু) ভূমিকা ও সম্পাদনা : অরুণ ভট্টাচার্য
5. A Treatise on Ancient Hindu Music (published simultaneously from India and U. S. A.)
6. Dimensions : Philosophical Essays on the Nature of Music and Poetry
7. Structure and Integration of Ragas (In Press)

কাব্যসাহিত্য সমালোচনা

১. ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস
২. কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল (১ম সং নিঃশেষিতপ্রায়)
৩. আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ (প্রেসে)
৪. Tagore and the Moderns
৫. The Romantic Design (shortly to be published)

কাব্যগ্রন্থ

১. সমর্পিত শৈশবে ২. হাওয়া দেয় (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ) ৩. ঈশ্বরপ্রতিমা ৪. সময় অসময়ের কবিতা ৫. সমুদ্র কাছে এসো (প্রকাশিতব্য) ৬. বারো বছরের বাংলা কবিতা (সম্পাদনা) ৭. চল্লিশ দশকের কবিতা (সম্পাদনা)

●

উত্তরসূরি প্রকাশনী : কলকাতা ৫০ ॥ ইণ্ডিয়ানা : কলকাতা ৭৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

পদার্থের ধর্ম (২য় সংস্করণ)	ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
পরমাণু ও কেন্দ্রীন	ডঃ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২১·০০
পরমাণু ও কেন্দ্রক গঠন পরিচয়	ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	৩৩·০০
জ্যামিতীয় আলোক বিজ্ঞান	শ্রী অরবিন্দ নাগ	১৯·০০
পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা	ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
আলোকের সমবর্তন	শ্রী সুহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২·০০
গ্যাসের আণবিকতত্ত্ব	শ্রী প্রতীপকুমার চৌধুরী	১২·০০
নিম্নতাপমাত্রা বিজ্ঞান	ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী	১২·০০
ইলেকট্রনিক্স	ডঃ অনাদিনাথ দাঁ	১৫·০০
বৈশ্লেষিক রসায়ন	ডঃ অনিলকুমার দে, ডঃ অসিতকুমার সেন	১৭·০০
ভৌত রসায়ন	ডঃ নিত্যানন্দ কুণ্ডু	২২·০০
ইউরেনিয়ামের ওপারে	ডঃ অনিলকুমার দে	৯·০০
দ্বিমাত্রিক স্থানাংক জ্যামিতি	শ্রী অশোককুমার রায়	২১·৫০
গতিবিদ্যা	ডঃ প্রদীপ নিয়োগী	১২·০০
প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা	শ্রী অপূর্বকুমার চক্রবর্তী	১৫·০০
সংখ্যাতত্ত্ব	ডঃ রাজকুমার সেন	৯১·০০
প্রতীকী ন্যায়	শ্রী ইন্দ্রকুমার রায়	৭·০০
সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান	শ্রী রমাপ্রসাদ দাস	২৬·০০
পরিপাক, বিপাক ও পুষ্টি	শ্রী দেবজ্যোতি দাশ	৩০·০০
রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস	শ্রী নির্মলকুমার সেন	১২·০০

আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায়?

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়ের স্কুলের টাকা জোগাড় করার সমস্যাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। এখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আপনি অন্তত নিশ্চিন্ত। টানাপোড়েন সরকারেরও। টাকা নেই সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে। এই কারণেই যাতে অল্প-বিত্তবান পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হোন। আমরা এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সমস্যা এখনও আছে অনেক। তবু আমরা চাই শিক্ষার আঙিনায় জনসাধারণের প্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[illegible]

[illegible] ... চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। [illegible], ঘুম যখন হইতেছে না তখন [illegible] সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার বৃথা চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, একী! এ-যে রক্ত!" বালিকার এই ব্যাকুলতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোন মতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে — জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।"

— "জীবনস্মৃতি"

পূর্ব রেলওয়ের পূর্বসূরী ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কোন রাতের গাড়িতে এই স্বপ্নলব্ধ গল্পই 'রাজর্ষি',

উত্তরসূরি ॥ ১০৬

আচার্য শৈলজারঞ্জনকে নিবেদিত বিশেষ রবীন্দ্রসংগীত সংখ্যা

●

●

উত্তরসূরি ॥ ১০৭

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কে. সি. ঘোষ রোড কলকাতা ৫০ ॥ ৫২-২৪৫২

উত্তরসূরি : নিয়মাবলী

১ লেখা কপি রেখে পাঠান। অমনোনীত লেখা কোন অবস্থাতেই ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

২. প্রকাশনযোগ্য বিবেচিত হলে অবশ্যই ছাপা হবে। চিঠি লেখার প্রয়োজন নেই। সম্পাদকের পক্ষে সব চিঠির উত্তর দেওয়া সত্যি সম্ভব নয়!

৩. উত্তরসূরি বিশেষ কোন দল বা মতে বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাস করে, লেখা 'হয়ে উঠেছে' কিনা তার ওপর। বিশ্বাস করে, চিরকালের শিল্পসাহিত্য বিশেষ রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

৪. কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন কোন অবস্থাতেই প্রকাশিত হয় না।

৫. ২৭ বর্ষ থেকে গ্রাহক মূল্য সডাক বার্ষিক ১৫.০০। এম. ও. করে স্পষ্ট ঠিকানা লিখে পাঠান। আর কোন নিয়ম নেই।

৬. সুস্থ কবিতা-আন্দোলনে সাহায্য করুন।

৭. একসঙ্গে দশ কপি নিলে এজেন্টদের ২৫% কমিশন দেওয়া হয়, ডাকখরচ পত্রিকার। বই ভি. পি.-তে পাঠানো হয়।

সম্পাদক : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫০
ফোন : ৫২-২৪৫২

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিণ্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রেসের ফোন : ৩৫-১০৮৭

আচার্য শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

ফটো : মনীন্দ্র ঠাকুর

রিটাচিং : নির্মল দে

রবীন্দ্রনাথের গান কেমন করে গাইতে হবে

রঞ্জন মঞ্জু

'আমার গান আপন মনের গান—তাতে আনন্দ পাই, শুনলে আনন্দ হয়।...গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে, বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্যে নয়।...আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায়, স্বগত, নাওয়ার ঘরে কিংবা এমনি সব জায়গায়, গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত—এর...বেশি ambition মনে নাই রাখলে।' ১৩৪৭ সালে 'গীতালি' সংগীত সংঘে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মর্মার্থটুকু ভালো করে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, তাঁর গানের আদর্শ কি ছিল। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৮।৭৯ হবে। সুতরাং জীবনের প্রান্তে এসে পরিণত চিন্তার ফসল আমরা পেয়েছি বললে অত্যুক্তি হবে না। সেসময় তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে চেয়েছেন কিন্তু সামান্যই। চেয়েছেন, তাঁর গান হৈ হৈ করে বিরাট সভামণ্ডপে গাওয়ার চেয়ে নিরালা ঘরের কোণে যেন গাওয়া হয়। অর্থাৎ, আমরা সহজেই বুঝতে পারি, তিনি তাঁর গানের মধ্যে যে আত্মগত গভীর ভাবলোকের স্পর্শ আছে তার ওপরই জোর দিয়েছেন। গায়ক বা শিল্পী এই তদ্‌গত ভাবলোকটির অনুসন্ধান করুন, এই গানের গভীরে ডুবে যান, এইটেই ছিল তাঁর সামান্যতম বাসনা।

দ্বিতীয়ত, তিনি চেয়েছিলেন, যাঁরা শ্রোতা তাঁরা প্রকৃত রসিক হবেন। 'রস' বস্তুটি বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই রস-আহরণ সকলের সমান অধিকারে নেই—এটি সহজ সত্য। গোড়াতেই এই সত্যটিকে মেনে নিলে কোন অসুবিধে হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলছেন: যেখানে আর্টের উৎকর্ষ সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না—সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে উঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়,

উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের ওপর যদি হাটের ফর্মাশ চালানো যায়, তা হলেই সর্বনাশ ঘটে। ফর্মাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফর্মাশ-অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তা হলে আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু, সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে, ভালো জিনিস এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলের জন্যে কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে একথা কেমন করে বলব ?' এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে শিল্পী, রসিক, জনসাধারণ এবং শিল্পবস্তুতে রস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা খুবই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অধিকারীভেদের প্রশ্নটিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, শিল্পী এবং রসিক এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ের অতি মূল্যবান কথা বলেছেন। এবং এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই শিল্প-প্রকরণের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি বলছেন : 'কাব্যকলা এবং চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে লইয়া যে মানুষ রচনা করে আর যে মানুষ ভোগ করে। গীতিকলায় আরো একজন প্রবেশ করিয়াছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার মাঝখানে আছে ওস্তাদ ;··· রসের স্রষ্টা এবং রসের ভোক্তা এই দুয়ের উপযুক্তমত সমাবেশ, সংসারে এইই তো যথেষ্ট দুর্লভ, তার উপরে আবার রসের বাহনটি—ত্রৈগুণ্যের এমন পরিপূর্ণ সম্মিলন বড়ো কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে—দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।' এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বড় স্পষ্ট করে শিল্পে communication তত্ত্বটির ওপর জোর দিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান সম্বন্ধে খুব সহজ করে সর্বসাধারণের কাছে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত গান -এর শ্রোতা কি ধরণের হবে—অথবা তিনি কী ধরণের শ্রোতা চান বা পেলে খুশি হ'ন তারও নিশানা আছে। তাঁর গানের আবেদন এতই সহজ ও সোজাসুজি যে তিনি কোনরকম মধ্যবর্তী তৃতীয় সত্তাকে সেখানে চান না। সেটি হচ্ছে ওস্তাদী। ওস্তাদী অর্থে স্বরমালিকা বা সুরপ্রয়োগরীতির অযথা 'টেকনিক্যালিটি।' ওস্তাদী বিষয়টি বলতে তিনি রাগরাগিণীর কঠোর বিধিনিষেধকে মনে করেছেন, এও মনে হতে পারে। কেননা, তিনি একদা বলেছিলেন যে স্বরলিপি বইতে 'রাগরাগিণীর নির্দেশ না থাকাই

ভালো।' অর্থাৎ রাগ বা রাগিণীর অন্তর্নিহিত ভাবসুষমা তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু উচ্চাঙ্গসংগীতের গায়নরীতিতে যে 'কালোয়াতী' আছে তা তিনি অপছন্দ করেছেন। এ থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে তিনি সহজ সুরের সহজ প্রকাশ পছন্দ করেছেন—সেইমত শিল্পীকে নির্দেশ দিয়েছেন গাইবার জন্য, একথা মনে করা যেতে পারে এবং এই গানের মুষ্টিমেয় শ্রোতা যথার্থই রসিক হবেন এটুকু আশা করেছেন।

এখানে, এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের গানকে মনের ভিতরে গ্রহণ করলে প্রাসঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়ের ওপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে, তাঁরই মানসিকতা বিচার করে দেখতে পাচ্ছি, একটি পরিশীলিত রুচি জড়িত আছে। সেই রুচির প্রশ্নটিকে যদি যথোচিত মর্যাদা দিতে হয় তবে কতগুলি বিষয়কে অবশ্যই সবিশেষ গুরুত্ব দান করতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে আবহ যন্ত্রসংগীত বাজে, তা ইদানীং বড় উৎকট হয়ে আমাদের কানে বাজে। এস্রাজ মন্দিরা এবং বাঁশী থাকলেই সুরসহযোগ হিসেবে যথেষ্ট। এবং রুচিবান পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে বলেই আমার ধারণা। রবীন্দ্রনাথও এস্রাজের আবহ সুরটিকে মূল্য দিতেন। সেতারকে কোনদিনই তিনি আবহসংগীতের সহযোগী মনে করেন নি। অথচ ইদানীং সেতারটি সমস্ত আসরে রীতিমত রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে বাজছে। তবলা বাজালে ক্ষতি নেই, কিন্তু তবলার কাজটি খোল এবং মৃদঙ্গতে আরো সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের গান পরিবেশন কালে সজ্জা এবং পোষাকের পরও একটু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন—যার মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর রুচি ফুটে উঠতে পারে। এই সব মিলিয়ে একটি সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠলে রবীন্দ্রসংগীত আরো স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

শেষ কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান নিয়ে যা একেবারেই চান নি, ইদানীং তাই হচ্ছে—অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত একটি বাণিজ্যিক মাল-মশলায় পরিণত হয়েছে। জলসা, রেডিও, রেকর্ড, মেলা, সম্মিলন—যেখানেই রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশিত হচ্ছে সেখানেই উদ্যোক্তাদের একটি বাণিজ্যিক মনোভাব কাজ করছে। স্থানে স্থানে তা এতো দৃষ্টিকটু এবং কুরুচিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, যে কোন রবীন্দ্রানুরাগী তাতে

ব্যথিত হবেন। আমার মনে হয়, এই অবস্থা এবং পরিবেশ বেশীদিন চলতে থাকলে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গান—যা বাঙ্গালীরই নয়, সারা ভারতবাসীরই গৌরব, —অচিরে তার মর্যাদা নষ্ট করবে। এই অমূল্য সম্পদকে আমরা অনাদরে অবহেলায় হারিয়ে ফেলব। তখন আর সময় থাকবে না।

২.

রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে যে তর্কবিতর্ক ও নানা মত আজকাল পোষণ করা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমানে রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহ্য ও তার মূল ধারাকে রূঢ়ভাবে খণ্ডন করা হচ্ছে, তার সংগীতের যে একটি বিশিষ্ট রূপ আছে তাকে তার পূর্ণতর রূপ দান না করে অনেকটা পেষণই করা হচ্ছে, এটা দুঃখদায়ক। রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়, অথচ রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার তিনি নিজেই। নিজেই তিনি তাঁর গান ও নাটকের আদর্শ রূপায়ন করেছেন। তাঁর ভাবধারাগুলি তিনি নিবদ্ধ করেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধের মধ্যে, বক্তব্যরূপে। তিনি রচনা করেই তা অন্যদের হাতে তুলে দেন নি শুধু, গানে সুরারোপ করে গেয়েছেন এবং নিজে গাইয়েছেনও তা নানা অনুষ্ঠানে, নাটকে নিজে অভিনয় করেছেন মঞ্চে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির যথার্থ রূপ তাঁরই হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর মাধ্যমে।

তাঁরই আদর্শ, তাঁরই রচনা এবং তার প্রকাশের দিকটি তিনি স্বয়ং চিহ্নিত করে গেছেন। সেগুলিকে শ্রদ্ধা করলেই, তাঁকে বুঝতে সচেষ্ট হলেই কিন্তু রবীন্দ্রগানে ঐ বিশৃঙ্খলতা এতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের গানের বিশুদ্ধ রূপটি এ কারণেই আজকাল প্রায় দুর্লভ।

গীতালির উদ্বোধনী ভাষণে ওই কথাটি বলেছিলেন, "আমার গান আমার মত করে গেও"। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আমাকে তিনি স্বয়ং যখন শান্তি-নিকেতনে সংগীতভবনের অধ্যক্ষের কাজে ব্রতী করেন তখন এই কথাটি আমাকে বিশেষভাবে বারবার বুঝিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর অন্যান্য বিভাগে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হোত, তাই সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু বলেন নি ; কিন্তু সংগীত বিভাগে তাঁরই রচিত গান শেখানো হোত তাই সেই জায়গায় তিনি

নিজে আমাকেই বলেছেন, তাঁর গান যেন তাঁরই আদর্শ মতো করে শেখানো হয়। আজকাল মনে হয় এখন কি তার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি? বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কি সে দায়িত্ব নেবেন না? এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেন গুরুদেবেরই আদর্শে পরিবেশন করার দায়িত্ব নেন, তাঁদের কাছে আমার এই আবেদন রইল। আজকাল প্রায় সমস্ত পাড়ায় রবীন্দ্রসংগীতের একটি করে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—সবাই রবীন্দ্রসংগীত শিখছেন, গাইছেন এটা আনন্দের কথা। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই রবীন্দ্রনাথের গানের বিশুদ্ধতার দিকে দৃষ্টি না রেখে ব্যবসায়িক মূল্যকে মর্যাদা দিচ্ছেন বেশী। তাঁরা গুরুদেবের কোন আদর্শেই আদর্শবান নন। শ্রোতৃবর্গও আজকাল কেমন সেসব বিকৃত রুচিতে মোহগ্রস্থ হয়ে সাড়া দিয়ে বাহবা দিচ্ছেন। শ্রোতারা কত অল্পে তৃপ্ত থাকছেন। কিন্তু শুধু শ্রোতার দোষ দেওয়া যায় না; এজন্য দায়ী সংগীত-পরিবেশনকারী। তারা নামতে নামতে এমন পর্যায়ে এসেছেন সেখান থেকে উদ্ধারকার্য সম্ভব নয়। বাজারের পণ্যসামগ্রী হিসেবেই রবীন্দ্রসংগীত আজকাল পরিচিত।

কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অবশ্য রবীন্দ্রসংগীতের 'গ্র্যামাটিকাল' দিকটির প্রতি বেশী মনোযোগ দেন; সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান ভাব, রস, মাধুর্য, সর্বোপরি শিল্প সৃষ্টি না হ'য়ে তার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করে' খড়ের কাঠামোতে তৃপ্ত থাকছেন। আমার দীর্ঘ জীবনের শিক্ষকতায় এই ধরণের পরিবেশন আমাকে দুঃখ দেয়। এতো কথা বললাম তার মূল কথাটি আমার নয়, স্বয়ং গুরুদেবের। তিনি নিজেই আমাকে শিক্ষাদান করার গুরুভার অর্পণ করে গিয়েছেন। তাঁরই আদর্শ শিরোধার্য করে চলেছি, কতটা সফল হ'য়েছি জানি না, তাই আজকাল যখন তাঁর গানের আদর্শচ্যুতি দেখি, তখন মনে হয় আমার শিক্ষাদান হয়তো অসমাপ্ত থেকে গেছে। তাই শেষ করার আগে স্বয়ং তাঁর কথাই বলি, "আমার গান আমার মতো করে গেও।"

আত্মস্মৃতি

শৈলজারঞ্জন মজুমদার ১

[শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন অরুণ ভট্টাচার্য। দিল্লী আকাশবাণীর স্থায়ী সংগ্রহশালার জন্য। সম্পাদক : উত্তরসূরি]

অ. শৈলজাদা আজ আমরা আপনার কিছু মূল্যবান সময় নেব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ। সংগীত ভবনে শান্তিনিকেতনের দিনগুলি এবং গুরুদেবের গানের যথাযথ শিক্ষা প্রচার এবং স্বরলিপির মাধ্যমে এইসব অমূল্য গানগুলির সংরক্ষণ বিষয়ে আপনার মন্তব্য বাঙালী সংগীতরসিকের কাছে প্রচণ্ড আকর্ষণের ব্যাপার। আচ্ছা, আপনি তো ছোটবেলায় বাড়ির সাংগীতিক পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু সুদূর নেত্রকোনায় তখন রবীন্দ্রসংগীত তো পৌঁছায় নি। কি করে আপনি গুরুদেবের গানের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হলেন ?

শৈ. অরুণবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার জন্ম হয়েছিল পাড়াগ্রামে সেখানে আমার ঠাকুরমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলাম আমি, স্নেহের পাত্র ছিলাম আমি। তিনি বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। সবসময় কীর্তন, বাউল গান বাড়ি মুখরিত করে রাখত। সেই সময়ে আমার ভিতরে সেসব গানের একেবারে ছাপ কেটে গিয়েছিল। পাঠশালা যেতাম মাঠ পেরিয়ে বাঁশবন পেরিয়ে, সেই মাঠের গান শুনতাম। সে গান, যে গান শুনতাম সে গানই ভাল লাগত, গলায় তুলে নিতাম। একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল আমার সে গলার যেন পাখির মত গান করে উঠত গলা।

গান : কানাই নিল কুল মান, বাঁশি নিল প্রাণ রে
আমার এই কলঙ্কে জগৎ ভাসিল রে, সখি

[শৈলজাদা গানটি আকাশবাণীতে গেয়ে শুনিয়েছিলেন]

গান গাইতে গাইতে পাঠশালার পরে এসে বাড়ি ঢুকছি আমার ঠাকুরমা আমাকে আদর করে বললেন—দ্যাখো, তুমি তো ছেলেমানুষ তোমার কিন্তু

এখনই এ গান গলায় শোভা পায় না। তোমাকে তোমার মত ঠিক গান আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি আমাকে ধরে নিয়ে 'কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না, পাই কোথায় তারে' গানটি আমাকে শিখিয়ে দিলেন। [এ গানটিও শৈলজারঞ্জন শুনিয়েছিলেন] তারপরে পাঠশালার পড়া সমাপ্ত করে আমি শহরে গেলাম, নেত্রকোনায়। দত্ত হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। সেখানে গান আমার বন্ধ হয়ে গেল। সেখানে ইস্কুলে পড়াটাই মুখ্য হ'ল। ইস্কুলে আমার একটু পড়াশুনায় নাম ছিল, মাস্টারমশাইরা সবসময়ে আমাকে সতর্ক প্রহরীর মত আগলে রাখতেন—গান গেয়ে যেন আমি বকে না যাই। আমার বাড়িতে সব সময় খবর পাঠিয়ে দিতেন ঠিক সময়ে আমি যেন বাড়িতে থাকি, পড়াশুনা করি। কেবল তবু আমার মন একেবারে গানের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। ওটা নিয়েই যেন আমার জন্ম। এর জন্যই যেন আমার জন্ম। কেবল ভিখারি বৈষ্ণবের কণ্ঠের গান ভেসে আসত আমার কানে, তাই আমার গলায় বাসা বাঁধত। এইরকম একটা কঠিন পাশের মধ্যে থেকে মানুষ হচ্ছি। তখন আমার চারটি জ্ঞাতি খুড়তুতো কাকা—শৈলেশ, সুরেশ,জ্যোতিষ, ভবেশ— এই চারটি আমার জ্ঞাতি কাকা—তাঁরা বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ছাত্র ছিলেন—পাঠভবনের—তাঁরা যখন বাড়িতে আসতেন ছুটিতে কিম্বা ছুটির পরে বাড়ির থেকে ওখানে যেতেন—তখন গাঁয়ের বাড়ির থেকে যাওয়ার পথে হয়তো আমাদের বাড়িতে দু-একদিন থেকে যেতেন। তখন তাঁদের দেখতে আমাদের সুযোগ হ'ত। আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগত, ভাল লাগত তাঁদের। তাঁদের বেশভূষা, তাঁদের চলন, তাঁদের বলন। তাদের গান-গাওয়া, তাদের গলার সুর, তাঁদের কথাবার্তা, তাঁদের কথায় গুরুদেব, তাঁদের কথায় আশ্রম তাঁদের গুরুদেবের গান এসব কথাবার্তা শুনতে আমার খুব ভাল লাগত। আমার মনে যেন একটা স্বপ্নের কল্পনালোকের সৃষ্টি করে দিত। এরকম করে তো আমি মানুষ হয়েছি। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম যে এই নেত্রকোনা দত্ত হাইস্কুল থেকে আমাকে অন্য একটা দূরের বেশ ভাল স্কুলে, লেখাপড়ার স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার মধ্যে দুটি স্কুলের নাম শুনলাম। একটি নাম শুনলাম, বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, আর একটা হচ্ছে জামতাড়া জঙ্ বাহাদুর হাই করোনেশান স্কুল। আমি মনে মনে ভগবানের আশীর্বাদ চাইলাম যে জামতাড়ায় না গিয়ে

আমি যেন বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কাকাদের সঙ্গে যাই। আমার বাবা এত রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন যে কিছুতেই যেতে দিলেন না। সকলের মত অগ্রাহ্য করে তিনি জোর করে আমাকে জামতাড়া হাইস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে আমি ম্যাট্রিক পড়তে গেলাম। তারপর আমি আবার দেশে এসে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এলাম। কলকাতায় এসে আবার—সেটা, কলকাতার জীবনটা আমি পরে বলব। তা নেত্রকোনাতে এই যে রবীন্দ্রনাথের একটা স্পর্শ পেলাম শান্তিনিকেতনের একটা স্পর্শ কিম্বা একটা আমেজ পেলাম সেটাই যেন আমার জীবনে রেখাপাত করে দিল। সেই যে আমার অবচেতন মন থেকে সেটা সরতে চায় না। যখনই একলা থাকি, আমার মনে হয়ে যেন সেটাই প্রতিধ্বনি করে। রবীন্দ্রসংগীত কোন্‌টা, রবীন্দ্রসংগীত কোন্‌টা না সেগুলি তো সেই কালে কোন বুদ্ধি বিচারের ব্যাপারের ছিল না—গান গান—কার গান কার লেখা সেসব লোকের কোন রকম বাছবিচার ছিল না। সেই রবীন্দ্রসংগীত বলে চিনি না, কিছু না কিছু যখন বুঝতে পারি যে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' সে পাড়াগায়ের লোকের কাছে শুনেছি কিন্তু সেটা যে রবীন্দ্র-সংগীত তা জানতাম না। সেইরকম রবীন্দ্রসংগীত বলতে যে ঠিক নেত্রকোনায় থাকতে পরিচিত হয়েছি খুব জানি না। তবে শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্বন্ধে খানিকটা জল্পনা-কল্পনা আমার কাকাদের ভেতর থেকে আমি পেয়েছিলাম—সেইটুকুই আমার মনে রেখাপাত করেছিল।

অ. তাহলে আমাদের তো মনে হয়, কলকাতায় যখন পড়তে এলেন, সেই সময়ে তো কলকাতার সংস্কৃতি, শান্তিনিকেতনের কথাবার্তা আরো বেশী করে আপনি শুনতে পেলেন। তা তখন বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার একটা সুযোগ ঘটেছিল যোগাযোগ ঘটবার। সেটি কি করে হ'ল ?

শৈ. কলকাতায় যখন আমি কলেজে পড়তে এলাম, তখন সেই কাকাদের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল কলকাতায়। তখন শুনলাম, ঠাকুরবাড়ি জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রসংগীত এই কথাগুলো বিশেষ করে আমার কানে এল। তখনকার দিনে অতুলপ্রসাদের গানও খুব জনপ্রিয় ছিল। মণ্টু রায়, দিলীপ রায় তখন নানান জায়গায় গান গেয়ে বেড়াতেন; আমাদের ছাত্রাবস্থায় সেসময় দুটো গানই খুব বেশী হ'ত। রবীন্দ্রসংগীত আর অতুলপ্রসাদের গান। সেই আমার

কাকাদের কল্যাণে আমি যখনই ঠাকুরবাড়িতে কোন উৎসব হোত, কিম্বা এ'বারেই মাঘে সাধারণ উপাসনা হোত তার টিকিট সংগ্রহ করে সেখানে যেতাম। সে গান ১১ই মাঘের উপাসনার গান বুঁদ হয়ে শুনতাম। আমার মনে পড়ে, ১৯১৪ সাল বোধহয় সেই বারে, যে সাহানা দেবী 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' গানটি যেন উপাসনায় গেয়েছিলেন। সে আমার এত ভাল লেগেছিল ছেলে বয়সে, আমার এখনও সেটা মনে পড়ে। এরকম ভাবে আস্তে আস্তে রবীন্দ্রসংগীতের, ঠাকুরবাড়ির, কাছাকাছি যেতে আরম্ভ করলাম। রবীন্দ্রনাথকে দেখি নি তখনও, রবীন্দ্রনাথের কথা কেবল শুনেইছি।

অ. কিন্তু কবে ওঁর সঙ্গে আপনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ'ল, সেটা কি···

শৈ. যদ্দুর মনে পড়ে, সেটা সত্যি কথা বলতে গেলে ১৯১১ সালে যখন শান্তিনিকেতনের থেকে রবীন্দ্রনাথ এসে বর্ষামঙ্গল করলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে ১৯২১ সালে, সেইবারে আমার কাকাদের মাধ্যমে কার্ড সংগ্রহ করে আমি বর্ষামঙ্গল দেখতে গেলাম ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে কাছে দেখে সামনাসামনি বসে তাঁকে দেখলাম ঋষিতুল্য লোক, তাঁর কণ্ঠে, সুরভি কণ্ঠে শুনলাম 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', আবৃত্তি শুনলাম 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে'। তখন এমন এক রেখাপাত করল আমার মনে রবীন্দ্রনাথ—আমায় এসে জুড়ে বসলেন আর কোন কিছুই এর পর থেকে আমার আর মনে ধরে না। আমার মনে পড়ছে না ভালবেসে আর কিম্ব ই'চ্ছে কার সখ ক'রে, আদর করে কোন গান এমন করে গেয়েছি। তারপর থেকে রবীন্দ্রসংগীত একেবারে আমাকে জাপটে ধরেছে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কোন গানই আমার মনে দাগ কাটে নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ তখনো হয় নি কিন্তু সামনে বসে তাঁকে দেখেছি। পরের বছর ১৯২২ সালে আবার বর্ষামঙ্গল হ'ল রামমোহন লাইব্রেরিতে। সেখানে শান্তিনিকেতনের দল গান গাইতে এলেন দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায়। সেসময় আমি এম. এস. সি. পড়ি—বাদুড়বাগান লেনের মেসে থাকি কাছাকাছি—সারাদিন টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি হচ্ছে—কোনমতে গা ঢাকা দিয়ে সেই বর্ষামঙ্গলে একরকম জোর করে ঢুকলাম—সব গানগুলি শিখতে চেষ্টা করাম—বই কিনলাম। তারপরে যখন সভা ভাঙল, তখন যখন বেরিয়ে এলাম তখন রবীন্দ্রনাথ মটরগাড়িতে উঠছেন—ভীড়

ঠেলে মরণপণ করে, ভীড় ঠেলে গিয়ে ফুটবোর্ডে উঠে ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম : তিনি একটু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, একটু আশীর্বাদ করলেন যেন। এই তাকে স্পর্শ করলাম আমি প্রথম। প্রথম স্পর্শ করলাম এইদিন। সেদিনের মত ভরপুর হয়ে আমি হস্টেলে ফিরে গেলাম।

অ. আচ্ছা শৈলজাদা, তারপরে আপনি তো আস্তে আস্তে রসায়নশাস্ত্রে এম. এস. সি. পাশ করলেন, তারপর আপনার বাবা ছিলেন তো ডাকসাইটে উকিল। তাঁর ইচ্ছে মতন ওকালতিও পাশ করলেন। কিন্তু এই রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা, ওকালতি সব ছেড়ে আপনি এই দুটিকেই অনায়াসে পাশ কাটালেন। চলে গেলেন রবীন্দ্রসংগীতের ভাবরাজ্যে। এটা কি করে ঘটল?

শৈ. রবীন্দ্রসংগীতই ছিল যেন আমার বীজমন্ত্র। আমার লেখাপড়ার দিকে মন ছিল না তা নয় কিন্তু গানে আমার মন একেবারে উদাস করে ফেলত। এইটা নিয়েই আমি জন্মেছিলাম। রবীন্দ্রসংগীত কিম্বা অন্য সংগীতের কথা আমি বলছি না। রবীন্দ্রসংগীতটাকে একটু বেশী বয়সে গিয়ে আমি বেছে নিলাম। কিন্তু আমার ছেলেবয়স থেকে সংগীতের দিকে একটা প্রবণতা ছিল। লেখাপড়ায় আমি কেন জানি না ভাল ছিলাম, আমার সহজেই হয়ে যেত। সেইজন্য আমার অভিভাবকবৃন্দ আমাকে ডাক্তারি পড়াতে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে কিম্বা বিজ্ঞান পড়াতে খুব উৎসাহবোধ করেছিলেন এবং সেইভাবেই ভর্ত্তি করেছিলেন। আমি কর্ত্তব্য করে গেছি, পরীক্ষায় পাশ করে গেছি। কিন্তু গান আমি ছাড়ি নি। সেই সময়, এইসব ঘটনাগুলি যখন নাকি আমি ভাবি চারদিক মিলিয়ে, তখন আমার একটা কথাই মনে হয় যে এইটেই যেন আমার নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল। আমার কপালে এইটাই যেন পূর্বজন্মের লেখা ছিল। না হলে এই যে ঘটনাগুলির সমাবেশ দেখছি সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলে মনে হয়, এসব হবে কেন। সবই রবীন্দ্রসংগীত, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথের দিকে আমাকে এই পাড়াগেঁয়ে ভূতকে টেনে নিয়ে যাবে কেন? কেমিস্ট্রি পরীক্ষায় পাশ করেছি, এর মধ্যে আমার মাতৃবিয়োগ ঘটল। আমার বাবা উকিল ছিলেন, তিনি ওকালতি আর করবেন না। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, তুমি ওকালতি পড়ো, পড়ে পাশ করে আমার চেয়ারে এসে আমার গদীতে এসে বোস। আমার বাবার এত প্রভাব ছিল আমাদের

ওপরে, আমরা না বলতে কিছুতেই পারতাম না। তাড়াতাড়ি করে ওকালতি পাশ করে আমি গিয়ে নেত্রকোনাতে তাঁর আসনে বসলাম। ওকালতি করতে, বলতে দ্বিধা নাই, তিনমাস কোনমতে সাজগোজ করলাম কোর্টে। সেখানে যাবার মুখে আমি একবার কলকাতায় এলাম যে আমার ধড়াচূড়া কিনবার জন্য। সে সময় কলকাতায় আমার যে বন্ধু প্রভাত গুপ্ত, তাঁর বাড়িতে গিয়ে, তাঁর ও পরিবারের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শুনলাম যে প্রভাত গুপ্ত শান্তিনিকেতনের Economics-এর প্রোফেসর, তিনি এসেছেন, আমাকে ধরলেন সেই ট্রেনে নিয়ে শান্তিনিকেতন যাবার জন্য আর কি, সে এইরকম ভাবে ঘটনাগুলি। আর যখন নাকি পেয়েছিলাম, M.Sc. পাশ করে Research Scholar ছিলাম তখন সেখান থেকে ছিনিয়ে আমার বাবা আমাকে ওকালতি পড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন; যখন নাকি ড. এইচ. কে. সেনের আণ্ডারে Sign Ascetic Condensation সম্বন্ধে আমি রিসার্চ করছিলাম। যখন আমার বস্ ড. এইচ. কে. সেন শুনলেন যে শৈলজা কেমিস্ট্রি টেমিস্ট্রি সব ছেড়ে দিয়ে, ওকালতি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেছে, তখন তিনি একটি মন্তব্যই করেছিলেন, 'যেথাকার জল সেথাই গড়িয়েছে, ঠিক জায়গার জল ঠিক জায়গায় গড়িয়ে পড়েছে গিয়ে'। তা সেজন্যই বলছি আমি, এইটাই যেন আমার নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল। স্পষ্ট কিন্তু। এই যে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে এস্রাজ বাজনা—এস্রাজ বাজনাটা—কোথাও কোন যন্ত্রেতে আমি কোনদিন হাত দিই নাই, তা শুধু শুধু এই এস্রাজটা আমি শিখতে গেলাম কি জন্যে, হঠাৎ সেটা আবার কি করে ঘটল? ঘটল মানে ঐ যে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গৌরীপুরের জমিদার—তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। তাঁর বাড়িতে যাওয়া আসা করতাম। তা খোকাবাবু, বীরেন্দ্রকিশোর তিনি এস্রাজ শিখতেন—ওস্তাদ শীতল মুখার্জীর কাছে। তাঁর বাবা ব্রজেন্দ্রকিশোর বসিয়ে দিলেন এস্রাজ হাতে, 'তুইও বসে যা ওর সঙ্গে শিখতে।' সে তাঁর কাছে তামিল নিলাম, তিনি একেবারে যে নাম করা। সেইটা গিয়ে পরবর্তী জীবনে আমার রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গ হিসেবে কাজে লেগে গেল, এগুলি আমি খুব জোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে মজা করে গল্প করে শুনিয়েছি। আমি ঠিক বলতে পারব না আমি কি করে

রবীন্দ্রসংগীতে গেলাম, আমার একমাত্র বক্তব্য যে এইটেই আমার জন্য যেন নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল।

অ. আচ্ছা, শৈলজাদা, সত্যিই আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার সারা জীবনটাই যেন সেই সমুদ্রের কাছে পৌঁছোবার জন্যই সব কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল। যখন গুরুদেবের কাছে প্রথম গেলেন, প্রথম তাঁর পাশে বসে তাঁর স্নেহ পেলেন, গান শিখতে আরম্ভ করলেন, আপনার কি মনে পড়ে কোন্ গানটি প্রথম শিখিয়েছিলেন তিনি আপনাকে?

শৈ. তার আগে আমি একটু বলতে ইচ্ছে করি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দিলাম তখনই কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল। আমরা এক পরিবারের, এক আশ্রমের বাসী হলাম, তখনকার রীতি ছিল যে, যে বিভাগের কর্ম্মী আর কি, সেই বিভাগীয় অধ্যক্ষ নতুন কর্ম্মীকে নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তা আমাকে তদানীন্তন আমার কলেজের অধ্যক্ষ নেপাল রায় আমাকে নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে যাচ্ছেন। তা আমি এটা বলে নি আগে। যে কলকাতায় আমি যখন ছিলাম, চাকরি নেবার আগে ল' পড়তাম যখন তখন আমি সৌম্যবাবুর দলে গান করতাম ঠাকুরবাড়িতে। সেই সময় পাগলাঝোরা একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের নিজের উপস্থিত থাকার কথা ছিল শান্তিনিকেতন থেকে এসে। তিনি কয়েকদিন আগে এসেও ছিলেন কিন্তু এসে থাকতে পারেন নি, কাজের তাড়ায় আবার ফিরে যেতে হয়েছিল, এই যে দু-একদিন থেকে গিয়েছিলেন তার মধ্যেই আমাদের পাগলাঝোরার দলকে তিনটি গান উনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

এ তিনটি হচ্ছে 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে' 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে,' 'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি'—এই তিনটি গান তিনি দুটু দি—দুজনে অনেকক্ষণ ধরে গেয়ে গেয়ে আমাদের গানের দলকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। একথাটা বললাম এই জন্য যে এখন এই জিনিসটার আমার দরকার হবে, আমি যখন গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেলাম তখন আমার রাস্তায় খালি মনে হ'ল যে সেই যে কলকাতাতে ওঁর সামনে বসে গান শিখেছিলাম যদি তিনি মনে করতে পারতেন যে আমি তাঁর গান করি কোনমতে তাঁর মনে হয়

তাহলে আমি ধন্য হব, আবার মনে হ'ল এ তো বামনের চাঁদের আশা। এতো বড়লোকের এতো একটা সাধারণ লোকের কথা মনে পড়বে কি? হ'ল কিন্তু তাই। আমি গিয়ে তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম, নেপালবাবু বললেন, এই আমাদের রসায়নের অধ্যাপক এসেছেন, শৈলজারঞ্জন মজুমদার আপনার সঙ্গে পরিচয় করাতে এনেছি। তা আমি পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মুখ তুলছি ওপরের দিকে, বলছেন, 'দেখি দেখি, তোমাকে তো আমি চিনি, তুমি তো আমার গান করো।' আমি বললাম 'হ্যাঁ, আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে। গানের টানেই আমি এসেছি।' 'হ্যাঁ, ও তুমি আমার গানের টানেই এসেছো, তুমি এখানে থাকো।' এই করেই কিন্তু প্রথম দিন একটা, কিরকম একটা বাণী প্রকাশ করলেন, তুমি এখানেই থাকো, তুমি আমার গান করো। সেদিনে আমি খুব খুশি হয়ে ফিরে গেলাম। সেদিনই সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। তার কিছুদিন পরে আবার সাপ্তাহিক একটা উৎসব—অনুষ্ঠানে বর্ষার সংগীত দিয়ে একটা অনুষ্ঠান হল, নুটুদি সেটা পরিচালনা করিয়েছিলেন। তাতে দিনুদা আমাকে একটা একলা গান করিয়েছিলেন—'গগনে গগনে আপনার মনে' গানটি করিয়েছিলেন। পরের দিনে সকাল বেলা যখন লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে নুটুদির দেখা, নুটুদি হাসিমুখে বললেন, 'শৈলজাবাবু আপনি মেরে দিয়েছেন।' 'কেন কি হয়েছে?' 'আপনার গান গুরুদেবের খুব ভাল লেগেছে'। সেই দেখেই মনে হয় আমি যে ওখানে গেছি, আমাকে ওঁর ভাল লেগেছে, আমি তো ভালই বেসেছি—এ যেন আমাদের দুজনের যোগাযোগ যে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এর থেকেই আমি খানিকটা প্রমাণ এর আভাস পেয়েছিলাম।

অ. আচ্ছা আপনার কাছেই শুনেছি শৈলজাদা, কয়েকটি বিশেষ গানের ওপর গুরুদেবের নিজেরই মমতা ছিল, নিজেরই লেখার ওপরে।

শৈ. না, তার পরেতে যখন দুবছর পরে দিনেন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় গিয়ে দেহ রাখলেন তখন আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গানটান কেমন চলছে।' তা আমি বললাম, 'আমার গানটান তো আর চলছে না, দিনুদাই চলে গেছেন, আমি তো আর কারো কাছে'…'না,' তুমি তো গানের টানেই আমার এখানে এসেছ তুমি আমার কাছে

এসো। আমি তোমাদের গান শেখাব।' প্রতিদিন বেলা তিনটের সময় গীত-বিতানটা নিয়ে ওঁর কাছে যেতাম। আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন সে তখন আমাকে প্রথম

অ. প্রথম কোন গানটি……

শৈ. প্রথম গানটি 'মায়ার খেলার' প্রথম গানটি 'পথহারা তুমি পথিক যেন গো' এ গানটি আমায় প্রথম শিখিয়েছিলেন। তারপরে রোজ গান শিখিয়ে যেতেন নানারকম। মজার গল্প বলতেন; তা কিছুদিন পরে আবার বললেন, 'তুমি ছোটদের একটা ক্লাস নাও'। আমি একবারে জিভ কেটে লজ্জায় পালিয়ে যেতাম। যে নিজে কিছু জানি না, বিদ্যা বুদ্ধি নাই, আঙাল বাঙাল মানুষ উচ্চারণ ঠিক নাই আমাকে আবার ক্লাস নিতে বলছেন। তা উনি বললেন যে 'এমন করছ কেন, তোমার শিক্ষা নিজের শিক্ষা, দেখাতে দেখাতে গিয়ে পাকা হবে। তুমি লেগে যাও।' তারপর আমাকে শিশুদের একটা ক্লাস দিলেন। 'হ্যাদে গো নন্দরানী' টা শিখিয়ে দিলেন। একদিন আমাকে বললেন যে তোমার জন্য আমি একটা খুব ভাল গান ঠিক করে রেখেছি। তুমি যত্ন করে শিখে নাও! আমি খুব যত্ন করে শিখতেই বসলাম, খুব ধারে খুব পাশে গিয়ে বসে শিখলাম। 'ওলো সই ওলো সই' বললে আমি আপত্তি করলাম, 'ওলো সই ওলো সই গান আমি শিখব না, আপনি মেয়েদের শিখিয়ে দিন, ও মেয়েদের গান' বললেন, না না না, শুনে দ্যাখো না, ওটা ছেলেমেয়ে না, কিছু না, এমনিই ভাল। সকলের জন্যই ভাল।' তার পরে এমন জোর করে গেয়ে আমার কান ফাটিয়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন। আমি পাগলের মত ভালবেসে গানটাকে শিখে নিয়ে গেলাম, এই সমস্ত ঘটনাগুলি আমার এখন মনে পড়ছে।

অ. শৈলজাদা, এমন একটা গান আপনার কাছেই শুনেছিলাম যে গুরুদেব ভীষণ পছন্দ করতেন 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'।

শৈ. হ্যাঁ, এ গানটি তো পছন্দ করতেন মানে এ গানটি উচ্চারণ করলেই গাইতে আরম্ভ করতেন। একদিন একটা অনুষ্ঠানে এমনি হয়েছিল যে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা কতগুলি আইটেম সংগ্রহ করেছিলাম যেমন দিনুদা গান দিয়েছেন, গুরুদেব আবৃত্তি দিয়েছেন, অমুকে প্রবন্ধ দিয়েছে; গুরুদেব শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষের কণ্ঠে এ গানটি শিখিয়ে তিনি সভার জন্য পাঠিয়েছিলেন—মরি

লো মরি। যথারীতি সময়ে গানটি ইন্দুলেখা দেবী সভায় ষ্টেজে বসে গান করতে আরম্ভ করলেন—উনি সামনে বসে শ্রোতা হিসেবে। তাঁর গানের অর্ধেকটি হ'ল তখন তিনি ঐ শ্রোতাদের ভিতর থেকে চিৎকার করে গাইতে আরম্ভ করলেন। রবীন্দ্রনাথ ইন্দুলেখাদেবীর সঙ্গে সঙ্গেই গাইতে আরম্ভ করলেন। ইন্দুলেখা দেবী অনন্যোপায় হয়ে লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন—শেষকালে শেষ অর্ধেকটা রবীন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে শেষ করে দিলেন। এরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল। যখন গানটির নাম করা যেত তখনই তিনি গুন গুন গুন গুন করে চোখ বুঁজে একেবারে মশ্‌গুল হয়ে গানটি গাইতেন। আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যে শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর আর অজিন ঠাকুর—এঁরা শান্তিনিকেতনে তখন বাস করছিলেন। তা অমিতা ঠাকুর একমাসের জন্য কলকাতায় আসবেন কোন একটা কাজে। তখন তাঁকে আমি বলেছিলাম যে শ্রীমতি অমিয়া ঠাকুরের কণ্ঠে 'মরি লো মরি' গানটি খুব জনপ্রিয় হ'তো শুনেছি, আমরা যখন কলেজ স্টুডেন্ট ছিলাম। আমাকে গুরুদেব ঐ গানটা শিখিয়েছেন আমার খুব ভাল লেগেছে—আপনি—কৌতূহলবশতঃ আমি ওঁকে বলেছিলাম যে—আপনি একমাসের মধ্যে কোন সময়ে গিয়ে—আপনারা পাশাপাশি তো থাকেন—ওঁর কণ্ঠের থেকে এই গানটির সুরটি তুলে আনবেন না!' তা উনি সেটা নিয়ে গেলেন। মাস কাল প্রায় উত্তীর্ণ হয় সে সময় আমি আর একটা—সেটা মনে করিয়ে, মনে জাগিয়ে দেবার জন্য আবার চিঠি লিখলাম একটা। সেই চিঠির ব্যাপারটা কি করে গুরুদেবের কানে গেল আর কি। গুরুদেব কলকাতা হয়ে যখন শান্তিনিকেতন ফিরে আসছেন তখন এইটা ওর কানে গেল। তা তখন উনি শান্তিনিকেতন ফিরে এলেন, আমরা প্রণাম করতে গেছি—খুব গম্ভীর চেহারা—খুব চটে গিয়ে বলছেন, 'তুমি কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াও।' 'কেন বলছেন আপনি? আপনি তো কলকাতা থেকে এলেন আমি তো কলকাতা যাই নি আমি তো এখানেই ছিলাম।' 'না, তুমি নাকি অমিতাকে চিঠি লিখেছ যে আমার মরি লো মরি গানটির জন্য।' আমি বললাম হ্যাঁ, চিঠি লিখেছি তো। চিঠি লিখছি ঐ গানটা খুব সুখ্যাতি সেজন্য কৌতূহলবশতঃ খালি বলেছি যে ঐটা একটু সুরে গলায় তুলে আনতে।' 'না, না, তুমি কক্ষনো করবে না—তুমি বলে দিও বাংলাদেশকে যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছাড়া

আর কেউ এই গান শেখাতে পারে না। এ গান তিনি নিজে তোমাকে শিখিয়েছেন, তুমি অলি গলিতে ঘুরবে না। এ গান তুমি সে ভাবে গাইবে এবং সেইভাবে শেখাবে।' সেই এই গানটি। এই গানটির জন্য ওঁর মন এত নরম ছিল যে এ গানটি শুনলেই গাইতেন এবং এখন আরও বলতে ইচ্ছে করে যে সেই সুরের থেকে যখন অন্যরকম শুনি তখন আমার একটু মনে লাগে বৈকি।

অ. শৈলজাদা, তাহলে এই গানটা একটু শুনতে ইচ্ছে করছে আপনার কাছে—

শৈ. আমার তো সেই বয়স নেই এখন। তা আমার কিছুদিন আগে দিল্লীতে আমার এক পরিবারে ওরা জোর করে আমার কতগুলি রেকর্ড করে রেখেছিল, টেপ করে রেখেছিল। তার থেকে যদি কোনরকমে উদ্ধার করে শোনানো যায় তাহলেই কাজ হবে, নাহলে

অ. না, সেটা আমরা…

শৈ. আমার তো গান শুনিয়ে অভ্যাস নেই, গান শিখিয়ে অভ্যাস কেবল।

অ. না, সে গানটি আমরা ব্যবস্থা করেছি। আচ্ছা শ্রোতাদের আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে ঐ গানটি শোনাচ্ছি।

শৈ. কি জানি ভাল লাগবে কিনা জানি না। গান………[গানটি শৈলজারঞ্জন গেয়েছিলেন আগেই। টেপ বাজিয়ে শোনান হল]

অ. ভারি সুন্দর হয়েছে গানটি আপনার শৈলজাদা, আপনার এত বয়সেও যে কি করে এরকম একটি কঠিন গান আপনি আমাদের উপহার দিলেন, সত্যি ভাবতে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। ভবিষ্যৎকাল আপনাকে গায়ক হিসেবেও নিশ্চয়ই মনে রাখবে। এখানে আর দু একটা কথা একটু বলি—আমাদের সময় তো আর নেই বেশী—স্বরলিপি সম্বন্ধে। আপনি তো স্বরলিপিকার হিসেবে সকলেরই শ্রদ্ধেয়। তা এই যে, রবীন্দ্রনাথের এক একটা গানের আমরা দুটো স্বরলিপি পেয়েছি। কিছু কিছু গানের এমনও বা হয়েছে স্বরলিপি একভাবে প্রকাশিত হয়েছে কোন গানের, আবার রেকর্ডে আমরা নামকরা শিল্পীদের একটু অন্যরকমভাবে শুনেছি। তা এসব সমস্যা যাঁরা নবীন শিল্পী তাঁদের কাছে কিভাবে এগুলো নেবেন—তাঁরা কোন্ রাস্তায় চলবেন? তাঁরা কোন্টাকে ঠিকমত গ্রহণ করবেন। আপনার কাছে এজন্য এইটুকু আমাদের জিজ্ঞাস্য।

শৈ· এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর বাইরের থেকে নেওয়ার চেয়ে নিজের ভেতর থেকে উত্তর নেওয়াই ভাল আর কি, এটা বুদ্ধি বিচার দিয়ে করা ভাল। সবচেয়ে ভাল হোত রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি স্বরলিপিকার হতেন তাঁর নিজের গানের। মূল কথা হচ্ছে সেটাই, অন্যেরা যখন স্বরলিপি করেছেন তখন একটু হাত বদল হয়েছে—প্রথমে স্বরলিপিকার হিসেবে একটু হাত বদল হয়েছে—আমি কথাটা বলছি এজন্য—আমি অনেকগুলি গানের স্বরলিপি করেছি এবং আমি যে স্বরলিপিতে রামকে রহিম করেছি কিনা কিম্বা অন্য কিছু করেছি কিনা, সেটা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোন পুলিশ বসান নি। আমি সেটাই ছাপিয়ে বিশ্বভারতীতে publish করেছি। তা আমার মত কেউ করছেন বলি না, কিন্তু সেটা জানতে অজানতে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটুকুর ভয় বিপদ ছিল না যদি নিজেই তিনি স্বরলিপিকার হতেন। সেইজন্য আমি এখন সবচেয়ে প্রামাণ্য স্বরলিপি মনে করি যেগুলি রবীন্দ্রযুগে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোনরকম প্রশ্ন দাঁড়ায় নি এবং সেইগুলিই প্রাধান্য পাবে এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেগুলি রেকর্ড হয়েছে, সেগুলিই কিম্বা সেই তৎকালীন সমস্ত স্বরলিপি ব্যবহার হয়েছে কোন প্রশ্ন উঠে নাই; এখন এমন সব প্রশ্ন, এমন সব স্বরলিপি পরবর্তী edition-এ বেরিয়েছে যেগুলি রবীন্দ্রযুগের পরকালে ব্যবহৃত। কিন্তু সেগুলি পরজন্মের মনে হয়। আমি নিজের দুটো জন্ম আলাদা করে ফেলেছি, আমি নিজে কখনো modern এই দিকের গানের সুরের ব্যবহার পছন্দ করি না, আমি রবীন্দ্রনাথ যেটা শুনে গেছেন, তাঁর টেবিলে যে গানের বইয়ের স্বরলিপিগুলি গড়াগড়ি করত সেই স্বরলিপিগুলিই উনি ব্যবহার করেছেন, আপত্তি করেন নাই, মন্তব্য করেন নাই সেগুলিই ব্যবহার করি। যেমন 'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী' আমি যেখানেই সেই মূল গানটি করাচ্ছি—সকলেই কিরকম বলেন—ভুল গাইছে ভুল গাইছে। এই যে একটা কথা আছে না—দশচক্রে ভগবান্ ভূত।—আর রেকর্ডের কথা তো আলাদা—ওটা তো একটা পণ্যদ্রব্য—ওটার মধ্যে তো জবড়জং বাজনাটাজনা দিয়ে তাকে এটা ওটা করে জনপ্রিয় করার জন্য আর তাদের বিক্রী বাড়াবার জন্য তাদের করতেই হয়; দোকানদারি তো। ওটার সঙ্গে বই কিম্বা গ্রন্থাগার যদিও ছাপ একই—বইয়ের ওপর ছাপ থাকে, রেকর্ডের ওপরে ছাপ

থাকে কিন্তু দুটোকেই আমি সমান মূল্য দিই না। মোট কথা হচ্ছে আমি নিজের একটা conscience খাটাই, যে বিচারবুদ্ধিতে খাটিয়ে যেটাকে উচিত মনে করি সেটাই করি—কোন এক সাধারণ নিয়ম আমি বলতে পারব না। আমি সেটা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি যে রবীন্দ্রনাথ থাকতে যেসব স্বরলিপি ব্যবহার করেছেন, আটপৌরে স্বরলিপি, সেসব স্বরলিপির যদি কোন ব্যতিক্রম হয়, তা সেই ব্যতিক্রমগুলি আমি এখনও করি না, আমি সেগুলি করি রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ কিম্বা বেশী কাছাকাছি স্বরলিপি যেগুলি আছে, উৎসের কাছে যে সুর আছে সেটাই বেশী প্রাধান্য দিই। সে আমি কারও নাম করতে চাই না, কিন্তু আমি কিছু কিছু জানি এইরকম যে কোন কোন স্বরলিপিকার নিজের সুরটা ঢুকিয়ে দেবার জন্য চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু আমি কিন্তু সেটাও আপত্তি করি নি। আমি বলেছি, অন্য স্বরলিপিকারের সুরটা ঢুকিয়ে দিন না, কিন্তু সেটা সুরান্তর হিসেবে দিন। যেটা অধুনা প্রচলিত সুর, সেটাকে তুলে দিয়ে, উৎক্ষিপ্ত করে—তার জায়গায় সেটাকেই একমাত্র সুর করে দেবেন, সে কিছুতেই হয় না। এই নিয়ে আমার সঙ্গে খুব মন কষাকষি হয়েছে. কিন্তু সেটা বিশ্বভারতী রক্ষা করেন নি কিন্তু. সেসব জায়গায় আমার এখনও আপত্তি, সেজন্য আমি প্রথমেই বলেছি যে এইটার সোজা উত্তর আমি দিতে পারব না কিছু। আমার উত্তর হচ্ছে আমার নিজের conscience এবং নিজের শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা, প্রীতি রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আনুগত্য, এই দিয়ে আমি বিচার করে যেটা বলি সেটাই বলতে আমি চেষ্টা করলাম।

অ. ঠিকই বলেছেন শৈলজাদা, কেননা এই বিষয়টাতো খুবই জটিল। তবুও আপনি যা বলবেন তা আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা সেটা শুনে নেব। আচ্ছা এখন আবার আর একটা অন্য জিনিষে আসি, আপনি তো এস্রাজ বাজিয়ে গান শিখেছেন চিরকাল এবং নিজে অত্যন্ত ভাল এস্রাজ বাজাতেনও। কাজেই আপনার কাছ থেকে একটু এস্রাজ বাজনা আমরা শুনতে চাই। আশা করি আপনি আমাদের নিরাশ করবেন না।

শৈ. এস্রাজ তো আমি ঠিক ক্ল্যাসিকাল এস্রাজ বাজিয়ে নই। রবীন্দ্র-সংগীতকে অনুসরণ করেই করি আর কি। সেরকমভাবে কিছু যদি চলে তাহলে

সেটা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমার বয়স এখন হয়ে গেছে তো, তবে রবীন্দ্রসংগীতের ঢঙ্‌টা আসবে হয়তো এই আর কি।

অ. না, ঐ গানটা আমরা আপনার কাছে শুনেছিলাম একবার, 'রোদন-ভরা এ বসন্ত', সেটাই আমরা শুনতে চাইছি।

শৈ. 'রোদনভরা এ বসন্ত' গানটা সেটাই আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি।

[শৈলজারঞ্জন গানটি এস্রাজে বাজিয়ে শোনালেন]

অ. আর, শেষে, আর একটাই প্রশ্ন, আর সময় অনেক নেব না, আমাদের সময় হয়েই গেছে। শিল্পীরা খুব সোজা সোজা গানেও আজকাল দেখতে পাই খুব একটা অলঙ্করণের কাজ করেন, কোথাও কোথাও অতিরিক্ত ভাবের আবেগ এসে পড়ে, আবার যেখানে সেখানে টপ্পাও ব্যবহার করেন। এগুলো সম্বন্ধে আপনার একটু মতামত চাই, কেননা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে খুব সহজ পথের পথিক ছিলেন, সংযমের কথাটা বারবার উনি বলে গিয়েছেন। কাজেই অতিরিক্ত অলঙ্কার-বাহুল্য কি রবীন্দ্রনাথের গানকে পীড়িত করে না ?

শৈ. রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বলেছেন, কলা-কৌশলই হচ্ছে কলার শত্রু, সেজন্য ওঁর গান হচ্ছে বাণীপ্রধান, কাব্যশৈলী, তার সঙ্গে, এর সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুষঙ্গ কথাটা আনব, এই যে নানারকম পাঁচমিশেলি যন্ত্রের সমাহার হচ্ছে তাতে একে জড়াখিচুড়ি করে ফেলেছে আর কি, তেমনি কণ্ঠ যখন নাকি কাঁপে কিম্বা কণ্ঠের intricacies কিম্বা নানারকম কারুকার্য বেশী ঢোকে আর কি, তখন কথাগুলি নাড়া খেয়ে যায়, যেমন স্থির জলের উপরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে, যে জন্য সমগ্র সৃষ্টিটা ব্যহত হয়। আর টপ্পার ঐ যে গলা কাঁপানো, যে ধ্রুপদাঙ্গের গান যে সোজা সোজা ঢালা সুরের কথাগুলি পরিষ্কার খুব বড় বড় কথাগুলি সুন্দর সুরের পরিষ্কার স্পষ্ট কথা—যেমন ঠুংরি, ঠুংরিতে স্বরকম্পন—কারুকার্যতে কথাগুলি ঘুরে বেড়ায় বেশী পাক খায়, মোচড় খায় বেশী। সেজন্য রবীন্দ্রসংগীতে, যেহেতু এটা বাণীপ্রধান, তাতে সোজা সোজা কণ্ঠস্বর যদ্দুর সম্ভব রেখে যদি সেটাকে গাওয়া যায় সুরটাকে বয়ে নিয়ে যায় তাহলে তার ওপরে কথাটা ভাসবে ভাল আর কি, নাহলে নাড়া খেয়ে যাবে আর কি। সেজন্য আমার মনে হয়, সংযমী হওয়া দরকার আর টপ্পার অলঙ্করণ, বেশী অলঙ্করণ-করা তো লোকের একটা সংযমের অভাব থেকেই। যে
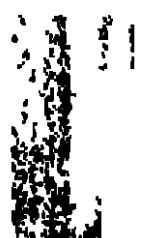
যত বেশী সাজে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় ঠাট্টা করে বলতেন, যে মানুষ দেহটাকে সাজায়, দেহটাকে দোকান করেছি যে, সেজন্য যার গলায় যত কণ্ঠস্বরের কায়দা আছে সেগুলি দেখিয়ে দেবে এক গানেই, সবরকম display করিয়ে দেবে। যেসব আজকাল হয়েছে, টপ্পা গান নিয়ে একটা ম্যানিয়া হয়েছে, যেখানে সেখানে টপ্পার জনপ্রিয়তার জন্য যেমন, 'তুমি কিছু দিয়ে যাও।' 'ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,' অংশটির ব্যাখ্যা। আর্টের সবচেয়ে বড় কথা সংযম। রবীন্দ্রসংগীতে সংযমটি খুব দরকার। সেখানে কিন্তু যিনি গান গাইবেন—তাঁর সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত, সেটা কে কতটুকু রাখতে পারবে। সেটা তাঁর নিজের ওপরে, শিক্ষা দীক্ষা স্বভাবচরিত্রের ওপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আর কিছু বলতে পারি না।

অ. ঠিক কথাই বলছেন শৈলজাদা, আমার মনে হয়, ভবিষ্যৎকালের শিল্পীরা যদি আপনার নির্দেশ মেনে চলেন তাহলে রবীন্দ্রসংগীত আমরা আরও সুন্দর ভাবে শুনতে পাব। শুধু আজ শেষ করবার আগে আপনার আর একটি গান আমাদের শুনতে ইচ্ছে ছিল—যে গানটি সম্পর্কে আপনি অনেক সময় বলেছেন—'আমার যেতে সরে না মন'—সে গানটি কিন্তু আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা বাজাব।

শৈ. গানটি রচনার একটা মজার ঘটনা আছে। সেটা একটু বলে নিচ্ছি। গরমের ছুটির পর আমরা সব জড়ো হয়েছি শান্তিনিকেতনে, গুরুদেব তখন শ্রীনিকেতনে গিয়ে বসে আছেন, শান্তিনিকেতনে ফেরেন নি। সকলেই গিয়ে শ্রীনিকেতনে প্রণাম করে গেছেন, আমি কিন্তু যাই নি।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছেন, আপনি গেলেন না প্রণাম করতে! না, আমরা অত দূর থেকে এসেছি, আর উনি এত কাছে আছেন, উনি আসুন তারপর প্রণাম করব। সেসময় বায়না ধরলাম যাব না ওখানে, তারপর অনিলবাবু ছিলেন, অজিন ঠাকুর, তাঁর একটা মটরগাড়ি ছিল, যে-গাড়িটাতে চেপে আমরা মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম। একদিন ওর মধ্যে হঠাৎ কিরকম করে জোর করে নিয়ে ওখানে ফেলে দিলেন আমাকে। তা গেলাম যখন সেখান পর্যন্ত তখন তাঁর সঙ্গে দেখা না করে ফিরে আসি কি করে। তখন তাঁর

সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করলাম। কিছুই বলি নি কিন্তু। 'যেতে সরে না মন' এ গানটি তক্ষুনি লিখে আমায় শিখিয়ে দিলেন এ গানটি।

অ. আচ্ছা শৈলজাদা, আপনাকে আজ খুব কষ্ট দিলুম। আমাদের এই আকাশবাণীর অনুষ্ঠানটিতে আপনি যে দয়া করে এসেছেন, এর জন্য আপনাকে সবাই আমরা খুব আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

অনুলেখন : অনুপ মতিলাল

সূত্র :

১. মুটুদি : রমা কর, সুরেন করের স্ত্রী।

২. অনিল : অনিলকুমার চন্দ, বিশ্বভারতীর কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

৩. অমিয়া ঠাকুর, অমিতা ঠাকুর : ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কলকাতা আকাশবাণীর তৎকালীন সহ-অধিকর্তা শ্রীকিরণশংকর মৈত্রের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং শ্রীসুনীত চট্টোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে শৈলজারঞ্জনের আশি-উর্ধ্ব বয়সেও এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

: অরুণ ভট্টাচার্য

শৈলজারঞ্জনের কাছে বাঙালীর ঋণের শেষ নেই

একটি সংকলন

······ নেত্রকোণায় আমার সৃষ্টির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ আমাকে রূপ দিয়ে আমার স্মৃতির যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কবির পক্ষে সেই অভিনন্দন আরো অনেক বেশী সত্য। তুমি না থাকলে এত উপকরণ সংগ্রহ করত কে?

: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

···রবিদাদামশায়ের গান শিক্ষা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রচার ও শিক্ষাদান সব মিলিয়ে তাঁর (শৈলজা বাবুর) যে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় পেয়েছি তার জন্য আমি তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি। : শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ অনেককেই আবিষ্কার করেছেন—শৈলজারঞ্জন তাঁদের অন্যতম। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের সুর-তালাদি আয়ত্ত করেন এবং যক্ষের ধনের মতো আগ্‌লিয়ে না রেখে প্রচার করেন একে একে। রবীন্দ্রনাথের কত গানের যে তিনি স্বরলিপিকার, সে কথা আজ রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীদের অবিদিত নয়। বহু রবীন্দ্রসংগীতের সুর তাল লুপ্ত হয়ে যেত, যদি না শৈলজারঞ্জন তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি বলে সেসব ধারণ করে রাখতেন। : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীতকে শৈলজারঞ্জন তাঁর জীবনে সাধনার বস্তুরূপে নিয়েছেন।······ কোন সাধনার পথই কুসুমাস্তীর্ণ ও সহজগম্য হয় না। অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের রক্তক্ষরণে অবশ্যই তাঁকে সাধনার পথকে বিধৌত ও বিশুদ্ধ করে চলতে হয়েছে, অনেক বাধা বিঘ্ন ও প্রলোভনকে দমন করে একনিষ্ঠ তপস্যায় তাকে অভ্যস্ত হতে হয়েছে, তবেই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা সিদ্ধির অর্গলকে মুক্ত করতে পেরেছে। বলতে পারি রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর সাধনা আজ সিদ্ধির পরিণতিতে পৌঁছেছে।

: শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

শৈলজাদা ভাগ্যবান। অগণিত ছাত্রছাত্রীদের, অনুরাগী বন্ধু ও সতীর্থদের স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, আজও পাচ্ছেন। তিনি দিয়েছেন

বিস্তর, পেয়েছেন এবং পাচ্ছেনও বিস্তর। তার চেয়েও বড়ো কথা, শৈলজাদা বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে, আর যে অগণিত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি লিখন তিনি করেছেন সেই লিখনের মালায়। আমৃত্যু শৈলজা-দা সুস্থ থাকুন, নীরোগ থাকুন, তাঁর কণ্ঠে, তাঁর এস্‌রাজের তারে জেগে থাকুক রবীন্দ্রনাথের গান, এই প্রার্থনা করি। : শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

শৈলজাবাবু সেই অনন্য প্রকৃতির মানুষ, অনন্য বলেই নিঃসঙ্গ। তিনি একলা পথের মানুষ। তাঁর অনুচর (শিষ্য শিষ্যা) যদি বা আছে, সহচর নেই। ...আজকের দিনে যে গুণটির একান্ত অভাব শৈলজাবাবু সেই বিরল গুণের অধিকারী। সে গুণটি হল নিষ্ঠা। নিষ্ঠাবান মানুষের মন একস্থানে নিবদ্ধ।

: শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

একদিন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে শৈলজাদা যে-রসতীর্থের পথে যাত্রা করেছিলেন সে পথে তিনি অনেককে টেনে এনেছেন। তাঁদের অনেকের কণ্ঠের গান আছে। কিন্তু যাঁদের কণ্ঠে গান নেই অথচ কানে রবীন্দ্রসংগীতের তৃষ্ণা আছে, তাঁদেরও অনেককে শৈলজাদা এপথে আসতে প্রলুব্ধ করেছেন।

: অমিয়কুমার সেন

রবীন্দ্রসংগীতে গায়কীর যথার্থ ঘরানা তাকেই বলব যা রবীন্দ্রনাথের ঈপ্সিত গীত-রীতির এবং তাঁর উন্নত ও মার্জিত শিল্পরুচির স্বাক্ষর বহন করে। এই বিচারে একবাক্যে স্বীকার করব যে শৈলজাদা সেই অভিজাত ঘরানার প্রবর্তক, ধারক ও বাহক। : শ্রীসুবিনয় রায়

শ্রদ্ধেয় শৈলজাদা সম্পর্কে কিছু লেখা আমার পক্ষে কঠিন। কেননা তাঁর কথা ভাবতে বা লিখতে গেলে চিন্তা ভাবনা আবেগ অনুভূতি এত ভীড় করে আসে যে কী লিখব কী লিখব না, কোনটা আগে লিখব কোনটা পরে তা স্থির করতে পারি না।...তিনি আমার এতই কাছের মানুষ যে তাঁর কথা নিয়ে বাক্য রচনা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই, বলতে গেলে জ্ঞান হবার পর থেকেই তাঁকে দেখেছি আমাদের পরিবারেরই একজন হিসেবে। নিজের বাবার থেকে তাঁকে কখনও আলাদা বলে ভাবতে হয় নি,

ভাবতে শিখি নি।......আমি আজ শিল্পী হিসেবে যতটুকুই স্বীকৃতি পাচ্ছি তার মূলে আছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ এবং শৈলজাদার প্রেরণা ও পরিচালনা—এই কথা আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

: শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে আছে প্রথম প্রভাতে শংকিতচিত্তে যখন সংগীতভবনে এলাম তখন প্রথমেই যাঁর স্মিত হাসি আমার ভয় দ্বিধা ঘুচিয়ে দিল তিনিই শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার—আমাদের শৈলজাদা। সংগীতভবনের তখন তিনি অধ্যক্ষ। বাড়ীর স্নেহচ্ছায়া ছেড়ে প্রথম হস্টেলে এলে আমার বয়সী ছেলে-মেয়েদের মানসিক অবস্থা কেমন হয় তা তিনি তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সহজ সরল ব্যবহারে নিজেকে আমার বয়সে নিয়ে এসে এক মুহূর্তের মধ্যে তিনি এক বন্ধুত্বের আবহাওয়া গড়ে তুললেন। প্রাণখোলা হাসি আর ছোটো ছোটো হাল্কা গল্পে তিনি এক জমাট আসর বসিয়ে ছিলেন। সেই একটি ঘটনাতে আমার পারিপার্শ্বিক—আমার রোরুদ্যমান মানসিক অবস্থার রূপান্তর ঘটল। কিন্তু কাজের সময় তিনি যেমনই নিয়মানুগ তেমনই কঠিন।...... শৈলজাদা 'রাগ করবেন', এই চিন্তাটি সব সময়ে মনের মধ্যে সজাগ থাকত। শিক্ষকতা করতে বসে আজ বুঝি এটি কতবড় গুণ। : শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, গায়ে কল্লিদার পানজাবী, গলায় চাদর, হাতে মন্দিরা। শৈলজাদার এই ছবিই আমার চোখে বেশি ভাসে। হাতে মন্দিরা, তার কারণ ছবিটা শান্তিনিকেতনের শ্রাবণ-পূর্ণিমার বা বসন্ত-পূর্ণিমার, বৈতালিকের পুরোভাগে থাকতেন মন্দিরা হাতে শৈলজাদা।

সত্যি কথা বলতে গেলে, শৈলজাদা নিজেই বৈতালিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন দীর্ঘদিন এবং শান্তিনিকেতনের হাটে মাঠে ঘাটে গানের পর গান ছড়িয়েছেন।......বার্ধক্যের ছাপ তাঁর মুখে লেগেছে বটে, কিন্তু ধুতি পানজাবি চাদর চটিতে আমার দেখা সেই ত্রিশ বছর আগেকার তাঁর সেই ছবিটির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। শুধু হাতে সেই মন্দিরাটি নেই। : শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

আজ দীর্ঘদিন ধরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে যে দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখতে শিখেছি, সেই দৃষ্টি আমার সমস্ত জীবনকে যদি সুন্দর ও সার্থক করে থাকে তবে এই সার্থকতার মূলে রয়েছে শৈলজাদার অশেষ স্নেহ ও যত্ন।······কোনোদিন যদি রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতে কথা ও সুরের উপলব্ধি হঠাৎ আমার মনকে উদ্ভাসিত করেছে সেদিন মনে হয়েছে আমার প্রণাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পায়ে পৌঁছেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটি প্রণামও পৌঁছেছে আমার রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষাগুরু পিতৃকল্প শৈলজাদার পায়ে।

: শ্রীমতী নীলিমা সেন।

রবীন্দ্রসংগীতে শৈলজাদার গুরুভাগ্য যেমন প্রসন্ন, তাঁর শিষ্য-শিষ্যাপরম্পরার দিক থেকেও তিনি গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। শান্তিনিকেতনে ও তাঁর বাইরে কত ছাত্রছাত্রী যে রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন তার সব সন্ধান পাওয়াই এক বিরাট ব্যাপার।···শিক্ষাব্রতী গুরু এখন গুরুর গুরু—তাঁর অনেক শিষ্য শিষ্যা গুরুর পদে আসীন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে তিনি গুরুর গুরু হয়েও আজও শিক্ষাব্রতী—রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর চিন্তা ও মননের অবধি নেই।

: শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্রসংগীত বাঙ্গালীর সবচেয়ে অন্তরতম, অন্তরঙ্গ। এই গানের প্রধানতম ভাণ্ডারী শৈলজারঞ্জনের কাছে বাঙ্গালীর ঋণের শেষ নেই। শৈলজারঞ্জনের সামনে বসে গান গাইতে বুক কেঁপে ওঠে না এমন শিল্পী বাংলাদেশের এপার ওপারে নেই। তার কারণ একটিই। রবীন্দ্রসংগীত বলতে এই গানের যে রুচিপূর্ণ, শুদ্ধতম এবং বিশিষ্ট গায়কীর ধারা, তাকে তিনিই ধরে রেখেছেন শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও। বাঙ্গালীর এই যে 'আপন গান' এর অতন্দ্র প্রহরী শৈলজাদা। একদিন, যেদিন তিনি থাকবেন না, প্রতিটি শিল্পীকে এই নির্মম অথচ শিশুর মত সরল শিক্ষকটির জন্য চোখের জল ফেলতে হবে।

: শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য

শৈলজারঞ্জন-কৃত রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি

সম্পূর্ণ তালিকা

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির তালিকা :

স্বরবিতান ১ (ভাদ্র ১৩৪২)

১। কাছে থেকে দূর রচিল

২। কোন গহন অরণ্যে

৩। মম মন-উপবনে

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (বৈশাখ ১৩৪৩)

সমস্ত গানের স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত।

স্বরবিতান ৩ (বৈশাখ ১৩৪৫)

৪। নীলাঞ্জনছায়া [১]

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (বৈশাখ ১৩৪৫)

এই গ্রন্থের মোট সাতটি গান ছাড়া সমস্ত গানের স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত।

নৃত্যনাট্য শ্যামা (ভাদ্র ১৩৪৬), সম্পাদনা : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

৫। হে বিরহী হায়

স্বরবিতান ৫ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯)

৬। ফাগুনের নবীন আনন্দে

৭। বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

(৪ + ৪ মাত্রা -ছন্দে)

বিসর্জন[২] (চৈত্র ১৩৪৯)

৮। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে

৯। থাকতে আর তো

১০। আমি একলা চলেছি

১১। ওগো পুরবাসী

১২। আমারে কে নিবি ভাই[৩]

স্বরবিতান ৭ (শ্রাবণ ১৩৫৫)

১৩। আর নাই যে দেরি

১৪। বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম

১৫। এই কথাটাই ছিলেম ভুলে

১৬। এবার তো যৌবনের কাছে

স্বরবিতান ৪২ (আশ্বিন ১৩৬২)

১৭। আমি যখন ছিলেম অন্ধ

১৮। প্রভু বলো বলো কবে

১৯। আমি রূপে তোমায় ভোলাব না

২০। ওগো, পথের সাথি, নমি বারংবার

স্বরবিতান ৪৪ (পৌষ ১৩৬২)

২১। তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি

২২। লক্ষ্মী যখন আসবে [৪] (৩+৩ মাত্রা -ছন্দে)

স্বরবিতান ৪৬ (পৌষ ১৩৬২)

২৩। এখন আর দেরি নয়

স্বরবিতান ৪৭ (শ্রাবণ ১৩৬৩)

২৪। ওরে নূতন যুগের ভোরে

২৫। চলো যাই চলো

স্বরবিতান ৫৩ (ফাল্গুন ১৩৬৪)

২৬। আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণ-রাতি

২৭। আমার যেদিন ভেসে গেছে

২৮। আমি তখন ছিলেম মগন

২৯। আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ

৩০। একদিন চিনে নেবে তারে

৩১। ওগো সাঁওতালি ছেলে

৩২। কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম

৩৩। চিনিলে না আমারে কি

৩৪। ধূসর জীবনের গোধূলিতে

১১৫। হৃদয়ে হৃদয় আসি

স্বরবিতান ৬১ (অগ্রহায়ণ, ১৩৮২)

১১৬। আর নহে, আর নহে

১১৭। আমার নিখিল ভুবন হারালেম

১১৮। কাছে ছিলে, দূরে গেলে। (পরিশিষ্ট)

১১৯। কোন্ সে ঝড়ের ভুল

১২০। ছি ছি, মরি লাজে

১২১। ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে

১২২। ডেকো না আমারে ডেকো না

১২৩। দুঃখের-যজ্ঞ-অনল জ্বলনে

১২৪। না না, ভুল কোরো না গো

১২৫। যাক্ ছিঁড়ে, যাক্ ছিঁড়ে যাক্

১২৬। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

১২৭। শুভমিলন লগনে বাজুক বাঁশি

১২৮। হায় হতভাগিনী

১২৯। যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরলিপি যা আজও গ্রন্থভুক্ত হয় নি :

১. অধরা মাধুরী। বিশ্বভারতী : ১০-১২।১৩৭৪।২৩৮

২. আজি দক্ষিণপবনে। বিশ্বভারতী : ১-৩।১৩৭৪।৩৫৪

৩. আমরা দূর আকাশের। উত্তরসূরী : ১-৩।১৩৬৬।২৬৩

৪. এসেছিনু দ্বারে তব। বিশ্বভারতী : ১০-১২।১৩৭১।২৮০

৫. ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী। বিশ্বভারতী : ১০-১২।১৩৭৬।৩৩৪

৬. নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে। বিশ্বভারতী : ১-৩।১৩৭৮।৪০৬

৭. বাণী মোর নাহি। বিশ্বভারতী : ১০-১২।১৩৭২।২৮৯

৮. সকল-কলুষ-তামস হর। বিশ্বভারতী : ৬।১৩৪৯

সম্পাদিত স্বরলিপি গ্রন্থ :

স্বরবিতান ৩॥ বৈশাখ ১৩৪৫

৪॥ ভাদ্র ১৩৪৬

৫ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

১৮ ॥ ভাদ্র ১৩৪৬

৩০ ॥ ভাদ্র ১৩৪৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

স্বরবিতান ৭ ও ৩৬ খণ্ড প্রকাশে সম্পাদককে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার বিশেষ সহায়তা করেন।

এই তালিকা প্রণয়নে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসের উপদেশে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

সংকলন : সুভাষ চৌধুরী

[1] গানটির দিনেন্দ্রনাথ -কৃত স্বরলিপি স্বরবিতান তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংস্করণে (বৈশাখ ১৩৪৫) মুদ্রিত। গানটির অপেক্ষাকৃত অলংকৃত একটি রূপের শৈলজারঞ্জন-কৃত স্বরলিপি আষাঢ় ১৩৫৯ সংস্করণে সংযোজিত।

[2] বিসর্জন গ্রন্থের চৈত্র ১৩৪৯ সংস্করণে গানগুলির স্বরলিপি মুদ্রিত, পরে স্বরবিতান ২৮ খণ্ডে মুদ্রিত হওয়ায় বিসর্জন গ্রন্থে বর্জিত।

[3] গানটির স্বরলিপি প্রণয়নে স্বরলিপিকার কবিকণ্ঠের গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্য নিয়েছেন।

[4] শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যী -কৃত 'যোগাযোগ' কাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ গানটিতে নূতন সুর দিয়ে স্বরলিপিকারকে শিখিয়েছিলেন।

প্রাক্তনী 'সুরঙ্গমা' প্রকাশিত 'সংবর্ধনা-পুস্তিকা' থেকে দুটি সংকলন পরিমার্জিত রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। : সম্পাদক, উত্তরসূরি

আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রসংগীতের নির্বাচিত তালিকা

[শৈলজারঞ্জন একদা গায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরও প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু এই আদর্শবাদী মানুষটি শিক্ষকতার আদর্শের কাছেই শিল্পী-জীবনকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলেন। কারণ, শিল্পী এদেশে কিছু রয়েছেন, শিক্ষক নেই; দীর্ঘকাল পূর্বে তাঁর ছাত্রী রুবি মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় কিছু গান ধরে রাখা হয়েছিল। তিনি আমাদেরও একটি সেট পাঠিয়েছেন। জানা গেছে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়মে গানগুলি সযত্নে রক্ষিত হবে। আকাশবাণী থেকেও প্রচারিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক গায়কীর জন্য শিল্পীদের এই গানগুলি শুনতেই হবে কোনদিন। ভাবীকালের শিল্পী ও গবেষকদের জন্য রইল এই গানগুলি : সম্পাদক : উত্তরস্মৃরি]

১৯৬৬

১. বড়ো বিস্ময় লাগে (অক্টো. ১৯৬৬), স্বর— /প্রেম-প্রকৃতি-৫৭/ গী-৩য়,খ।

২. আছো অন্তরে চিরদিন (অক্টো. ১৯৬৬), স্বর—২২/পূজা-৪২২/ গী-১ম, খ।

১৯৬৭

৩. বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল (৮.১১.৬৭), স্বর—৫৮/প্রকৃতি (বর্ষা)-১২৬/গী-২য়, খ।

৪. মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে (৮. ১১. ৬৭), স্বর—২০/ প্রেম-৫৯/গী-২য়, খ।

৫. বাজো রে বাঁশরি, বাজো (৮.১১.৬৭), স্বর— /নাট্যগীতি-১০৭/ গী-৩য়, খ।

৬. মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন (৮. ১১. ৬৭), স্বর—৫৯/ প্রেম-২২৫/গী-২য়, খ।

৭. আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় (৮. ১১. ৬৭), স্বর—৩৭/ প্রেম-১৪৭-গী-২য়, খ।

৮. আজি দক্ষিণপবনে (৮. ১১. ৬৭), স্বর—বিশ্ব-পত্রিকা/প্রেম-২২৭/ গী-২য়, খ।

৯. শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে(৮. ১১. ৬৭), স্বর—৫৫/পূজা-৮২/গী ৩য়, খ।

১৯৬৮

১০. কেহ কারো মন বোঝে না (০২. ১০. ৬৮), স্বর—৩২/প্রেম-৩৯২/ গী-২য়, খ।

১১. শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা, প্রাণেশ্বর (১২. ১০. ৬৮), স্বর—৪৫/পূজা-৪৩৮/ গী-১ম, খ।

১২. আমার আপন গান আমার অগোচরে (১২. ১০. ৬৮), স্বর—৫৯/ প্রেম-২২৯/গী-২য়, খ।

১৩. এ পরবাসে রবে কে হায় (১৯. ১০. ৬৮), স্বর—৮/পূজা-৪৩৫/ গী-১ম, খ।

১৪. দিনান্তবেলায় শেষের ফসল (১৯. ১০. ৬৮), স্বর—৫৯/প্রেম-২৫৫/ গী-২য়, খ।

১৫. প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে (১৯. ১০. ৬৮), স্বর—৫৩/প্রেম-৯৬/ গী-৩য়, খ।

১৯৬৯

১৬. ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার (১৭. ৩. ৬৯), স্বর—১/ প্রেম-৪০২/গী-২য়, খ।

১৭. হৃদয় আমার প্রকাশ হল (১৭. ৩. ৬৯), স্বর—৪৩/পূজা-২০৮/ গী-১ম, খ।

১৮. শুধু তোমার বাণী নয় গো (১৭. ৩. ৬৯), স্বর—৪৫/পূজা-৩৭/ গী-১ম, খ।

১৯. আরো আঘাত সইবে আমার (১৭. ৩. ৬৯), স্বর—৩৭/পূজা-২২৪/ গী-২য়, খ।

২০. তোমায় নতুন ক'রে পাব বলে (১৭, ৩. ৬৯), স্বর—৭/পূজা-৪৫/ গী-২য়, খ।

২১. শুধু যাওয়া আসা (১৯. ৩. ৬৯), স্বর—১০/বিচিত্র-৬৯/গী-২য়, খ।

২২. ওলো সই, ওলো সই (১৯. ৩. ৬৯), স্বর—৩৫/প্রেম-৮১/গী-২য়, খ।

২৩. হ্যাদে গো নন্দরাণী (১৯. ৩. ৬৯), স্বর—২০/বিচিত্র-৮৮/গী-২য়, খ।

২৪. দিনের পরে দিন যে গেলো (১৯. ৩. ৬৯), স্বর—৫৭/প্রেম-২৬০/ গী-২য়, খ।

১৯৭০

২৫. মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে (২৯. ১০. ৭০), স্বর—৫৮/ প্রেম-২৭৭/গী-২য়, খ।

২৬. শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে (২৯. ১০. ৭০), স্বর—৫৯/ প্রকৃতি-১৩২/গী-২য়, খ।

২৭. গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা (২৯. ১০. ৭০), স্বর—৫৮/ প্রেম-১০৯/গী-২য়, খ।

২৮. আমি আশায় আশায় থাকি (২৯. ১০, ৭০), স্বর—৫৯/প্রেম-২০০/ গী-২য়, খ।

২৯. দেবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে (২৯. ১০. ৭০), স্বর—৬০/প্রেম-২৩৮/ গী-২য়, খ।

৩০. আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে (২৯. ১০. ৭০), স্বর—৫৮/ প্রকৃতি-.২৪/গী-২য়, খ।

৩১. চিত্ত পিপাসিত রে (৪. ১১. ৭০), স্বর—১০/প্রেম-১/গী-৩য়, খ।

৩২. অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে (৪. ১১. ৭০), স্বর—/ প্রেম-২৩০/ গী ৩য়, খ।

৩৩. ডেকোনা আমারে ডেকোনা (৪. ১১. ৭০), স্বর— /নৃত্যনাট্য/ গী-৩য়, খ।

৩৪. যে ছিল আমার স্বপনচারিনী (৪. ১১. ৭০), স্বর—৬১/প্রেম-১০৫/ গী-.য়, খ।

৩৫. মহারাজ, একি সাজে এলে (৪. ১১. ৭০), স্বর ৩৬/পূজা-৫২২/ গী-১ম, খ।

৩৬. চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না (৪. ১১. ৭০), স্বর—৪/ পূজা-৪১৩/গী-১ম, খ।

৩৭. নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে (৫. ১১. ৭০), স্বর—৫৯/ প্রকৃতি-১৩৫/গী-২য়, খ।

৩৮. পিপাসা হায় নাহি মিটিল (৫. ১১. ৭০), স্বর—২৫/পূজা-৪৪১/ গী-২য়, খ।

৩৯. আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে (৮. ১১. ৭০), স্বর—৫৮/ প্রকৃতি-১২৭/গী-২য়, খ।

৪০. আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে (৮. ১১. ৭০), স্বর—৫৯/ প্রকৃতি (বর্ষা)-১২৯/গী-২য়, খ।

৪১. এবার নীরব করে দাও হে (৮: ১১. ৭০), স্বর—৩৭/পূজা-২৫৪/ গী-১ম, খ।

১৯৭১

৪২. ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় (৩. ১০. ৭১), স্বর—৫৩/ প্রেম-২৫৬/গী-২য়, খ।

৪৩. আমার যেতে সরে না মন (৩. ১০. ৭১), স্বর—৬০/প্রেম-৩৯৫/ গী-২য়, খ।

৪৪. আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা (৫. ১০. ৭১), স্বর—৪২/প্রেম ৮৮/ (অরূপরতন)/গী-২য়, খ।

৪৫. যা হবার তা হবে (৯. ১০. ৭১), স্বর—৫২/পূজা-৮৩/গী-১ম, খ।

৪৬. দূরে কোথায় দূরে দূরে (৯. ১০. ৭১), স্বর—১২ পূজা-৪৪০/গী-১ম, খ।

১৯৭৪

৪৭. তুমি যে আমারে চাও (৬. ১১. ৭৪), স্বর—৬০/পূজা-২৯৮/গী-১ম, খ।

৪৮. অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া (৭. ১১. ৭৪), স্বর—৮/

১৯৭৫

৪৯. শুকনো পাতা কে-যে ছড়ায় ওই দূরে (৫. ১১. ৭৪), স্বর—৬/ প্রকৃতি-২২৪/গী-২য়, খ।

সংকলন : নির্মল দে

তরঙ্গিত স্মৃতি : রবীন্দ্রসংগীতে সিম্ফনি

অম্লানজ্যোতি মজুমদার

অনুচ্ছেদ ১. মালার্মের "ল' আপ্রে মিদি দ' উন ফন" কবিতাটির প্রেরণা ছিল Bonche এর একটি ছবি, মালার্মের কবিতাটি দেবুসিকে তাঁর প্রেলুডটি রচনা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাংলা কবিতায় এমন একটি দৃষ্টান্ত হল রবীন্দ্রনাথের ছবি (বলাকা) কবিতাটি। প্রশান্ত মহলানবীশ লিখেছেন, এলাহাবাদে অবস্থানকালে (১৩২১) কাদম্বরী দেবীর একখানি পুরানো ফোটো রবীন্দ্রনাথকে 'ছবি' কবিতাটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'উত্তরসূরি'র 'রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা'য় রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন : "এই রচনাটি সম্পূর্ণই চিত্রপ্রেরণাজাত; অর্থাৎ এলাহাবাদে ঐ ছবিটি না দেখলে রচনাটি আদৌ উৎসারিত হত না।" তুলনাটিকে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে ; 'ছবি' কবিতাটি অবলম্বনে ১৩৩৮ সালে "তুমি কি কেবলি ছবি" শীর্ষক গানটি রচিত হয় যা ১৩৩৯ সালে "শাপমোচন" গীতিনাট্যে প্রযুক্ত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ২. কিন্তু কোন তুলনাই নিখুঁত হয় না। মালার্মে-দৃষ্ট Bonche এর ছবি আর রবীন্দ্রনাথ-দৃষ্ট ফোটো শিল্প হিসাবে অবশ্যই তুল্যমূল্য নয় বা দেবুসি-কৃত সংগীত এবং উক্ত রবীন্দ্রসংগীতটি। এ সমস্ত তথ্য থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প কি ভাবে একে অন্যকে প্রভাবিত করে। কিন্তু পরস্পরকে অনুপ্রেরিত করা বা পরস্পরের উপাদান যোগান দেওয়া ছাড়াও এক শিল্পকে আরেকটিকে অন্যভাবেও প্রভাবিত করতে পারে—তা হল, সেই উপাদান সমূহের বিন্যাসে বা নির্মাণ কৌশলে। রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতাটি সেইদিক থেকে আমাদের মনোযোগ দাবী করে, কেন না এটি এমনি এক দৃষ্টান্ত যা কবিতা আর সংগীতের যোগে এক অভিনব সৃষ্টিতে রূপান্তরিত। এখানে অবশ্য 'ছবি' কবিতাটির কথাই বলা হচ্ছে, তার গীতিময় রূপটি নয়। বস্তুত: গীতিময় রূপটি খণ্ডিত ; কবিতাটির সমগ্র অংশে সুর দেওয়া হয় নি, কেবল স্মৃতিপ্রসঙ্গটুকুই গানে ধরা পড়েছে। আর গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হবার ফলে তা মূল কবিতাটির অনুষঙ্গ থেকেও বিযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংগীতের যোগ বলতে কি বোঝাচ্ছে তা এখানে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের মনে সুর আর কবিতা পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সম্ভবতঃ তিনি আমাদের একমাত্র গীতিকবি যাঁর সমান অধিকার ছিল এই দুই বিষয়ে, যাঁর গানে বাণী অকুণ্ঠ; বস্তুতঃ বাণীকে অনন্তে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর সাধনা। অপরপক্ষে সুরের বাঁধনে বাঁধা বলে তাঁর বহু কবিতাই গাওয়ার যোগ্য। এমন অনেক কবিতার নাম সহজেই করা যায় যেগুলি মূলতঃ গান হিসাবে লেখা হয় নি, পরে সুর সংযুক্ত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩. সুর ব্যতিরেকে কাব্য যে উপায়ে সংগীতের সাযুজ্য লাভ করে তা হল শব্দঝংকারে। সাধারণতঃ কাব্যের সংগীত (music of poetry) বলতে যা বোঝায় তা হল ভাষার non-semantic তথা অর্থনিরপেক্ষ ধ্বনি সম্পদের ব্যবহার। (দ্র. ১.) যন্ত্র সংগীত যেমন শব্দার্থ ছাড়াই শ্রোতাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম, কবিতাও তেমনি কেবল শব্দের ধ্বনির সাহায্যে আবেগ সৃষ্টি করতে পারে। ভেরলেনের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যিনি শব্দার্থের উপরে স্থান দিয়েছিলেন ধ্বনিকে, কিন্তু মনে রাখতে হবে কবিতা সংগীতের বিকল্প বা অপকৃষ্ট সংগীত নয়। কোনো রচনার শব্দের ধ্বনি যদি তার অর্থ গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকে কবিতা বলা যাবে কি না ভাববার বিষয়। এ প্রসঙ্গে জর্জ হোয়ালীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "anything that tends to undermine or destroy the verbal character of words in a poem strikes a blow to the heart of poetry by destroying the medium of poetic." (দ্র. ২)

অনুচ্ছেদ ৪. কাব্যের সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে টি. এস. এলিয়ট বলেছেন সংগীতের যে দুটি বৈশিষ্ট্য একজন কবিকে আকৃষ্ট করে সেগুলি হল ছন্দ-চেতনা আর বিন্যাস-কৌশল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বিশেষ একটি সাংগীতিক বিন্যাস যেমন সিম্ফনি বা কোয়ারটেটের আদলে একটি কবিতাকে বিন্যাস করা সম্ভব। (দ্র. ৩)

ফলতঃ এলিয়েটের অনেক কবিতাই সাংগীতিক বিন্যাসের ব্যবহারে বিশিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ এখানে ফোর কোয়ারটেট কাব্যটির উল্লেখ করা

যেতে পারে যার নামই তার সংগীত সম্পর্কের ইঙ্গিত করছে। অধিকন্তু জে. ডব্লু. এন. সুলিভান বীথোফেনের ওপাস ১৩০ (বি. ফ্ল্যাট), ১৩১ (সি. মাইনর), এবং ওপাস ১৩২ (এ. মাইনর) কোয়ারটেটগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাকে স্বচ্ছন্দে এলিয়টের ফোর কোয়ারটেট এর বর্ণনা হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। (দ্র. ৪)

কিন্তু এলিয়টের আগে থেকেই ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় কাব্যে এ জাতীয় সাংগীতিক বিন্যাসের ব্যবহার প্রচলিত ছিলো। জে. এম. কোহেন উল্লেখ করেছেন এলিয়টের কাব্যরচনার অনেক আগেই সংগীতের আদলে লেখা হয়েছিলো টেনিসনের 'মড', টমসনের 'সিটি অব ড্রেডফুল নাইট'; আর প্রবন্ধের সুরুতে যে কবিতাটি উল্লেখ করেছি তারও বিন্যাস সাংগীতিক। (দ্র. ৫)

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে এ জাতীয় সাংগীতিক বিন্যাস বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

অনুচ্ছেদ ৫. রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার সেই অতুলনীয় প্রতিভার পরিক্রমা সুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতকে, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ভিক্টোরিয়ান যুগে। এবং ঐ যুগের ইংরেজী কবিতা, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এসবই তাঁকে স্পর্শ করেছিল। অন্ততঃ একথা ভরসা করে বলা যায় তাঁর সামনে ছিলো টেনিসনের 'মড', ব্রাউনিংএর 'জেমস্ লী'জ ওয়াইফ'—কাব্যে সাংগীতিক বিন্যাসের এমন সব দৃষ্টান্তগুলি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ইংরেজী তথা অভারতীয় কোনো কিছুর কথা বলার বিপদ আছে, সাধারণ্যে এমন এক ধারণা প্রচলিত এতে রবীন্দ্রনাথের মহিমা খর্ব হয়। এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন কিনা সন্দেহ আছে; কেন না তাঁর প্রতিভা তো দ্বিতীয়স্তরের নয় যা শুভমার্গে বিচরণ করে আপনার অস্তিত্ব বাঁচাতে ব্যাকুল! বরং তিনি শেকসপীয়রের সংগোত্র; ঋণী, কিন্তু তাঁর মতো ধনীই বা কে!

(৬) শুধু ইংরেজী কবিতাই নয়, ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সংগীতও তাঁর শ্রবণে ঝংকৃত ছিলো। রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্য সংগীতের গভীর অনুশীলন করেছিলেন (এখানে রিয়াজ করার থেকে বড়ো কিছুর কথা বলা হচ্ছে) তার অজস্র প্রমাণ অল্প আয়াসেই সংগ্রহ করা যায়; "At seventeen, when I first came to Europe, I came to know it intimately, but even

before that time I had heard European music in our household, I had heard the music of Chopin and others at an early stage."

"য়ুরোপে কবি যখনই আসিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য সংগীত শুনিবার ও অভিনয় দেখিবার সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন"—লিখছেন জীবনীকার। তিনি শোনেন বাখ বা হ্বাগনার, পদ্মার অবিরাম কলরোল তাঁকে মনে করিয়ে দেয় শোঁপার সোনাটার কথা। ইন্দিরা দেবীকে লেখেন হাতের কাছে শোঁপার রচনা থাকলে ভালো হত। (দ্র. ৬) এ সব থেকেই পাশ্চাত্ত্য সংগীতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, যা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে যায়। আরও জানা যায় রবীন্দ্রনাথের অধিকতর পছন্দ ছিল হ্বাগনারের সাহিত্যাশ্রয়ী 'পার্সিফাল" প্রভৃতি অপেরা কেন না তা যুক্ত করেছে সাহিত্য এবং সংগীত: ওই সংগীত যা বলতে চেয়েছে তা বাণীর সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্ত হতেই পারে না। ওই সকল অপেরার সাহিত্য বিষয়ও পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য সংগীতের অপেক্ষা করেছে।" (দ্র. ৭) আশ্চর্য্য কি, কাব্যের প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করবেন সাংগীতিক বিন্যাস।

অনুচ্ছেদ ৬. "ছবি" কবিতাটিতে যে সাংগীতিক বিন্যাস ব্যবহৃত হয়েছে তা হল সিম্ফনি। প্রায়শই চার, কখনো বা ততোধিক (বীথোফেনের আছে পাঁচ পর্ব সিম্ফনি পাস্টোরাল, আন্তন রুবিনস্তাইনের আছে সাত পর্ব), পর্বে (movement) রচিত যন্ত্রসংগীত যা লয় এবং ভাবের পারম্পর্যে গ্রথিত। একটি পর্বের সঙ্গে অপরটির ভাব এবং লয়ের বৈপরীত্য, কখনো কখনো একটি পর্বের মধ্যেই বিরোধী ভাববস্তুর ব্যবহার, সিম্ফনিকে ত্যর বৈশিষ্ট্য দান করে। ফলে একটি ভাববস্তু ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়ে একটি সামগ্রিক রূপ পায়।

লিরিক কাব্যের ক্ষেত্রে এই সাংগীতিক বিন্যাসের উপযোগিতা সহজেই অনুমেয়। প্রচলিত লিরিক আঙ্গিক—একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা যা একটিমাত্র সরল এবং অবিমিশ্র আবেগে গ্রথিত—যখন আর বহন করতে পারছে না নবজাগ্রত অনুভূতিমালা, একটিমাত্র আবেগ নয়, আবেগপুঞ্জ, তখনি ভিক্টোরিয়ান লিরিকে সাংগীতিক বিন্যাস দেখা দিয়েছিলো। কেন না এই বিন্যাস লিরিককে বৃহৎ পরিসরে চলে ফিরবার স্বাধীনতা দিলো। এখানে দুটি কথা মনে রাখা দরকার:

১. কোনো সাংগীতিক বিন্যাসকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার দায় নেই কবিতার।

২. সাংগীতিক বিন্যাস বলতে ধ্বনিগত মূর্চ্ছনাকেও বোঝাচ্ছে না। এ বিষয়ে সুজান ল্যাঙ্গারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"The tension which music achieves through dissonance and the reorientation in each revolution to harmony find their equivalents in the suspensions and periodic decisions of propositional sense in poetry. Literal sense, not euphony, is the 'harmonic structure in poetry."

গদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন. 'ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন করে সাজান যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় ন', প্রাণ পেয়ে ওঠে আনন্দের অন্তরে।

যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে-ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই, অনেক সময়ে এ কথা ভুলে যাই যে, ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম করে আমাদের মনকে বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভারের সংযমে, তার বিন্যাস নৈপুণ্যে। সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা" র. র/১৪/৮১৭ (দ্র. ৮)

সংগীতিক বিন্যাস মূলতঃ এবম্বিধভাবের বিন্যাস। এ কথা মনে রেখে ছবি কবিতাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

অনু ৭. ১০৭ পংক্তিতে রচিত 'ছবি' পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত, পঞ্চমপর্বের পর চার পংক্তির একটি কোডা (coda); পর্ব পাঁচটির বিস্তার সমান নয়, সিম্‌ফনির ক্ষেত্রেও পর্ব বিভাগ ভাবের বিস্তার অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। প্রথম পর্বটি সংক্ষিপ্ত; এর ৯ পংক্তিতে উপস্থাপিত এক দ্বিমাত্রিক প্রতিমা, অবিরাম চলার মাঝখানে গতিহীন এবং গতিহীন বলেই সত্য নয়। যা আছে তা স্মৃতিমাত্র—"শুধু পটে লিখা।" পটের স্তব্ধতার পাশাপাশি বেগবান গ্রহ-তারা-রবির শোভাযাত্রা ভাবের বৈপরীত্য সূচিত করছে। দ্বিতীয় পর্বে (দশ থেকে আটাশ পংক্তি) বৈপরীত্য সূচক শব্দগুলির—চঞ্চল এবং শান্ত, স্থির এবং অস্থির—প্রয়োগে সেই বৈপরীত্য সম্প্রসারিত হ'ল। নিখিল বিশ্বের জঙ্গমতা

পটের স্তব্ধতাকে প্রকট করছে। রাত থেকে দিন, গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত বিচিত্র পরিক্রমায় চলমান এই পৃথিবীর ধূলি।

তৃতীয় পর্বে (উনত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ) এক নতুন বক্তব্য উপস্থাপিত। আজ যা গতিহীন পটমাত্র একদা সচল ছিল এবং সত্য। বিশ্বের অবিরাম চলার সঙ্গে সেও ছিল নৃত্যপরা। তার চলার মধ্যে বিশ্বের চলার বাণী ধ্বনিত হ'ত।

এই পর্বগুলি ক্রমান্বয়ে পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সাংগীতিক বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলিও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেনই বা রবীন্দ্রনাথ সাংগীতিক বিন্যাসের ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হলেন তাও। একটি সরল লিরিকে এভাবে ক্রমাগত ভববিস্তার সম্ভব ছিলো না। কেন না ভাবের বৈচিত্র্য এবং বিরোধাভাস লিরিকের ইউনিটির (unity) পক্ষে ক্ষতিকারক বলেই বিবেচিত। অপর পক্ষে, লিরিক আবেগ (impulse) যখন উদ্বেল হয়ে ওঠে তাকে বৃহৎপরিসরে মুক্তি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। লিরিক অনুপ্রেরণা এবং লিরিকের সংক্ষিপ্ত আয়তন রোমান্টিক কাব্যের কয়েকটি মহৎ ব্যর্থতার জন্য দায়ী। কাদম্বরী দেবীর ছবি রবীন্দ্রনাথের মনে যে আবেগ সঞ্চার করেছিল তাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ছিল সন্দেহ নেই। সাংগীতিক বিন্যাস ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা সমাধান করতে পেরেছেন।

চতুর্থ পর্বে (পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেষট্টি পংক্তি পর্যন্ত) পূর্বের সমস্তগুলি বক্তব্য ভিন্নরূপে দেখা দিচ্ছে। এখানে সাংগীতিক বিন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। পর্ব থেকে পর্বান্তরে একটি ভাবসূত্র ঘুরে ঘুরে আসছে কিন্তু প্রতিবারই নতুন অনুষঙ্গে, নতুন রূপে। প্রথম পর্বে বিশ্বের গতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল সচল গ্রহ-তারা-রবির উল্লেখ ক'রে : দ্বিতীয় পর্বে ঋতুপরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের বেগ সূচিত হয়েছিল ; চতুর্থ পর্বে সেই চলার বাণী নতুনতর রূপে বর্ণিত। আলো থেকে আঁধারে, জানা থেকে অজানায়, মৃত্যুকে অতিক্রম করে এই সজীব বিশ্ব কেবলই অগ্রসর। আর এই চলার বেগ প্রতিনিয়ত ছবির সঙ্গে (কবিতায় ছবি/স্মৃতি তুল্যমূল্য, আমরা মুহূর্তের জন্যও 'ছবিটিকে প্রত্যক্ষ করি না) বিশ্বের ব্যবধান রচনা করছে।

'এই তৃণ, এই ধূলি, ওই তারা, ওই শশীরবি,

সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।"

অনুচ্ছেদ ৮. পঞ্চমপর্বে (সাতষট্টি থেকে একশো তিন পংক্তি) সম্পূর্ণ এক বিপরীত বক্তব্য—'নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি" নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূচনা করেছে। সিম্ফনির অপর বৈশিষ্ট্য তার নাটকীয়তা: the feeling that the music presses onward through conflict of solution" অপ্রত্যাশিতভাবে গতিহীন পটে সঞ্চারিত হচ্ছে বেগ। স্মৃতি যদি সচল না হয় তবে তো সে বিস্মৃতি, বিশ্বের গতির সঙ্গে যুক্ত থাকে বলেই তো স্মৃতি থাকে। এই ধূলি, এই নীলিমা, নদীর তরঙ্গভঙ্গ তাকে নিয়ত বহন করে চলে। প্রয়াত প্রেম অগোচরে রক্তে বাসা বাঁধে। শেষ পর্বে স্থির। অস্থির, শান্ত। চঞ্চল, জীবন। মৃত্যু—এই বিরোধীভাবগুলির দ্বন্দ্বের অবসান হবার পর গভীর প্রশান্তিতে একটি "কোডা" বাজে

"তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পর হারায়েছি রাতে।
তারপর অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি
নয় ছবি, নও তুমি ছবি॥"

অনুচ্ছেদ ৯. কোনো কোনো সমালোচক 'ছবি' কবিতাটিতে বের্গসঁ কথিত গতির তত্ত্ব আবিষ্কার করে ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু 'বিশ্বের সত্য হল গতি' এই একটিমাত্র সরল বাক্য এই কবিতাটির উৎকর্ষের সামান্যতম পরিচয় বহন করে না। দৃষ্টি এড়িয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটিতে কি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সমস্যা কেবলমাত্র লিরিক কবিতার আয়তনের সমস্যামাত্র নয়, এই সমস্যা কবিতার ভাববস্তুতেই নিহিত ছিল। যে স্মৃতি কবিতার উৎসে তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছিল বেদনাদায়ক এবং একান্ত ব্যক্তিগত। সেই ব্যক্তিগত থেকে ধীরে ধীরে নৈর্ব্যক্তিকতাতে উত্তরণেই কবিতাটির সিদ্ধি। আমরা কবিতাটি পড়ে যে বিধুরতা অনুভব করি তা কাদম্বরী দেবীর জন্য রবীন্দ্রনাথের শোক থাকে না, বরং সেই প্রয়াত প্রেম যা আমাদের প্রত্যেকের বুকের নীচে বাসা বাঁধে

এবং অগোচরে আমাদের পরিবর্তনশীল জীবনকে স্পর্শ করে যায়। 'আবেগের উচ্ছ্বাস নয়, কবিতা হল আবেগ থেকে মুক্তি', এলিয়ট-উক্ত এই প্রবাদতুল্য বচনের এমন সার্থক দৃষ্টান্ত অল্পই আছে।

সূত্র :

১. Music of Poetry : জন হল্যাণ্ডার/JAAC (15) 1956.

২. Poetic Process : জর্জ হোয়ালী/দশম অধ্যায় পৃঃ ১৯৫—২২১, R K.P.

৩. Music of Poetry : টি. এস. এলিয়ট, On Poetry and Poets/ Faber & Faber.

৪. Sound and Form in Modern Poetry : হার্ভে গ্রস, য়ুনিভার্সিটী অব মিশিগান প্রেস

৫. Poetry of this Age : জে. এম. কোহেন, পৃঃ ১৩৬

৬. ছিন্নপত্রাবলী ১০৫, ১১৯, ১৪২, ১৬২

৭. গদ্যছন্দ : রবীন্দ্র রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬

৮. A short History of Western Music : আর্থার জ্যাকবস্, ১৫শ অধ্যায়, পৃঃ ২০৪, এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জ্যাকবস্ বীথোফেনের পঞ্চম সিম্ফনি এবং পাঁচ সংখ্যক পিয়ানো কনচের্টোর উল্লেখ করেছেন।

৯. Tradition and Individual Talent : টি. এস. এলিয়ট

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বিতীয় সেতু

নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তায় কীর্ত্তনের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। অথচ এটা লক্ষণীয় যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ লালিত-পালিত। তখনকার অভিজাত সমাজে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ততক্ষণে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উচ্চবিত্তদের মধ্যে অনেকেই বৈঠকখানায় ওস্তাদ গায়ক-বাদকের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সঙ্গীতে বা নাটকে বাংলার সুর কিছু কিছু স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু তখনকার নব্য-সংস্কৃতি সম্পন্ন উচ্চবিত্ত সমাজে প্রচলিত সঙ্গীতের মূল ধারাটি ছিল উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-ভিত্তিক। সেই ধারাটি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল সাধারণ্যে।

এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পড়েছে। প্রথম যুগের সঙ্গীত রচনায় তাই তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বিশেষ করে, ধ্রুপদের আদর্শে অজস্র গান রচনা করেছেন। এই সময়ে তাঁর রচিত বেশীর ভাগ গানই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের থেকে নেওয়া। আর যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে সঙ্গীত রচনা করেছেন, হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত পদ্ধতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। তবে সেটা আরো পরে। শিলাইদহ আর শান্তিনিকেতনে তাঁর গানে এনে দিয়েছে মাটির ছাপ। বাংলার নিজস্ব গান—কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতির ছোঁয়া যখন লাগল তাঁর গানে, বাংলা গানের নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হল।

রবীন্দ্রনাথ এটা বুঝেছিলেন যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে, আর যাই হোক, বাঙালীর হৃদয়ের সংযোগ ঘটে নি। আবেগপ্রবণ বাঙালী সঙ্গীতে কিছুতেই কলাকৌশলের কারুকৃতি চাইতে পারে না। তার আসল লক্ষ্য হল হৃদয়াবেগের কোমল-করুণ বহিঃপ্রকাশ। রুচির এই বৈশিষ্ট্যই বাঙালীর ঘরে কীর্ত্তনকে এনে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন :···আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালী স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে। সেই কারণে সর্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতরীতির একান্ত অনুগত হতে পারে নি। সেই জন্যেই কানাড়া আড়ানা মালকোশ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালীকে কীর্ত্তন সৃষ্টি করতে

হয়েছে। গানকে ভালবেসেছে 'বলেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে। তিনি বলেছেন—বাংলাদেশের একটা বিশেষত্ব আছে; বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। সমস্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পিছনে ফেলে বাঙালীর প্রাণ আপনার সঙ্গীতকে উদ্ভাসিত করেছে, যেহেতু তার ভেতরের হৃদয়াবেগ সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না করে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, কীর্তন বাঙালীর নিজস্ব এক সৃষ্টি যা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিভাস। অন্য কোনো গানেই বাঙালীহৃদয় এমন করে আর প্রতিবিম্বিত হয় না। তিনি বলেছেন: বাংলা কি গান গায় নি? বাংলা এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্তন। বাংলার সঙ্গীত যাবতীয় প্রথা—সঙ্গীতসম্বন্ধীয় চিরাগত প্রথার নিগড় ছিন্ন করেছিল। দশকুশী, বিশকুশী, কত তালই বেরোল, হিন্দুস্থানী তালের সঙ্গে যার কোনো যোগই নেই। খোল একটা বেরোল, যার সঙ্গে পাখোয়াজের কোনো মিল নেই। কিন্তু কেউ বল্লে না এটা গ্রাম্য বা অসাধু। একেবারে মেতে গেল সব নেচে-কুঁদে হেসে ভাসিয়ে দিলে। কত বড় কথা। অন্য প্রদেশে তো এমন হয় নি। সেখানে হাজার বছর আগেকার পাথরে গাঁথা কীর্তিসমূহ যেমন আকাশের আলোককে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তেমনি সংগীত সম্বন্ধেও সজীব চিন্তা প্রতিহত হয়েছে।

কীর্তনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা তাই অকৃত্রিম। তিনি লিখেছেন: কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকারের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে. সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়। কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সংগীতের পুনরাবৃত্তি চান নি, চেয়েছেন তাকে আত্মসাৎ করে তারই প্রেরণায় নতুন সৃষ্টির বৈচিত্র্য। এক্ষেত্রেও কীর্তন তাঁর কাছে প্রেরণাস্বরূপ। তিনি লক্ষ্য করেছেন. কখনো কখনো কীর্তনেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যোগাযোগ ঘটেছে, কিন্তু সেই প্রভাব শুধুমাত্র দৈহিক, আত্মিক নয়। তিনি

লিখেছেন: কখনো কখনো কীর্ত্তনে ভৈঁরবী প্রভৃতি সুরের আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে, রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক।

কীর্ত্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার সামগ্রিকতা। তাঁর মতে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আছে এক একটি রত্নের কৌটো। ওস্তাদ জহুরী ঘটা করে প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে তার ঢাকা খোলে। আলোর ছটায় ছটায় তান লাগিয়ে দিকে দিকে তাকে ঘুরিয়ে দেখায়। সমঝদার তার জাত মিলিয়ে দেখে, তার দান যাচাই করে। বলে দিতে পারে, এটা হীরে না নীলা, চুনি না পান্না। কীর্ত্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যেজন রসিক, প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না—দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার বিষয়।

কীর্ত্তনের সার্বজনীনতাও কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো কীর্ত্তন সমজদারের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে কোনোদিনই বন্দীদশা যাপন করে নি। রবীন্দ্রনাথ তাই দিলীপকুমার রায়কে বলেছেন: বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রেসীর যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্ত্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।

কিন্তু, কীর্ত্তনের যে দিকটা তাঁকে সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট করেছে, তা হল কীর্ত্তনের মধ্যেকার কথা ও সুরের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ। তাঁর মতে, বাণীর প্রাণ ত বাঙালীর অন্তরের টান। সেইজন্যই ভারতের এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশী হয়েছে। কিন্তু বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের সম্পূর্ণতা হয় না, এইজন্যই বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পঙক্তি না, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কীর্ত্তনে। তিনি বলেছেন, কীর্ত্তন অপরূপ সঙ্গীত, যুগল ভাবে-গড়া পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা, পদাবলীর সঙ্গেই তার রাসলীলা, স্বাতন্ত্র্য সে সইতে পারে না। কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয়েই কীর্ত্তনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর গান বইতে পারে শুধু এই ধারাকে অবলম্বন করেই।

দিলীপকুমার রায়কে তিনি বলেছেন : বাংলার সঙ্গীতের বিশেষত্ব যে কী, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্ত্তনে পাওয়া যায়। কীর্ত্তনে আমরা যে আনন্দ পাই, সে তো অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।

বাংলার গান যে যৌগিক সৃষ্টি-কথা আর সুরের সার্থক সমন্বয় এ কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে তিনি একথাও বলেছেন : বাঙালীর কীর্ত্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে প্রিমিটিভ্ এবং ফোক্ মুিজক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।…বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত এই আদর্শেরই অনুসারী।

২.

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাবই বেশী। কিন্তু আগেই বলেছি, এটা সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতিপর্ব। এই সময় মাত্র একটা গানে তিনি কীর্ত্তনের সুর প্রয়োগ করেছেন—সেটা হল ভানুসিংহের পদাবলীর 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' গানটি। কীর্ত্তনের প্রতি তাঁর প্রীতি পরবর্তীকালে বেড়েছে বটে, কিন্তু তাঁর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কীর্ত্তনাঙ্গ গানের সংখ্যা ছিল মাত্র বারো-তেরোটি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি স্বদেশীগান রচনা করেছেন কীর্ত্তনের সুরে। পরবর্তীকালে তিনি কীর্ত্তনের সুরকে প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন গানে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানগুলিতে একদিকে যেমন প্রাচীন কীর্ত্তনরীতি রক্ষা করেছেন, তেমনি আবার নিজস্বতাও দেখিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই। এদিক থেকে বিচার করলে, তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়—আখরযুক্ত ও আখরহীন।

প্রচলিত কীর্ত্তনগানে গায়করা মূলগানের সঙ্গে অতিরিক্ত কথা জুড়ে দিয়ে সুরবিস্তার করে থাকেন। একেই বলে আখর। রবীন্দ্রনাথ আখরকে বলেছেন

'কথার তান'। কিছু কিছু কীর্ত্তনাঙ্গ গানে রবীন্দ্রনাথ আখর যুক্ত করেছেন যাতে সুরবিহার করা চলে অথচ গায়ক স্বাধীনভাবে সুরবিস্তার করতে পারেন না। এগুলি হল :

১. ওহে জীবনবল্লভ। ২. আমি জেনেশুনে তবু ভুলে আছি। ৩. আমি সংসারে মন দিয়েছিনু। ৪. কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে। ৫. তুমি কাছে নাই বলে। ৬. নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে। ৭. মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।

আখরহীন কীর্ত্তনাঙ্গ গানই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন বেশী। তার মধ্যে অনেক গানেই কীর্ত্তনের সুর স্পষ্ট। কোথাও কোথাও আবার কীর্ত্তনের সুরের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে। এর মধ্যে পূজা, প্রেম এবং প্রকৃতি—এই তিন পর্যায়েরই গান রয়েছে। যেমন :

পূজা : আমি যখন ছিলেম অন্ধ। এই তো তোমার প্রেম ওগো।· ওই আসনতলে মাটির 'পরে। তোমার সুরের ধারা। লহ লহ তুলে লহ।

প্রেম : আজি এ নিরালা কুঞ্জে। আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে। এসো আমার ঘরে এসো। দে পড়ে দে আমায় তোরা। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। পুরানো জানিয়া চেয়ো না। ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে। ফিরে ফিরে ডাক্ দেখিরে। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী। লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা। হৃদয়ের একূল-ওকূল।

প্রকৃতি : আমার মল্লিকাবনে। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে। আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে। ফাল্গুনের শুরু হতেই।

বলা বাহুল্য, এটা সম্পূর্ণ তালিকা নয়। অপেক্ষাকৃত প্রচলিত গানগুলিকেই উদাহরণস্বরূপ বেছে নেওয়া হয়েছে।

জমিদারীর কাজে রবীন্দ্রনাথ কুস্টিয়ায় যাবার পরই তাঁর সঙ্গে বাংলার দেশী সুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটল। এরপরেই তাঁর গানে লাগ্‌ল বাউল-কীর্ত্তনের ছোঁয়া। কিন্তু এই সময়কার কীর্ত্তনাঙ্গ গানের বিষয়বস্তু ছিল পূজা আর প্রেম, সুরেও ছিল অবিমিশ্র কীর্ত্তনের আনন্দ-যন্ত্রণা। কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পরেই তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানে প্রকৃতিরও প্রবেশাধিকার ঘটেছে। বিষয়বস্তুর ঘটেছে বিপুল বিস্তার। এই সময়েই রচিত হয়েছে—'আমার

মল্লিকাবনে', 'তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক,' 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে,' 'আমি তখন ছিলেম মগন', প্রভৃতি গানগুলি।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানে বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনাবিলাসে। তাঁর অনেক গানেই তিনি বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে একাত্মতার আভাস দিয়েছেন যদিও বিষয়বস্তু ঠিক রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক নয়। 'আর নাই রে বেলা,' 'সখী ওই বুঝি বাঁশী বাজে,' 'এখনো তারে চোখে দেখি নি' প্রভৃতি গানগুলি অতি অনায়াসেই বৈষ্ণব পদাবলীর সেই অপার্থিব জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ত করে তোলে। তবু এটা সত্যি যে, শান্তিনিকেতন পর্বেই কীর্ত্তনাঙ্গ গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছে। বিষয়বস্তুতে, সুরে, ছন্দে কীর্ত্তনাঙ্গ গানের পরিপূর্ণ ব্যাপ্তি ঘটেছে এই সময়ে।

কীর্ত্তনের মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরসের সন্ধান পেয়েছিলেন, এটা তারই স্বীকারোক্তি। হয়তো সেইজন্যই তাঁর কোনো কোনো নাটকে তিনি কীর্ত্তনাঙ্গ সুর প্রয়োগ করেছেন। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে 'সখী বহে গেল বেলা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে 'রোদনভরা এ বসন্ত' গান দুটির প্রাসঙ্গিকতা এবং গীতিমূল্য নিশ্চিন্তভাবেই অসাধারণ।

৩.

প্রচলিত কীর্ত্তনগানের একমাত্র বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কীর্ত্তনসুরের বহুল প্রয়োগ করে এর সীমা বিস্তৃত করে দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়েই তিনি কীর্ত্তনাঙ্গ গান রচনা করেছেন। প্রেম, পূজা এবং প্রকৃতি ছাড়াও তিনি দেশাত্মবোধক ('একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্'), এবং উপাসনা-সঙ্গীত ('প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত') প্রভৃতি রচনা করেছেন কীর্ত্তনের সুরে।

অন্যান্য ধরণের গানে যেমন, কীর্ত্তনাঙ্গ গানেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌলিকত্বকে স্বীয় প্রতিভায় বজায় রেখেছেন। কীর্ত্তনের করুণ-মধুর সুরকে তিনি প্রয়োগ করেছেন নিজস্ব পদ্ধতিতেই। তাই কোনো কোনো গানে যেমন কীর্ত্তনের সুর স্পষ্ট, কোথাও আবার কীর্ত্তনের সুর এমন ভাবে মিশে আছে যে, এক নতুন ধরণের সঙ্গীতের উদ্ভব ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো রাগাশ্রয়ী গানের সঙ্গে কীর্ত্তনের সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। 'বকুলগন্ধে বন্যা এল' (আড়ানা, বাহার ও কীর্ত্তন), 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' (বাহার, পঞ্চম ও কীর্ত্তন)' 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও (হাম্বীর, কেদারা ও কীর্ত্তন), 'শীতের হাওয়ার লাগ্‌ল নাচন' (নট ও কীর্ত্তন) প্রভৃতি গান তাঁর বৈচিত্র্যপ্রিয়তার স্পষ্ট স্বাক্ষর। তেমনি, বাউলের সঙ্গে মাঝে মাঝে কীর্ত্তনের সুর মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই,' 'এই তো ভাল লেগেছিল,' 'তুমি কোন্ পথে যে এলে,' 'আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায়' 'স্বপনপারের ডাক শুনেছি' প্রভৃতি গানগুলি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সঙ্গীত-প্রতিভার স্বাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুতঃ, এই ধরণের গানগুলিই রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তনাঙ্গ গানের সত্যিকারের প্রতিনিধি। এছাড়া, বাউল কীর্ত্তনের সঙ্গে তিনি 'পূরবী' মিশিয়ে তৈরী করেছেন 'এ বেলা ডাক পড়েছে' গানটি। খাম্বাজের সঙ্গে কীর্ত্তনের সুর মিশিয়ে রচনা করেছেন কোথা বাইরে দূরে যায় রে, উড়ে' গানটি। পিলুর সঙ্গে কীর্ত্তনের মিলনে গড়ে উঠেছে 'তোমার আনন্দ ওই এলো দ্বারে' গানটির কাঠামো। কীর্ত্তনাঙ্গ বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত 'হৃদয়ক সাধ' গানটির যদিও ভৈঁরোর পর্দায়ই রচিত, সূক্ষ্ম এক ধরণের কীর্ত্তনের আমেজ কিন্তু এতে পাওয় যায়।

রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তনাঙ্গ গানেরও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ বেয়েই শান্তিনিকেতন পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তনাঙ্গ গান তার পরিণতিকে খুঁজে পেয়েছে। নতুন এক ধরণের গানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলা-গানের সম্পদ ভাণ্ডার। সেক্ষেত্রে কীর্তন প্রেরণামাত্র, নিছক অনুকৃতির বিষয় নয়।

তালের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ সহজ হতে চেয়েছেন। ছয় মাত্রা, আট মাত্রা এবং দশ মাত্রার সহজ ছন্দই তিনি ব্যবহার করেছেন এই ধরণের গানে। সাধারণ কীর্ত্তনের তাল-ফেরতাও রবীন্দ্রনাথ সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটা কীর্ত্তনাঙ্গ গানেই তাই একই ছন্দের ঠাসবুনন রয়েছে।

সঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত ছিলেন বলেই, তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানেও অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়েছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই। তিনি অনেক

সময় একই গানে শুদ্ধ ও কোমল ধৈরত এবং নিষাদের প্রয়োগ করেছেন। 'তবু মনে রেখো, 'আমার মল্লিকাবনে', 'তোমরা যা বল তাই বল' প্রভৃতি গানেই এর প্রমাণ রয়েছে। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গান 'তবু মনে রেখো' কীর্তনের সুরেই রচিত। অথচ, সুরবিস্তারের পর 'স্থায়ী'তে এসে দাঁড়ানোর সময় কেমন যেন টপ্পার আভাস লাগে। আবার কীর্ত্তনাঙ্গ গানে আখর লাগানোটা রপ্ত হয়ে যাওয়ায় অন্য ধরণের কোনো কোনো গানেও তিনি আখরযুক্ত করেছেন—যেমন, 'তোমরা আনন্দ ওই এল দ্বারে,' 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ' প্রভৃতি গান।

রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা সত্যিই বিস্ময়কর। নিত্যনূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তিনি যেন সারাজীবনই সংস্কার মুক্তির অভিসারে মগ্ন। তাঁর বেশীর ভাগ গানই হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের মতো চারটি তুকে বিভক্ত। অন্তরা ও আভোগে মোটামুটি একই সুর থাকে। তাঁর প্রথম যুগের কীর্ত্তনাঙ্গ গানেও এই সাধারণ নিয়মটি অনুসৃত। কিন্তু পরবর্তীকালে সুর সংযোজনায় আরো বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে', 'পুরোনো জানিয়া চেয়ো না', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', প্রভৃতি কীর্ত্তনাঙ্গ গানের প্রত্যেক কলিতেই সুরের বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। 'আমার মল্লিকা বনে' গানটির অন্তরা এবং আভোগের সুর বিশ্লেষণ করলেও আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে।

৪.

বাণী ও সুরের সার্থক সমন্বয়ে কাব্যসঙ্গীত রচনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের সাধনা। বাংলা গানের ধারার মধ্যেই তিনি এর প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কীর্ত্তনের মধ্যেই তিনি তাঁর আদর্শকে যেন প্রমূর্ত্ত হতে দেখেছিলেন। প্রথম যুগে কীর্ত্তনের সুরকে তিনি গান রচনায় ব্যবহার করলেও, এর ব্যপকতর প্রয়োগ ঘটে তার সাঙ্গীতিক জীবনের পরিণত অধ্যায়ে। কীর্ত্তনের সুর ও গীতিরীতিকে তিনি বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেছেন তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিশালায়।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের কূটকৌশলে আগ্রহী হন। তাঁর সাধনা সহজের সাধনা। তিনি আবেগপ্রবণ বাঙালীর হৃদয়-যন্ত্রণারই রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রচলিত ধারাতে সেক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত তার ছায়া ফেলেছে বটে, কিন্তু তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভা যতই পরিণতির দিকে এগিয়েছে, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ততই গেছে দূরে সরে। নিবিড় করে, তিনি গ্রহণ করেছেন বাঙালীর নিজস্ব গানের

ধারাগুলিকেই। কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, সারি প্রভৃতি গানই হয়ে উঠেছে তাঁর প্রধান অবলম্বন। অবিমিশ্র সঙ্গীত তাই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি।

কীর্ত্তনের প্রভাব তার গানে আরো আছে। কীর্ত্তনগানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা এবং প্রেম পর্য্যায়ের গানে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই ধারাটি রক্ষা করেছেন। পূর্বরাগ, মান, বিরহ, অভিসার প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রেম-পর্যায়ের গানের মতো রবীন্দ্রনাথও লৌকিক প্রেমের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও পর্যায় নিয়ে গান রচনা করেছেন।

কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, কীর্ত্তনাঙ্গ গান রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন আদ্যন্ত। প্রচলিত কীর্ত্তনকে তিনি অনুকরণ করেন নি। নিজস্ব সঙ্গীতরুচি অনুসারে কীর্ত্তনের প্রয়োগ করেছেন তাঁর গানে।

রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রসংগীত

একটি প্রতিবেদন

"পৃথিবীতে সব চেয়ে যেখানে আমার যথার্থ পরিচয় ও আমার রচনার আলোচনা কম সে হচ্ছে শান্তিনিকেতন।" এই কথাগুলি আক্ষেপ ভরে রবীন্দ্রনাথ কবি অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ১৯২৯ এ।

ভাবতে অবাক লাগে, যে-বাঙ্গালীর গর্ব রবীন্দ্রনাথ, যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের কর্মে জ্ঞানে ধ্যানে রূপান্তর ঘটিয়েছেন, যে-রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে যে কোন ভারতবাসী পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শ্রদ্ধা না হোক অভ্যর্থনা লাভ করেন (—রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতেই বলছেন, 'এই শান্তিনিকেতনের কোন লোক যখন য়ুরোপে যাবে তখন তাদেরি কাছ থেকে আদর পাবে যারা তাদের চেয়ে যথাযথ-ভাবে আমাকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালো করে জানে।"···—) সে-রবীন্দ্রনাথের কোন স্থায়ী আলোচনা তাঁরই স্থাপিত বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গনে বিশেষ অনুষ্ঠিত হয় না। এ যে কত বড় বেদনার তা কবির থেকে বহুদূর সময়ে বাস করে আমরাও অনুভব করতে পারি। বিশ্বভারতীতে দেশ বিদেশের পণ্ডিত আসেন, চারিদিকে বড় বড় বাড়ি উঠছে— নানা 'কমপ্লেক্স' তৈরী হচ্ছে, কত কত অধ্যাপক কত জটিল বিষয় পড়াচ্ছেন! আর যে মানুষটি এই কর্মযজ্ঞের অন্তরালে— তিনি অন্তরালেই রয়ে গেলেন। তাঁর অনুযোগ যে মুদ্রিত! খণ্ডন করবার কোন উপায় বিশ্বভারতীর নেই, নেই ভাবীকালের। যতদূর মনে পড়ছে কবির জন্মশতবার্ষিক বছরে বিরাট উৎসব হয়েছিল। আমরা তখন তরুণ কবি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম উৎসবে যোগ দিতে, সংগীত বিষয়েও আলোচনা হয়েছিল—কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই ক'দিনের আলোকসজ্জা —সে তো শুধু উৎসব। কবিকে নিয়ে তা তো কোন স্থায়ী আলোচনা নয়! [বেসরকারী ভাবে শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্তর কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে, ১৯৩:৫র পর থেকে, কি উল্লেখযোগ্য আলোচনা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হয়েছে। কিছু যে হয় নি তা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

১৯৪৬ সাল থেকে রবীন্দ্র-সপ্তাহ হিসেবে ৭ থেকে ১৪ অগস্ট ধরে আলোচনা-চক্র নিয়মিত শুরু হয়। অনেক অনেক নামী বক্তাও এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।] এই সঙ্গে অবশ্য একটি বড় কাজও করছেন বিশ্বভারতী "রবীন্দ্রবীক্ষা" প্রকাশ ক'রে। পঞ্চম সংকলন হাতে এলো শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের আনুকুল্যে, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি যুগ্ম-সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। পঞ্চম সংকলনটি 'যোগাযোগ'-এর নাট্যীকৃত রূপ,—১৯৩৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর শিশিরকুমার ভাদুড়ির প্রযোজনায় ও পরিচালনায় প্রথম অভিনয় হয় নবনাট্য-মন্দিরে। এর আগের চারটি সংকলনের মধ্যে ২ নম্বরে 'অরূপরতন' এর অসম্পূর্ণ রূপান্তর এবং ৪ নম্বরে 'তাসের দেশ' এর প্রাথমিক খসড়া রবীন্দ্রচর্চায় উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছে আকর্ষণীয়। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীকানাই সামন্তর মত গবেষকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশে বিশ্বভারতীর গবেষণা প্রকাশনের এই দিকটি উল্লেখের দাবী রাখে। তাছাড়া এখনো কর্মক্ষম রয়েছেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। কিন্তু ওই যে বলেছি, স্থায়ী কাজ অর্থাৎ যে কাজ দিয়ে ভারতে এবং বহির্ভারতে রবীন্দ্র-আলোচনা একটি গবেষণা-ধর্মী অথচ লোকপ্রিয় পর্যায়ে পৌছুতে পারে, তা কি নিয়মিতভাবে হয়েছে, যেমন শেকসপীয়ারকে নিয়ে হয়ে থাকে, (এখন ধারণা রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য ও গানই লিখেছেন—যে গান শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীরাই পরিবেশন করে থাকেন!) রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত কত যে-সংস্থা আছে বাংলাদেশে, বাংলার বাইরে, ভারতের বাইরে। এ বঙ্গে সরকারী প্রতিষ্ঠান 'রবীন্দ্র সদন'এর 'হল' ভাড়া দেওয়াই তো প্রধানতম কাজ। এক মাস ধরে গানবাজনা হয়। ভালো কথা। কিন্তু সে-গানের রূপ তো 'জলসা'! কিছু কিছু তরুণ শিল্পী আবিষ্কৃত হন, মন্দের ভালো। কিন্তু 'অ্যাকাডেমিক' চর্চা তো সেখানে হয় না। কবি বীরেন্দ্র চাটুজ্যে, অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শত আবেদন সত্ত্বেও রবীন্দ্র-গবেষণার জন্য একটি ছোটখাট গ্রন্থাগারও সেখানে এখন পর্যন্ত করা গেল না। অথচ প্রতি সপ্তাহে কমিটি বসছে। বাঘা বাঘা সদস্যরা টেবিল ফাটাচ্ছেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামকে নতুন করে সাজাচ্ছেন। কিছু গানের রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন। দশ বারো বছর পূর্বে এই গানের সংগ্রহ নিয়ে

আমি 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম—তাতে কিছু গুরুতর বিষয়ও ছিল। এই অমূল্য সম্পদ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে তো উদাসীন বলেই মনে হয়। যাই হোক এগুলি মূল্যবান কাজ। কিন্তু আরো অনেক করবার আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে বাংলা বিভাগ কিছুদিন আগে একটি আলোচনা-চক্র করেছিলেন। সেই গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীত নিয়ে এযাবৎ এখানে কিছুই হয় নি। না কোন আলোচনাচক্র। রবীন্দ্রসংগীতের পৃথক বিভাগ সবে শুরু হয়েছে। তাঁদের কাছে কি এই আশা অন্যায় হবে? না, গানের স্কুলের মত কিছু গান শিখিয়েই তাঁরা শুধু দায় শেষ করবেন। তাহলে গীতবিতান, বৈতানিক, দক্ষিণী, রবিতীর্থ, সুরঙ্গমা থাকতে রবীন্দ্রভারতীর বিশেষ দরকার ছিল কি? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, সামগ্রিকভাবে "আন্তরিক এবং তন্নিষ্ঠ" আলোচনা দেশবিদেশের পণ্ডিতদের নিয়ে—সে কাজ তো রবীন্দ্রভারতীও করেন নি! এখন পর্যন্ত রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে কোন মৌলিক গ্রন্থ তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যে পত্রিকা প্রকাশ করেন তা "বিশ্বভারতী" পত্রিকারই কনিষ্ঠ সংস্করণ! একটু নতুন করে ভাবা যায় না কি (হ্যালহেড' সংখ্যার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ)? বিশ্বভারতী পত্রিকাও তো কোল্ড ষ্টোরেজে! এহ বাহ্য। আমার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রসংগীত। সকলেই জানেন, শেষ জীবনে কবিগুরুর সবচেয়ে প্রিয় এবং গোপন দুর্বলতম স্থান ছিল তাঁর গান। তাঁর ধারণা জন্মেছিল, আর সব সৃষ্টি যদি মুছেও যায়, গান চিরকাল থেকে যাবে। কিন্তু উনি কি শুনতে পাচ্ছেন, কী গান এখন গাওয়া হচ্ছে!

কিছুদিন আকাশবাণী 'অডিশন বোর্ডের' সঙ্গে যুক্ত থাকায় এবং বারো চোদ্দ বছর একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় কিছু কিছু লেখবার সুযোগে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের গান শোনবার বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। সেটা বেশীর ভাগ সময়ে সৌভাগ্য না হয়ে দুর্ভাগ্যেই পর্যবসিত হয়েছে। আকাশবাণীতে প্রায় দু'শত শিল্পীর গান শুনে আমি বোধহয় মাত্র দুজনকে পাশ করাতে পেরেছি। শেষ পর্যন্ত 'অডিশন বোর্ড' ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি রবীন্দ্রসংগীতকে কর্তৃপক্ষ 'লাইট মিউজিকে'র নামাবলী চড়িয়ে রেখেছেন, সেকারণে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর রবীন্দ্রসংগীত শোনবার পর এবং দীর্ঘদিন গান শেখবার অভিজ্ঞতায় ঠিক

পনেরোজন শিল্পীর গান আমার আগ্রহ করে এখনও শুনতে ইচ্ছে করে। (কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর সংখ্যা কবিদের সংখ্যার থেকে কম নয়। আমার কাছে দুদলেরই মোটামুটি স্ট্যাটিস্টিকস্ আছে। কম করে তাঁরা পাঁচশত হবেন।) এঁরা হলেন সর্বশ্রী সুবিনয় রায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, তড়িৎ চৌধুরী, কমলা বসু, নীলিমা সেন, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মায়া সেন, গীতা ঘটক, প্রসাদ সেন, ঋতু গুহ, বনানী ঘোষ, পুরবী মুখোপাধ্যায়, বুলবুল সেনগুপ্ত, এবং রনো গুহঠাকুরতা। রবীন্দ্রনাথের জীবন-আদর্শ, রুচিবোধ ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তাঁর যে ছবিটি আমার মনে ভাসে তার সঙ্গে মিলিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চাই। এই ক'জন শিল্পী সেই আভাস মাঝেমধ্যে দিয়ে থাকেন। দু'চারজন হয়তো আরো আছেন। এ মুহূর্তে মনে আসেছে না। এর বাইরে যাঁরা রইলেন, তাঁদের গান কানে এলে শুনি, আগ্রহ করে শুনি নে। শতকরা ৯৫ ভাগ্য অশ্রাব্য।

এই তালিকায় আমি বাদ নিয়েছি তাঁদের যারা সত্তর-উর্ধ্ব—যেমন শৈলজারঞ্জন (মূলত শিক্ষক, কিন্তু একদা শান্তিনিকেতনে গাইতেন), সাহানা দেবী, অমিয়া ঠাকুর, মালতী ঘোষাল, শান্তিদেব ঘোষ, ইন্দুলেখা ঘোষ প্রভৃতিদের। বাদ দিয়েছি জর্জদা (দেবব্রত বিশ্বাস) এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে, যাঁরা প্রকৃত অর্থেই শিল্পী—কিন্তু বিগত দশ বছরে এঁদের গান-এর স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট হয়েছে। আর যাঁরা গান ছেড়ে দিয়েছিলেন যেমন বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রায় দশ পনেরো বছর পূর্বেই গান গাইতেন, একবার কি দুবার লোকের মাঝে গেয়েছেন বছর আট আগে) অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, গীতা রক্ষিত, চিত্রা মজুমদার, বেলা ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

আর নাম করি নি তাঁদের যাঁরা নবীন। যাঁদের ওপর আমাদের ভরসা করতে হবে। বলতে দ্বিধা নেই, কুড়ি থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে বহু নবীনা আছেন যাঁরা সুরে, ছন্দে, গায়কীতে, রবীন্দ্রভাবনার আত্মীকরণে অনেক 'তথাকথিত জনপ্রিয়' শিল্পীদের লজ্জা দেবেন। এঁদের বিষয়ে এখনই বলা উচিত হবে না। লক্ষ্য করা যাক—ধীরে ধীরে এঁরা কতটা 'আত্মস্থ শিল্পী'তে পরিণত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে সমুচিত মর্যাদা দান করতে পারেন। মুস্কিল এই, এঁদের বেশীর ভাগ এরই মধ্যে খবরের কাগজের সমালোচকদের খাতির করতে শুরু করেছেন! যদিচ এঁরাই আমাদের শেষ আশা।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় এই তালিকা থেকে যে, সারা বছর জলসায় যে সব 'তথাকথিত জনপ্রিয়' শিল্পীরা গান করে থাকেন তাঁদের প্রায় কারুর নামই আমি করি নি। আমার ভালো লাগে না তাঁদের পরিবেশনের কায়দা, ভালো লাগে না তাঁদের 'অ-রাবীন্দ্রিক চাল-চলন' (অর্থাৎ শুদ্ধতা এবং রুচি মিলিয়ে একপ্রকার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের অভাব)। তাঁদের কারো গলা বেসুরো জোরে জোরে হারমনিয়মের শব্দে যা ঢাকতে হয়, গলায় স্থির (অচলপ্রতিষ্ঠ) সুর নেই, এমন ট্রেমেলো, যেন পপ্ সংগীত মনে করিয়ে দেয়, কণ্ঠ অমার্জিত, কখনো ভাবে-গদগদ, কখনো অসহ্য ন্যাকামি, অথবা অতিরিক্ত মেকানিক্যাল, কেউ বা আড়ষ্ট. 'স্টিফ্'। উচ্চারণ-দুষ্টতা (একজন 'তথাকথিত জনপ্রিয়' শিল্পী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিন সকালে গান শুনিয়েছেন, 'আব্বার যদি ইচ্ছা কর আব্বার আসি ফিরে',) কারু কণ্ঠের ধ্বনি নাসিকা-নির্ভর, কারু শব্দ ভুল, বাক্যবন্ধ ভুল, কেউ স্থায়ী অংশ গাইবার পর অন্তরা গাইবেন দুবার, আসর জমাবার জন্য তিনবার, কেউ এমন টপ্পা ব্যবহার করবেন, যা কালীপদ পাঠককেও হার মানাবে! কোন কোন শিল্পীর সাথে একই সঙ্গে ৮টি যন্ত্র বাজে, সেতার, বহালা, এস্রাজ, বাঁশী, জলতরঙ্গ, গীটার এবং দু'জোড়া তবলা-বায়া। পাখোয়াজও রেখেছেন তাঁরা, যদিচ স্বচক্ষে দেখেছি. ধামার গাইবার সময় চোদ্দটি মাত্রা কর গুণছেন। পাঠক. বলতে পারেন. কেন এই সব শিল্পীদের বেসুরো গান আমরা শুনবো দিনের পর দিন--কেন এঁদের নাম শোনামাত্র 'রেডিও' বন্ধ করব না অথবা দূরদর্শনের সুইচ অফ্ করব না? পাঠক বলতে পারেন, অরুণ ভট্টাচার্যের কথায় কী আসে যায়। কিন্তু আমি জনে জনে কথা বলে দেখেছি। এই আক্ষেপ আমার একলার নয়, বহু বিদগ্ধ রবীন্দ্রসংগীত-শ্রোতার। বড় বড় কাগজগুলিও নানা কারণেই এসব কথা বলবেন না, আমি নিশ্চিত জানি। সাধারণ মানুষের বলবার জায়গা নেই. হয়তো লেখার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে থাকলেও হয়তো কারু মনে আঘাত দিতে চান না। আমিও চাই না, কিন্তু এগুলি নীরবে সহ্য করে গেলে যাঁর গান গেয়ে তথাকথিত জনপ্রিয় শিল্পীরা বাড়ি গাড়ি করছেন, সেই ঋষিপ্রতিম মানুষটির মনে যে এখনও আঘাত পৌঁছোচ্ছে, তা আমি বিশ্বাস করি।

এবারে আসল কথায় আসা যাক্। এই যে অবস্থা এর জন্য বিশেষ কোন

সংস্থাকে দায়ী করা যায় না। তবু, যদি দায়ী করতে হয়, করব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং শিক্ষকদের। তাঁরা আদর্শচ্যুত হয়েছেন। অথবা রবীন্দ্র-আদর্শ বিষয়ে কোন পরোয়া করেন না, অথবা জানেন না রবীন্দ্র-আদর্শ ব্যাপারটা কি! 'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্র-বিষয়ে সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান। লাঠি-ঘোরানো বিশ্বভারতীর কাজ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করবার সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব বিশ্বভারতীর। কেন 'মিউজিক বোর্ডে'র মাননীয় সদস্যগণ উদার হস্তে গান পাশ করেন;—তাঁরা কেন জনপ্রিয়তার মোহে পড়ে কঠোর হতে পারেন না! যে তিনজনের নাম শুনেছি সদস্য হিসেবে, তাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পী। আমারও শ্রদ্ধেয়। তাঁদের কাকে ভয়? শিল্পীদের ভয়! রেকর্ড কোম্পানীকে ভয়! না ভূতের ভয়? কেন তাঁরা রাম শ্যাম যদু মধুর রেকর্ড দিনের পর দিন পাশ করেন? শুধুমাত্র স্বরলিপি ঠিক করে গাইলেই পাশ করাতে হবে? (কোন কোন ক্ষেত্রে তাও হয় না এমন মৌখিক অনুযোগ করেছেন শৈলজারঞ্জন—তাঁরই স্বরলিপি-করা কয়েকটি গানের ক্ষেত্রে) 'কোয়ালিটি' বলে কি কোন বস্তু নেই, রুচিবান শ্রোতাদের কথা কি তাঁদের মনে আসে না একবারও? তাঁরা কি শুধুই সরকারী বিচারক, শ্রোতা নন? তাঁদের কানে কি গলা-কাঁপানো সুর ধরা পড়ে না? হরেক রকম বাজনা কি তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় না?

এবার ফিরে আসি প্রথম কথায়। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আলোচনা-সভা ডাকুন বিশ্বভারতী। সারা দেশের গুণীজন আসুন। শিল্পীদের গানের উৎকর্ষ বিচার করুন। একবার নয়, মাঝেমধ্যেই রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষত, সংগীততত্ত্ব এবং সংগীত-ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গবেষণামূলক কেন্দ্র গড়ে তুলুন বিশ্বভারতী। প্রাণ সঞ্চার করুন। যেভাবে রবীন্দ্রসংগীত অতিদ্রুত 'আধুনিক' সংগীতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাকে রোধ করুন। সংবাদপত্রেরও একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রাম শ্যাম যদু মধুকে দিয়ে গানের সমালোচনা না করিয়ে এমন লেখক খুঁজুন যাঁরা দীর্ঘদিন সদ্‌গুরুর কাছে নিষ্ঠাভরে গান শিখেছেন, 'কাব্য' না করে সহজ গদ্যে সমালোচনা করতে পারেন। তাঁরাও আসুন রবীন্দ্র-আলোচনায়। তাঁদের বক্তব্য রাখুন। শেষ কথা, বিশ্বভারতী আবার আমাদের রবীন্দ্র-আলোচনার পীঠস্থান হোক। আমি জানি, শৈলজারঞ্জনের

কাছে এখনো গানের ভাণ্ডার শূন্য হয় নি। সম্প্রতি, 'আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি' (আখর যুক্ত) রবীন্দ্রসংগীতটি সুরঙ্গমা পত্রিকা রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক সম্মেলন বিশেষ সংখ্যায় (১৯৮০) প্রকাশিত হয়েছে। বাকি গানগুলি যা যা আছে শৈলজারঞ্জনের কাছ থেকে নিয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশ করুন। শৈলজারঞ্জনের অনেক বয়স হয়েছে, এটা মনে রাখা দরকার।

২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি-প্রাঙ্গণে যে অনুষ্ঠান হয়, তা ক্রমশ 'জলসা'য় পরিণত হচ্ছে। কবিগুরুর সামান্য ইচ্ছাটা কি অন্তত একদিনের জন্যও পালন করা যায় না? নিবেদন এই:

১. শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী নীলিমা সেন এবং শ্রীমতী মায়া সেনের মত অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিল্পী দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাতেও কর্তৃপক্ষ তাঁদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শিল্পী নির্বাচন করেন কি?

২. বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয় নিজে ২৫শে বৈশাখ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি-সভাগুলিতে আসেন না কেন?

৩. 'রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি'তে একজনও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ নেই—যতদূর জানি। অথচ তারাই পুরো ব্যাপারটি 'ম্যানেজ' করেন। বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ তা নীরবে সহ্য করেন কেন?

৪. রবীন্দ্রসংগীত বিভাগে চারটি তানপুরা কেনা হয়েছে। গতবছর একটি তানপুরাও দেখি নি কেন? সম্মেলক গানে হারমনিয়ম থাকলে হয়তো সুবিধে হতে পারে, কিন্তু একক সংগীতে তানপুরা থাকবে না কেন? এস্রাজ ক্রমশ বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে কেন? রবীন্দ্রনাথের গানের আসর ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গনেই একটি 'আধুনিক গানের আসর'এর রূপ নিচ্ছে কেন? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর গানের পরিবেশন চেয়েছিলেন অন্তত তাঁর জন্মদিনে তাঁরই বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাঁর সে সামান্যতম ইচ্ছাটা পূরণ হবে না কেন?

৫. বছরের পর বছর কবিতা পাঠ করেন কারা? কবিগুরুর আসরে তাঁরা কি কোন কবি? তাঁরা হয়ত জনপ্রিয় আবৃত্তিকার, আমাদের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু কবির জন্মোৎসবে কবিরা উপস্থিত থাকলে ব্যাপারটা শোভন হয় না কি? কেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীর লক্ষ্য থাকবে কয়েকজন 'তথাকথিত জনপ্রিয়'

আবৃত্তিকারদের ওপর? সর্বশ্রী বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ প্রভৃতি কবিরা এক এক বার করে কেন কবিগুরুর জন্মোৎসবে কবিতা পড়বেন না? জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, মনীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিরা যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর জন্মদিনে জোড়াসাঁকোয় পড়তেন তবে ব্যাপারটা কি খুব নিন্দনীয় হোত?

২৫শে বৈশাখের ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গণে প্রভাতী অনুষ্ঠানটিকে 'জলসা'র পরিবর্তে একটি মার্জিত রুচি-শুভ্র পুণ্য উৎসবে পরিণত করুন।

বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়ের কাছে এই সব প্রশ্ন ও নিবেদন রইল। রবীন্দ্রভারতীর শ্রদ্ধেয় উপাচার্যও নিশ্চয়ই এসব ভাবছেন।

অরুণ ভট্টাচার্য

শুদ্ধ চৈতন্যের কবি রামপ্রসাদ সেন

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

১.

হিউয়েন সিয়াঙের সময় থেকে আরম্ভ করে যে সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের ধারা বঙ্গভূমিতে প্রবাহমান, বৌদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবের মধ্য দিয়ে নানা ভাঙা-গড়ার যে প্রবাহ সর্বদা বাঙালী মননে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি করে এসেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা শেষবারের মত মোর ফিরেছে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবে। সেই অভিনব ধারারই সৃষ্টিধর্মী গতিশীলতার প্রকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই নবচেতনার প্রথম রূপকার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। জীর্ণমত পুরাতন ধারা লুপ্ত হ'য়ে কিভাবে নতুন ধারাস্নান ঘটলো রামপ্রসাদ জীবনী-আবিষ্কার প্রধানতঃ এই ইতিহাস।

সঙ্গীতরচয়িতা ও সাধকরূপেই রামপ্রসাদ সাধারণ জনসমক্ষে পরিচিত। তিনি যে 'কালীকীর্তনে'র রচয়িতা ছিলেন, তার খবর অনেকে রাখেন না। আবার তিনি যে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন, এ সংবাদটি অনেকের কাছে যেমন অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর। এই বিস্ময়ের সূত্র ধরেই সম্ভবতঃ 'পদাবলী'র রামপ্রসাদ ও 'বিদ্যাসুন্দরে'র রামপ্রসাদকে বিভিন্ন জন ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উভয় রামপ্রসাদই এক এবং 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থেই রামপ্রসাদ-জীবনীর অধিকাংশ উপকরণ রয়েছে। রামপ্রসাদের পদে তাঁর আধ্যাত্মিক মননের ক্রমোন্নতির ছাপ সুস্পষ্ট, পদে অধ্যাত্ম সচেতনতা যতই পরিস্ফুট হ'য়েছে, পার্থিব সুখ সুবিধার উল্লেখ পদ থেকে ততই অপসৃত হয়েছে। মায়ের অলৌকিকরূপের নানা পরিকল্পনায় কবি তখন বিভোর; এরপর আর এক জাতীয় অতৃপ্তি ও গ্লানির প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ করে, কবির কণ্ঠে মাকে না পাওয়ার জন্য বেদনা সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত, সাধক রামপ্রসাদ এই অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে সাধনার অনেক উচ্চ সোপানে অসীম। কিন্তু সিদ্ধি তখনও হয় নি, তখন পর্যন্ত প্রাপ্তির জন্য

আকুলতা, অপ্রাপ্তির জন্য ক্রন্দন, সাধক ও কবির মেশামেশি রূপ তখন। একেবারে শেষ স্তরের পদ সাধকরূপেই সুস্পষ্ট, এখানে শুধু মায়ের জয়গান, মায়ের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা। মায়ের রূপ উদার সমন্বয়বাদী ; কিভাবে সার্থক রূপে সহজে মাকে পাওয়া যায়, তারই নির্দেশ পাওয়া যায় পদগুলিতে। এই পদগুলি পড়ে অনেকে নির্দ্বিধায় রামপ্রসাদকে একেশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, পৌত্তলিকতা-বিরোধী প্রভৃতি বলে ফেলেছেন। এ প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্যের 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের "বাহ্য পূজা" উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদের পদে 'তারা আমার নিরাকারা যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার' 'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি' জাতীয় কথাগুলি পূর্বোক্ত মন্তব্যের কারণ।

সাধক শিবচন্দ্র এই মন্তব্যকারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'তিনি সাকার ব্রহ্ম মানিতেন কিনা, সাকার উপাসনা করিতেন কিনা, মৃত্যুর পূর্ব রাত্রিতেও পূজা করিয়া মৃত্যুকালে মায়ের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া সিদ্ধ সাধক মাহাত্মা তাহার জলন্ত প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবনে ত গানে গানে প্রাণে-প্রাণে মূর্তিমতী মায়ের নৃত্য! ইহার পরেও রামপ্রসাদের সাকার উপাসনা ছিল না—ইহা যিনি বলিতে পারেন রামপ্রসাদের আত্মা ছিল না, এ কথাও তাঁহার মুখেই শোভা পায়! 'মন! তোমার এই ভ্রম গেল না!' পদে মৃন্ময়ী মূর্তিনির্মাণের অসারতার কথা আছে। এই পদটি সম্বন্ধে সাধক শিবচন্দ্রের অভিমত হল —'উল্লিখিত গানটি যে রামপ্রসাদের অতি অপক্কাবস্থার আমরা ক্রমে তার পরিচয় দিতেছি। এখন প্রথমতঃ এটুকু বুঝিবার কথা যে, যে সময়ে রামপ্রসাদের এই গান সেই সময়ে তিনি জ্ঞান রাজ্যের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যস্তরে অবতীর্ণ, শেষস্তরে অপ্রবিষ্ট এবং সাধনা রাজ্যে নব প্রবিষ্ট মাত্র, তাই ভক্তিতত্ত্ব নিরপেক্ষ কেবল জ্ঞানের সহিত সাধনাকে সম্মিলিত করিতে গিয়াই উপক্রম উপসংহার স্থির রাখিতে পারেন নাই।'

২.

শ্রীরামপুরে মিশনারি সাহেব W. Ward-এর 'A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos' গ্রন্থখানি অষ্টাদশ ও গোড়াকার উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, ইতিহাস ও ধর্মের একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথম খণ্ডের ৫৭৯ পৃষ্ঠায় কালিকামঙ্গল রচয়িতা 'শূদ্র' কৃষ্ণরাম

এবং 'ব্রাহ্মণ' কবিবল্লভ, অন্নদামঙ্গলরচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়, পঞ্চানন গীতরচয়িতা অযোধ্যারাম, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী-রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদের উল্লেখ আছে। দেশীয় কবি শুধু এই ক'জন। কবি বা সাধকরূপে রামপ্রসাদের উল্লেখ এই সংস্করণের দুটি খণ্ডের কোথাও নাই। ১৮২২ এ লণ্ডন থেকে এই গ্রন্থের যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে রামপ্রসাদের উল্লেখ আছে 'কালিকামঙ্গল' রচয়িতা একজন শূদ্র বলে। রামপ্রসাদ জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু প্রথম সংস্করণে তাঁর উল্লেখ হল না কেন? Ward সাহেবের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে তাঁর অপরিচিতিটুকু বিস্ময় উদ্রেক করে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'রামপ্রসাদ' প্রবন্ধে রামপ্রসাদের প্রথম জীবনে জমিদারী সেরেস্তায় খাতা লেখা ও মাসিক তের টাকা বৃত্তিলাভ প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখেছেন—"এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতাস্থ নববঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরিগিরি কর্ম করিতেন। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী—ড. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, পৃঃ ৫০)

গোকুলচন্দ্র ঘোষালের বাড়ি রামপ্রসাদ খাতা লিখলে এবং তাঁর নিকট থেকে বৃত্তিলাভ করলে ঘটনাটি ঘোষাল পরিবারে সাধকরূপে রামপ্রসাদকে সুবিদিত করে রেখেছিল। তখনকার দিনের ধনী দরিদ্র সকলের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলা চলে, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পক্ষে ভাইয়ের আশ্রিত সাধক-কবিটিকে এড়িয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। রামপ্রসাদের সাধক বা কবিখ্যাতি হয়তো তেমন প্রসারিত বা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তিনি যে কোনদিন গোকুলচন্দ্র ঘোষালের বাড়ি খাতা লেখেন নি নিশ্চিতভাবে তা ধরে নেওয়া যায়।

লোকনাথ ঘোষের The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars &c (১৮৮১ খৃঃ) গ্রন্থটি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন সৃষ্ট রাজা জমিদারদের কুলজী গ্রন্থ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কৃষ্ণনগর রাজবংশের পরিচয় বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নানা কীর্তির বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর সভাস্থ পণ্ডিত ও কবিদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখক রামপ্রসাদের উল্লেখ করেছেন। "Ramprasad Sen

a Sanskrit Scholar" (২য় খণ্ড পৃঃ ৩৬০)—রামপ্রসাদের শুধু এই পরিচয়টুকু পাওয়া যায়। দয়ালচন্দ্র ঘোষের "প্রসাদ-প্রসঙ্গে"র প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর দয়ালচন্দ্র ঘোষকেই রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ গবেষক বলা হয়। প্রথম সংস্করণের ভূকিকায় বিজ্ঞাপনে লেখক লিখেছেন : "তিন বৎসরেরও অধিককালের পরিশ্রমের আজ পরিসমাপ্তি হইল।' অর্থাৎ লেখক ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম রামপ্রসাদ অনুসন্ধানরত হলেও তাঁর সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাচ্ছিলেন না। শেষে এক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকের কাছে তিনটি তথ্য পেলেন। ১. রামপ্রসাদ বৈদ্য ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক, ২. তিনি শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক, ৩. তাঁর বাড়ি কুমারহট্টে। এরপর রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হওয়ায় আরও তথ্য ও কিছু পদ পেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় "কালীকীর্তন" প্রকাশিত করেন। ১২৬০ বঙ্গাব্দের পৌষ অর্থাৎ ১৮৫৩তে "সংবাদপ্রভাকরে" রামপ্রসাদ-জীবনী প্রকাশিত হয়েছে এবং আগে ও পরের সংখ্যায় আরও পদ এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

অথচ ঢাকায় বসে দয়ালচন্দ্র ঘোষকে ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে এতখানি অন্ধকার হাতড়াতে হয়েছিল জেনে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রসারতার দৈন্য দেখে দুঃখিত হতে হয়। 'সংবাদপ্রভাকর' জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত পত্রিকা ছিল এবং ঢাকায় অবশ্যই শিক্ষিত সাধারণের কাছে তার প্রচার ছিল। অথচ দয়ালচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকায় রামপ্রসাদকে পৌছে দিতে পারেন নি। রামপ্রসাদই সম্ভবতঃ এমনি গমনভীরু প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাঁর সময়ে জীবনীকারেরা কি করে কুমারহট্ট কলকাতায় তাঁর অগাধ যোগাযোগের কথা বলেন বোঝা যায় না। দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম একবারও করেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সাধককবি রামপ্রসাদের প্রথম জীবনীকার। পরবর্তী সকল জীবনী তাঁর ওপর ভিত্তি করে রচিত। অনেক অনুসন্ধানে দু-একটি দলিল-টলিল কেউ বা পেয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জীবনীগ্রন্থ বিপুলকায় হয়েছে কল্পিত কাহিনীর ভারে।

১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দীননাথ

গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "যে ভূমি-খণ্ডের উপর রামপ্রসাদের বাসগৃহ ছিল, তাহা দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। বহুকাল তাহা জঙ্গলপূর্ণ ছিল। সম্প্রতি হালিসহর বাসিগণ এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া সেই পবিত্র স্থানটির প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। স্থানীয় পূর্ণিমা-ব্রত সামিতির সভ্যগণের যত্নে গত দশ বৎসর হইতে মহাত্মা রামপ্রসাদের স্মরণার্থে একটি মেলা হইতেছে। ইহা প্রসাদ মেলা নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর কালীপূজা হইয়া থাকে। হালিশহরের হিতৈষিণী সভা একটি 'প্রসাদ প্রাসাদ' নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।"

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ জীবনীর শেষের দিকে বলেছেন, "৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিত পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবেক না। প্রাচীন লোকেরা কহেন 'তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জনের সময় পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমাদের সঙ্গে আইস। আমি পদব্রজে চলিলাম"......এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দিনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রামপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুর সময় যথাক্রমে ১১২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭২০ খৃঃ এবং ১১৮৮ বঙ্গাব্দের ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার বা ১৬ অক্টোবর ১৭৮১ খৃঃ বলে নিরূপণ করেছেন।

রামপ্রসাদের জীবিকার্জনের স্থান ও মনিবব্যক্তিটি এখনও সমস্যা হ'য়ে আছে, তাঁর লেখা প্রথম পদ বলে উল্লিখিত পদটিও (দাও মা আমায় তবিলদারী) কি এই সমস্যার মধ্যে গিয়ে পড়ে না? স্থান ও পাত্র নির্দিষ্ট না হলে পদটির নির্দিষ্ট মর্যাদাই বা দেওয়া যায় কি করে? রামপ্রসাদ-জীবনী রচনা করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্তই এই সব সমস্যার সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সমাধান কিছুই দিয়ে যান নি। অবশ্য এই সমস্যা সৃষ্টি করেও তিনি চিরকালের জন্য রামপ্রসাদকে বাঁচিয়ে গেছেন। রামপ্রসাদ যে জীবিকার্জনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন তাঁর পদেই তার প্রমাণ রয়েছে,

কাজ হারালেম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গ-রসে॥

যখন তার ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ।।
এখন আমার ধন উপার্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে ।।

৩.

বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম বাংলাদেশে ঐতিহাসিক যুগে বিশেষ করে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, দুটি ধারার প্রাধান্য সব সময় লক্ষ্য করা গেছে। ১৪৮৬ খৃঃ নবদ্বীপে নরদেহে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বের ধর্মচিত্র বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে বিধৃত। আমরা পূর্বের একটি উল্লেখে দেখেছি শাক্ত প্রভাব তখন অত্যন্ত বেশী। বৈষ্ণব যে ছিলেন তারও প্রমাণ দেখেছি। অদ্বৈত আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরী সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানগত বৈষ্ণবধর্ম তখন এখানে ছিল না। ছিল চতুর্দিকে শাক্তের ছড়াছড়ি; বৃন্দাবনদাস লিখেছেন:

সকল সংসার মত্ত ব্যাবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নেই বাসে ।।
বাসুলী পূজায়ে কেহ নানা উপহারে
মত্ত মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলাদেশের একখানি প্রামাণিক তথ্য গ্রন্থ। নবদ্বীপ সর্বপ্রকারে তখন বাঙালী হিন্দু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা থেকে আমরা তৎকালীন বাঙালী হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্য-নির্ভর চিত্র পাই। এই চিত্রটি সংক্ষেপে হল সমাজের সর্বস্তরে শাক্তধর্মের প্রাধান্য এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাহীনতা। শ্রীচৈতন্য দেহরক্ষা করেন ১৫৩৩ খৃঃ-তে। তাঁর বৈষ্ণবীয় লীলাভূমি ছিল নীলাচল। সন্ন্যাসগ্রহণের পরই তিনি নীলাচলে চলে যান। ভক্তরা অবিরত সেখানে যাতায়াত করেন। এবং প্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে থাকার নির্দেশ দেন বাণী প্রচারের জন্য।

কিন্তু তত্ত্বগত শিক্ষা দিলেন যাঁদের তাঁরা তাঁর তিরোধানের পর রইলেন বৃন্দাবনে। সেখান থেকে যোড়শ শতাব্দীর শেষে শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ

বাহিত হয়ে বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি গৌড়ে এলো এবং খেতুরি উৎসবের পরে আনুমানিক ১৫৮২ খৃঃ তাই বাঙ্গালীর বৈষ্ণবরসের আচরণবিধিতে পরিণত হল। জাহ্নবীদেবী ও বীরভদ্রও বৃন্দাবন ঘুরে এসে বিধিমতে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠায় রত হলেন। শ্রীচৈতন্য-সময়কালে বৈষ্ণবধর্মের যে জোয়ার বাংলাদেশকে অধিকার করেছিল তাঁর তিরোধানের পর উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে তা স্তিমিত হয়ে আসে। শ্রীনিবাসাদির কার্য, এই অভাবকে দূর করে ধর্ম হিসেবে বৈষ্ণবতাকে শক্ত কাঠামোয় স্থাপন করে।

শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় মহাসত্তার কথা মনে রেখেও বলা চলে বাংলাদেশের প্রথম এবং সার্থক সমাজ সংস্কারকরূপে তাঁর নামোল্লেখ করা যায়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ রদ, সতীদাহ প্রথা দমন প্রভৃতি সামাজিক প্রতিটি আন্দোলনের প্রাথমিক যে কটি সামাজিক আন্দোলন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনকে আলোড়িত করেছে তার সবগুলিরই অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্যর ধর্মীয় নানা আচরণ ও উপদেশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

শাক্ত ধর্মের প্রবল প্রসার যেমন শ্রীচৈতন্য সময়ে বর্তমান ছিল, শ্রীচৈতন্য প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যে তার প্রসার কিছুমাত্র কমে নি ষোড়শ শতাব্দীর থেকে রচিত তন্ত্রগুলি তার প্রমাণ দেয়। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত রামানুজ প্রেমধর্ম তান্ত্রিকতার একটি সহজ ও ভদ্র সংস্করণে পরিণত হল তার তিরোধানের অল্প পরেই; কারণ তার পরেই বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এজাতীয় জাগরণের পরিচয় আছে। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবকে স্থানবিশেষে কমিয়ে দিলেও এবং এর প্রকাশকে কিছু পরিমাণে সাত্ত্বিকতামণ্ডিত করলেও শাক্তধর্ম আপন অস্তিত্বে শুধু বলীয়ান ছিল না, বৈষ্ণবধর্মকে ম্লান করারও আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছিল। তবে মধ্যযুগীয় বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে শাক্তধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের ব্যাপারটি কোন ক্রমেই ছোট করা যায় না।

একসময় বৌদ্ধধর্মের সারটুকু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধকে হিন্দুর অবতারে প্রমাণ করে ভারতে এক অপূর্ব ধর্মসমন্বয় ঘটায়। হিন্দুধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব এবং শেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গেই তার সমন্বয়প্রচেষ্টা অনুরূপ পরিচয়ই পাওয়া যায় বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রে। শাক্ত ধর্মের প্রবল

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যুগ প্রয়োজনেই বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব, অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত কবি রামপ্রসাদ গাইলেন

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে—
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে একথা বিষম ভারী॥

অন্যত্র : ও মন, তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত,
হরি-হর তোর এক হ'লো না।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল কথা মনে বোঝেনা
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে,
ক'রে আত্ম প্রতারণা।

শ্যামার উদ্দেশ্যে বললেন :

ব্রজেতে বালিকা হ'য়ে যশোদাকে মা বলিলি
আবার কৃষ্ণ হয়ে মাটি খেয়ে
মুখে ত্রিভুবন দেখালি॥

কবি বেদ, আগম, পুরাণগ্রন্থ অনুসন্ধান করে শ্যামার কি রূপের পরিচয় পেলেন !

কালি ব্রহ্মময়ি গো।
বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজতালাসি
মহাকালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী
ওমা রামরূপে ধর ধেনু, কালীরূপে করে অসি॥

রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার একটি কারণ যেমন মানব মনের সর্বাবস্থার রূপসাজের মধ্যে রয়েছে তেমনি আর কারণটি তাঁর ধর্মীয় উদারতা। তিনি চিরকালের জন্য সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিলেন। তিনি বাংলার চির-প্রসিদ্ধ ধর্মধারাগুলির মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছেন। "আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে" বলে ঘোষণার মধ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিদ্বেষের

অবসান ঘটিয়েছেন। তাঁর ধর্মদৃষ্টির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এই পদটির মধ্যে নিহিত—

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্তে পারে
মন অগ্রে শশী বশীভূত,
কর তোমার শক্তিসারে
প্রসাদ বলে আমি মাতৃভাবে তত্ত্ব করি যাঁরে
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বে। হাঁড়ি বুঝবে মন ঠারে ঠোরে॥

মাতৃভাবে সাধনা এই ভাবেরই সাধনা। প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরারাধনা উপলব্ধির বিষয়। তাই শাস্ত্র বা পূজার উপকরণ তাঁর কাছে তুচ্ছ তাই তিনি বলেন:

জাঁক জমক করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা,
জানবে না রে জগজনে।

সাধক কবি রামপ্রসাদের করুণাপূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সাধক বিষয়ক পদগুলির অন্তর্নিহিত ভাববস্তু। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলেও এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি।

রামপ্রসাদের কয়েকটি কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে:

১. (প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

মন রে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
(মন রে আমার)
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা বাজে আপ্ত হবে জান না
(মন রে আমার)
আছে একতারে মন এই বেলা, তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুবীজ রোপণ করে বীজ, ভক্তিবারি তায় সেচ না।

২. (প্রসাদী সুর তাল—একতালা)

মন তোমারে করি মানা

তুমি পরের আশা আর করো না ॥

তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে মর কার ভাবনা।

ওরে তোর ভাবনা কেউ ভাবে না, ভাব দেখে কি যায় না জানা।

সুখের ভাগ অনেকে হয়, দুঃখের ভাগী কেউ হবে না।

যখন শমন এসে ধরবে কেশে তখন কেবল ত্রিনয়না।

সুদিন দেখে অধীন জনে করবে কত উপাসনা।

সেদিন কুদিন হবে বলে প্রসাদ বলে,

সেদিন অধীন কেউ রয় না ॥

৩. (প্রসাদী সুর—তাল একতালা)

মরলেম্ ভূতের বেগার খেটে।

আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে ॥

নিজে হই সরকারী মুটে মিছে মরি বেগার খেটে

আমি দিন মজুরী—নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।

পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।

তারা কার কথা কেও শুনে না, দিন তো আমার কেটে

যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে।

আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা, কর্মদোষে যায় গো ছুটে ॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্মডুরি দেনা কেটে।

প্রাণ যাবার বেলা এই কর মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

৪. মা আমায় ঘুরাবে কত।

কলুর চোক ঢাকা বলদের মত ॥

ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত

তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত ॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত।
মা শব্দ মমতাযুত কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে মা চোখের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয়পদ ॥
কুপুত্র হয় অনেক গো মা কুমাতা নয় কখনও
প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার, করে রেখো পদানত ॥

মহাকালের মনোমোহিনী সদানন্দময়ী কালী ॥
তুমি আপনি নাচ আপন সুখে
আপনি দাও মা করতালি ॥
আদিরূপা সনাতনী প্রকৃতি পরমা কালী
মা গো! ব্রহ্মাণ্ড না ছিল যখন
মুণ্ড মালা কোথায় পালি ॥
ব্রজেতে বালিকা হয়ে যশোদাকে মা বলিলি।
আবার কৃষ্ণ হয় মাটি খেয়ে
মুখে ত্রিভুবন দেখালি।
মনের সাধে রামপ্রসাদে দেখে দিচ্ছে গালাগালি :
ওলো সর্বনাশী ধরে অসি
ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটা খালি।

(প্রসাদী সুর—একতালা)

৬. শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভব সংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে, মন ঘুড়ি, আশা বায়ু. বাঁধা পথে মায়া-দড়ি

কাক গণ্ডী-মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশ' হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে হেসে দেও মা হাত্ চাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়বে খেয়ে তাড়াতাড়ি।

৭. (রাগিণী যোগিয়া, তাল—একতালা)

(আমার) সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না।
যেথা আছে শুধু ভালোবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি।
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না
আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা ॥

৮. সাবাস্ মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি।
(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল সাজায়ে,
নিজে গুণময়ী—হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায় নি ত্রিপুরারি।
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি ? তুইও বুঝি পাগল হলি।

[কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের পাঠক এবং রসিকের কাছে অতি-পরিচিত। তবু নতুন করে সংযোজনের কারণ বলে আমি মনে করি দুটি বিষয়ে। প্রথমত, রামপ্রসাদের কবিতায় 'মন' নামক বিষয়টি যে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতীক তা বারবার পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আজকাল আমরা কবিতায় যে ধরণের শব্দ ব্যবহার করে থাকি, সহজ, আটপৌরে অথচ সাবলীল, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রামপ্রসাদ দু'শ বছরেরও পূর্বে কত অনায়াসে সেইসব শব্দ এবং ইডিয়ম্ ব্যবহার করেছেন।

সম্পাদক : উত্তরস্থরি]

বটকৃষ্ণ দাস

হে বৃক্ষ, হে বৃক্ষরাজি

যে কোনো মুহূর্তে সেই অলৌকিক পাখি আসতে পারে
আমি তাই সমস্ত বৃক্ষকে
সজাগ রেখেছি, যেন টু শব্দ না ক'রে
তারা সব স্থির থাকে। নিরুচ্চার প্রান্তরে এখন
ধীর পায়ে হেঁটে যায় হেমন্তের খনেদী রোদ্দুর।
শীতের মলিদা গায়ে দিয়ে
হে বৃক্ষ, হে বৃক্ষরাজি, হে আমার দুঃস্থ বনস্থলী
এবার সুস্থির হও; নিজের ছায়ায় চ'লে এসো।

আদিগন্ত রৌদ্রে ঢের দুলিয়েছো শাখা ও প্রশাখা—
বাচাল বাতাস খেলা করে গেছে পাতায় পাতায়;
এখন বিগত দিন। রৌদ্র নেই। ক্রমশ নীলিমা
নিটোল দ্রাক্ষার মতো অন্ধকারে গাঢ় হ'য়ে আসে।
হে বৃক্ষ, হে বৃক্ষরাজি, সময়ের মনিবন্ধে ঘড়ি
তীব্র রেডিয়মে জ্বলে। অতএব আমূল শরীর
এবার সংহত ক'রে প্রার্থনায় নতজানু হও:
দূরের মন্দিরে বাজে আরতির শেষ ঘণ্টাধ্বনি।

হে বৃক্ষ, হে বৃক্ষরাজি, এবার সমিধ হ'য়ে ওঠো।
যে কোনো মুহূর্তে সেই অলৌকিক পাখি আসতে পারে॥

বাড়ি ফেরা

[অবনীভূষণ রায়, বন্ধুবরেষু]

কিছু দুঃখ থাকে। কিছু রমণীয় দুঃখ চিরকাল
থেকে যায়। কে আর দুহাত ভ'রে অমল আকাশ
নিয়ে বাড়ি যেতে পারে? মাঝপথে বৃষ্টি আসে ঝেঁপে—
প্রিয় পরিচিত মুখ, মুখের জ্যোৎস্না মুছে যায়।
বৃষ্টি আসে। তমালের নীলাঞ্জন ছায়া গাঢ় হ'লে
যমুনায় বাঁশি বাজে। বৃষ্টি নামে বুকের ভিতর।

কিছু দুঃখ থাকে। কিছু রমণীয় দুঃখ চিরকাল
থেকে যায়। ভোরের শিশির, রোদ, রোদের ভিতর
মাঠের সবুজ খুশি, নিরিবিলি নদীর আহ্লাদ
সব শেষ হ'লে পর অতর্কিতে বৃষ্টি নেমে আসে।
কোথায় কদম ফোটে। হু-হু হাওয়া কেঁদে উঠে বুকে
শখের ফুলদানি, ছবি, বাতিঝাড়, জাপানী পুতুল
চুরমার ক'রে ভাঙে। বেলোয়ারী দিন চ'লে গেলে
বুকের ভিতর ব'সে সুন্দরীরা কোমল নিখাদে
উজ্জ্বল বিষাদগুলি নিয়ে জলতরঙ্গ বাজায়।
অমল আকাশ নিয়ে কেউ বাড়ি ফেরে না কখনো॥

ঈশ্বরীকে

ঈশ্বরী, আমাকে তুমি সর্বস্বান্ত করেছো কৌশলে।
এবার গুটিয়ে নাও ঠাণ্ডা হিম করুণার হাত;
ফিরে নাও রাজ্যপাট, সিংহাসন যা কিছু বৈভব—
এই সুখ, এই শান্তি, যাবতীয় নোংরা আবর্জনা।

আকণ্ঠ সুখের বিষে জর্জরিত সমস্ত শরীর।
অযাচিত দাক্ষিণ্যের ভারে বাঁকছে আমূল শিরদাঁড়া :
তোর কাছে কোনোদিন এ-প্রার্থনা করি নি ঈশ্বরী—
তবু কেন এতো সুখ! এমন সুখের বিড়ম্বনা!

তোমার প্রেমিক আমি। প্রেমের অপর নাম যদি
দুঃখ হয়, তাহলে তো দুঃখই আমার প্রাপ্য। তুমি
আমাকে আমার প্রাপ্য দাও। আমি কঠিন অসুখে
নিজেকে অঙ্গার গ'ড়ে তুলি তোমার প্রতিমা।

ঈশ্বরী, আমার রক্তে বেণী বাঁধো। তৎপূর্বে আমায়
মুগ্ধ দুঃশাসন করো। তুমি হও শিল্পের দ্রৌপদী।

একটি শব্দের জন্যে

একটি শব্দের জন্যে হাহাকার কিছুতে থামে না।
অথচ স্ত্রীপুত্রকন্যা ঘরবাড়ি সমস্ত সংসার
রীতিমতো জমজমাট। ভোরে চা। বাজার। ট্যুইশন।
নাকে মুখে গুঁজে স্কুল। বিকেল চারটেয় বাড়ি ফিরে
জলখাবার। রাত্রে তাস। তারপর সাড়ে বারোটায়
বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে এপাশ ওপাশ—
ঘুমের প্রার্থনা, ঘুম। হঠাৎ দুঃস্বপ্নে জেগে ওঠা।
সব যথারীতি চলে। কিঞ্চিদপি ব্যতিক্রম নেই।

দারাপুত্রপরিবারবান্ধববেষ্টিত দিনগুলি
স্বাভাবিক কেটে যায়। সুখদুঃখ আনন্দবেদনা
হাত জড়াজড়ি ক'রে চলে ফেরে বুকের ভিতর।
অথচ একটি শব্দ, একটি শব্দের জন্যে শুধু

আমূল উৎকর্ণ থাকে সমস্ত শরীর। ধুলো জমে—
ধুলো জমে অকৃতার্থ দীর্ঘ দিনপঞ্জীর পাতায়,
শরীরে, ফুসফুসে, মনে। শয়নে স্বপনে জাগরণে
একটি শব্দের জন্যে হাহাকার যেহেতু থামে না।

জন্ম: ১৯২৫। জন্মস্থান: হাওড়া। প্রথম কবিতা: 'স্বদেশ'। শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: পাখনা। প্রকাশিতব্য: শঙ্খিল সিঁড়িতে।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

ছুঁয়ে থাকা

মাঠের মধ্যে যে-পথ সারাদিন একলা শুয়ে থাকে
তার দীর্ঘশ্বাসে নিজেকে কেমন ছন্নছাড়া লাগে।
গাছতলায় যে-বাছুরটা নিঃসাড়ে ভিজছে
তার জন্য মায়া হয়।
নিঝুম স্টেশনে চা খেয়ে মাটির ভাঁড়টা
লাইনের ধারে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম
সেটাও যে কেন এত করুণভাবে তাকিয়েছিল!

যা কিছু নিঃসঙ্গ, উদাস
তার পাশে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়।
মেঠো রাস্তা, বোবা বাছুর, তুচ্ছ মাটির ভাঁড়—
সবই বোধ হয় মুখিয়ে থাকে মানুষের উষ্ণতার জন্য।
অনেকগুলো বাছুর পেছনে পড়ে রইল;
সামনে আর ক'টাই বা দিন।
মনে হচ্ছে বেঁচে থাকার একটাই শুধু অর্থ:
শেষ দিন অব্দি সবকিছুকে দূর থেকে হলেও
মনে মনে একটুখানি ছুঁয়ে থাকা।

ফেলে আসা

যেখানেই যায় লোকটা কিছু না কিছু
ভুল করে ফেলে আসে।
হয়তো কোথাও যেতে না যেতেই
বাঁধা পড়ে। এত মায়া!

যত মায়া হোক ঝাপ্‌সা দু-চোখ
ফিরেও আসতে হয়।
ছেঁড়া মাদুরের মতন নিজেকে
পেতে রেখে চলে আসে।

অস্তিত্ব

[অমিয় চক্রবর্তীকে নিবেদিত]

একসারি খুদে পিঁপড়ে কি জানে মহাপৃথিবীর
বিশাল বুকের ওঠানামা? জানে সৌরঝঞ্ঝা, আকাশপ্রপাত?
পাহাড়ের ধসে হাজার বনস্পতির ধ্বংস, জন্মান্তর?

একসারি খুদে পিঁপড়ের শুধু
দেয়ালে যে-কোনো গোপন রন্ধ্র
থেকে নেমে আসা
নিঝুম দুপুরে
ফাঁকা উঠোনের
ধুলোর ভিতর।

উঠোনের ইউক্যালিপ্‌টাস

যেখানেই যাও রোদে জ্যোৎস্নায় একলা পথিক
ঘুরে ফিরে সেই বাড়ির পথে পা ফেলতে হবে।

তোমাকে যে উঁচু মিনারের মত লক্ষ্য করে
দীর্ঘ সরল বৃক্ষ নিকোনো উঠোন থেকে
সুদূরব্যাপ্ত তার ছায়া ধরে ফেলবে তোমায়।
নিয়তির মত নিশ্চিত জাল গুটিয়ে নেবে।
মৃদু টানে ধীরে ফিরতে হবে।

তুমি অস্থির, ধাবমান বলে দীঘল তরু
বাড়ির উঠোনে সুস্থির হয়ে প্রোথিত আছে।
তুমি সব ছুঁয়ে কিছুই করো না করস্থিত
ব'লে সে-বৃক্ষ মাটির গর্ভ আঁকড়ে ধরে।
তুমি উজানের সঙ্গী, ভাঁটায় ফিরবে জেনে
শুভ্র সবুজ বৃক্ষ আকাশে ঋদ্ধ, একা॥

জন্ম : ১৯২৯। জন্মস্থান : আমারিয়া (পূর্ণিয়া)

প্রথম প্রকাশিত কবিতা : ১৯৪৫-এ নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত 'পাঠশালা' পত্রিকায়।

কাব্যগ্রন্থ : একটি বই প্রকাশের ইচ্ছে আছে। তবে তৎপরতার অভাব, কবে সম্ভব হবে জানি না।

অরুণ ভট্টাচার্য

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

তাহলে আমার কুটীরের প্রাঙ্গণে এসো।
শীতল পাটি বিছিয়ে দেব, দেবো
সুস্বাদু নারকোল এবং ঠাণ্ডা পানীয়।
তুমি বিশ্রাম যাও।

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

তাহলে আমার ঘরে এসো, আমার
নতুন বস্ত্র পরিধান করে সুবেশ হও,
আমার গন্ধ তেল তোমার অবাধ্য চুলে বিলি কাটুক।
তুমি দীঘিতে অবগাহন করে
শরীরের আরামকে আহ্বান করো।
আমার ঘরে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত। তুমি সংকোচ কোরো না।

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

আমার পালঙ্কে সুখনিদ্রা যাও। আমি
ব্যজন হাতে তোমার কাছে বসি।
তোমার হাতখানি আমার জানুতে রাখো।
পথিক, তুমি লজ্জা কোরো না, ঘুম যাও। আমি
তোমার মুখমণ্ডলের শোভা নিরীক্ষণ করি।

৪. ৩. ৭৭

বড় বিপন্ন বোধ করছি

[রাজনৈতিক দাদাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে]

আমি বড় বেকায়দায় পড়েছি। অনেকটা
প্রাণান্তকর অবস্থা বলতে পারো।

আমার বাড়ির চারপাশে বাঁশগাছ, তারপর
সারি সারি বাড়ি।
এই সব বাড়িগুলির প্রত্যেকটিতেই জোড়াজোড়া
ভূতপেত্নী। প্রেতেদের নিশ্চিন্ত আস্তানা।

বাড়ির যে সরু রাস্তাটা দিয়ে আমাকে শহরে যেতে হয়
তা প্রায় ধানক্ষেতে আলের মত,
একটু বেমক্কা হলেই টাল খেয়ে
পড়বো কোন ভূতেদের ঘাড়ে।

ওরা আমাকে চেনে। সুতরাং জ্যান্ত ঘাড়
মটকাবে না, এটুকু বিশ্বাস রাখি। কিন্তু
ওদের নিঃশ্বাস বড় সাংঘাতিক।
সারা রাত্তির ঘুমোতে দেবে-না। জানালার ধারে
রাত্রিভর বসে থাকবে। মশারির ভেতর অবধি
ওদের রাঙাজবা চোখ দু'টি
আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করবে।

কোথায় পালাবো!
সমস্ত শহরময় ভূতেদের বাসা, গ্রামগঞ্জ ছড়িয়ে।
শুনছি নাকি, দূর দূরান্তর থেকে, এমনকি ভূটান পাহাড়
ছাড়িয়ে ওরা দলে দলে আসছে
শহরটি দখল করবে বলে।

একমাত্র উপায়, ভেবে দেখলুম, আমিও
ওদের দলে নাম লেখাবো, বাড়িটাতে একটা
মস্ত তালা ঝুলিয়ে।

আমার পুরনো বন্ধু অরোরা বোরিয়ালিসের
কিছুটা দুঃখ হবে, তা জানি।
কিন্তু আমি একান্ত নিরুপায়।

২৮.৭.৭৮

ঘুমোবার পর

কাল বেশ রাত্তিরে কারা যেন আমার
বিছানার পাশে এসে বসলো!
গগন ঠাকুর, বিলটুমাসী, ওপাড়ার
রামধন মিস্ত্রী আর যে-ছেলেটা দিনরাতের কাজ করত,-
সবাই উপুর হয়ে আমার মুখের দিকে
চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।
মজার ব্যাপার, কেউ কোন কথা বলল না এবং
এঁরা যে কেউ কাউকে চেনেন এমন বোধ হল না।

আমি তো সবাইকে জানি। কতদিন বাদে সব
দেখাশোনা। ভাবলুম, খবরাখবর
জিজ্ঞেস করব। ভাবতে ভাবতেই মুহূর্তে
গগন ঠাকুর আর বিলটু মাসী আর
রামধন মিস্ত্রী আর ছেলেটা
সব যেন লাইন দিয়ে চলে যেতে শুরু করল।

আশ্চর্য, ঘর বন্ধ, তথাপি সবাই চলে গেল,
পষ্ট দেখলুম।

২৭.৭.৭৮

সুশীলকুমার গুপ্ত

বন্যা

বন্যা, তুমি দুর্বার গতিতে
অক্লেশে শিকার কর দীপ্ত জনপদ।
ভেঙে ফেল ঘরবাড়ি, শস্যাগার, পাঁচিল, ব্যারেজ;
ছিন্নমূল মানুষকে নিয়ে
উন্মত্ত গেণ্ডুয়া খেল, লোকালুফি কর গাছপশু।
লক্ষ হাতে মুছে দাও
আলিম্পনা, বসুধারা, কাজলের রেখা। ভেসে যায়
লক্ষীঝাঁপি, পাণ্ডুলিপি, হাঁড়িকুড়ি, পুতুল, লাঙল।
তুমি এত শক্তিধর। কিন্তু কিছুতেই
পার না ভাসিয়ে নিতে একতিলও পৃথিবীর হিংসা লোলুপতা;
তোমার অক্ষম হাত যায় না যেখানে স্বার্থ স্বৈরতান্ত্রিকতা
মূল গেড়ে সমাসীন, ধ্বংস করে মানুষের শান্তি ঋদ্ধি কৃষ্টির আশ্রয়।
লুটপাট ক'রে তুমি যত আন পলি
তা শুধু নূতনভাবে বৃদ্ধি করে লোভক্ষুধাপাপের ফসল।
তুমি ব্যর্থ, যাও
জন্ম নিক শ্রেষ্ঠ পল্লী মানুষ নদীর শান্ত সুস্থ সহবাসে।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

স্ট্রেস-১

হালকা গোলাপী আলোয় আঙুল তুলে আমার সঙ্গে কথা বলো কেন। তোমার অস্বাভাবিক উঁচু নাক আমায় তাড়া করে ঘুমের মধ্যে। তর্ক করি না, তবু তোমার অকরুণ প্রশ্ন, উচিত কথাগুলো আমি বলেছি, সত্যি? না ভিতু কাপুরুষ, চুপ করে মেনে নিয়েছি

অপমান? বিব্রত করো কেন শংকরপ্রসাদ, আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যাই।
রাজগীরে নিসর্গ সামনে, আমার অতীত নোটবুক খুলে দেখাও। তুচ্ছ দানখয়রাতের তালিকা মেলে ধরো। বই কিনি, পড়ি না, শুধু পেজমার্ক দিয়ে রাখি কেন তুমি জানতে চাও। কতকাল আগে খেলতে খেলতে আমার ভাইয়ের সামনের দাঁত—মনে হয় পেছন থেকে ঠেলেছিলাম। আমি ভুলতে চাই।

কাত হয়ে শুয়ে থাকি, তুমি আমার ওপর তারের খাঁচা চেপে ধরো। শিক দিয়ে খোঁচাও। শান্তি নষ্ট হয়। চোখ বাঁচাতে ল্যাজ বেরিয়ে পড়ে আমার কষ্ট হয়। লোম ফুলিয়ে ভয় দেখাতে চাই, কিন্তু গলার কাছে ধুকধুক করে প্রাণ।
সাম্রাজ্য ফিরে পাবার আশায় কত শাহেনশা পালিয়ে বেড়ায়। সাম্রাজ্যের লোভ নেই আমার। ঘুমোতে দাও শংকরপ্রসাদ। আমি মহৎ নই, সাহসী নই। আমি লেখাপড়া কিছু শিখি নি।
নারকোলগাছের ওপর মলমের মতো জ্যোৎস্না পড়েছে। ব্যানডেজ বাঁধা শাদা বাড়িটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, একলা। তুমি যাও। আর একটু পরে আলো ফুটলে শান্তি। বসিরহাট বারুইপুর থেকে কলকাতায় ঢুকবে সারি সারি ট্রাক বোঝাই সবুজ।

দেবী রায়

আগুন, ওরে আগুন

সুচতুর ভাগ্যের সঙ্গে একদিন দেখা হবে—
অ-দেখায়, কেটেছে বহুমাস, অযুতবছর, অবিরত
সকলকাম নয়, যে জীবন, হবে নাকি সার্থকতর
যদি হয়, হোক—কোনো একদিন। শহরের-বিজ্ঞাপনের-

প্রাচুর্য্যের ফাঁস থেকে মাথা তোলে, স্ফীত-আশা।
যেন অধীর-অবুঝ শিশুর মতন :
গোপন ফাঁদে পা দিস্ নে—আগুন, ওরে আগুন…… ॥

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

একটি অশ্বতরের স্বপ্ন

কোনো অজ্ঞাত কারণে বাতাসের ঘনত্ব কমে আসছে। দিনের আলো
দ্রুত তার লোমশ শরীর গুটিয়ে নিয়ে এখন এই ঝোপের ভেতর ঢুকবে।

এই রকম কোনো এক সময় দেহ-ধারণ করে রহস্য—লম্বা, চ্যাপ্টা
একটা ধূসর নলের মত বেরিয়ে আসছে জঙ্গলের প্রায়ান্ধকারে
ছোট্ট ধোঁয়ার জানলা ফুটে উঠল ধীরে ধীরে
জটিল হতে থাকে তার দেহবোধ।

লেনা নদীর ধারে শুয়ে শুয়ে এই আশ্চর্য প্রাজ্ঞ স্বপ্নের থেকে জেগে ওঠে
মধ্য প্রাচ্যের কোনো এক শ্রেষ্ঠীর অশ্বতর। আখরোট গাছের নীচে
নদীর জলে মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়ে আছে
তার মনিবের ঈষৎ ছায়া। থির থির করে কাঁপছে। সে অনুভব করে
কেমন বেঢপ লম্বা হয়ে যাচ্ছে তার পেছনের পা দু'টো।

নারায়ণ ঘোষ

নেই

কেউ ডাকতে এলে বলে দিও আমি বাড়ি নেই
আমার দুর্বোধ্য ক্ষত কাউকে দেখাতে চাই না
দেখো, যেন কেউ ঢুকে না পড়ে
যেন দেখে না ফেলে টেবিল ল্যাম্পের বাল্‌বটা ফিউজ

এখন কবিতা লেখা বন্ধ আছে
তাছাড়া এখন আলো নেই। মোমবাতি নেই। তেল নেই। নেই।
কেউ ডাকতে এলে বলে দিও আমি ভালো নেই।
আমি বাড়ি নেই।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধিক্কার

কষ্ট ক'রে জোগাড় করি
শুকনো পাতা, বাঁশের কুঁচো,
খড়-কুটো, মাটির হাঁড়ি।
কোত্থেকে তুই ছুট্টে আসিস,
আগুন দিস!
আগুন দিয়ে রঙিন মুখে
খুব হাসিস!
বাহবা তোর মেড়াপোড়া,
নিলাজ হাসি!
দূর হ'য়ে যা সামনে থেকে
দূর হ রে সর্বনাশী।

গৌতম বাগচি

আকাঙ্ক্ষা

বুকে জেগে ওঠে ভীষণ বিজন
প্রথম দুপুরে আমার সুজন
ভুল করে হও প্রিয়।

ক্রমাগত ভুল ভাঙার খেলায়
ভরা ফসলের ঋতুর পাড়ায়

ইচ্ছের ঠোটে বলো—
অভিলাষী এই সিঁথির বীথিতে
সিঁদুর ভিক্ষা দিও।

প্রভাত মিশ্র

বরাকর

জেগে আছে বরাকর এপ্রিলের রাতে, রূঢ় আরশোলা
আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমাকে একলা দেখে, ভুল বোঝে আরো।
ফুলের ঘাসের গন্ধ,হায় হায় ক'রে ওঠে সঙ্গীটির খোঁজে।
যেন কে উদাসী নারী হাই তোলে, ঢলে ঢলে মৃদু চোখ বোঁজে।
সে গন্ধ জানে না আজো আরশোলা কোনদিন সঙ্গী নয় কারো।
নড়ে ওঠে মরাগাছ, চাঁদের শরীর ঘিরে কেন অবিরত।

আমাদের জীবনের অর্ধেক গিযেছে পুড়ে কয়লার গ্রামে।
ওগো এত আঁখিজল, টলটল করো রোদে, রাত্রির রোদে।
ভেঙে গুঁড়ো হয় কিছু, কিছু ওড়ে মহাশূন্যে, ওড়ে—।
শাদা কাচে সংসারের মুখখানি ম্লান হ'য়ে কিরকম পড়ে।
জল যায় পরবাসে, বরাকর দেখে আর কেঁদে ওঠে ক্রোধে।
মানুষও কালো কালো সমাজের দিকে চেয়ে হাত রাখে হাতে।

বিপ্লব বিশ্বাস

কয়েকটি কবিতা

জপ

কে জলছে প্রখর তপনে?
বর্ষার নদীর তীরে
তাকে দেখে এসো
সূর্য্যস্নাত 'রূপ'।

যুদ্ধশেষে

যুদ্ধশেষে

ঘরের খোটায় ঘোড়া বেঁধে
উন্মুখ তাকায় সৈনিক।
বউটাকে ডাকত 'মালতীফুল,
ছেলেটাকে—একটা পাকা আঙুর।
"তোমরা আছো তো ঘরের মধ্যে,
নাকি, আমার বাগানে মিশে।"

বসন্ত আসবে

তার চাইতে ঘুমিয়ে পড়া যাক
কোনো শরতের শেষে।
যথাসম্ভব প্রত্যেকের হিসাব-নিকাশ
মিটিয়ে ফেলা যাক।
কারও সহানুভূতি নয়, ভালবাসা নয়
এমন কেউ কিছুতেই কাছে থাকবে না
যে বলাত পারে,
"এ বছরেও বসন্ত আসবে।"

সুকমল বসু

পরিচয়

তার কোর পরিচয়
আজও শব্দ দিয়ে বানানো গেল না
গাছের মধ্যে তার
অদ্ভুত ছবিগুলি নিতান্ত মলিন
হাওয়ার মধ্যে তার

গন্ধের স্বাদ পাওয়া অনেক জটিল
ফুলের গোপন অর্থে
বাসা বেঁধে থাকে তার নিজস্ব ছায়া
কোন এক রমণীয়
সুসম মাটির বুকে নরম চিবুক

অথচ সমস্ত কিছু
মিলে মিশে গিয়েও সে পরিচয়হীন

'জেন্' কবি শিনকিচি তাকাহাসি

জাপানের শিকোকু দ্বীপে ১৯০১ সালে শিনকিচি তাকাহাসির জন্ম। কিশোর বয়সে রাজধানী তোকিওতে গেলেন পটু কবি বনতে। তাকাহাসি জাপানে প্রথম 'দাদা'বাদী (Dadaism) কবি। আধুনিক জাপানী কবিমহলে এঁর লেখা খুবই মনোরম ও অগুণতি। মনেপ্রাণে প্রথম থেকেই কিছুটা বৌদ্ধ ছিলেন। তবে পরে যখন 'রীন্‌জাই' সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা গুরু শীজান আশিকাগা-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়, তখনই আরম্ভ হয় 'জেন্' (Zen) মার্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর অচল-অটল ভক্তি। শীজান্ নিজেই তাকাহাসির ধ্যানী শিক্ষা ও দীক্ষার বিরাটত্বের কথা অনেকবার বলেছেন।

তাকাহাসির বেশীর ভাগ কবিতাই 'জেন্' চেতনায় ভরা। কবিতা ছাড়াও এঁর অনেক গদ্য রচনা আছে। ধ্যানী বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে আছে নানান্ উল্লেখযোগ্য রচনাবলী!

শিনকিচি তাকাহাসি এই শতাব্দীর পয়লা নম্বর 'জেন্' কবি, আর বোধহয় একমাত্র 'সাতোরি' কবি। 'সাতোরি' কথাটার মানে হল জাগরণ। কবির জীবন ও 'জেন্' গুরুর জীবনের মধ্যে আছে আপাতবিরোধী এক সত্য। দুটির মাঝে সামঞ্জস্য আনা সোজা কথা নয়। তবু তাকাহাসির কবিতায় পাওয়া যায় সনাতনী 'জেন্' ভাবনার সবচেয়ে ভাল দিকটা—তার কথার স্বল্পতা, শৃঙ্খলাভরা মনোযোগ আর সূক্ষ্মতা। সেই সঙ্গে মিশিয়েছেন কবির চোখে দেখা আর শোনা কথার অসীম অস্তিত্বকে—বৌদ্ধ ধর্মের মহাসাগরে এক চমৎকার শরীরী পট। তাকাহাসির জমাট-বাঁধা চিত্রাবলীর মধ্যে দেখা যায় ভাবনার তীক্ষ্ণতা। পাওয়া যায় সমসাময়িক সমস্যার কথা আর অভিজ্ঞতা—সেটাও আবার সেই সনাতনী ভাবে এগিয়ে চলেছে এক সর্বসমন্বয়তা ও অনন্যতার তীরে, যাকে বলা যায় শর্তশূন্য নিষ্কৃতি।

নীচের কবিতাগুলি মূল থেকে বাংলায় অনুবাদ। প্রতি কবিতাই শর্তশূন্য দুনিয়ার সঙ্গে ভাব পাতিয়েছে 'জেন্'এর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, বৌদ্ধ ধর্মের ভাব ও চেতনার অনবদ্য সমতানের কাব্যিক চালচিত্র এঁকে।

সাগরকোলে রামধনু

কুয়াশাভরা ঢেউয়ের ঝাঁট-না-জানা
শঙ্খ ঘুমায়।
বালি ঢাকা, জোয়ার জলের সরা বালিতে দোলা,
উত্তাল তরঙ্গের বাজ-পড়া বাজনা না-শোনা,
ঢলে পড়ে শঙ্খ।
একদিন. এই বালিয়াড়িটাও
পৃথিবীর আস্তরণ সরিয়ে হবে ফসলভরা মাঠ
কিংবা হয়তো সামুদ্রিক মেঝে।
দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবে না শঙ্খ,
চায় না আকাশে ভাসা মেঘের মত হতে,
মৃত্যু কিছু দিতে পারে, আর কোন চাহিদা নেই তার
কুড়েমিতে ভরা, অশ্রুহীন, নেই তাড়াহুড়ো,
প্রকৃতির নমনীয় দেহকান্তি,
দুঃখ-রাগহীন, নিঝুম ভেসে চলা।

ঝড়ে পেতে কান।
জলন্ত রবির তাপে বালিতে ভাজা,
দিবাস্বপ্নে উদাসীন।
শঙ্খ,
সাগরকোলের রামধনু,
দেখে চল তোমার সুখ স্বপ্ন।

জন্ম

এ হাতে ছুঁয়েছি কি তোমার চুল?
এ হাতে ছুঁয়েছি কি তোমার কোমল দেহ?

সদাই তো তোমার-আমার মাঝে নেমেছে শীতের হিম,
গ্রীষ্মের ভাপা-কুয়াশার পর্দা, নয় কি ?

তবু তোমার মধ্যে আসন্ন শিশু
ছমড়িয়ে ওঠে, কেঁপে ওঠে জীবনস্পন্দনে।
এক চাদরে মুড়ে শুয়েছি আমরা, তবু
জানি না তুমি কে।
প্রসব করবে যে শিশু হয়তো সে তুমি
আমিও হতে পারি।

সারাদিন ধরে বৃষ্টি

সেদিন বৃষ্টি সারাক্ষণ
কেটেছিলাম আঙুলটাকে।
বৃষ্টির হিম শুভ্রতা
যেন থামতে চায় না।

আঙুলটা, ডাকিনীর লাল চোখের মত,
রক্ত ঝরায়।
ভবিষ্যৎ কি ঝরছে আঙুল বয়ে !

সন্ধ্যার মেঘ

মেঘের মত কি যেন কিছুতে আকাশটা ভরা,
পৃথিবীও যেন মেঘেরই মত।
সোনালী রাংতা ছাড়ানো আঙুলগুলো,
পৃথিবী ছেয়েছে, মেঘের কালো ছায়ার মত।
সূর্যাস্তে, যখন আগুন লাগে মেঘে,
আঙুলগুলো নড়তে সুরু করে।

বাতাস

কথা দাও,
শরীর বিছিয়ে দাও,
তবু অস্তিত্বের বদল নেই।
কিন্তু বাতাস—

বাঁচব আমি শান্তভাবে
বাতাসের মত, উড়ে
শহরের উপর দিয়ে,
আমার বুকে পায়রায় উড়ে যাওয়ার শব্দ

পাইন্ গাছের হাওয়া

পাইন্‌গুলোর মাঝ বরাবর বইছে বেজায় হাওয়া
অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি—
হাতে তার জলের কুঁজো
তাতে সে কিছু তো ভরে নি।
নেই জীবনানন্দ কিংবা মদিরা—
শুধুমাত্র অযুত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

পাইন্‌গুলোর মাঝ বরাবর হাওয়া বইছে।

মূল থেকে সটীক স্বচ্ছন্দ অনুবাদ:
সন্দীপ ঠাকুর

নতুন কবিতা

[শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীসুব্রত রুদ্র, একটি বিজ্ঞপ্তিতে চোখে পড়ল, অতি সম্প্রতি 'নতুন কবিতা'র কাব্য-সংকলন প্রকাশ করছেন অথবা করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, নানা লিটল্ ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা কবিতা নিয়েই এই সংকলন। বলা বাহুল্য, এবং কবিতা পাঠকদের কাছে অজানা নয়, গত চার-পাঁচ বছর ধরে উত্তরসূরির প্রতিটি সংখ্যা নীরবে এবং নিঃশব্দে এই কাজটিই করে যাচ্ছিল 'নতুন কবিতা' বিভাগে। ইতিমধ্যেই আমরা গ্রামবাংলা এবং কলকাতা শহরের প্রায় শতাধিক লিটল ম্যাগাজিন থেকে বাছাই করে কবিদের একশটিরও বেশী কবিতা প্রকাশ করেছি—এবং এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তীর মত প্রবীন কবি থেকে তরুণতম কবিরা প্রায় সবাই।

আমরা নিশ্চিত জানতাম, উত্তরসূরির এই বিভাগটি একদিন কবিতার ইতিহাস তৈরী করবে। আমরা আনন্দিত যে একজন প্রতিষ্ঠিত কবি এবং একজন তরুণ উৎসাহী কবি—দুজনে মিলে উত্তরসূরির শুরু-করা-কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের জন্য আমার সাধুবাদ রইল। সম্পাদক : উত্তরসূরি]

অমিত ভট্টাচার্য

আত্মপরিক্রমা

আন্তরিক ছিপ নিয়ে জলঘেরা সবুজ মাচানে বসে আছি।
প্রিয় মাছ ধরা কি দেবে না? হাতের উন্মুক্ত প্রাণ তোমাকেই ধরিবারে চায়—
হৃদয়ের কোল বেয়ে ভেসে যায় নদী, গেরুয়া পালের নৌকা
দিনান্তের ছায়া নিয়ে পরিক্রমা করে, আর শাদারং সেতুটি দূরগমনের কালে
প্রতিভাস হয়।

আমার চামড়ায় লাগে রোদ, ধুলো, বিদ্বেষ, ব্যর্থতা :

জন্ম হ'য়ে পড়ি; অন্ধকারে প্রবল হাওয়ায় আপন শিখাটি প্রাণপণ আঁকড়ে
ধ'রে থাকি।

অল্প আলোয় প্রোফাইল বড় দীর্ঘ মনে হয়,
মনে হয় আমি দেওদার, শিরিষ : দীর্ঘতায় আকাশকে ছুঁয়ে দিতে পারি।
আস্তে আস্তে আলো কমে যায়, আসে নিভৃতি, সারারাত তার সঙ্গে যুদ্ধ চলে
ভোর হ'লে পদচিহ্ন খুঁজেও পাই না, আবার চামড়ায় লাগে ে াদ।
হৃদয়ের কোল বেয়ে ভেসে যায় নদী, গেরুয়া পালের নৌকা।

অক্ষক্রীড়া। C/o অমিত নাথ, শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা, ২৪ পরগণা।

অরূপ চৌধুরী

ডিসেম্বর

এইবার তবে এইবার,
ঐ হলুদ বাড়ীটার দিকে চলে যাওয়া চাই, চাই সনেটের বিকল্পে কিছু অনুগত
অক্ষরের মালা।
চাই ঘনভার দুঃখের পাশে থেকে যাক কিছু কিছু বেদনামাধুরী,
ভাষার ভেতরে শুভ্র প্রণয়ের স্মরণীয় গান, নাহলে শিল্পের ঐ মেঘমালিনীকে
নিয়ে
কীভাবে সে একটানা লিখে যাবে দীর্ঘ কবিতা, শব্দের আড়ালে তার জানাবে
পরম অনুরাগ
পদ্মভুক মানুষের হিংশাদা নখের আঘাতে কেঁপে ওঠে কুসুমকুমারী, কাঁপে তার
গন্ধগরিমা,
একাকী বাতাস ছুঁয়ে এলোমেলো উড়ে যায় গুল্মহুপুর, উড়ে যায় পাতা
ও পালক,
হলুদ পরাগ কিছু পড়ে থাকে পাথরের বিজন প্রদেশে

এসব জানে না ঐ পরাগ শিকারী সব হিমশাদা কলংকিত নখ, জানে না কুসুম
মানে প্রিয়সুধা…
উপমা শিল্পের…

তাদের প্রণয় নেই, পূজা নেই, স্বপ্নের ভেতর তারা পুষে রাখে নীলবর্ণ সাপ,
আর কুসুমকুমারী ক্রমে থরোথরো কেঁপে ওঠে তামসিক চুম্বনের বিষে,
দু'চোখ ঝাপসা হয় বোবাক্রোধে, স্বেচ্ছাচারে, শিরার ভেতরে জাগে নীলঘৃণা
জ্বলে ওঠে লোহিত আগুন,

অবশেষে দু চোখে জলের চিক মুছে গেলে মনে পড়ে অনলের সুধা
পাঁচমুড়ো পাহাড়ের তলে, মনে পড়ে, সানলী নদীটি,
চলে যায় ডিসেম্বর, গোধূলীর পৃথিবী ছাড়িয়ে, দূরে, ছায়াপথে,
আর প্রস্তুত হয়, যেন সে বন্দুক হবে এইবার
একজন রোগা কবি তাকে
শান্ত আঙ্গুলে তুলে নেবে মুঠোর ভেতরে, তারপর টিপে দেবে
ঠাণ্ডা ট্রিগার…

শব্দ-শাব্দিক। C/o কৃষ্ণেন্দু দে, ১১/২এ মোহনলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

সুতপা সেনগুপ্ত

শিরোনামহীন কবিতা

নতুন বছর আমায় দিও সর্বনাশা খিদে
তোমায় আমি সাজিয়ে দেবো ডালায়
বেলেল্লা চুল, সন্ধ্যা-বকুল, প্রখর ভালোবাসা
দুপুর রোদে অন্ধ বুড়িবালাম

আমায় দিও উল্কি-তোলা হাতের খর ভাষা
জাহাজ দিও এবং প্রিয় নারী
তিনভুবনের একটি দিও, শাসন পাখির ডানায়
শর্তে দিও বন্যা, খরার ঋণ

বাতাসে পাল তুলল কেন অগ্রদানের ঘোড়া
আজকে আমি সবার অধীনতার
শেকল ছিঁড়ে দেখিয়ে দেব দশ আঙুলের দিখলয়ে
কটিকারীর বিজন দীনতাপ
নতুন বছর, স্বর্গে রেখো অশ্লেষা রাক্ষসী,

সুধীন্দ্রনাথ এবং কিছু কবি
তোমার আমি শরীর ভরে শোনাবো বৈরথে
ললিত টোড়ি পুরবী ভৈরবী

অভিমান। ১।এ শশী ঘোষ লেন। কলিকাতা-৫

রাজকল্যাণ চেল

আপনার চিঠি

সেই শহর থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পর এক সকালে
আমি আপনার চিঠি পাই। বলা বাহুল্য, আমার জীবনে সেই আপনার প্রথম চিঠি।

একথা আপনি জানতেন, পড়তে গিয়ে দেখি আমার চারপাশে
আর একটিও দেওয়াল নেই। এক আকাশ তলে শেষ নেই নেই শব্দে—
উধাও হয়ে গেছে যে পথ বিশে, সে পথের উপর দাঁড়িয়ে আছি
একথা কি আপনি জানতেন? এ কাহিনী আমি কোনদিন কাউকে লিখে জানাই নি।

সেদিন মেঘ করে এসেছিল আকাশে চতুর্দিক অন্ধকার আর ঐ অন্ধকারে
আমি দেখতে পেয়েছিলাম জাগ্রত ফসলের গানের রচনা
যত হাওয়া আসে সব এসে লাগে মর্মে যত বৃষ্টি সব এসে পড়ে চেতনায়,
এভাবে প্রতিটি মুহূর্ত তার হয়ে উঠেছিল শিকার। আপনি আর তারপর

এমন চিঠি কোনোদিন লেখেন নি, তবু সেই যে পথে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন,
সেই যে আপনার ভাষ্য খুলে দিয়েছিল, মেলে দিয়েছিল আমাকে,
এরপর পৃথিবীর সমস্ত ঘরের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখেছি আমারই ঘর।
একথা আপনাকে আমি কোনদিন লিখে জানাই নি, যা জানানো উচিত ছিল।

কলঘাস। C/o সত্যসাধন চেল, বেলবনী, ধবনী, বাঁকুড়া।

আলিঙ্গন চক্রবর্তী

তৃতীয় ফুসফুস্

ডান ফুসফুস আর বাম ফুসফুসের মাঝখানে একটা গোলপোষ্ট আছে, অবিরাম একটা লাল বল গড়িয়ে গড়িয়ে ঢুকে যাচ্ছে গোলপোষ্টে। ছিঁড়ে দিচ্ছে জাল। অসহায় গোলকিপার ঝাঁপিয়ে পড়ছে কখনো ডানদিকে। কখনো বামদিকে। লাল বলটা গড়িয়েই যাচ্ছে। অবিরাম। ছিঁড়ে দিচ্ছে জাল। গোলকিপার বলের নিশানা বোঝে না। ফুসফুসের সঙ্কেত বোঝে। গোলকিপার জানে না মানুষের তৃতীয় ফুসফুস লুকোনো আছে বলের ভেতরে। অবিরাম লাথি খেতে খেতে লাল বলটা গড়িয়ে, যায়। কিছুতেই ধরা দেয় না কোন নিপুণ হাতে। ঘুরতে ঘুরতে বল্গাহীন বলটা সমস্ত জাল ছিঁড়ে কাঠের গোলপোষ্ট ভেঙ্গে মাটি থেকে আকাশে হঠাৎ লাফিয়ে স্থির হবে সূর্যের পাশে। একদিন গোলকিপার সকালে উঠে দেখবে সূর্যের স্থানে স্থির হয়ে গেছে সেই অনিয়ন্ত্রিত ফুসফুস।

এবং এবং কবিতা। C/o অজিত দেব, ৮।৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

নিশীথ ভড়

কেমন আছি

এবার তুমি হয়ে উঠবে ব্যক্তিগত চিঠির মতো তুচ্ছ কিন্তু স্মরণযোগ্য
অনিদ্রার রোগীর কাছে ঘুমের মতো প্রার্থনীয়, সুদূর

এই যে একটু আড়াল পেলাম, ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম
জানতাম না আগে
ভিড়ের ভিতর বেশি সুযোগ তোমায় নিরভিমানী পাওয়ার, এসো
রাস্তা সব খোঁড়া হয়েছে, আর
সহজ রাস্তা পাওয়ার যখন বালাই নেইকো সহজ রাস্তা পাওয়ার কোনো উপায়ই
নেই, তাই
অল্পে অল্পে কাছে এসে আলতো স্বরে কী উদাসীন বলো
পায়ের তলায় সব রাস্তাই বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে বদলাতে বদলাতে
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে এই রহস্যবার্তাটির ঋণ
কেমন ছিলাম, কেমন ছিলাম, আমরা কেমন ছিলাম।

অভিমান। ১।এ শশী ঘোষ লেন। কলিকাতা-৫

বাণী সমাদ্দার

অলৌকিক

আমি শূন্য থেকে এক-লহমায় ফসল ফলাই :
ইচ্ছেমত ঘুন্টি টিপে বৃষ্টি পাড়ি যখন-তখন ;
অসুখ তাড়াই, মন্ত্র জানি, আমার ফুঁয়ে ঘা শুকোবে ;
দৈত্য নেই দানো নেই এই দ্বীপে দেদার হরিণ—
মাছের বাগান, ফলের পুকুর, আমি চাইলে সমাজ গাভিন
তুমি সব পার ?
আত্মা বলতে পার ? রক্তমাংস ?
মনের কুলুপ খুলে ব'লে দিতে পার সত্যমিথ্যা ?
তুমি কি মায়াজাল জান ? তুক্‌তাক্ ? জলপড়া ?
হাজারো কাঁকর দিলে জুড়া করতে পার ?
আমি কিছু ভেলকি জানি না।
তেমন দশম বিদ্যা জানা নেই যে-অশ্রুমোচন হবে ;

রোমকূপ ভ'রে দেখি বিশ্বচরাচর :
আমি এ-বাতাসে জবুথবু—কোনো কাজেই আসি না!
বিচ্ছিন্ন ব-দ্বীপ যেন-সব দেখছেন :
চোখ ঢালি অন্ধকারে,
কুয়াশায়,
যাতে একবার দেখা যায় :
দেখা যায় না, চোখে পট্টি, তবু দেখি, রোমকূপ ভ'রে দেখি :

ঠাণ্ডা জমি—নিচেই গোক্ষুর

আজকাল। শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা, ২৪ পরগণা।

কবিতা এবং শুদ্ধ চৈতন্যের উন্মোচন

[উত্তরসূরি ১০৫ (২৭ বর্ষ ১ম) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী পাঠক মহলে যে উত্তেজনা, উৎসাহ, বিরক্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করেছি, ইদানীং সাহিত্যের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। বহু বছর এরকম আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি সেই 'আরো কবিতা পড়ুন' এর যুগ থেকে। প্রতিদিন অজস্র চিঠি আসছে দপ্তরে। মাত্র কয়েকটি পত্র প্রকাশ করা হল। পাঠকদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানা যাবে 'তরুণ কবিদের প্রতি আবেদনে'। সম্পাদক : উত্তরসূরি]

১.

কল্যাণীয়,

অরুণ, তোমার ১০৫ সংখ্যক উত্তরসূরি পেলুম। ঐ কাগজের মারফৎ তোমার সঙ্গে যোগসূত্র এখনও টিঁকে আছে। অনেক দিন হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে দেখাশুনো আর হয় না। আমারও শরীর দ্রুত ভাঙছে, বড় অবসন্ন ও নিঃসঙ্গ বোধ করি। তার ওপর একে একে পুরানো, বহু দিনের বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে যাচ্ছেন। মনীশদা অজিত গেলেন, তাঁদের বয়স হয়েছিল কিন্তু অরুণের চলে যাওয়া যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি মর্মান্তিক। 'অরুণ' বললেই তোমাদের দু'জনের কথা এক সঙ্গে মনে উদয় হয়। তবু তুমি আছো, এটুকুই সান্ত্বনা, অরুণের সঙ্গে ইদানীং কালে ভদ্রে দেখা হত। কিন্তু গত 'প্রতিশ্রুতি সংসদের' বার্ষিক অনুষ্ঠানে এবং তার আগের বছরেও তাকে অনেকটা কাছে পেয়েছিলুম। আমাকে অনুযোগ করে বলেছিল—'লেখা ছেড়ে দিলেন, আপনি? আর কবিতা যা দিয়ে সাহিত্য-জীবন শুরু করেন?' বলেছিলুম, '১৯৭১ সালে শেষ কবিতা লিখেছি। এখন খুবই কম।' অরুণ বলেছিল, 'আপনার বইগুলি থেকে এবং ষাট-সত্তরের দশকে লেখা ইতস্তত: ছড়ানো কবিতাগুলি থেকে নির্বাচিত একটি সংকলন প্রকাশ করুন।' আমি জবাব দিয়েছিলুম, 'অরুণ, 'আমি Retired', সে বলেছিল, 'আচ্ছা আমি দেখছি আপনি বলুন…কে, এ

বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।' করেও ছিলুম কিন্তু তাঁর সেই কবির আগ্রহ ও response পাই নি। সুতরাং ও সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়েছি। তোমাকে বলে রাখছি—যদি কেউ উদ্যোগী হয়ে প্রকাশ করেন, জানিও। কবিতাই আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। ১৯৫৬-৫৭তে 'সম্ভবা' আমার শেষ বই। তার পরেও অনেক কবিতা কাগজপত্রে বেরিয়েছে। কিন্তু সে সবই চিন্তাশয্যার সামগ্রী।

উত্তরস্মৃরিতে "কবিতার জন্য আবেদন" লেখাটি আমার বিশেষ ভালো লাগল। তোমার সময়োচিত বক্তব্য আমার মনে ধরেছে। তুমি যা হোক 'কবিতা' বাঁচিয়ে রেখেছ। এবং তারই মাধ্যমে তুমি সমধর্মী ও সংবেদনশীল হৃদয়কে স্পর্শ করে থাকো। সেটা বড় কথা।

বিজ্ঞাপনে তোমার 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' নাম দেখি। যদি অসুবিধা না থাকে আমাকে এক কপি দিও, আমি তো মুখ্যতঃ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, ইতিহাস তার পরে। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা অরুণের চিঠিখানা তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের চমৎকার reveal করেছে। এ লেখাটি তাঁর ঋজু মনের ও honestyর একটি দলিল বলা চলে। তোমার "কবিতার ভাবনা" ১১ খুব touching। তুমি এক দিন ফোনে, কার্ড লিখে জানিয়ে আমার কাছে এসো। সত্যি খুশি হব। স্নেহাশীষ সহ

১৭/১ ব্রড ষ্ট্রীট, কলকাতা। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২.

শান্তিনিকেতন

১১-৭-৮০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার 'আবেদন' সম্পূর্ণ স্পর্শ করলো। আপনাদের

শিশির

ইংরেজী বিভাগ, (অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ)

বিশ্বভারতী।

৩.

প্রীতিভাজনেষু,

অরুণবাবু, উত্তরসূরি ১০৫ (২৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা) গতকল্যের ডাকে পেয়েছি। তরুণ ও তরুণতর কবিদের প্রতি বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভাবে যে আহ্বান জানিয়েছেন সেজন্যে সাধুবাদ দিই ও ধন্যবাদ জানাই। এঁকে বলা চলে পথ-ভ্রষ্টদের ঘরের পথ দেখিয়ে নিজ আঙিনায় ফেরার ডাক।

বহুকাল থেকে এই রকম মনোভাব নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক খুচরো কথা বলেছি। সেসব হয়তো কেউ দেখেন নি, দেখে থাকলেও উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু আপনি এবার যেন জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ভালো করেছেন। আপনার জয় হোক।

প্রীতি নেবেন। আপনাদের

সুশীল রায়

(প্রাক্তন সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা। সম্পাদক, ধ্রুপদী)

৪.

শ্রদ্ধেয় অরুণদা

আমার অনেক নিন্দনীয় অভ্যাসের মধ্যে সময়মতো চিঠি না-লেখার অভ্যাস অন্যতম। অন্তর্নিহিত অমনোযোগ ও আলসেমিই এর প্রধান কারণ। তবু 'উত্তরসূরি'র ১০৫ সংখ্যাটি পেয়ে আপনাকে চিঠি না লিখে পারলাম না। বিশেষ করে আপনার 'কবিতার জন্য আবেদন, ১৯৮০' আমার জড়তাকে আঘাত করেছে। এই আবেদন প্রকাশ করে, আমার মনে হয়, উত্তরসূরিকে আপনি বাংলা কবিতা বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন; শুধু কবিতার জন্য বাংলা পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। যা আছে তা যেমন অনিয়মিত এবং তেমনি লক্ষ্যের দিক থেকে সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ বলছি এই মর্মে যে, যায় ধরণের অধিকাংশ পত্রিকায় বাংলা কবিতা সম্পর্কে যে আলোচনা পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই কবিতার তথাকথিত আধুনিকতা নিয়ে। কিন্তু যা প্রকৃতই কবিতা তার একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে 'কবিতা', তাঁকে 'আধুনিক' বা 'প্রাচীন' এই ধরণের আখ্যায় বিশেষিত করা রসিকের পক্ষে অবান্তর বলে মনে হয়। আমার

বিশ্বাস 'আধুনিক' 'পৌরাণিক' ইত্যাদি বিশেষণ কবিতার চরিত্র নয়, কবিতার জ্যাকেট মাত্র। ওপরে জ্যাকেট যা-ই থাক ভেতরের চরিত্র যদি কবিতার না হয় তবে নিছক জ্যাকেট কোন রচনাকে 'কবিতা' করে তুলতে পারে না। এই সহজ কথাটা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হয়ে আমাদের ভাষার অনেক পুরনো কবিকে আমরা অবহেলা করে থাকি—অথচ এই সব কবি যুগধর্মে পুরনো হলেও কালধর্মে শাশ্বত। আপনার আবেদনে আপনি একালে আত্মবিস্মৃত কাব্যপাঠককে যে এ ব্যাপারে কর্তব্য-সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন এজন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকৃতপক্ষে যে কাগজ কবিতাব্রত, তাতে আধুনিক অনাধুনিকের শুচিবায়ু থাকবে কেন? নির্বিশেষে যে-কোন কালের 'কবিতা' নিয়েই তাতে আলোচনা ও অনুশীলনের অবকাশ থাকা দরকার। 'উত্তরসূরি'তে তার প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি বলেই মনে হচ্ছে উত্তরসূরি এখন বাংলা কবিতার মুখপত্র হিসেবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি রচনার কথা উল্লেখ করি, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণু দে-র শব্দ সন্ধান', রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা কবিতা এবং মধুসূদন' এবং অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী'র 'উষা-পরিণয়' (পুথি-পরিচয়)। বিশ্ববাবু ও রবিবাবুর লেখা দুটির আস্বাদভঙ্গী আলাদা হলেও দুজনে একই লক্ষ্যে পৌছচ্ছেন—তাঁরা দুই শতকের দুজন প্রবল পাশ্চাত্ত্য-প্রবণ কবিকে বাংলা কাব্যের আবহমান পরম্পরার মধ্যে রূঢ়মূল করে দেখিয়েছেন। এর ফলে আমরা পুনর্বার বুঝতে পারি, একমাত্র পৌরাণিক ঈশ্বর ছাড়া এ সংসারে আর কেউ স্বয়ম্ভূ নয়। আর এই কারণেই অগ্নিবর্ণ বাবুর লেখাটি আমার দৃষ্টি টেনে নিয়েছে। এই লেখা আমাদের আর এক পরম্পরার সন্ধান দেয়। মধ্যযুগের বাংলা পুথিচিত্র সম্পর্কে এর আগে অল্পস্বল্প আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তা প্রায় সবই রাঢ়বঙ্গ বা পূর্বাঙ্গের পুথি নিয়ে। উত্তরবঙ্গের পুথিশিল্পীরাও যে এ ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, অগ্নিবর্ণবাবুর লেখায় তার পরিচয় পেয়ে উত্তরবঙ্গের সন্তান হিসেবে আমি মনে মনে গোপন সুখ অনুভব করছি। অগ্নিবর্ণবাবুর লেখা পড়ে মনে হলো তাঁর ভাণ্ডারে আরও অনেক মালমশলা মজুত আছে, কিন্তু স্থানাভাব বা সময়াভাবে (না কি আমারই মতো জড়তা-বোধে?) পুরোপুরি প্রকাশ করেন নি। সম্পাদক হিসাবে আপনার কাছে

আমার আবেদন, এই লেখককে আপনি আরও জায়গা দিন এবং উত্তরসূরির মাধ্যমে লেখকের কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আরও লিখুন।

যাই হোক অযাচিত ভাবে অনেক কথা বলে ফেললাম, ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে।

নির্মল দাস

১৮. ৭. ৮০

বাংলা বিভাগ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা ৫০

৫.

প্রিয় অরুণদা,

পত্রিকা হাতে এলো। কিন্তু মনের ভিতর থেকে আপনার আবেদনে সায় দিতে পারছি না। এটা কী সত্যিই গর্বের কথা নয় যে, বাংলা-কবিতা ৩০-এর থেকে সমস্ত পৃথিবীর কবিতা-চর্চার উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করতে পেরেছে? মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে যোগ্য পরিণতি দিচ্ছিলেন, তাঁরাও তো আধুনিক (তৎকালীন) বিশ্বের কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন মননের পদ্ধতি, শিক্ষা, নতুন নতুন মানবিক মূল্যবোধ। তারপর তিরিশের কবিরা (জীবনানন্দ সহ) আবার বিশ্বের দিকে নতুন ক'রে মুখ ফিরিয়েই বাংলা কবিতায় এক সর্বাঙ্গীন ব্যাপ্তি এনেছেন। এর আগে বাংলা-কবিতা তো শুধুই ভক্তি-রসের কবিতা, শুধুই গান ও কীর্তন। মননহীন বিশ্লেষণহীন, ব্যাপকতর জীবনের বোধহীন, জটিলতাহীন পদ মাত্র। খুবই সুন্দর নিশ্চয়, কিন্তু যথেষ্ট নয়। আজকের কবিদের কাজ (যেমন কোনো আধুনিক মানুষেরই নয়) নয় আত্মনিবেদন ও ভক্তির রসে ডুবে থাকা। তার কাজ সর্বব্যাপক : দেখা, বিশ্লেষণ করা, প্রতিবাদ করা, চিন্তাভাবনা করা, সত্যের মুখোমুখি হওয়া। পাপপুণ্যহীন তার জীবন এবং বেঁচে থাকা। তার আছে সারা বিশ্বের ভাবনা-চেতনার উত্তরাধিকার। কেউ কি মা বলে তরী ভাসাবে?

আশা করি, আপনার আবেদন পুনর্বিবেচনা করবেন। শ্রদ্ধা জানবেন।

১০. ৭. ৮০

ফ্ল্যাট RC/1, ODRC হাউজিং এস্টেট

কলিকাতা ৬৪

কালীকৃষ্ণ গুহ

৬.

মাননীয়, সম্পাদক
উত্তরস্বরি, সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

কবিতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত। আপনার সম্পাদিত বর্তমান সংখ্যাটি সুনাম ও দুর্নাম—উভয়েরই সম্মুখীন হয়েছে বলে আপনি জানালেন। পত্রিকাটি তখনই হাতে নিয়েছি।

আমি আগেই স্বীকার করেছি, কবিতার জ্ঞান আমার সামান্য; কিন্তু পত্রিকা সম্পাদকের প্রবন্ধের মূল বক্তব্য, যেটি প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হয়েছে, ঐটিই পত্রিকার মূল্যায়ন সম্পর্কে যথেষ্ট। শ্রীমধুসূদনের আপন মাতৃক্রোড়ে ফিরে আসার মত 'উত্তরস্বরি'র নবজাগ্রত মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানাই, অভিনন্দন করি, নবতর বিপ্লবসাধনাকে।

৫. ৭. ৮০ নমস্কারান্তে

গ্রন্থন বিভাগ শিবানী চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭.

'উত্তরস্বরি'—সম্পাদক সমীপেষু,

১০৫ ক্রমিক-সংখ্যক 'উত্তরস্বরি' হাতে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তন্ময়চিত্তে পাঠ ক'রে শেষ ক'রে ফেলেছি এবং ভেতরে ভেতরে যুগপৎ উৎফুল্ল ও উদ্দীপিত বোধ করছি। এ-সংখ্যা থেকে 'উত্তরস্বরি'-র অঙ্গসজ্জা ও বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন সম্পাদক হিসেবে আপনার সদাজাগ্রত পরীক্ষামনস্কতার পরিচায়ক। আলোচ্য সংখ্যাটি সম্পর্কে সাধারণভাবে জানাবার কিছু নেই, কেননা 'উত্তরস্বরি'র যে কোনো সংখ্যার মতোই বর্তমান সংখ্যাটিও একটি অসাধারণ সংখ্যা। তবু তন্নিষ্ঠ পাঠকের তাৎক্ষণিক মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় প্রচ্ছদপৃষ্ঠার সম্পাদকীয় আবেদন ও অন্তিম পৃষ্ঠার 'স্মৃতিতর্পণ' অংশে এবং এই দুই পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী কোনো-কোনো রচনায়, যার অন্তত কয়েকটি বিস্তারিত বিশ্লেষণের

অপেক্ষা রাখে। অরুণকুমার সরকারের স্মৃতিতে রচিত 'কবিতার ভাবনা' যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই আন্তরিক। অরুণকুমার সরকারের অপ্রকাশিত চিঠিটি কবির আন্তর-ভাবনার আবরণ-উন্মোচক। এবং সর্বোপরি, গ্রামবাংলায় অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবিদের কবিতার দ্বিতীয় মুদ্রণ 'কবিতা কবিতা' বিভাগটি বাংলা কাব্যে নবাগতদের পক্ষে প্রচণ্ডভাবে আশাব্যঞ্জক ও উদ্দীপক।

১০. ৮. ৮০ পরিমল চক্রবর্তী

৪৩৪ পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা ৩০

৮.

প্রিয় অরুণবাবু,

আপনাকে চিঠি লেখার সঙ্কল্প অনেকদিনের, আজ হাতে কিছুটা সময় পেয়েছি, এই সুযোগটুকু সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছি চিঠি লিখে। আলোচ্য বিষয় অরুণ ভট্টাচার্য কৃত অন্তরঙ্গ আলোচনা কবিতার ভাবনা (১১)। বেশ কয়েকবার পড়েছি 'উত্তরসূরি' ২৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (১০৪)। এমন রসসিক্ত মায়াভরা স্মৃতিকথা যার মধ্যে সাহিত্যের সমীক্ষাও রয়েছে সমান্তরালভাবে, আমি এর আগে পড়ি নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে লেখা অংশটুকু অনবদ্য; জুলাই, ১৯৬০ উত্তরসূরি বিশেষ সংখ্যায় কবির যে স্মৃতিচিত্রটি আপনি লিখেছিলেন সেটি আবার এখানে পড়তে পেরে খুবই উপকৃত হয়েছি। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে যথার্থ সমালোচনার জন্য আপনি সবচেয়ে উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন, আমি মনে করি। তাঁর মনের বিশেষ কতগুলো দিক আপনি খুব বেশী করেই জানতেন, নিরঞ্জন হালদার ও অন্যান্য রেনেশাঁস ক্লাবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও বটে। "বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর যে আকর্ষণ ছিল তা সচরাচর অন্য কবিদের মধ্যে দেখতে পাই নি।"—এবিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

'কবিতার ভাবনা' আলোচনার প্রথম অংশে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পর্কে মিছরীর মত মিষ্টি আপনার লেখা পড়তে পড়তে হঠাৎ ধাক্কা খেলাম যেখানে একটি গানের আসরে বোধ হয় (রামরিক ইনস্টিট্যুশনে) রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড বাজানো সুরু হতেই 'রবীন্দ্র কালচারের নামাবলী-জড়ানো তথাকথিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভদ্র ও ভদ্রাগণ হাসাহাসি শুরু করেন। চমকে ওঠার মত।

এমন ঘটনা এখানে সেখানে আরো ঘটেছে ও ঘটছে। বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতা, অত্যন্ত কাঁচা ভিত্তির ওপর বড় কিছু গড়ে তোলার হুজুগ, প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা এসব মিলে কোন্ অধঃপতনের দিকে আমাদের নিয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ জেনারেশন সম্পর্কে এখন নৈরাশ্য জন্মাচ্ছে। সিরিয়সনেস্-এর অভাবে জাতটা ডুবতে যাচ্ছে। আপনি এ্যানেক্ডোটটি এই আলোচনায় উল্লেখ করে খুব উপকার করেছেন, এর মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। চিন্তা করবার কিছু লোক এখনো আছেন, নইলে সমাজটা আছে বা চলছে কি করে।

৬. ৭. ৮০ ইতি

২৭৬ লেক গার্ডেনস্, কলকাতা ৪৫ অমূল্য চক্রবর্তী

৭.

'উত্তরসূরি'-র এ সংখ্যাটি শুধু যে আয়তনেই বিরাট, তা নয়—আয়োজনেও বিশাল। এতো কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, গুচ্ছ-কবিতা,—এ-তো একদিনে পড়ে ওঠার ব্যাপার নয়! কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্বি-মত থাকলেও, সামগ্রিকভাবে আপনার সম্পাদকীয় বক্তব্য আমার ভালো লেগেছে। ভিন্নমত তিনটি ক্ষেত্রে: ১. কবিতাকে অবিশ্যি দেশজ ভিত (base)-এ দাঁড়াতে হবে, কিন্তু রূপারোপ (superstructure)-এর ব্যাপারে তার আন্তর্জাতিক হতে বাধা কোথায়? ২. কবিতার পাঠক হবার দাবি যেমন একজন আলোকপ্রাপ্ত কাব্যবিশারদের আছে, তেমি একজন শ্রমিক, প্রযুক্তিবিদ, ডিপ্লোম্যাট, চিকিৎসক অথবা নাবিকেরও রয়েছে; সে হিসেবে কবিতার থিমেটিক বা স্ট্রাক্চার্যাল বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। ৩. যুগ ও সমাজগত বিবর্তনের সাথে সাথে কবিতার চরিত্রগত পরিবর্তন (দৃষ্টিভংগীর ক্ষেত্রে) ঘটেছে কিন্তু কবি যেমন নিছক টাইম-সারভার নন, তেমি চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতার বার্থ-রাইটও তার নেই। সততা এবং শুভ বোধের সাথে সাথে এখানে এক অলিখিত সামাজিক দায়বদ্ধতাও জড়িত রয়েছে। সশ্রদ্ধ প্রীতির সংগে।

২৩. ৭. ৮০ ঊর্ধেন্দু দাশ

প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্যাম্পাস

জোড়হাট, আসাম

১০.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কাগজ খুব ভালো হয়েছে। শ্রীরমেন্দ্রকুমারেরও (আচার্যচৌধুরী) সেই মত। তবে উত্তরসূরির ম্যানিফেস্টো (?) সম্বন্ধে কিছু বলার আছে আমার। আমরা বর্জন করব না মেলাবো দেশজ ও বিদেশী ঐতিহ্যকে ? নেহাৎ অনুকরণের বিরুদ্ধে বলেন নি এসব কথা নিশ্চয়ই ? তাহ'লে ব্যাপারটা তো খুবই অব্‌ভিয়াস হয়ে যায়। শক্তিমান কবিদের কাছে পশ্চিমী সতীর্থরা তো এখন ঘরের লোক। সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা করার বাসনা রইল। স্নেহার্থী

২৭. ৭. ৮০ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজী বিভাগ

চন্দননগর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ

১১.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরুণদা,

১০৫ সংখ্যা উত্তরসূরিতে কবিতার জন্য নতুন ১৯৮০ সম্পাদকীয় আবেদন পড়ে উদ্দীপিত হলাম। বিবেকবান বিচক্ষণ আপনার উপদেশ তরুণ কবিতা রচনা চর্চাকারীদের কতটা প্রণিধানযোগ্য হবে জানি না, আত্মজিজ্ঞাসার একটা সূত্রপাত যদি করে দেয় সেও তো অনেকখানি।

মধুসূদনের পরধন-লোভে-মত্ত অনুতাপী চতুর্দশপদীর সমটুকু যেন ফিরে আসছে আপনার কণ্ঠে, কিন্তু মাতৃভাষার পুরোনো ধনের দিকে আপনি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে কি এখন আর গুপ্তধনই আছে, সে তো লুপ্তধন। আপনি লিখেছেন ১৯৩০ থেকে ১৯৮০ এই পঞ্চাশ বছর আমরা সাগরপারে তাকিয়ে আছি। ১৯৩০ তো নয়, ১৮৩০—না হোক দেড়শ বছর।[১] নতুন সন্ততিদের যে বেশ-ভাষা-আচার যে ভাবনা-লক্ষ্য তাদের সামনে, তারা কি চিনতে পারবে, গ্রহণ করতে পারবে যদি লুপ্ত রত্নোদ্ধারই কেউ করতে বসেন। বড়জোর গ্রাহক হয়ে মাসে মাসে নিয়ে গিয়ে ঘর সাজানোর উৎসাহ হতে পারে—সে এক ধরনের আত্মসচেতনতা বটে, কিন্তু মর্মান্তিক লাগে। আসলে বিবর্তনের এই ভবিতব্যটুকু মেনে নিলেই হয়তো বা স্বস্তি। পুরোনো আদি মানুষদের

আমাদের ধারার উন্নতির সন্নিকর্ষে আনতে গিয়ে কতবার দেখা গেল সেই অবহেলার ভোগ করার চাইতে তারা আত্মনিপাত বরণীয় মেনেছে। এখনো তো দেখছি আকছারই। বিষ্ণু দে তো পুরোনো কবিতার স্মৃতি তাঁর লেখায় অনেক খুঁড়ে এনেছেন, জানি না কেমন লাগে—সৌখিনতার চেয়ে অন্যরকম কিনা। যদি বলেন, চারপাশে যে ইমারত খাড়া করছি, আমরা খাপ খাচ্ছি না তার ভেতর, যদি বলেন যেমন আমাদের রক্তের সংস্কার—গরিব একটুকরো মেটে ঘরের পাশে ঝোপঝাপের পাশে গিয়ে বসে কবি-টবি আলগা করে স্বাভাবিক হই একটা দণ্ড—জায়গাটুকুর আঁচ জানতে পারলেই তো টি টি পড়ে যাবে—আগাম চাঁদা ডাকা ওনারশিপ ফ্ল্যাট বাড়ির বিজ্ঞাপনে খবরকাগজের পাতা ভর্তি হয়ে উঠবে। তা ছাড়া, সেই জায়গা, সেই গাঁদেশ এদেশে আছে আর? মুক্তির দশক সত্তরের দশকের আগে, ষাটের শেষ দিয়েও মানুষের মুখে যে বিশ্বাস, দারিদ্র্যশ্রী চোখে পড়েছে, কোথায় গেল? দুঃস্থ হতদরিদ্র কুটোপাতাছাওয়া যে গাঁকে বিভূতিভূষণ ভালোবাসার লাবণ্য দিয়ে ভরে তুলেছিলেন, জীবনানন্দ যাকে দিয়েছেন কবিতার অমরতা—সে তো আমাদের মনের ইচ্ছে ধার করেই। পুরোনো জিনিশপত্র তার কোথাও যদি ঈষৎ সম্পদ ভাববার কিছু থাকে সে জানছি বিদেশী ট্যুরিস্টকে দেখাবার, মিউজিয়াম ভেঙে পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশের মিউজিয়ামে—কৃত্তিবাসের কাছাকাছি আসল লেখাটা পড়তেও তো হ্যালহেডের নিয়ে যাওয়া পুঁথি ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে জেরক্স্ করে আনতে হয়। মহাজন পদাবলী নিধুবাবুর গান এখন সোফিস্টিকেশন দেখাতে হয়তো বা কেউ কেউ চর্চা করেন, করবেনও, কিন্তু তার ভেতরে বসে সুখনিশ্বাস নেবে বাঙালি সন্তান! হালে পানি না পাওয়া, বাইশ বাজারে অকৃতার্থ, নিষ্কিঞ্চন-না-শিক্ষিত আমার মতন কেউ যদি হন পেতে পারেন বা, জানি না। তেমনি নির্বুদ্ধি তো এত বছর ধরে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিত্য সঙ্গ করছি, চোখে পড়ে না।

অরুণদা, আপনি নিশ্চয় নতুন ফ্যাশন প্রবর্তন করতে চাইছেন না, যা গভীর অনুতাপে বুঝেছেন তাই বলেছেন। এত দিন ব্যর্থ চাতুরির শিক্ষাতে কাল কাটল, প্রাণের লেখা তো কোথাও পড়তে পেলাম না। এর সঙ্গে যোগ করছে [illegible] 'সেই পুরোনো লেখার পরে' কিন্তু সে যে জানে, জানে। তা ছাড়া

কাউকে অনুজ্ঞা করলেই বোঝানো যাবে। লেখা কি জীবন পদ্ধতির বাইরেকার? আপনি লেখা হাতে নিয়ে বলুন, এই লেখা ভালো। ছেলে বুঝবে, শেক্‌সপীয়র দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ মহাজন পদাবলী ভালো। এই নিশ্চয় আপনার বলবার নয়, প্রত্যাশারও নয়। আপনি বিদেশী সাহিত্যের ছাত্র, হাজারটা দৃষ্টান্ত টেনে বলবেন কত আন্দোলন পটবদল পুনরুজ্জীবন ঘটে গেছে নানা দেশে নিজের দেশের জাতের পুরোনো লেখা নতুন চোখে পড়ে, তার আগে না দেখতে-পাওয়া প্রাণ-আবেগ নতুন করে রক্তে স্পন্দিত করে তুলে। কিন্তু আপনি তো জানেন —সেই শিক্ষা কি শিখতে পেয়েছি নতুন শিক্ষা সূচীর বশবর্তী হয়ে। আর পাঁচটা উন্নয়নশীল দেশের মতন আমরা শেখবার গোড়ার পাঠ থেকে শিখেছি নিজের জাতজ্ঞাত, নিজের পুরোনো ছায়া, নিজের পুরোনো পোষাকটাকে অবধি ঘেন্না করতে, এখন তাকে খুঁজে মিলবে আর? তাকে চিনতে পারব সহজ বলে? মুক্তি আশ্রয় আরাম আনন্দ—সত্যি সত্যি কিছু বোধ করতে পারবো তার ভেতর?

সাত কথার মধ্যে এক কথা। প্রায় বছর দশ আগে একটা সামান্য লেখা আমি লিখেছিলুম 'পুরোনো বাঙলা কবিতা ও আধুনিক কাল' বলে; একআধ-জনেরও তা চোখে পড়ে নি, বিশ্বাস হয় না। ঈষৎ তথ্য ঈষৎ মনস্তাপ দুইই তো ছিল, তবে কি গদ্য-লেখা পত্র সৌকর্যের বা গ্রন্থ সৌকর্যের নিছক-লেখা বলেই নেওয়া এখন চল? হয়তো ভালো করে লিখতে পারি নি। সম্ভব। পুরোনো কবিতার একটা সংকলনও করেছিলাম। আমার দুঃখ-বিশ্বাস—যা ভেবেছিলাম আমার মতন আরো আছে কারোর কারোর—সেই ছিল আমার খোঁজ-বাতি। ভেবেছিলাম সাজগোছ করা পাণ্ডিত্যের বাইরে সহজ সত্যেরও একটা কোথাও জায়গা নিশ্চয় আছে—আমাদের এইখানেও। এক যুগ ধরে বারো হাতে ধর্ষিত হয়ে সে আমার ফেলা-কাগজের চুবড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে।

আপনার লেখা পড়ে আমার নির্বুদ্ধি হতাশার, প্রত্যাহারের সুখটুকু একটুখানি ফিরে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। একদমে এতটা তাই অনায়াসে লিখে ফেলতে পারলাম। নিজের কথাই তো কত বললাম সব সংবরণ আলগা করে। আশা করি, প্রগল্‌ভতার জন্য মার্জনা করবেন।

একটা কথা কিন্তু স্বীকার করতে বাধছে। আপনি লিখেছেন, 'কবিতাকে

হতে হবে কেবল সহজ স্ফটিকস্বচ্ছ হৃদয়বান, কেবল তাই ? এবারেই একটি কবিতায় আপনি ছেপেছেন

গোলাপফুলের গায়ে
কতো জটিলতা

এইটুকু আছে বলেই না এত টান ! এই জটিলতাটুকু জমে না উঠলে গোলাপ কি গোলাপ হয়, কবিতা কবিতা ?

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩. ৭. ৮১

বাংলা বিভাগ

গোয়েঙ্কা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ

[১. শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীঅরুণ মিত্রও মৌখিক আলোচনায় আমাকে এবারকার আবেদন সম্পর্কে এই তারিখটিই জানিয়েছেন। : অরুণ ভট্টাচার্য]

১২.

অরুণদা,

নতুন কবিদের উদ্দেশ্যে লেখা আপনার প্রবন্ধের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। অরুণকুমার সরকারের চিঠিটি খুবই মূল্যবান।

১৬. ৭. ৮০

৫৩ বিধান পল্লী, কলকাতা ৩২ আশিস সান্যাল

১৩.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরুণদা, উত্তরস্মৃরির বর্তমান সংখ্যাটি এতো ভালো হয়েছে যে কি বলব। প্রাচীন কবিতার সংযোজন যেমন অভিনব, সংকলন তেমনি অসাধারণ : পুরনো হয় চিরনূতন আপনি তা আবার দেখালেন। সবচেয়ে আমাকে বিস্মিত করেছে তরুণতর কবিদের কবিতাগুলি। সবচেয়ে 'গোলাপ কাঠের বৌ' আমাকে আকৃষ্ট করেছে, আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি। এছাড়া বিভিন্ন আলোচনা অরুণ সরকারকে নিয়ে, কবিতার ভাবনা—বিশেষ করে কবির কবিতাসহ আপনার স্মৃতিচারণের বেদনা,—আমাকে ভীষণভাবে বিদ্ধ করেছে। গুচ্ছ কবিতার সঙ্গে

পরিচিতি নতুনত্বের আর এক চিত্র। সব মিলিয়ে জমজমাট, দারুণ। কবিতা যে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে তার অন্যতম কারণ উত্তরসূরি এবং আপনার প্রচেষ্টা। আবার গভীর অভিনন্দন গ্রহণ করুণ।

আপনার স্নেহধন্য

১৪. ৭. ৮০ জগৎ লাহা

বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

১৪.

অরুণদা,

উত্তরসূরি ১০৫ পেয়েছি, ধন্যবাদ। বৈচিত্র্যের জন্য উত্তরসূরির একটা আলাদা মর্যাদা তৈরি হয়েছে। এই সংখ্যাটি সেই ধারার সার্থক অনুসরণ।

প্রচ্ছদে আপনার আবেদন অভিনব। বাংলাদেশের জল মাটি আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড খামচে রয়েছে, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে সেই রক্তের দাগ গূঢ় সঞ্চারী। শত অস্থিরতায় আমরা আমাদের রক্তস্পন্দনকে ভুলব কি করে? তবু আপনার এই আবেদনের প্রয়োজন ছিল।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা— উত্তম দাস

১৪. ৭. ৮০

বারুইপুর/২৪পরগণা

১৫.

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য,

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

'উত্তরসূরি' বরাবর আমার কাছে মর্যাদার, আকর্ষণের। তার সাম্প্রতিক 'নতুন কবিতা' বিভাগটি সেই আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে।

আর বর্তমান (১০৫) সংখ্যার 'কবিতার জন্য আবেদন, ১৯৮০'—এই নিবন্ধটি নানান দিক থেকে বিশিষ্ট। অবশ্যই, আমি আপনার সব অভিমতের সংগে একমত হতে পারছি না। কিন্তু নিহিত অভিপ্রায়টি অভিনব ও মূল্যবান। বলতে ইচ্ছে করে, চমকপ্রদ।

এমন করে ইদানীং কেউ কথা বলেন নি। অথবা সেই দুঃসাহস কারু নেই। 'কবিতা আর কারুর গোলাম নয়', কোন নীতির বা দাদার চামচা নয়, একথা এদেশে বড় শুনি নি। বরং উল্টোটাই শুনে আসছি—কবিতা হবে অমুকের এজেন্ট···আপনার একথা খুব মানি, 'কবিতা মিস্টিক ভাবনাসঞ্জাত, কবিতার রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত'। 'মহৎ কবিতার মধ্যে নিহিত আছে মন্ত্রশক্তি। তার কাজ চৈতন্যের উন্মোচন।'

কবিতা যে আপনার কাছে সখের জিনিষ নয়, পার্টটাইম ব্যবসা নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। এবং জানতে পারি—একটি নিবেদনের সুর আপনার বিশ্বাসকে কী প্রসন্নতায় আত্মমুখী ও স্বকীয় করতে চায়।

১০. ৭. ৮০ স্নেহধন্য

পয়লাডাঙ্গা, বারুইপুর, ৭৪৩ ৩০২ পরেশ মণ্ডল

১৬.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'উত্তরসূরি'র সাম্প্রতিক সংখ্যাটি (১০৫) পেয়ে খুব ভাল লাগল। তার কারণ সংখ্যাটির বিষয়-বৈচিত্র্য। অবশ্য ইদানীং লক্ষ্য করছি, আপনার পত্রিকার বিগত কয়েক সংখ্যার প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলি সাহিত্য ও সংস্কৃতির মৌল প্রশ্ন সম্পর্কে সজাগ পাঠককে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করে। সে সম্পর্কে লিখব লিখব করে শেষ পর্যন্ত আর লেখা হ'য়ে ওঠে নি।

কিন্তু আপনার কবিতা-বিষয়ক আবেদন-এর জন্য সাম্প্রতিক সংখ্যাটি এমন জরুরী যে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করবে। বিষয়টি সম্ভবতঃ অনেকেরই ইতিপূর্বে মনে হয়েছে। কিন্তু সাহসী উচ্চারণে ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায় আপনার আগে এমনভাবে কেউ বলেন নি। তার চেয়েও বড় কথা (যা কবিতা সম্পর্কে আপনার বক্তব্যের পরিপূরক) রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরে বিশেষ বিশেষ কয়েকজন মাত্রই কবিতা লিখেছেন (আর কেউই লিখতে পারেন নি) এই বহুঘোষিত ও বহু-উচ্চারিত দম্ভোক্তির পুনর্মূল্যায়নও আজ একান্ত জরুরী।

সাহিত্যের আলোচনায় দেখা যায়, কিছু কবিকে সুপরিকল্পিতভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেবার কুশলী চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে দিনের পর দিন। আপনি নিজে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন—সুতরাং এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সেই সাহিত্যের ইতিহাসেও এ ধরণের ঘটনার নজির রয়েছে অজস্র। এ প্রসঙ্গে বাংলা কবিতার আসরে কিছু কবিকে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা চলেছে, সেই বহুঘোষিত তিরিশের যুগ থেকেই। সেই মহান ঐতিহ্যের (?) পতাকা ধারণ করেই এ যুগে কবি ও কবিতার মূল্যায়নের জের এখনো চলেছে পুরোদমে!

আপনার স্পষ্ট ও নির্ভীক আলোচনা, বাংলা কবিতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগ্‌দর্শন সূচিত করবে কি না, তা আগামীকালের ইতিহাস প্রমাণ করবে।

এ সংখ্যায় আপনার কবিতার ভাবনা শীর্ষক আলোচনাটি স্মৃতিচারণের অতিরিক্ত এক অর্থ বহন করে; এবং তা কবিতা-জীবন-মৃত্যু, তথা অস্তিত্বের গভীরে আমাদের স্পর্শ করে।

৩৬বি, বকুল বাগান রোড
ক'লকাতা-৭০০০২৫ বিজয়কুমার দত্ত
১৯. ৭. ৮০

সাম্প্রতিক গ্রন্থপ্রকাশ

কবিতা এবং শিল্পচর্চা

Tennyson and His Publishers.—by June Steffensen Hagen. 266p. Illus. Ref. Bibl. Index. Price £ 12. Macmillan, 1979.

✓African Poetry in English.—by S. H. Burton. & C. J. H. Chacksfield. 168 p. Bibl. Price £ 5·95 £ 1·95 Pbk, Macmillan 1980.

Twelve Poems.—Sylvia Townsend Warner. 28 p. Price £ 3·50, Chatto & Windus. 1980.

✓Sonnets from the Spanish,—by Morrison, R. H. (ed. & tr.) 50 p. Rs. 50·00 (Hard bound) Rs. 30·00 (Ordinary) Writers' Workshop. Calcutta, 1980

✓Lyrics and Idylls.—M. M. Dileep. 44 p. Rs. 25·00 (Hard bound) Rs. 10·00 (Ordinary) Writers' Workshop. 1979.

Poets of the Tamil Anthologies. Ancient Poems of love and war,—by George L. Hart III. p. 212, Princeton University Press. 1979. Price not stated. (A selection from the Tamil Sangam Classics)

✓W. H. Auden : The Poet ; by R. N. Srivastava. p. 144, Doaba House. 1979. Rs. 14·00.

✓Sap-Wood : Dyson, Ketaki Kushari. 64 p. Rs. 50·00 (H. B.) Rs. 15·00 (Ordinary) Writers' Workshop. Calcutta, 1978. translated from Bengali by the poet

✓T. S. Eliot's Theory of Poetry by Rajnath. p p. 208, Arnold Heinemann, Rs. 55·00, 1980.

✓ Time and Poetry in Eliot's Four Quartets.—by Rajendra Verma. XI, 201 P. Rs. 55·00. Macmillan. Delhi, 1979.

✓ The Fifth. (poems)—Gopal Honnalgere. 49 p. Rs. 6·00 Hyderabad, Bromstick Publications, 1980.

✓ British Poetry Since 1979. A Critical Survey.—by Schmidt, Michael & Jones, Peter. (eds) £ 9.95. Carcanet Press. 1980 (Essays by Critics and Poets identifying current trends and tendencies

Thomas Gray : His Life and Works.—by Sells, A. L. Lytton. Allen & Unwin. Illus. £ 12·95. 1980. (Biography of the 18th Century English Poet.)

Conversations with Menuhin.—Robin Daniels. 192 p. Illus. £ 7·95. Macdonald & Janes, 1979.

The Story of Modern Art.—by Lynton, N. Price £ 7·95. (pbk.) Price £ 13·95. Phaidon. (over 300 Illus. 85 in colour) (Analysis of continuity and change in art from 1900.)

✓ An Approach to Indian Art,—Niharranjan Ray, Panjab University, Chandigarh. Rs. 40·00

Aesthetics (An anthology) : ed. Harold Osborne, Oxford University Press.

রীণা রায়

কবিতা পড়ুন:

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র :

তবুও এখানে এক আরণ্যক সন্ধ্যার তিমিরে
শান্তি নামে পাহাড়ে পাহাড়ে।
তারই অনুবাদে যেন পৃথিবীর ও প্রান্তেও নেমে পড়ে ঘুম।
শুধু জ্বলে বনের আগুন এক অন্ধকার মসৃণ শরীর—
শিকারী চিতার স্তব্ধ চোখের গভীর
পত্র-ঝরা রাত্রির ফাল্গুন ॥

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় :

থেমে গেছে অন্ধ ঝড়, শান্ত হল গ্রহ স্বস্ত্যয়নে,
হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিছে তবু ধরিত্রীর শঙ্কায় আহত।
তুমি যেন মাতরিশ্বা, অন্তরীক্ষে আমার জীবনে
কামনার বনস্পতি মুহুর্মুহু নাড অবিরত।
প্রশান্তি দিয়েছে যেন হৃদয়ের দীর্ঘ আশীর্বাদ।

দিনেশ দাস :

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো!
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে!

সমর সেন :

অনেক অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রির নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপর ঝরুক মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ

পুরোনো কলকাতার সঙ্গে যে-নামটি অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে তা হচ্ছে ভীমচন্দ্র নাগ। একসময়ে বহুবাজার বা বউবাজার অঞ্চলকে বনেদী মনে করা হ'ত। ভীমচন্দ্র নাগ সেই প্রাচীন উত্তরাধিকারকে এখনো ধরে রেখেছে।

মিষ্টান্ন শিল্পে অগ্রণী ভীমচন্দ্র নাগ তার ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি।

জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য

যত দিন যাচ্ছে বাজারে জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করাই এখন দুরূহ কাজ। প্রতিদিন সব কিছুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই তো আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এর কি কোনই প্রতিকার নেই ?

খাদ্যশস্য, চিনি, তেল, কেরোসিন, ডিজেল, সার, কয়লা, কাপড় ইত্যাদি ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দিয়ে যেগুলি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা কি একেবারেই সম্ভব নয় ? আমরা মনে করি সম্ভব। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দায়িত্ব নিতে পারেন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করতে পারেন। কারণ রাজ্য সরকারের হাতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করার ক্ষমতা নেই—এমনকি কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া অন্য রাজ্য থেকে তাঁরা কোন কিছু কিনতেও পারেন না। কাজেই সারা দেশ জুড়ে এ ধরণের বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের। একমাত্র তাঁরাই দেশের যেখানে যে জিনিস পাওয়া যায় কিনে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ এর জন্যে যে বিরাট সম্পদ ও বিশাল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন—সে সবই তো তাঁদের হাতেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এ দায়িত্ব পালন করে রাজ্যে রাজ্যে জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, রাজ্য সরকারগুলির তখন দায়িত্ব হবে সেইসব জিনিস সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একমাত্র এইভাবেই মজুতদার মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ১৫৫৭।৮০

ওরা চিরকাল

টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,

ওরা মাঠে মাঠে

বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—

ওরা কাজ করে

নগরে প্রান্তরে।...

ওরা কাজ করে

দেশে দেশান্তরে,

গোপাল ঘোষ : একটি স্কেচ ॥ শুরুতে

সম্পাদনা : অরুণ ভট্টাচার্য । ২বি-৮ কে. সি. ঘোষ রোড, কলকাতা ৫০ । ৫২-২৪৫২

শিল্পী : গোপাল ঘোষ

প্রভাত গুহ-র সৌজন্যে

অন্তরঙ্গ অনুভবে তিন কবি

ক. অতুলপ্রসাদ সেন

১.

কবি অতুলপ্রসাদ সেনকে যে আমরা ভুলতে বসেছি রেডিও মারফৎ প্রচারিত গুটি কয় গান ছাড়া, এ আমাদের বাঙালি জীবনের পরম দুর্ভাগ্যের ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। অথচ অতুলপ্রসাদের মতো একজন সার্থকজন্মা মানুষকে ভুলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে বলে তো ভুলেও মনে হয় না; তবু, তাঁকে যে আমরা ভুলতে বসেছি এ-সম্পর্কে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। আজ আমরা যাঁদের স্মৃতির প্রতি যত্নশীল হয়েছি এবং যাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে মাতামাতি পর্যন্ত করছি, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের দান তাঁদের কারো চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। বাস্তবিক, অতুলপ্রসাদের স্মৃতির প্রতি আমাদের এই শীতল ঔদাসীন্য অনেক সময়ই অন্তরে দুঃখের সঞ্চার করে, স্মরণে আনে গবেষক-সাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অমোঘ উচ্চারণ 'বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।'

অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি এখনো অনেকাংশেই সীমিত; আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে বহু শত মাইল দূরে সুদূর লক্ষ্ণৌ শহরে অতুলপ্রসাদ সেন নামে একজন কবি ও গায়ক একদা বাস করতেন কিংবা তিনি ছিলেন সেখানকার একজন বিখ্যাত আইনজীবী, আমাদের অধিকাংশের কাছেই তো এইটুকুই তাঁর পরিচিতি। আর তাঁর সৃষ্টির স্মৃতি হিসেবে রয়েছে কোনো-কোনো স্কুলপাঠ্য শিশুসেব্য পুস্তকে কিছু-কিছু কবিতা এবং গ্রামোফোন-রেকর্ডে গুটিকতক গান। তাঁর সমস্ত গানের কোনো নির্ভরযোগ্য সংকলন কিংবা তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ আজ আর সহজলভ্য নয়, হয়তো বিলুপ্তপ্রায়। তাঁর কোনো প্রামাণ্য জীবনী নেই, নেই তাঁর নামে কোনো স্মৃতি-প্রতীক, পালিত হয় না সামান্য সমারোহেও তাঁর আবির্ভাব কিংবা তিরোভাব দিবস; থাকার মধ্যে একমাত্র আছে তাঁর নামে একটি সরণী, তা-ও বাংলাদেশে নয়, বাংলার বহুদূরে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে।

কিন্তু এইটুকুই তো তাঁর শেষ পরিচিতি নয় কিংবা এটাই তো তাঁর স্মৃতি-রক্ষার ব্যাপারে আমাদের শেষ দায়িত্ব বা কর্তব্য নয়। আইন-আদালতে, দেশ সেবায়, দানেধ্যানে অথবা অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অতৃপ্ত ও বহুমুখী জীবনের ছোটোবড়ো কতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সে-খবর আমরা ক'জন রাখি? ক'জন জানি লক্ষ্ণৌ শহরের ঐতিহাসিক মোঘল প্রাসাদের আদালত কক্ষে কতো বাদী-বিবাদী অতুলপ্রসাদের কাছে একদিন ছুটে এসেছিলেন সুবিচারের আশায়, নিজেদের বিপদ থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে! সেদিকের সেই প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার তাঁর অতুলনীয় বাকচাতুর্যে ও আইনের সুগভীর পাণ্ডিত্যে তাঁর সমসাময়িক আপামর আইনজীবীকেই পেছনে ফেলেছিলেন অতি সহজে। আর সেই আইনের আঙিনায় কতো অভিজ্ঞতাই না তিনি অর্জন করেছেন! কে জানে, হয়তো সে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতাও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলে রসসিঞ্চন করেছিলো। কিন্তু তাঁর জীবনের অতীতে-বিলুপ্ত-হওয়া সেই সব দিনগুলির বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার কাহিনী বাংলা সাহিত্যের কোনো অলক্ষ্য প্রকোষ্ঠেও স্থান পেয়েছে ব'লে জানি না; এবং তার চেয়েও ঢের পরিতাপের বিষয়, আমরা, এই বাংলাদেশে, তাঁর যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে এখনো নির্মমভাবে উদাসীন হয়ে রয়েছি।

২.

অতুলপ্রসাদ তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের একটি বৃহৎ অংশ কাটিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে; কাজেই তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন প্রবাসী বাঙালি। কিন্তু তাঁর বড়ো আদরের বাংলাদেশে, বাঙালি জাতি আর বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ছিলো অকৃত্রিম প্রাণের টান। প্রবাস-জীবন তাঁর বঙ্গপ্রীতির পথে এতোটুকু বাধাও সৃষ্টি করতে পারে নি, বরং আরো গভীর করেছে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর প্রীতিবোধকে। কালক্রমে, একজন প্রবাসী হওয়া সত্ত্বেও এই শহরের সমাজজীবনের সর্ববিধ স্তরে নিজেকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কাব্যে, সঙ্গীতে, ধনে, মানে ও অন্যান্য বহুবিধ দিকে। লক্ষ্ণৌ শহরের এই বিখ্যাত মানুষটির গানের প্লাবনে এককালে সমগ্র উত্তরপ্রদেশ প্লাবিত হবার উপক্রম হয়েছিলো। তাঁর গানের শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণে সুরের আগুন তিনি যে কতোখানি তীব্রতায় জালিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, এর

থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। একজন সুদক্ষ আইনজীবী হিসেবে তিনি ছিলেন সব ক'টি দিক দিয়েই প্রথম শ্রেণীর—আইনশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যে, আইনবিদ্ হিসেবে সুদূরব্যাপ্ত খ্যাতিতে এবং এই ব্যবসায়ের পসারে ও প্রভূত অর্থোপার্জনে। এ-প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে একটি কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়; আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, এমন সফল পুরুষের সংখ্যা আমাদের দেশে অঙ্গুলীমেয় নয়, কিন্তু এই ব্যবসাসূত্রে উপার্জিত অর্থকে বিবিধ জনহিতকর কাজে অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করেছেন, নিয়োজিত করার মতো মহানুভবতা দেখিয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা, (দু'এক জনের বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া) অদ্যাবধি নেহাৎই নগণ্য এবং অতুলপ্রসাদ সেই দু'একটি বিরল ব্যতিক্রমেরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর তাঁর দানশীলতা? তারই কি অজস্র তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে একদা-ঐশ্বর্যশালিনী অধুনা-ঐশ্বর্যহীনা আমাদের এই দেশে? নিজের যথাসর্বস্ব দান ক'রে একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হবার এমন মহৎ উদাহরণ আমাদের দেশে বাস্তবিকই বিরল। দানের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সার্থকভাবে তুলনা করা চলে এমন বাঙালি আর মাত্র একজনই ছিলেন যাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম 'চিত্তরঞ্জন' আর আপামর দেশবাসীপ্রদত্ত বিশেষণ-মুকুট 'দেশবন্ধু'। না, একটু ভুল হ'লো সত্যকথনে; এমন বাঙালি আরো একজন ছিলেন আমাদের দেশে, তিনি বীরসিংহের সিংহশিশু ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর', ঈশ্বরচন্দ্র 'করুণাসাগর', ঈশ্বরচন্দ্র 'দানসাগর'। আইন ব্যবসায়ে অতুলপ্রসাদ একদিকে যেমন উপার্জন করেছেন প্রচুর, তেমনি অন্যদিকে দানও করেছেন খ্যাতি-প্রাপ্তি-প্রচার-বিচার নিরপেক্ষভাবে। তাঁর দানের অনেক অজ্ঞাত কাহিনী লক্ষ্ণৌ শহরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, এমন কি শেষ জীবনে তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট সম্পত্তি নিজস্ব বসতবাড়ীটি পর্যন্ত তিনি দান ক'রে গেছেন। অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য দিকের কথা বাদ দিলেও তাঁর চরিত্রের শুধুমাত্র এই বিশেষ দিকটিই পরার্থ-পরতার পরাকাষ্ঠা হিসেবে আমাদের জাতীয় জীবনে পরিগণিত হওয়া উচিত।

তাঁর প্রবাস জীবনের লীলাভূমি লক্ষ্ণৌ শহর আর সেই শহরের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আশ্রয় করেই অতুলপ্রসাদের সামাজিক সত্তা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো; সেই শহরের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে, নানা সামাজিক

ব্যাপারে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন গভীরভাবে। সেখানে এখনো যে বাঙালি-চক্র বা 'বেঙ্গলী ক্লাব' আছে সেটি তাঁর উৎসাহেই একদা স্থাপিত হয়েছিলো সুদূর অতীতে, তা ছাড়া তখনকার দিনে লক্ষ্ণৌতে 'যুবক সমিতি' নামে আরো একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও ছিলো। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ লক্ষ্য করেছিলেন যে লক্ষ্ণৌ শহরের প্রবাসী বাঙালিদের এ-দু'টি সংস্থা নিজেদের সীমিত শক্তিকে অনর্থক অপব্যয় করছিলো পরস্পর সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন ক'রে তুলছিলো পারস্পরিক মিত্রতার পরিবর্তে অহেতুক বৈরিতায়। তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রবাসী বাঙালিদের এ-দু'টি সংস্থাকে এক হ'তে হবে, ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান হ'তে হবে। সেই কারণেই উনিশ শ' উনত্রিশ সালে মূলত তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পরস্পর বিবাদমান এ-দু'টি সংস্থা সংযুক্ত হ'য়ে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভাবতে আনন্দ পাই যে আজ এই মিলিত প্রতিষ্ঠানটিই লক্ষ্ণৌর প্রবাসী বাঙালি সমাজের সর্বপ্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হ'তে পেরেছে, তৃপ্তি বিধান করতে পেরেছে তাঁর অন্তরলালিত অপূর্ণ ইচ্ছার। আরো দৃষ্টান্ত আছে তাঁর সহৃদয় সামাজিকতার। লক্ষ্ণৌ শহরের অন্যতম প্রধান সংগী 'হিউয়েট রোড'-এর 'গোপাল নিকেতন'-নামক ভবনে বর্তমানে যে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার এককণা জমিও কেনা সম্ভব হ'তো না যদি এ-ব্যাপারে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে না আসতেন। কিন্তু এ-ও যথেষ্ট নয়; জমি সংগ্রহ করেই তিনি তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে বলে ভাবতে পারলেন না কিছুতেই যতোদিন পর্যন্ত না তিনি সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এই সেবাশ্রমের 'লাইব্রেরী' ও 'ডিস্পেন্সারী'র তিনখানি সুবৃহৎ কক্ষ নির্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন। এমনই ছিলো আমাদের অতুলপ্রসাদের বিপুল দানশীলতা, এমনই ছিলো তাঁর উদার, ব্যাপ্ত ও সহৃদয় সামাজিক সচেতনতা।

৩.

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন অতি চমৎকার লোক। ভারী অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি; নিজে খেতে যতো না ভালোবাসতেন, অন্যকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন তার চেয়ে অনেক বেশী! যেমন রসিক ছিলেন, স্বভাব ছিলো তেমনি লাজুক আর মনটি ছিলো শিশুর মতোই সরল ও

অমায়িক। স্রেফ হাসি ও গল্পের সাহায্যে আসর জমাতে তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই অদ্বিতীয়। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ফিটফাট থাকতেন, কথা বলতেন কম, আর ছিলেন (যা তাঁর কথাবার্তাকে আরো মাধুর্যমণ্ডিত ক'রে তুলতো) সামান্য একটু তোতলা। উর্দুভাষায় অতি চমৎকার দখল ছিলো তাঁর; লক্ষ্ণৌর অবাঙালী মহলেও তিনি ছিলেন একজন রীতিমতো বিখ্যাত মানুষ। আর যাকে আমরা বলি জনপ্রিয়তা, তারও শীর্ষে তিনি আরোহণ করতে পেরেছিলেন নিজের অন্তরের স্বাভাবিক মাধুর্যের গুণে। সাহিত্যগতপ্রাণ একজন মানুষ ছিলেন তিনি। একবার নয়, বেশ কয়েকবার প্রাক্তন 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বা বর্তমান 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, শুধু তা-ই নয়, ইংরেজী উনিশ শ' পঁচিশ সালে কানপুরে এবং উনিশ শ' তেত্রিশ সালে গোরক্ষপুরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেছিলেন। তাছাড়া উনিশ শ' একত্রিশ সালে এলাহাবাদ শহরে যে বিরাট, প্রায়-ঐতিহাসিক রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, অতুলপ্রসাদই ছিলেন তার প্রধানতম উদ্যোক্তা। সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আজ যে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, এই সম্মেলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন কিন্তু কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও কানপুরের একনিষ্ঠ সাহিত্যপ্রেমিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলুম শুধু এই কারণে যে সম্প্রতি যে-সমস্ত তরুণ সাহিত্য যশোপ্রার্থী 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের কারো-কারো পক্ষে এটি একটি বহুলাংশে অপরিজ্ঞাত অথচ অপরিহার্য তথ্য বিশেষ।

অতুলপ্রসাদ নিজেকে বলতেন 'কবি-বাউল', তিনি অবশ্য অসংখ্য নদনদী -বিধৌত গাঙ্গেয় উপত্যকার শস্যশ্যামল প্রান্তরের বিবাগী বাউল নন, তিনি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের গোমতীর ধূসর উষর রুক্ষ দগ্ধ প্রান্তরের আত্মভোলা নিঃসঙ্গ বাউল। পল্লীবাংলার মালতী-বকুলের শ্বেত উত্তরীয় তাঁর অঙ্গে ছিলো না ঠিকই, কিন্তু তাঁর অঙ্গে ছিলো শিমুল পলাশের রক্তবর্ণ উত্তরীয়। বাংলাদেশের তথাকথিত পেশাদার বাউলদের সঙ্গে এই বিশিষ্ট ভাবতন্ময় কবি বাউলের মূলগত কিছু-কিছু পার্থক্য ছিলো অবশ্যই, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই তাঁর

অনন্য বাউল গানের তন্ময় ভক্তদের নিয়ে একটি একান্ত নিজস্ব ভাবজগৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সারাজীবন ধরে অনন্যচিত্তে সাধনা ক'রে গেছেন গভীরতর রূপে, অন্তরতর রূপে সেই ভাবজগতে ডুবে থাকতে।

পারিবারিক জীবন কিন্তু মোটেও সুখের ছিলো না এই উদাস মানুষটির। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিবাহিত জীবনে অসুখী হ'য়ে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সারাজীবনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়; এজন্য আয়ুর অন্তিমে পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর পরিতাপের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না; এবং এ-ধারণা পোষণ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে এই সুতীব্র অন্তর্বেদনাই তাঁর অন্তঃকরণে গানের ঝর্নাধারাকে উৎসারিত ক'রে দিয়েছিলো। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা তো আমরা কতোজনই কতোভাবে পেয়ে থাকি, আমাদের পেতে হয়, কিন্তু ক'জন পারি সেই যন্ত্রণার বিষকে সৃষ্টির অমৃতে রূপান্তরিত করতে? অতুলপ্রসাদ ছিলেন মনেপ্রাণে একজন যথার্থ কবি, কাজেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি পেরেছিলেন তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত দুঃখবেদনাকে আমাদের সকলের জন্য সর্বগত আনন্দে রূপান্তরিত করতে। এ-প্রসঙ্গে হঠাৎ-আলোর-ঝলকানির মতো মনে পড়ছে একজন বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকের (খুব সম্ভবত জর্মান কুলীন গ্যয়টের) একটি অমর উক্তি, যার ভাবের অনুবাদ করলে অনেকটা এ-রকম দাঁড়ায়: দুঃখ পাওয়া সার্থক, যদি সে দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে অন্ধকার আকাশের বুকে নিঃসঙ্গ তারার মতো। কবি অতুলপ্রসাদের জীবন-সাধনায় এই বাণী আশ্চর্যজনক সার্থকতালাভ করেছিলো।

৪.

বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশে আধুনিক রাগপ্রধান গানের প্রথম সার্থক স্রষ্টা অতুলপ্রসাদ—এ-স্বীকৃতিটি আজ তাঁর গানের অসংখ্য অনুরাগী-অনুরাগিনীদের মুখে-মুখে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে নির্দ্বিধায় উচ্চারিত হওয়া দরকার। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী নানা রাগরাগিণীর সূক্ষ্ম কলাকৌশলের অপরূপ বিন্যাস সাধন ক'রে তিনি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে বাংলা গানের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গীতিধারার সূত্রপাত ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গানের মৌলিক পার্থক্যের কথা সচেতনভাবে স্মরণে রেখেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ-গীতির গভীর আত্মিক যোগও সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

অতুলপ্রসাদ নিজেই সঙ্গীত রচনা করতেন, তাতে সুর দিতেন এবং গাইতেন; অর্থাৎ তিনি ছিলেন একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তাঁর অসংখ্য স্বদেশপ্রীতির গানের মধ্যে 'ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী' কিংবা 'হও ধরমেতে ধীর' অথবা 'বল বল বল সবে' এই গানগুলির আবেদন একেবারেই মর্ম-ছোঁয়া; নানাভাবে এই সব গান প্রতিদিনের জীবনে আমাদের সুপ্ত আত্মচেতনা ও স্বদেশানুরাগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগিয়ে তুলছে। বাংলাভাষার প্রতি তাঁর দরদী মনের আর্তি তাঁর অগণিত গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে শিল্পসঞ্জাত হয়ে চিত্রসুলভ স্পষ্টতায় পরিব্যাক্ত হয়েছে। তিনি যে দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ডে ছিলেন এবং সেখানে থাকাকালে যে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা ও চিত্রবিদ্যার চর্চা করেছিলেন, তাঁর জীবনী রচনার উপাদান হিসেবে এ-তথ্যটি আমাদের অনেকেরই জানা, কিন্তু তাঁর পক্ষে কৃতিত্বের বিষয়টি হচ্ছে এই যে তাঁর গানের মধ্যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য কোনো সুরের প্রভাব এমন কি আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা ও সঙ্গীতের অমৃতরস আকণ্ঠ পান করা সত্ত্বেও তাঁর গান একেবারেই খাঁটি স্বদেশী জিনিষ, এবং আমার বিনীত বিবেচনায়, এটাই হচ্ছে অতুলপ্রসাদের গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, এটাই হচ্ছে তাঁর গানের অন্তঃশীলা। মনে পড়ছে প্রখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল, যিনি নিজে একজন বিশিষ্ট অতুলপ্রসাদ-ভক্ত ও অতুলপ্রসাদী গানের খ্যাতনামা গায়ক, একবার কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে অতুলপ্রসাদ তাঁর লণ্ডন প্রবাস থেকে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরে ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় একটি অতি উচ্চস্তরের গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে গুণীজনদের একটি সমাবেশে (সেখানে সান্যাল মশাই উপস্থিত ছিলেন) পাঠ করেছিলেন; সেই প্রবন্ধে পরিস্ফুট তাঁর যুক্তির গভীরতা সেদিন অনেক পাশ্চাত্ত্যসঙ্গীত বিশারদদেরও মুগ্ধ করেছিলো।

অন্যান্য অনেক প্রতিভাবানদের মতো অতুলপ্রসাদকেও প্রথমে অনেকেই চিনতে পারেন নি, একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতকার হিশেবে তাঁকে স্বীকার করেন নি অথবা স্বীকার করতে চান নি। তিনি যে কতো বড়ো একজন সঙ্গীতবিদ্, কী অন্তহীন গভীর তাঁর সৃষ্টি, কতো বিচিত্রমুখী যে তাঁর প্রতিভা—এ-সমস্তই স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছে অনেক; তবু, সৌভাগ্যের বিষয়,

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মাহেন্দ্র-মুহূর্ত থেকেই অন্তত দু'জন সঙ্গীত-রসিক তাঁকে নির্ভুলভাবে চিনতে পেরেছিলেন কিংবা বলা চলে পরম অনুসন্ধিৎসায় তাঁকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ; এঁরা হচ্ছেন বিদগ্ধ পণ্ডিত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্র-তনয় দিলীপকুমার রায়। অতুলপ্রসাদের গানের সত্যিকারের মূল্যায়নের ও প্রচারের ব্যাপারে এঁদের দু'জনেরই দান অসামান্য। আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্বে যখন প্রায় কেউই অতুলপ্রসাদকে চিনতেন না বা জানতেন না তখন দিলীপকুমার তাঁর দলের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে নানা 'কনসার্টে' দিনের পর দিন এবং অবস্থাবিশেষে সম্ভব হ'লে নিয়মিতভাবে অতুলপ্রসাদের গান গাওয়াতেন এবং প্রচার করতেন। এভাবেই ক্রমে-ক্রমে প্রধানত দিলীপকুমারের অসীম নিষ্ঠায় ও প্রায় একক চেষ্টায় অতুলপ্রসাদের গান সাধারণ্যে স্বীকৃতিলাভ করে। দিনের পর দিন দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদের গান শুধু যে গেয়েই বেরিয়েছেন, তা-ই নয়, কোথায় অতুলপ্রসাদের গানের মাধুর্য আর কোথায়ই বা তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য—এ-সমস্তই তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছেন অনেক সভাসমিতিতে। এ-সম্পর্কে তাঁর রচিত 'স্মৃতিচারণ' নামক সুখপাঠ্য রম্যগ্রন্থে দিলীপকুমার রায় এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মূলেও ছিলো অতুলপ্রসাদের গানের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সপ্রীতি আকর্ষণ। তাছাড়া খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিক শরৎ-মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা, চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু প্রভৃতিও অতুলপ্রসাদের গানের মর্ম উপলব্ধি করতে উৎসুক থাকতেন ব'লে জনৈক বর্ষীয়ান অতুলপ্রসাদ-ভক্তের উক্তি থেকে জানতে পেরেছি।

৫.

এখনো মাঝে-মাঝে ক্ষণিকের অবকাশের মন্থর মুহূর্তে অতুলপ্রসাদের নির্জন স্মৃতি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র হ'য়ে মনের আকাশে জ্বলে ওঠে—মধ্য-ফাল্গুনের বিহ্বল রাত্রির মদির লগ্নে যেন বহুদিনের ওপার হ'তে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে আসে তাঁর গানের কলি 'বধু আমার আর কতকাল রইব চেয়ে' কিংবা 'আমিও একাকী, তুমিও একাকী'। রেডিওতে যখন তাঁর সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মপরিচিতি-সঙ্গীত 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা' শুনি,

তখন হঠাৎ, কেন জানি না, কী-এক অজানা অনুভূতিতে সমস্ত দেহমন অবশ হয়ে আসে, সমগ্র অস্তিত্ব মথিত হতে থাকে। হায়, তবু তাঁর সেই অতুলন চারুকণ্ঠ আর শোনা যাবে না কোনদিন, মৃত্যুর নিঃশব্দ তর্জনী চিরতরে সে কণ্ঠকে নীরব ক'রে দিয়েছে! লক্ষ্ণৌ শহরের সুন্দর একটি রাস্তা তাঁর নামেই পরিচিত হয়েছে—এ. পি. সেন রোড; কিন্তু যাঁর স্মৃতিতে সেই রাস্তার নামকরণ, তিনি আর কোনোদিনো সে-রাস্তার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবেন না, এ-কথা ভাবতেই মন বিষণ্ণ হয়ে যায়, দু'চোখের পাতা ভারী হ'য়ে আসে। তবু, আমরা যদি তাঁকে ভালোবেসে তাঁর স্মৃতিকে আমাদের জীবনের অনুধ্যানে চিরজাগ্রত ক'রে রাখতে পারি, তবে তা-ই হবে আমাদের শোকের সান্ত্বনাস্বরূপ প্রাপ্ত মৃত্যুর অতিকৃপণ মুষ্টি হ'তে স্খলিত দুর্লভ উপহার।

প্রতিভার প্রতি অহৈতুক ঔদাসীন্য পৃথিবীর কোনো দেশেই অভিনব ঘটনা নয়, আমাদের এই হতভাগ্য দেশে তো নয়ই। তবু, শুধু এই কথা উচ্চারণ ক'রে আমাদের ত্রুটির স্খালন হয় না এতোটুকু কিংবা আমাদের কৃতকর্মের অনুশোচনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না বিন্দুমাত্র, বিশেষ ক'রে অতুলপ্রসাদের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কালের করালগ্রাস থেকে তাঁর স্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদেরই গ্রহণ ও পালন করতে হবে। অতুলপ্রসাদ সেনের একটি স্থায়ী স্মৃতিফলক স্থাপন করা বাঙালি-সমাজের একটি জাতীয় কর্তব্য, এ-কথা বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। আর প্রয়োজন তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার। এ-বিষয়ে আমি বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ গবেষক ও প্রখ্যাত অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অবশ্য এ-ব্যাপারে বোধ হয় খুবই মূল্যবান সাহায্য করতে পারেন লক্ষ্ণৌর 'বেঙ্গলী ক্লাব'-এর দায়িত্বশীল প্রবীণ সদস্যরা, কারণ তাঁরা অনেকেই হয়তো প্রতিদিনের অতুলপ্রসাদকে দেখেছেন, জেনেছেন আর চিনেছেন আমাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশী। আর প্রয়োজন নির্ভুল স্বরলিপিসহ তাঁর রচিত সমস্ত গানের এবং ঘনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ পরিচিতিসহ তাঁর সমগ্র কবিতার একক সংকলনের। এ-সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার কোনো অতুলপ্রসাদ-ভক্ত বিশিষ্ট প্রকাশন-সংস্থাকে অবিলম্বে উদ্যোগী হবার জন্য অনুরোধ করতে পারি আমরা। পরিশেষে আবারও বলি আমরা যেন ভুলে না যাই, যেন মনে রাখি শয়নে-স্বপনে

যে অতুলপ্রসাদের স্মৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের পূত লগ্ন এসে গেছে, কোনো মতেই আর দেরী করা চলে না, এক মুহূর্তও না।[১]

পরিমল চক্রবর্তী

খ. জীবনানন্দ দাশ : রূপকল্প প্রসঙ্গ

বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হবার উপক্রম করেছে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই উত্তরণপ্রয়াস লক্ষ্য করেছিলেন। পুনশ্চের যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার রূপরীতিকে কবিসত্তার ভিন্ন এক প্রেরণায় অন্য পথচারী করলেন। তাঁর উত্তর-কাব্যপাঠক স্বতঃই উপলব্ধি করবেন সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলালের মত শক্তিমান সমকালীনরাও মুহূর্তে কতকটা পিছিয়ে গেলেন সূর্যকরোজ্জ্বলে সমাচ্ছন্ন হয়ে। এই আধুনিক রবীন্দ্রনাথকেও জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে উত্তর-তিরিশের অরাবীন্দ্রিক আধুনিকতায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারলেন কবি-ব্যক্তিত্বের জোরে। জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' বইখানির প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৩৪৫ থেকে '৬০-এর মধ্যে। উত্তর-রৈবিক বাংলা কবিতার চরিত্র শরীর ও হৃৎস্পন্দনটা কী কী বলতে চাইছেন ভিন্ন এক সময়ের কবি তার বিশ্লেষণের দরকার ছিল, আর এই আয়োজনের নান্দীমুখ রবীন্দ্রনাথ দেখেও গেছেন তাঁর সৃষ্টির প্রান্তসীমায় পৌঁছে। যুগকাল ও কবিস্বভাবের দিক থেকে জীবনানন্দের স্থিতপ্রজ্ঞাও অনাহত স্থায়ীত্ব আজ প্রশ্নাতীত। কেননা তাঁর অনুগামিতা ও মূল্যায়ন পঞ্চাশ কি তার আগে থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত ঐতিহ্যসূত্রে বাংলা কবিতায় বহমান। বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দকে চিনলেন, চেনালেন। কল্লোল যুগের উত্তাল প্রাণস্রোতে কবি জীবনানন্দ একলা মানুষটি হয়েও সন্নিহিত আপন হলেন, একথা অচিন্ত্যকুমার জানিয়েছেন। এদিকে হয়ত রবীন্দ্রপন্থী বৈশিষ্ট্যশূন্য অসম-স্বভাব কাব্যপাঠক এবং কবিরা জীবনানন্দের আধুনিকতার পরিপন্থী হয়েছেন বৈজ্ঞানিক নিয়মেই।

[১][ইতিমধ্যেই আমরা তিনজন অতুলপ্রসাদ-ভক্ত ও ঘনিষ্ঠজনকে হারিয়েছি, ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপ রায় এবং পাহাড়ী সান্যাল। আর যে দু'চারজন এখনো আছেন—তাঁরাই বা আর কতদিন! আর দেরী নয় তাঁর জীবনচরিত রচনায়। সম্পাদক : উত্তরস্থরি]

প্রতিবাদ যখন প্রগতির নিকষ-নিরীক্ষা, জীবনানন্দের কাব্যসমালোচনা যখন রস থেকে ব্যক্তিত্বহননের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল বুদ্ধদেবই তখন সর্বপ্রথম তাঁর অনন্য আধুনিকতার ধৃপারতি করলেন। স্থির বিশ্বাসে তাঁকে উত্তরকালের সারথি বলে অভিনন্দিত করলেন। জীবনানন্দের জীবিতকালেই বুদ্ধদেব-কৃত ধূসর পাণ্ডুলিপি ও বনলতা সেনের ন্যায়নিষ্ঠ সরস সমালোচনা জীবনানন্দের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কবিতার মহত্ত্ব ও গৌরবকে তুলে ধরলেন। জীবনানন্দ নিজেও ছিলেন দেশ-বিদেশের সাহিত্যে বিদগ্ধ অথচ আশ্চর্যভাবে বুদ্ধদেবের মত তাঁর শিক্ষাবৃত্তি তাঁকে বিরস পাণ্ডিত্যের অভিমানে কলালক্ষ্মীর আসন থেকে দূরে সরায় নি। অগ্রজের আশীর্বচনে তিনি ধন্য নন যথার্থ, কিন্তু সত্যিই তাঁর কবিতা 'চিত্ররূপময়।' আবার কবিতার ও কবিস্বভাবের 'টেন্‌শন' বা কল্পনাশক্তির তুরীয় আততি (বিষ্ণু দে টেন্‌শনের বাংলা করেছেন "আততি") সৃষ্টিমার্গের অন্তরায় কিনা এই বিতর্কে জীবনানন্দ পত্রালাপে রবীন্দ্র বিপরীত।

তিরিশের দশকে যখন এক এক করে আমাদের পরবশ জাতীয় জীবন্ প্রতিহত হচ্ছিল অর্থনীতি রাজনীতি সমাজ বৈষম্য—এক কথায় গোটা জীবনটার বিবিধ লাঞ্ছনায়, নেতা পিতা পুরোহিত এই ত্রিকালজ্ঞে যখন বিভ্রান্ত ভ্রষ্ট তখন কালের কুটিল কটাক্ষের সামনে প্রশ্ন জাগছিল, ততঃ কিম্? আশ্বাস-প্রিয় রবীন্দ্রনাথ বারবার শুনিয়েছেন 'ঐ মহামানব আসে'—জীবনের উপান্তে পৌঁছে লিখলেন 'নবজাতক'। ১৯৩৮-এর অগষ্টে বলছেন "মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী—/নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো বুঝি-বা দিতেছে আনি"—ক্ষোভ প্রায়শ্চিত্ত ও সমকালের অ-মানবিক যুদ্ধোন্মাদনাকে ধিক্‌কার দিয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথ আত্মশুদ্ধি ও বিশ্বাসের আয়োজন করেও ক্ষণে ক্ষণে ক্লান্ত সন্ত্রস্ত এবং নৈরাশ্যে বিষণ্ণ—"জটিল রেখার দলে শুভ অশুভের আলপনা" আবার যুগের আদর্শের আড়ালে অভ্যন্তরে এক বিষণ্ণ-বিবেক-ব্যক্তিসত্তা—খণ্ডিত নিরালম্ব শূন্য একটি কবিমন। যে তার বিপুল সৃষ্টিসম্ভারকে বাণী-বিলাস বলতেও কুণ্ঠিত নয়। রোমান্টিসিজমের বর্ণাঢ্য বনবাসর থেকে বেরিয়ে মহাজাগতিক অট্টহাস্যে সেই মহান কবিও কী নিদারুণভাবে বিক্ষত এবং প্রশ্নাধীন—"রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে / চলে যাবে বহুকোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে ?/ উজার করিয়া দিবে তার / পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—/ ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের

ভাঙা ভাণ্ড হেন?/ কিন্তু কেন।" তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্থৈর্য থেকে সহসা উৎকেন্দ্রিক হতে পারেন না। তাঁর জীবন তাঁর পরিবেশ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাঁর আদর্শলিপ্সা তাঁর জীবনের উত্তরকাব্যের বন্ধুরতা ও ক্লান্তিকে দমিত রেখে আমাদের তুঙ্গস্পর্শ করতে চাইছে। অথচ দেখি তিরিশ থেকেই সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা জটিল আত্ম-বৈপরীত্যের বেগ। ব্যক্তিসত্তার মধ্যে নারকীয় বীভৎসতা নেতিচারণা ও মৃত্যুর বিষণ্ণ ছায়া—পরাভবের ভেতর থেকে জাগছে অনাশক্তি বা অবিশ্বাস। এই লক্ষণটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের কবিতায় সেদিন ছিল নূতন। ত্রয়ীর নাম একসঙ্গে কালনির্দেশে উচ্চারিত হলেও আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা ঠিক করে কি সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-কে সমরেখায় আনা যাবে? এর উত্তর আমার প্রবন্ধে থাকবে না। আমি বলতে চাইছি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তখন বিশ শতকের গোড়া থেকেই একটা নতুন বিশ্বাস আসছিল। হার্ডি-হিউম-য়েট্‌স্‌-লরেন্স-পাউণ্ড-জয়েস্‌-এলিয়ট এঁরা কবিতার ও গদ্যের ভাষায় ও ভাবে যখন জার্মান-ফরাসী কাব্য ও শিল্প রচনার আরো সব প্রশাখার ভেতর নতুন নতুন ক্যাকৃটাসের দুরূহ জীবনপিপাসার সন্ধান পাচ্ছিলেন। দুই দশকের দুটো আকাশ-জল-মাটি-তোলপাড় যুদ্ধ, রুশবিপ্লব-বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ও ধনতান্ত্রিকতার শীর্ষাশ্রয়ী শিল্প-সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ ভারাক্রান্ত মানুষ তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশক ব্যাপী যে কবিতার মুখোমুখি হল তা রোমান্টিক নয়, দারুণ বাস্তব জিজ্ঞাসায় তার তিনভুবন উত্তাল বিপর্যস্ত ও একটা নবমহাদেশ পৌঁছবার জন্য আর্ত। এ কবিতা আবেগাশ্রিত বুদ্ধির অথবা বুদ্ধি সঙ্গতি সংহত আবেগ ও সংরাগের। এর ভাষা এর ছন্দ এর রূপকল্প (ইমেজ) ও শব্দানুপ্রাণনা স্বতন্ত্র অনন্যপূর্ব বলেই জীবনানন্দ এসেছিলেন, 'সকল লোকের মাঝে বসে / আমার মুদ্রাদোষে / আমি একা হতেছি আলাদা।' অথবা আধুনিক যুগটাই যেন তাঁর সেই অমোঘ উচ্চারণে চিহ্নিত হয়েছিল "মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয়, কোন্‌ এক বোধ কাজ করে।' এই বোধ, আগের থেকে মানুষের এই জটিলতা এবং দুনিয়া-জোড়া বিশাল রূপরাশি অজস্র ঘটনা এবং উন্নয়নমুখী নিদারুণ দ্বন্দ্বের মাঝখানে থেকেও মৃত্যুর নৈঃসঙ্গ কবি বুঝতে পারেন। এই প্রজ্ঞা নচিকেতার এই ধ্যান খ্যাতিবিমুখ ঋষির এই শিল্পচেতনা যথার্থ নিরাসক্তের। কত সহজ মন্ত্রপ্রতিম স্বচ্ছতায় তিনি বলতে পারলেন "মৃত্যু আর জীবনের কালো আর

শাদা / হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ / এসেছে এ পৃথিবীর দেশে।" কাব্যগ্রন্থ ধরে কালানুক্রমিকভাবে জীবনানন্দের কবিমনের বিকাশটিকে ধরবার হয়ত কিছু অসুবিধা আছে। কেননা জীবনানন্দের কবিতাগুলি রচনার ক্রম-অনুসারে প্রকাশিত হয় নি, হয়ত রচনাকালের মধ্যে ব্যবধানও কখনও দীর্ঘ। সবচেয়ে বড় কথা জীবনানন্দ অবশ্যই পরিণত উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন এই বাসনায় কবিতা লেখেন নি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে রাত্রিনীরব এক অচেতন স্বপ্ন উচ্চারণ: "দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ" আবার রূপসী বাংলাতেও তেমনি একটানা প্রবহমান পয়ারে—"এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল / ফুটে থাকে নিম শাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন।" আবার 'সাতটি তারার তিমির'এও তাঁর নদী নারী ফুল মাঠ ও ঋতুর চিত্রগুলিই যেন নস্টালজিয়ার মত স্মৃতির পাখনায় উড়ে এসে যায় সেই প্রবাহের মধ্যে ভাসতে ভাসতে—'এর নাম ধানসিড়ি বুঝি?' / মাছরাঙাদের বললাম / গভীর মেয়েটি এসে দিয়েছিল নাম / আগে আমি মেয়েটিকে খুঁজি।"

কিন্তু এতটা হঠাৎ-ক'রে জীবনানন্দের মূল্যায়ন সম্ভব বলে আমার মনে হয় নি। ছন্দের দিক থেকে তাঁর কাব্যপর্বের বিকাশ খুব সূক্ষ্ম। সেটি লক্ষণীয় শাব্দিক সংহতি ও ধ্বনির প্রগাঢ়তার মধ্যে। 'ঝরাপালকে'র মত দীর্ঘ দীর্ঘতর কবিতার জের তাঁর শেষপর্বের রচনাতেও নিঃশেষিত নয়। বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুল' বইতে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'তিনজন আধুনিক কবি' নামক ছোট বইখানিতে ও পরে অম্বুজ বসু দীর্ঘ বিস্তৃততর গ্রন্থে জীবনানন্দের কবিমানস ও কাব্য-রূপরীতির বিষয়ে মূল্যবান কথা বলেছেন। অমলেন্দু বসু, অরুণ ভট্টাচার্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দীপ্তি ত্রিপাঠী অশ্রুকুমার সিকদার কবির মূল্যায়ন করেছেন। তবু আমার কাছে আজ ত্রিশ বছরের জীবনানন্দ পাঠ সমান রসপিপাসায় অক্লান্তিকর। রবীন্দ্রনাথের সৃজন বিস্তার জীবনানন্দর বোধকে ম্লান করে দেয় নি। এর কারণ হল জীবনানন্দের ঐকান্তিক কবিসত্তা। কবিতা ছাড়া আর কোনো মাধ্যম তাঁকে টানল না। যশ অথবা ইনস্টিট্যুশন কিছুই তিনি চাইলেন না। শুধু দেখলেন, "একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে।" কী নিঃশব্দতায় ছুঁয়ে থাকলেন "হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে / শুধু

শিশিরের জল ; / অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে / হিম হয়ে আসে / বাঁশপাতা—মরাঘাস—আকাশের তারা।" এইসব জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা একটা স্বপ্ন-অতিশায়ী বিহ্বল মানসিক অবস্থা— ট্রান্স—এর ধ্যান ও দর্শন যে কবির শরীর ও মনের ওপর ভর করেছিল বাস্তবিকতার একমুঠো খতিয়ান বেশ শক্ত। কেন, এই 'bliss of solitude' কি ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ অথবা রবীন্দ্রনাথে ছিল না—এই রূপতন্ময় শৈল্পিক ইন্দ্রিয়সংরাগ কি কীট্‌সেরও কাম্য নয়? অবশ্যই। কিন্তু তথাপি জীবনানন্দ একক। যেমন প্রতীতিতে তেমনই রূপরীতিতে। এটাও অধ্যাপকোচিত গবেষণার কীটবৃত্তিবসে বলে বসলাম। বাস্তবিক কবিতার শরীর ও আত্মা অবিশ্লেষ্য, অন্তত আমি য'ন সমালোচক নই, কবিতার রসলিপ্সু পাঠকমাত্র। কিন্তু অভিজ্ঞতার কথা বিজ্ঞাপিত করারও একটা আকর্ষণ আছে। চিনতে চাই চেনাতে চাই জীবনানন্দের জীবনবোধটি কি? তাঁর মৃত্যুচেতনার অতল নীল রেখা থেকে উঠে কণ্ঠের কোথায় স্থিরাশ্রয়ী? তাঁর প্রেম সুরঞ্জনা মদিরাক্ষী বিহগ-নীড় নয়নাদের ভেতর থেকে কোন্ নাটোরে কোন্ বনলতার মুখোমুখি অন্ধকারে একা? তিনি কি শুধু রূপসী বাংলার স্মৃতি-বিস্মৃতির? হিজলের জানলা থেকে চোখ সরে এসে কি বারুদ বিমান নাগরিক আকাশে বিক্ষত নয়? "যেখানে সূর্যের আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই / সেইখানে অন্ধকার।" এই অদ্ভুত আঁধারের আবার শিশুর গালের মত নরম আলোয় আমি জীবনানন্দ দাশকে দেখতে পাচ্ছি। দেখছি স্মরণাতীত কাল থেকে এক সৌরসংক্রান্তির অবিনশ্বর পথিক কাল ও ইতিহাসের ভেতর দিয়ে চিরবর্ত্তমান চিরাতীত ও চিরায়ত ভবিষ্যর মধ্যে থেকে গেলেন। আত্মার এই অবিনশ্বর অভিযানকেই বলব বিকাশ। সকল কবির বেলায় সকল কবিতার বেলায় এই বিকাশ এক অঙ্ক মিলিয়ে হয় না। হলে কবিতা হ'ত ডায়েরী। চিত্র হত মরা খড়ের মত রেখার বিস্তার। গান হত প্রলাপের মত একঘেঁয়ে আর পাঠকের জীবন যেত হারিয়ে ভীড়ের ভেতর জনতার তাণ্ডবে। এই ভীড়টাকেই ছিল জীবনানন্দের সবচেয়ে ভয়। তাই কি তিনি বিশশতকের অভিশাপে আতঙ্কিত হয়ে বললেন শেষ কালে: "কোথাও সার্থককাম কেউ নয়,/ আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটো বড় সফলতা সব / মুষ্টিমেয় মানুষের বার-বার নিজের জিনিস, কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার ভা

নয়।"[৫] শুনতে পাচ্ছেন যথার্থ আত্মভূমির ডাক "নিজের স্বদেশে এসো।" অথবা এক অমোঘ জিজ্ঞাসা পলে স্বকর্মে কালের প্রত্যাঘাত থেকে—"সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে: 'নদী,/ নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে ?"

২.

ব্যাপকভাবে হয়ত জীবনানন্দ রোমান্টিক। যদি রোমান্টিসিজ্‌মের সুপ্রচুর বনেদী ব্যাখ্যার মধ্যে 'হেথা নয়, হেথা নয়' এরকম একটা সুদূরপ্রিয়তার ব্যঞ্জনা থাকে। থেকে যায় কোনো একটা ভিন্নতর জীবনাস্বাদনের আর্তি। কিন্তু কনভেনশনের ভয়ে আমি এই মহামানসের মননশীল কবিকে উন-আশিতে বসে রোমান্টিক বলতে চাই না, ভালবাসি না। আর তিনি য়েট্‌সের সহচর না এলিয়টের, এসব অন্ধিসন্ধি প্রভাব-অনুভবের এইসব গোত্রলিখন ঠিক সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে না, যদি সেটা আত্যন্তিক হয়ে যায়। কবির অনন্যতা তাতে ঘা খায় যদিও কৌতূহল বেচা যায় প্রচুর। আর সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে তিনজনেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বিদগ্ধ। তাঁদের প্রবণতা ও আনুকূল্য কোন বিদেশী কবির মমতাময়ী রূপরীতির দিকে এটা খুঁজব প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ লিখে, না তুলে আনব তাঁর সাধনার ফসল ? বিশ্‌শতকের মধ্যলগ্ন পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছরের একটা ঘটনাবহুল সময় বাংলার ইতিহাসে নিদারুণভাবে চিহ্নিত। এই কালের গল্প কবিতা নাটক ছবি এমন জটিল ঘূর্ণাবর্তে আমাদের সামনে উদ্‌ভাসিত যে একটা সঞ্চয়ী আবার অবক্ষয়ী যুগমানসই যেন মহাকবি মহাস্থবিরের রূপ ধরে গঙ্গা-পদ্মার জলাধারকে উত্তাল করে তুলেছে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে মহাকাব্যোচিত ধ্যাননিমীল যুগমানস প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতার প্রত্যয় রূপরীতি ভাষা ও আত্মার উন্মোচনের মধ্যেই। এছাড়া গত দশবছর ধরে তাঁর জীবনালেখ্য চিঠি স্মৃতিচারণ প্রকাশ পেয়েছে 'কবিতা', 'উত্তরসূরি' এবং 'ময়ূখ' পত্রিকা তিনটির জীবনানন্দ সখ্যায়; 'অমৃত'তে শেষ ক'বছরের জীবনস্মৃতিও উপাদানবহুল।

৩.

জীবনানন্দ কাব্য-সমালোচনায় উপাদান-ঔচিত্যবোধ এসব প্রসঙ্গ এখন থাক। প্রসঙ্গে আসি, 'রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প' বইতে আমি অনেকদিন আগেই

আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে কবিকল্পনার উৎস বিস্তার ও পরিণতি শব্দ ও কবি-ভাষাসৃষ্ট রূপকল্প বা ইমেজের বৈচিত্র্যে। রূপকল্প কবিতার কোরকের জিনিস, বহিরাবরণ নয়। অলঙ্কার ব্যাখ্যাতেই এর সৌরভটুকু ফুরোয় না। একালে অমলেন্দু বসু অশোকবিজয় রাহা সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণে সেটা আমাদের বোঝবার পথ খুলে দিয়েছিলেন। এই কবি-ভাষা-সৃষ্ট রূপকল্প গীতিকবিতার বেলাতেও স্বতন্ত্র আবার অখণ্ড। অর্থাৎ একজন কবি বিচিত্র সাদৃশ্য কল্পনায় যেমন তাঁর ভাবনার চিত্র টানেন তেমনি আবার তাঁর অখণ্ড কবিসত্তাটি ব্যাপকভাবে রূপকল্পের অক্ষমালা তৈরি করে একটি সামগ্রিক পৃথিবীর ভেতর আমাদের নিয়ে যেতে পারে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও ছিন্ন আবার অবিচ্ছিন্ন রূপকল্প বিচারের সুযোগ আছে। এমন কি 'ঝরাপালক'-এর যুগেও জীবনানন্দ কোথাও সত্যেন্দ্রনাথ থেকে স্ব-ভুবনচারী। "দেউটি নিভায়ে গেছে—চলে গেছে দেউল ত্যজিয়া, / চ'লে গেছে প্রিয়তম-- চলে গেছে প্রিয়া"—সমালোচক বলতে পারেন 'পিরামিডের' এই ছবিগুলো ভাষা ক্রিয়াপদ একটু আনুষ্ঠানিক বা রবীন্দ্রানুসারী। 'দেউটি' শব্দটিতে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'র 'অনাবশ্যক' কবিতার অনুষঙ্গ জড়ানো না কি? 'ত্যজিয়া যুগলস্বর্গ' ইত্যাদি রবীন্দ্রানুসৃত বা মাইকেলীয় পুরানো ক্রিয়াপদের প্রয়োগে অনুজ্জ্বল হয়ত বা। কিন্তু নিরাশ হই না, ঐ কবিতাতেই দেখি যখন—"জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি—প্রেমের প্রহরা / মোদের জীবনে কবে জাগে পাতাঝরা / হেমন্তের বিদায় কুহেলি—/অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি / গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান / দু'দিনের তরে শুধু।" এখানে প্রচলিত শব্দের ভেতর থেকে একটা ছবি তৈরি হয়ে গেছে যেটা, সত্যেন্দ্রীয় বা মোহিতলালীয় নয়, জীবনানন্দীয়। এই শব্দ রূপকল্প একটা শুকনো মাঠের দীর্ঘশ্বাস ও আবহাওয়ায় আমাদের নিয়ে যায় ঐ কবির একান্ত আপনার। আর পিরামিডকে তিনি চেয়েছিলেন রূপকল্পনার চিত্র হিসাবে, সেখানে পাই তাঁর কালাতিক্রান্তির বা ইতিহাসচেতনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। "হেমন্তের বিদায় কুহেলি" তাঁর প্রিয় ঋতুপরিবেশ পরিচয়ে অনন্য। ঐ কাব্যগ্রন্থের আর একটি কবিতা "সেদিন এ ধরণীর"—এখানেও "উতরোল তরঙ্গের ভিড়" "ডেকেছিলো ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিমমাস—জোনাকির ঝাড়" "মাটির বাঁটের চুমো শিহরি উঠিল মোর ঠোঁটে, রোমপুটে"—এসব চিত্র বা

রূপকল্প আস্বাদনের অভিজ্ঞতা আমাদের আগে ছিল না। দেশজ শব্দচিত্রের জীবনানন্দীয় প্রয়োগ অভূতপূর্ব।

ধূসর পাণ্ডুলিপিতে কবি শব্দানুভববেদ্যতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ। রূপকল্পের হাত আরো খুলে গেছে। প্রেম-মৃত্যু-প্রকৃতি এই ত্রিবৃত্তের সমাবর্তনে কবি একটা সত্তায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় সুরের আলাপটা আরম্ভ হয়েছে প্রকৃতিকে ভালবেসে আসবার একটা গ্রামীণ অনুভব দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, চিত্রা, ছিন্নপত্র ও ছোটগল্প রচনার যুগে এরকম একটা প্রকৃতি প্রেম আঁকলেও এই পার্থিব প্রীতি স্মৃতি ও বিয়োগের স্বরূপটা অন্যধাতের। এখানে মৃত্যুর কথা মনে রেখে বলা হচ্ছে "আমরা বেসেছি সারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো" এই শীতের রাতে কবির জবানিতে আমরা পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ পেয়েছি. "বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ" "আমরা বুঝেছি সারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক"—এমনি করে এক ভীড় চিত্ররূপের ঘ্রাণে দৃশ্যে আস্বাদের উপাদান নিয়ে গড়ে-ওঠা গোটা একটা মানবজীবনী। এই জীবনের শেষ পাতাটা খুলে গেছে কবির চোখে "আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর?" না আর কিছু বোঝবার নেই। বসুন্ধরার দিকে চেয়ে চেয়ে ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল তার মুখে চিরকালের 'কোন এক সুদূরব্যাপী বিষাদ' লেগে আছে। সুধীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দের মৃত্যু-প্রেম-প্রকৃতি-বোধের স্বরূপ কমমাত্রায় তত্ত্বান্বেষী বা যুক্তিতে প্রখর। রূপকল্পের ভাষা, রূপকল্পের ছন্দ, রূপকল্পের শব্দ, স্বপ্নের কবি কি তিনি? তবে কেন বললেন "স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে।" তা সে বোধ হোক বুদ্ধি হোক আর স্বপ্ন হ'ক—এমন অচেষ্ট প্রয়াসে জীবনানন্দের কবিতার ফিল্টারে রূপকল্পগুলি স্বতঃ প্রবাহে ছেঁকে উঠে আসে যে তার আঁশ ছাড়াতে ভয় হয়, নষ্ট হবে। তাঁর দীর্ঘান্বয়ী বাক্যগুলি গদ্য পদ্য সংলাপ ও সুরের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রকে একাকারে বুনে চলে। "হাতে তুলে দেখিনি কি চাষীর লাঙল? / বালতিতে টানিনি কি জল? / কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে?" / "ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে / অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে / ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে।" ভালবাসা অবহেলা ঘৃণা মনের অবস্থাই দৃশ্যমাত্রে একাত্ম গ্রথিত। জীবনানন্দ কি সমদর্শী? তাঁর রূপকল্পগুলি ভেদ

দ্বন্দ্ব বৈষম্য এদের সংগঠনী উপাদান থেকে সৃষ্ট নয়? বোধহয় না, কেন না তিনি স্থিতপ্রজ্ঞার কবি তিনি সমদর্শী বেদোক্ত ঋষি। এক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে সন্নিহিত সমকালিন বিভূতিভূষণ, তাঁরও পদচারণা আলোর প্রান্তরে মমতার কুটীরে আর মৃত্যু অজ্ঞাতির আরণ্য অন্ধকারে। রহস্য না থাকলে কবিতা হয় না, শিল্প বিরস সংবাদে বিনষ্ট হয়। প্রেম হয় নিছক মেদচর্চার স্থূল মৃত্যু। রেখে যায় না অবিনষ্টির দাগ। 'সাতটি তারার তিমিরের' আগে পর্যন্ত কবি জীবনানন্দের মৌল রূপকল্প মাঠ ঘাস পাখি ছায়া কেবলই রূপান্তরিত দৃশ্যান্তরিত হয়ে চলেছে মাঠের যৌবন চোঁয়ানো ভাঁড়ের গল্প কথাকলিতে—"অলস গেঁয়োর মত এইখানে কার্তিকের খেতে" কবি সমাসীন শান্ত। 'অবসরের গান' একটি দীর্ঘায়ত কবিতা। দীর্ঘ কবিতা লিখব বলে ভেবে ঠিক করে কবি বলেন নি। সুপ্রচুর-ভাবে আসতে দিয়েছেন রূপকল্পগুলিকে। রসের ভিয়েন যখন চাপিয়েছেন—"মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ" "রোদের নরম রং শিশুর গালের মত লাল" "আজো তবু ফুরায় নি বৎসরের নতুন বয়স" "আঁটির ভিতর থেকে চলে গেছে চাষা" "প্রেম আর পিপাসার গান আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন" "শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধরে" "অবসর আছে তার—অবোধের মতন আহ্লাদ" তিনটি অধ্যায়ের এইসব অভিজ্ঞকার বিস্তার ক্ষণে ক্ষণে নূতনত্বের মাইলস্টোন ছুঁয়ে যাচ্ছে। শহরবাসী প্রবাসী এই কবিচোখে তাঁর জন্মভূমি গ্রামবাংলা কী নিদারুণ স্মৃতিতেই না আলোড়িত হত! ল্যান্সডাউন রোডের সেই মর্মান্তিক ঘটনার আগের দিনই আমি তাঁকে দেশপ্রিয় পার্কের ধার ঘেঁষে অন্যমনস্কের মত যেতে দেখেছিলাম। সঞ্জয়বাবুর ভাইপো আমার বন্ধু বিনয় ভট্টাচার্য চিনিয়েছিল, ঐ ত জীবনানন্দ যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে একটি বিপরীতচারী অবসরকে দেখেছিলেন বুঝি বা ভীড়ের ভেতর একা। এই একাকীত্ব তাঁর মৃত্যু মুহূর্তে ছলছলিয়ে ওঠা শেষ পাখির ছবি—চোখের ওপর এ রূপকল্প অলিখিত। তাই সবচেয়ে স্পষ্ট! "বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব / ঐ মৃত মৃগদের মতো। প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই; / পাই না কি?" প্রলম্বিত বাক্যবন্ধ। প্রসারিত ছন্দ। শব্দগুলি ক্লান্তির পায়ে মূর্ছা যায়। শব্দান্ত 'এ' স্বরধ্বনি কবির অনেক কবিতায় ক্লান্তিতে শয়ান। স্মৃতি

স্বপ্ন অনুষঙ্গ মগ্ন অবচেতন থেকে তুলে আনে রূপকল্পগুলিকে। "কোথাও ফড়িঙে-কীটে—মানুষের বুকের ভিতরে / আমাদের সবের জীবনে।" অধিকরণ কারকে থাকে ব্যাপ্তি কাল ও আধারের বিস্তৃতি, কখনও দ্বিত্ব প্রয়োগে পৌনঃ-পুনিক জীবনাচরণের আবেগ—"খেতে খেতে লাঙলের ধার/মুছে গেছে কতোবার —কতবার ফসল কাটার সময় আসিয়া গিয়াছে, চলে গেছে কবে।" 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত সাধুক্রিয়া শব্দ প্রয়োগে আধুনিক জীবনানন্দ নির্দ্বিধ। নিঃশব্দ ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে জীবনানন্দ শব্দকে টান দেন কবিতার আত্মা ধ্বনির চিরায়ত চেতনার লোকে "ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে / মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে / জাগে একা অঘ্রানের রাতে / সেই পাখি।" অথবা "মাঠে মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর / কার্তিক কি অঘ্রানের রাত্রির দুপুর।" কোন বোধিক্রম থেকে তাঁর কবিতার শব্দ চিত্রগুলি সমাহৃত? অবশ্যই সেগুলি এমন সব অভিজ্ঞতা ঘটনা বা অন্তর্দৃষ্টির ফুল ফল যার জন্য একটা 'ইমোশনল লজিক' বা আবেগানুভূতিজাত ন্যায়-ক্রম ছাড়া অন্য রাস্তায় পাঠক যেতে পারেন না। কে বলবে কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতার প্রতীক হিসাবে কেমন করে জীবনানন্দ শকুন চিল ধানসিড়ি নদী এই সব রূপকল্পের প্রেরণা পেয়েছেন? তাঁর দেখা মাঠ পৃথিবী বাংলার পরিকীর্ণ পরিপার্শ্ব নিমেষে অক্লেশে আদিঅন্তহীন একটা কাল ও ইতিহাসের চেতনায় রূপান্তরিত হয়। "কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন"—যারা "এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন" ঘিরে কেঁদে ওঠে—আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সড়ক দিগ্‌বিজয়ী রিরংসার একটি চিত্র তিনি একটানে সমাধা করে দেন—"কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেইসব হূন।" কবির চোখের সামনে সমস্ত দুপুর ধরে এশিয়ার আকাশে আকাশে যেসব শকুন চরছিল তারা অবশ্যই কবির একটা ভাব অভিজ্ঞতা বা ঘটনার প্রতীক। আর সেইখানেই জীবনানন্দ যুগ-সচেতন সমাজ-সচেতন জন-সচেতন। কিন্তু এই বাস্তবতার সাধনায় তিনি নজরুল কি সমর সেন অথবা সুকান্তর অনুপন্থী নন। তিনি তাঁরই মতন। রূপসী বাংলার রূপকল্পগুলি নিটোল রসফলভারনত আবার উদাস, বাৎসল্যে নম্ররসাতুর আবার মিলনোৎকণ্ঠায় ও আরতির প্রতীক্ষায় লজ্জারুণ!

জীবনানন্দ সমতার কবি নন। হয়ত কোনো বড় কবিই তা নন। বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সত্যের আসল রূপ। কালো কদর্য কুৎসিৎ আর

শান্ত সুষম সুন্দর এই দুই কোটিতে চলে তাঁর পদচারণা। কবি জ্ঞানী অথবা তাত্ত্বিক হতেও পারেন কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও তত্ত্বের অভিপ্রায় ঠিক সমাজকর্মী রাষ্ট্রবিদ্ কি দার্শনিকের মত নয়। তাঁর সমকালিক সমস্যার মর্মস্পর্শী অভিঘাত কোনো একটা নিটোল সত্যে সারাক্ষণ ধ্রুবাচল না থাকতেও পারে। জীবনানন্দ আত্মসংলাপী, পরীক্ষা-সমীক্ষা স্বীয় রচনার সমালোচনা ব্যাখ্যায় তৎপর হতে তাঁকে দেখি না। অথচ সম-বিষয়ে আশা নিরাশা জীবনে-মরণে তিনি ক্রম-বর্দ্ধমান। তাঁর কবিতার শব্দগুলি এমন একটা ওতপ্রোত বেগে আন্দোলিত—inertia র গতিতে সঞ্চালিত যে তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান কবিসত্তা শেষ পর্যন্ত 'বিপ্লবিনী নদীর বাঁধার মতো" আত্মসম্বরণের সমাকর্ষে তার মস্তক পর্যন্ত সুর চড়াতেও সক্ষম ও সবল। তাঁর কালেই তিনি দেখছেন নাৎসী বাহিনীর শিরোভূষণ হিটলারীয় যুদ্ধ। পারমানবিক বিধ্বংসের মর্মন্তুদ নাগাশাকি আবার মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী জনযুদ্ধের সাম্যবাদী বিপ্লব, তাঁর অবস্থান কেমন বেত ফলের নির্বেদে সমাধিস্থ তেমনি আবার নাবিকী তরঙ্গে কি ভূমিকম্পে দোলায়মান। যুদ্ধ দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ-ক্ষুব্ধ তাঁর ভারতবর্ষে আর থুবথুরে এক মহাজ্ঞানী প্রাচীন পেঁচকের ললাট-লিখন সমীক্ষার স্তব্ধ প্রহর ঘোষণায় তিনি উপলব্ধি করেন মায়াবী জীবন বেশী মৃত্যুর পদসঞ্চার আবার পাড়াগাঁর ভাঁড়দের সরল মেঠো গল্প অথবা গন্ধ পান ধান্য স্তন্যে সঞ্চারিত এক অসম্ভব জীবনসুধার। এইজন্য মনে হয় জীবনানন্দ রূপরীতির কবি। রূপকল্পের উভয় মেরুতে তাঁর অধিবাস।

তাই তিনি আত্মহনন ও আত্ম-উজ্জীবন এই দুই ধারাশ্রয়ী বাস্তবতার জন্য অনুজের চোখে যুগাচার্যের যথার্থ প্রভায় সুদক্ষরী। রবীন্দ্রনাথের নিঃশেষ সৃষ্টির অস্পর্শী জগতে জীবনানন্দের বিস্তার। আবার রবীন্দ্রনাথের মত উত্তরসাধকের কাছে তিনি কাব্যকলার মায়ামারিচি। তাই তাঁকে দৃষ্টান্ত শিরোধার্য করা বিপজ্জনক। যদি না অনুশীলনে এই মহাকবি সম্যক আত্মীকৃত হন কোনো নতুন লেখকের শ্রমে ও নিষ্ঠায়। জীবনানন্দের রূপকল্প নির্মাণের জন্য কবি ভাষা ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তরণের শীর্ষ রস-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কানের সঙ্গে চোখের, চৈতন্যের সঙ্গে স্বপ্নের, ঘ্রাণের সঙ্গে স্বাদের বা স্পর্শের মিশ্রণে (যাকে ইংরেজিতে সিনেস্‌থেসিয়া বলা হয়) তাঁর কারিগরির জোড়া নেই। একটির বেশি উদাহরণ দেবার যায়গা নেই—'হৃদয়

ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে/দিগন্ত প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে / মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট/ সজীব রোমশ উল্লাসে। জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায় :" "১৯৪৬-৪৭" কবিতায় জীবনানন্দর লক্ষ কলকাতা-বিমুখ হওয়া স্বাভাবিক "বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।" অবক্ষয়ের সামনে বসে আশাবাদের বাতিক তাঁর চাপে নি। তত্ত্বের বাহাদুরি নেবার মোহ ছিল না, বললেন— "মৃত্যু আর জীবনের কালো আর সাদা হৃদয়ে বাড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ এসেছে এ পৃথিবীর দেশে।"

এইটি ভারতীয় জীবনবোধ ও দর্শনলব্ধ প্রজ্ঞার কথা। যুগের দর্শন কবির প্রভায় যখন শব্দচিত্রাশ্রয়ী একটা মূর্তিতে শরীর হয়ে ওঠে তখন কবির রূপ-কল্পের মধ্যেই তাঁর ব্যবহৃত শিল্পের ঐতিহ্যকে পাই। তিনি মতবাদের দ্বারা চালিত হবেন না, হন না—যুগচেতনা মানবিক বোধ ঘটনাহত দ্বান্দ্বিকতা তাঁর মধ্যে কবিতা হয়ে জন্মলাভ করে। মহাদেশ কি এক বিপুল ভূ-খণ্ড রচনা করে। কেউ কেউ এই শিল্প সার সৃজনের সঙ্গে সমকালিক পরিপার্শ্বের সহযোগিকে social context বা সমাজচেতনা বলতে চেয়েছেন। তিরিশ চল্লিশের ইতিহাস ও যুগসন্ধি জীবনানন্দের "মহাপৃথিবী"র কবিতাগুলির মধ্যে ক্রমশ প্রখর উজ্জ্বল হয়ে উঠতে উঠতে একটা মহাকবিত্বের প্রভায় সুদৃঢ় হতে পেরেছে। একটি মাত্র দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আধুনিক বাংলা কবিতায় কবিপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাস্মৃতি নিবেদন ক'রে :

"এই নগরী যে কোনো দেশ, যে কোনো পরিচয়ে
আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের বলয়ে
অন্তবিহীন ফ্যাক্টরি ক্রেন ট্রাকের শব্দে ট্রাফিক কোলাহলে
হৃদয়ে যা হারিয়ে গেছে মেশিনকণ্ঠে তাকে
শূন্য অবলেহন থেকে ডাকে।
তুমি কি গ্রীস পোল্যাণ্ড চেক প্যারিস মিউনিক
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলাণ্টিক
লণ্ডন চীন দিল্লী মিশর করাচী প্যালেস্টাইন ?
একটি মৃত্যু এক ভূমিকা, একটি শুধু আইন।'

বলছে মেশিন। মেশিনপ্রতিম অধিনায়ক বলে :
'সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন করে গড়ে
আমার হাতে গড়া ইতিহাসের ভেতরে,
নতুন সময় সীমাবলয় সবই তো আজ আমি
ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আমার সত্তাধিকারকামী,
আমি সংঘ জাতি রীতি রক্ত হলুদ নীল ;
সবুজ সাদা গেরুয়া অশ্লীল
নিয়মগুলো বাতিল করি : কালো কোর্তা দিয়ে
ওদের ধূসর পাটকিলে বক্ কোর্তা তাড়িয়ে
আমার অনুচরবৃন্দ অন্ধকারের পার
আলোক করে কী অবিনাশ দ্বৈপ-পরিবার।
এই দ্বীপই দেশ : এ দ্বীপ নিখিল ভরে।
অন্য সকল দ্বীপের হতে হবে
আমার মতো—আমার অনুচরের মতো ধ্রুব।
হে রক্তবীজ, তুমি হবে আমার আঘাত পেয়ে
অনবুতল আমির মত শুভ।' ('সাতটি তারার তিমির'।)

—প্রতিটি বড় কবির শ্রেষ্ঠ প্রোজ্জ্বল রূপকল্প কবির নিজের সত্তা নিজের আত্মা।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

৩. মনীশ ঘটক

১.

নির্বাচনের কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। সপ্তম লোকসভা নির্বাচন। ধুলোয় তাকানো যায় না। শব্দে কান পাতা যায় না। এর মধ্যে মনীশ ঘটক আমাদের ছেড়ে গেলেন। খবরটা কোথাও পৌঁছুলো, কোথাও পৌঁছুলো না। মনীশ ঘটক একটি ছ'অক্ষরের বানান নয়, মনীশ ঘটক জীবনের পুরুষ-অভিজ্ঞান। মনীশ ঘটক 'একটি বিশাল গাছ, মাথা যার আকাশে ঠেকেছে'।

২

ক্যালেণ্ডারের লেখতথ্যে মনীশ ঘটক :

জন্ম—১৯০২, ৯ই ফেব্রুয়ারী, রাজসাহী

মৃত্যু—১৯৭৯, ২৭শে ডিসেম্বর, বহরমপুর

পড়াশুনা—১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রবেশিকা পাশ

১৯২৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক হন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়েছিলেন।

জীবিকা—আয়কর বিভাগের ব্যবহারজীবী (১৯২৭ থেকে)

আয়কর বিভাগে চাকরী ১৯২৭ থেকে ১৯৫৯

তারপর স্বাধীনভাবে ঐ বিভাগে ব্যবহারজীবীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্র—বহরমপুর ও কৃষ্ণনগর।

সাহিত্যসাধনা শুরু—১৯২৩-২৪এ কল্লোল পত্রিকায় 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে গল্প লেখা দিয়ে। পরে স্বনামে কবিতা লিখতে থাকেন।

প্রকাশিত কাব্য—শিলালিপি — ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

যদিও সন্ধ্যা — ১৩৭৫ "

বিদুষী বাক্ — ১৩৭৮ "

এক চক্রা — ১৩৮২ "

গদ্য—পটলডাঙ্গার পাঁচালী (যুবনাশ্ব ছদ্মনামে) ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

কনখল (উপন্যাস) ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

মান্ধাতার বাবার আমল (আত্মজীবনীমূলক) ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

অনুবাদ—যুবনাশ্বের নেরুদা ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

সম্পাদনা—অতিথি (১৯২৪, ঢাকা থেকে ত্রৈমাসিক)

বর্ত্তিকা (১৯৫৫ থেকে আমৃত্যু। বহরমপুর। ত্রৈমাসিক।)

৩

নানা সাক্ষ্যচিত্রে শ্রীমনীশ ঘটক :

ঢাকায়—যখন আমি তরুণ ছাত্র···তিনি কালো চশমা আর ডোরা কাটা সিল্কের শার্ট পরে মোটরবাইকে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছেন : বুদ্ধদেব বসু।

কলকাতায় কল্লোলে :

মনীশ দুর্ধর্ষ উদ্দাম ।··· মনীশ নির্বারিত। ছ' ফুটের বেশি লম্বা। প্রস্থে কিছুটা দুঃস্থ হলেও বলশালিতার দীপ্তি আছে তাঁর চেহারায়। অতখানি দৈর্ঘ্যই তো একটা শক্তি : অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

ছাত্র জীবনে : থেমে থাকলে দাঁড়ি—হাঁটলে চিমটে—এ কৌতুকুক্তি স্বয়ং মনীশ ঘটকের।

বহরমপুরে : ওই কে যায়! অমন প্রসারিত বাদশা বাদশা উজ্জ্বলতা নিয়ে—মনীশ ঘটক না? মনীষীমোহন রায়।

বহরমপুরে : এখন তাঁর বয়স আশী ছুঁই ছুঁই। একটি (৩-৪-'৭) বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে। পিতামহ ভীষ্মের মতো অসুস্থতার ভারে শয্যাশায়ী। টানটান শুয়ে আছেন বহরমপুর লালদিঘির পূর্বপাড়ে নিজের বাড়ীতে। মেরুদণ্ডসার দীর্ঘ চেহারা। লম্বা দু'খানি হাত দু'পাশে শুয়ে আছে। শোক, নির্জনতা, শয্যাশায়িত্ব, লোডশেডিং বিকেলের শেষ পড়তি আবছাকে হারিয়ে দিয়ে এখনও সেই ঘরটিতে একটি চরিত্রবান আগ্রহ, সমস্ত মানুষের জন্য একটি বলবান শুভেচ্ছা বিরাজিত।

—জঙ্গীপুর বইমেলা ১৯৭৯, স্মারক গ্রন্থ।

বহরমপুর—আরো অবাস্তব রাত দুটোর বাইরের ঘর, পথজুড়ে স্তব্ধ মানুষের ভিড়, চেয়ারে বসে মা, পাশে শায়িতা বাবা। : মহাশ্বেতা দেবী জনমত ॥ ২১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা ॥

বহরমপুরে : মনীশদা তখনো হেমকান্তি, দীর্ঘদেহী, (১৯৬৮/৬৯ আনুমানিক) দুরন্তপনা ভরা উজ্জ্বল দু'চোখে কী আনন্দের প্রকাশ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়

৪.

মনীশ ঘটক ॥ স্বজন পরিচয়

A man is known by the company he keeps ; ইংরেজী প্রবাদটা যদি একটু বদলে relatives he keeps করা হয় তবে কখনো কখনো মন্দ হয় না। কোনো কোনো প্রতিভার স্বজন পরিচয় নিতে গেলে মনে হয় প্রতিভার উদ্যানে প্রবেশ করলুম। যেমন—রবীন্দ্রনাথ,—যেমন সুকুমার রায়, যেমন—মনীশ ঘটক। বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক (ডি. এম.) ছিলেন। মা

ইন্দুমতী দেবী। মনীশরা পাঁচ ভাই। মনীশ জ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠ ৺ঋত্বিক। ঋত্বিক মানে ঋত্বিক ঘটক। মেঘে ঢাকা তারা—সুবর্ণরেখা—অযান্ত্রিক—তিতাস একটি নদীর নাম। ছেলেরা ৺অবু ঘটক, ৺অনীশ ঘটক, শমীশ ঘটক, মৈত্রেয় ঘটক। মেয়েরা মহাশ্বেতা, শাশ্বতী, অপালা, সোমা, শারী। মহাশ্বেতা মানে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। বিবেকের গণগণে আগুনে বাংলা গল্প আর উপন্যাসকে যিনি রক্ষা করছেন আজও। মহাশ্বেতা মানে অরণ্যের অধিকার, গুরু, হাজার চুরাশীর মা। মহাশ্বেতার স্বামী ৺বিজন ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য অর্থাৎ নবান্ন, নবনাট্য আন্দোলন। শিশির ভাদুড়ী যাঁর নাটক শ্রীরঙ্গমে সাত রাত দেখে প্রশ্ন করেছিলেন 'কোথায় শিখেছিলেন?' বলতে গেলে বাংলায় সমাজসচেতন সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাটিকে নানা দিক দিয়ে মনীশ ঘটকের পরিবার বহন করে চলেছেন যেন। মহাশ্বেতা লিখেছেন "বাবার ঋণ শোধ হয় না।"

৫.

মনীশ ঘটক ॥ পত্র পত্রিকা

ব্যাসদেব যদি মহাভারত লিখবেন তবে তার যোগ্য লিখিয়ে চাই। গঙ্গা স্বর্গ থেকে নামবেন যদি মহাদেব তার প্রথম ধাক্কা সামলাতে রাজী থাকেন। "মনীশ দুর্ধর্ষ, উদ্দাম……মনীশ নির্বাচিত"—এই প্রতিভার প্রথম বেগ ধারণ করার জন্য যোগ্য পত্রিকাও একটা বিবেচ্য প্রশ্ন। প্রস্তুত ছিল অথবা প্রচণ্ড ছিল 'কল্লোল'। কল্লোল শুধু একটা পত্রিকা নয় 'কল্লোল' একটা আন্দোলনের নাম। রবীন্দ্রনাথের বৃত্ত-ভাঙ্গা আন্দোলন। ১৯২৩-২৪-এ কল্লোলে এলেন যুবনাশ্ব নামে। 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' নামে বহু পরে গ্রন্থিত দুর্ধর্ষ গল্পগুলো কল্লোলে বেরিয়েছিল। ১৯৩০-৩১-এ কবিতায় স্বনামে আত্মপ্রকাশ। অজিত দত্তের প্রগতি, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় ছাড়া প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী, উত্তরসূরি, নাচঘর, বিষাণ, বসুমতীতে লিখেছেন কবিতা ও গল্প। বিষাণ পত্রিকায় বৈঠকী শিরোনামে গদ্য লিখতেন। ১৯৩৮-এ ১২ই সেপ্টেম্বর মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত দোস্ত তাদের জাগাও, এদিকে আন্দামান কবিতা দুটির জন্য কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের নজরে পড়েছিলেন।

গল্পে ভাঁটা পড়লেও কবিতা থামে নি। অনুজ কবি সাহিত্যিকদের সম্পাদিত

পত্রিকার আমন্ত্রণ বারবার রক্ষা করেছেন। না লিখতে পারার যন্ত্রণাও জানাতেন, কৃত্তিবাসে তা প্রকাশিত হয়েছে। শারদীয়া ১৩৮৫-র এখানে প্রকাশিত 'সে এক বুড়ো' সম্ভবতঃ তাঁর শেষ সিরিয়াস কবিতা।

পঁচিশ বছর ধরে প্রকাশিত স্ব-সম্পাদিত বর্ত্তিকা ত্রৈমাসিকের দাবীতে প্রায় প্রতি সংখ্যায় একটি করে কবিতা বেরিয়েছে। জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ কবিতার গৌরব সম্ভবতঃ বর্ত্তিকারই।

৬. মনীশ ঘটক ॥ সম্পাদক

পত্রিকা একালের সাহিত্যিকদের রাজসভা। জহুরী সম্পাদক কি না করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো মনীশ ঘটক সে মানুষ নন। জহুরী বা গুণগ্রাহী নন তা নয়। যে পরিকল্পিত একাগ্রতা ও সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণেচ্ছা থাকলে বুদ্ধদেব বসু হওয়া যায় তা তাঁর ছিল না; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়াটিই তা আমাদের বলে দেয়—

এমন মানুষ পাওয়া শক্ত লেখার রাজ্য ঢুঁড়ে
এই নিচ্ছেন কলম আর এই ফেলছেন ছুঁড়ে।

তবে কি পাবো এই সম্পাদকের কাছ থেকে? গদ্যের বা গল্পের যে অপেক্ষিত বিবর্ত্তন তাঁর কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য ছিল তা তিনি মেটান নি। সময়ের বেহিসেবী পটে কিছু নিশ্চিত আঁচড় তাকে দিতে হয়েছে এই সম্পাদকীয় কলমেই। আরোপিত দায়িত্বে বাধ্য হয়ে ইতস্ততঃ সম্পাদকীয়তে মণি-মাণিক্যের মতো ছড়িয়ে গিয়েছেন শোকের প্রস্তাব—উৎকীর্ণ সমস্যা-দুঃসময়ের চাপ—আনন্দ-গ্লানি—প্রত্যাশা আর ক্রমশঃ অক্ষম শরীরের ক্লান্তি।—সেই আমাদের লাভ।

(১) 'অতিথি'র তথ্য আমাদের আয়ত্তে নেই। কেউ স্মৃতিচারণ করলে জানা যেতো বাইশ বছরের সম্পাদক কেমন ছিলেন।

(২) 'বর্ত্তিকা' সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষে জবানি পাচ্ছি ১৩৮৬র শারদ সংখ্যায়। বহরমপুর ভ্রাতৃসঙ্ঘে কৃষ্টি শাখার হাতে লেখা বর্ত্তিকা প্রথম বের হয় ১৯৫৪। ১৯৫৫ সালে ছাপা বর্ত্তিকার শুরু। বন্ধু জরাসন্ধর পুত্র তরুণ ও প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ঠেলতে না পেরে তিনি শেষ পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

"তিন মাস অন্তর একটা কবিতা এবং দু' তিনপাতা সম্পাদকীয় মতামত লেখা শুরু হল। সেই পদ্ধতি আজও অব্যাহত যদিও গত সংখ্যায় আমি বিদায় চেয়েছিলাম। বিজনের অনুরোধে অসুস্থ অবস্থায় রোগশয্যায় শুয়ে এই কথা-গুলি লিখছি।"

সম্পাদকীয়র উপরে লেখা অন্তিম॥ মনীশ ঘটক। কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যাক ইতস্তত:

১. সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব বিস্ময়কর, পরিণতি গতানুগতিক।

২. বড় দুঃখের মৃত্যু আমার অনুজ ঋত্বিকের। সে আমাদের পাঁচ ভায়ের মধ্যে কনিষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ, আমার থেকে ২৩ বছরের ছোট ছিল সে; মোমবাতির দুধারের পলতেয় আগুন দিয়ে দিক উজ্জ্বল করে নি: শেষ হয়ে গেল সে। ভালোবাসার কাঙাল ছিল সে জীবনভোর; ভালোবাসার সন্ধানে ফিরেছে বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথে। —১৩৮৩ (নববর্ষ-বর্ত্তিকা)

৩. আমি আশাবাদী। আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। মনন ভারাক্রান্ত, কর্মক্ষমতালুপ্ত, তবু আজও আমি অনাগত ভবিষ্যৎকে অপদেবতা বলে স্বীকার করতে রাজী নই। —১৪.৩.৭৮ (বর্ত্তিকা)

৪. আনন্দবাজার গ্রুপ বাংলা সাহিত্যের তথা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে 'বই মেলা ও দু'শো বছরের মুদ্রণযন্ত্রের ইতিহাস' উপলক্ষ করে যে দৃষ্টান্তস্থাপন করলেন তা সময়ের পটে জাজ্বল্যমান আক্ষরে লেখা থাকবে।

—৬.৩.৭৯ (বর্ত্তিকা)

৫. আমার শেষ প্রার্থনা এই যে যাঁর লিখবার কিছু ক্ষমতা আছে তিনি অন্ততঃ দিনে তিনঘণ্টা আপনমনে লিখে যাবেন, রাতারাতি বড়লোক হবার আশা ত্যাগ করে। —১৩৮৫ (শারদীয়া বর্ত্তিকা)

৬. অথচ স্বাধীনতা লাভের আগে যা স্বপ্ন ছিল সে স্বপ্ন যে এমনভাবে ভণ্ডুল হয়ে যাবে ভাবি নি। শিক্ষায়, চিকিৎসায়, সামাজিকতার নৈতিক চরিত্র-গঠনে কিংবা ভারতীয় সংবিধানে যে সুস্থ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিল তা গঠিত হলো না। পৃথিবী কাছে এসে গেলো, আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেললাম।...

'এই পর্যন্ত লিখেই অসীম ক্লান্তি—

১৩৮৬ (শারদীয়া-বর্ত্তিকা)

৭. মনীশ ঘটক ॥ গদ্যচর্চা

'শৈল্পিক রিয়ালিজম-ধারণার কোনো আলোচনাই যেমন গোর্কিকে বাদ দিয়ে হয় না বাংলা সাহিত্যেও তেমনি যুবনাশ্বকে বাদ দিয়ে হয় না'—এ মন্তব্য শ্রীঅমলেন্দু বসুর। জীবন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে মনীশ ঘটকের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর নিজের উক্তি—"সুন্দর কুৎসিত একসঙ্গে বসবাস করছে।— শিল্প সাহিত্য সুন্দরকে খুঁজছে দৈন্যের মাঝ থেকে দৈন্যকে বাদ দিয়ে।...কিন্তু কেন ?...গায়ে ঠেস দেওয়া দরদ দেখানো হয় নি তা নয়। কিন্তু যাদের জন্য লেখা তাদের মুখ দিয়ে বলাতে অল্প লোকই এগিয়েছে।" 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'তে গ্রথিত গল্পগুলো কল্লোলে যখন বেরুচ্ছিলো তখন শুধু পত্রিকার অন্দোলন নয় বাংলা গল্পের আন্দোলনেও একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। অমলেন্দু বসুর মন্তব্যে সেই মাত্রার কথাই ব্যক্ত। উদাহরণ তুলে কবিতা চেনানো যায়, গল্পের মহিমা টাঙানো মুশকিল। তবু অংশ বিশেষ উদ্ধার করি :

"খেঁদি বললো, সত্যি করে বল তুই, ও মাগী তোর কে ? আমি কেন, দশ-জনে দেকেচে, ওই তোকে মারচে, ও কে তোর ?

বঙ্কু মুখ তুলে দেখলো, সেও এসেছে তার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে বললো, "ও, আমার বোন। দলের মধ্যে দু'জনা পট পট করে মরে গেলেও কেউ অত আশ্চর্য হতো না। বোন! খেঁদির দলে বোন ?"

—মৃত্যুঞ্জয়/পটলডাঙ্গার পাঁচালী

'মান্ধাতার বাবার আমল' আত্মজীবনীমূলক রচনা। জীবনের নানান আস্তানার মধ্যে তিনি ভিড়ছেন। পকেটমার ফজল, লেংড়িবিবি, দাগী চোরদের সঙ্গে ঢের দহরম করার সূত্রে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন মানুষের যে প্রকৃত ভাঙা-চোরা জীবনচর্চা তার অদ্ভুত রসচিত্রে গ্রন্থটি অনন্য হয়ে থাকবে।

'কনখল' উপন্যাসও যেন কৈশোর আর বাবা মা'র স্মৃতির ফ্রেমে বাঁধানো ক্রমোন্মোচিত স্বানুভূত জীবন। কে কনখল ? যে "বিষাদ সিন্ধু পড়ে কেঁদেছে, কঙ্কাবতী পড়ে মুগ্ধ হয়েছে, ইন্দিরা পড়ে স্বপ্নের জাল বুনেছে-'ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, বাঁশ তলাতে জল—আয় আয় সই জল আনিগে চল।' নিজের অগোচরে এ বোধ ওর মনে উঁকি দিয়েছে যে কথা দিয়েও ছবি আঁকা যায়।"

৮. মনীশ ঘটক ॥ কবি

১৯৬৭ সালে ডিসেম্বর মাসে হায়দারাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪২তম অধিবেশনে কাব্য সঙ্গীত নাটক শাখার মূল সভাপতি হিসাবে মনীশ ঘটক যা বলেছিলেন তা তাঁর কবিতা ভাবনার ভালো গৌরচন্দ্রিকা:

'বিস্ময়ের হ্রস্ব শাব্দিক অনুবাদই কবিতা, কখনো প্রেমে বিস্ময় কখনও দুঃখে বিস্ময়, কখনও শোভাতে বিস্ময়, কখনো অসুন্দরে বিস্ময়। আজীবনের বাস-ভূমি এই পৃথিবী কখনো প্রাচীন হয় না, বহু পরিচয়ের ফলে মানুষ কখনো কবির চোখে তার অস্তিত্বের মোহ হারায় না।'

অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কে বিস্ময়বোধ তাঁর কাব্য দর্শনের মূলে। কবি হিসেবে আত্মকৈফিয়ৎ দিয়েছেন:

'আমার মনে হয়েছিল মানুষ বলেই আমার কবিতা না লিখে উপায় নেই। কবিতা আমার মনুষ্যত্বের পূর্ণতার একটি সোপান।'

একজন যথার্থ ভারতীয় কবির পক্ষেই এ কথা বলা সম্ভব। এখন অনুধাবন করে দেখতে হবে মানুষ সম্পর্কে তাঁর বিস্ময় কিভাবে তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। আর কিভাবেই বা মনুষ্যত্বের পূর্ণতার দিকে তিনি এগিয়ে গেছেন কবিতার সোপানে পা ফেলে।

১৯৬৭ সালে উক্ত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেই কাব্যশাখার প্রধান বক্তা ছিলেন অরুণ ভট্টাচার্য। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি যেতে পারেন নি শেষ মুহূর্তে, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে প্রেরিত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে মনীশ ঘটক সম্বন্ধে কবি অরুণ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয়: **Both Premendra Mitra and Manish Ghatak represent freshness and vitality that were so needed at that time. ...Manish Ghatak does not care so much for sensibility as for directness. The appeal of his poetry is more to the body and flesh than to the spirit and there he tries to unearth subdued human emotion. The dreadful and the aweful are twin experiences in his poetry, but characteristically woven into parallel textures of crudity and softness.**

(from Dimensions by Arun Bhattacharya)

মনীশ ঘটক পৌরুষের কবি। তাঁর কবিতা তেজের কবিতা। তাঁর কবিতার সুর দৃপ্ত, দীপ্ত, বলিষ্ঠ, সোচ্চার, উচ্চকণ্ঠ ও গম্ভীর। তাঁর ভাষার প্রধান গুণ স্পষ্ট সমারোহ ও ব্যাপ্ত গাম্ভীর্য। মনীশ ঘটকের কবিতা অন্যমনস্ক বাঙালীর বিবশ চেতনাকে আক্রমণ করতে সক্ষম। শ্রীবার্ণিক রায় তাঁর কবিতা সম্পর্কে উদ্ধারের যোগ্য একটি মন্তব্য করেছেন :

'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না লেখকের শরীরের বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখায় পড়ে কিনা, কিন্তু মনীশ ঘটকের লেখায় তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য মুদ্রাঙ্কিত। তাঁর ভাষার দৃঢ়তা, শব্দের দৃপ্ত ঝঙ্কার, বক্তব্যের সাবলীলতা, প্রকাশের অকুণ্ঠভঙ্গি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শানিত দীপ্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ, আত্মবিশ্লেষণের উদার স্বীকারোক্তি এ সবই তাঁর আর্য শরীরের বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করায়।'

বিষয়বস্তু এবং বাণীভঙ্গী উভয় দিক থেকেই তাঁর দ্বিচারিতা লক্ষণীয় ছিল। সমকালীন জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ কিংবা যে কোনো সুপরিচিত কবির মতো মাত্র একটি স্বায়ত্ত রীতিতে তিনি লিখতে চান নি। বিষয়বস্তুর দুটি বৃত্ত, বাণী-ভঙ্গির দুটি ধারা তিনি আজীবন রক্ষা করে গেছেন। এ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মতো। কোথাও তিনি অনুভবময় শান্ত গম্ভীর কোথাও বা তীব্র, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে কণ্টকিত। ঝরঝরে সহজ অথবা ব্যাপ্ত গাম্ভীর্যে কখনো তাঁর কবিতা শুদ্ধসুন্দর কখনো অসুন্দরের বিস্মিত ও দুঃসাহসিক প্রকাশে অকপট। স্পষ্টতা আর বাক্‌রীতির স্বচ্ছন্দ প্রযোজনায় মনীশ ঘটকের কবিতার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য।

রসের দিক থেকে বাংলা কবিতার ভূগোলে তাঁর অবদান বৈচিত্র্যময়। কবিতার মানচিত্রে শৃঙ্গার করুণ, অদ্ভুত, শান্তই একমাত্র নয়; রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস এরাও জীবনকে ঘিরে রাখে মনীশ ঘটক তা দেখালেন।

গদ্য বা গল্প চর্চার অতি অপেক্ষিত ধারাবাহিকতা তিনি রক্ষা করেন নি। রিয়ালিস্টিক গল্পের দ্বারা তিনি বাঙালী পাঠকদের যে ভাবে সচকিত করেছিলেন সেই পরিমাণে নিরাশ করেছিলেন পরে না লিখে। হয়তো রিয়ালিস্টিক প্রতিভার মধ্যেই উপ্ত থাকে এই ছেদের বীজ। অভিজ্ঞতা-নির্ভর লেখকদের আর্বিভাব এই বিপদ শিরোধার্য করে। মনীশ ঘটকের গল্প না-লেখার পেছনে এই কারণটি চিন্তার যোগ্য বলে আমাদের মনে হয়। মাঝে কিছুদিনের জন্যে কাব্য সাধনায় ছেদ পড়লেও মোটামুটি

ধারাবাঁহিকতা রেখে গেছেন কবিতাতেই। কেননা মানুষ বলে কবিতা না লিখে তাঁর উপায় নেই। শুধু ধারাবাহিকতা নয় প্রতিভার দ্বিচারিতা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যচর্চায় একটা স্পষ্ট বিবর্তন ধরা পড়ে। সেই বিবর্তনের রূপরেখাটি অনুধাবনীয়। প্রথম জীবনে কবিতার উপজীব্য ছিল প্রেম। অনুভূতির ঋজুতা তার সঙ্গে তীব্র প্যাশনের ঝঙ্কার তাঁর প্রেমের কবিতায়। ১৯৩৭ এর পর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় বলা যেতে পারে। কবিতা এখানে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হয়েছে সমাজ-চেতনার দিকে। চারপাশের ঘটনার মুখোমুখি করে দিলেন কবিতাকে। দেখা গেল ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শানিত দীপ্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ। পাবলো নেরুদার অনুবাদ তাঁর পক্ষে সঙ্গত মনে হলো। গল্পের চর্চা ছেড়ে দিলেন বলেই হয়তো তাঁর কবিতা একটা বিশিষ্টতা পেয়ে গেলো। গদ্যে যে সব ব্যাপারে মোকাবিলা করা অপেক্ষিত ছিল তাদের দেখা গেলো কবিতার ফ্রন্টে। এই পরিপার্শ্ব মনস্কতার ভেতরেই হাঁটছিলেন আর এক মনীশ ঘটক। সেই যথার্থ ভারতীয় কবি কবিতা যাঁর কাছে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার একটি সোপান। তাঁর উত্তরণ ঘটলো 'বিদূষী বাক্'-এ। দেখা গেলো ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনার গম্ভীর রসপ্রকাশ।

এবারে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রেখে উদাহরণের নির্বাচনে আসা যাক :

প্রেমের কবিতা :

১. যৌবন গৌরবে
বন্ধন শাসনমুক্ত তীব্র স্তনদ্বয়
সহসা উদ্বেল হলো শুভ্র বক্ষময়
শিহরিল প্রবাল অধর

[পরমা]

ছুটিতে ফিরিলে দেশে, কুড়ানি-জননী
আশীর্ব্বাদ বরষিয়া কন—"শোন মণি,
কুড়ানি উন্নিশে পরে, আর রাহি কত ?
হইয়া উঠছে মাইয়া পাহার পর্বত।"
"সুপাত্র দেহুম" কহি দিলাম আশ্বাস
চোরাচোখে মিলিল না দরশ আভাস

ম্লানমুখ, হতবাক, ফিরি ভাঙা বুকে—
হঠাৎ শুনিনু হাসি। তীক্ষ্ণ সকৌতুকে
কে কহিছে,—"মা তোমার বুদ্ধি তো জবর!
নিজের বৌয়ের লাইগা কে বিস্রায় বর?"

সহসা থামিয় গেল সৌর আবর্তন,
সহসা সহস্র পক্ষী তুলিল গুঞ্জন
সহসা দক্ষিণা বায়ু শাখা দুলাইয়া
সবকটি চাঁপা ফুল দিল ফুটাইয়া॥

—কুড়ানি

একটা নিখুঁত গল্প শেষ চার লাইনের ফলে কি অপরূপ কবিতা হয়ে গেলো।
রৌদ্ররসের উদাহরণ:

৩. লাফ দেবার প্রাক্কালে হিংস্র চিতার মতো
পতনোন্মুখ না পড়া বাজের মতো কী দেখতে পাচ্ছ
হে প্রবঞ্চক, ওহে আত্মপ্রবঞ্চক, কী সব দেখতে পাচ্ছ?

বীররসাত্মক যে কবিতাটি তাঁর মতে প্রতিনিধিস্থানীয়:

৪. প্রভঞ্জন হার মানে। গোঙায় নিষ্ফল রোষে
বিদ্যুৎগর্ভ বারিবাহ। সুতীক্ষ্ণ ফলকাঘাতে
দীর্ণ করে দিগঙ্গন লক্ষজিহ্ব শাণিত বিজলী।
অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু আত্মঘাতী পরিক্রমা শেষে
অন্তরীক্ষে হয় অন্তর্ধান। এত রঙ্গ, কে সে দেখেছে
একটি বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে।

—একটি বিশাল গাছ

ব্যঙ্গে:

৫. আত্মস্তুতি কড়া মাল, আকণ্ঠ সে চিজ করে পান
জি হুজুর গা ঢালেন। নান্য পন্থা ভেড়িয়া সাধন

—ভেড়িয়া সাধন

৬. রবীন্দ্র শতবর্ষে লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতার অংশ বিশেষ

ফুচকা খাও নি বসে সদর রাস্তায়
একটানা কলকের ফাটাও নি নল
নেতা হয়ে দেখাও নি খইনির কল
বিলিতি থ্রিলার টুকে ঝাড়ো নি সস্তায়
করো নি অনেক কিছু, ফর্দে কাজ নাই
মানে মানে সরে গেছ, বেঁচে গেছ তাই।

যুবনাশ্বের দুঃসাহস :

৭. বন্ধু মরেছে, সান্ত্বনা তার স্ত্রীকে দিচ্ছিলে
আর্তি দেখিয়ে বুকে পিঠে হাত বুলোচ্ছিলে
হাতটা হঠাৎ জায়গা বিশেষে রইল থেমে
সদ্যবিধবা শোকাবেগ ভুলে উঠল ঘেমে।

—সে লোহার স্বাদ

তির্যক আত্মসংলাপ :

৮. আরে কে ও যুবনাশ্ব না ?
এসো এসো হাঙাৎ ঢেদ্দিন পর ! তোমার আমলের
কোনো শালা আর বেঁচে নেই এই আমি ছাড়া
নরক গুলজার করে একা আমিই থেকে গেছি
কি করে যে আজও টিঁকে আছি,
দেবা ন জানন্তি—

যুবনাশ্ব, না ?

নিয়তি-চেতনা :

৯. জাতক মাত্র বলি ঘাতকের অদৃশ্য খড়্গের।

অধ্যাত্ম-চেতনার স্থির প্রশান্তি :

১০. যেন কোনো ঢেউ না ওঠা মহাসমুদ্রের
গোপন অতল মণিকোঠায়

আমার অনেক ঘরের
অনেক ছড়ানো নির্জনতায়
আবার আমি পূর্ণ হয়ে উঠি

—সন্ততি

অনুবাদ :

১১. ওই রামধনু যেখানে গিয়ে মিলিয়ে গেছে
সেইখানে কোনো জায়গা খুঁজিগে চলো
যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সবাই
খুশীমতো গান গাইতে পারবে,
সেইখানে চলো আবার একসাথে
গান ধরিগে দু'জনে, সাদা আর কালো,
তুমি আর আমি।
গানটা হয়তো হবে বিষাদের
কারণ কখন কি গান গাইতে হয়
তুমি জানো না, আমিও না

—রিচার্ড রিং (দক্ষিণ আফ্রিকা)

বর্ত্তিকা বা অন্যান্য পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে আরো বহু কবিতা যা কোনো দিন গ্রন্থিত প্রকাশ লাভ করবে। শেষ দিকের সেরকম দু' একটি কবিতা :

১২. হায় আফশোষ

ফুটন্ত খৈয়ের মত লেখা যখন ফুটছিল
গরম বালুর তপ্ত মাটির খোলায়
উড়ন্ত ফুলের মতো মাছ লাফিয়ে উঠছিল
টান পড়া বেড়া জালের দ্রুত দোলায়
বেহিসেবি ওরে লেখক খেয়াল তখন করিস নি
খৈ জমিয়ে মাছ কুড়িয়ে তখন কোঁচড় ভরিস্ নি।
ভিজে খোলায় খৈ ফোটে না
মাছ ওঠে না ছেঁড়া জালে

হায় আফশোষ করে মরাই
লেখা ছিল তোর কপালে।

৪. ৮. ৭৭ (বর্ত্তিকা)

১৩৮৬র বর্ত্তিকা শারদ সংখ্যার কবিতাটি সম্ভবতঃ তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ কবিতা। রোগ-শোক-বেদনার ক্রমান্বয়ী স্রোতে বিধৌত হতে হতে তিরিশের দুর্দান্ত যুবনাশ্ব কিরকম শিশুর সারল্যে লগ্ন হয়ে গেছেন কবিতাটি তার বিশুদ্ধ নিদর্শন হতে পারে ;

১৩. ফুটন্ত বকুল

সাত সকালে ঘুম ভেঙেছে
দেখব বলে ফুল
ঝরার আগে গাছের ডালে
ফুটন্ত বকুল
বিকেল থেকে সমস্ত রাত
গন্ধে ম' ম' করে
দেখে ফেলার আগেই তারা
রোজ পড়ছে ঝরে
পেয়ে গেছি আজকে দেখা
ফুটতে পাতার ফাঁকে
দিনটা আমার এমনি য়েন
খুশী মনেই কাটে ॥

কবিতা তাঁর কাছে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার সোপান। পূর্ণতা কি তিনি পেয়েছিলেন ? অতৃপ্তি ছিল, আফশোষ ছিল। 'যা লিখতে চাই লেখা হয়ে উঠলো না।'

হয়তো পরবর্তী জন্মেও তিনি কবিতা লেখার আকুলতা পোষণ করে গেছেন। 'ফুটন্ত বকুল' কি সেই অন্তর্গত আকুলতারই স্বাক্ষর ! পরের জীবনের লেখা কি এই জীবনেই আরম্ভ করে গেলে মনীশ ঘটক ! কে জানে ?

মনীশ ঘটক পর্যাপ্ত লেখেন নি। অনুবাদ নিয়ে খান পাঁচেক কাব্য ; উপন্যাস,

আত্ম-জীবনী ১টা করে। গল্পের বই ১টা। মফঃস্বলে থাকতেন মুর্শিদাবাদের মত একটা ডেফিসিট ডিস্ট্রিক্ট থেকে পত্রিকা করতেন একটা। আজকালকার প্রতিভাবানরা যে রকম দশ হাতে লেখেন প্রায় আশি বছর বেঁচে থেকে মনীশ ঘটক এমন কি আর করেছেন? তাই তাঁকে যথার্থ সম্মানিত করার দায় কারো ছিল না। একটি ইংরেজী দৈনিকে চোখে পড়লো—"He was honoured by the State Government with the Rabindra Award."- মারাত্মক ভুল খবর। এ খবরে বাঙালীর লজ্জা ত্রি-গুণ হয়, পিতার মৃত্যুতে মহাশ্বেতা লিখেছেন—"পেশাদারী সাহিত্য জগত যে নির্মম ঔদাসীন্যে বাবার সাহিত্যকৃতিকে উপেক্ষা করে চলত প্রতি পূজায় পুরস্কার ও পদক বিতরণে, সেজন্যে আর আমার বুকের স্নায়ু বেদনায় ছিঁড়ে যাবে না।"

অনেক সোনার ধান ঝরে যায়। অনেক গহন মতি ঘটে যায় নিরুপদ্রবে। তাঁর মৃত্যু আজ লাভ-ক্ষতির বাইরের ঘটনা। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান শিরোধার্য হয়ে থাকবে। রসতীর্থের পথিকদের কাছে যে শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছেন সোনার ইনাম তুচ্ছ তার কাছে। তবু ঋণ ঋণই। অপরিশোধের লজ্জা থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় রইলো না। মনীশদা বেপরোয়া। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে চলে গেলেন তিনি।

> সূর্য ডুবু ডুবু দেখে
> হঠাৎ বুড়ো গেল থামি
> তারপরেতেই টেউয়ের ওপর
> হনহনিয়ে পা চালিয়ে
> মুখটি বুঁজে রওনা দিল
> আমার দিকে না তাকিয়ে
> সেই যেখানে দিগন্তরে
> শেষ অবধি সাগর জ্বালে
> পড়ন্ত দিন তলিয়ে গেল
> সেইখানে সে গেল চলে ॥

—সে এক বুড়ো 'এক্ষণ', ১৩৮৫ ॥ শারদীয়া

লেখা যখন দেরাজে তুলে রাখি নি তখন জবাব দেবার দায়টুকু স্বীকার করে নিই। এ লেখার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমি পূর্ণ সচেতন। মনীশ ঘটক সম্পর্কে লেখার যোগ্য অধিকারী আমি নই। শ্রদ্ধা জানানোর উপায় হিসেবে এই লেখা আমার। লিখতে গিয়ে পরোক্ষে জানা শোনা হলো অনেকের সঙ্গে। মনীশ ঘটকের মুখোমুখি বসে ছিলাম ক'দিন যেন। আমার লাভ সেই-টুকু। চেষ্টা করেছি তথ্যগুলো সামনে রাখার। তথ্য আড়াল করে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করি নি। যদি ভুল হয় সে আমার অজ্ঞতা। সংশোধনের রাস্তা তো খোলাই রইলো। পরিগ্রহণের ঋণ স্বীকার করি—বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, জঙ্গীপুর পুস্তক মেলা স্মারক গ্রন্থ (১৯৭৬), মনীষীমোহন রায়, শান্তনু দাস, অমলেন্দু বসু, সুধীর চক্রবর্তী, শান্তি লাহিড়ী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বার্ণিক রায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য, বিজন ভট্টাচার্য্য, চন্দনা সেনগুপ্ত, জনমত, জঙ্গিপুর সংবাদ, কৃত্তিবাস, এক্ষণ, দি স্টেটসম্যান, বর্ত্তিকা এবং মনীশ ঘটক।

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভালবাসা এখন

যেসব ছেলে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ধরা পড়েছে
আজকে তারাই চোর-পুলিসের বুড়ি ছুঁয়ে সভা করেছে আলো!
অথবা তারা কেউরাজা কেউ মন্ত্রী চারদিকের ভাল থাকার সমারোহে ;

কেননা বয়েস নদীর জলে ভেসে গিয়েছে অনেকদিন,
তা-ছাড়া ভালবাসা তো এখন মুখোস।

২৪ অগস্ট, ১৯৮০

বৃষ্টি এলে

বৃষ্টি যেন সোনা, যেন মাণিক
ঝরছে, পড়ছে গাছের পাতায়…

ছাতা-মাথায় বাবুটি, তুই একটু দাঁড়া!
একটুখানি বৃষ্টিতে ভেজ!

আহা, বৃষ্টি! শীতল বৃষ্টি! সারা শরীরে শীতল সোনা
মাখছে পথ, মাখছে মাঠ! গাছের পাতায় মাণিক ঝরছে ;

বৃষ্টি ঝরছে, বৃষ্টি পড়ছে—
চারদিকে তার মাদল বাজে।

চারদিকে তার মাদল বাজে! হেই বাবু, তুই
একটুখানি বৃষ্টিতে ভেজ!

১২ জুলাই, ১৯৮০

জগন্নাথ চক্রবর্তী

ত্রিকোণমিতিক

১. ত্রিকোণমিতি

বাহু আর কোন খোঁজে
ভালবাসা এই তার রীতি
প্রেমের গণিতবিদ্
পাঠ নেয় ত্রিকোণমিতির।

২. সূক্ষ্মকোণ

সারসের চঞ্চু এসে
বিদ্ধ করে বুক
কেবলি কৌণিক হয়
যাবতীয় সুখ।
একদিকে তীক্ষ্ণ ফলা
অন্যদিকে অনন্ত বিস্তার
মুক্তির আকাশে বেঁধা
সূক্ষ্ম মনোভার।

৩. অতিভুজ

একটি আয়তক্ষেত্রে রয়েছি দাঁড়িয়ে
কোনাকুনি দীর্ঘ বাহু দিয়েছি বাড়িয়ে
ব্যাকুল বুকের মধ্যে নিতান্ত অবুঝ
যৌথ আকাংক্ষার নাম বুঝি অতিভুজ।

৪. সমবাহু ত্রিভুজ

সমদ্বিবাহু থেকে সমবাহু
কিংবা সমকোণী
বালিকার সজ্জা ছেড়ে
নবোদ্ভিন্ন প্রথম রমণী

জগন্নাথ চক্রবর্তী : জন্ম ১৯২৪, প্রথম প্রকাশিত কবিতা বসুমতীতে। জন্মস্থান : যশোহর। প্রথম কাব্যগ্রন্থ : নগরসন্ধ্যা। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ : মৌনী হিমালয়, শুদ্ধ আয়ুস্।

সমবাহু ত্রিভুজটি
সমদ্বিবাহু থেকে টানা
কিছু আরো প্রস্ফুটিত
কিছু আরো হরিণ-নয়না।

৫. অসমবাহু ত্রিভুজ

দুহাত মেলাতে যাই
ব্যথা পাই অমিল দুহাতে
অসমবাহুর মধ্যে
চাঁদ ডোবে অন্ধকার রাতে।

৬. ঊর্মিরেখা

প্লাংকের গণিতে তুমি
তেজের দর্পণ
সমুদ্রে নদীতে ঢেউ
আবেগে অর্পণ
উদ্বেল মুহূর্তগুলি
বড়ো আঁকাবাঁকা
ওঠানামা ওঠানামা
সবি ঊর্মিরেখা।

৭. বৃত্ত

বৃত্ত বড়ো সমদর্শী
বৃত্ত সাম্যবাদী
অনন্ত এখানে সান্ত
চক্রান্ত অনাদি
আকাশ বৃত্তেরি অংশ
মাটি তথৈবচ
অসংগতি চারিদিকে
একমাত্র বৃত্তই সংগত।

৮. সমকেন্দ্রিক বৃত্ত

ক্ষুধা বলো সুধা বলো
নিবৃত্ত কোথায় ?
বৃত্তের ভেতরে বৃত্ত
যায় আসে যায়।

৯. সমকোণী চতুর্ভুজ

উত্তরে প্রবাহ যদি
দক্ষিণেও তাই
পুবে ও পশ্চিমে তেমনি
একই রোশনাই
মিলনান্ত এই নাট্যে
দুই প্রান্তে সমান বাঁধুনি
সমান পুরুষ নারী
গৃহকর্তা তিনিও রাঁধুনি।

১০. সমান্তরাল চতুর্ভুজ

তুমি যদি নুয়ে পড়ো
আমি তথৈবচ
সমান দূরত্বে গড়ি
সম উচ্চাবচ
সর্বদা কৌণিক তাই
সর্বদা সন্দেহ
সম-অন্তরালে থাকে
আত্মা আর দেহ।

১১. সমকোণ

চেয়ারে সমান পিঠ
চক্ষুরোগী অথবা মাস্টার
বড়ো বেশি ঋজু তুমি

বড়ো বেশি যেন অহংকার
পা মুড়ে সারাটা ক্ষণ
বসে থাকো কি যে সুখ পাও
পেছনের দায় নেই
বিস্ফারিত সম্মুখে তাকাও।

১২. স্পর্শক (১)

তোমার চৌদিক ঘেরা
বাহুর উঠোনে
মুহূর্ত-অতিথি এসে
গেছে পরক্ষণে
মুহূর্তের জন্য আসে
মুহূর্ত-অতিথি
ফেরে না যে ফিরে যায়
ফেরে শুধু স্মৃতি।

১৩. স্পর্শক (২)

বৃত্তের ভেতরে খুব সুখ আছে জেনে
আগন্তুক আসি খুব কাছে
মসৃণ চৌকাঠে এসে খুব ভালবেসে
স্পর্শ করি বিম্বোষ্ঠ আলগোছে
তখনি প্রলয় ঘটে
বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যাই
ফেলে রেখে নহবত
ফেলে রেখে সন্ধ্যার সানাই
বিদ্যুতের স্পর্শ নিয়ে
স্মৃতি নিয়ে
দূরান্ত গগনে—
বৃত্তের ভেতরে খুব সুখ আছে জেনে।

১৪. সমান্তরাল রেখা

দুজনই উদ্‌ভ্রান্ত ছোটে
দিনে রাত্রে সকালে দুপুরে
দুজনই নিকটে তবু
ঠিক সমদূরে
যেন দুই বঙ্গভূমি
চলে যুগ্ম সংযোগ বিয়োগে
রেডিও রটায় মিথ্যা
যোগসূত্র শুধু প্রতিযোগে
বস্তু ও ছায়ার মতো
এক যেন অন্যের নিয়তি
যুগল তবুও লক্ষ্য
দুর্নিবার মুগ্ধ আত্মরতি।

১৬. সমান্তরাল ক্ষেত্র

সূক্ষ্ম আর স্থূল মিলে
আমি কোনাকুনি
আমাকে চ্যাপ্‌টানো সোজা
টেনে তুললে উঠবো তখ্‌খুনি।
আমি বড়ো নমনীয়
সমান দূরত্ব দুই দিক
কখনো ভীষণ ঋজু
আয়তক্ষেত্রের রূপ ঠিক।
আমার স্বপ্নের মধ্যে
বর্গক্ষেত্র অনিন্দ্য অপ্সরা
কিন্তু সে আমারি দেবী
অন্যদের দূরের অধরা।

১৬. বিন্দু

সিন্ধুর ভেতরে আমি
আমি বৃষ্টিজলে
ঘাসের ওপরে আমি
শিশিরের ছলে।
অস্তিত্বের মূলে আমি
করি অশ্রুপাত
আমি অস্তি আমি নাস্তি
ধনী ও অনাথ
পরস্পর ছেদ করে
প্রেমে ও ঘৃণায়
স্পর্শের মুহূর্তে আমি
থাকি সেই ঠাঁই।

অরুণ ভট্টাচার্য

নির্জন বারান্দা থেকে : কবিতাগুচ্ছ

১. বাইরে আকাশ-জোড়া আলো। ঘরে ঢুকলে
নিশীথিনী অন্ধকার। অন্ধকার
নির্জনতা দেয়। হরিণীর নিঃসঙ্গতা
অন্ধকারকে গাঢ় করে। গাঢ়তর
রৌদ্রের দুপুরে
ঘরে ঢুকলে কী যে এক অপাপবিদ্ধতায়
আমাকেও শান্তি দেয়।
ঘর আলো অন্ধকার, হরিণীর
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, এই সব
অপরূপ নীলিমার কাছে
হয়তো বা একদিন স্থির নিয়ে যাবে! ১০ই জুলাই। ১৯৮০

২. তোমাকে দেখতে যাবো, প্রায়ই ভাবি,
যাওয়া হয় না।
তোমার সঙ্গে দেখা হলে কি কি বলবো, তাও ভাবি,
কিছু বলা হয় না।
তোমার কাছে কতকাল থেকে কত কী যে চাইব ভাবি,
আমার কিছুই চাওয়া হয় না।

এই সব ভাবনা নিয়ে আমি
তোমার প্রতিমা গড়ি, ভাঙি, আবার গড়ি।
ইচ্ছামত খেলা করি,
খেলা করতে ভালবাসি।

১৮ অগষ্ট। ১৯৮০

৩. কোন্ গভীর থেকে উঠে আসছে তোমার মুখ
মুখের কালিমা, শীতল
দীঘির চেয়েও শীতল, মসৃন
পাথরের চেয়েও মসৃন, যেন
খোদাই-করা মিশরীয় মূর্তির ঘন রহস্য।

আমি কি তা জানতে পারি না!

এটুকু জানি, ওই দুটি কালো আঁখির অন্তরালে
রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবন। বয়ে চলেছে আদিম রসধারা।

২৮ অগষ্ট। ১৯৮০

৪. তোমার ঠিকানা রয়েছে আমার কাছে। বৃথা
ঘুরো না এদিক ওদিক।
শূন্য রাস্তাঘাট, ঝোপঝাড়,
কাঁটাবন। কোথায় আটকে যাবে
শাড়ির আঁচল, কোথায় খসে পড়বে

রত্নহার।
বরং নিশ্চিন্ত হয়ে বোসো। ক্রমশ
অন্ধকার গাঢ় হবে, তারা ফুটবে, ফুটপাথের
কেয়ারী-করা শিশুগাছের কিশোর হাওয়া
তোমার উড়াল খোপায় ইতস্তত
বিলি কাটবে।

এমনই যাবে দিন। বৃথা
ঘুরো না এদিক ওদিক।
তোমার একান্ত ঠিকানা রয়েছে আমারই কাছে
২৮ অগস্ট। ১৯৮০

৫. কিছু কিছু কথা থেকে যায়, কিছু
ছবি, কোন গোপন বেদনার।
সরে যায় স্থির জলের ওপর
হরিতকী পাতার ছায়া
ইতস্তত নির্জন হাওয়ায়।

একদিন অন্ধকার বারান্দায় তুমি ছিলে,
তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাস ছিল,
ছিল পুকুরপাড়ের গাঢ় প্রতিবিম্ব।

আজ সেই বারান্দায় তোমার
বেদনার ঘনানো কান্না, তোমার
স্ফুরিত অধর। তোমার
অবাধ্য চূর্ণকুন্তল।

এই দুটি দ্বীপের ব্যবধানে আমি,
একলা দাঁড়িয়ে,
আমার নৌকো ভাসাবো মনে করছি।
৩ সেপ্টেম্বর। ১৯৮০

৬. একটি সাদা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম
একটিমাত্র সাদা ফুল।
সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি একটি কামিনী ফুলের।
শ্বেতশুভ্র। হালকা মেঘের পালক। যেন
গভীর জলে শ্বেতপদ্ম। যেন
সমুদ্রচূড়ায় শঙ্খমালা।
সারা জীবন ধরে একটিমাত্র সাদা ফুল তুলতে চেয়েছিলাম,
একটি কামিনীফুল।
আজও তোলা হয় নি।

কামিনী ফুল হাত থেকে শুধু ঝরে ঝরে যায়।

৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৮০

৭. মনে পড়ছে, কাক-ভিজে ভিজে বাড়ি-ফেরা
এক ছাতায় বৃষ্টির জল তোমার
শাড়ির আঁচলে, ব্লাউজের চিকণ উদ্ধিতে,
বেলভেডিয়ারে মসৃণ-পীচ রাস্তায়
ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেবদারুর উতল হাওয়ায়
মনে পড়ছে, লাইব্রেরীর সবুজ বাগান থেকে
বাড়ি-ফেরা।

মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়ানো
কয়েকটি দুরন্ত রাত্রির মুহূর্ত। তোমার
উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। তোমার
উদ্ধত তর্জনী। তোমার
নির্মম তিরস্কার।

দিন যায়, দিন যাবে। যেমন
সূর্য-ওঠা, যেমন গঙ্গার ওপারে পশ্চিমদিগন্তে

অস্থির আকাশে সূর্য-ডোবা।

বাড়ি ফিরে আসি। নিঃসঙ্গ
পথের দুধারে দেবদারুর পাতা ঝরে যায়, ব্যাকুল
বকুলের নিঃশ্বাসে তোমার গ্রীবার সুগন্ধ
মনে পড়ে।

এখনো বৃষ্টির দিনে।

১১. ৯. ৮০

৮. এই নাও ধারালো অস্ত্র, উজ্জ্বল
তরবারি। এই নাও
মুহূর্ত সময় তোমার হাতের মুঠোয়।

আমি প্রস্তুত। আমি
দেহ রেখেছি শয়ান। তোমার
তরবারি নামুক আমার
নিষ্পাপ দেহে।

এই শোণিতে তুমি স্নান করবে ভেবেছিলে!

স্নান করে বুঝি পবিত্র হতে চাও, রমণী!
তবে জেনে রেখো, এই শোণিতে
শুধুমাত্র দেবতার উৎসর্গ হতে পারে।

১১. ৯. ৮০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সিন্ধুতীরে

রাত হল খুব বালুর খেতে
এবার তবে অন্যরকম শস্য হবে
সন্ন্যাসীদের ডাক পড়েছে সে-উৎসবে
রাত বিরেতে

কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এসো সন্ন্যাসীরা
বালুর মধ্যে ফলাও বাগান
আপনারা কি শূন্যতা চান
বলতে বলতে ঝাউ খেলেছে চন্দ্র-হীরা
যবন হরিদাসের শ্মশান
মন্দিরাতে ডাক দিয়েছে ওইখেনেতে ॥

দহরাকাশ

দহরাকাশ রইল ভেসে আর্শি-ঘাসে
দহরাকাশ রইল বিঁধে ঘর-আকাশে

তাই তো অকূল ভালোবাসায় ঘর ভরিল
তা নইলে কি বেঁচে ওঠার অর্থ ছিল

আজ সকালে গিয়েছিলাম তার সকাশে
এখন ভাসে দহরাকাশ আর্শি-ঘাসে

তুমি

পুরবাসীরা জেগেছে ঐদিকে
তার করেছে দুরূহ বৈরীকে

নির্বোধেরা ঘৃণ্য অভিচারে
খুন করেছে প্রেমের কবিতারে

ধূমের মধ্যে উদাসীন প্রদোষে
চুল এলিয়ে রয়েছো তুমি বসে ॥

জন্মসন ১৯৩৩। জন্মস্থান কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ যৌবনবাউল। প্রথম প্রকাশিত কবিতা, ৭ বছর বয়সে, বীরভূমবার্তায়। ১০ বছর বয়সে বসুমতীতে। শেষ কাব্যগ্রন্থ অনূদিত ভোরের হাওয়ার মুখে।

মানস রায়চৌধুরী

সমাপ্তির ছবি

জলে তার মুখ, দেখি মুখে তার জল
এই ছন্ন সংসারের অলীক শিকল
আমাকে জলের দিকে টানে
সন্ধ্যায় পানীয় দুঃখ যায় অন্তর্ধানে,

কতদিন ভেবেছি এবার হবো সম্পূর্ণ গৃহস্থ
অথবা তুলসীমঞ্চে আনত প্রদীপ
নির্ঘুম ছুটির দিনে জলে ফেলব ছিপ
ভাবনা আমাকে করে এমনই বিধ্বস্ত !

'তাই হোক তবে তাই হোক'
নীলিমার পরপারে আমার আবাস জ্যোতির্লোক
সেখানে আশ্রম গড়ে পাবো স্থির নিশ্চিন্ত আশ্রয়—
চারিদিকে চেয়ে দেখে প্রেক্ষাপটে ক্ষয় শুধু ক্ষয়

জলে তার মুখ আর মুখে তার জল
আমাদের সুখদুঃখ প্রসাধন সুন্দর কাজল
যাকে ভাবি স্নেহশীল সে-ও তো নির্মম
একটি কুঠারে হানে মৃত্যুর চরম।

মানব জীবন

মানুষের দিকে চেয়ে আছি
যে মানুষ মাটি থেকে শস্য খুঁটে খায়
যে মানুষ খায় না আপেল কিংবা ফ্রিজ খুলে নিটোল আঙুর
যে মানুষ মাটি থেকে ভাত খুঁটে খায়।

মাধবপুরের কাছে আসতেই ঝুপ্ করে সূর্য ডুবে গেল
এক পশলা অন্ধকার চতুর্দিক অদ্ভুত ঢেকেছে
কেরাসিন নেই তাই কোন হারিকেন নেই
অথবা থাকলেও তারা জ্বলে নি আঁধারে
কয়েকটি মোমবাতি শুধু দূর থেকে আমাদের চোখে এসে লাগে
মাধবপুরের কাছে এসে মনে হলো
মানুষের খুব কাছাকাছি এসে গেছি
এখানে ইস্কুল আছে পড়ুয়া নেই, এখানে দেখেছি
হাসপাতাল নেই, আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র শুধু—
ওষুধ ও চিকিৎসক ডাকযোগে পৌছোয় নি এসে
মাধবপুরের কাছে এসে মনে হলো
মানুষের বুক জোড়া অন্ধকারে দুএকটি মোমবাতি
জ্বলে শুধু জ্বলে—
মানুষের কাছ থেকে চলে যাবো এই কথা কখনো বলি নি
এই কথা কখনো ভাবি নি আমি মানুষের এত কাছে এসে
দেখাশুনো না করেই দূরে ফিরে যাবো

কতদূরে জনতাবহুল শহরের শেষ বাস দ্রুত চলে গেছে
আমি অন্ধকারে বসে ভাবি এই মানুষের উজ্জ্বল বসতি
যেখানে দিনের বেলা ধান হয় গম হয়
কোন কোন পালা পার্বন কিছু গান হয়
তারপর সব নিভে এই অন্ধকার
সারি সারি বন্ধ দরজা
হাটের ওপাশ থেকে ফিরে আসা দুর্জয় গরুর গাড়ী
ঘণ্টার টুং টাং
মানুষের এত দুঃখ তবু আমি মানুষেরই কাছে ফিরে আসি।
কত কথা জানা হয় তবু বহু কথা থেকে গিয়েছে অজানা
রাত্রির মশারী হাওয়া ছিঁড়ে দেয়
ভিতরে আমার মত ঘুম্-কাতর পর্যটক বসে বসে ভাবে—
কাল ভোরে ফিরে যাবো ওখানে, শহরে
কিন্তু সেই মানুষের দেখা আমি পাবো ?
শহরে কচিৎ আমি দেখেছি তাদের—
মাধবপুরের অন্ধকারে
আমি আছি মানুষেরই কাছে
যে মানুষ মাটি থেকে মুড়ির দানার মতন
শুকনো ভাত খুঁটে খুঁটে খায়।

কথায় শুধু

কথায় শুধু কথাই বাড়ে
কপালে জমে ঘাম
সকাল বলে, সন্ধে হলে
পাবে তোমার দাম
শ্যাওলাগুলি পুকুরটিকে

সবুজ করে রাখে
একটি ছাদের তলায় থেকেও
চেনা হলো না তাকে।

সুখে আমার সুখ লাগে না
কেমন তরো বাঁচা
গ্রীষ্ম আতপ গায়ে মেখেও
ফল থেকে যায় কাঁচা
আমিও ভাবি আমার মধ্যে
আনত ডালপালা
ঝড় ওঠে নি তবু কাঁপছে
সাতটি তারে ঝালা।

তর্ক এখন তর্কাতীত
বুকে শ্মশান চিতা
দুঃখে নিবিড় সুখ মিশেছে
প্রখর মনস্বিতা
তোমার আমার বাঁচার মধ্যে
একটি শিথিল ছন্দ
উঠতে বসতে মনে পড়ছে
লেবু পাতার গন্ধ
এ বয়েসেও সাত সতেরো
সাধ থেকে যায় সূক্ষ্ম
কি করে যাই জ্যোৎস্না রাতে
পা ছড়ানো দুঃখ।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কোন কোন অন্ধকার

কোন কোন অন্ধকার দেখতে নেই
কোন কোন নিঃশব্দ পেঁচাকে
কেউ সেখানে হাঁকে না ডাকে না
শুধু তার দৃষ্টি থেকে লোভাতুর তারল্য গড়ায়
বিস্রোত মানুষ তার আলোঅন্ধকার নিয়ে আছে
একটি দেউড়ির জানালা অন্যটি খিড়কির
অন্ধকারের দিকে মুখ
কোন কোন মানুষ একাকী
জন্মজন্মান্তরের সেই নাম-না-জানা
হারানো এক পাখি।

যখন বুঝি নি

যখন বুঝি নি সেইসব তখনই ত শুরু হয়েছিল
পথে পথে বকুল ছড়ানো
কে একজন জেগে বলে—হিসেব মেলে নি
একে একে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়লো
খসে গেল রঙের রঙিন
গন্ধ কোন্‌কালে অপহৃত
দিনগুলি দ্রুত চলে যায়
বোঝা যায় পিছনে তাকালে
সব কিছু ফিরে পাওয়া যায়
ফিরে পাওয়া যায় নাকো দিন
মোটামুটি সবই ঠিক থাকে

মুখের আদল, কথা বলা
শুধু ঢিমে হয়ে আসে হাসি
এক পোঁচ ম্লানতার কালি
এই নিয়ে বসে থাকা দায়
তাই জন্যে ডাকা হয় পথ
পথই আজ মস্ত রাজবাড়ি
পথসভায় অনন্ত জোয়ার।

একটি পাখিকে আমি

পাখিগুলি উড়ে যাচ্ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে
একটি পাখিকে আমি তার সঙ্গে উড়িয়ে দিলাম
দূরে শূন্যে আকাশের গা ঘেঁষে যাতে চলে যেতে পারে
পাখি শুধু গায়ের পালক রোম, চোখে জল নিয়ে গিয়েছিল
এখন শহরে বৃষ্টিপাত হলেও আর ক্লেদ ধুয়ে যায় না
কুয়াশা কমে না
তার চেয়ে সুদূর অস্পষ্ট সেই অজানার হাতছানি
ডাক দিতে তাকে
পাখি উড়লো মহাশূন্যে দিকচিহ্নহীন দূর বাতাসপ্রবাহে
তার শেষ ডাক কিন্তু ভেঙে পড়েছিল ঠিক মেলাবার আগে
দেওদারের উত্তুঙ্গ শীর্ষে
ভাঙা একটা মন্দিরচূড়ায়।

সে একজন

আমি হাহাকারের বাইরে যেতে চাইছিলাম
মুষ্টি মেয় রঙিন স্বপ্ন এবং দিনগুলি একে একে পাশ ফিরছিল

যেমন পাখিরা হঠাৎ হঠাৎ উড়ে যায়
যেমন কুয়াশা এসে পড়ে হিলস্টেশনে
তেমনি সেই চিন্তাগুলি উড়ে যায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়
জোড়া লাগে, 'আমি আমি' বলে ডাকে
এবং হাহাকার কমে না
তারই মধ্যে কে একজন সজোরে দরজা খুলে
ভেতরে ঢুকে যায়
নিষেধ মানে না
ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে দাগ কাটে, অথবা
কাগজে বুকের রক্তে অক্ষর সাজায়
কবিতার রূপবন্ধে বুক খুলে দাঁড়ায়
আর ঠিক তখনই
হাহাকার হা-হা হাসি নিয়ে ঝরে পড়ে ঝরে পড়ে
পর্দা কাঁপা ঘরের ভিতরে।

জন্ম : ১৯৩২। স্থান : কলকাতা। প্রথম কবিতা 'হিন্দু' পত্রিকায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ অজ্ঞাতবাস। প্রকাশিতব্য : ভারতবর্ষ, তুমি কার।

শান্তিকুমার ঘোষ

নিউ ইয়র্কে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলি

এক

পাহাড়-চূড়া নয়, সৌধ আর অট্টালিকা বেড়ে উঠছে আকাশ ফুঁড়ে
পাথুরে দ্বীপ এই ম্যানহাটানে
যায়, সূর্য অস্ত যায় প্রাসাদ-ঘেরা টাইম স্কোয়ারে
রশ্মি ঝলসে তার হর্ম্যচূড়া
ছায়া ঘনায় উপত্যকায়
পাষাণ-বাঁধা চত্বরে বন্দী তরু
সেখানে ভিড় জমিয়েছে পায়রা

গভীর খাত বেয়ে হাড্‌সন্ নদী থেকে উঠে আসে বাতাস
সজোরে ঘোরায় ভাঙা টিন, ছেঁড়াপাতা, ইস্তাহার
স্রোত উচ্ছৃত হ'য়ে পড়ে মানবতা
ঢোকে আর বেরোয় আলো-আঁধারি সুড়ঙ্গ থেকে

দুই দিকে আমার রাজপথের বিরামহীন প্রবাহ
পায়ের তলায় গর্জে ছুটছে ভূগর্ভট্রেন
আছি দাঁড়িয়ে ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার দ্বীপে
ফেনা হ'য়ে সময় ভাঙছে তটে

দুই

ভাখো, ঘোড়-সওয়ার ঘুরছে টাইম স্কোয়ারে
বেহালা-বাদক পার হ'য়ে যায় স্রোত
একি লাবণ্যে রাঙিয়ে গেল আজকের মতো সূর্য
এখন সন্ধ্যা ভরিয়ে তোলে চতুষ্ক
হর্ম্যসারির খাঁজে-খাঁজে নিরল নীলিমা
পুঞ্জে-পুঞ্জে জ্ব'লে ওঠে অপূর্ব ময়ূর
জ্ব'লে উঠলো য়ুরোপীয় যুবতীর তৃতীয় নয়ন

জন্ম : ১৯২৯। জন্মস্থান : কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা বঙ্গদর্শনে (মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত)। প্রথম কাব্যগ্রন্থ : বিতার জন্য রোমান্টিক কবিতা। প্রকাশিতব্য : পরিকল্পনা নেই।

কালীকৃষ্ণ গুহ

অমিতাদি

কবিতায় আপনাকে অমরতা দিতে চেয়েছিলাম, অমিতাদি।
আপনি বলেছিলেন, 'মানুষের অনুভূতি নষ্ট হয় না কখনো'।
কিন্তু, অমিতাদি, মানুষের মাথায় জড়তা থাকে,
আর থাকে, অক্ষম পঙ্গু হাত।

অনুভূতি-প্রবণ মানুষ তার পঙ্গু হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
একদিন বুড়ো হ'য়ে যায়।

তোমার পাশে রাত্রি ঘুম

তোমাকে ঘিরে রচিত হয় যে রাত্রি তার কাছে একদিন যাবো।
তোমাকে ঘিরে রচিত হয় যে ঘুম তার কাছে একদিন যাবো।
পুরোনো হলুদ-পাতা পরিপ্রেক্ষিতের অন্ধকারে ঝ'রে পড়বে।
চুলের স্পর্শ নিয়ে
ঝ'রে পড়বে অন্ধকার স্মৃতি।

রাত্রি ঘুমের কাছে নিয়ে যায়, ব্যর্থতার বোধ-সহ, মানুষের শরীর ও মাথা—
এই কথা জেনে নিয়ে একদিন শহর-তলিতে তোমার
রাত্রির কাছে যেতে চাই আমি।

আকস্মিক প্রেম

তোমাকে এখন আর দেখতে পাই না।
বহুদিন হ'য়ে গেল। কতোদিন হ'লো? দশবছর?
আর তো দশবছর পরে প্রৌঢ় হ'য়ে যাবো—
পৃথিবীকে মহাপৃথিবীর অর্থে ভাবতে শিখবো।
তখন কি মনে পড়বে আমাদের আকস্মিক প্রেম ছিলো
স্পর্শাতুর, অর্ধ-শারীরিক?

উদ্যান ও হ্রদ

তোমার হ্রদের কাছে একা একা কিভাবে দাঁড়াবো?
তোমার হ্রদের পাশে প্রকৃত সুন্দর এক উদ্যান রয়েছে।
'উদ্যান' ও 'হ্রদ' জানি, বাংলা কবিতার থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে এই
আশির দশকে—

তবু এরা, কখনো-কখনো, হয়তো খুব কার্যকর যৌন-প্রতিচ্ছবি।
তবে, আমি কি তোমার কাছে যৌনতা চেয়েছি ?
যৌনতার বোধ থেকে আমি কবে অক্ষরবৃত্তের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে
নেমে যাবো, একা, মৃত্যুবোধে ?

জন্মসাল : ১৯৪৪, ৩ সেপ্টেম্বর। ২. স্থান : বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি থানার ছাইবাড়িয়া গ্রাম। ৩. কাব্যগ্রন্থ (১) রক্তাক্ত বেদীর পাশে (১৯৬৭) (২) নির্বাসন নাম ডাকনাম (১৯৭২) প্রস্তাবিত গ্রন্থ : হস্টেল থেকে লেখা কবিতা। প্রথম এবং দ্বিতীয় কবিতা প্রকাশিত হয় (যতোদূর মনে পড়ছে) যথাক্রমে 'গঙ্গোত্রী' এবং 'উত্তরসূরি'তে।

প্রদীপ মুন্সী

ফেরা

দেরাজের পাল্লা খুলে যায়
ব্যবহৃত আসবাব
চিঠি
পুরোনো স্মৃতির ঘ্রাণ
যেন গোলাভরা ধান ছুঁয়ে থাকা
প্রবাসীরা ঘরে ফেরে
মৃতরাও ফিরে আসে
শরীর গড়িয়ে বৃষ্টি নামে
বুকের গোপন গুহায়
হিরন্ময় নীরবতা জ্বলে

যে যার মতন

যে যার মতন
যে যার মতন
যে যার মতন নিজের অতলে
এ শুধু নিছক শরীর
অন্য এক ধূসর ভূগোল
জানাহীন বাঁক
টেনে রাখে
অতল বিষাদে
বৃত্ত বুনে কেবলি পাক খাওয়া
শুধু
চোখ দিয়ে জানা
চোখ দিয়ে দেখা
এ শুধু নিছক শরীর

রংটং

দূরে রংটং
গুম্ফার উর্দ্ধশিখা
জানাশোনা পথ
বনের ভিতরে গাড়ি
মাটি চিরে কুয়াশা উঠে আসছে
গাড়ির ভিতরে হিম
মদের বোতল হিম
গাড়ি জড়িয়ে রূপসি অন্ধকার
নেমে আসছে !
দূরে রং টং
অস্থির শিখা

পাহাড়ের গায়ে

পাহাড়ের গায়ে বিষণ্ন
গুম্ফার কাঠে ঘুণ ধরে
সারাদিন সারারাত
পোকা কাটে

বুদ্ধকে স্মরণ করে যাই
তিস্তার জল জানে
মদের দোকানে ভীড়
ওঠা আর নামা
সবুজের পাড় ভাঙে
তিস্তার জল জানে
টারবাইন ঘুরছে ঘুরছে ঘুরে যাচ্ছে

যাওয়া

নিজের সাথে নীচু গলায়
কথা বলতে বলতে
সকলের থেকে চলে গেলেন দূরে
এখন কঠিন খরার দিন
শাবলে মাটিতে
ঘাত
প্রতিঘাত
জল শতখান
গ্রাম শতখান
নির্বিবাদে দূরে দাঁড়িয়ে এদের কথা লিখুন
নিজের সাথে নীচু গলায়
কথা বলতে বলতে
নিজেকে ছাড়িয়ে চলে গেলেন দূরে

জন্ম : ১৯৩৬, স্থান : রাজশাহী। প্রথম কবিতা উত্তরহরিতে।

পুরানো কথা : কাউণ্ট কেসলারের ডায়েরী

ভূমিকা অনুসরণ ও টীকা : কমলেশ চক্রবর্তী

[কাউণ্ট হ্যারি কেসলার ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। ক্রমান্বয়ে ফ্রান্স, জর্মনি ও ইংলণ্ডে পাঠ্য জীবন কাটান। ফলে কেবল যে বেশ কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষায় দক্ষ হ'য়ে ওঠেন তাই নয়, য়ুরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর অনুরাগ প্রগাঢ় হয়। মা ছিলেন সমকালীন বিচারে সুন্দরীতম আইরিশ মহিলা। এবং নানা কারণে পটস্‌ডাম-এর হোহেনজের্লান রাজসভায় মধ্যমণি। জন্মদাতা পিতা সম্ভবত ছিলেন কহিনীর প্রথম উলহেলম। এই অর্ধ-আইরিশ অর্ধ-নর্মন অভিজাত পুরুষ সে-সময় স্বদেশে ও বিদেশে প্রায় অধিকাংশ খ্যাতিমানদের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন রেড কাউণ্ট নামে। সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি তাঁর গভীরতর ভালোবাসার ফলে তিনি জীবনে প্রকাশনাকেই উপজীবিকা হিসেবে নির্বাচন করলেন। সমকালীন উৎকৃষ্টতম পাণ্ডুলিপিগুলো তাঁকে পেতে কখনোই তেমন বেগ পেতে হয় নি। হ্বাইমারে তাঁর ক্রানাক প্রেস থেকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন—ম্যালোল, গ্যেয়র্গে গ্রসৎ, এরিক গীল, আঁদ্রে জিদ, ফন হফমানস্তাল ও পোল ভালেরির রচনা। সংবদ্ধ হৃদ্যতা থাকা সত্ত্বেও যেসব বরেণ্য লেখক ও মনীষীদের কোনো রচনা তিনি প্রকাশ করেন নি তাঁদের মধ্যে আছেন—বার্নার্ড শ, জঁা ককতো, বেরটোল্ড ব্রেশ্‌ট, হপ্টমান, ডিয়াঘীলেফ, ও আইনস্টাইন। মানসিক দিক থেকে কেসলার ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবনার অধিকারী। যে জন্য তিনি যেমন অপছন্দ করতেন উলহেলম-মিনিয়ন রাজতন্ত্র—তেমনি সপ্রশংস ছিলেন রিপাবলিকানদের বৈপ্লবিক কাজকর্মে ও ভাবনায়। নাৎসীদের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল সে যুগে। ফলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশ ত্যাগ ক'রে পারী চলে এলেন পরবাসে জীবন যাপন করার জন্য এবং এখানেই সত্তর বৎসর বয়সে এই বিত্তশালী অথচ ঝকঝকে বুদ্ধিমান সুরুচিসম্পন্ন মানুষটি মারা গেলেন।

কেসলারের মৃত্যুর এতদিন পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল তাঁর সযত্ন

লিখিত বত্রিশ খণ্ডে চামড়ায় বাঁধানো নোটবুক। তাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন বিশ দশকের দীপ্রমান য়ুরোপীয় প্রত্যেক প্রতিভার কথা—রাজনৈতিক উত্থানপতন ও সর্বনাশের কথা। এই ডায়েরি সমকালীন সাহিত্য বা রাজনীতি দুয়েরই পঠন-পাঠনের পক্ষে এক অমূল্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছে। ডায়েরির অনেক অংশ ইংরিজিতেও সম্ভবত অনুবাদিত হয় নি। যে সব অংশ ইংরিজিতে আমি পেয়েছি এবং যেসব অংশ আমাদের জ্ঞানসীমার অন্তর্গত বলে আমার মনে হয়েছে শুধুমাত্র সেইসব অংশেরই অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল।

যেহেতু এই ডায়েরির পশ্চাৎপট সমকালীন জর্মনির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সেহেতু বিশ শতকের প্রথম দুই তিন দশকের জর্মন রাজনীতি ও সাহিত্যের ইতিহাস এরই সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াশ পেয়েছি যাতে কেসলারের কোনো অনুভূতিই অপ্রাসঙ্গিক বা সূত্রচ্ছিন্ন মনে না হয়। ডায়েরীর যে বৃহৎ অংশ এখানে অনুবাদ করা হয় নি সেখানে রাজনীতির অনেক চমকপ্রদ উত্থান পতনের অন্তরঙ্গ ইতিবৃত্ত রয়েছে—যা বাঙলা ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হ'লে অন্তত পাঠসুখের কারণ হ'তো।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কাইজার উইলহেলম্-এর পরিচালনায় জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে। ১৯১৮তে চার বছরের যুদ্ধে বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রায় সব উপনিবেশ হারিয়ে জর্মনি মিত্রশক্তির হাতে নিশ্চিতভাবে পরাজিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জর্মনির রিপাব্লিক (হ্বাইমার রিপাব্লিক) ঘোষিত হ'ল। তখন থেকে পরবর্তি ১৪ বছর পর্যন্ত জর্মনরা অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যেই কাটিয়েছে। অর্থ-নৈতিক অবস্তা ভগ্নপ্রায়, সরকার অস্থায়ী এবং জনসাধারণ জীবন কাটাচ্ছিল এক যুদ্ধোপরাধের মানসিক কালো মেঘের ছায়ায়। এডলফ হিটলার চেষ্টা করলেন ক্ষমতা অধিগ্রহণ করার—যার নাম ইতিহাসে মিউনিকের "বীয়র হাউস পুট্‌স্ক" নামে বিখ্যাত। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যার্থ হলেও, হিটলার ক্রমাগত ক্ষমতা লাভ করতে লাগলেন এবং অবশেষে সরকারের নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জর্মনির পুরোপুরি ক্ষমতা অধিগ্রহণ করলেন চ্যানচেলর হিসেবে। তারপরই ক্ষমতাসীন হ'য়েই তিনি হ্বাইমার রিপাব্লিক ভেঙ্গে দিলেন এবং নিজে ডিকটেটর হিসেবে থার্ড রেইখ স্থাপন করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিলো যে ভার্সাঈ চুক্তিতে তা ভেঙ্গে দিলেন, জাতিগত বিশুদ্ধতার জন্য

প্রচার শুরু করলেন—আর্যদের পক্ষে ও সিমিটিকদের বিপক্ষে। ১৯৩৮-এ অস্ট্রিয়া, '৩৮-এ চেকস্লোভাকিয়া জর্মনির সঙ্গে সংযুক্ত করে পরের বছর পোলাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে শুরু করলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এমনি করেই ঘটে চলল জর্মনিতে।

কাব্য সাহিত্যের পশ্চাৎপট : যেমন উনবিংশ শতকে তেমনি বিংশ শতকেও জর্মান সাহিত্য মূলতঃ ফরাসী সাহিত্যের অনুরূপ ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রকৃতিবাদের দিন শেষ হ'য়ে আরম্ভ হয়েছে বাস্তবতাবাদ ও নব্যরোমান্টিকতার ধারায় সাহিত্য সৃষ্টির যুগ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিছু সংখ্যক স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ কবিতা ও বাস্তবমুখীন নাটক ও উপন্যাসের জন্ম দিয়েছিল। এই সাহিত্য প্রচেষ্টার অধিকাংশই অবশ্য ক্ষণজীবী কিন্তু এসবের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। হিটলারের সর্বগ্রাসী শাসনতন্ত্র বস্তুত জর্মনির সব নান্দনিক ও দার্শনিক সৃষ্টির অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক, লেখক ও দার্শনিক স্বদেশ ত্যাগ ক'রে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে আত্মগোপন করলেন ; যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন—ফ্রান্সৎ ভেরফেল, এরিক রেমার্কে (ক্রামের), টোমাস মান এবং এলবার্ট আইনষ্টেইন।

বিংশ শতকের প্রথমদিকে গীতিকবিতার পুনর্জন্ম ঘটল। প্রকৃতিবাদ বিষয়ক কবিতা থেকে বিষয়ান্তর হ'ল প্রতীকবাদে এবং অভিব্যক্তিবাদে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কবিতা হ'য়ে উঠেছিল ক্রমশ শান্ত, গভীরতর ও অধিকভাবে আধ্যাত্মিক। এই শতাব্দীর প্রধান কবিদের মধ্যে আছেন : রিচার্ড দেহ্মেল (১৮৬৩-১৯২০)—যিনি প্রকৃতপক্ষে নীৎসের একজন অনুগামী, যাঁর কবিতার প্রধান তিনটি বিষয় হচ্ছে—যৌনজীবন, পরাজাগতিক জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের যোগ, এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ।

স্টেফান গ্যেয়র্গে (১৮৬৮-১৯৩৩)—চরিত্রগত ভাবে একজন অভিজাত। কাব্যচেতনার দেহ্মেল-এর ঠিক বিপরীত মেরুবাসী। তাঁর কবিতা প্রকৃতপক্ষে হিমেল, পরিমিত, রহস্যময়, নৈর্ব্যক্তিক এবং নব্যধ্রুপদী। তিনি প্রচার করেছেন কাব্যে—নৈতিক আদর্শবাদ, সৌন্দর্য, পরম সত্য আলোক এবং সহজিয়া মতাদর্শ।

হুগো ফন হফমানস্তাল (১৮৭৪-১৯২৯)—জাতিগতভাবে অস্ট্রিয়ান। জর্মন প্রতীকবাদের হোতাদের মধ্যে অন্যতম। যদিও গ্যেয়র্গের কাছে অনেকাংশে ঋণী তথাপি তাঁর কবিতা অনেক বেশি উত্তাপিত এবং অনেক সহজেই অনুধাবন-যোগ্য। হয়ত বা তিনি রিচার্ড ষ্ট্রোসের নাটকের সংলাপ রচয়িতা হিসেবে অনেক বেশি পরিচিত। স্ট্রোসের প্রায় সব নাটকেরই সংলাপ অংশ তাঁরই রচিত।

রাইনের মারিয়া রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬)—ইনি প্রাগ শহরে জন্মেছিলেন। কবি হিসেবে স্টেফান গ্যেয়র্গে, শার্ল বোদলেয়ার এবং রুশীয় উপন্যাসকারদের অনুগামী। গ্যেয়র্গের থেকে অনেক বেশি দরিদ্র মানুষ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি আস্থাবান। বস্তুত কবিতায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নিরত।

কবিরা ভিন্ন উপন্যাস ও নাটকে এই সময় যাঁরা প্রখ্যাত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে—রিকার্ডা হাক্, হেরমান স্টের, হাইনরিখ মান, হানস গ্রীম, হেরমান হেসে, ফ্রানৎস কাফ্‌কা, আর্নষ্ট ভিচার্ট, এরিখ মারিয়া রেমার্কে, ইয়াকব ভাসেরমান, টোমাস মান, ফ্রানৎস ভেরফেল ইত্যাদি।]

১. বের্লিন, জানুয়ারী ২৮, ১৯১৯

আজকে মধ্যাহ্নভোজে ভাইলাণ্ড হের্জফেল্ড-এর কাছে শুনলাম তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যার কথা। কাগজের নাম এভরিম্যান হিজ ওন ফুটবল। গ্যেয়র্গে গ্রৎস ছবি আঁকবেন। প্রথম সংখ্যা—সুন্দর অশ্বশকট ও মোটরগাড়ীর ভ্রমণরত সৈনিক ও ছাত্রদের মধ্যে হকারদের দিয়ে বিলি করা হবে। খানিকটা অদ্ভুত ও খানিকটা গভীর। পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ হবেন গ্যেয়র্গে গ্রৎস। তিনি একটা সিরিজ ছবির পরিকল্পনাও করেছেন 'সুদর্শন জর্মান পুরুষকুল' নামে। হের্জফেল্ড-এর বর্ণনায় তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য "এতকাল যা কিছু জর্মনরা নিজেদের প্রিয়তম ব'লে জ্ঞান করেছেন সেই সবকিছু ধূলায় লুণ্ঠিত ক'রে দিতে হবে।" অন্যভাবে বলা যায় একটু খোলা হাওয়ার দমক লাগিয়ে দেওয়া আর সব গৃহীত আদর্শকে নাড়া দেওয়া। যেহেতু তিনি বিদেশনীতি বিষয়ে তেমন ওয়াকিবহাল নন তাই খানিকটা নির্দেশ চেয়েছিলেন। আমি যখন একটা মোটামুটি চেহারা

বর্ণনা করলাম তখন মনে হল সে সব কথা তাঁর কাছে গ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বুদ্ধিবৃত্তিকে সচল রাখার জন্য আরিস্তফেনিসের কর্মকৌশল। ব্রীয়র হাউস বুদ্ধিজীবীদের যেমন, তেমনি ঘুণে-ধরা ঐতিহ্য, মহৎ মানবতার অস্পর্শনীয় ব্যাপ্তি, অলঙ্ঘনীয় মূর্খতা ও জড়ত্ব—পুরনোদের এমনকি, র‍্যাডিক্যালদের পর্যন্ত শত্রু হ'য়ে উঠবে। 'না হে কার্ল মার্ক্স'!—নামক তাঁর নিবন্ধ তো কেবল সূচনা। হয়তো বা কিছুটা ছেলেমানুষীও আছে তবু এই কাগজ এক অচলায়তন ভাঙার হাওয়া প্রবাহিত করবে ব'লে মনে হয়।

১. ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯১৯

গ্যেয়র্গে গ্রৎস-এর বিশাল রাজনৈতিক চিত্র—'জর্মনি—এক শীতকালীন গল্প' দেখতে গিয়েছিলাম। এ চিত্রে তিনি পূর্বতন শাসকশ্রেণীকে ব্যঙ্গ করেছেন যেন বুর্জোয়া সমাজের অতিভোজী ঘৃণ্য জীবদের সহযোগী হিসেবে। তিনি যেন জর্মন হোগার্থ, সচেতনভাবে সোচ্চার ও নীতিবাগীশ—করতে চান দীক্ষিত, উন্নত ও পরিবর্তিত। বিমূর্ত শিল্পের প্রতি তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। তাঁর বাসনা এই চিত্রটি স্কুলগুলোর দেয়ালে শোভা পাক। আমার অভিমত প্রকাশ করলাম এই ব'লে—সম্ভবত শিল্পীর পক্ষে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ না করেও, হয়তো আরো ভালোভাবে, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারে যা তিনি করতে চান। এই প্রচার কার্যের জন্য হয়তো বা শিল্প বেশ কিছুটা অতিরিক্ত মূল্যবান মাধ্যম। যদিও এমন কিছু কিছু জটিল নৈতিক অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব যা কেবলমাত্র কোনো শিল্পসম্মত মাধ্যমেই অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। গ্রৎস তারপর তাঁর মত ব্যক্ত করলেন এই বলে—সব শিল্পই বস্তুত অবাস্তব, এক রকমের অসুস্থতা। শিল্পী একজন ভূতেপাওয়া, বাতিকগ্রস্থ মানুষ। শিল্পের কোনো প্রয়োজন এই ভূমণ্ডলের নেই। শিল্প ছাড়াও মানুষ জীবন ধারণ করতে পারবে।

বস্তুত গ্রৎস শিল্পের ক্ষেত্রে একজন বলশেভিক। চিরাচরিত চিত্রশিল্পের প্রতি, আজ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যহীনতার প্রতি তাঁর ঘৃণা অপরিমেয়। তিনি যেন কোনো কিছু একেবারে নূতন, ঠিক ভাবে বললে, এমন কিছু চিত্রশিল্প, যা একদা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলো (যেমন হোগার্থের

ধর্মীয় চিত্রমালা) অথচ যা গত উনিশ শতকেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে—তেমন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি একধারে প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লবী: এই বর্তমান সময়ের এক প্রতীক।

৩. মার্চ ১৬, ১৯১৯

আমি যে চিত্রটি ক্রয় করেছিলাম তার মূল্য দিতেই গিয়েছিলাম গ্যেয়র্গে গ্রৎস-এর গৃহে। আমাকে বসতে বলে তিনি ষ্টুডিওর ভেতরে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর এক বন্ধু যিনি গত রাতে তাঁর ওখানেই ছিলেন তিনিও চলে গেলেন। মনে হয় পলায়নপর কোনো কমিউনিস্ট বন্ধু।

গ্রৎস বললেন অনেক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা—এমন কী আইনস্টেইন পর্যন্ত এক আবাস থেকে অন্য আবাসে পলায়নপর। যদিও তিনি নিজে এখন আবার কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। এমন কী তিনি আর এক সংখ্যা 'প্লেইৎ' (দেউলিয়া) পত্রিকাটি প্রকাশের তোড়জোড় করছেন। যাতে আরো গভীরতর ব্যাঙ্গ চিত্র অধিক সংখ্যায় দেবেন। গত কয়েকদিনের এমন কিছু ঘটনা তিনি বর্ণনা করলেন যা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। গোঁড়া স্পার্টাসিষ্টরা[১] এক অবিশ্বাস্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করছে। এইসব ঘটনা থেকে এই কর্মীদের সম্পর্কে তাঁর মনে এক নবতম ভাবনার জন্ম হয়েছে: শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই এদের দলের দ্বিতীয় সারিতে সামিল হ'তে হবে। যে ঘটনাটি সবচেয়ে তাঁর মনে রেখাপাত করেছে তা হচ্ছে—ইডেন হোটেল এলাকার একজন লেপ্‌টেন্যান্টকে যখন একজন সৈনিক সামান্য কর্কশভাবে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলো। তখন সে সৈনিকটিকে গুলি ক'রে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। সৈনিকটির সঙ্গীরা দুঃখে ও ক্ষোভে কেবল চোখের জলই ফেলেছিলো। গ্রৎস স্পার্টাকাস দলের মতাবলম্বী হ'য়ে গেলেন। কোনো ধারণা-ভাবনার জন্য এমন কি হিংস্রতারও প্রয়োজন। বুর্জোয়া প্রতি-রোধের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ করার অন্যকোনো পদ্ধতি আর নেই। আমি প্রতিবাদ করলাম। যে কোনো ধ্যানধারণাই হীনতাপ্রাপ্তি হয় যদি তা অভিসিক্ত হয় হিংসার দ্বারা।......তাঁর মতে আস্থাহীনতা ও রক্তের ছোপ লাগালে এই

১. ১৯১৮ সালের চরমপন্থী বিপ্লবী জর্মান স্পার্টাকাস দল।

সরকার আর বেশিদিন চলতে পারবে না। কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে কমিউনিষ্টদের মধ্যে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না যিনি শাসনবিদ হ'তে পারেন। কমিউনিষ্ট পার্টিতে কেবলমাত্র রোজা লুক্‌সেমবর্গ ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সম্ভবত জর্মনির শাসক হ'তে সমর্থ।

৪. মার্চ ১৬, ১৯১৯

ডোবলার নামক একজন কবির সঙ্গে গিয়েছিলাম আইনবিদ ভেরথোর-এর কাছে হ্বিলাণ্ড হের্‌ৎফেল্ড-এর মামলাটা নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে। হের্‌ৎফেল্ড ৭ই মার্চ বন্দী হয়েছে—মোয়াবিট থেকে তাকে প্লোয়েৎজেনসি কয়েদখানায় নিয়ে গেছে। গ্যেয়র্গে গ্রৎস-এর সৈনিকদের হাতে তাঁর গৃহেই ধরা পড়ার কথা। তিনি আসলে অন্য একজনের পরিচয়পত্র প্রদর্শন ক'রে পালিয়ে যান। সেই থেকে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আজ রাতে এখানে কাল আবার অন্যখানে—যেমন আমি করেছিলাম ওয়রশতে……এখনো সেই ২৪ জন ফোক্‌স্‌মারিন বিভাগের নাবিকদের গুলি ক'রে হত্যার দৃশ্য ভুলতে পারি না। ওরা গিয়েছিলো ওদের মাসকাবারি মাইনে আনতে অথচ উঠোনেই ওদের উপর সামনে থেকে গুলি করা হ'লো। গৃহযুদ্ধে এর চেয়ে বীভৎস অন্য কোনো অপরাধ তো আমি মনে করতে পারি না। সন্ধ্যাবেলা ম্যাকস রেইনহার্ট-এর এস য়ু লাইক ইট দেখতে গিয়ে বসেছিলাম কিন্তু মানসিক অবস্থা তেমন ছিলো না ব'লে আর ব'সে থাকা গেল না। আজকের বের্লিনে এই যে অসংখ্য হত্যা ও সরকারী জহ্লাদদের দৌরাত্ম্য যা নৈমিত্তিক হ'য়ে উঠছে তাতে আর কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

আজ গ্রৎস-এর চিঠি পেলাম। লিখেছেন "যেহেতু এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধায় রয়েছি তাই আপনি কি দয়া করে জানাবেন, যে ছবিটি আপনি নেবেন ব'লে স্থির করেছেন তার বিনিময়ে কিছু অর্থ আমি পাবার আশা করতে পারি!" চিঠির ঠিকানা তাঁর স্টুডিও। ফলে মনে হয় তিনি আবার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আমি একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানালাম আমি রবিবার বারোটা থেকে একটার মধ্যে তাঁর ওখানে যাবো এবং ব্যাপারটা মিটিয়ে আসবো।

৫. হ্বাইমার, ১৩ মে ১৯২০

ফ্রাউ ফোরস্টের-নীৎসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দাবী করলেন —তিনি একজন জাতীয়তাবাদী—অর্থাৎ রাজতন্ত্রবাদী। এবং তাঁর ভ্রাতা নিজেকে জর্মন বলেই মানতে রাজি নন—নিজেকে মনে করেন পোল। এইসব কাউন্টেস ও মহামহিমদের দেখে তাঁর মাথাটা একেবারে ঘুরে গেছে।

৬. ১০-১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২১

একটি প্যাসিফিস্ট দলের প্রতিভূ হিসেবে আমাকে এলবার্ট আইনস্টেইনের সঙ্গে আমস্টারডম যেতে বলা হয়েছে। সেখানে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে পারীর পুনর্গঠনের কাজ বিষয়ে আলোচনা করতে। এই বিষয়টির পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন এডুয়ার্ড বার্নস্টেইন, হ্বালথের রাথেনো ইত্যাদি···।

আজ খুব ভোরে বেনথেম-এর কাছে সীমান্ত পার হলাম। মনে হ'লো যেন জীবনে প্রথম একটা ঘুমবার সুব্যবস্থা আছে এমনি শকটে চেপেছেন আইনস্টেইন। সব কিছুই দেখে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে উঠছিলেন। পথে আমি তাঁকে জিগ্‌গেস করলাম—তাঁর থিয়রী অব রিলেটিভিটির জ্যোতির্বিদ্যা সম্ভূত অনুমিতি কি জ্যোতির্বিদ্যাবিধেয় গঠিত অণুর সম্পর্কেও মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে? আইনস্টেইন বললেন—না, তা সম্ভব নয়। কারণ অণুর আয়তন ও সূক্ষ্মতাই এখানে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। বললাম—তবে আয়তন ও পরিমাপ -বৃহত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব—একটাকে অবশ্যই সত্য হ'তে হবে—হয়তবা এই হবে একমাত্র সত্যের নিদর্শন। আইনস্টেইনও স্বীকার করলেন—আয়তন হচ্ছে সব সত্যের শেষতম যার থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই। এই বিষয়টির আরো বিশ্লেষণ হওয়া উচিত—কারণ পদার্থ বিদ্যার গভীরতম রহস্যই হচ্ছে—আয়তনের ব্যাখ্যাহীনতা ও দূরত্ব। একটি লৌহ অণু অন্য একটি লৌহ অণুর সমপরিমাপের—তা বিশ্বের যেখানেই তার অস্তিত্ব থাকুক না কেন। তথাপি মানুষ সেটা নানা পরিমাপের অণুর কল্পনা করতেও সমর্থ।

ঠাট্টা ক'রে বললাম, তবে তো মানুষ ঈশ্বরের তুলনায় অধিক চতুর ব'লে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্পর্কে এটাই নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে তাঁর

মধ্যে মানবিক চাতুর্যের অভাব রয়েছে। মানুষ তার অপরিসীম জটিল কল্পনা ও চাতুর্য নিয়ে ঈশ্বরের উপর আস্থাশীল হয়েছে—যেন মুক্তোটা রয়েছে ঝিনুকের ভেতর। ঈশ্বর বস্তুত এতোই প্রাচীন যে তাঁর পক্ষে কোনোরূপ চাতুর্যেরই আর প্রয়োজন নেই। আইনস্টেইন বললেন, অপরপক্ষে, প্রস্তুতির ভেতর যত বেশি একজন অন্তর্লীন হ'তে পারবেন ততো বেশি তাঁর ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য জন্মাবে।

৭. বের্লিন, মার্চ ১০, ১৯২২

আইনস্টেইনদের সঙ্গে নৈশভোজ। বেশ মনোরম এপার্টমেণ্ট—প্রভূত ও রাজসিক খাদ্যের আয়োজন। নৈশভোজের আনুষ্ঠানিকতা যেন এই অমায়িক শিশুসুলভ দম্পতিকে এক সারল্যে ঘিরে রেখেছিল। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন—বিত্তবান শিল্পপতি কোপেল, আমানতব্যবসায়ী মেনডেলশন ও হল্যারবুর্গ, (যথারীতি আলুথালু বেশে) পুরনো উপনিবেশিক মন্ত্রীসভার ডার্নবুর্গ।...... আমি আইনস্টেইন ও তাঁর পত্নীর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার সময় থেকে তাঁদের দেখি নি। জিগগেস করলাম—মার্কিনমুলুক ও ইংলণ্ডে তাঁদের কেমন অভ্যর্থনা দেওয়া হ'ল। উত্তরে বললেন—প্রায় একটা বিজয়উৎসবের মতো। যদিও আইনস্টেইন এইসব ব্যাপারে কণ্ঠে একটু ব্যঙ্গ ও দ্বিধা প্রকাশ করলেন, তিনি নিজে অনুধাবন করতে পারছেন না কেন মানুষ তাঁর থিয়োরী-বিষয়ে এতটা উৎসাহী, তাঁর স্ত্রী বললেন—তিনি নাকি প্রায়ই বলেন, নিজেকে তাঁর প্রতারক ব'লে মনে হয়, মনে হয়, বিশ্বাস-হন্তা। যেন মানুষ যা তাঁর কাছে চেয়েছিল তা তিনি তাদের দিতে পারেন নি। খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পারী যাবেন, তারপর হেমন্তে টোকিও এবং পিকীং-এ বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণও রয়েছে। তিনি নাকি তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন—যতদিন এই মজার খেলা চলবে ততদিন হয়ত প্রাচ্যের কিছুটা দেখার সুযোগ মিলবে।

অন্য সবাই বিদায় নেবার পর তিনি ও তাঁর পত্নী আমাকে একটু অপেক্ষা ক'রে যেতে বললেন। আমরা একটা কোনায় ব'সে আড্ডা জমালাম। আড্ডায় ক্রমশ আলোচনা তাঁর তত্ত্ব-ঘেঁষা হ'য়ে উঠলে আমি জানালাম তাঁর তত্ত্বটি পুরোপুরি অনুধাবন না করতে পারলেও কিছু একটা ধারণা করতে পারি। হেসে

বললেন, আসলে এগুলো খুবই সহজ এবং তিনি এর এমন ব্যাখ্যা দিতে পারেন যা আমার পক্ষে বোধগম্য হবে। আমাকে কল্পনা করতে হবে আমাদের সামনে একটা টেবলে একটা কাঁচের গোলক রয়েছে যার ঠিক মাঝখানে একটা আলো রাখা আছে। গোলকটির ওপরের অংশে কী দেখা যাবে—দেখা যাবে চ্যাপটা কয়েকটা রেখা অর্থাৎ দুইতল বিশিষ্ট রেখা বলয়। এই পর্যন্ত সহজ। গোলকটি দুইতল, অসীম তথা সসীম তলবিশিষ্ট। এখন কল্পনা করুন টেবলের উপর গোলকের রেখা-বলয়গুলো ভেতরের আলোর প্রভাবে যে সব ছায়া ফেলছে, ছায়াগুলো এবং টেবলের উপরে সবদিকে তার বিস্তৃতি প্রকৃতপক্ষে অসীম অথচ সসীম ধারণা, অর্থাৎ ছায়ার সংখ্যা অথবা ছায়ার অংশগুলো যা টেবলের উপর প্রলম্বিত হ'য়ে আছে তা নির্ধারণ করা যাবে রেখা-বলয়ের সংখ্যাদ্বারা এবং যেহেতু রেখা-বলয়ের সংখ্যা সীমিত সেইহেতু ছায়ার সংখ্যাও সীমিত। এখানে আমাদের ধারণায় এমন একটি তল পাওয়া গেল যা অসীম হওয়া সত্ত্বেও সসীম। এখন কল্পনা করা যাক, চ্যাপটা দুই তল বিশিষ্ট রেখা-বলয়-এর স্থানে এমন একটি কাঁচের গোলক যা ত্রিতল বিশিষ্ট এককেন্দ্রিক এবং পুনরায় ওই ছায়া বিস্তারের ঘটনাটা করুন। এবং তখনি পাবেন, অসীম অথচ সসীম তল-এর ধারণা অর্থাৎ দুই তলের পরিবর্তে ত্রিতল বিশিষ্ট স্থান। আইনস্টেইন বললেন, আসলে এই ধারণাটা হ'চ্ছে তাঁর তত্ত্বের একটা ছবিমাত্র, তত্ত্বের অর্থ নয়। তত্ত্বের অর্থ নিহীত রয়েছে বস্তু, তল ও কালের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। এর কোনেটির মধ্যে কোনো একটির একক অস্তিত্ব নেই, অন্য দুটির সম্পর্কেই এর অস্তিত্ব। বস্তু, তল ও কালের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই কেবলমাত্র রিলেটিভিটি তত্ত্বের নবসংযোজিত অংশমাত্র। তাই তিনি এখনও বুঝতে পারেন না কেন এই তত্ত্ব মানুষের মনে এতো উত্তেজনার সঞ্চার করেছে। যখন কোপারনিকাস প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী সব সৃষ্টির মধ্যস্থলে নেই তখন তাঁর আবিষ্কার যে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলো তার কারণ বোধগম্য হয়। এই আবিষ্কার নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পর্কে সমস্ত প্রচল ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু আইনস্টেইনের তত্ত্ব সে হিসেবে মানুষের নিজের সম্পর্কের ধারণার কতটুকু পরিবর্তন ঘটাবে! পৃথিবীর সম্পর্কে যে কোনো ধারণা, যে কোনো দর্শন, এই তত্ত্বের সঙ্গে সহজেই পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এমন কি একজন আদর্শবাদী থাকেন আদর্শবাদী হয়েই,

যেমন বস্তুতান্ত্রিক থাকবেন বস্তুতান্ত্রিক অথবা প্র্যাগমাটিস্ট থাকবেন প্র্যাগমাটিস্ট !

৮. ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

কবি ভোলমোয়েলার, এখনো তেমনি মজাদার, পাগলাটে ও তীক্ষ্ণ রয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন কবি দানানৎজিও'র মুসোলিনি সম্পর্কে কী ধারণা। দানানৎজিও বিশ্বাস করেন যে মুসোলিনি তাঁকে হত্যা করাবার জন্য নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এমন কী যে স্ত্রীলোকটি দানানৎজিওকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলো সেও মুসোলিনির দ্বারাই প্রেরিত হয়েছিলো তাঁকে খতম করার জন্য।

৯. ভাইমার, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

আজ সন্ধ্যায় আমি যখন ফ্রাউ ফোয়েরস্টার নীটসের সঙ্গে দেখা করতে যাই—তখন আমাকে দেখে উত্তেজনায় টগ্‌বগ ক'রে বললেন তাঁর সঙ্গে মুসোলিনির বন্ধুতার কথা। আমি বললাম, আমি শুনেছি এবং শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছি। বিশেষত তাঁর ভ্রাতার কথা ভেবে। মুসোলিনি সমস্ত য়ুরোপের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি। যে য়ুরোপ, তাঁর ভ্রাতার কল্পনায় সমস্ত 'সাধু য়ুরোপবাসীর' জন্য। বেচারি বৃদ্ধা একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লেন কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে বিষয়ান্তরে এলেন আলাপচারিতা স্বাভাবিক করবার জন্য। তিনি প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই, এবং চেহারায় তা বেশ লক্ষ্যণীয় হ'য়ে উঠেছে।

১০. ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

আইনস্টেইনরা আমার সঙ্গে নৈশভোজে এলেন। ফ্রাউ আইনস্টেইন জানালেন যে তাঁর স্বামী শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিদেশমন্ত্রক দপ্তর থেকে তাঁর দুটো স্বর্ণপদক নিয়ে এসেছেন—যে দুটো তাঁকে দিয়েছিলো রয়েল স্সোসাইটি এবং জ্যোতির্বিদ সমাজ। পরে যখন তিনি তাঁকে জিগ্‌গেস করলেন, পদকদুটো কেমন দেখতে তখন দেখলেন আইনস্টেইন ওগুলোর মোরক পর্যন্ত খুলে দেখেন নি। এইসব সামান্য ব্যাপারে মনোনিবেশ করবার মতো সময় তাঁর নেই। আকাদেমির গত সভায় যখন একজন তাঁকে বললেন যে তিনি তাঁর পদকগুলো গলায় ঝোলান নি—হয়তো বা তাঁর পত্নী তাঁকে ওগুলো দিতেই ভুলে গিয়েছেন,

শুনে আইনস্টেইন প্রবল প্রতিবাদে জানালেন, "না না ভুলে যান নি। আমিই পড়তে চাই নি।"

১১. পারী, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

হতভাগ্য ইসাডোরা ডানকান গতকাল মারা গেছে। তাঁর শালের একপ্রান্ত একটা গাড়ীর পেছনের চাকায় আটকে যায়--অন্য প্রান্তটা তাঁর গলায় জড়ানো ছিলো, ফাঁস লেগে মারা গেছে ইসাডোরা। কী নির্মম ভাগ্য! যে শাল তাঁর নৃত্যের অন্যতম উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হ'তো এতকাল তাই তাঁর জীবন-হানির কারণ হ'ল। যেন নৃত্যমঞ্চের এই উপকরণ তাঁর উপর এক নির্মম প্রতিশোধ নিল সুযোগ পেয়ে। ইসাডোরার জীবনটাই ঘিরে ছিল নানা বেদনা। তাঁর ছোট ছোট দুটি শিশু মারা গেছে মটোর দুর্ঘটনায়। তাঁর স্বামী ইসেনীন আত্মহত্যা করেছিলেন। এবং এখন যা তাঁর শিল্পকীর্তির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাই কারণ হলো তাঁর অপঘাত মৃত্যুর। তাঁর শিশু সন্তানদের মৃত্যুর আগের দিন আমি রাশিয়ান ব্যালের তাঁরই নির্দিষ্ট আসনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে পরের দিন মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল তাঁর সন্তানদের নৃত্য দেখাবেন। কিন্তু আমি সময়াভাবে যেতে পারি নি। সব সময় আমার মনে হয় যদি সেদিন আমি মধ্যাহ্নভোজনে যেতে সক্ষম হতাম তবে হয়তো বা ঐ দুই শিশুর মৃত্যু হ'তো না। হায় ইসাডোরা। তাঁর প্রথম জীবনের নৃত্য বিষয়ে আমার তেমন একটা বিশেষ উঁচু ধারণা ছিল না। তখন তিনি ছিলেন কেমন যেন আগোছালো, পেশাদার, এবং অমার্জিত। কিন্তু পরে তিনি গোর্ডোন গ্রেইগ এর কাছে অনেক কিছু শিখেছেন। এবং তিনি আমাকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেছেন তাঁর নৃত্য দেখতে। আমি আমার বিষয় জানালে তিনি মার্কিনী-ঘেঁষা ফরাসীতে বলতেন—'আপনি যখন আগে আমার নাচ দেখেছেন তখনও আমার নৃত্যের কলাকৌশল তেমন ক'রে রপ্ত হয় নি, বস্তুত আমি সত্যিকারের নাচ বিষয়ে কিছুই প্রায় জানতাম না, কিন্তু এখন…'।

আমি তাঁকে প্রথম বের্লিনে দেখি। শহরে তখন অবিরাম তুষারপাত চলছিল। রাস্তাঘাট কাদা প্যাচপেচে। আমি প্রথম তাঁকে দেখলাম একটা হলঘরে—আমি ঢুকছি তিনি বেরুচ্ছেন। চওড়া লালচে রংয়ের ভূমিচুম্বিত

আলখাল্লা আর তারপর পাদুকাবিহীন দু পা—যদিও দু পায়ে ছিলো গালোশ। সেখানে দাঁড়িয়ে পা থেকে গালোশ জোড়া খুলে নিলেন এবং আমার বিস্মিত চোখের সামনেই খালিপায়ে প্রবেশ করলেন সালোঁতে। কাউন্টেস হারাক তখনকার দিনের বের্লিন রাজসভায় সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা এবং স্বয়ং আভিজাত্যবিলাসিনী সম্রাজ্ঞীর সখী। সেই কাউন্টেস হারাক হচ্ছেন সালোঁর অধিকর্ত্রী। আর ইসাডোরা তাঁরই নয়নের মণি। সম্রাজ্ঞীকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো—কোনো মহিলা যদি খালি পায় বিচরণ করেন তবে কি তা অনৈতিক ব'লে বিবেচিত হবে। সম্রাজ্ঞীর পরিচারিকা তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন অভয়-বাণীতে। (এ ঘটনাটি আমি অন্যদিন পরিচারিকার মুখেই শুনি।) এই ঘটনা থেকেই ইসাডোরার সমর্থনে এক খ্রীষ্টিয় মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছিল। ইসাডোরার এই রবরবা বেশ কিছুদিন চললো। যতদিন না পর্যন্ত একথা অগ্রাহ্য করা গিয়েছিল—এই অক্ষতযোনি ইসাডোরা খুব শিগগিরি একটি সন্তান লাভ করবেন। সেই মুহূর্তে এই মহিলা সমিতি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল, আর ইসাডোরা হঠাৎ একদিন বের্লিন ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

হায় ইসাডোরা, সারা জীবনে তুমি যা কিছু প্রথাসিদ্ধ, যা কিছু বিত্তায়তনীয়, অনেক প্রযত্ন সত্বেও কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হ'লে। চেষ্টা করেছিলে ক্ষুদ্র নীতিবাগীশ মার্কিনতাকে তোমার শিল্প থেকে বাদ দিতে—মুক্ত প্রেমে আস্থা রেখে, এমন কি নিজের সন্তানের জনক নিজেই বেছে নিয়ে। অথচ তিনি ছিলেন, এতৎসত্বেও সত্যিকারের একজন শিল্পী। এবং তাঁর শিল্প ও বেদনা-ব্যর্থতা ছিলো তাঁর ক্যালিফোর্নিয়ার মফঃস্বল শহরে মানুষ হ'য়ে তাঁরই চরিত্রের অঙ্গ। যে নৃত্য আজ আমরা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত বলে স্বীকার করেছি এবং এমন কি রাশিয়ান ব্যালে পর্যন্ত—সম্ভবত এই পর্যায়ে পৌঁছুতে পারতো না ইসাডোরা না থাকলে। এই সব কিছুই পরিবর্তিত হয়েছিল তাঁরই দ্বারা।

১২. পারী, সেপ্টেম্বর ৬, ১৯২৭

গিয়েছিলাম পোল ভালেরির কাছে—আমার জন্য ভর্জিলের গেয় গীক্স্ অনুবাদ করার অনুরোধ করতে। ভালেরি, সযত্নে সিঁথি কাটা রুপোলীচুল, সম্ভ্রান্ত কালো পোষাক, সম্মানার্থে পরিহিত নকল গোলাপ—সব নিয়ে ঠিক যেন

একজন অভিজাত রাজপুরুষ। তখন তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন নানা অনুবাদ কর্মে এবং গেয়র্গীক্স্ অনুবাদে ছিল তাঁর একান্তই অনীহা। বললেন, গ্রাম্য-জীবন বিষয়ে তিনি প্রায় কিছুই জ্ঞাত নন—কেবল জানেন সমুদ্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কথা। এমন কী একদিন মালার্মেকে পর্যন্ত তাঁকে বোঝাতে হয়েছিল—কাকে বলে গোধূম। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মালার্মে তাঁর এক অন্যতম স্মরণীয় বাক্যবন্ধ রচনা করেছিলেন এই প্রসঙ্গে। ভালেরি গেছেন মালার্মের গ্রামের আবাসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—তখন গ্রীষ্মের শেষাশেষি, যখন মাঠে মাঠে সাজানো রয়েছে স্বর্ণবর্ণ গোধূম। দুই কবি মাঠের আলপথে চলছেন—ভালেরি জানতে চাইলেন এইসব ঘাসের নাম। মালার্মে বললেন, "ম্যা, মঁশের, সেৎ দ্যু ব্লে"।[২] ভালেরি হয়তো তখন সেই সোনালি ফসলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন তাঁর নিকট যা অনেক বেশি আকর্ষণীয়, শারীর আগামী কনসার্ট সীজনের কথা। মালার্মে বললেন, "C'est le premier coup de cymbales de l'automne"।[৩] ভালেরি অবশ্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আঁদ্রে জিদের কাছে গেয়র্গীক্স্ অনুবাদের জন্য—কারণ সে চিরদিন চাষবাসে খুবই উৎসাহী।

নিজের রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন—গত পাঁচ বছরে তিনি এমন কিছুই রচনা করেন নি যাতে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল—যা কিছু লিখেছেন সবই কোনো না কোন অনুরোধ সাপেক্ষে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত কেউ তাঁর কোনো রচনার প্রতি মনোযোগ অনুভব করে নি। তারপর তিনি হঠাৎ একদিন হয়ে উঠলেন সকলের আদর্শ—সকলের অভিষ্ট—আর সেই থেকে তিনি নন নিজের নিয়ন্তা। তাঁকে চাটুকরিতার জন্যই বললাম : 'এটাই তো খ্যাতির বিড়ম্বনা।' 'একথা প্রত্যেকে আমাকে বলে আর প্রতিবার আমি প্রতীক্ষা করি পরবর্তী চাটুকারকে আমি গলা টিপে হত্যা করবো।'

ভালেরি সম্পর্কে আমার ধারণা, তিনি একজন পুরানো আমলের অভিজাত দার্শনিক ও বাণিজ্যিক—এগুলো সব তাঁর মধ্যে সমভাবে মিশে গেছে আর তা অলঙ্কৃত করেছে বুদ্ধিমত্তা ও বিবেক। মানসিক গঠন ও দূরদৃষ্টি তাঁর অপরিচ্ছন্ন গভীরতার উপর একটা চমৎকার আবরণ সৃষ্টি করেছে। এই আবরণ আসলে বর্ণনসাধ্য নয় এবং সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে ছদ্মবেশী।

২. বন্ধু, এর নাম গোধূম। ৩. এ হচ্ছে বিদায়ী হেমন্তের শেষ ঘণ্টাধ্বনি।

১৩. বের্লিন, ২৯ অক্টোবর

ফার্দিনান্দ ব্রাকনার-এর 'অপরাধী' দেখলাম। বিষয় হ'চ্ছে—আমরা প্রত্যেকে একএকজন অপরাধী অথবা, পক্ষান্তরে কোনো অপরাধীর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা—রুশোর ধারণা অনুযায়ী, অপরাধীর সৃষ্টি করে। তেমন কিছু ভালো হয়েছে তা বলা যায় না। কেবলমাত্র বিশাল মঞ্চকে ছয় ভাগে ভাগ ক'রে ছয়টি দৃশ্যের অবতারণা ও যেভাবে সমকালীনতার বিষয় মঞ্চে উপস্থাপনা করা হয়েছে তা নাটকটিকে সত্যিকারের অভিনবত্ব দিয়েছে। নাটকের এই সমকামীনতা বিষয় অবশ্যই হেইনরিখ মান-এর 'বিবি' নাটকের তুলনায় সোচ্চার অথচ দর্শকরা একবারও কোনো অসন্তোষের কারণ খুঁজে পান নি। যে দৃশ্যটিকে কোনো কিছুই ঢেকেঢুকে নেই, যেমন একটি দৃশ্য যা মহিলাদের নিজস্ব ঘরের মতো ক'রে সজ্জিত, সেখানে একজন মার্জিত চেহারার যুবক বছর ১৬ বয়সের একজন বালককে কোলে বসিয়ে তাকে চুম্বন করছে—তাতেও দর্শকরা কোনো আপত্তিকর কিছু পান নি। দর্শকদের কাছে যেন সব ব্যাপারটা সহজভাবে বোধগম্য—নূতন ক'রে বোঝার কিছুই নেই। দুইজন রমণীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ, কিংবা একজন পুরুষ ও একজন বালকের মধ্যে সমকাম দৃশ্য যেমন প্রাচীন গ্রীসে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করা হতো তেমনি এরাও গ্রহণ করছেন—যদিও ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত নাটকের ক্ষেত্রেই কেবল সীমাবদ্ধ !

১৪. বের্লিন ২২ জানুয়ারী ১৯২৯

শ্রীমতী হ্যারল্ড নিকলসন, সঙ্গে ভার্জিনিয়া ও লিওনার্ড উল্‌ফ্ আমার গৃহে চায়ে এসেছিলেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ দীর্ঘাঙ্গী, একটু রুক্ষদর্শন, হৃতযৌবন এবং চেহারায় কেমন যেন একটা ক্ষয়িষ্ণুতার ছাপ প্রতীয়মান। অথচ যথার্থ অভিজাত ইংরেজ মহিলাসুলভ মিষ্ট স্বভাব। লিওনার্ড উল্‌ফ্—অত্যন্ত অসপ্রতিভ, আলাপচারিতার সময় কেঁপেঝেপে অস্থির, চতুর, কল্পনাপ্রবণ মানুষ। আমরা আমার ক্রানাক প্রেসের জন্য শ্রীমতী নিকলসন-কৃত রিল্‌কের অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করলাম। অধ্যাপক-দুহিতা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ যথার্থভাবে একজন উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিভূ। এবং শ্রীমতী নিকলসনও যথার্থ ই একজন ভদ্রমহিলা, সম্ভ্রান্ত, দীর্ঘাঙ্গী ও মেদহীন, সহজসরল স্বভাব যা তাঁর প্রত্যেকটি আচরণে

প্রকাশ পায়। উনি যেন জীবনে কোনোদিন কোনো অবস্থায়ই হতভম্ব হন না অথবা কোনো সামাজিক বেড়া ডিঙাতেও তার অসুবিধা হয় না।

১৫. বের্লিন, ১৩ এপ্রিল, ১৯২৯

তরুণ ইহুদি মেনুহিন-এর কনসার্ট ছিলো। এই তরুণ ছেলেটি সত্যিই আশ্চর্য। ওর বাজনার মধ্যে যেন ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিভার স্ফুরণ ও শিশুর সারল্যময় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ প্রায়। তাঁর অভূতপূর্ব আঙ্গিক কিন্তু স্বাভাবিক-ভাবেই গৌণ হ'য়ে যায়। একটা আশ্চর্য অনুভূতি হয় তার সঙ্গীতশৈলীর জন্য, যাতে বিন্দুমাত্র অশুদ্ধতা নেই. নেই কণামাত্র ভাবপ্রবণতা। পক্ষান্তরে এক অমলিন, গভীর সূক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়। বিটোফেনের "রোমান্স ইন এফ-দুর" বাজাল সেদিন—যা আমি ইতিপূর্বে একমাত্র যোসেফ যোচিমকে বাজাতে শুনেছি।

১৬. বের্লিন ১৫-১৬ জুলাই ১৯২৯

সংবাদপত্রে পড়লুম হুগো ফন হফ্‌মানস্‌তাল-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রান্সৎ, নিজেকে গুলি ক'রে আত্মহত্যা করেছে। আমি একটা তার পাঠিয়ে দিলাম। সন্ধ্যায় এরিখ ফন স্ট্রোহেইম এর যুদ্ধের পূর্ববর্তী ভিয়েনা বিষয়ে ছবি 'ওয়েডিং মার্চ' দেখতে গেলাম। ছবিটি একজন প্রতিভাধর ব্যক্তির সৃষ্টি।...

পুত্রের পারলৌকিক ক্রিয়ার সময় তাঁর আত্মহননের আঘাতে হফ্‌মানস্‌তাল মারা গেলেন। আমি সম্পূর্ণ বিমূঢ়। আমাদের এই সময়—আমাদের এই দুঃখময় বন্ধুবর্গ - ওয়াল্টার রাথেনো, পোল কাসিরের, ফন হফ্‌মানস্‌তাল···

১৭. ভিয়েনা, ১৮ জুলাই, ১৯২৯

বেচারি হুগোর অন্ত্যেষ্টির জন্য খুব ভোরে এখানে পৌছেছি। বিকেল ৩টায় রোডাউন-এর প্যারিস চার্চে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। শবাধার, বেদী ও বেদীর বেড়া সব গোলাপের সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। হয়তবা ভিয়েনার প্রত্যেকটি বাগান শূন্য ক'রে এই গোলাপ এসেছে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে। ছোট্ট গীর্জাটি যেন উপচে পড়ছিলো মানুষের চাপে। রিচার্ড স্ট্রস্‌-এর পুত্রের ঠিক পেছনেই আমি বসেছিলাম। স্ট্রস ও ম্যাক্স রেইনহার্ট-এর অনুপস্থিতি খুবই চোখে

পড়ছিলো। একটিমাত্র নিঃসঙ্গ বীণের অপূর্ব বাজনা সত্ত্বেও সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল। ভিয়েনার প্রায় সব কৌতূহলী মানুষই পুরো ঘিরে রেখেছে গীর্জেটা। হালকা গ্রীষ্মের পোষাকে মহিলাবৃন্দ, কিছু মার্কিনী, এছাড়া আশপাশ থেকে এসেছে অনেক চাষী ও ব্যবসায়ীরা। শবযাত্রায় বেশ কয়েক হাজার মানুষ যোগ দিলেও শেষপর্যন্ত গরম আবহাওয়াই যেন মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাটুকু হরণ ক'রে নিল। আমি হুগোর আরেকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম কবরখানার দিকে। আমাদের গভীরতম বন্ধু-বিয়োগব্যথা সত্ত্বেও গরম যেন তাঁকেও বেশ কাবু ক'রে দিল। কবরখানার দরোজায় এক লজ্জাজনক পরিস্থিতি তৈরি হ'ল। শোকগ্রস্ত মানুষ ও কৌতূহলী দর্শক উভয়েই হাতাহাতি আরম্ভ করল পুলিশের বেড়া ভেঙ্গে ভেতরে যাবার জন্য। অবশেষে আমাদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হ'লেও আর কোনো বিস্ময় আমাদের অবশিষ্ট রইল না—কারণ ততক্ষণে এটা একটা দারুণ গরমে অনুষ্ঠিত মেলার রূপ নিল। কফিনে একমুঠো মাটি দেবার সময় এক ঝলক কবরটার দিকে তাকিয়ে কফিনের সংক্ষিপ্ত প্রসার ও ক্ষুদ্রতা দেখে চমকে গেলাম। এখনো এরই নিচে আত্ম-হত্যাকারী পুত্রের কফিনটা দেখা যাচ্ছে। তারপর সব শেষ হ'য়ে গেল।

হুগো ফন হফ্‌মানসন্তালের সঙ্গে আমার জীবনের একটা অংশও যেন চ'লে গেল। এইতো মাত্র এক সপ্তাহ আগে উনি আমাদের দু'জনের দীর্ঘ ও নীরবচ্ছিন্ন বন্ধুতার কথা লিখেছেন আমাদেরই বন্ধু গ্রোৎস্‌কে। ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা গতবছর জুনে সেই আবিল ও দুঃখপূর্ণ ভোজসভায় যেখানে রিচার্ড স্ট্রস এমন সব কটূক্তি করেছিলেন যে পরে হফ্‌মানসন্তালকে পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে লিখতে হয়েছিল।

১৮. ভিয়েনা, ১৭ জুলাই, ১৯২৯

গাড়ি ক'রে শ্লোনব্রান গেলাম, ব'সে ব'সে পড়ছিলাম হফ্‌মানসন্তালের 'এভরিম্যান'। দুপুরের আহারের পর রোডাউন গিয়ে দেখি গার্টি হফমানসন্তাল (ফ্রাউ ফন হফমানসন্তাল), রাইমুন্ড ও পরিবারের অন্য সবাই—সকলেই বেশ উৎফুল্ল। গার্টি বললেন (নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মতো ক'রে) 'হুগোর মৃত্যুর কারণ অবশ্য পুত্রের আত্মহত্যার সংবাদ নয়, কারণ বছর তিনেক আগেই

চিকিৎসকরা ওঁর মূল ধমনী শক্ত হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে ওঁর জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। ফ্রানৎস্-এর মৃত্যুর পর উনি বেশ শান্ত হয়েই ছিলেন, প্রাত্যহিক কাজকর্মও সব করলেন, অনেকগুলো চিঠি লিখলেন, রাইমুন্ড ও আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করলেন—পুত্রের মৃত্যুর বিষয়ে অনেক কথা বললেন—আশ্চর্য সুন্দর সব কথা। তেমনি, অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর ক্রন্দনও অত্যন্ত তীব্র ছিলো। সোমবার সকালে রোজকার মতোই ঘুম থেকে উঠলেন, খাবার খেলেন নিয়ম মতোই। তিনটের সময় ফ্রানৎস-এর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে যাবার কথা, মাথায় টুপিটা পড়লেন—হঠাৎ বললেন, কেমন আচ্ছন্নের মতো লাগছে—বলতে বলতে ব'সে পড়লেন একটা চেয়ারে। গার্টি ওঁর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে গেলেন ওঁর পড়ার ঘরে। যাবার পথে হাত থেকে খসে পড়া গ্লাবসটা নিচু হ'য়ে নিজেই তুলে নিলেন। পড়ার ঘরে ব'সে পড়ার পর ওঁর স্ত্রী জিগ্‌গেস করলেন জামার গলাবন্ধটা খুলে নেবেন কিনা, কিন্তু কেমন যেন জড়িয়ে একটা অপরিষ্কার উত্তর দিলেন। তারপরই ওঁর মুখটা কেমন যেন বেঁকে গেছে দেখে ওঁর স্ত্রী ভয় পেলেন। অথচ স্ত্রীকে নিজের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিগ্‌গেস করলেন, "অমন ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?" তিনি এরকম ক্ষেত্রে সচরাচর যা করেন—অর্থাৎ উঠে যান আয়নার সামনে কী হয়েছে দেখতে—তা কিছু করলেন না। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তিনি ধীরে ওঁকে আরামকেদারায় শুইয়ে দিলেন এবং ক্রমশ ওঁর সংজ্ঞা লোপ পেতে লাগলো।

ততক্ষণে কিন্তু পুত্রের অন্ত্যেষ্টির কাজ শুরু হ'য়ে গেছে। রাইমুণ্ড বলছিলো, দ্রুত ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিতে যেতে যেতে সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিলো ফিরে এসে আর পিতাকে জীবিত দেখতে পাবে না। এমন কী সে নিজে ও তাঁর মা দুজনেই মনে মনে চাইছিলো যেন পিতা তাঁর এই অচৈতন্যদশা থেকে ফিরে এসে দীর্ঘ রোগ-যন্ত্রণার দশা ভোগ না করেন। এ রোগ তো সারবার নয়। গার্টির দুঃখ, হুগো 'আঁরাবেলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক পরিমার্জনা ক'রে যে রিচার্ড স্ট্রসের কাছে ডাকে পাঠিয়েছিলেন তার প্রাপ্তি সংবাদ তখনো পান নি। অথবা স্ট্রোস যে পরিমার্জিত অংশ পাঠ ক'রে খুসি হয়েছেন তাও জানতে পারছেন না।

হফমানসস্তাল ব্যারোক কবিকুলের সর্বশেষ। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে

যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে আছেন—শেকস্‌পীয়র ও সারভেন্তেস্‌। ব্যারোক—সত্যিকারের অনুভূতির শিল্প যা অবাস্তব বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে সচেতনভাবে সংযোজিত। কতই না জাঁকজমক ক'রে হফ্‌মানসন্তাল তাঁর রচনার বিষয়-গুলোর পরিচর্যা করতেন, যেন কোনো অনুষ্ঠানের তিনিই পুরোহিত, তিনিই গৃহকর্তা—তাই তাঁর গদ্য ভাষা এক আনুষ্ঠানিক, ঐন্দ্রজালিক অর্থবহতা লাভ করতো। কোনো কিছু বিষয় সরাসরি উন্মোচন তাঁর চরিত্রের পক্ষে অসম্ভব। তাঁর কাছে তেমন কোনো কাজ—এমন কি রচনাও ছিলো যেমন অসম্মানজনক তেমনি অসৃজনশীল। হফ্‌মানসন্তাল বিষয় বেছে নিতেন যাতে তাঁর অনুভূতি কেবল একটা অবলম্বন পায়—অথচ তার অস্তিত্ব বাস্তবে অলীকও হ'তে পারে! সুতরাং হয় তিনি তাঁর রচনার বিষয় সৃষ্টি ক'রে নিতেন নতুবা অবাস্তবতার অবলম্বন করতেন তাঁর রচনার প্রয়োজনে। আর সেই জন্যই তিনি বস্তুত শেষতম ব্যারোকধর্মী লেখক ব'লে চিহ্নিত।

১৯. বের্লিন, ৩০ আগষ্ট, ১৯২৯

প্রকাশক হাচিনসন এরিখ মারিয়া রেমার্কে-কে আমার কাছে পাঠিয়েছিলো ওঁর চুক্তিপত্র বিষয়ে আলোচনার জন্য। মাথাটা যেন একজন স্যাক্সন চাষীর ছেলের মতো, মুখে গভীর রেখার ছড়াছড়ি, নীল চোখ, মাথার চুল এমন কী ভ্রূ পর্যন্ত সোনালি। কথা বলার ঢং বেশ দৃঢ় কিন্তু কবিত্বপূর্ণ। বলছিলো, বিস্তারিত ভাবে, এমন কি না থেমে—কী ক'রে ওস্‌নাব্রুকে কোনো উপদেশ, কোনো সাহায্য ছাড়াই সে তাঁর বেদনাময় শৈশব পেরিয়ে এখানে এসে আজ পৌঁছেছে। সে যে বেঁচে আছে আজও—এটাই তাঁর কাছে একটা অসম্ভব ঘটনা ব'লে মনে হয়। যখন যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরলো তখন তার মা মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালে শায়িত মৃত মাকে দেখে সে চিনতে পর্যন্ত পারে নি। যুদ্ধের সময় তাদের মনে হ'তো—যুদ্ধ শেষে যখন শান্তি স্থাপিত হবে তখন সব কিছুই ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন বোঝা গেল ওরা কত অসহায়। জীবনে যে কী করবে সে সম্পর্কে তার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। 'কনটিনেনটাল-রবার' কোম্পানিতে কিছুদিন চাকুরি করলো। সেখানে বিজ্ঞাপনের কপি লেখা ও বিজ্ঞাপনের জন্য ছোটোছোটো গান বাঁধাই তার কাজ ছিলো। নাকউঁচু

সাহিত্যের কাগজগুলোর পাতায় একদিন উপস্থিত থাকতে পারবে এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে এরপর বেলিনের একটা খবরের কাগজে খেলাধুলার সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিল রেমাকে। সাহিত্যকর্মের প্রচেষ্টা হিসাবে তখন লিখতে শুরু করেছে "অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট"। ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই রচনাটা শেষ হ'য়ে গেল, লেখা বেশ তরতরিয়ে এগলো, কোনো অসুবিধা নেই। "আসলে লেখা তখনই সহজ হ'য়ে ওঠে যখন রচনার বিষয়ের ওপর সত্যিকারের দখল থাকে......কখনো হয়ত অপনি রেলগাড়ি চ'ড়ে কোথাও যাচ্ছেন হঠাৎ বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় দেখলেন দূরে একজন মানুষ পার হ'য়ে যাচ্ছেন বিস্তারিত নিঃসঙ্গ এক মাঠ। দিগন্তে নেমে আসা আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে যেন মনে হ'ল অসম্ভব দীর্ঘকায়। এমনি করেই আমার লোকেদের আকাশের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে তার পেছনের ইতিহাস; তবেই অহেতুক বিস্তৃতি অথবা করুণরস ছাড়াই আপনার লোকেরা হ'য়ে উঠবে স্মরণীয়......" সঠিক বলতে গেলে রেমার্কেও তাই করার চেষ্টা করেছে। তাঁর চরিত্রদের স্থাপন করেছে অসীমের প্রেক্ষাপটে এবং যখনি তা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়েছে—রচনাকার্য হ'য়ে উঠেছে সরলতম। হয়ত বা তার বাক্যগুলো যতখানি একজন লেখকের কাছে আশা করা যায় ততটা পটু নয়, কিন্তু তা অনেক বেশি ক'রে হৃদয়ের দূরতম গভীরে প্রবেশ করে সহজে।

আর্নল্ড ৎসাইগ ওকে বলেছে 'বেপরোয়া', ৎসাইগের নিজের রচনা পুস্তক ও পাঠকের মাঝখানে দোদুল্যমান, রেমার্কে চেয়েছিলেন পাঠকের আরো কাছাকাছি পৌঁছুতে। যদি তার রচনাশৈলী ৎসাইগ-এর তুলনায় হ'য়ে থাকে অপরিশীলিত তথাপি রেমার্কে যা করতে পেরেছে তা অনেকখানি। কিন্তু "অল কোয়ায়েট"-এর সাফল্য তেমন কিছু উৎসাহজনক হয় নি। এর পূর্বে অবশ্য তাঁর মনে হয়েছিল সফলতাই তাঁর একমাত্র কাম্য—কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পেরেছে সাফল্য কখনো মানুষকে পরিপূর্ণতা দেয় না। এমন কি পুস্তকটি প্রকাশের পর প্রথম কয়েকমাস সে প্রায় আত্মহত্যাই সমীচীন বলে ভাবতে আরম্ভ করেছিল; কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হয়ত গ্রন্থটি কোথাও কারো কোনো প্রয়োজনে লাগবে; আর তাই তাঁকে আত্মহনন থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। এটাই একমাত্র

জরুরি। কোনো একটা কারণের জন্য শান্তি অথবা মাত্র একজন মানুষের প্রয়োজনে, এই হচ্ছে প্রকৃত সার্থকতা। পরবর্তী জীবনে সে কিছু একটা করতে চায়, এমন মানুষের জন্যে যে পৃথিবীতে একান্ত নিঃসঙ্গ, হয়ত বা পথভ্রান্ত—তাদের জন্য নির্মাণ করা যেতে পারে একটা যৌথ আবাস যেখানে তরুণ লেখকরা নিশ্চিন্তে বসবাস ও রচনাকর্ম করতে পারবেন। রেমার্কে বলছিল, "অল কোয়ায়েট" বস্তুত ভালো গ্রন্থ কিনা তা সে জানে না। সে জানে, সে কেবল তাঁর কর্মজির সব শক্তি দিয়ে রচনা করেছে এই গ্রন্থ।

সন্ধ্যায় ভোজে আর্নল্ড ৎসাইগ এসে ধূর্ততার সঙ্গে রেমার্কের বিরুদ্ধে আমার কানে বিষ ঢালছিল। যখন সকলেই রেমার্কে-কে প্রশংসা করছে তখন যেন মাত্র একজন কেউ তাঁর নিন্দা করেছে—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বললো: "না না, বইটা খুব ভালো। রেমার্কে আসলে রেন-এর ন্যায় একজন উৎকৃষ্ট অপেশাদার ঔপন্যাসিক। 'অল কোয়ায়েট'-এর মতো একটা মহৎ উপন্যাস অবশ্যই সে হঠাৎ ক'রে লিখে ফেলতে পারে—আর ঠিক এই কারণেই তাঁকে অপেশাদার বলা হয়েছে। যে বীজ থেকে মহৎ উপন্যাসের জন্ম হয় তা সে জানে না—অথচ না জেনে সেই বীজ সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, ব্যবহার করেছে অন্ধভাবে। উপন্যাসে যেখানে সেই চাষীর ছেলেটি গাছের ফুলফোটা দেখে হঠাৎ বুঝতে পারলো যুদ্ধ ব্যাপারটাই আর সহ্য করা যাচ্ছে না—আমি হ'লে ঠিক সেখানেই গল্পের আরম্ভ করতাম এবং অন্যসব চরিত্র ও ঘটনা এই চাষী বালকটিকে ঘিরেই গ'ড়ে তুলতাম। তবেই না এই কাহিনী এক মহৎ উপন্যাসে রূপান্তরিত হ'ত।" আসলে, সেই সন্ধ্যায় ৎসাইগ ঈর্ষাপ্রণোদিত হ'য়ে কিছু ধূর্ত কথা বলছিলো, যাতে না ছিলো কোনো বুদ্ধির চমক বা সহৃদয়তা, ফলে সমস্ত সন্ধ্যাটাই একটা ক্লান্তিকর সাহিত্যসম্পর্কিত গালগল্পে নষ্ট হ'লো।

২০. পারী, ৩-৪ অক্টোবর, ১৯২৯

আমি তখন নাপিতের চেয়ারে ব'সে ছিলাম—যখন স্ট্রেসমান-এর মৃত্যু-সংবাদ এলো। চেয়ারটা মনে হ'ল যেন গরম কড়া। তিনি কাল হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন—এই খবর আজ 'পারী মিডি' কাগজে সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ওঁর মৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, যা তার

ফলাফল যা হবে তা কল্পনাও করা যাচ্ছে না। পরে আমি আমাদের দূতাবাসে গিয়ে কাউনসেলারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম—তিনি বললেন, স্ট্রেস্‌মানের মৃত্যুতে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত ভবিষ্যত বিষয়ে। আমার অবশ্য মনে হয়—স্ট্রেস্‌মানের মৃত্যুর ফলে প্রথম যা হবে তা হচ্ছে জর্মনির আভ্যন্তরিন রাজনৈতিক অস্থিরতা। যার ফলে জাতীয়তাবাদীরা আরো বেশি দক্ষিণপন্থী-ঘেঁষা হবে এবং কোয়ালিশন হয়ত বা ভেঙে যাবে—এর পরিণতি হিসাবে সুগম হবে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ।

এই মৃত্যুর বেদনা ফরাসীদেশেও এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যাতে মনে হ'তে পারে হয়ত বা একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ফরাসী নেতাই মারা গেছেন। মনে হচ্ছিল, যেন সমস্ত য়ুরোপ এক জাতি হ'য়ে উঠেছে। ফরাসীরা স্ট্রেস্‌মানকে য়ুরোপীয় বিসমার্ক হিসেবে ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, গত যুদ্ধে পরবর্তিদিনে যাঁরা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই জর্মন—আইনস্টেইন, একেনার, কোহ্‌ল, রেমার্কে, স্ট্রেস্‌মান। অন্য যারা এই পর্যায়ে পৌছেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—লিণ্ডবার্গ, লেনিন, প্রভৃ।

২১. লণ্ডন, ১৪ নভেম্বর, ১৯২৯

অপরাহ্ণে ট্যাভিষ্টক স্কোয়ারে গেলাম লিওনার্ড ও ভার্জিনিয়া উলফ্‌দের সঙ্গে চা পানে। লিওনার্ড বেশ সহৃদয়তার সঙ্গে আমার গ্রন্থ বিষয়ে বললেন। জানালেন, ওর কৃত আলোচনাটি পরের দিন 'নেশনে' বেরুবে। ভার্জিনিয়া অভিযোগ করলেন, "জানেন, আমার স্বামী গত সপ্তাহের প্রায় প্রত্যেক রাতে আমাকে ঘুমুতে দেন নি আপনার বই থেকে নানা অংশ প'ড়ে প'ড়ে শুনিয়ে।" এরপর আমরা রাথেনো ও স্ট্রেস্‌মান বিষয়ে নানা আলোচনা করলাম। পরে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি আজকাল আর এডেলফি টেরাসে থাকেন না, বাসস্থান পরিবর্তন ক'রে গিয়েছেন হোয়ায়েটহল কোর্টে। বাসস্থানটি বিলাসবহুল ও সেখান থেকে টেমস্‌-এর মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শনীয়। ওঁর স্ত্রীর স্বভাব যেমন অত্যন্ত মধুর, তেমনি সহজসরল। একটু মুটিয়েছেন সত্যি তবু এখনো তন্বী ও তরুণীর মতোই দ্রুত চলাফেরা করতে পারেন (যদিও মাথার চুল প্রায় সব শাদা হ'য়ে গেছে)। অত্যন্ত সাবলীলভাবে অতীত ও

বর্তমানের নানা বিষয়ে কথা বলতে পারেন। আমরা আমাদের যুদ্ধ পূর্ববর্তী ইংলণ্ড ও জর্মনির মিলনের বিষয়ে যে জোর প্রচার একদা যৌথভাবে চালিয়েছিলাম সেইসব স্মৃতিচারণ করতে করতে মনে পড়লো—প্রিন্স লিচনোস্কির সঙ্গে আমাদের সেই বিখ্যাত দ্বিপ্রহরের আহারের কথা যেখানে শ তাঁকে গ্রে'র বিরুদ্ধে একটু তপ্ত করবার বৃথা চেষ্টা করছিলেন। তিনি তখন এখানে জর্মনি রাজদূত। তারপর শ বললেন এই গ্রীষ্মে রিচার্ড স্ট্রোস ও তিনি একসঙ্গে কাটিয়েছেন তার গল্প—"আশ্চর্যের বিষয় যে যতক্ষণ স্ট্রোস ও আমি ব্রাওনিতে একসঙ্গে ছিলাম কেউ আমাদের বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করে নি। কিন্তু যখনি জেনে টিউনি এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন তৎক্ষণাৎ ফোটোগ্রাফাররা আমাদের ছেঁকে ধরলো। আসলে তারা সবসময় ওখানে ছিলো, আমাদের চারপাশেই ছিলো, অনুসরণ করছিলো, লক্ষ্য করছিলো......" তিনি টি. ই. লরেন্সের সম্পর্কে একটা গল্প বললেন, উনি শ'দের পারিবারিক বান্ধব, এবং প্রচারিত হবার বিরুদ্ধে তাঁরও একটু খেপামি আছে। লরেন্স যখন বললেন, তাঁর প্রত্যেকটি মুহূর্তই প্রায় সাংবাদিকরা অনুসরণ করেন, শ তার উত্তরে বলেছিলেন: "যথার্থই তারা আপনাকে লক্ষ্য করে কারণ আপনি সর্বদাই পাদপ্রদীপের আলোর মাঝখানে লুকিয়ে থাকেন।"

২২. পারী, নভেম্বর ২৯, ১৯৩১

ভার্সেইতে রাজকুমারী বাসিয়ানোর ওখানে দ্বিপ্রাহরিক ভোজে অন্যান্যদের মধ্যে আঁদ্রে জিদ-ও ছিলেন। আমাকে দেখে মনে হ'ল বেশ প্রীত হয়েছেন। আলাপচারীতার মাঝে আমি জর্মনির প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথাটাও উল্লেখ করলাম। জিদ বললেন, তাঁর কোনো সন্দেহ নেই যে সাধারণভাবে জনতার বৃহত্তর অংশের কাছে অর্থ অপ্রতুল, কিন্তু ফরাসীদের কাছে এটা বিশ্বাস্য ক'রে তোলা প্রায় অসম্ভব, কারণ যে সব ফরাসী জর্মনি থেকে ভ্রমণ শেষে ফিরছেন তাঁরা কেবল জর্মনিতে অকল্পনীয় অপচয়ের গল্পই করেন। শুধু তাই নয়, ফরাসীদেশে বাস করেন এমন অনেক জর্মন আছেন তাঁদের দেখে মনে হয় পুড়িয়ে ফেলার মতো প্রচুর অর্থ তাঁদের করায়ত্ত। টেবলে বসার পর জিদ বললেন, তিনি নাকি অদ্যাবধি 'জারাথুস্ত্র' পড়েন নি অথচ নীৎসের অন্যান্য

প্রায় সব রচনাই তাঁর পড়া। এই গ্রন্থের রচনাশৈলী তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। আরো বললেন, টোমাস মান তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করেছেন যে গ্যায়টে কখনো 'প্রমিথ্যুস' রচনা করেন নি; উনি কেবল জ্ঞাত আছেন গ্যায়টের 'প্যাণ্ডোরা' বিষয়ে আর তাই দুই-এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। আহারপর্ব সমাধা হ'লে আমি জিদকে সিনেমা দ্যে মিরাক্ল পৌঁছে দিলাম কারণ উনি সেখানে লিলিয়ান হারভে কে দেখতে যাবেন ডের কোংগ্রেস তানৎস ছবিতে আমারি প্ররোচনায়।

২৩. বের্লিন, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৩২

আন্দ্রে জিদ এখানে এসেছেন। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন গ্রানর্ভাণ্ড-এ টম কাকার কেবিন নামক গৃহপ্রকল্প। তাঁকে প্রকল্পটি অত্যন্ত প্রীত করেছে বোঝা গেল—'লা সিতে মাজিক্।' খুঁতখুঁত করতে লাগলেন ফরাসীদের পিছিয়ে পড়া দেখে—যখন স্থাপত্যবিদ্যা জর্মনিতে এতোটা উৎকর্ষ লাভ করেছে ঠিক তখনি ফরাসীদেশ এতোটা পিছিয়ে পড়লো কেন?......তারপর আমরা গেলাম হেলেন ফন নোসতিত্-এর ওখানে চায়ে কারণ জিদ নিকারবোকার নামক মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করবেন। নিকারবোকার মানুষটি ছোটোখাটো, দৃঢ়চেতা, লালচুল, রেখাময় অথচ তারুণ্যময় মুখশ্রী। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করলেন বিশ্বসংকট বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়ে। তিনি একটি গ্রন্থ লিখছেন যার বিষয়—এই সংকট কী কেবল পূর্বের অন্যসব সংকট থেকে "মাত্রিক তফাৎ" সম্পন্ন না "গুণীয় তফাৎ" সম্পন্ন। এখন স্মরণে নেই আমি কোন একজন দার্শনিককে উদ্ধৃত ক'রে বলেছিলাম, এমন একটা সময় কখনো আসে যখন মাত্রিকতা পরিবর্তিত হয় গুণীয়তায়। আমার ভয় হচ্ছে, এখন আমাদের সংকটের সেই সময়ই এসেছে। অর্থাৎ সংকটের বিপুল আয়তন এমন এক পর্যায়ে আজ পৌঁছেছে যে গতদিনের অন্যসব সংকট থেকে এর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন্ হ'য়ে গেছে।

২৪. বের্লিন, জুন ২৮, ১৯৩২

ফ্রাউ ফন ওসিয়েৎসকী টেলিফোন ক'রে জানালেন যে নাৎসীরা তাঁর গৃহের

সামনে জনবিরল রাস্তায় দিবারাত্র প্রহরা দিচ্ছে। বের্লিনের রাস্তায় ক্রমশ নাৎসীরা এক ভয়ের রাজত্ব বিস্তার করছে।

২৫. কান্‌স্‌, অগস্ট ১৪, ১৯৩২

মার্সেই-এর সংবাদপত্রের খবর—গতকাল হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকে চ্যানচেলর করতে রাজি হন নি। চূড়ান্ত আলোচনা মাত্র তের মিনিট চলে। অতঃপর কী? আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ অথবা গৌরবহীন নাৎসী আন্দোলনের পতন? একটা ব্যাপার ঠিক যে আমরা সবচেয়ে অন্ধকারময় অবস্থায় পৌঁছচ্ছি। বলা কঠিন—কে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিক্রিয়াশীল—স্লেচার না নাৎসীরা।

২৬. পারী, অগস্ট ২৬, ১৯৩২

ফরাসী কাগজে সবচেয়ে গরম খবর হচ্ছে জর্মনির রাজনীতি। প্রতিদিন লেখা হচ্ছে—হিটলার, ফন পাপেন, স্লেচার-দের সম্পর্কে। বেশির ভাগ ফরাসী নিজের দেশের রাজনীতির তুলনায় অনেক বেশি জর্মনির রাজনীতির খবর রাখে। ফরাসীরা পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে তাদের ঘরের কাছেই একটা আগ্নেয়গিরি জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—যা যে কোনো মুহূর্তে সেই দেশের নগরপ্রান্তর সব জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ, প্রকৃতির ক্রোধ, যার বিরুদ্ধে মানুষের কিছুই করার নেই—তা দেখবে বলে ফরাসীরা অপেক্ষা ক'রে আছে। হায়, জর্মনি, তুমি আবার হ'য়ে উঠলে "বিশ্বতারকা"।······ফরাসীরা অনুভব করছে এক নতুন পৃথিবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এরা হয়ত বা বলশেভিকদের চেয়েও তাদের পক্ষে আশু বিপদজনক। অথচ এটাও ভাবছে যে এই নতুন তারকা জন্মের আগেই ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

২৭. বের্লিন, সেপ্টেম্বর ১, ১৯৩২

মার্কিন তাম্র সম্রাট গুগেনহেইম-এর সঙ্গে নৈশ আহার ছিল। ভান্দা ফনডের মারভিৎস্‌, যাকে আমি প্রায় তিরিশ বছর পরে দেখলাম, উৎফুল্ল কণ্ঠে জানালেন, তাঁর সব আত্মীয়-স্বজনই নাৎসী। মহিলা নিজে কিন্তু রাজতন্ত্র অনুরাগিনী। অবশ্য জাতীয়তাবাদে এবং সিমিটিক বিরোধী আন্দোলনে

আস্থাবতী। আমিও তাঁর মতাবলম্বী কিনা জিগগেস করলে জানালাম—না। নচেৎ আজ নৈশ ভোজে একজন জু'র আতিথ্য গ্রহণ করতাম না।......ব্যারোনেস রেব্যো যিনি ১৯১৮ পর্যন্ত স্ট্রাসবুর্গে বাস করতেন এবং এখন পর্যন্ত যিনি নিজেকে একজন এলসেমীয়ান ব'লে ভাবেন, তিনিও নাৎসী অনুরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। তার মতে "আন্দোলনের" সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দিক হ'চ্ছে যে সাধারণ মানুষকে পর্যন্ত শেখানো হ'চ্ছে—তাদের ত্যাগের কথা অথচ গত যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র আমাদের শ্রেণীর লোকেরাই ত্যাগ স্বীকার করেছে। আমি বললাম, দুই-ই সমান। যুদ্ধে কয়েকলক্ষ মানুষ মারা গেল, কয়েক সহস্র মারা গেল অনাহারে। আমার আপনার কোনো আত্মীয় কিন্তু তখনও মরে নি।

শ্রীমতী গুগেনহেইম আদিম ও আধুনিক পরাবাস্তবতার চিত্র সংগ্রাহক। তিনি বললেন, "যদিও এই দুই শ্রেণীর মধ্যে তুলনা চলে না কারণ আদিকালীনরা অনেক বেশি দামী।"

২৮. বের্লিন, নভেম্বর ১৪, ১৯৩২

ফন পাপেন গতকাল তার পুরো মন্ত্রীসভার সঙ্গে পদত্যাগ করেছে। অবশেষে! এই সদাস্মিত হাস্যময় মূর্খ অপটু মানুষটা গত ছয় মাসে যা ক্ষতি করেছে এর পূর্বে অন্যকোনো চ্যানচেলর তা করতে পারেন নি। সবচেয়ে দুঃখের হচ্ছে—সে হিনডেনবার্গের সুনামের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে।

২৯. বের্লিন, জানুয়ারী ৩, ১৯৩৩

আমার দেওয়া দ্বিপ্রাহরিক ভোজের নিমন্ত্রণে যখন আমার অতিথি এসে পৌঁছুলেন—তিনিই নিয়ে এলেন হিটলারকে যে চ্যানচেলর করা হয়েছে—এই দুঃসংবাদ। আমি বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম। আমি এরকমটা হবে আশঙ্কা করি নি, অন্তত এত দ্রুত হবে তা বুঝি নি।

৩০. বের্লিন, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৩৩

লোর ভোজনালয়ে রাত্রের আহার শেষ করছিলাম, এমন সময় বুড়ো লোর নিজেই আমার কাছে উঠে এলো—খবর, রাইখস্ট্যাগ জ্বলছে। তখন রাত

দশটা। তাহ'লে পরিকল্পিত গুপ্তহত্যাটা ঘটেছে—অবশ্য যেমনটি আমরা ভেবেছিলাম তেমন হয় নি। হিটলার নয়—জ্বলছে রাইখস্ট্যাগ। এর শেষ পরিণতি যে কী তা কেউ জানে না।

৩১. ফ্রাঙ্কফুর্ট, মার্চ ৮, ১৯৩৩

সন্ধ্যায় আমি পারীর দিকে রওনা দিলাম।

কিছু মূল নামের তালিকা ও বাংলা হরফে ব্যবহৃত রূপ

Berlin—বের্লিন

Paris—পারী

London—লণ্ডন

Weimar—হ্বাইমার

Einstein—আইনস্টেইন

Jean Cocteau—জঁা ককতো

Harold Nicolson—হ্যারোল্ড নিকলসন

Leonard/Virginia Woolf—লিওনার্ড/ভার্জিনিয়া উলফ্

Yehudi Menuhin—ইহুদি মেনুহিন

Diaghilev—ডিয়াঘিলেভ

Hugo Von Hofmannsthal—হুগো ফন হফমানসন্তাল

Max Reinhardt—ম্যাক্স রেইনহার্ড

Richard Strauss—রিচার্ড স্ট্রোস

Raimund—রায়মুণ্ড

Arnold Zweig—আরনল্ড ৎসাইগ

Remarque—রেমার্কে

Maillol—ম্যালোল

Stresemann—স্ট্রেসমান

Eckener—একেনার

Koehl—কোহল

Rathenau—রাথেনো
Gordon Craig—গোর্ডন ক্রেইগ
Andre Gide—আঁদ্রে জিদ
Frau Von Ossietzky—ফ্রাউ ফন ওসিয়েৎস্কি
Foerster-Nietzsche—ফোয়েস্ট´র নীৎসে
Franz Von Papen—ফ্রানৎস ফন পাপেন
Hindenburg—হিণ্ডেনবুর্গ
Guggenheim—গুগেনহেইম
Wandา Von Der Maswitz—ভান্দা ফন ডের
Schleicher—সক্লেইচার
Paul Valery—পোল ভালেরি
Mallarme—মালার্মে
Eric Gill—এরিক গীল
Vollmoeller—ভোলমোয়েলার
D'annunzio—দানানৎসিও

আলোক সরকার

শীত

নিরঞ্জন একটা অনাবশ্যকতা ওই এগিয়ে এগিয়ে চলেছে
নিরাসক্ত আর আত্মময়
ওই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঢুকলো অন্ধকার গলির মধ্যে
গলি থেকে বেরিয়ে আসছে আবার, ব্যাকুল আর উদ্‌ভ্রান্ত
তার অন্বেষণ ঠিক কোনখানে ?

আমরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতেই পারি না নিয়ম
ওই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঢোকা বেরিয়ে আসা উদ্‌ভ্রান্ত
বুঝতে পারি না লক্ষ্য আর ব্যর্থতা
বুঝতে পারি না মেঘ ভেঙে-যাওয়া মেঘ গড়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আবার

কেবল ওই উদ্বেগ চরাচর ব্যাপ্ত করা নিশীথিনী
আবশ্যকতা কোনো কিছুই নয় বৃক্ষ নেই, নেই কল্লোলিনী তটিনী।
শূন্যময় অন্ধকার ফুলে উঠছে বেলুন
রঙ ফিকে হয়ে ছলচ্ছল প্রবাহ রঙ ঘন হয়ে মরুধূসর।
আমরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের আক্রমণ করে শীত
বিশৃঙ্খল আর অনিশ্চিত—পরিব্যাপ্ত খরতা প্রতিমুহূর্তের দ্যুতি।
তামস নিরঞ্জন উদ্‌গ্রীব
আর সেই অনুপস্থিত নিশ্চয়তা। বটগাছের পাশ দিয়ে লাফিয়ে
হারিয়ে যাচ্ছে আবার।

নবনীতা দেবসেন

বিকেলবেলার গান

তোমার নামের প্রভা জ্যোতির্ময় করেছে বিকেল
চিকণ হাসির মধ্যে মখমলের বিছানা পেতেছো
বিকেলবেলার গান বাজিয়ে দিয়েছো দুই চোখে
নহবৎখানার মতো, ভেসে যায় দূরান্তে সে স্বর
এইবারে ফুল চাই এ বিকেল ফুলের বিকেল
তারাফুল ফুটে উঠবে আকাশবাগানে কান্তিময়
উধাও সুগন্ধ হয়ে ঝেঁপে আসবে মৃদুল আঁধার
আলোফুল ঝরে পড়বে চোখের শয্যায় সুকোমল
তারার সুরভি ঠিক হৃদয়বিভার মতো চিকণ চিকণ
মিশে যাবে হাসির মখ্‌মলে

অঞ্জলিতে ধরে আছি বিকেলবেলার সুখ
দুরু দুরু কবোষ্ণ চঞ্চুই, নরম, জীবন্ত, পক্ষধর
আন্‌চান্‌ অস্থির প্রহর
বিকেল বেলার গানে, নক্ষত্রসুবাসে, থরথর
রাত্রি নেমে আসে
অঞ্জলিবন্ধনে কাঁপে প্রহরের ডানার উড়াল
একটুও আনমনা হলে আঙুলের শিক ভেঙে
লক্ষ্যহীন শূন্যে উড়ে যাবে—
অর্ধস্ফুট অঞ্জলিতে পড়ে থাকবে উষ্ণ শিহরণ
অনিঃশেষ প্রার্থনার মতন আফশোস।

তাই রুদ্ধশ্বাস, তাই এমন উদ্‌গ্রীব,
তৃপ্তিহীন, একাগ্র রয়েছি।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

নীলপদ্ম

(কমুদার মৃত্যুতে)

'সরোত নীল জল অথৈ' তোমারই কথা শৈশবের নিরুত্তাপ বিস্ময় আমাদের টুকরো করে দিয়েছিল গুহান্বিত মন্ত্রোচ্চারণের মত। সেই সুখী দিন আঃ আমাদের ভালবাসার দিনগুলিরে আমরা কী না চাইতেম! এখন বাতাসের মর্মোচ্ছ্বাসে আত্মস্ত স্বপ্নের স্বরধ্বনি উরুগুরু মাংসল শরীরের সেই নারী রাত্রি 'যার শরীরে বাঁধা' এবং পর্যাপ্ত প্রেম যা আমরা চিনিনা। এবং আমি বড় একা, বন্ধু কবি বড় কেউ নেই আর, সকলেই ফিরে গেছে নিজ নিকেতনে, অথ তিলোত্তমা পুতুল অদ্যপি বুকেই রয়েছি। কী দুঃখে বল ধনি ভুলি ভুবন মাঝির হাট? এখানে নিবিড় জোনাক জলে চোখের চামরে ওখানে গোদাবরী সন্ধ্যায় হয় সতিমির কাঁসর। অবিশ্রান্ত গোধূলিতে বসন্তবেলা গেছে মোহন মুরলী গড়াতে স্বর্ণকার কাকে আর খুঁজব আমরা। দেশান্তরে আর্ত একটি নীলপদ্মের জন্যে কেবলই তৃষিত রইব।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

জীবনানন্দ

আমরা সকলে আসি. চলি বলি, দেখি বা দেখি না,
আমরা সকলে এক-ই জমা ও খরচে। যা-ই দেখি
এ-ওর চোখের ছানি চোখে মেখে এক-ই সব।
আমরা সকলে।
এক-ই কথা বলি, অথবা বলি না,
ভিড়ের একটি মুখ, এক-ই স্বর, আমরা ভিড়ের
ভিতরে বাড়াই ভিড়! তবু, ভাবি আমরা একাকী!

শুধু তুমি কি করে যে; স্থির পায়ে চলে গেলে একা
কান্নার অতলে, আরো স্তম্ভিত গভীরে চলে গেলে
অথচ গেলে না। তুমি দৃশ্যের জগতে—স্থির
আপন বলয়ে। যেন চিত্রার্পিত। তুমি কোনো
—কোনো শব্দ যাবে না যেখানে,
সহজ স্বভাবে গিয়ে নিঃশ্বাসে নিবিড় হলে। আর
সুদূর মন্ত্রের কোলে সহজাত নিভৃত কান্নার
স্বেদে তাপে জন্ম নিল উচ্চারণ।
অনিবার্য, অসহায় গাঢ়

দেবতা যখন মূক, মন্ত্রধ্বনি তুমি দিতে পারো।

সুশীলকুমার গুপ্ত

কালান্তর

পালিয়ে এসেছি তাড়া খেয়ে
শ্বাপদের মতো। বাসভূমে সোনার সংসার
লণ্ডভণ্ড হল। গেল ভেঙে
তিলে তিলে গড়ে তোলা সাধের প্রতিমা। রাতারাতি
চেনা লোকজন বন্ধু প্রতিবেশী যা ছিল আপন
একেবারে পর হ'য়ে গেল কোন গূঢ় মন্ত্রণায়
বোঝার আগেই। উপড়ে তাজা মূল
রক্তঝরা স্বপ্ন বুকে শিকারীর নজর এড়িয়ে
এসেছি আরেক প্রান্তে, কিন্তু কোন দোষে
বুঝি নি, বুঝি না।

ভোলা কি এতই সোজা? মেরে ফেলা যায় টুঁটি টিপে
অবধ্য স্মৃতিকে? স্বপ্নে হানা দেয় অবিরত
অমর গানের নৌকা পুবালী নদীর স্রোতে নেচে
সত্তার গভীর ঘাটে; পাহাড়ের বাহুলগ্ন বনের ফুৎকারে
সমস্ত ধমণীশিরা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ওঠে, খোলে
নিরুদ্ধ কপাট; মাটিখনি থেকে উৎসারিত তরল সোনায়
হৃদয় সোনালী হয়, কথায় সোনার সঞ্চয়ন।

কান পেতে আছি,
বিভেদকামীর ফাঁদ ছিন্নভিন্ন ক'রে
কখন আসবে ছুটে অখণ্ড মধুর
উৎসুক আহ্বান!

গোবিন্দ চক্রবর্তী

পেন্সিল-স্কেচ

একটা, দু'টো, তিনটে চিল—
আকাশ বেশ মিষ্টি নীল,
মনের মিলই আসল মিল
নইলে কিছুই না।
গায়ে-মাথায় রোদের গুঁড়ো
ছোটো-বড় পাহাড়চুড়ো,
চম্পাহাটির পোল পেরিয়েই
ঘাঘরবুড়ীর গাঁ।

অন্ত নদী ঝুনিয়া
বন্য সে এক দুনিয়া

শালঘোরিতে ছৌ নাচে শান্ত
মৌঝুরিতে মৌ।
ছোকরার নাম মিঠুয়া,
চানমনি তার বৌ।

সেই রূপসী কালো শশী, কালো ভ্রমর চুল।
সেই কালিতে আলিক দিতে ফুল ফোটে শিমুল।
'টি'-'টি'-'টি' ডাকছে পাখী সময় শুয়ে ঘাসে,
কোন্ ঝর্না সরোদ বাজায় ফিনফিনে বাতাসে!
উসুম-উসুম ডিমের কুসুম ফাগুন মাসের রোদ,
পাকা গেঁহুর ক্ষেত পরেছে ধোপ-দেওয়া গরদ।
এই নিসর্গই কাব্যে ছড়ায় ইন্দ্রধনুর রং,
এই মানুষই কিন্নর হয়, কিন্নরী এবং।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

তাপসী

[শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্যকে]

আমার বয়সী উঠোনের করবী ফুলের গাছটা
মাঝে মাঝে হলদে ফুলের সজ্জায়
যুবতী সাজতো
আর যত রাজ্যের পাখী এসে সেই যুবতী কন্যাকে
কার আগমনের যেন সংবাদ দিয়ে যেতো
কিন্তু কেউ এলো না
আমি দেখলুম গাছটা শুকিয়ে গেলো

আমার এক সময়ে ইচ্ছা হয়েছিলো

আমি ঐ মৃত গাছটার জায়গায় দাঁড়াবো

আমি তপশ্চারনের ব্রত নিয়ে

দাঁড়িয়ে থাকা

এক ঠাঁই

শীত গ্রীষ্ম রাত দুপুর

তারপর সে যখন আসবে

তখন তাকে বলবে—

আজ এসেছো

কিন্তু সে…নেই।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

জন্মমৃত্যু. ব্যক্তিগত

কোনো কোনো দিন আসে টুনিলতা রমণীর মতো

শূন্য হাতে, শুষ্ক বুকে শুষ্ক ঠোঁটে

কুঞ্চিত জঙ্ঘায় কাঁপে নিরর্থক বালিয়াড়ি ঢেউ;

সেদিন আমার জন্ম অযোনিসম্ভূত।

কোনো কোনো রাত [illegible] বর্বরের মতো
দৃপ্ত পদে; নগ্ন নাচে, স্খলবস্ত্রে
পেশীর সঙ্কারে ছোঁড়ে নর্মসুখ স্মৃতি,
সেদিন আমার মৃত্যু অস্বাস্থ্যসম্ভূত।

তিলোত্তমা দিন আসে আবার কখনো ঠাণ্ডা হেসে
হলুদ চিঠির মতো, আলোর ঠিকানা লেখে
তারা ঘর্মপাতে খোঁপা খুলে মুখোমুখি বসে
নক্সীকাঁথা নাড়াচাড়া করে স্বপ্নের উষ্ণতা নিয়ে।
আমি দেখি ইন্দুমতী আলোর প্রতিমা [illegible]
বিস্ফার ব্যথায় আসে গর্ভাধানে
বকুল-উৎসব; [illegible] খুঁজে পাই
আরো সব বকুলের জন্মকথা, সুদূর [illegible]।

রাত্রি আসে প্রিয়তম টার্মিনাস, শীতল পাটির মতো
আরেক সান্ত্বনা নিয়ে, ঘুমের শিউলি ঝরে
কোমল মাংসের স্বাদে, অনাত্ম আঙুলে আর
পেতুলামে, প্রবচন বকুল বকুল
গা-ভরা ভেলকির বাজি হেরে হয় নিস্তাপ বিশ্রাম।
মনে হয় রাত্রির আরেক নাম
মৃত্যু অভিরাম।
হে ঈশ্বর, জন্মমৃত্যু যা দিয়েছো সুস্থ-উ[illegible]
[illegible] তা আমার সপ্তপদী [illegible]
ব্যক্তিগত॥

কল্যাণ সেনগুপ্ত

যূথভ্রষ্ট

কার সাধ্য একা থাকতে পারে?
একটু বিচ্ছিন্ন হও। কাছে দূরে শুরু হয়ে যাবে
তোমাকে লক্ষ করে সুড়ঙ্গ খনন।
তোমার পায়ের নিচে মাটি
যাতে ধসে যায়।
তুমি যে সংসারে কারো সুখের গরল নও
শুধু চাও নিমজ্জন নিজের নির্জনে
এ-ব্যাখায় তুষ্ট হবে এত মূর্খ কাউকে ভেবো না।
বরং সবাই ভাববে তুমি কোনো কূট অভীপ্সায়
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে গোপন বিবরে লুকিয়েছ।

এবং অচিরে দণ্ডবিধানের পালা শেষ হবে।
যেটুকু দূরত্বে এসে আত্মার উত্তাপ পেতে চাও
সবাই তোমাকে তারো বহুদূরে নির্বাসন দেবে।
বন্ধুরা তোমাকে দেখে বাস্তুভার অছিলায়
চকিতে অদৃশ্য হবে জনারণ্যে, নামগোত্রহীন।
বস্তুত জ্বালাতে এসে আত্মবীক্ষণের দীপমালা
দেখবে তুমি পূজা করো প্রাণহীন নিজেরই বিগ্রহ।
তার চেয়ে যূথবদ্ধ হও।
তুমি একলব্য নও স্বকীয়মহিমাদীপ্ত। কুরুকুলে তুমিও কৌরব।
তোমার নিয়তি, জেনো নির্বিশেষ থেকে
অসংখ্যের মাঝখানে আজন্ম বহন করা হৃদয়ের, শরীরের শব।

নরেশরঞ্জন দত্ত

ভুল একলব্য

হঠাৎ পথের মোড়ে, যখন রাস্তা ঘোলাটে এলোমেলো,
কাঁচা বয়সের কথা,
সাক্ষাৎ না হলে ভালো ছিল
একজন বিপ্লবী কবি, কি সমাজবিপ্লবীর সঙ্গে

রাত্রে ভালো ঘুম হতো
রক্তক্ষরণে ভিজে যেত না বিছানা
শরীর ফুলে ফুলে উঠতো না দুঃখের প্রহারে
সাক্ষাৎ না হলে আঙুল কেটে দিতে হতো না
একলব্যের।
চোরের ওপর রাগ করে আর মাটিতে নয়।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নশো ধাপ উঠে যাই....

নশো ধাপ উঠে যাই ফটিকপাথর বেয়ে ঝোরা।
নড়বড়ে টেবিলে মাথা গুঁজে অাঁট করে ধরে আছি হাত তোমার।
পাথাল জমির চরে গা ডুবিয়ে কাদার শুতার চাখছি গায় বুকে।
ঝোরা কলকল করে ফুলে ওঠে রূপোছোপা ঘুমে।
নশো ধাপ উঠে যাই, চুড়োর মুকুটে পাক খায়
দিপ্ দিপ্ আকাশ...

বারোটা অনড় রাত। জেলখানা দেয়ালের মতো মিশমিশে মেঘ।
বারোটা অনড়.. ঘুমবন্ধ হয়ে জেগে আছে নিঃশব্দ নকৃআপ।

পাথাল জমির চরে কাদার সুতায় চাখছি গায় বুকে।
ঝোরা কলকল করে দুলে ওঠে রুপোঝোপা ঘুমে।
আঁচড়ে হিঁচড়ে তুলছে—রবারের বলের মতো গলে ঝরে যায় তার মাথা।
দলবাঁধা কুকুর হাঁকছে পালা করে…নড়বড়ে টেবিল
ঝন্ঝন্ বেজে ওঠে—নলো ধাপ চুড়োয় আঁট করে ধরে আছি তোমারি হাত।
আগুনমোমের মতো গলতে গলতে হঠাৎ কিছু নেই আর
আলগা মুঠোর মধ্যে—শিরশির করে ওঠে রাতের বাতাস—

থোরা শেষ করে ঘন ডুবনীল পিঙ্গরার আঁজি।
গোপন গলার রঙে ঘর গন্গন্ করে ওঠে।
পিছুসান দিয়ে চলে যায় যেন আঁচ গায়ে লাগে—আধাবুনো গাঁ,
পাথাল জমির চরে পা ডুবিয়ে কাদার সুতার চাখছি গায় বুকে।
কখন ঝলে পড়েছে মেঘবৃক্ষের ঢোলা ঢোলা পাতা, মাথায় লাগছে
আসুকিবাসুকি নাগ—লালনীল ফিতের বিদ্যুৎ—
দেয়াল দেয়াল ছিঁড়ে ফুঁসে ওঠে—বেনাগাল চুড়োর মাথায়
শেষ বাঁধটুকু ছিঁড়ে খসে গেল হঠাৎ—কালো তীব্র পাষাণপাতাল,
দশদিশ বাঁধা করে কালো তীব্র পাষাণপাতাল…
ধরে কল কল করে বেজে যায় একটানা ঘুম—

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

৫৭

ঝড়ের জন্য অপেক্ষা

ভারতবর্ষের আগে 'মহান' শব্দটি খুব সুন্দর মানায়,
আশ্বিনে মানায় চঞ্চল বালক মেঘ হিমালয়ের চূড়ায়,
ওই সংকুল পাথর থেকে, আকাশের ঈশ্বরপ্রদেশ থেকে

নির্ঝরিণী নেমে এসে সবুজউল্লাসে একে বেঁকে
নারীপুরুষের নামে কত নদনদী হয়েছে আর
ডিংডং ডিংডং ডিং
মন্দিরেও ঘণ্টার পৃথক সান্ধ্যধ্বনি যখনি জেগেছে, বোঝা গেছে
এই দেশে আলাদা আলাদা বহু দেবদেবী রয়েছে
এবং মানুষও ভাত খেয়ে অথবা না খেয়ে ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেছে
যেন সে জ্যান্তই থাকে, উদগার তোলার মতো
খাদ্য যেন পায় তার ছেলে ছেলে-বৌ
অর্থাৎ মন্দিরে ঢুকে নিজের দেশের জন্য প্রার্থনা করে নি কেউ
তবু ভারতবর্ষের আগে 'মহান' শব্দটি বড় সুন্দর শোনালো !

বুদ্ধ অনেক প্রকৃত কথা স্পষ্ট বললেন ; বহুদিন পরে
এযুগের মানুষদেবতা রামকৃষ্ণ আরো সোজা করে
শেখালেন ভালবাসা, দেখা গেল দিব্যোন্মাদ একজন ব্রাহ্মণ
সূর্যকে অবাক করে দেশের পতাকা তুলে দিচ্ছে
রাজনীতি নিশানের অনেক ওপুরে। এখন
এরা কেউ মানচিত্রে নেই, শুধু 'মহান' শব্দটি রয়ে গেছে।

ভেবে দেখুন হে পাঠক, যে দুটি গ্রন্থের লক্ষ কোটি শব্দের গভীরে ভারতীয়
সভ্যতা, সমাজ, অহিংসা প্রভৃতি প্রিয়
নাম, সর্বনাম, ঐতিহ্যের ঠিকানা রয়েছে সেই রামায়ণ মহাভারত তো
আসলে যুদ্ধের গল্প, যেখানে হিংসায় মৃত্যু, গুরুজন হত্যা, রমণীর অশ্রুরক্ত সব
পেয়েছে লেখার গুণে ধর্মের সৌরভ
যেন হিংসাই প্রকৃত ধর্ম, কৃষ্ণের শেখানো ক্রোধ অর্জুনের অনিবার্য তীরে
মৃত্যু হয়ে ছুটে যায়, পাঁচটি জারজ পায় হৃতরাজ্য ফিরে,
রাজ্য না শ্মশান ? সেই থেকে শ্মশানই এ দেশে কিছু সম্মান পায়।
এভাবেই মহাদেশ দেশ হয়, দেশ ক্রমশই ছোট হয় গ্রাম, গঞ্জ, রিক্ত পরগনায়,
পাঁচজনের যুদ্ধ শেখে জন্মসূত্রে ভারতবর্ষীয় জনগণ,

ভাতের জন্যও যুদ্ধ হয়, নেতৃত্বের জন্য হয়, ধর্মেরও থাকে বহু সমরাঙ্গণ !
বহুদিন অপমানে, বহুদিন বেঁচে থাকার বিরক্ত বেদনায়
একজন ক্ষিপ্ত কবি চাঁদ, তারা, নারী সব সরিয়ে ধাক্কায়
লোলুপ বাঘের মতো 'মহান' শব্দের টুঁটি হিংস্র চেপে ধরে,
তারপর 'মহানের' মৃত্যু হলে পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে যায়
পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে গেলে পুনর্বার এসে যায় নির্বাচনের সময়।
এই নির্বাচনকেই আমার ভয়, আমরা বেছে নিই যাকে সেইতো দেখি
'হেন করেঙ্গা. তেন করেঙ্গা'
বলে ! হিমালয় ক্রমশ গম্ভীর হয়
সমুদ্র, গাছপালা, সৌধ, নতুন ঝড়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কুয়াশা

কুয়াশায় হাত রাখলে নির্জনতা বুঝতে পারি
কেমন নিজের থেকে নিজে ভিজে বাতাসে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি

অথচ কথা ছিল কুয়াশা সরিয়ে সরিয়ে রোদ আনবে তুমি
বৈত উত্তাপ মেখে সবুজ ঘাসে পা রাখবো আমরা।

কথা ছিল। কথা থাকে।
এমনি করেই কুয়াশার পর কুয়াশা চাদর বিছিয়ে বিছিয়ে
হাতে হাত রাখা অরণ্যানীকে ঢেকে ফেলে মায়া জালে ;

তুমি হয়তো পথ খুঁজে না পেয়ে অন্যমনে তারার ঠিকানা খুঁজেছো,
অথচ কথা ছিল সুসময়ে রাত্রি আনবে তুমি।

কথা ছিল। কথা থেকে যায়।

কুয়াশায় হাত রাখলে নির্জনতা একান্ত নিজস্ব ॥

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

এইরকম

ঠা-ঠা রোদও উৎসব
মুকুন্দ আলির কেরায়া নৌকো
পাট-পচা গন্ধ
কালীঘরের দেয়ালে ঝুলন্ত খাঁড়াটা একবার যদি
ছুঁতে পারতাম।
পদ্মপাতায় জল ঢালা আর জল ফেলা
খেরো খাতায়, হিজলের বনে ভিতু দুঃখ অপেক্ষা করত
উৎসব হাতের মুঠোয়
কালপুরুষের বেল্টের নিচে
আমাদের ছ'আনার জমিদারি।

শৈশব থেকে দূরে এই মৌসুমি মধ্যাহ্ন
বহুকাল পর নিজের সঙ্গে একা দেখা
কিছু কষ্ট—ঝেড়ে ফেলা দরকার,
কিছু কাপড়—একটি সুতোও গায়ে রাখার দরকার নেই
মাথার ভিতরে চড়া বাজনাটা বেজে যায়
ঝনঝন্ ঢংঢঙ ঝন্ ঝন্
নেমে আসে উঁচু দেয়াল
শৈশব যৌবনের মাঝখানে
প্রশ্নচিহ্নের মতো
নাচতে থাকে একটা সিঁদুর-মাখানো খাঁড়া।

সুরজিৎ ঘোষ

দেশ পরদেশ নয়

দেশ নয়, পরদেশ নয়
একটি কলমিলতা বেড়ে ওঠে স্নানপুণ্য জলে।
পরিচয় ছাড়িয়ে সে যতদূর লাবণ্য-সতেজ
টিনের মুকুট থেকে ততদূর আলো এসে পড়ে।

স্রোতের কলমিলতা জলের তলায় গাঢ় মুখ
সেই মুখ শিশুটির, আজ যার কঠিন অসুখ।

হাওয়ায় কলমিলতা, জলের মাথায় উঠে পড়ে,
দেশ পরদেশ নয়, হাসিমুখ, অচেনাঅসুখ
লুকোনো আলোয় নড়ে চড়ে।

সামসুল হক

অথচ সে

দাঁড়িয়ে থেকো না আমি বসো কিংবা হাঁটো
বসে থাকিস না তুমি পালক কুড়িয়ে ডানা বাঁধ
অথচ সে এইসব করতে না-পেরে একা শ্রেণীহীন কাঁদি
বিদ্রূপের মতো বসা ইষুর মতোন হেঁটে যাওয়া
পালক মানে কি লাল আর
ডানা মানে ভিখিরির ভাতের সুবাস
দুপুরে সে এইসব জানতে না-পেরে শিয়ে সঙ্ঘহীন কাঁদি

তরবারি ভেঙে গেলে আমি-ই হয়েছো তরবারি
ভিক্ষাঝুলি উড়ে গেলে তুমি গিয়েছিস পম্পেইয়ের
পাইরোক্লাস্ট থেকে ধন্য নীবার কুড়োতে
অতিরিক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় SiO_2

অথচ সে এইসব করতে না-পেরে একা শ্রেণীহীন কাঁদি

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দোষ দিও না

পাপের পথে পা দিয়েছি, পাপে ডুবছি, পাপে ভাসছি,
পাপের পথে এগিয়ে যাচ্ছি দ্রুত

এগিয়ে যাচ্ছি প্রলোভনের অদৃশ্য কুমন্ত্রণায়।

তবু আমার গতিবিধির দিকেই তোমার নজর।
যেদিকে হাঁটি, সেদিকে তুমি হাঁটো।

দোষ দিও না তোমায় আমি নষ্ট করছি বলে।

বেণু দত্তরায়

রাজগীরের কবিতা

১.
শেষরাত্রে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে চলেছি
স্নানের পোষাকে
অ্যাশফণ্টের পুরানো রাস্তাটা
ডাইনে বিম্বিসারের মৃত নগরীর
কংকাল
হাওয়ায় শীত-শীত আমেজ…আলোগুলি
দাঁড়িয়ে
বার্মিজ বুদ্ধিষ্ট্ টেম্পল বাঁয়ে রেখে
ডর্মিটারী ওই দিকে—
জাপানী টেম্পলে কাল বিকেলে
হাওয়ায় মৃদঙ্গ বেজেছিল
মনে আছে?

২.
স্বপ্নের মতো মনে আসে এইসব
হাজার হাজার বৎসরের পুরানো স্মৃতি
স্বপ্ন ভেঙে
নৈরঞ্জনা একদিন ওইখানে ছিল, মস্ত
কালো পাথরে বাঁধানো মূর্তি, ভগ্ন
দেবদত্তের স্তূপ
আমরা হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি
মস্ত বড় গাছটা, রাজগীর
নিউপয়েন্টের আলো
বাতাসে শীত-শীত… টাঙা দাঁড়িয়ে
গরম চাদরটা আনলে চলত

৩.

পুরাণের সরস্বতী চলেছেন পায়ের তলায়
কাঠের ব্রীজ, উপরে উঠবার সিঁড়ি···
ধাপে ধাপে ধাপে
বাঁধানো চত্বর, আমরা
কত উঁচুতে উঠব ?
রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িতে রাত পৌনে চারটে

পরেশ মণ্ডল

দিনলিপি ১৯৮০

দেখতে দেখতে বছর চলে যায়
চলতে চলতে বরফ গলে যায়
আর পাহাড় থেকে বেড়ে ওঠে একটা গাছ
কী নাম জানি না
গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ফুল
দেয়ালে
ঘরের মধ্যে অমাবস্যা কেননা লোডশেডিং
ক্যালেণ্ডারে দিনটা গুডবয় রোববার
টেবিলে একটা বুদ্ধমূর্তি
পাথর হয়ে ছিল
এখন একটু নড়ে বসল

দেখতে দেখতে বছর চলে যায়
চলতে চলতে বরফ গলে যায়
আর পাহাড় থেকে বেড়ে ওঠে একটা গাছ

বাসুদেব দেব

ঝড়বৃষ্টি

কিছুই জানো না যেন তুমি
রান্নাঘরে সুগন্ধি ব্যস্ততা
আগুনের আঁচে রাঙা মুখ
বাগানের পিছে জমছে নিঃশব্দে মেঘের অভিমান
পুকুরে সে ছায়া পড়ে
কিছুই জানো না যেন তুমি
তুমি কি তোলো নি ঝড়
ভাঙো নি কাচের মত কিছু
ছিঁড়ে খুঁড়ে বুক তুমি চাও নি কি
তৃষ্ণার ছোবল

পেয়ালা পিরিচে শুধু কৃত্রিম লিরিক
আনমনে তোলো তুমি
চিনির কৌটোর কাছে বড়ই কাঙাল ছুটি
পিঁপড়েকে দিতেছো প্রশ্রয়
কিছুই জানো না যেন
নিষ্ঠুর রমণী, তবে 'নমস্কার আজ তবে যাই'

'ঝড় নয় আজ কিন্তু বৃষ্টি হতে পারে'
জানালার দিকে চোখ তুমি যেন কিছুই জানো না

সুধীর আচক

বাঁকুড়ার ঘোড়া

অন্ধকারের নাভি ছিঁড়ে উঠে এল চাঁদ,
আমাদের দু'চোখে তখন
জ্যোৎস্নার আরাম হাত-পা মেলে হয়েছে।
আমরা একটা কংক্রিটের ব্রিজ পার হয়ে এলাম;
নিচে অভ্রের বিছানায় দ্বারকেশ্বর
শহর তখনো দু'ঘণ্টা দূর।
আচমকা বিদ্যুতের চাবুক পড়লো ঈশান কোণে,
বিশাল একটা শাদা-কালো মেঘ
জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে ছুটে এল যেন অশ্বমেধের ঘোড়া.
তার কপালের জয়পত্রে আটকে ছিল চাঁদ
ক্ষুরে বৃষ্টির মুক্তো,
আমরা পথের মধ্যে দু'হাতে মুক্তো কুড়িয়ে ভিজেছিলাম।
বাড়ি ফিরতে মাঝরাত
আকাশ তখন মাজা নীল
উঠোন ভরে আছে চিত্রল হরিণের মতো জ্যোৎস্নায়,
বসার ঘরের টেবিলে বাঁকুড়ার ঘোড়া
তাদের পোড়া মাটির গায়ে ঘাম অথবা বৃষ্টির চিহ্ন নেই॥

জগত লাহা

আবার আয়না

প্রসিদ্ধ অভিনেতা হতে চেয়ে ছেলেবেলায় আমি
হরিতকি কাঠের একটা বিশাল আয়না কিনেছিলুম।
সেই আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি রোজ,

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হরবোলার মতো পার্ট বলতুম।
কখনো অশালীন ভুরু কুঁচকে জেব্রাচোখে তাকিয়ে
থাকতুম। দোয়েলের মতো শিস দিতুম। ময়নার মতো
গান গাইতুম। রকবাজ ছোকরাদের মতো ভিলেনি
হাসি মকশো করতুম। পেঁচার মতো চোখ পাকাতুম।
বিড়ালের মতো গোঁফে তা দিতে দিতে কল্পিত ব্যক্তিকে
উদ্দেশ্য করে হাঁড়িচাচাকণ্ঠে ধমকে উঠতুম। বাঁদরের
মতো দাঁত খিঁচিয়ে এলোপাথাড়ি ভেংচি কাটতুম।
হর্ষ ক্রোধ বিষাদ—নানান মানবিক ভাব ফুটিয়ে নিজেকে,
বন্ধু এবং প্রতিবেশীকে মুহূর্তে হতবাক করে দিতুম।

তারপর ক্রমশ বড়ো হলুম, কিন্তু বড়ো অভিনেতা
হতে পারলুম না। আয়নাটা থেকেই গেল।
বিবর্ণ হল কিছুটা। চতুষ্কের চারপাশে মরচে
ধরল। গ্লাসটা হলদেটে এবং ঘোলাটে হয়ে এল।
এখন আমি আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালে
আয়নাটাও সরাসরি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। দাঁত বের করে হাসে।
চোখ পাকায়। গোঁফে তা দিতে দিতে ধমকাতে
থাকে। ক্রমাগত ভেংচি কাটে। হর্ষ ক্রোধ বিষাদ—
নানান সব ভাব ফুটিয়ে আমাকে অবাক করে দেয়।

স্বপন সেনগুপ্ত

কাব্যিক চাতাল চেয়ে

কাব্যিক চাতাল বেয়ে উঠে আসছে
নর্দমার তিলোত্তমা হাঁস।

তার কোন ভয় নেই, ভীতি নেই—
ভয়ানক খাড়া কিংবা জলের পাহাড়,
রক্ত-অপরাহ্ন—
কোনদিকেই তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই

ঘর-ক্ষিপ্র বিচ্ছুরণে এগিয়ে আসছে
চক্‌চক্‌ করছে তার পালক
অতলান্ত ভুলে যাওয়া স্ফটিক চোখ

ফেনিল ঢেউ কেটে কেটে ক্রমশঃ
এগিয়ে আসছে বিদ্যুৎ-ঝলকে
ক্রুদ্ধ চঞ্চু, আক্রোশী,
হয়তোবা আংশিক কামুক

চিড়ে ফেঁড়ে যেন দেখতে চায়
মৃত্তিকায়, বিক্ষুব্ধ সবুজে
পিষ্ট, জীবন্মৃত, রুটি ও ব্যথার কবলে
মানবীয় যান্ত্রিক শিকড়।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

হয়তো ভাবছো

হয়তো ভাবছো, ফিরতি ট্রামেই
বাঁধা বান্দার মতো এসে দাঁড়াবো তোমার উঠোনে
বড়জোর কিছুদিন এ গলি সে গলি করে
পুনরায় কড়া নাড়ব তোমার দরজায়
কেননা প্রবাদে আছে, এক বর্ষার জলে
হৃৎপিণ্ডের সমস্ত প্রদাহ জুড়ায়।

হয়তো ভাবছো, ফিরে আসব বলেই
অভিমানে ফোঁস করে একছুটে বাইরে এসেছি
হয়তো ভাবছো, এ আমার প্রথাসিদ্ধ ভান !
কিন্তু মনে রেখো
অন্তর্নিহিত পুরুষ একবার আহত হলে
ভিখিরির অঞ্জলিও ডিনামাইট ছুঁড়ে দিতে পারে !

যদি ফিরে আসি
দস্যুর পোশাকে এসে তছ্‌নছ্‌ করে দেব তোমার প্রতিমা।

যতীন্দ্রনাথ পাল

দুপুরের দিকে

এইত প্রথম তুই পা বাড়িয়ে দিয়েছিস্ এমন একটা রাজ্য
যাকে ঠিক জানিস্ না : বুঝিস্ না,
কচি নীল সবুজ শাখার মত সকালের থেকে
রোদভরা দুপুরের দিকে : সবুজ মাঠের দিকে,

অরণ্য রয়েছে মনোরম, নাকি রহস্যে ভীষণ
ওখানে কোকিল ডাকে;
ওখানে কি শ্বাপদও রয়েছে ?
সবুজ মাঠটা যেন টেনে নিচ্ছে দুই চোখ দিয়ে :

অজগর : অনেকেই বলে অজগর,
মোহন শরীর নাকি লুটপাট ছেঁড়াখোঁড়া
করে দেবে, যখন ওর ময়ূর-নাচে ভীষণ জ্বর
দাঁতে করে কল্‌জে চুষবে হায়েনারা,

ভয়ানক খর যে দুপুর

অশোক সেনগুপ্ত

বসে থাকে কেহ

সে কখনো আসে না
অন্তরে আলো জেলে যার তরে
বসে থাকে কেহ।

যে আসে সে কভু সে না,
দিন কত হয় গত হয় চেনাশোনা
তারপরে দেখা যায় এতো আর কেহ।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরাধিকার

তোকে যে লুকিয়ে দেখি আজকাল
তুই টের পাস ?
ইচ্ছে ক'রে দূরে দূরে রাখি
পাছে তোর মাছরাঙা
আমাকে এড়িয়ে
উড়ে যায়।

অথচ, সকাল-সন্ধে
তোকে দেখা ছাড়া
কাজ নেই।
তোর শিশুশরীরের ননী
কার হাতে ভেঙেচুরে

গ'ড়ে উঠছে
নতুন শরীর।

তোর মুখে ছেলেমানুষীর সর
কেটে গিয়ে
দেখা দিচ্ছে আমার আদল,
আমাদের,
বাঁড়ুজ্জ্যেবাড়ির।
প্রপিতামহের জেদ
তোর রক্তে,
চওড়া হ'য়ে ওঠা কাঁধে
অকুতোভয় পিতামহ।

তোরই হাতে দিয়ে যাব, বংশধর,
উত্তরাধিকার।
তোরই বুক মুখে ক'রে
মুখে নেব তোর হাত থেকে
মুখাগ্নির নুড়ো নয়,
বংশের মশাল।

ব্রত চক্রবর্তী

পাখী

একটি ছোটো পাখী আজ সকালবেলায় এসে
আমাকে জিজ্ঞেস ক'রছে আমি কেমন আছি।
এই পাখী অনেক পুরোনো পাখী, কয়েকবছর আগেও দেখেছিলুম
এই পাখী আমার আত্মার ভেতরে এসে কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করছে।

পাখী বিষয়ে আমি কম বুঝি কিন্তু আমি
আন্তরিকতা চিনি। বন্ধুদের শীতল অভ্যর্থনা যখন দুঃখ দেয়,
সম্মেলক সঙ্গীতের ভেতর বেসুরো লাগে আমার গানের গলা,
তীব্র শীতের দিনেও ক্ষার কোটের আড়ালে ঘেমে উঠি
এক যুক্তিহীন বিষণ্ণতায়, ঠিক সেইসব দিনে
আমি এই পাখীর উদার উপস্থিতি টের পাই।
টের পাই ঈশ্বরের মতো আমার ভেতরে এসে সে আমাকে
বাজাতে শুরু ক'রেছে।
আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি বিষয়ে যত গল্প প্রচারিত আছে পৃথিবীতে
আমি সমস্ত পড়ি নি, তবু এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি
আমার দুঃখের দিনে এই পাখী কাছে এসে দাঁড়াবেই।
মনে হয়, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আত্মা এই
পাখীর খবর জানে। জেনে, স্থির হ'য়ে আছে এই রুক্ষ পৃথিবীতে।

মঞ্জুভাষ মিত্র

শরৎকাল

সে যেন আসুক সে যেন আসুক
প্রতীক্ষাময় আমার প্রেম।

প্রতিজ্ঞা কত করেছি এবং
অবশেষে গেছি ভুলে
আমার ভয় ও আনন্দগুলি
ফোয়ারার মত রঙীন, গিয়েছে খুলে

তৃষ্ণার চাপে হৃদয় আমার
কালো হয়ে যায়। হে শরৎকাল

সে যেন আস্থক সে যেন আস্থক
আমার প্রেয়সী !

স্বর্ণ-রচিত সবুজপাথর
সুন্দর হাতে বেপমান
অতি বেড়ে যাওয়া নিষ্ঠুর ফুল
দুঃখেরা করে গন্ধ-গান

বনের ভিতর সবুজ পাতার
মতন চকিত তন্বী তরুণী
আজ তাকে দেখলাম
যেন বিষণ্ণ নীল ভায়োলেট।

সে যেন আস্থক সে যেন আস্থক
মোহময়ী ওই শরৎকাল।

মুরারিশংকর ভট্টাচার্য

কবিতা

দুঃখ যখন পাতাল ফুঁড়ে ওঠে
পাশেই তখন দাঁড়াও অনিকেত
হাজার সুখের আভাস দিয়ে বুকে
উত্তরণের পরাও উত্তরীয়।

দুঃখ যখন পাতাল ফুঁড়ে উঠে
হাত বাড়িয়ে হৃদয় ছুঁতে চায়
তখনি তোমার বজ্র ওঠে হেঁকে
জানিয়ে দিয়ে স্তব্ধ অভিপ্রায়।

অশোককুমার মহান্তি

দু'টান

মানুষের ভালোবাসা ঘর বাঁধতে বলে
ঈশ্বরের ভালোবাসা ভেঙে দেয় ঘর
আমি দোটানার মধ্যে বহুদিন এরকম যন্ত্রণাকে ভুলে যাই
বহুদিন যন্ত্রণা আমাকে অবসাদে ক্লান্ত করে…
ক্লান্ত করে…
আমি শুধু ঘরে বাইরে ছোটাছুটি করি।
আগুন লেগেছে ঘরে আগুন লেগেছে দেহে
আগুন লেগেছে শিশ্ন আমার উদরে
মানুষের ভালোবাসা ঘর
ঈশ্বরের ভালোবাসা শূন্যস্থান নির্জন আখর
আমি দোটানার মধ্যে বহুদিন এক-কে দ্বিগুণ করে ফেলি।

আনন্দ ঘোষ হাজরা

পরিচিত ভাঁড়ের গল্প

শিরীষ ফুলের মতো রোদ বেয়ে একদা এনেছি সিন্ধুপার
ইত্যাকার ভেবে ভেবে হাতীর ছায়ার নিচে আমাদের
পরিচিত ভাঁড়
কেঁদেছিলো, ভেবেছিলো মুখমণ্ডলের মধ্যবিন্দুর আগুনে
বয়স পুড়েছে দীর্ঘকাল ধরে,
অথচ কি বয়স্ক সেগুনে
বৃষ্টিভারে নত মেঘ ছোঁয় নাই অভ্রের মতো প্রতিভাসে?

শব্দ ক'রে হেসে পরক্ষণে
প্রখর মধ্যাহ্ন এলে আপন খুলির শূন্য স্তব্ধতাকে
সূর্যের আলোর দিকে ধ'রে
শমিত সামর্থ্য নিয়ে ফিরে গেলো ব্যস্ত যাদুঘরে ॥

অজিত বাইরি

সময় সব শোক ভুলিয়ে দেয়

সময় সব শোক ভুলিয়ে দেয়—
পুরনো কথাটাই আবার মনে পড়লো
দেওয়ালে টাঙানো দেখলাম যখন
তোমার প্রতিকৃতি।

তুমি একা। গলায়
শুকনো ফুলের মালা। প্রথম প্রথম
দু'চারদিন বদলানো হলেও
এখন আর হয় না।

এখন চায়ের টেবিলে প্রসঙ্গক্রমে
উঠে আসো তুমি। এবং তেমনি
আবার কথার আড়ালে হারিয়ে যাও।
কতগুলি ঋতু
তোমার মৃত্যুবার্ষিকী ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল
কেউ খোঁজ রাখে না।

শুকনো পাতার মত জড়ো হওয়ায়
এবং আবার উড়ে যাওয়া হাওয়ায়
তুমি একটি নাম।
সময়ের বিধান অগ্রাহ্য করা আমাদেরও অসাধ্য ছিল।

সুব্রত রুদ্র

বেঁচে থাকবে কেন

মানুষ বেঁচে থাকবে কেন যদি-না মাথা হারিয়ে ফেলে ?
তুমি কী জানো ? পৃথিবীর এদিকে অন্ধকার
নেমেছে। সমস্ত মানুষ গিলতে।
তুমি কী জানো ? পৃথিবী কোথায় আছে
আমি তা জানতাম না তাই এত কথা বলেছি
আমার ভয় হচ্ছে শূন্যে পৌঁছে যাবো আমরা।

রোজ সকালে গলায় দড়ি দিতে চাইছি আমি।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পথে

বেরিয়ে পড়েছি পথে
সুটকেশ সাথে নেই
কোথায় কোথায় যাব
নেই সেই তালিকাও।

বৌ আর বাচ্চাদের
সামলাতে ভীষণ ব্যস্ত
ট্রেনে লোকটির প্রশ্ন :
কোথায় যাবেন স্যার ?

কোথায় যে যাব আমি
কোথায় যে যেতে হয়

কোথায় যে যেতে নেই
আমি তার ছাই জানি !

সূর্য মরে যান দূরে—
দূর নক্ষত্রের আলো
বড়ো ম্লান গায়ে লাগে
শীত করে—শীত করে।

নিখিলকুমার নন্দী

কি সাহস !

ভীষণ টানছে তবু…
বিবিধ টাঙানো আয়োজন চারধারে বাধা এবং পরিধি
স্বহস্তনির্মিত কিছু সামাজিক সঙ্‌বদল গূঢ়ফণা ভান ও ভনিতা
ভয়ংকর আরূঢ় আসনে উপবিষ্ট
আর তার আয়ত নয়ানে দেবী-আরতির গন্ধধূপধুনো
ধূমময় আচ্ছন্ন স্বন্দর

দূরকে কাছের করা কী কঠিন হিমের পাহাড় !

সহজ চাহনি দিয়ে খেয়া-পারাপার তার অকপট চাওয়া
দরজা-জানলা-খোলামেলা ইচ্ছাগুলি তথাপি অন্যায়
যদিও তা সৎ আন্তরিকতম গোপনের নিভৃত উত্থান
কী সাহসে থেকে থেকে স্পর্ধিত দাঁড়ায় !

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

যাওয়া

পা বাড়িয়েই দাঁড়িয়ে আছি
তুমি এলে
যেখানে যেমন যা যা আছে
ঠিক তেমনি রেখে
কুণ্ঠাহীন যাবো
বড়ো জোর
পিছনে তাকাবো ফের্
দেখে নিতে মৃদু আলো
গাঢ় অন্ধকার ঘর।

তবু বলি
একটু অপেক্ষা করলে হত
কিছু দেনাপাওনা বাকি
কিছু পরিশোধ
গেরুয়া মাটির এই ঋণ
কাঙাল দুঃখিনী চোখে
অল্প একটু তৃপ্তির আঁচড়
টেনে দিতে প্রতিশ্রুতি
দেওয়া ছিল। যেন অই দুটি চোখ শুধু
আমার পিছন টান
যেতে যেতে
অল্পস্বল্প মন খারাপ হবে।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি একাই তার গান গাইবে

রাত্রি একাই তার গান গাইবে
একাই সে কথা বলবে নিজের সংগে
দুঃখে সে ভারাক্রান্ত করে তুলবে আষাঢ়ের আকাশ
তোমার মনে পড়বে খুব সাধারণ সেই মেয়েটির কথা
খোলা মাঠের খোলা বাতাসে
যে তোমাকে প্রথম চুম্বন উপহার দিয়েছিলো
ভালোবাসার রক্তে রাঙা হয়েছিল মাটির পৃথিবী
এখন সেই বিমুগ্ধ স্মৃতি এতই সুদূর
তাদের উপন্যাসের ঘটনার মত মনে হয়
—তবু মনে হয়
রাত্রি একাই তার গান গায়
একাই সে কথা বলে নিজের সংগে ···

কিরণশঙ্কর মৈত্র

ভেসে যাই

মায়ের হৃৎপিণ্ডের তাপ ছিল না
বরং ফণীমনসার ঝোপে মাথা রেখে
কখনও মাধবীলতা
বুকের বাগানে, দাঁড়ে
যত্নে পোষা সবুজ ময়না,
আলোকিত পাইনের গান
যেখানে রোদ্দুর চাদর বিছায়

পাহাড়ী মেলায়—
খোলা হাওয়া মুখে মেখে
ভেসে যাই।

ভেসে যেতে হয়।

ব্রততী ঘোষরায়

বেণীবন্ধে পাপ রাখো

বেণীবন্ধে পাপ রাখো,
সবুজ পাখির অহংকার॥
নাম দাও উত্তর শাখায় যদি
পত্রবিন্দু দুহাতে ওড়ায় মিল
প্রশস্তি তবুও স্থির রেখাময়॥

যে জানে সে জানে সব,পত্রময় ত্রুটি, ফেলে যায়
অন্তিম ঋণের দায়।
সেই তো রমণী কিম্বা
অশোধিত বৃক্ষরাজি
নির্মম মৃত্যুকে ভালোবাসা
সুধাপক্ক দুহাতে ভরানো॥

ফাঁক থাকে সময়ে ও ঘরে।
পাপ রাখো করবৃন্তে,
বৃষ্টিজলে
দীঘিতে, উদ্যানে॥

বরুণ মজুমদার

বিপন্ন দুঃখের কাছে

এখন মনের মধ্যে অতৃপ্ত কামনা :
কে তুমি বিপন্ন দুঃখ, বিষাদের ঘরে
আমাকে দিয়েছো স'পে অভিশপ্ত প্রেমিকের কাছে।
ব্যাপক তিমিরে একা দুর্বিনীত সম্রাটের মত
নিজ হাতে তুলে নেবো এই বেলা অতি সমারোহে
সুগন্ধি গোলাপচারা চিরকাল রোপণের ভার।

দেখেছি নদীর প্রান্তে বনানীর সঘন চূড়ায়
হলুদ রঙের রাখি নীড়ে তার মায়াবী শাবক।
রোজকার খেলাশেষে ছায়াঘন শীতের সকালে
আমাকে ঘুমোতে দাও, আমি শ্রান্ত জীবনের রণে।

তুমি হে বিপন্ন দুঃখ, বার বার অমলিন স্বরে
আমাকে ডেকো না যেন অতিব্যস্ত পাহাড়তলীতে।

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

রহস্যের সাদা পাল

জোয়ারে স্রোতের জলে আশা থাকে ভয় থাকে। মৃত্যু—

এ মৃত্যু কোমল জল, এ ভয় হারিয়ে
অন্ধকারে মাছেদের সুখ,
কিছু আশা জীবনের
রাজ্যে ফিরে আসা। চিরন্তন আশার সংগ্রাম

মৃত্যুর দরজায়। স্রোত ক্লান্ত হলে চড়া পড়ে—
নতুন দ্বীপের বুকে তৃণাঙ্কুর, সবুজ সবুজ……

সমুদ্রবাতাস বুঝি কানাকানি কথা বলে,
ঝড় হবে। জলের স্রোতের সঙ্গে জোট বাঁধা
মাঝিদের দাঁড় বাওয়া
গান গাওয়া অযুত যুগের, রহস্যের
থরোথরো বেপরোয়া সাদা সাদা মাস্তলে উড়িয়ে

মধুমাধবী ভাদুড়ী

এই সকালে

কচু পাতাটা দুলে উঠল
অথচ হাওয়া নেই
হয়তো ফড়িঙটা উড়ে গেল।

এ সময়েই তিনটে ঘুঘু ডেকে চলে
অবিরাম ইলেকট্রিক তারে।
আর একটু পরে দুটি মেয়ে চলে যায়,
দূরে স্কুলের ঘণ্টা বাজবে।

এই সকালগুলো আমায় বড় করেছে ;
আমার মনে ইচ্ছে হয়,
সুখ দুঃখ বুঝতে পারি ;
অনেক কিছুই চাইতে পারি। বা পারি না

তবু অসহায়, পেতে পারি না কিছুই,
রোজ সকালে আমাদের চাকরটা
এখানে বসিয়ে রেখে যায়
বেলা হলে ইচ্ছে কটি দমবন্ধ ঘরে।

মানসী দাশগুপ্ত

বৃক্ষের মতন

কিছু নবীনতা ছিলো বাকি কোনদিন,
সমস্ত পুরোনো আজ। বেঁচে থাকা, মরণাপন্নতা.
বুকের ভিতরে কথা ছলছল অথবা গলার কাছে বেদনায়
অনির্বচনীয় সব এত বেশি জমা হয়ে উঠেছে কোটরে—
খুঁজলেও মিলবে না।
বাসাবদলের ইচ্ছে অনুভব করেছিল তাই
একজন সংসারী মানুষ।
এখন প্রাচীন তা-ও। শুধু পড়ে থাকা।
বসন্তসন্ধানী সূর্য, তেজ একটু নম্র করে রাখো,
কাঠুরে অক্লান্ত হাতে সুনিপুণ আঘাতে কাটুক
জড়ের মাটির মায়া
যে-মমতা সহস্র শিরায় পিছু টানে।
স্থবির বৃক্ষের আঙুলের অসফল মুঠি
বিনাশর্তে খুলে যাব বিনিঃশেষ আত্মসমর্পণে।

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয় পাখি

এসেই দেখি তোমার বাগানে
খেলা করে ছয় টিয়েপাখি
এডালে ওডালে ফেরে, সন্ধ্যা ভাষায়
পরস্পর কথা বলে, ঠোঁটে ঠোঁট রাখে।

রাস্তায় বিস্তর ধুলো—
ট্রাক, রিক্সা, বাস, পি পি জীপ,—
পাকালো পাতার ডাঁই, নেড়িকুত্তা,
কা কা কাক, পিলে-উদোম ছেলে,—
হঠাৎ ট্রেনের বাঁশি বাজে।
অর্থাৎ সম্পন্ন শহরের এই ইতিবৃত্ত। তবু
অনেক দূরের দেশ থেকে মেঘের জাজিমে
রোদের তির্যক সুতো বোনে তন্তুবায়
দৈবী চরখায়। বুক জুড়ে বাজায় দোতারা।

ছয়টি প্রমত্ত পাখি নিয়ে
টিয়ে-রঙ বয়স্ক বৃক্ষের মতো নতভার
ঘর করি দীর্ঘ কাল জুড়ে,
গার্হস্থ শাখায় দোলে ছায়া মায়া।
ছয় পাখি সন্ধ্যা ভাষায় কথা বলে
তারই তালে ফাঁক খুঁজে নিয়ে
কানে কানে কথা বলি যেখানে মনের
গহন গুহায় শুধু তোমার আমার
ছয় দাঁড়ি সমুদ্র-সময় পারাপার।

ছয় পাখি ছয় দিকে ওড়ে,
ছয় ডালে বসে, মুখ নাড়ে,
কী ভাষায় গেয়ে ওঠে সপ্তমে অন্তর।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

হাইওয়ের পাশে

দু'তিনটে শাদা পায়রা
সবুজ গাছের ডালে দাপাদাপি ক'রে
তারপর স্পষ্ট উড়ে গেলো।
হাইওয়ের পাশে, ছোট্ট চায়ের দোকানে,
সমাজ, সাহিত্য নিয়ে আমরা একে একে
কথা ব'লতে আরম্ভ করলাম।

কিছু দূরে, চুর্ণি নদী কচুরিপানার নীল ভাসিয়ে ভাসিয়ে
সমান্তরালভাবে চ'লে গেছে।
কিছু দূরে, ছোটো-নৌকো খেয়া-পারাপার করছে
সাইকেল, ছাগল, আর মানুষ উজিয়ে।

ইচ্ছে হ'লে, আমরা দূরে কৃষ্ণনগরের দিকে চ'লে যেতে পারি,
কিংবা, আরেকটু কাছে, রাণাঘাটে, জয়ের বাড়িতে—
কিন্তু এখন আমরা কোথাও যাবো না,
হাইওয়ের পাশে, এই ছোট্ট দোকানে
আমরা আরেকটুক্ষণ ব'সে থাকবো, কাপ হাতে নিয়ে।

শাদা পায়রা ফিরে আসছে টেলিগ্রাফের তার ঘেঁষে,
মস্ত রেন-ট্রির পাশে ধুতুরাফুলের চারা চমকিয়ে ওঠে॥

অরুণ মিত্র

যেখানে আংঠায় রাখা

বাজারের পথে আপিসে ইস্টিশানে গুদোমে
কলকুঠিতে শয়তানের হো হো অষ্টপ্রহর ছিটিয়ে
গিয়ে আকাশে আওয়াজের ছটা সাপাটতানের
বাহাদুরি। তবু আসে সুগন্ধ সুস্বাদ আর ঝর্ণার
ঠাণ্ডা রাস্তা থেকে উঠে আসে নেমে যায় রাস্তার
উপর দিয়ে রক্ত পার হ'য়ে পোড়োবাড়ির ধসে।
ওখানে আমি ফিরে যাব আমার জায়গায় আমার
দোমড়ানো হাত পা মেলে বসব আঙুলগুলো
খুলব বন্ধ করব সেই কোণ ঘেঁষে যেখানে সমস্ত
জ্বালা আংঠায় রাখা আছে।

কবি আপোলোনীয়র

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

[উইলহেলম্ আপোলোনারিস ছ্য কস্টোউইট্‌স্কি ১৮৮০ খ্রীঃ ২৬শে আগস্ট রোমে জন্মগ্রহণ করেন। গীয়ম আপোলোনীয়র তাঁর ছদ্মনাম। মা পোলিশ, বাবা ইতালিয়ান, শরীরে একবিন্দু ফরাসী রক্ত নেই, তবু তিনি ফরাসী দেশেই শৈশবকাল থেকে লালিত হয়েছেন এবং খাঁটি ফরাসী কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। মডার্নিষ্ট আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। বহু ছোটখাটো সাহিত্য সমালোচনা-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৯১৩-য় ফিউচারিজম্-এর সপক্ষে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। স্যুররিয়ালিজম্ শব্দটি ব্রেঁত পেয়েছিলেন প্রথম আপোলোনীয়রের রচনায় যদিও এর বীজ নিহিত ছিল আরও আগে র‍্যাম্বোর লেখায় বা তারও আগে নার্ভাল বালজাকের রচনায়। নারী থেকে নারীতে প্রেমের পর্যটনে বিশ্বাস করতেন কবি। বিশাল চেহারা ছিল। কিছুটা অ্যাডভেঞ্চারের বলেই প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, মাথায় গোলার আঘাত লাগে, সে আঘাত আর সারে নি। বিয়ে করলেন; ছ'মাস পরেই, যুদ্ধ থামার আগের দিন, ১৯১৮-য়, তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শবদেহ বহন করেছিলেন পিকাসো প্রভৃতি শিল্পী-বন্ধুরা।

গত ২৬শে আগষ্ট কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার কবির জন্মশতবার্ষিকী পালন করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কবির বিভিন্ন লেখার একটি তালিকাও প্রকাশ করেন জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। : অনুবাদক]

গীওম আপোলোনীয়র একদা বলেছিলেন 'I am intoxicated of having drunk the whole universe'। তাঁর নিজের মানসিকতা সম্পর্কিত এমন উন্মুক্ত স্বীকৃতি আর কোনো কবি বোধহয় করেন নি। তাঁর কবিতার এবং সমালোচনা কর্মের সবলতা ও দুর্বলতার মূলেও রয়েছে চতুষ্পার্শ্বের নিসর্গ, শিল্প

এবং মানবিক সম্পর্কের জন্য কবির এই সর্বগ্রাসী, সুগভীর তৃষ্ণা। খুব সাধারণ জিনিসের দিকে তিনি তাকাতে পারতেন। বন্দীশালার দেওয়াল বেয়ে-ওঠা সূর্যচ্ছটার দিকে তিনি তাকাতেন সেই বিস্ময়ে, যে বিস্ময়ে আদিমতম মানুষ তাকিয়েছিল নক্ষত্র এবং চন্দ্রের দিকে। একবার, ১৯১১-য়, প্যারিসের লুভার থেকে দা-ভিঞ্চির মোনালিসা চুরি করার মিথ্যে অভিযোগে কবিকে কিছুদিন বন্দীশালায় থাকতে হয়েছিল। কবির এই বিস্ময়ানুভূতির মধ্যে ছিল পুরান ও ইতিহাসের, অতীত ও বর্তমানের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ; এবং বস্তুত সব কিছুই যা এই পৃথিবীতে চলমান এবং যা অলঙ্কৃত করেছে অমরাবতীকে। এই সর্বব্যাপী দৃষ্টি নিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর শিল্প এবং কবিতা সম্পর্কিত নিরীক্ষা। কবি আবিষ্কার করেছিলেন, অন্তত আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিলেন সমস্ত জীবন, এই সব কিছুর মধ্যে এক স্পর্শাতীত ঘনিষ্ঠতা এবং এমনকি বিশ্বাস করতেন যে 'All the words I have to say have become stars'.

আজ আপোলোনীয়র বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, যে-বিশ্বভুবনের কাছে তাঁর সত্তার সূক্ষ্মানুভূতি সমর্পিত ছিল, সেই বিশ্বভুবনকে তিনি কি সত্যিই করতলগত করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কি সেই সংহত ভিশন্ ছিল যা প্রকৃত মহৎ কবিতার নির্মাণে প্রয়োজন? ঐ সংহতিবোধই কাব্যের জগতকে শৃঙ্খলা দেয়, অর্থপূর্ণ করে তোলে। এবং কাব্যের অমরতাও আসে ঐ একই সূত্র থেকে। সেই শৃঙ্খলা, যা যে-কোন কবি-সত্তার গোড়ার কথা, তারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল আপোলোনীয়রের জীবন। কিন্তু, অন্যদিকে এক দুঃসাহসিক জীবনের প্রতি আসক্তি এই অনুসন্ধানকে ব্যাহত করেছিল। তাই, শৃঙ্খলার প্রতি আসক্তি এবং অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আবেগ, ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং নতুনত্বের জন্য আকুলতা, নিয়মানুবর্তিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতার জন্য আকুতি, এই বিরুদ্ধ ইচ্ছাগুলির সমন্বয়ে তাঁর কবিসত্তা ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। সমস্ত মহৎ আধুনিক কবিদের মতই আপোলোনীয়র ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দাবীকে এক জায়গায় মেলাতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই তাঁর কবিতায় এসেছে সেই বিরল স্বাভাবিকতা ও সহজধর্মিতা। যা স্বাভাবিক ও সহজ তার একটা নিজস্ব শক্তি আছে। আপোলোনীয়রের কবিতায় সেই শক্তি বর্তমান।

একজন কবি তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তিনি যা দু-হাত তুলে দিতে পারেন আমরা শুধু তাই গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু, তবু আমরা তাঁর সহজাত সৃজনী প্রতিভার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি এবং যে-সব অবস্থা বা পরিবেশ ঐ প্রতিভাকে পূর্ণতায় পৌছে দিতে প্রতিবন্ধক হয়েছে, তার আলোচনা করি। আপোলোনীয়রের ব্যক্তিজীবনে বেশ কিছু বিপর্যয় ঘটেছিল যা তাঁকে, আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাড়িয়ে ফিরেছে। পোলিশ মাতা এবং ইতালীয় পিতার স্বাভাবিক সন্তান হিসেবে আপোলীনেয়ারের জন্ম হয়েছিল রোমে। তিনি শৈশব থেকেই ফ্রান্সকে তাঁর স্বদেশ হিসেবে বেছে নেন। কবির প্রথম যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা লেখা হয়েছিল অ্যানি প্লেডেন্‌ নামে একজন ইংরেজ রমণীর প্রতি তাঁর প্রেমের অনুপ্রেরণায়। এঁর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয় জার্মানিতে। আপোলোনীয়রের রক্তে ছিল লাতিন শৃঙ্খলা এবং স্লাভিক স্বতঃস্ফূর্তির দুটি বিচ্ছিন্ন ধারা। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একজন ফরাসী হওয়া এবং গ্যালিক প্রতিভার বিশুদ্ধতা আয়ত্ত করা। জীবনের প্রয়োজনে কবিকে বহু বিচিত্র চাকরি করতে হয়েছে, খুব অল্প বয়সে। এই সময়েই তিনি সমকালের প্রথম সারির কবি ও শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ফরাসী জীবনে একটি অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ায় কবি আগ্রহী ছিলেন এবং সেজন্যই ফরাসী শিল্প ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যে নতুন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সে-সময়ে, তিনি তাঁর নেতৃপদ বেছে নিয়েছিলেন। কিউবিষ্ট শিল্পীদের বন্ধু আপোলোনীয়রই প্রথম ‘সুররিয়ালিজম্‌’ শব্দটি সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই পরবর্তীকালের সুররিয়ালিষ্টদের প্রথম পূর্বপুরুষ। অবশ্য দাদাইজম্‌ আন্দোলনের ভস্ম থেকে সুররিয়ালিষ্ট আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল কবির মৃত্যুর প্রায় ছ’ বছর পরে। এই সময়েই ডিল্যানের নতুন ধাঁচের শিল্পের নামকরণ হয় অরফিজম্‌। এবং এই সমস্ত কাজে ফরাসীদের প্রতি কবির ভালবাসা প্রায় উগ্র স্বাদেশিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছেন কিন্তু আওয়েন বা রোজেনবার্গের মত এই লড়াইয়ের জন্য তাঁর কোনো বিশেষ দুর্বলতা ছিল না। ফরাসী কবিতার মতই তিনি যুদ্ধের উত্তেজনাকে মহিমান্বিত করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘The French are carrying poetry to all nations. All other languages seem to be silent so that the universe may better listen to the

voice of the new French poets'. আপোলোনীয়র য়েটস্, রিল্‌কে এবং র‍্যামন হিমেনেথ্‌-এর সমসাময়িক কবি ছিলেন।

বিভিন্নতা এবং একটি স্থায়ী আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার প্রেরণাই ছিল নব্য আন্দোলনের প্রতি আপোলোনীয়রের গভীর অনুভূতি, বিশ্বাস এবং অসীম উদ্যমের উৎসে। তিনি নতুন আন্দোলনগুলির নামকরণ করেছেন এমন করে যাতে সেই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি সংযুক্ত থাকে। তিনি এইসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন, কেননা ব্যাখ্যাহীন এবং কিছুটা অবোধ্য আদর্শের মাঝখানে কবি অস্বস্তি বোধ করতেন। বোদলেয়ারের পর থেকেই ফরাসী কবিতা চলেছিল এক বিচিত্র আদর্শের জগতে। বিশশতকের প্রথম দুটি দশকে হেনরি বের্গস-র Creative Evolution (১৯০৭) ফরাসী আদর্শবাদকে নতুন ব্যাপ্তি দিয়েছিল এবং ঠিক এই সময়েই সাহিত্যে সাঙ্কেতিকতা একটি নিঃশেষিত শক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছিল। ১৮৮৬ সালে যে সাঙ্কেতিকতা আন্দোলনের উদ্বোধন করেছিলেন জঁ মরিয়াস তাঁর 'লা ফিগারো' তত্ত্বের ঘোষণায়, সেই আন্দোলন দ্রুত তার যুক্তিমূল্য হারাচ্ছিল এই সময়ে, পারনাশিয়ানরা তাদের ভিত্তিভূমি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠছিল। নতুন আদর্শ, নতুন নীতি, নতুন আঙ্গিক এবং নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নবতর এক সাফল্যে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। আধুনিক কবিতা এবং আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে আপোলোনীয়রের আবির্ভাব। দূরদ্রষ্টা কবি একটি নতুন আন্দোলনের সূচনা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং এই আন্দোলনের প্রথম যুগের প্রবর্তকদের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। আপোলোনীয়র এই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা নিলেন; কোনো অহঙ্কারে নয়, গভীর এক সাহিত্যহিতকরী অনুপ্রাণনায়। তিনি তাঁর এই কর্মভারের বিভ্রান্তিকর জটিলতা ও বিপুল বিশালতা উপলব্ধি করেছিলেন। একটি আধুনিক যুগকে নব্য আধুনিকতায় ভূষিত করার কাজে তিনি নেমেছেন। এই নব্য আধুনিকতার সক্রিয়তা কবি প্রথম লক্ষ্য করেছেন চিত্রশিল্পে। ১৯০৭-এ তিনি যখন ব্রাক এর সঙ্গে পিকাসোর পরিচয় করিয়ে দেন, তখনই আধুনিক শিল্পকলা আন্দোলনের সূচনা হয়। আপোলোনীয়র প্রথম কাব্যগ্রন্থ Alcools এবং তাঁর প্রথম শিল্প সমালোচনা গ্রন্থ 'The Cubist Painters'

একই বছরে, ১৯১৩-য় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থটিতে কবি ঘোষণা করেন যে, সমাজে কবি এবং শিল্পীর ভূমিকা এক ও অভিন্ন : The great poets and the great artists have as their social function that of ceaselessly renewing the appearance which nature puts on in man's eye ; শিল্প এবং কবিতার কার্যাবলী এবং ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর এই বিবৃতি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ নয় কেননা শুধুমাত্র একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করা ছাড়াও শিল্প ও কবিতার আরও অনেক কিছু করণীয় আছে। মানবধর্মের সগোত্র ক্রিয়াকলাপ হিসেবেই কবিতা ও শিল্পকে দেখেছিলেন এই কবি। এবং এই নতুন আলোকে শিল্প-কবিতাকে দেখাই ছিল নব্য আন্দোলনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

আপোলোনীয়র প্রকৃত শিল্প-সমালোচক ছিলেন না। অবশ্য কোনো কোন সময়ে তাঁর স্বজ্ঞা দিয়ে এমন কিছু বলেছেন যা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। কিন্তু তিনি কখনই একজন শিক্ষিত চিন্তাবিদ ছিলেন না এবং যদিও বহুব্যাপ্ত ছিল তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পেছিয়ে। শিল্প-সমালোচক হিসেবে তাঁর শুধু ছিল উপলব্ধির গাঢ়তা ও গদ্যের স্বচ্ছতা। কিন্তু শুধুমাত্র উপলব্ধির গাঢ়তা দিয়েই শিল্প-সম্পর্কে তাঁর একটি সুসংহত মতামত গড়ে ওঠে নি। এমনকি তাঁর বন্ধু ব্রাক একবার মন্তব্য করেছিলেন যে 'Apollinaire was a great poet and a man to whom I am deeply attached, but, let's face it, he could not tell the difference between a Raphael and a Rubens. The only value of his book on Cubism is that, far from enlightening people, it succeeds in bamboozling them.' আমরা অবশ্যই ভুলব না যে কিছু কিছু জায়গায়, কীটসের চিঠিতে কিছু মন্তব্যের মতই, আপোলোনীয়রের শিল্প-সমালোচনা আশ্চর্য্য দ্যুতিময়। উদাহরণত, বিমূর্ত শিল্প সম্পর্কে তিনি 'Cubist Painters'-এ লেখেন 'We are progressing towards an intensely new kind of art, which will be to painting what one had hitherto imagined music was to pure literature.'

নব্য আন্দোলনে শিল্প এবং কবিতার বিভিন্ন নীতিগুলির বিশুদ্ধ সারাংশকে একটি তত্ত্বে পরিণত করা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদর্শকে একটি সুতোয় বেঁধে

ফেলা ও পরিশেষে আধুনিক শিল্পের সেই ঐক্যবদ্ধ আকৃতিকে কোনো চিরকালীন সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাকে যুক্তিমূল্যে স্থাপিত করার প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবল আপোলোনীয়রের ছিল না। সমালোচক আপোলোনীয়রের প্রতিভা শিল্পের জন্য একটি মহান্ অনুপ্রাণনার দর্শন নির্মাণের কাজে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর সমকালের আধুনিক শিল্পীদের সুযোগ্য সংগঠক হিসেবে যিনি কখনই তাঁদের ভালোবাসা দিয়ে প্রেরণা জোগাতে ভোলেন নি।

আপোলোনীয়র মূলত কিন্তু বেঁচে আছেন কবি হিসেবে। শুধু তেমন একজন কবি হিসেবে নন যিনি এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ফ্রান্সের অন্যতম প্রভাবশালী কবি ছিলেন, তিনি এখন সকলের শ্রদ্ধেয় ক্লাসিকে রূপান্তরিত। ফরাসী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখন তাঁর কবিতা মুখস্থ করে, অধ্যাপকেরা তাঁর উপর বক্তৃতা করেন সরবোন-এ। কবি হিসেবে তাঁর গায়ে কোনো তত্ত্বের তক্‌মা আঁটা নেই। তাঁর কোনো কবিতাতেই এমন কোনো পঙক্তি নেই যাতে আধুনিকতার সচেতন আঙ্গিক আছে এমন কোন বিষয় নেই যা সমকালীন ফ্যাশানের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি আমাদের উপহার দেন কবিসত্তার বিশুদ্ধ গীতিময়তা, খুব সরল শব্দ নির্বাচনে। সহধর্মিতা ও স্বাভাবিকতা তাঁর কবিতার রচনাশৈলীর দুটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভেলেঁন-এর পর কোনো ফরাসী কবি? আপোলোনীয়রের মত কবিতায় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আনতে পারেন নি। আমরা যারা মনে করি যে কবিতায় যতিচিহ্ন ব্যবহার না-করা তাঁর আত্মাভিমানী আধুনিক অস্তিত্বের ফলস্বরূপ, ভুলে যাই যে, আপোলোনীয়রের কবিতা মূলত সঙ্গীত এবং এর যতিচিহ্ন নির্ধারিত হবে সাংগীতিক ছন্দের মাধ্যমে। তাঁর যতিচিহ্নহীন কবিতার স্বপক্ষে কবি এক চিঠিতে লেখেন:

"As regards the punctuation, I cut it out merely because it seemed to me unnecessary, which it is, in fact, as the very rhythm and division of the lines are real punctuation and nothing else indeed."

কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আপোলোনীয়রের কবিতায় পূর্বসূরিদের হুবহু প্রতিধ্বনি পাই। জর্জ দুহামেল Alcools কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে বিস্ময়করভাবে আগ্রাসী সমালোচনা করেছেন ও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে তাঁর

বহু কবিতাই 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড', কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁর বিরুদ্ধে এই 'কুম্ভীলক'-এর অভিযোগ কবি খণ্ডন করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদের ভাষায় তাঁর রচনাশৈলীর একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়: "I do not think I have been imitative, since each of my poems commemorates an event in my life usually of a sad nature, but I have also had joys of which I have sung."

এই সাহিত্যের ইতিহাসের একটি মজার ঘটনা যে আধুনিকতার প্রবর্তক আপোলোনীয়র, যিনি সৃষ্টিশীল জীবনে দুঃসাহসিক কার্যকলাপে এবং সমকালীন সাহিত্যে-দর্শনের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন, তাঁর চরম উৎকর্ষ লাভ করেন কবি হিসেবে তখনই যখন তিনি তাঁর আধুনিকতার রাজত্ব থেকে সানন্দে ছুটি নিয়ে চলে যান ঐতিহ্যের কাছাকাছি, বিষয়বস্তুতে ও রচনাশৈলীতে। এবং আজ তাঁর জন্মের একশ' বছর পরে আমরা যখন এই কবির সৃষ্টিকর্মের দিকে তাকাই তখন কবির নিজের ভাষাতেই তাঁর বিচার করতে ইচ্ছা যায়। Calligrammes (1918) কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'La Jolie Rousse' কবিতায় আপোলোনীয়র বলেছিলেন:

'You whose mouth is made in the image of God's / Mouth which is order itself / Be lenient when you compare us / To those who were the perfection of order / We who seek adventure everywhere / Have pity on our mistakes have pity on our sins.'

টীকা ও অনুবাদ:

অনুপ মতিলাল

অমিতাভ গুপ্ত

তিনটি কবিতা

সরস্বতী

কিছু আমার ভাঙাচোরা, কিছু আমার অবহেলায় ফেলা
কিছু আমার ছড়িয়ে আছে দীর্ঘশ্বাসের স্তূপে
তারই উপর একটি ছোটো, বিশ্বজোড়া হাত রেখেছে সে

অন্যহাতে রয়েছে তার বীণা।

আয়োজন

ফাঁদ পেতে বসেছে শিকারী, তার গুঁড়ি মেরে বসার ভঙ্গীটি
দেখে বোঝা যায় না কে বধ্য, কে-ই বা হন্তারক
কাদার উপর মুড়ে বসেছে তার হাঁটু—থাবায় ভর দিয়ে
শরীরের উপরার্ধ
এবং ফাঁদের অন্যদিকে গর গর শব্দে ল্যাজ আছড়াচ্ছে শ্বাপদ
বাতাসে ভেসে আসছে নরমাংসের সুঘ্রাণ
কিন্তু ক্রমশঃই সে টের পাচ্ছে উভয়ের মধ্যে আছে এমনকিছু
যা অনতিক্রমনীয়।

অনুসন্ধিৎসা

তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লে ক্ষোভ আর অস্থিরতা বেড়ে ওঠে বাতাসে বাতাসে
তিনি শুধু অনাড়ষ্ট, ক্ষিপ্র, অনাহত
উলঙ্গ শিশুর সামনে দাঁড়িয়ে যেমন
স্নেহ ও কৌতুকভরা হাসি
ফুটে ওঠে মুখে

অথব প্রশ্নের কোনো শেষ নেই: একটি ও তারপর আরো একাধিক
যোজনবিস্তৃত
বিধুর মাঠের মতো হা হা স্বরে জেগে ওঠে, 'কেন ? কেন তবু ?'

ব্রততী বিশ্বাস

আলো-আঁধারি খেলা

আলোর সঙ্গে আপোষ ছিল না যখন
ভীষণ অন্ধকারও ভরাডুবি
জ্যোৎস্নার মতো সুখ তখন ভুতুড়ে ছবি
যে শিশিরে সিক্ত আঁধার গাঢ় জমে থাকে
তার ছোঁওয়া আমার ঠোঁটে বিঁধে যায় অকস্মাৎ
প্রাচীন মহিমার মতো আলো
ঘেরাটোপ পরে সতর্ক সাবধানী
তার বোরখার তর্জনী
নিরাপদ দূরত্বে আমাকে শাসায়
এই আলো-আঁধারি খেলা
আমার জন্ম-সহোদর

যেদিন তুলেছি পদ্মবীজ হাতের মুদ্রায়
আলোর ভ্রূকুটি মার্জনা করে নি
প্রথম শিখেছি যাদুকরের তুমুল চাতুরী
আঁধারের করোটি প্রকাশ্যে হেসেছে
বিপন্ন পর্যটন সেরে
জমির সীমানা নাগালের বহির্ভূত পড়ে থাকে

শুধু আর একবার জন্ম নেবো বলে
অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ে নি।

মোহিত চক্রবর্তী

যাওয়া

যেমন ইচ্ছে তেমনই যাবো
বললেই তো যাওয়া হয় না
উঠোন জুড়ে হাজারো বাধা
অন্তরঙ্গ ছুটির মেলা
এবং মুখের আত্মীয় আর
অনাত্মীয় সব একাকার
এসব ছেড়েও কয়েকটি গান কয়েকটি শিস
দোয়েল কিংবা চন্দনাটন্দনা
যেমন ইচ্ছে তেমনই যাবো
বললেই তো যাওয়া হয় না
কথায় বলে অন্তরঙ্গ
ভালোবাসাই ঘাতক সাজে
স্মৃতির নদী দুকূল ভাসবে
কাঁদায় এবং নিজেও কাঁদে
দুয়ার জুড়ে ক্রন্দসী মেঘ
দুয়ার জুড়ে সকল বাঁধন
আলগা হতে হতেও কেমন
শক্ত জমাট বরফি কাটা
জাফ্‌রী সাঁটা কোন জানলায়
হৃদয় তোমার নাচায় দ্যাখো
উড়াল দেবে অচিন পাখি
যেমন ইচ্ছে তেমনই যাবো
বললেই তো যাওয়া হয় না

অনুরাধা মহাপাত্র

কথা রাখুক

বাসকপাতা অঙ্গে ধরবো, মেঘ, ডাকবো তোমায়, লগ্ন আসুক
শালুকফুলে ফুলের ভরণ, হয়ে উঠুক নতুন বর্ষা, থরে থরে গহীগড়ন
কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পাতবো, হলুদ দেবো, পিঁড়ি জুড়ে নতুন জলের ঘট
লক্ষ্মীমোহর, সিঁদুরেসাপ বুকেই নিয়ে রাখো, বাসা দেবো, তোমার ঘরে থাকো
আজ তোমাকেই ভালোবাসবো, খড়ের ছাউনি, বর্ষা-ভেজা থৈ থৈ জল শালুকফুলে
মাছির মত মেধাবীরাত তফাতে থাক্।
তার জন্য চলায় পা, নষ্ট কপাল, শরীরভরা মাছরাঙা রঙ, ধ্বংস গাঙ জল
ট্রেণের শব্দ, বইয়ের গন্ধ, দেশলাই ও আয়না থেকে সে একবার সরে আসুক
শালুকফুলে, ফুলের ভরণ নিমন্ত্রণের লগ্নভরা চোখের পাতায়
সেই মেয়েটির ভাসার কথা ভালোবাসা বুকের বোঁটায় আমার কথা রাখুক।

হিমাংশু বাগচী

নিজস্ব বৃত্তের পথে

অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে আমার জীবন
বাগানের ফুলের কুঁড়িরাও ঝরে যাচ্ছে
আহত চাঁদ যন্ত্রণাদগ্ধ হচ্ছে আকাশের বুকে
তোমার কাছে গোপন আছে সুধা
তুমি আশ্চর্যভঙ্গিমায় মুছিয়ে দাও সমস্ত দুঃখ
এতকাল অসীম সাহসে অরণ্যে হাঁটতাম একাকী
পশুপাখির দল স্বেচ্ছাধীন নিজের পরিমণ্ডলে
ব্যাধরমণীর স্তন থেকে মাতৃরস গড়িয়ে পড়ছিল মাটিতে
তার সন্তান ছিন্ন হয়ে গেছে স্বর্গের ওপারে

আমি তার দুঃখে বঞ্চিত হই
বেদনার ভাষা অন্তরে আগুন জ্বালায়
অনির্বাণ সেই শিখা
এখন লক্ষ্য করি :   আহত চাঁদ, ফুল, জীবন
সব কিছুই কেমন যেন ম্রিয়মান
অসহায় আমি নিজস্ব বৃন্তে ঘুরপাক খাই

শিশির গুহ

শুধু তুমি

তখন মোহর ছিল আয়ত্তে তোমার
কাজল মেঘের তাল, রূপের সমুদ্র
সব ছিল হাতের মুঠোয়।

রুমাল পাঠিয়েছিল হাস্নুহেনা দিয়ে
পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছি—
সাম্রাজ্যে লোভ নেই, কখনো ছিল না।

এখন বুকের মধ্যে বাঁশী
ফুল ফোটায় গান শোনায়
ছবি আঁকে স্বপ্নের তুলিতে
সে কেবল তোমারই প্রতিচ্ছবি।

নিশয় চাঁদের জ্যোৎস্নায়
তোমাকেই ভাবতে পারি সমস্ত জীবন॥

কমলেন্দু দাক্ষিত

অন্য অধিকার

খাবার টেবিলে বসে একদিন শিশু কন্যার পাশে
বিষম লাগলো। গিন্নীর মতে, জননী হয়তো স্নেহে
দেশের বাড়িতে সেই মুহূর্তে নাম করে ফেলেছেন।

সবকিছু শুনে গম্ভীর মুখে ওইটুকু কচি মেয়ে
শুধু বলেছিল : বর্ষার দিনে যদি না গেঞ্জি পরো
দেখবে তাহ'লে অনেকে অমন করবে তোমার নাম।
শুনে হতবাক ঈর্ষাকাতর মেয়েটার টিপ্পনি,
বাপের ওপর অন্য কারুর মানাবে না অধিকার,

ভেবে দেখলাম, মিথ্যে বলে নি, যতো ছোট হোক না সে
হৃদয়কে নিয়ে বৈজ্ঞানিকের কারবার চলে না তো।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

কোথায় লুকোবি তুই

কার্তুজ এখনো আছে—বুক পকেটে আগুনের ফুল
যৌবনে উত্তাপ জমছে, সর্বাঙ্গে অমিত বিক্রম
প্রখর পৌরুষ ক্ষিপ্ত—ট্রিগারেতে রেখেছে আঙুল
কোথায় লুকোবি তুই ? এইবার নিশ্চিত অধম।

রক্তপাতে সূর্যোদয়—উঁকি দিচ্ছে সোনালী সকাল
মানচিত্রে হাসে ভাখ মার-খাওয়া মানুষের মুখ।

সিংহাসন পাল্টে যায়—শিস্ দেয় কালের রাখাল
হাতের বাঁশরী তার বাঁশী নয়—জলন্ত চাবুক।

কোথায় লুকোবি তুই ? চতুর্দ্দিকে ফাটছে গ্রেনেড—
সদর দরোজা থেকে উঠে যাবে তোর নেমপ্লেট।

চিত্রিতা চট্টোপাধ্যায়

নীল ওড়না উড়ে যায়

নীল ওড়না উড়ে যায় কুয়াশায় ভিজে কার মুখ ?
শিশিরে ধুয়েছে দেহ—জ্যোৎস্নায় ওড়ে তার চুল
চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে দাঁড়িয়েছে রূপের প্রতিমা
নিহিত মৃত্যুর ঘ্রাণ হিম ঠোঁটে,—তবু রূপ, অফুরন্ত রূপ

অসীম প্রান্তরে ঝরে…ঝরে যায় নিখিল ভুবনে।

দেবাশিস প্রধান

ঋণ

কয়েক বছর পর সেই পিতামহদের ঘরে
ঝন্‌ঝন্ কড়া নাড়লো :
চক্রান্তের গভীর খপ্পরে মুখড়ে আছে লাঞ্ছিত কাহিনী,

প্রত্যয়ী যুবার দল হো হো করে হাসে,
নষ্ট গুল্মের মতো বৈপরীত্যো পড়ে থাকে পথের দু'পাশে।

সমস্ত জীবন ধ'রে হার মানে একক সৌহার্দ্য
গোপন অসুখ আর দগ্‌দগে ঘা

জালায় জিহ্বায় পুঞ্জিত মেঘেদের মতো
সোঁ সোঁ দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে দেয় অবাধ্য কুন্তল
ঝরায় হিমানী সংকেতে…

কাল রাতে যুবাদের দল গভীর হয়েছে প্রেমে
নিথর জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে
চিত্রার্পিত যেন
ইতিহাস কেটেছে পোকায়।

ক্রমাগত ভোর হয় ঘুম ভাঙে
প্রত্যয়ী অর্জুন যুবা
জীবনযৌবন ঘর গেরস্থালী নিয়ে পড়ে থাকে
ব্যাগ্র শুধু দাউ দাউ কবিতার কাছে
তাহাদের ঋণ।

দীপঙ্কর সেন

কেউ কেউ, আমি নয়

কেউ কেউ ভালোবাসা বাসে
আমি বাসি না,
আমার ভালোবাসা বাষ্পের মতো নিরাকার।

কেউ কেউ হাওয়া থেকে রস টানে
আমি টানি না,
তেমন মধুস্রাবী হাওয়া আমি পাই নি।

কেউ কেউ অমরত্ব দাবী করে
আমি করি না,
তাদের মতো আত্মহীন হতে পারি নি।

সন্ধ্যা ভৌমিক

তুমি আসবে কথা ছিল

বিশ্বাস করো সুদীপ্ত
তবুও আমি কাঁদতে পারি নি
অসহায় বৃক্ষের মত ঠায় দাঁড়িয়ে
ভিজতে চাই নি সারা রাত
বিশ্বাস করো
তোমার প্রতীক্ষায় সময় গুণে গুণে
রাত পোহাল
অথচ, তিক্তমুখে অভিশাপ দিতে পারি নি
উজ্জ্বল সূর্যটাকে
রাত্রির অন্ধকারকে আরো কিছু সময় ধরে রাখতে পারি নি
নিলর্জ্জের মত,

তুমি আসবে ভেবে।

ইন্দোনেশিয়ার পান্তুন বা ছড়া

'পান্তুন'কে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে 'ছড়া'ই বলতে হবে; কিন্তু এ ছড়ার জাত ছেলেভুলোনো-ছড়ার থেকে ভিন্ন। 'পান্তুন'কে বলা যায় লোককবিতা।

পান্তুনে সাধারণত চারটি চরণ, প্রতি চরণে চারটি পদ। একটি সুপ্রচলিত ইন্দোনেশীয় পান্তুন :

ডারি মানা দাতাং লিন্তা?
ডারি সাওয়া তুরুণ ককালী।
ডারি মানা দাতাং চিন্তা?
ডারি মাতা তুরুণ কহাতি।

[বাংলা : কোথার থিকা আইলোরে কেয়ো?
খ্যাতের থিকা নামছে খালে।
কোথার থিকা আইলো পীরিত?
চক্ষু হইতে কইলজাতে চলে।]

পংক্তি বা 'চরণ' এবং 'পদ' বিষয়ের উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ছয় কিম্বা আট পংক্তির পান্তুনও আছে এবং প্রতি পংক্তিতে পাঁচটি অথবা তিনটি পদ থাকাও সম্ভব।

পান্তুনের জন্ম মালয় দেশে। বাংলাদেশে যেমন কবির লড়াইয়ের প্রচলন ছিলো, মালয়েও তাই। ধরুন একজন বললো, 'আঁধার কোণে পিপড়ের বাস'। চট করে উত্তর দিতে হবে 'লেপ মুড়ে তুই নাক ডাকাস।' লড়াইয়ে যে হারলো তাকে ঠাট্টা সইতে হয়।

হ্রদে ডুবে এলো আমার পুত্তুর রাজার বেটা যে,
তোর ছেলেটা ব্যাঙের ছানা গর্তে ডুবেছে।
সোনার থালে নাইছে সে মোর পুত্তের সকল সাধ মেটে,
সিঁড়ির তলায় নাইছে যে তোর ছেলে বনের ছাগ বটে।
তাড়াতাড়ি চান সেরে রাজা হবে মোর পুত
বাটির ভিতর চানটি সারে ছেলে তোর কিম্ভূত।'

ইত্যাদি।

এইসব ছড়া মুখে মুখে ছড়ায়, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে।

ইন্দোনেশিয়ায় পান্তুনের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল পশ্চিম সুমাত্রায়। আজও জাভা বালিদ্বীপের তুলনায় সুমাত্রায় এর চল বেশি। বাড়িতে বিয়ে শাদী থাকলে তার জন্যে ছড়া কাটা হয়। সুমাত্রায় প্রচলিত একটি বিয়ের ছড়া :

'বিয়ে নয় চোখের টানে
বিয়ে হয় মনে প্রাণে।'

বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষে কবির লড়াই হয়।

কবির লড়াই : ১.

বরপক্ষ :
কাঠের থালায় জন্মে হলুদ
নাড়িতে নাড়ি জোগায় মদত
আমরা বসি, আমরা বলি,
সোহাগ বসায় দিলাম শুবাক

কন্যাপক্ষ :
কাঠের থালে বসছে যারা
নাড়ির টানে টানছে তারা।
আমরা বসি, আমরা বলি
জবাবটা দিই কী বাকছলি?
থালা নিয়ে হেলিক বেলিক
লাংসাৎ ফসের বাঁধছি ছাঁদা
লুকিয়ে দাঁতে সুপুরি কাটি
নইলে সোহাগ কেমন খাটি

২.

বিয়ের ছড়ার চেয়েও বেশি যার প্রচলন তা হলো হাসির এবং উপদেশমূলক ছড়া। এইবার তার কয়েকটি অনুবাদ করে দিচ্ছি। প্রথমটি সুমাত্রার।

ওদের দোকানে কাগজ বেচে
তাইতে আমরা চিরুণি
কুমীর দাদা চড়েন ডাঙায়
ছাগল দেখে জলে ঝাঁপায়

৩. পাসার মালায়ু ছড়া

ক. পারস্তে গেছি, সিয়াম দেখেছি
কিন্তু মেক্কা? সেটাই হয় নি।
সোহাগ করেছি, চুমুও চেখেছি,
কিন্তুক শাদী? সেটাই হয়-নি।

খ. গুরুমশাই লেখেন স্লেটে
একসপ্রেস চিঠি সেলয়াং[১] ছোটে।
সাত স্বর্গের খবর শরীরে
ভালবাসা বলে তাকেই তাকেই।

গ. বানের ওপরে ডেকে এনো বান
আগের বৃষ্টি আজও ধরলো না।
কল্‌জেতে দ্বেষ হচ্ছে গভীর
কবেকার খেদ আজও কমলো না।

১. বাহামা ইন্দোনেশিয়া থেকে

পরিবেশন ও অনুবাদ : কৃষ্ণা

শিল্পী গোপাল ঘোষ

উনিশশো আশির সুরু থেকেই আমরা বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিদের হারিয়েছি। এদের মধ্যে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, গায়ক, অভিনেতা প্রভৃতি রয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতিত্বে দেশের মুখ উজ্জল করেছেন। প্রয়াত চিত্রশিল্পী গোপাল ঘোষ এঁদের মধ্যে অন্যতম। গত চার দশক ধরে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছেন। তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে বিশেষ করে জল-রং এর প্রাকৃতিক চিত্র এবং রেখাচিত্রগুলি কলারসিকদের মুগ্ধ করেছিল। জন্ম ১৯১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর, কলকাতায়। পৈত্রিক বাসস্থান, পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রামে। শিল্পীর বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন জয়পুরে কেটেছে। জয়পুরের মহারাজা স্কুল অফ আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফটস্ থেকে শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং ডিপ্লোমা পান। পরে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। জয়পুর আর্ট স্কুলে ছাত্রাবস্থায় তিনি সাইকেলে চড়ে সারা ভারত ঘুরে দেখার এবং ছবি আঁকার পরিকল্পনা নেন। তাঁর এই পরিকল্পনার সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন: শিল্পীর চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখার দৃষ্টান্ত তুমি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছ। আমার ধারণা ভারতবর্ষের মানুষ একদিন তোমার চোখ দিয়ে ভারতের ঐশ্বর্যের ছবি দেখতে পাবে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর তখনকার আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন: তোমার ড্রইং অসামান্য।

১৯৪৭ সালে দিল্লীতে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী হয়। ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু। ঐ বছরেই তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জহরলাল নেহেরু ও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনেও কয়েকবার পুলিশের নির্যাতন ভোগ করেছেন তিনি।

উনিশশো চল্লিশ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিএন্টাল আর্ট থেকে পাঠ শেষ করে বেশ কয়েক বছর আমি কর্পোরেশন স্ট্রীট হিন্দুস্থান বিল্ডিং এর চার তলার একটি মেসে থেতাম। সেখানে খ্যাতনামা ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও কালীপদ

ঘোষাল মহাশয় থাকতেন। আমি নিয়মিত তাদের কাছে ছবি আঁকা শিখতাম। তখন ইণ্ডিয়ান আর্ট সোসাইটীর কাজকর্ম প্রায় বন্ধ বললেই চলে। বেশ কয়েক বছর পরে ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কয়েকটি ছাত্র নিয়ে আর্ট সোসাইটী পুনরায় কাজ শুরু করে। তখন শ্রীনীহাররঞ্জন রায় উক্ত সোসাইটীর সেক্রেটারী। সেই সময় গোপাল ঘোষ মহাশয় শিক্ষকতা করতে আসেন। আমি কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছি এবং আলাপ করেছি। দেখতাম নিরলসভাবে ছবি এঁকে যাচ্ছেন। কত বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি জীবনে অফুরন্ত স্কেচ করেছেন যা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

উনিশশো বিয়াল্লিশে ক্যালকাটা গ্রুপে বিশেষ সদস্য হিসাবে যোগদানের পর থেকেই শিল্প জগতে একটা আলোড়ন আসে। তখন ১নং চৌরঙ্গী টেরাসে জে. এন. মজুমদারের বাড়িতে ক্যালকাটা গ্রুপের বেশির ভাগ প্রদর্শনীয় হতো। যতটুকু মনে আছে ক্যালকাটা গ্রুপই প্রথম ঐ বাড়িটি প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহার করেন। পরে বহু চিত্র-প্রদর্শনী এই বাড়িতে হয়েছে। উক্ত গ্রুপের অন্যতম সদস্য শিল্পী পরিতোষ সেন মহাশয় বলেছেন: গোপাল ঘোষ প্রাকৃতিক দৃশ্যে আনলেন এক নতুন ডাইমেনশন—সেটা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। ভারতীয় শিল্পে, পাশ্চাত্য কিম্বা চীনা জাপানী শিল্পের মত ল্যাণ্ডস্কেপের ট্র্যাডিশন ছিল না। গোপাল ঘোষই সর্বপ্রথম এক ধরণের নিসর্গ চিত্র আঁকলেন যার ট্রিটমেণ্ট সম্পূর্ণ ফ্লাট অথচ বর্ণে উজ্জ্বল। আলোছায়ার খেলা না দেখিয়ে পুরোপুরি টু-ডাইমেনশনাল ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছে বহুবার। প্রতিবারই তিনি শিল্প-রসিকদের বিস্মিত করেছেন রঙের স্নিগ্ধতা এবং সরল অথচ বলিষ্ঠ রেখার টানে। এই রূপদক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবি সংগ্রহ করে কোন মিউজিয়ামে স্থায়ীভাবে রাখতে পারলে ভাবিকালের শিল্পীদের যথেষ্ট প্রেরণা দেবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ-বিষয়ে সচেষ্ট হবার জন্য অনুরোধ জানাই।

শিল্পী গোপাল ঘোষ ৩০শে জুলাই ১৯৮০, বুধবার কলকাতা শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নির্মল দে

কয়েকটি প্রাচীন এবং নবীন কাব্যগ্রন্থ

১. বাসু ঘোষের পদাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

২. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : ১ম খণ্ড। গ্রন্থবিতান। ৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। কলকাতা-২৬

৩. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে। প্রমা, ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা ১৭

4. Henry Louis Vivian Derozio : Poems. Oxford University Press, P17, Mission Row Extn. Calcutta 13.

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন এমন বৈষ্ণব কবি এবং চৈতন্য-জীবনীর পদকর্তা বোধহয় বাসু ঘোষ ছাড়া খুব বেশী নেই। সেকারণে, চৈতন্যজীবনী রচয়িতৃ-কবিদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষের স্থান অত্যন্ত বিশিষ্ট। তিনি শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষই করেন নি, বরং দিবসরজনী এই মহান পুরুষটির সঙ্গী ছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় দেড়হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের মত প্রবাদ-পুরুষ আর জন্মেছেন কি না সন্দেহ, যিনি একটা গোটা জাতিকে, দেশকে, তার ধর্ম, সমাজচিন্তা এবং আচার আচরণকে আমূল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

বাসু ঘোষের পদাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রখ্যাত গবেষক এবং বৈষ্ণব-পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার। তাঁর অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করেছেন তাঁর কন্যা মালবিকা চাকী। এই সংকলনে ২১২টি পদসংখ্যা রয়েছে। সম্পাদিকা জানাচ্ছেন, ২০৪ সংখ্যক পদ অবধি অবশ্যই বাসু ঘোষের। কিন্তু বাকী আটটি পদ বাসু ঘোষের কিনা সন্দেহের বিষয়। পদগুলি বেশীর ভাগই রাগরাগিণীতে নিবদ্ধ। মল্লার, সুহা, শ্রীগান্ধার, বরাড়ী, পটমঞ্জরী (পঠমঞ্জরী), বিভাস, ভাটিয়ার, কেদার, ভূপাল (ভূপালি), পাহিরা (পাহাড়ী?) টুরী (টোড়ী?) প্রভৃতি রাগ এককালে বাংলার নিজস্ব সম্পদ ছিল, সংগীতবিষয়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কাল ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৪, যাঁর শেষার্ধ কেটেছে নীলাচলে। বাসু ঘোষ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবসানের পরও ২৭-২৮ বছর কর্মক্ষম ছিলেন এবং তাঁর পদে নরহরি সরকারের মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে। বাসু ঘোষের পিতা বল্লভ ঘোষ (মতান্তরে গোপাল ঘোষ) চাটিগাঁ থেকে এসে এ বঙ্গে বসবাস করেন, যার জন্মস্থান ছিল শ্রীহট্ট। বাসু ঘোষের অগ্রজ দু'ভাইও পদকর্তা ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের অন্তরঙ্গ আলেখ্য পাওয়া যায় কবির পদগুলিতে, বিশেষত, যে-'গৌরনাগর' ভাবের কবিতা উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন, তার অন্তরালে রাধাকৃষ্ণের লীলা স্পষ্টত অনুভব করা যায়। বাসু ঘোষই সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি নির্দিষ্টরূপে বর্ণনা করেন:

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, নক্ষত্র ফাল্গুনী

বাসু ঘোষের পদগুলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা ও বাল্যলীলা, নিমাই-এর ভাব-প্রকাশ, শ্রীগৌরাঙ্গের রাগ-বর্ণনা, গৌর-নাগরী ভাব, সন্ন্যাস লীলা, নীলাচললীলা এবং শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ক পদগুলি এক নিবিষ্ট আন্তরিকতায় আমাদের অন্য এক জগতের সন্ধান দেয়। ভনিতায় বাসু, বাসু ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি পাওয়া যায়। বাসু ঘোষের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রখ্যাত গ্রন্থগুলিতে। স্পষ্টতই এ থেকে আমরা মনে করতে পারি, বাংলা সাহিত্যে এই কবির স্থান কোথায় নির্দিষ্ট রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাসু ঘোষ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবেরও অত্যন্ত প্রিয় কবি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ত্রিশ দশকের পরবর্তী সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। আমার কাছে এই অর্থে বিশিষ্ট যে, তিনি কোন বিশেষ ভঙ্গি বা বিশেষ দলীয় রাজনীতি আশ্রয় করে কবিতা লেখেন নি, যদিও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন অনেক সময়। তার অর্থ এই নয় যে তিনি কবিতা থেকে রাজনীতি বর্জন করেছেন। মোটেই না। কিন্তু যে-রাজনীতির তিনি সমর্থক, তাকেও তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করতে দ্বিধা করেন না। এ সততা এযুগে বিরল। তিনি কারো মুখ চেয়ে কবিতা লেখেন না—যখন কিছু বিপ্লবী কবিও

নানা আকর্ষণে নিজের অন্তরের ধ্বনিকে একপাশে সরিয়ে রেখেই কবিতা-চর্চা করতে দ্বিধা করেন না! মাথা মুহূর্তে তাঁরা নোয়াতে পারেন, বীরেন্দ্র চাটুজ্যে পারেন না। তিনি মাথা উঁচু রাখতে জানেন, যখন দেখি প্রভূত এবং সরকারী বেসরকারী সম্মান পেয়েও কোন কোন কবির কাছে আদর্শ নামক বস্তুটি কত ভঙ্গুর। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একারণে আমার কাছের কবি।

কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্যসংগ্রহ প্রকাশের একটা অসুবিধে আছে। তিনি যখন ভালো লেখেন, তখন তা উত্তুঙ্গ শীর্ষে পৌছোয়। আবার সাময়িক তাগাদায় বহু কবিতা তাঁকে লিখতে হয়—যা না লিখলে হয়তো কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেতো। সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে কবির, একথা মনে করেই তিনি অনেক সময় ইস্তাহার-জাতীয় পদ্য লেখেন। তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র কবিতা সংগ্রহ একটু 'রিস্কি'। প্রচণ্ড রোমান্টিক কবিতা রচনা থেকে ক্রমশ এক কবি কি করে সমাজসংসারকে নিজের বাসভূমি মনে করে' এক গভীর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন তারই মুখবন্ধ এই প্রথম খণ্ডের কবিতাবলী। এই গ্রন্থের বহু কবিতাই কবিতা-রসিকের পড়া। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুকান্তের মত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি, নানা কারণেই সেধরণের জনপ্রিয়তার প্রশ্ন আসে না; কিন্তু তিনি যে-জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে অর্জন করছেন তার ডালপালা বহুদূর প্রসারিত মনে হয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার অনুজ কবি, একমাত্র যাঁর প্রভাব, আমি অসংকোচে স্বীকার করি, আমার কোন কোন কবিতায় প্রত্যক্ষ করেছি। বড় কবির সম্ভাবনা রয়েছে অলোকরঞ্জনের মধ্যে। তিনি ভারতীয় ধ্যান এর সন্নিকটবর্তী হয়েছেন। এই ছোট্ট কবিতাটি পড়া যাক নিমগ্ন হয়ে:

বাছুরের খুরে যতটুকু ধুলো ওঠে
তার বেশি নয়। উৎসর্গের আগে
মহিষের কলামাত্রিক দু' শিঙের
মধ্যবৃত্তে যেটুকু চন্দ্র ধরে
তার বেশি আমি কাজে না লাগিয়ে দেখি
আনন্দ বলে কাকে।

কবিতাটির নাম 'আনন্দ'। এই ধারণা একান্তই ভারতীয়—অথচ এতে, এই বাক্‌ভঙ্গিতে, একটা বহমান আধুনিকতার সুর স্পষ্ট। অর্থাৎ কবি একালের, অথচ চিরকালের সংবেদনা তাঁর মানসমুকুরে প্রতিবিম্বিত। দ্বিতীয় কবিতাতেও সেই আনন্দের আভাস :

আমার সর্বনাশে
তখন অপার আনন্দ এক : বন্ধু-অবন্ধুরা
সেই জোনাকির বাতিঘর ঘিরে আমার সঙ্গে ভাসে।

'মুক্তিসুখ' কবিতাটিতে ছড়ার এক আমেজ আছে, একটা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার আছে, কিন্তু তা গভীরে নিয়ে যায়। 'মায়াবী জল্লাদ' কবিতায় 'পেলব' শব্দটি আমার ভালো লাগে নি। শব্দের অর্থ নরম হতে দোষ নেই, কিন্তু শব্দটি যেন নরম না হয়, এই আমার বাসনা। রোমান্টিক কবির এহেন আর্তি লক্ষ্যণীয় :

রাজপথে তুমি অক্ষরে অক্ষরে
রাত দশটায় শেফালি ঝরিয়ে পুলকে জর্জরিত
সবুজ এনেছো, দুঃখকে তুমি কেন ছাখো সুনজরে ?

অন্য ধাঁচের কবিতা পড়ছি, যেখানে শান্তিনিকেতনে এই কবির কৈশোর যৌবন কেটেছে, সেখানে তিনি একান্ত সহজ :

নিভল যেই প্রদীপ
খোয়াই থেকে উঠে এল
লালমাথা টিট্টিভ।

এই কবির কবিতায় নানাস্থানে রবীন্দ্রনাথ আছেন, আছে এই গ্রামবাংলার বাউল, আছে এক উদাসী দার্শনিক, আর রয়েছে এক আন্তরিক কবি, প্রকৃত অর্থেই কবি। হয়তো তাঁর বিদেশ-বাস তাঁকে আরো অন্তর্মুখী করে তুলবে মনে হয়।

যত দিন যাচ্ছে, আধুনিক বাঙালীর ইতিহাস-রচনায় ততই ডিরোজিও-র অবদানের কথা সবাই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করছেন। মাত্র বাইশ

বছরের স্বল্পায়ু জীবনে অনড় অচল স্থাণুর মত একটি সমাজকে যে-প্রবল ধাক্কা তিনি দিতে পেরেছিলেন আমাদের কাছে তা এক আশ্চর্য ঘটনা বলে মনে হয়, আজও। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ডিরোজিও বিষয়ে দুটি উক্তি করেছেন যা তাঁর জীবন-আলেখ্য-কে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে : ১. **Derozio is modern India's first patriot** ২. **Derozio, the first to contemplate an intellectual renaissance for an ancient civilization** এবং ডিরোজিও-র এই চেতনার পেছনে কাজ করেছে তাঁর একটি নিশ্চিত দার্শনিক প্রত্যয়। এই প্রত্যয়টি হচ্ছে 'doubt as a gateway to faith'; মধ্যযুগে রেনে দেকার্তে য়ুরোপীয় দর্শনচিন্তায় যে বিপ্লব আনতে সাহায্য করেছিলেন এই প্রত্যয় দ্বারা, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ডিরোজিও সেই কাজ করলেন কলকাতার বুকে বসে, বাঙালী এবং ভারতীয় সমাজের জন্য।

এই বাইশ বছরের স্বল্প-পরিসর জীবনে তরুণ যুবকটি ব্যবসাসূত্রে ভাগলপুরে নিসর্গশোভা নিরীক্ষণ করেছেন গঙ্গার ধারে ধারে, সাংবাদিকতা করেছেন নিপুণভাবে—যখন সাংবাদিকতা বিষয়টিকে মানুষ একটি জীবন-আদর্শের প্রতিরূপ মনে করতো—, হিন্দু কলেজে পড়িয়েছেন, অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন নানা পত্র-পত্রিকায়, নবীন ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বাধীন চিন্তায় এবং আরো কিছু করেছেন। কবিতা লিখেছেন তারই ফাঁকে ফাঁকে। বেঁচে থাকলে তিনি বড় চিন্তাবিদ্ হতেন না বড় কবি হতেন তা আমাদের গবেষণার বিষয়। কারণ পনেরো বছর বয়সে তিনি যে কবিতা লিখতে শুরু করেন তা ঝোঁকের মাথায় নয়, নিতান্ত সখেরও তা নয়। এবং তারপর ছ' সাত বছর ধরে তিনি নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও কবিতা লেখা থেকে নিবৃত্ত হন নি। বহু কবিতা তিনি উপহার দিয়েছেন যা কবিতা হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কবিতাবলীর নতুন সংস্করণ হাতে পেয়ে যে-কোন কাব্যরসিক খুশি হবেন। প্রকাশক জানাচ্ছেন, এই সংস্করণে মাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাগুলিই সংকলিত হয়েছে। এবং তার সংখ্যা কিন্তু কম নয়—যা দুশো পৃষ্ঠার পরিধি ছাড়িয়ে গিয়েছে মুদ্রণের ফলে। ডিরোজিওর প্রায় পূর্ণাঙ্গ জীবনী আমরা পাচ্ছি ব্রাডলে-বার্ট এর ভূমিকায়। এই ভূমিকাটি বহু পরিশ্রমে রচিত, পরবর্তী অনেক গবেষকের কাছে আকর গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করে, হিন্দু কলেজ থেকে

ডিরোজিওকে বিতাড়নের প্রশ্নে উইলসন সাহেবের সঙ্গে ডিরোজিওর পত্রালাপ পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় এই ভূমিকার মূল্য অনেক বেড়ে গেছে।

ডিরোজিওর এই কবিতাবলীর মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। 'নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বী' যে কবির কাছে প্রধান বিষয় এটি তিনি মনে রেখেছেন। তাই বাংলাদেশ, ভারতবর্ষের প্রবাহিনী গঙ্গা, গ্রীস, ইটালী বার বার তাঁর কবিতায় এসেছে। এসেছে ফারসী বয়েৎ, নানা ধরণের সনেট। মনে রেখেছেন হিন্দু কলেজে তাঁর ছাত্রদের, শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ডেভিড হেয়ারকে, মনে রেখেছেন শেকস্‌পীয়ারকে ('রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নামক সনেটটি দ্রষ্টব্য); তাসো এবং সাফোকে বন্দনা করেছেন—সাফোর অপবিতৃপ্ত প্রেম বিষয়ে বলেছেন 'O! how the gushing blood did inly flow!'—যার ভালোবাসার তুলনা হচ্ছে 'the raging of a storm'.

বস্তুত এই কবিতাগুলির মধ্যে যুবক কবির যে হৃদয়-স্পন্দন শোনা যাচ্ছে অনবরত, তা প্রেম। স্বাভাবিক বয়ঃসন্ধির দুর্বার ভালোবাসা। এই চিন্তাশীল বিপ্লবী কিশোর তাঁর প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কি এমনভাবে প্রেম বিষয়ে এত সচেতন ছিলেন! ডিরোজিওর কবিতাবলী না পড়লে তাঁর জীবনের এই গোপন তথ্যটি আমাদের অজানা থাকত। এমনি আর একটি দীর্ঘ কবিতা 'Ada'র বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনী চোখ দুটিকে অশ্রুসজল করে তোলে। 'St. Monan's bells are ringing'...এরকম জায়গায় কোলরিজকে মনে পড়া আশ্চর্য নয়। নায়িকার জীবনকাহিনীকে কবি বলছেন 'A history of passion'—এই 'passion' কবির কাছে যৌবনের নিষ্পাপ স্বাভাবিক প্রেম।

ডিরোজিওকে প্রথম 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' কবি বলা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর বিষয়ে বলেছেন : he is a Bengali poet who wrote his poems in English—একথা সম্ভবত অসত্য নয়। "The Fakeer of Jungheera" নামক দীর্ঘ কবিতায় আমরা কয়েকটি শব্দ অবিকৃত পাচ্ছি : সূর্য, নলিনী, কামিনী, পবন, ব্রাহ্মণ, রাধিকা; অন্যত্র চন্দ্র শব্দটি পাচ্ছি! কবি অনায়াসে এই সব শব্দ ইংরেজী কবিতার মধ্যে চয়ন করেছেন। অবশ্য ব্রাডলে-বার্ট জানাচ্ছেন ভাগলপুরে থাকবার সময় গঙ্গাতীরবর্তী এই অঞ্চল কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল; The Fakir of Jungheera was directly

prompted by these peaceful peasant scenes beside the Ganges'.
ভাগলপুর এবং উত্তরবঙ্গ, মনে রাখতে হবে, তৎকালে একটি অবিচ্ছেদ্য বাঙালী সংস্কৃতি দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল।

কবির কিশোর-জীবনে আর একটি লক্ষ্যণীয় বোধ কাজ করছিল। তা হচ্ছে মৃত্যুচিন্তা, **'The Tomb', 'Dust', 'The Poet's Grave'** কবিতাগুলি তার সাক্ষ্য। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু এতো আসন্ন ?

There let his ashes lie,
Cold and unmourned ;...
There, all in silence, let him sleep his sleep !

ব্রাডলে-বার্ট তাঁর কবিতায় বায়রন এবং মূরের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু শেলীও অনুপস্থিত নয়। বরং বলা যায়, সেযুগে সাধারণভাবে যে রোমান্টিক কাব্য-চেতনা কবিকুলকে আবিষ্ট করেছিল তাই ডিরোজিওর কবিতায় নানাভাবে স্পষ্ট অভিঘাত এনেছে। শব্দচয়নে, রূপকল্প-নির্মাণে, স্বাভাবিক চিত্রধর্মিতায়, এবং একটি স্বাপ্নিল মানসিকতায়—বিশেষত প্রেম-বিষয়ে বিয়োগান্ত চেতনায়—এই সব ধরা পড়বে। **'Leaves'** কবিতাটি এই প্রসঙ্গে পড়া যেতে পারে। পড়া যায় এমনি আরো কবিতা, যেমন **'Night'**

Swift as the dark eye's glance, or falcon's flight
Thought comes on thought, awakened to the night—

১৮৯২ থেকে ১৮৩০এর মধ্যে ইংরেজী কবিতা খুঁজে পড়লে এজাতীয় পংক্তির আভাস—বরং বলা যায় রসাভাস—আরো মিলবে, যেখানে এই ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কবিকে কোলরিজ বায়রন শেলীর সগোত্র মনে হতে পারে।

অরুণ ভট্টাচার্য

নতুন কবিতা

[১৯৩০-৭০ এই পঞ্চাশ বছরের কবিতার পালাবদল শুরু হয়েছিল আরো কয়েকবছর পূর্বে। এবার পালাবদলের কেন্দ্রভূমি ছিল না কলকাতা। আবার গ্রাম বাংলা, কাঁটাবন, নদীনালা, আকাশের বিস্তার ও সহজ জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের কবির দল। একমাত্র "উত্তরসূরি" পত্রিকা সেই নতুন প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েছিল। পাঁচ বছর পূর্বে উত্তরসূরিতে এই কবিতার বিভাগটি, যা ছিল নেহাৎই পরীক্ষা, আজ তাই চৈতন্যের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে এসেছে তরুণ কবিদের শব্দের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে। এই "নিঃশব্দ বিপ্লব" কবিতার ইতিহাসে একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে থাকবে মনে হয়। সম্পাদনা : উত্তরসূরি]

সমীরণ ঘোষ

এই পথ

পথখানি দৌড়ে গিয়ে বহুদূর···একটি বিন্দুতে আজ স্থির।
এইপথে তিনটি যুবক নেমে এলো প্রপাতের মতো
এইপথ প্রশাখায় ভেঙেছে কোথাও! ভেঙে গেলে
কোন্ দিকে তাহাদের নিয়ে যেতে পারে!

উত্তরে অরণ্য-শহর :
হাতির পায়ের দাগ যন্ত্রণার মত গেছে বনের ভেতর বহুদূর···
আদিবাসী যুবতীর পায়ে পায়ে প্রার্থনার মতো ঝুঁকে আছে অগ্নিপলাশ
এইখানে চিতার থাবা বুকে এসে বেজে যেতে পারে অকস্মাৎ!
কতোখানি সুখকর হবে যুবকের ; কতোখানি অনিয়ম যাবে তাহাদের
সত্যের ভীষণ কাছাকাছি······
না-কি দক্ষিণে ? সমুদ্র আর শীতোষ্ণ বালির কাছে ?
ঝাউ-এর জঙ্গল থেকে ছুটে আসে মোহন বাউল···

সংগীত তাদের কোন্ মূর্তির কাছে নিয়ে যাবে ? বৃক্ষের কাছে !
তারা কী ঝাউ-এর পাশে সমান্তরাল হ'য়ে দাঁড়াবে কখনো !
একটি যুবক আজ পুড়ে-পুড়ে বুকের আগুনে,
ভাবে, এইসব গভীর রহস্যমালা পথ ও পথিক বিষয়ক...

অগ্নিনির্জন। C/o কল্যাণ ভৌমিক। ১২৮/১৮ হাজরা রোড কলিকাতা ৭০০ ০২৬

মুকুন্দলাল গায়েন

দারুন অচেনা লাগে

আমরা রোজ বিকেলের দিকে মন্দিরে বেড়াতে যাই—
হাতে থাকে পবিত্র ফুলের গন্ধ-ভরা ডাল।
তারপর সন্ধের একটু পরেই ফিরে আসি,
আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে রাস্তা পার হই।
অনেকগুলি আঁকাবাঁকা অলিগলি ঘুরে—
ঢুকে যাই আমাদের পরিচিত অন্ধকার গলির ভেতরে।
কিন্তু আজ আর আমি চিনতে পারি না আমাদের
শম্ভুনাথ লেনের বাড়িটা, এবং আমাদের আশ-পাশের
প্রতিবেশী বাড়ীগুলো। দারুন অচেনা লাগে,
রূপকথার নগরী মনে হয় আমাদের আজকের এই
শম্ভুনাথ লেনের গলিটা॥

শ্রবণান্ত। গোসাবা ৭৪৩৩৭০, সুন্দরবন, ২৪ পরগণা

মুরলী দে

কবিতার মতো

নীলছুরি দিয়ে আমি সাধের বালিশ কাটলুম
হাতে, হাতময় ছিল তৈল পদার্থ
বৃষ্টিফুলের মতো লেগে গেলো তুলো···
একটি শরৎকাল দীর্ঘ খরার মধ্যেও বয়ে নিয়ে এলো মেঘ !

আর আকাশের দিকে তাকিয়ে
মনে হলো—সমস্ত সুহৃদ বকগুলি
আমাকে ফেলে যাচ্ছে কোথাও।

ঘাসমাটি। ঠাকুরপুর, জয়কৃষ্ণপুর, বাঁকুড়া

সুদীপ চক্রবর্তী

এই শোন প্রাচীর ভাঙছে

এই শোন ফুলের কাছে যেও না প্রাচীর ভাঙছে
জানলায় হাত রেখে কাকে দেখি, কার কাছে যাওয়া যেতে পারে, সব দরজা বন্ধ
কাকে কি দিয়েছি নিমন্ত্রণ, প্রেম, দুঃখ
এখনতো ফুলের সময়, জানো প্রাচীর ভাঙছে, জানো এখন কী দারুন কম্পন
ভিতরে ভিতরে, এখন ফলের কাছে যেও না।

এই শোন চন্দন বনে যেও না এখন আগুন জলছে
পাতাবাহারের নীচে মাথা রেখে কাকে ভাবি, কার কাছে জানা যাবে স্বপ্ন, পাথর
এবং অন্বেষা, এখন কিছুই মনে থাকে না, কিছু না
এখন তো অরণ্যে নিনাদ, জানো চাঁদটা ভাঙছে, এখন কী মলিন
চন্দনবনে চাঁদে, এখন চন্দন বনে যেও না।
এই শোন এখন ফলেরা প্রাচীর ভাঙছে, চন্দন বনে আগুন জলছে
এখন যেও না,
জানলায় হাত রাখো দুঃখি মানুষ।

কণ্ঠস্বর। C/o সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ১১/২ টৈমুর লেন, কলিকাতা ৯

বঙ্কিম চক্রবর্তী

রত্নাকর

নিজের ইচ্ছেমতোই তছনছ করছি, দা ভাঙবো বলেছিলাম
ভেঙে ছড়াবো বলেছিলাম প্রপিতামহের গাঁজার কল্কে,
কচুরিপানার ডোবা, মর্মস্পর্শী জন্ম-ভিখিরির টিনের কৌটো
কল্কের আগুনে জ্বালাবো বলেছিলাম চৌহদ্দি সতীনের রাজধানী।
এবার দয়া করে তোমরা কে কি উপহার দেবে দিয়ে যাও,
আমার পিরান নেই, পৈতে নেই, ঘর-দোরে এক ছটাক সুখ নেই
বাতলে দাও, পরম প্রশান্তি জুড়ে নিজের ইচ্ছেমতো কবে রত্নাকর হবো?

নিজের ইচ্ছেমতো হেলিক্যপ্টারে যেমন উঠতি মহামানব
একদিনে স্বর্গ এবং নরক পরিভ্রমণ সেরে বুঁদ হ'য়ে
লক্ষ্মীর ভিটেতে চরায় সোয়া তিনশো ঘুঘু,
প্রভু হে, এমন অরূপ একটা বর দাও, যাতে
আমার উকুন-পোষা বৌটাকে জ্যোৎস্নার রাজরাণী করতে পারি, তার
একঘাটে জল খাইয়ে বাঘ ছাগলের মিলন দিতে পারি।

নিজের ইচ্ছেমতোই ভাঙতে বসেছি চতুবর্গ যুদ্ধ প্রেম,
দাঙ্গা বাধিয়ে রেখেছি বুকে।
এবার নাকে দড়ি বেঁধে আমাকে বুঝিয়ে দাও
নিজেকে ছাড়া আর কি কি ভাঙলে তোমরা খুশী হবে এবং
ভোটাভুটি ছাড়াই আমি রত্নাকর হবো।

বেণুকা। C/o মনোরঞ্জন খাঁড়া। বর্গন, মেচেদা, মেদিনীপুর।

জমিল সৈয়দ

কষ্টের মাস

মাসটি তো শেষ হয়ে এলো, তবে তুলো রোদে দিই
কাপড়ের ফালিটিও যত্নে সাজিয়ে রাখি............

এই ব'লে নারীটি তাকায় মাসের শেষের দিকে—
ঋতুবদলের গন্ধে গন্ধে ভরে ওঠে রমণীকুসুম
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় মাস, মালঞ্চের ডাল জুড়ে কানাকানি,
সে কি তবে ক্রমশই বড়ো হয়ে যাবে, বড়ো হতে হতে
তুলোর গাছের নিচে সাজাবে ঝুলন, দে তোরা আঘাত দে
সর্বস্ব ঠেলাটি দিয়ে নাড়িয়ে দে ময়নামতী মেঘেদের সাজানো বাগান

যেতে যেতে দেখা হয়—পথের পাশেই ঘেরা তাঁবুটির নিচে
নারীর প্রফুল্ল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাসের সবুজ, মাটি খুঁড়ে বীজধান……
খুরপি চালিয়ে দূরে—কাঁদো কাঁদো জলের ঢেউয়েরা, ওঠে-পড়ে,
ভাসিয়ে দেবেই ব'লে…চারপাশ নিথর, সুমসাম…
নিঃসীম ঘুমের ভেতরে মন আনচান-করা ব্যথার বিশাল অর্থ
সে কি বোঝে—এইসব আনন্দনিহিতি !

মাস যায়, যাওয়ার সময় হলে বেনারসী শাড়িটির জমি জুড়ে
ফুল ফোটে, লজ্জায় আরক্ত চোখে দিগন্ত রেখার দিকে চুপিচুপি দেখে
সোনালী সরের চাদর উঠে আসে পা থেকে মাথায় , আল্‌তো নরম পালক
সুড়সুড়ি দিয়ে যায় পায়ের আঙুলে, আঃ এতো কষ্ট হয়,
'মাগো, এতো কষ্ট কেন !'

সার্বণি। C/o প্রশান্ত গোস্বামী, স্টেশন রোড, দাঁতন ৭২১৪২৬ মেদিনীপুর।

অরূপ চৌধুরী

মেঘলা দিন বিষয়ক

বুকের পাশে কেউ জেগে নেই, গোপন অসুখ, বুক জ্বলে যায়
শূন্যঘরে মলিন শয্যা—চক্ষু আমার ঘুম ভুলে যায়
বাহির জুড়ে বিষণ্ণ দিন, মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি ঝরে
এইভাবে সব নির্জনতার প্রহর কাটে নিরুত্তাপে

বুকের পাশে কেউ জেগে নেই, গোপন দহন, বুক জ্বলে যায়
পোকায় কাটে পাণ্ডুলিপি, হৃদয় আমার সাধ ভুলে যায়
এমন সময় কোথায় যাবো…? কার দরোজায় প্রেমিক হবো…?
ফুল্ল কুসুম মৃদুল মায়ায় কেউ কি আর আশায় আছে…?

ঘরের ভিতর তরল আঁধার, স্মৃতির ছায়া ঈষৎ কাঁপে
ঘাট আঘাটা রাস্তা ও মাঠ সব ডুবে যায় গভীর জলে
জলের ভিতর ধূসর ছবি, বৃক্ষশাখায় বৃষ্টি নাচে
অশ্রুপাতে শরীর ভাঙে উদ্ভাসিত রোদের খোঁজে……

রেনেশাঁস সাহিত্য পত্রিকা। C/o অপূর্ব শীট, স্টেডিয়াম মোড়। বাঁকুড়া ৭২২ ১০১।

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

সখি, তোর

সখি, তোর এ রাস্তায় পা ফেলা নিষেধ :

রাস্তার প্রহরী যারা, সহচরী সাক্ষী ও আসামী
সকলেই তোকে কেন দুষ্ট করে, চুরি করে তুই নাকি
চাঁদ দেখেছিলি ?
আহাঃ ! চাঁদ নেই, ডুবে গেছে,
তবু তোর আনাগোনা শেষ আর হোলো না কিশোরী।

এখন পথের বুকে গড়ে ওঠে আদালত ;
পা-ফেলা নিষেধ।

তুই কি পারবি সখি অগ্নি-পরীক্ষায় জয়ী হতে ?

কবিতা নিবর্তন/৪ । C/o শ্রীযোগেশ রায়, 'মা সাবিত্রী সদন' চিকুপুর । গৌহাটি-১৬, আসাম

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

স্কেচ ২২

অনেক কঠিন ক'রে অর্গল বন্ধ করেছ, প্রচণ্ড জোর
প্রয়োগ করেছ তুমি, সব শক্তি করেছ নিঃশেষ ?

কোথায় রেখেছ চোখ, দেখ নি কি বিরাট ফাটল
গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মত সজোরে ঢুকবে এসে ঝড় !

তোমার পতন আছে ঐ ছিদ্রে, মৃত্যু আছে, সমস্ত বিকল
করবার দস্যু আছে, জানও না তার ছদ্মবেশ !

সময়ানুগ। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৬। ২/৩ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

রাজকল্যাণ চেল

মানুষের দিকে

অন্য কোনদিকে যাওয়ার চেয়ে মানুষের দিকে যাওয়া ভালো
অন্য কোন কথা বলার চেয়ে মানুষের কথা বলা ভালো।

পৃথিবীর হৃদয় বড় কঠিন বার বার শিকড় ছড়াতে গিয়ে আমি বুঝেছি,
কঠিন তবু যে মানুষটি বসে আছে একা তার সাথে চাই যোগ,
যে ক্ষতস্থানে কাপড় বাঁধছে একা হাতে—
চলো তার ক্ষতস্থানে বেঁধে দিই কাপড়ের টুকরো।

যে যেখানে ছিল সে আর সেখানে নেই, সমস্ত নোঙরের মুখ আজ লক্ষ্যের দিকে
অন্য কোন গল্প বলার চেয়ে মানুষের গল্প বলা ভালো
অন্য কোন দিকে যাওয়ার চেয়ে মানুষের দিকে যাওয়া ভালো।

সপ্তর্ষি। C/O সুব্রত চেল, বেলবনী, বাঁকুড়া।

কবিতা এবং কবিতাবিষয়ক

কাব্যগ্রন্থ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : মহাপৃথিবীর কবিতা ॥ কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩। টা. ৮.০০

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত : রাজার গাড়ি ॥ উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩। টা. ৮.০০

আহসান হাবীব : দু' হাতে দুই আদিম পাথর ॥ কথাসরিৎ, ১৬ দিলখুশ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২, বাংলাদেশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে। প্রমা, ৫ ওয়েষ্ট্ রেঞ্জ, কলিকাতা ১৭

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত : স্মৃতি যখন সমুদ্র। প্রাইমাপাবলিকেশনস্, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭

তুলসী মুখোপাধ্যায় : দুই বসন্ত (সম্পাদনা) ॥ অনুভব প্রকাশনী, ২৪/২ আর. এন. দাস রোড, কলিকাতা ৩১। টা. ৭.০০

দেবী রায়ের কবিতা। মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, ২৪ পরগণা ॥ টা. ৫.০০

সুব্রত রুদ্র : গাঢ়তম ছায়া ॥ ১২ অভয় সরকার লেন থেকে প্রকাশিত, কলকাতা ২০। টা. ১.০০

রূপাই সামন্ত : মুহূর্তের পাপড়ি ॥ কস্তুরী প্রকাশনী, ফুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া, ২০০টি কবিতা, প্রতিটি কবিতার জন্য এক পয়সা।

অশোক সেন : মানুষ বড় রতন রে ॥ জোয়ার প্রকাশনীর পক্ষে পুষ্পজিৎ রায় ॥ রামকৃষ্ণপল্লী, মালদহ। টা. ৪.০০

ফিরোজ চৌধুরী : তুমি ॥ স্বরলিপি, ২৩এ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা ৯ টা. ৫.০০

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী : দশজন কবি ॥ বাংলা প্রাচী প্রকাশন, ৪২ অরবিন্দ পল্লী, পোঃ ইচ্ছাপুর নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা। টা. ৬.০০

কৃষ্ণা বসু : শব্দের শরীর ॥ ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা ৬ ॥ টা. ৪.০০

শীতল চৌধুরী : একাকী অলৌকিক ক্রন্দন ॥ সরকার ভবন, ফ্ল্যাট ৫, বহুবাজার, চন্দননগর, জেলা হুগলী ॥ টা. ৪.৫০

কবিতা বিষয়ক

নলিনীকান্ত গুপ্ত : রচনাবলী ১ম খণ্ড ॥ সাহিত্যিকা। পৃষ্ঠ, ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২ ॥ টা. ২৫.০০

সমীরকান্ত গুপ্ত : কাব্যলোকে ॥ শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২ ॥ টা. ৮.০০

অ্যালফ্রেড এডওয়ার্ড হাউসম্যান : কাব্যের স্বভাব ॥ অনুবাদ ভূমিকা ও টীকা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ টা. ২.২৫

অশোক মিত্র : কবিতা থেকে মিছিলে ॥ অয়ন, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯ ॥ টা. ১০.০০

অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় ॥ অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬ ॥ টা. ২০.০০

উত্তম দাস : কবিতার সেতুবন্ধ ॥ কবি ও কবিতা প্রকাশন, ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ॥ টা. ৯.০০

অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রেসের ফোন : ৩৫-১০৮৭ ॥

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-   )

আমরা তুজনা তুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমার আমার মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-   )

তোমার দেহ উঠ্‌তি ধানের মঞ্জরী।
আঁটো গড়ন, নধর চিকন, কচি কাঁপন শিষের
কেমন করে ধরি ?

তোমার দেহ রেশমী সুতোর জাল।
কামনারই ঠাসবুননে ময়ূরকণ্ঠী চেলি
পরবো কতো কাল ?

অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-   )

গাছের সারির পিছে চুপি-চুপি কখন এখানে
এসেছে শবরী উষা, দাঁড়ায়েছে বনের আড়ালে,
পরেছে বিশাল খোঁপা, সত্যফোটা রক্তজবা কানে,
বুকের কাঁচুলিখানি বিঁধে আছে মহুয়ার ডালে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-   )

আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি,
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
তুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা॥

শিক্ষার সম্প্রসারণে বামফ্রন্ট সরকার

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কি অর্জন করা গেছে—

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ, সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ে বেতন।

৩৪০০ বিদ্যালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০০০ নুতন প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ, ৩১ লক্ষ শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য, সমস্ত শিশুর জন্য সব ভাষায় বিনামুল্যে বই, খাতা, শ্লেট, মেয়েদের জন্য পোষাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, ১৩,৮০০ নুতন প্রাথমিক শিক্ষক।

৯০০ নুতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সকলের জন্য সরকারী অনুদান, ২৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ, মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, খেলাধুলা, বিজ্ঞানাগারের উন্নতি, ১০,০০০ নুতন মাধ্যমিক / প্রাথমিক স্তরে জীবনমুখী শিক্ষার পাঠক্রম, গণতান্ত্রিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন, গণতান্ত্রিক সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ সংগঠন।

১৩৭৫টি নুতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার যেখানে মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭০১টি, গ্রন্থাগারগুলির জন্য সাহায্য ১০গুণ বৃদ্ধি, বেসরকারী গ্রন্থাগারে সাহায্য, কোলকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২৬০৮/৮১

উত্তরসূরি : নিয়মাবলী

১. লেখা কপি রেখে পাঠান।

২. প্রকাশনযোগ্য বিবেচিত হলে অবশ্যই ছাপা হবে। চিঠি লেখার প্রয়োজন নেই।

৩. উত্তরসূরি কোন দল বা মতে বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাস করে, লেখা 'হয়ে উঠেছে' কিনা তার ওপর। বিশ্বাস করে, চিরকালের শিল্পসাহিত্য রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

৪. কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন কোন অবস্থাতেই প্রকাশিত হয় না।

৫. ২৭ বর্ষ থেকে গ্রাহক মূল্য সডাক বার্ষিক টা ১৫·০০। এম. ও. করে স্পষ্ট ঠিকানা লিখে পাঠান।

৬. সুস্থ কবিতা-আন্দোলনে সাহায্য করুন। প্রচার থেকে বিরত হ'ন।

সম্পাদক : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫০
ফোন : ৫২-২৪৫২

রামকিংকর-এর শিল্পকর্ম অবনীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শশালার সৌজন্যে

উত্তরসূরি ১০১ কার্তিক-পৌষ ১৩৮১ ২৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা

রাঁমকিঙ্কর-কৃত অবনীন্দ্রনাথ : একটি অসাধারণ ভাস্কর্য

●

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরি ॥ ৭বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড ॥ কলিকাতা ৫০ ॥ ৫২-২৪৫২

মেঘনাদবধ কাব্যে ভৌগোলিক স্থানবিন্যাস

গার্গী দত্ত

মেঘনাদবধ কাব্য রাম-রাবণের যুদ্ধের কল্পিত কাহিনী নিয়ে লেখা হলেও মধুসূদনের কল্পনায় এই কাহিনী প্রত্যক্ষ বাস্তবের মত সুনির্দিষ্ট ছিল, তার প্রমাণ এর কাহিনী স্থান ও কালের যুক্তিসঙ্গত বিন্যাসে পরিকল্পিত। এই কালবিন্যাস যেমন সুচিহ্নিত, এর স্থানবিন্যাসও তেমনি সুচিহ্নিত। স্থান ও কালের ঐক্যতত্ত্ব প্রাচীন গ্রীসের নাটকের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করত বলে লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্থান ও কালের ঐক্যের সঙ্গে ছিল ঘটনার ঐক্য। এই তিনটি ঐক্যর কাজ ছিল কাহিনীকে যুক্তির শৃঙ্খলে বদ্ধ করা। গল্পটা যেন বাস্তব বোধকে অতিক্রম করে না, যা সম্ভব তাই যেন ঘটানো হয়। রূপকথা বা আমাদের দেশের পৌরাণিক গল্পগুলির মাধুর্য যাই থাক, বাস্তবতার দিক দিয়ে এদের মধ্যে ছিল এই অভাব—স্থান ও কালের ঐক্য তাদের মধ্যে ছিল না। মধুসূদন তাঁর কাহিনী-পরিকল্পনায় এই সূত্রটির প্রবর্তন করেছিলেন। নাটক বা মহাকাব্যে যে জীবনের অনুকরণ থাকে, তার তাৎপর্য এখানেই।

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে তিনটি ঐক্যই মেনে নিয়েছেন। অবশ্য এর ঘটনা-স্থানের দুটি স্তর আছে—একটি মর্ত্যলোক, একটি স্বর্গলোক। স্বর্গলোকের ঘটনায় অবশ্য এই ঐক্যের ব্যতিক্রম ঘটেছে। সেখানে যা ঘটছে, তার কালগত বিন্যাস ঠিক আমাদের সাধারণ যুক্তিবোধে মেলে না। স্থানগত ঐক্য কালগত ঐক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই স্থানের যুক্তিসিদ্ধতাও স্বর্গলোকের ঘটনায় ব্যাহত হয়। কিন্তু সেটা স্বর্গলোক বলেই গ্রাহ্য, তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। আবার মর্ত্যলোকে যা কিছু ঘটছে, মধুসূদন তাকে যুক্তিসিদ্ধ কালের মাত্রাধীন করেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণের বীরবাহু নিধন সংবাদ-শ্রবণে কাহিনীর আরম্ভ আর ইন্দ্রজিতের সৎক্রিয়ায় তার পরিসমাপ্তি। নয় সর্গে বর্ণিত সমগ্র ঘটনা ঘটছে তিনদিন দুই রাত্রি সময়ের মধ্যে। সমালোচকের মতে "কবির অনুপম কল্পনাগুণে, এই তিন দিন মাত্র ব্যাপী ঘটনা কত দীর্ঘ কালের কার্য্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয়"।[1] তার আগের আর কোনো বাঙালী কবি কাব্য-বর্ণিত ঘটনাকে একটা নির্দিষ্ট কালসীমায় বিধৃত

করেন নি। কেবল ঘটনার কাল নয়, একটা স্থানবিন্যাসও এই কাব্যেই আমরা প্রথম পেলাম। তাঁর প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভবের কাহিনী দেবলোকের, কতদিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয়েছিল তার আভাস যেমন কবি দেন নি, তেমনি স্বর্গলোকের অধিবাসীদের চলাফেরার কার্যক্রমের কোন সুস্পষ্ট ক্ষেত্রনির্দেশও সেখানে নেই। ব্রহ্মলোক থেকে স্বর্গ মর্ত্যে তাদের অবাধ বিচরণ, হিমাচল বা সুমেরু অঞ্চল সবই মর্ত্যলোক থেকে বহুদূরে।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মর্ত্য ঘটনার কিছু স্থান নির্দেশ যে নেই তা নয়। বাস্তব সমাজচিত্র যেমন মঙ্গলকাব্যে প্রচুর, তেমনি ঘটনার স্থানরূপে বিভিন্ন দেশ গ্রাম নগরীর নামও উল্লিখিত। এ বিষয়ে মুকুন্দরামের কিছু ধারণা ছিল তা মনে করার কারণ আছে। তবু তাতে ধারাবাহিকতা বা সংলগ্নতার একান্ত অভাব। কালকেতুর বাক্যের আবাসভূমি থেকে গুজরাট কতদূরে সে ধারণা চণ্ডীমঙ্গলকারের ছিল কিনা সন্দেহ; ধনপতি বাণিজ্য করতে সিংহল গেল কোন্ সাগর পাড়ি দিয়ে—সে জ্ঞানের পরিচয় নেই। তাঁদের স্থূল কল্পনায় দেব-মানবের বিচরণভূমি এক, কেবল বিচ্ছিন্ন অসংলগ্নভাবে কতকগুলি জায়গার নাম এসেছে স্থানগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াই। তাই পার্থিব সমুদ্রে 'কমলে কামিনী' দেখা সম্ভব হয়েছে আর বেহুলার কলার মাঞ্জাস বাংলার গ্রামের ঘাট থেকে পাড়ি জমিয়েছে স্বর্গে নেতা ধোবানির ঘাটে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কয়েকটি সুপরিচিত স্থানের নাম পওয়া যায়—কাশী, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, যশোর, ভুবনেশ্বর, নীলাচল, দিল্লী। মানসিংহ কাব্যে ভবানন্দের দিল্লী যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি কিছু ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যশোর থেকে গঙ্গাপার হয়ে দক্ষিণের পথ ধরে চলেছেন ভবানন্দ। মঙ্গলকোট, উজানী, বর্ধমান, মল্লভূমি, কর্ণগড় দক্ষিণে রেখে বাংলার সীমান্তে গিয়ে পৌছালেন। তারপর মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, দাঁতন, জলেশ্বর, রাজঘাট ছাড়িয়ে কটক; কটক ছেড়ে ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, আধার নালা, নীলাচল। এই পর্যন্ত কবির জ্ঞান বেশ প্রত্যক্ষ মনে হয়। তারপরেই সব জড়িয়ে গিয়েছে। নীলাচল ছেড়ে সেতুবন্ধ, কৃষ্ণা, কাঞ্চী মারাঠাদের দেশ। তারপরে গুজরাট মথুরা বৃন্দাবন, তারপরে দিল্লী। বোঝা যায় এ-দিকটা সম্বন্ধে কবির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব। তীর্থস্থানগুলির নাম তাঁর জানা আছে। সেইগুলিই ভারতচন্দ্র দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু ধারাবাহিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

তাঁর ছিল না। তবু মনে হয় ভারতচন্দ্রের কাব্য-কাহিনীতে কল্পনামূলক সৃষ্টি তেমন নেই। তাঁর মানুষগুলি, তাদের আচরণ, তাদের চিন্তাভাবনা সব প্রত্যক্ষ, তাদের বিচরণক্ষেত্রও আমাদের জানার পরিধির মধ্যে। কল্পনা দিয়ে স্থানগত ঐক্য রক্ষার তেমন প্রয়োজন ঘটে নি। তাঁর জানা ভৌগোলিক জ্ঞান যতটুকু ছিল, তাতেই কাজ চলে গিয়েছে।

মেঘনাদবধের কাহিনী রামায়ণ থেকে নেওয়া। এখানে কল্পনার অবকাশ প্রচুর। কল্পনা দিয়েই তাঁকে কাহিনীতে স্থানগত ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা আনতে হয়েছে। পৌরাণিক একটি খণ্ড কাহিনীকে মহাকাব্যের বিস্তার দিয়ে সম্পূর্ণ একটি কাল্পনিক কাহিনীতে সুস্পষ্ট এবং সুপরিকল্পিত স্থানবিন্যাসের মধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় কবিত্ব-কল্পনার যুক্তিসিদ্ধতা ও প্রত্যক্ষতা। তাঁর কল্পনার সৃষ্টি রাবণকে দিয়ে যেমন জীবনধর্মকে প্রকাশ করলেন, তেমনি কাহিনীকে একটি বিশ্বাস্য এবং সুস্পষ্ট স্থানবিন্যাসের আয়ত্তে এনে তাকে একাধারে বাস্তব ও মানবিক করে তুললেন।

লঙ্কাতে রাবণের প্রাসাদ দুর্গ প্রাচীর অশোকবন চণ্ডীর দেউল ইন্দ্রজিতের প্রমোদ কানন প্রভৃতি যে-সব স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের স্থান বিন্যাস সম্বন্ধেও কবির ধারণা ছিল স্পষ্ট। কোন্‌টা কোন্ জায়গায়, কোন্ দিকে অবস্থিত, কবি তার নির্দেশ দিয়েছেন। কবি কল্পিত এই চেহারাটি প্রথম-সর্গের প্রথম দিকেই পাওয়া যায় প্রাসাদ শিখরে উঠে রাবণের বর্ণনায়। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাবণ ওপরে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে চাইলেন। এর মধ্যে কবির অভিপ্রায় একটু ভাবলেই বোঝা যায়। রাবণের প্রাসাদ এবং যুদ্ধক্ষেত্রের 'লে আউট' বা ছকটার একটা ধারণা তিনি পাঠকদের দিতে চান। "চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন সৌধ কিরীটিনী লঙ্কা মনোহরা পুরী।" লঙ্কার কেন্দ্রস্থলে আছে প্রাসাদ, তাকে ঘিরে অজস্র অট্টালিকা সৌধ, দোকান-পাট, বাগান, সরোবর, মন্দির। বিবিধ রত্নে পূর্ণ এই নগরীকে ঘিরে সুউচ্চ প্রাচীর, সশস্ত্র রক্ষীদল নগর রক্ষার জন্য প্রাচীরের উপরে প্রহরারত। প্রাচীরের চারদিকে চার সিংহদ্বার। বাইরে শত্রু সৈন্য বেষ্টন করে আছে। তারা যাতে প্রবেশ করতে না পারে তাই সিংহ দুয়ার চারটি বন্ধ। কিন্তু বাইরের দিক দিয়ে এই দুয়ারগুলিতে হানা দিয়ে আছে রামপক্ষীয় বীরের দল—উত্তর দুয়ারে সুগ্রীব,

পূর্ব দুয়ারে নীল, দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ, পশ্চিম দ্বারে রাম লক্ষ্মণ হনুমান বিভীষণ।
বাল্মীকি রামায়ণেও রাম সৈন্য পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রীসহ রাবণের সুউচ্চ প্রাসাদ শিখরে ওঠার কথা আছে :

আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপাণ্ডুরম্।
বহুতাল সমুৎসেধং রাবণোৎথ দিদৃক্ষয়া ॥[২]

অপার দুঃসহ মহাবল বানর সৈন্য দেখে ক্রোধান্ধ রাবণ সারণের কাছে বানর যূথপতিদের পরিচয় জানতে চাইলে সারণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাদের পরিচয় দিল। তবে দ্বাররক্ষণ বর্ণনা মধুসূদনের কৃত্তিবাসের অনুরূপ।[৩] কেবল কৃত্তিবাসে পশ্চিম দুয়ারে একা হনুর কথা আছে। বাল্মীকির বর্ণনায় দ্বাররক্ষণ অন্যরূপ। নীল অঙ্গদ ও হনুমান পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দ্বারেই আছে। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ উত্তর দ্বারে এবং বিভীষণ ও জাম্ববান মধ্যগুল্মে। রামায়ণে সৈন্য সংস্থাপনে একথা স্পষ্ট নয় যে শত্রুসৈন্য লঙ্কাকে বেষ্টন করে রেখেছে, কেবল যুদ্ধ প্রকরণটুকুই আছে সেখানে। ইলিয়াড মহাকাব্যে শত্রুসৈন্যের ট্রয় নগরীকে বেষ্টন করে রাখা এবং ট্রয়ের প্রাচীরের দ্বার রুদ্ধ রাখার উল্লেখ আছে। সে বর্ণনা মধুসূদনকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে :

"শত প্রসরণে
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী
গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি
বেড়ে জালে সাবধানে কেশব কামিনী ,[৪]

এই শত্রুসৈন্য বেষ্টনের বাইরে অদূরে যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে মৃতদেহভুক্ শকুনি গৃহিনীর ভীড়। যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখতে পেল রাবণ। বিধির বিধানে ক্ষুব্ধ নৃপতি দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পেল সমুদ্রকে লঙ্কাদ্বীপকে বেষ্টন করে আছে যে অতল জলধি। "ফিরাইয়ে আঁখি" তার চোখে পড়ল রামের তৈরী "অপূর্ব বন্ধন সেতু"। তখনই মহামানী রাবণের মুখে উচ্চারিত হল তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ'। আত্ম-হৃদয়ের সঙ্গে তরঙ্গোদ্বেল জলধির সাদৃশ্যানুভবের রহস্য ছাড়াও পাঠকের বিস্ময় জাগে মধুসূদনের অতিস্পষ্ট ভৌগোলিক বিন্যাসের শক্তি দেখে। এটা স্পষ্টই অনুমান করা যায় রাবণ প্রাসাদশিখরে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন,

একই কালে সমগ্র লঙ্কার মানচিত্র তার চোখে পড়েছে, দূরে সমুদ্র, রামেশ্বরের কাছে সেতুবন্ধটি ডান দিকে মুখ ফিরিয়েই (পেছনে ঘুরে নয়) চোখে পড়ে। পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন অনুমান করার কারণ সমগ্র কাব্যের মধ্যেই এই পশ্চিম তোরণের কথা ঘুরে ঘুরে আসছে। মধুসূদনের বর্ণনায় মূল যুদ্ধশিবির পশ্চিম দিকেই। সেখানে রাম লক্ষ্মণ বিভীষণ প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয় প্রধানদের অবস্থান। চিত্ররথ সেখানেই সমুদ্রতীরে রামের শিবিরে দেব-অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে। প্রমীলা তার নারী বাহিনী সহ পশ্চিম দ্বার দিয়েই শত্রু সৈন্য বেষ্টন অতিক্রম করে রামের অনুমতি লাভ করে লঙ্কা প্রবেশ করেছে। আর চির-কোলাহল ময় পয়োনিধিতীরে রামচন্দ্রের শিবিরেই রাক্ষস সচিবশ্রেষ্ঠ গিয়েছিল ইন্দ্রজিতের সৎক্রিয়ার জন্য সাতদিন যুদ্ধ-বিরতির অনুনয় নিয়ে। শেষ পর্যায়ে এর পশ্চিমদ্বার দিয়ে শবযাত্রা চলেছে সিন্ধুতীরে। আত্যন্ত এই পশ্চিম প্রীতি কি মধুসূদনের মনে পশ্চিমদেশ যাত্রা বাসনারই দ্যোতক? রাবণের সৌভাগ্য-সূর্যের অস্তোন্মুখিতার দ্যোতনাও অসম্ভাবিত নয়।

কাব্যের প্রথমাংশেই সমগ্র লঙ্কাপুরীর চিত্র উপস্থাপনায় পাঠকের মন একটি বিশেষ দেশ ও কালে নিবদ্ধ হয়। ঘটনার ভূমি সংস্থানের জন্য মন প্রস্তুত হয় তবে এখনও কোন ঘটনার আরম্ভ হয় নি। এর পরেই প্রভাসা-নাম্নী ধাত্রীর বেশে রাক্ষসপুরী রাজলক্ষ্মী প্রমোদ উদ্যানে ইন্দ্রজিতের কাছে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দিলেন। বীরকুমার বিলাস বিভ্রম পরিত্যাগ করে কর্তব্য পালনের জন্য লঙ্কাপুরীতে গমন করল, প্রমীলাকে আশ্বাস দিয়ে গেল—

> ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
> কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
> রাঘবে।[৫]

প্রশ্ন জাগে এই প্রমোদ-উদ্যান কোথায়? অবশ্যই প্রাচীর-বেষ্টিত নগরের বাইরে। কারণ তৃতীয় সর্গে লঙ্কায় প্রবেশ করে পতির সঙ্গে মিলিত হতে প্রমীলাকে সৈন্যবেষ্টন ভেদ করতে হয়েছে। লক্ষ্মী বলেছেন—

> "যাই আমি যথা
> ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।"[৬]

'ধাম' বলতে এখানে নগরীকেই বোঝাচ্ছে কারণ দ্বীপটির বাইরে অবশ্যই

যায় নি তারা। লক্ষ্মী আকাশপথে যাত্রা করেছেন, তাই গতিপথ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ইন্দ্রজিৎও রথ পবনপথে চালিত করে নগরে ফিরে এসেছে। আকাশ পথে যে রাক্ষস-রথ চলত তার উদাহরণ রাবণের পুষ্পক রথ এবং সীতা-হরণ পন্থা। প্রমীলা ইন্দ্রজিতের প্রত্যাবর্তনে দেরী দেখে সন্ধ্যাকালে শতসখীসহ রণসজ্জা করে লঙ্কার কণকদ্বারে উপনীত হল—তার বিস্তৃত বর্ণনা সমগ্র তৃতীয় সর্গ ব্যাপী। সদাসতর্ক রাক্ষস সৈন্য শত্রুর উপস্থিতি অনুমানে গর্জন করে উঠল কিন্তু রক্ষঃ-কুল বধূকে দেখে হুড়কা টেনে বজ্রশব্দে দ্বার খুলে তাদের সানন্দে বরণ করেও নিল।

চতুর্থ সর্গের অশোক কানন কোথায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা একটু কঠিন। ইন্দ্রজিতের পরিণতির সঙ্গে এই অংশ ঘটনাগত ভাবে যুক্ত নয়, কবি নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তবু সীতার প্রতি তাঁর মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল; সর্বংসহা ধরিত্রীর মত অসীম ধৈর্যশীলা ক্ষমাপরায়ণা সীতার চরিত্র চিত্রণের সুযোগটি তিনি গ্রহণ করেছেন। চিরকালীন এই মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনাস্থলকে তেমনভাবে নির্দিষ্ট করারও হয়তো প্রয়োজন ছিল না। অশোক কানন প্রাচীরভ্যন্তরে, না বাইরে সেটা বোঝা যায় না। তবে নগর কেন্দ্র থেকে দূরে তাতে সন্দেহ নেই। মেঘনাদ সেনাপতি পদে বৃত হবার পর লঙ্কার প্রজাবৃন্দ যখন উৎসবে মত্ত তখন চেড়ীরাও সীতাকে পরিত্যাগ করে সে উৎসবে যোগ দিতে চলে গেছে, এই অবসরে সরমাসতী সীতার কাছে এসে তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনল। আবার দূরে তাদের প্রত্যাবর্তনের পদধ্বনি শুনে সীতা সরমাকে দ্রুত চলে যেতে বলেছেন[৭] এতে নগর কোলাহল থেকে অশোক কাননের নিরাপদ দূরত্ব প্রমাণিত হয়। লঙ্কার বীরশূন্য অবস্থা বলতে গিয়ে সরমা সীতাকে সাগরকূলে শবরাশির দিকে তাকাতে বলেছে[৮] তাতে ধারণা হয় প্রাচীরে দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ যে সীতাকে উপলক্ষ্য করে এত বড় সংগ্রাম, তিনি প্রাচীর বেষ্টনীর বাইরে ছিলেন এটা মনে হয় না—চেড়ীর প্রহরা সত্ত্বেও। আর চেড়ীগণ কত সতর্ক তা তো সরমার আসার সুযোগ থেকেই বোঝা যায়। এই অসংগতিটুকু সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

পঞ্চম সর্গে চণ্ডীর দেউলের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণ সুমিত্রা-জননী-বেশা স্বপ্নদেবীর আদেশে চণ্ডীর দেউলে পূজা দিতে গেল।

'লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে,
শোভে সরঃ, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।' [৯]

পশ্চিমদিকের শিবিরে রামের অনুমতি নিয়ে লক্ষ্মণ 'নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।' সেখানে 'বীতিহোত্ররূপী' সুগ্রীব তাকে বাধা দিল, পরে পরিচয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিলে :

'কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যান দুয়ারে
ভীমবাহু সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ দর্শন মূর্তি।'[১০]

এই সরোবর এবং দেবীমন্দিরও প্রাচীরের বাইরে, না ভিতরে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। নগরভ্যন্তরে লক্ষ্মণ প্রবেশ করেছে ভাবা যায় না কারণ রাক্ষস প্রহরী প্রাকারোপরি সদা-জাগ্রত। আবার বাইরে অরক্ষিত অবস্থায় কেন দেব-দেউল থাকবে—বিশেষতঃ অন্য দেবগৃহসমূহ যখন নগরকেন্দ্রে। এখানেও সামান্য অসংগতি রয়ে গেছে। স্বচ্ছ সরোবরের জলে অবগাহন করে তীরবর্তী মন্দিরে ভক্তিভরে পূজা নিবেদন করে লক্ষ্মণ মহামায়ার প্রসাদ অর্জন করল, দেবী নির্দেশ দিলেন :

'যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজে বৈশ্বানরে।'[১১]

এই নির্দেশ থেকেও ধারণা জন্মায় নগরের বাইরে।

এ সর্গের শেষ ভাগেই ইন্দ্রজিতের রাস মন্দির, মন্দোদরীর মহল, শিবের মন্দির ও যজ্ঞশালার একটা সংস্থান-চিত্র পাওয়া যায়। উষাকালে প্রমীলাসহ মেঘনাদ শিবিকারোহনে মাতৃসকাশে চলল আশীর্বাদ প্রার্থনায়। মন্দোদরী তখন অনিদ্রায় অনাহারে পুত্রের মঙ্গল-হেতু শিবের মন্দিরে পূজারতা। পুত্র দুয়ারে দণ্ডায়মান এ সংবাদ পেয়ে লঙ্কেশ্বরী শিবালয় থেকে বেরিয়ে এসে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করলেন। মাতৃচরণ বন্দনা করে বীর মেঘনাদ কাননের মধ্য দিয়ে কুসুম-বিস্তৃত পথে ধীর গতিতে পদব্রজে চললেন যজ্ঞশালা অভিমুখে। যজ্ঞশালা একেবারে কাছে নয়, কারণ চোখ মুছে প্রমীলা—

'হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে
জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ।'[১২]

ষষ্ঠ সর্গের প্রথমেই জানতে পারি উদ্যান থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মণ রামের শিবিরে ফিরে এসেছে। এর পরে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাত্রা। এই যজ্ঞাগারটি কোথায়? লক্ষ্মণ ও বিভীষণ শিবির থেকে বেগে বহির্গত হয়ে 'চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোহে।' যখন তারা প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছে তখনই মায়াদেবী সহ রমা পশ্চিমদ্বারের কাছেঁ এসে পৌছালেন, উভয়ে প্রাচীরের ওপরে উঠে বিভীষণ সহ লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। রমার কর্তব্য শেষ, মায়ার হাতে বীরদ্বয়কে সমর্পণ করে তিনি নিজালয়ে (মনে হয় রাবণ রাজ্যে লক্ষ্মী-মন্দিরে) ফিরে গেলেন। অতঃপর লক্ষ্মণ হাত দিয়ে দ্বার উদ্‌ঘাটন করে নগর প্রবেশ করল। এবার মায়ার প্রসাদে অদৃশ্যভাবে চলেছে বলে আর নগর প্রবেশে বাধা নেই। পথে দুধারে লঙ্কার—

শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস, অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ, স্যন্দন, অগণ্য
অগ্নিবর্ণ, অস্ত্রশালা, চারু'নাট্যশালা,[১৩]

দেখতে দেখতে অগ্রসর হল তারা। মধুসূদনের কল্পনা বলে এগুলি এখন আর কাল্পনিক নয়; একেবারে বাস্তব জগতের সুপরিকল্পিত নগরের নক্সা। ক্রমে ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়ে 'নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে রক্ষোরাজ গৃহ।' শত্রুসৈন্য যখন প্রাচীর গাত্রে প্রতিহত তখন যে-প্রাসাদের শিখরে রাবণকে প্রথমে উঠতে দেখেছি, স্বয়ং শত্রু তখন সেই প্রাসাদ সমীপে উপনীত, কিন্তু প্রাসাদের শোভায় সেও বিমোহিত। যে-প্রাচীর রাবণের পুরীকে সুরক্ষিত রেখেছিল, পুরীবাসীগণও বিশ্বাস করে যুদ্ধ তার বাইরেই হবে। প্রাচীরের ওপরে উঠে যুদ্ধ দেখার কথা বলছে তারা। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে শমনরূপী শত্রু এসে নগর-কেন্দ্রে পৌছে গেছে তা তারা জানে না। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার নগরের মধ্যভাগেই।

কাব্যখানির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নগর প্রাচীরের কথা এবং চারটি সিংহ-

দ্বারের কথা (বিশেষতঃ পশ্চিম দ্বার , কেবল রাবণের যুদ্ধ যাত্রাকালে চার দ্বার দিয়েই সৈন্য বেরিয়েছে) পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থেকে মনে হয় প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গের একটি ছবি কবির মনের মধ্যে ছিল। দুর্গের কেন্দ্রস্থল সাধারণতঃ পর্বতের উপরে থাকে, সেই সুরক্ষিত অংশ থেকে বাইরে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে। সমগ্র দুর্গের পরিধি ও বাইরের ভূমি এককালে চোখে পড়ে। দুর্গের সুরক্ষার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক প্রাচীর থাকে, বাইরের দিকের প্রাচীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর জনবসতি, সৈন্যের আবাস, পশুশালা, দোকান বাজার ইত্যাদি থাকে আর কেন্দ্রস্থলে খাদ্য, অস্ত্র, ধনাগার, রাজন্যবর্গের বাস। প্রাচীরের উপর থেকে বাইরের দিকে নজর রাখা হয়, প্রয়োজনে ভিতর থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। প্রবেশ পথে সতর্ক প্রহরা। হায়দ্রাবাদের কাছে গোলকোণ্ডা ফোর্ট নাকি সাতটি বেষ্টনী-প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে বাসকালে কবি এরকমের কোন দুর্গ দেখেছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে রাবণের প্রাসাদের সুউচ্চ শিখরের উল্লেখ এবং রাবণের লঙ্কার শোভা, প্রাচীরের বাইরের সৈন্য বেষ্টন এবং রণক্ষেত্র, দূরে রাজ্য সীমায় সমুদ্র দর্শনের বর্ণনায় দুর্গ-পরিকল্পনার সঙ্গে একটা মিল দেখা যায়। এজন্যই কোথাও লঙ্কাপুরী বলতে কেন্দ্রস্থলকে বোঝায়, কোথাও বা কিছুটা বাইরের দিক বোঝায়। কল্পনা করতে দোষ নেই যে সবচেয়ে সুরক্ষিত অংশে রাজপ্রসাদ, যজ্ঞাগার প্রভৃতি এবং বাইরের দিকে বৃক্ষশোভিত উদ্যান, সরোবর, চণ্ডী দেউল, পশুশালা, অশোক-কানন ইত্যাদি। কবির কল্পনা অবশ্যই কোন কিছুকে হুবহু অনুসরণ করে না, তাঁর অনন্যনিরপেক্ষ স্বাধীন কল্পনাতেও এই ভূমি-বিন্যাস এসে থাকতে পারে। বাইরের যে প্রাচীরে রাক্ষস সৈন্য প্রহরা রত, মনে হয় সেটি নয়, ভিতরের প্রাচীরের দ্বারই অশনি-নিনাদে খুলে লক্ষ্মণ বিভীষণ একেবারে নগরের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়েছে।

প্রশ্ন জাগে লঙ্কা একটি দ্বীপ না নগরী। এ সম্পর্কে মধুসূদনের কল্পনাতেও একটু অস্পষ্টতা ছিল। কোথাও কেবল প্রাচীরবেষ্টিত নগরীটিকে বোঝান হয়েছে, কোথাও সমগ্র দ্বীপটিকে। রাবণের রাজত্ব সমগ্র দ্বীপ ব্যাপীই ছিল। রাজধানী লঙ্কা নগরী ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত। সমুদ্র পার হয়ে শত্রুসৈন্য রাজ্যে প্রবেশ করেছে কিন্তু প্রাচীর-বেষ্টিত নগরীর অভ্যন্তরে সমগ্র ঐশ্বর্যসহ প্রজাব্দবৃ ও

সৈন্যবাহনী নিরাপদে রয়েছে। গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে কবির মনে প্রাচীন গ্রীসের City State-এর ধারণাটি প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। একটি শহরই সেখানে একটি রাজ্য। সেই অনুসারে প্রাচীর বেষ্টিত লঙ্কার কনক নগরীই রাবণের সাম্রাজ্য। আবার তারই বর্ণনায় সমুদ্র-বেষ্টিত লঙ্কা—যা নাকি প্রাচীরে বাইরের শত্রু সৈন্য বেষ্টন, তার বাইরে যুদ্ধক্ষেত্র, দূরে ইন্দ্রজিতের প্রমোদ উদ্যানের 'বৈজয়ন্ত ধাম সম পুরী', সরোবর তীরের চণ্ডী দেউল সব কিছু নিয়ে—তাকে একটি বিস্তৃত রাজ্য বলেই মনে হয়। রাবণ তারই অধীশ্বর। সীতার উক্তিতে 'সাগরের ভালে সখি, এ কনকপুরী রঞ্জনের রেখা।[১৪] লঙ্কা দ্বীপকেই বোঝানো হয়েছে। এই পুরীর ভৌগোলিক অবস্থানও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চবটি বন থেকে রাবন সীতাকে হরণ করে পুষ্পক রথে আকাশ পথে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পর্বত অরণ্য অতিক্রম করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে পৌছেছে।

রুদ্ধকক্ষ যজ্ঞশালাতে লক্ষ্মণ বিভীষণ প্রবেশ করল অদৃশ্যভাবে তখনই চরম মুহূর্ত সমুপস্থিত হল। কোশাকুশি নিয়ে ইন্দ্রজিত একাকী পূজায় বসেছে। জ্যোতির্ময় বেশধারী লক্ষ্মণকে দেখে আরাধ্য দেবতা বৈশ্বানর বলেই তার ভ্রম হয়েছে। লক্ষ্মণের পরিচয় জানতে পেরে নিরস্ত্র বীর প্রথমেই বলেছে—'ছাড় দ্বার যাব অস্ত্রাগারে'। বোঝা যায় কবির ভূমি পরিকল্পনায় অস্ত্রাগার সন্নিকটেই। বিভীষণকে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখতে পেয়ে বীরের ক্ষুব্ধ উক্তি—

> 'এতক্ষণে, অরিন্দম কহিলা বিষাদে
> জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিলা
> যজ্ঞাগারে.'[১৫]

লঙ্কার রাস্তাঘাট, দুর্গের গোপন প্রবেশদ্বার ইত্যাদি অতি পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া জানা সম্ভব নয়—সেই ইঙ্গিতই বহন করছে। অভিজ্ঞ সেনাপতির মানসপটে যেমন সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে বিরাজ করে এবং তদনুযায়ী তিনি সুকৌশলে যুদ্ধ প্রকরণ প্রস্তুত করেন তেমনি রাক্ষস সৈন্যসজ্জা, তাদের রণবেশ, শোভাযাত্রা, গতিপথ ইত্যাদি এবং শত্রু-সৈন্যের অবস্থিতি ও চলাচল কবি মধুসূদন নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন। লঙ্কার শোভা বর্ণনা বা বিভিন্ন কাহিনীবৃত্তের স্থান নির্দেশে ছোটখাট অসংগতি চোখে পড়লেও যুদ্ধ

বিষয়ে কোন অসংগতি ধরা পড়ে না। ইলিয়াড কাব্য খুঁটিয়ে পড়ার ফল কিনা জানি না।

এই যজ্ঞাগার কল্পনা ও ইন্দ্রজিৎ বধ বর্ণনা মধুসূদনের সম্পূর্ণ মৌলিক। বাল্মীকি রামায়ণে আছে মৃত্যুর দিনে ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতামূর্তিকে বানর সৈন্যের সামনে খড়্গদ্বারা ছেদন করল। তাতে রাম শোকে মুহ্যমান হলে বিভীষণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে "আজ সে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম করবে, সেখানে অগ্নি ও দেবগণ গেছেন। এই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সে সংগ্রামে দুর্ধর্ষ হবে, তার ফলে আমরা সকলেই তার হাতে মরব। পাছে যজ্ঞে কোনও বিঘ্ন হয় সেজন্য সে মায়াদ্বারা বানরদের বিমোহিত করেছে। রাম, তুমি মিথ্যা শোক ত্যাগ করে এখানেই থাক, আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাব, লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে যজ্ঞ পণ্ড করবেন।"[১৬]

যজ্ঞ সমাপনান্তে মহাবনে নীল মেঘতুল্য ভীমদর্শন বটবৃক্ষের তলে ভূতগণকে উপহার দেবার পর যুদ্ধ করতে গেলে সে অবধ্য হবে। তাই লক্ষ্মণ আগেই তার সৈন্য ক্ষয় করতে আরম্ভ করল। সেনাগণ বিধ্বস্ত হচ্ছে শুনে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাম-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। মৃত্যুর পূর্বে সে নানাপ্রকার মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্রবাণে শিরস্ত্রাণ ও কুণ্ডলভূষিত ইন্দ্রজিতের মস্তক দেহচ্যুত হয়ে ভূতলে পড়ল। কৃত্তিবাস-রামায়ণে আছে লক্ষ্মণ সৈন্য সমেত গড়ের দ্বার ভেঙে প্রবেশ করেছে এবং যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়েছে:

"গড়ের নিকট উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশ সকল॥"[১৭]

মধুসূদনের গড় বা দুর্গের ধারণাটা এখান থেকে পাওয়াও অসম্ভব নয়। কৃত্তিবাস যজ্ঞস্থান বটবৃক্ষ তলাতেই নির্দেশ করেছেন:

"মেঘবর্ণ বসে আছে বটবৃক্ষতলে।
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নাম নিকুম্ভিলে॥"[১৮]

বানর সৈন্যের নানা উৎপাতে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, মায়া দ্বারা রথ, রথাশ্ব এবং যুদ্ধবেশ সৃষ্টি করে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। বিপক্ষীয় অস্ত্রজালে বিভ্রান্ত হয়ে একবার

"ইন্দ্রজিৎ পালায়ে লঙ্কায় যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে ॥"[১৯]

গড়ের দ্বার ভেঙে তারা প্রবেশ করেছে। আবার সেখান থেকেও ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাতে পালাতে চেষ্টা করে—এ বর্ণনা লক্ষণীয়। তবে কি গড় লঙ্কার বাইরে? অনুরূপ সংস্থান মধুসূদনের কাব্যেরও স্থানে স্থানে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণের ব্রহ্ম-অস্ত্রে (ঐন্দ্রাস্ত্র নয়) ইন্দ্রজিতের মৃত্যু। মধুসূদন কিন্তু রণক্ষেত্রে মৃত্যু দেখালেন না। রুদ্ধকক্ষ যজ্ঞাগারে একাকী নিরস্ত্র বীর আক্রান্ত হ'ল, তার ক্ষণিক মনোবিকার ও ভীতির সঞ্চার, পরমুহূর্তে পুজোপকরণকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহারের চেষ্টা, মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণের অস্ত্রাকর্ষণে ব্যর্থতায় বীরের অভিমান এবং অন্তিম মুহূর্তে মাতৃ-পিতৃপদদ্বয় এবং প্রেমময়ী পত্নী প্রমীলাকে স্মরণ—সব মিলে আশ্চর্য বাস্তব এবং মানবিক হয়ে উঠেছে। এমন উল্কা পতনের পর সিদ্ধকাম লক্ষ্মণ যখন শোকাকুল বিভীষণকে বলে—'যাইব চল যথায় শিবিরে চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে,[২০] তখন বিভীষণের মতোই পাঠকও অতল বেদনার ভাব-বিহ্বলতার জগৎ থেকে অকস্মাৎ রূঢ় বাস্তব জগতে ফিরে আসে। যে পশ্চিম দ্বার থেকে তাদের যাত্রা সুরু হয়েছিল সেখানেই আবার ফিরে চলল দুজনে।

তারপর রাবণের যুদ্ধযাত্রা। নিদারুণ শোকসংবাদ রাবণকে রুদ্রতেজে প্রজ্বলিত করল। প্রতিহিংসায় পরিণত শোক রাবণের হৃদয়কে উদ্‌বেল সমুদ্র-বিক্ষোভের মত রণোন্মাদ করল। 'অরাম অরাবণ বা হবে ভব আজি'—এই প্রতিজ্ঞায় সমগ্র লঙ্কায় সমরসজ্জার আয়োজন—তার সঙ্গে প্রকৃতিও উন্মত্তা হয়ে উঠল। জীমূতগর্জনে, চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ বিদ্যুৎ ঝলকে—লঙ্কায় যেন প্রলয় সমুপস্থিত। এ সময়ে যে সৈন্যদল চারদিকের দ্বার দিয়েই বেরোবে—তাই তো স্বাভাবিক।

"যক্ষ গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে।
গবাঁক্ষ-দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারিদ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গর্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।[২১]

এই যুদ্ধটা হয়েছে প্রাচীরের বাইরে, যুদ্ধান্তেও রাবণ ফিরে এসেছে প্রাচীরের ভিতরে। রাবণের উন্মত্ত রোষাগ্নি শক্তিশেল রূপে লক্ষ্মণকে মুহ্যমান করল। তাকে পুনরুজ্জীবিত করার উপায় দশরথের কাছে জেনে আসতে রামের পাতালে দীর্ঘপথ যাত্রার বর্ণনা অষ্টম স্বর্গ ব্যাপী। সে পথ বর্ণনায় নানা পুরাণের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে ভার্জিল দান্তে ও কাশীরামের অনুকরণ। বিশ্বাস-যোগ্য বাস্তব ভূ-বিন্যাসও সেখানে অপ্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে দ্বিতীয় সর্গে ত্রিদশ আলয়ের দেবদেবীগণের কার্যকলাপের কোন কাল পরিমাণ বা স্থান নির্দেশ করেন নি কবি। স্বর্গের কাহিনী যখন আরম্ভ হ'ল তখন সন্ধ্যা—'উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ আলয়ে' আর সন্ধ্যার পরে প্রমীলা সখী নৃমুণ্ডমালিনী-সহ যখন রামচন্দ্রের শিবিরে উপস্থিত হয়েছে তখন দেব-অস্ত্র রাম-শিবিরে পৌঁছে গেছে। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে দীর্ঘ প্রস্তুতি, চক্ষের পলকে তা পরিসমাপ্ত। মানবলোকের সময় দিয়ে দেবগণের আচরণকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই বহু যুগ সময়ে তাঁদের এক মুহূর্ত। ইলিয়ডের কবিও দেবগণের কার্য বর্ণনায় কাল নির্দেশ প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁদের কার্য স্থান নির্দেশ, যাতায়াতের পথ বা দিক্ নির্দেশ করাও কবি মধুসূদন প্রয়োজন মনে করেন নি। মানুষের মাপে তাঁদের বিচার চলে না। লঙ্কা থেকে লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন, রতির সহায়তায় সাজসজ্জা সেরে ভবানী যোগাসন শৃঙ্গে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়ে মেঘনাদ নিধনের উপায় জেনে নিলেন, মায়াদেবীর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে চিত্ররথ মর্ত্যে রামশিবিরে পৌঁছে দিলেন—এসব ঘটেছে নিমেষের মধ্যে। তেমনি কে কেমন করে, কোথায়, কোন্ পথে গেলেন তারও কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ পাই না। ইচ্ছা মাত্রেই দেবগণের কাযসাধন হয় এটাই হয়তো কবি দেখিয়েছেন। মায়াদেবীর সাহচর্যে তাই রাম অনায়াসে পাতালে গমন করলেন। রামায়ণে রামের বহু অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মেঘনাদবধ আধুনিককালের কাব্য, মনুষ্যত্বের মহিমাই একাব্যের বাণী, তাই রামের অলৌকিক শক্তি বা দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি, রাক্ষসেরও কোন মায়াশক্তির বর্ণনা নেই। চরিত্রগুলি নিজেদের দেহবল ও চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়েই চিরকালের মানুষ হিসাবে সার্থক। কেবল মায়ার সহায়তায় লক্ষ্মণ অদৃশ্য রূপে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে এবং রামচন্দ্র পাতাল পরিভ্রমণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে এই অপ্রাকৃত বর্ণনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের কবিত্বশক্তি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে, এই সর্গটিই তাঁর দুর্বলতম রচনা। আর লক্ষ্মণও যখনই মায়ার ছলনা আশ্রয় করেছে, মনুষ্যত্বের বিচারে ইন্দ্রজিৎ রাবণের কাছে তখন সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। দেবতা ও মানুষের আচরণের সুস্পষ্ট পার্থক্যই মধুসূদন সচেতনভাবেই বজায় রেখেছেন। ষষ্ঠ সর্গে মায়াদেবী যখন কমলার স্বর্ণ-দেউলে অবতীর্ণ হলেন তখন তার কোন পথ নির্দেশ নেই। অথচ পরক্ষণেই লক্ষ্মণ বিভীষণকে নিয়ে অগ্রসর হবার সুবিস্তারিত পথ বর্ণনা, স্থান ও দিক্‌নির্দেশ। এর মধ্য থেকেই মধুসূদনের কাব্য রচনার গভীর প্রেরণার স্বরূপটি অনেকাংশে ধরা পড়ে।

আবার নবম অর্থাৎ শেষ সর্গে পাই সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ। বীর শ্রেষ্ঠ পুত্রের শোকে নিয়তি-নির্জিত রাবণ পুত্রের যথাবিধি সৎক্রিয়া করবার জন্য সাতদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখার অনুনয় জানিয়ে রাক্ষসসচিবশ্রেষ্ঠকে পশ্চিম দিকে রামের শিবিরে পাঠাল। সে শিবির প্রাচীরের বাইরে, সমুদ্রতীরে। রাম সম্মত হলেন। তিনি ধার্মিক এবং বীর। বিপক্ষীয় বীরকে সম্মান দেখানো বীরধর্ম। তাছাড়া প্রেতক্রিয়া তো ধর্মেরই অঙ্গ। 'ধর্মকর্মে রত জনে কভু না প্রহারে ধার্মিক।'[২২] ইন্দ্রজিতের মৃতদেহ ও চিতারোহণে-কৃতসঙ্কল্পা প্রমীলা সহ শোভাযাত্রা ধীর গতিতে এগিয়ে চলল। শববাহী রথে পতির মৃতদেহের পাশে প্রমীলা। রথের চূড়ায় ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজা। রথের আগে আগে চলেছে হস্তীপৃষ্ঠে দুন্দুভিবাদক ; দুধারে ধ্বজাবাহী দল। রথের পশ্চাতে পদব্রজে চলেছেন শোকবিবশ রাবণ, তাঁকে ঘিরে মন্ত্রীদল। শোভাযাত্রার পশ্চাৎভাগে আবালবৃদ্ধবনিতা রক্ষোপুর-বাসী। তাদের পদভরে ধূলা উড়ছে আকাশে। কি সুস্পষ্ট বিন্যাস !

"ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ নিনাদে।"[২৩]

নগরপ্রাচীরের পশ্চিমদ্বার অশনিনিনাদে খুলে বেরিয়ে এল শোভাযাত্রা। দশ শত রথীসহ অঙ্গদ চলল তার পিছনে বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনহেতু। দূরে অশোক কাননে বসে বৈদেহী সরমার মুখে শুনলেন—"সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে প্রেতক্রিয়া হেতু।" তারপরে—

'উতরি সাগরতীরে রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ।"[২৪]

চিতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'ল।

"সচকিত সবে
দেখিলা অগ্নের রথ; সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসব বিজয়ী
দিব্য মূর্তি! বামভাগে প্রমীলা রূপসী।"[২৫]

অগ্র পশ্চাৎ, দক্ষিণ বাম, ঊর্দ্ধ অধঃ সমস্ত দিক ব্যাপী এক বিষণ্ণ অথচ রাজকীয় মহিমাময় চিত্র। অবশেষে জাহ্নবী জলে (এখানে সমুদ্রের পবিত্র বারি বোঝাচ্ছে) চিতা ধৌত করে রিক্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে সকলের লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন। কাব্যের পরিসমাপ্তিতে কবি রাবণের অতল বেদনার এক অপরূপ ক্লাসিক চিত্র রচনা করলেন। সমগ্র কাব্যব্যাপী লঙ্কারাজ্যের ঘটনাবলীর যে স্থান-ভিত্তিক স্পষ্ট বর্ণনা, এখানে তার চরম সার্থকতা। সমুদ্র বেলার ঊষর রিক্ততার পটভূমিতে রাবণ হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি।

মধুসূদন রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ বধের সংক্ষিপ্ত এবং অনেকাংশে অপ্রধান কাহিনীটিকে তাঁর মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য করলেন। পুরাণের অলৌকিক এবং অনতিস্পষ্ট কাহিনীটিকে কাল্পনিক বিস্তার দিতে গিয়ে তাকে এমন সুস্পষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত ভৌগোলিক স্থান ও দিক্‌নির্দেশের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারলেন যাতে তা একান্তভাবে বাস্তব ও মানবিক হয়ে উঠল। তাই কাব্যটি তাঁর আধুনিক চিন্তাভঙ্গীর একটি নিঃসংশয়িত প্রমাণ হয়ে রইল।

১. যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৫৬।

২. যুদ্ধকাণ্ড ২৬ সর্গ, ৫ শ্লোক

৩. কৃত্তিবাসী, রামায়ণ (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত) লঙ্কাকাণ্ড, বানর কর্তৃক লঙ্কায় দ্বার রক্ষাকরণের নির্ণয়।

৪. মেঘনাদবধ, ১ সর্গ, ২৩৮-৪১ পংক্তি

৫. ঐ ১ সর্গ ৭১১-১৩ পংক্তি

৬. ঐ, ১ সর্গ, ৬১০-১১ পংক্তি।

৭. ঐ, ৪ সর্গ, ৬৮১-৮৩ পংক্তি।

৮. ঐ, ৪ সর্গ, ৬৪৮ পংক্তি।

৯. ঐ, ৫ সর্গ, ১১৭-১৮ পংক্তি।

১০. ঐ, ৫ সর্গ, ২০৩-০৫ পংক্তি।

১১. ঐ, ৫ সর্গ, ৩৪৮-৪৯।

১২. ঐ, ৫ সর্গ, ৫৭৮-৮০ পংক্তি।

১৩. ঐ, ৬ সর্গ, ৫৩৬-৩৬ পংক্তি।

১৪। ঐ, ৪ সর্গ ৬২৯ পংক্তি

২৫ ঐ, ৬ সর্গ ৫২০-২২ পংক্তি

১৬ রাজশেখর বসু কৃত অনুবাদ. যুদ্ধকাণ্ড, ২২ পরিচ্ছেদ

১৭, ২০. কৃত্তিবাসী রামায়ণ (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, লঙ্কাকাণ্ড, ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন ও মায়াসীতাবধ এবং ইন্দ্রজিতের পতন।

২১. ঐ, ৭ সর্গ, ৪৮৫-৮৯ পংক্তি

২২. ঐ, ৯ সর্গ, ১০১-০২ পংক্তি

২৩, ঐ, ৯ সর্গ, ৩১০-১১ পংক্তি

২৪, ঐ, ৯ সর্গ, ৩৩৮-৩৯ পংক্তি

২৫. ঐ, ৯ সর্গ, ৪২৪-২৭ পংক্তি

শিল্পকর্মের দুই আশ্চর্য দিগন্ত : রামকিংকর ও গোপাল ঘোষ

অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী

১.

ভারা বেঁধে কাজ হচ্ছিল, রামকিংকর টোকা মাথায় রিক্সা থেকে নামলেন, অসুস্থ ছিলেন। আসাম সরকারের জন্য গান্ধীজীর ভাস্কর্য—নন্দলালের ডাণ্ডী অভিযানের আদলে—পাদপীঠে ভাঙাচোরা দুর্গ প্রাসাদ ও নর করোটির আভাস—সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শক্তির অনিবার্য ধ্বংসের আভাস (যদিও রামকিংকর কখনো কখনো দাঙ্গার পটভূমিকায় নন্দলালের ডাণ্ডী অভিযান এর আদলে তৈরী বলেছেন) নিয়ে তখন সমাপ্তির মুখে। তখন দুপুর। রামকিংকরের প্রায় সব মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য রাঢ়বঙ্গের গ্রীষ্মের দুঃসহ দুপুরে করা। তাঁর নিজের কথায় "আমি কাজ করেছি দিনের বেলায় প্রখর রৌদ্রে। গ্রীষ্মকাল আমার বড় প্রিয়। যদিও বীরভূম গ্রীষ্ম দারুণ দুঃসহ তবুও এই সময়টা আমার প্রয়োজনে লাগত।" ঠা ঠা রোদ্দুরে পাখপাখালি পালানো গ্রীষ্মে খাঁ খাঁ, প্রায় জনশূন্য শান্তিনিকেতনে কখনো সিমেণ্ট মোরাম ছুঁড়ে মারছেন, কখনো ছেনী হাতুড়ি চালাচ্ছেন—প্রিয় শিষ্যদের সাক্ষাতেই প্রমাণ চারপাশের চেনাশোনা মানুষের সঙ্গে তার মিল নেই,—না জীবনচর্চায় না শিল্পকলায়। বাড়ীতে অর্থাৎ প্রায় ঘুপচি আঁধার ঘরে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা একই দৃশ্য দেখেছেন। আদুল গা বা ফতুয়া লুঙ্গি পরা রামকিংকর চেয়ারে বা তেলচিটে বিছানায় বসে—ছড়ানো ছিটানো এদিক সেদিকে কিছু ভাস্কর্য কিছু ছবি—বিড়ির বাণ্ডিল সস্তা সিগারেট। চৌকির তলায় কেউ দেখেছেন চিঠির বাণ্ডিল, খালি-বোতল বা ডালডার কৌটো। সম্পত্তি বলতে নিজের আঁকা ছবি। বিক্রী করতে চাইতেন না, তবে গুরু নন্দলাল যেমন অসংখ্য পোষ্টকার্ড স্কেচ্—চিঠি লিখেছেন বিলিয়েছেন—রামকিংকরও তেমনি। অনেকের কাছেই রামকিংকর আছে—যা চেয়ে আনা বা হাতিয়ে আনা। টাকা পয়সা রোজগার করেছেন কিন্তু উড়িয়ে দিয়েছেন। টাকার জন্য নিজের সৃষ্টি বিক্রী করতে চান নি।

অহিভূষণ মালিক লিখেছেন, 'I asked him if his works were for sale. He promptly replied "No". He is so fond of his works, he thinks them to be his son. How can one sell one's children.' কিন্তু তাঁর অনেক ছবিতে যেমন খেটে-খাওয়া দম্পতিযুগল অথবা জনমজুর মা যখন ফসল বুনছে বা ফসল তুলছে পাশে অনিবার্য কারণেই পড়ে আছে সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে অনাদৃত শিশু ঠিক তেমনি তাঁর আঁকা ছবি কী ভাস্কর্যও তেমনি অযত্নে পড়ে থেকেছে। K. G. Subramanyam তাই রামকিংকরকে ক্ষ্যাপা বাউল আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, "An artist crazy with his art, lost so much in his search as to forget both his person and his product, not concerned in the least whether it brought him name or fame or success." অধ্যক্ষ দিনকর কৌশিক অবশ্য এগুলি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাঁকুড়ার যুগীপাড়ার যে ছেলে পটোপাড়ায় মূর্তি গড়ত, থিয়েটারের সীন আঁকত বা তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের ছবি আঁকত আন্দোলনের খাতিরে—চোখে পড়ে গেল সে 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের, অবনীন্দ্রনাথ যাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে ঘরে। আজ বুঝতে পারি—আমাদের আর্ট ও আর্টিস্টদের কতখানি কল্যাণ তিনি করে দিয়ে চলে গেলেন।" এই শিল্পপ্রাণ জহুরীর চিঠি নিয়ে রামকিংকর এলেন শান্তিনিকেতনে। নন্দলাল ছবি দেখে বললেন 'তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?' একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা দু তিন বছর থাকো তো।" (মাষ্টারমশাই—রামকিংকর। নন্দলাল সংখ্যা দেশ, ১৩৮৩) কলাভবনে ছিল চিত্রকলা ভাস্কর্যের নানা গ্রন্থ, প্রিণ্ট। এছাড়া ১৯২১ থেকেই স্টেলা ক্রামরিশ পাশ্চাত্ত্য শিল্প-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতেন। রামকিংকর প্রসঙ্গে কিউবিজম্, সুররিয়ালিজম্, এক্সপ্রেসনিজম্ ইত্যাদি ধারার প্রভাব সম্পর্কে অনেকেই বলেন। ছবির প্রিণ্ট এবং আলোচনায় রামকিংকর এগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া বা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন ঠিকই, ছবিতে পিকাসোর কিছু প্রভাব বা ভাস্কর্যে রদাঁর সামান্য প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকলেও কী অবনীন্দ্র নন্দলাল এর ওয়াশ বা নব্য ভারতীয় চিত্ররীতি তাকে যেমন গ্রাস করে নি, তেমনি পাশ্চাত্ত্য শিল্পধারারও

যেমন অনুকরণ করেন নি তেমনি বিশেষ প্রভাবও নেই। শ্রদ্ধেয় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় গগনেন্দ্রনাথের কিউবিজম্ এর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কিউবিজম্ এর তফাৎ আবিষ্কার করেছেন—রামকিংকর সম্পর্কেও এ সত্য প্রযোজ্য। আচার্য নন্দলালের কাছে শিল্পশিক্ষা ছাড়াও অস্ট্রিয়ার শিল্পী লিজভন্‌পট এবং বিশেষ করে মিসেস মিলওয়ার্ডের কাছে শিক্ষা প্রাথমিক ভিত গড়ে দিয়েছে তাঁর—নন্দলাল যাঁকে বলেছেন "তুমি তো সবই জানো।" কী ভাস্কর্যে কী আঁকা ছবিতে রামকিংকর নিজস্ব শৈলী অনবরত কাজের মধ্য দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে বের করেছেন। তাঁর নিজের কথায় 'ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার সময় বার বারই যে কথাটা আমার মনে হতো, আমাকে স্বতন্ত্র হতে হবে। ভীষণভাবে স্বতন্ত্র; কোনো স্কুল অব আর্ট এর যোগ্য উত্তরসূরী বা অন্য কারোর মতো ছবি আঁকা—এসব করলে আমি নিজে শিল্পী হিসাবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত হ'তে পারবো না। এক্ষেত্রে আমাকে স্বার্থপর হতেই হ'বে। সেই সময় আমি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতাম, কোন্ আঙ্গিক বা মিডিয়াম, কোন্ বিষয়, কোন্ শৈলী এখনো ব্যবহৃত হয় নি।' মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যে র‍ঁদা, এপস্টিন, মূর, ব্রাঁকুসি অবিস্মরণীয়। রামকিংকরের অধিকাংশ ভাস্কর্য মুক্তাঙ্গণ ভাস্কর্য—তিনি নিজেই বলেছেন "আমার প্রায় সমস্ত মূর্তিই খোলা আকাশের নিচে। ঘরের চৌহদ্দি থেকে আমি তাদের মুক্তি দিতে চেয়েছি।" র‍ঁদার সঙ্গে নিজের এই মিল রামকিংকর নিজে খুঁজে পেয়েছেন যে র‍ঁদার মতই তাঁর "প্রায় সব কটা মূর্তিই মুভিং। স্থবিরতায় আমার বিশ্বাস নেই।"…র‍ঁদাও তাই। বলতেন, 'মুভ মুভ। মুভমেণ্ট না হলে ক্যারেকটার জীবন্ত হয় না।" এ উক্তি যথার্থ। চলিষ্ণুতা এবং গতিময়তা তাঁর মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যের বড় বৈশিষ্ট্য—তাই এগুলি প্রাণবন্ত। গাছগাছালির মধ্য দিয়ে পায়েসের বাটি মাথায় 'সুজাতা' এগিয়ে চলেছে—ব্ল্যাক প্যাগোডা কি সঙ্গীত ভবনের আশেপাশে অথবা বিদ্যাভবন ছাত্রী আবাস এর আশেপাশে দাঁড়ালে,—নৈরঞ্জনা নদী তীরের 'সিদ্ধার্থে'র (তখনও তিনি বুদ্ধদেব হন নি) অভিমুখে—এ অভিজ্ঞতা জোছনা-ধোওয়া রাতে শান্তিনিকেতনে হয়।

বিদ্যাভবনের ছাত্রী আবাসের সামনে দাঁড়ালে তখন চোখে পড়বে মোষ-মাছ ভাস্কর্য। চোখে দেখা এক তাৎক্ষণিক মুহূর্ত ধরা আছে এই ভাস্কর্যে। "বাঁধ ছিল ভুবনডাঙায়। সব মোষ যেতে যেতে জলে পড়ে গেলো। আদ্ধি

দাঁড়িয়ে দেখলাম। লেজ দিয়ে গায়ে জল ছেটাচ্ছিলো। ওটা আমার মাছের মতো লাগলো।" এখানেও সেই চলিষ্ণুতা, গতি। ছাত্রী আবাসের পিছনে গান্ধীজী পথ মাড়িয়ে চলেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে—সাম্রাজ্যবাদীদের শাষক শোষকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে—মুহূর্তে চোখে ভাসে ডাণ্ডী অভিযানের সঙ্গীরাও যেন পিছনে ছুটছেন। কলাভবনের চৌহদ্দিতে আছে 'কলের পথে'—ভোরবেলায় কলের বাঁশি বাজছে, দেরী হ'বে—ছুটে চলেছে দুই সাঁওতাল যুবতী, পেছনে খেলতে খেলতে ছুটছে ছোট্ট একটা ছেলে। ভেজা কাপড় হাওয়ায় উড়ছে—শুকোচ্ছে, বাতাসে—কাঁচা রোদ্দুরে—পুরুষ্টু বাহু, বুক, উরুসন্ধি, জানু—আঁকা ছবির মেহনতি মানুষের সঙ্গে এর তফাৎ আছে—হাসি ঝলমল মুখ দুই যুবতীর। চোখে-দেখা সাঁওতাল যুবতীর প্রচণ্ড প্রাণশক্তির এবং গতির প্রকাশ এখানে। একটু দূরেই সাঁওতাল পরিবার (দুঃখের কথা, রামকিংকরের জীবদ্দশাতেই অনেকেই কলের পথে বা কলের বাঁশী এবং সাঁওতাল পরিবার গুলিয়ে ফেলছেন।) ফটোর নীচে পরিচয়ে এই ভুল যা এই মুহূর্তে মনে পড়েছে—১. সুজাতার মডেল বিখ্যাত শিল্পী জয়া আপ্পাস্বামীর অবনীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অ্যাণ্ড দি আর্ট অব হিজ টাইম—যে বই বেঙ্গল-স্কুল সম্বন্ধে জানতে হ'লে অপরিহার্য সেখানেও এই ভুল। ২. বিড়লা একাডেমীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা ১৯৭২ এর মার্চ এপ্রিল-এ রামকিংকরের ভাস্কর্য, তৈলচিত্র, জলরঙ ও ছাপাই ছবি এবং বেশ কিছু স্কেচের প্রদর্শনী করেছিলেন; কিন্তু তাঁদের ক্যাটালগে সাঁওতাল পরিবারের নীচে ছাপ আছে 'Way to market' (ক) আর কলের বাঁশী নীচে ছাপা 'Santhal family.' ৩. প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়ুর পর বেঙ্গল স্কুল বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ছবি প্রচুর ছেপেছেন আনন্দবাজার-দেশ পত্রিকা। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু ৭ই মের 'আনন্দমেলা'য় কলের বাঁশির নীচে ছাপা হয়েছে 'সাঁওতাল দম্পতি' (ক) হাটের পথে এছাড়া শুভময় ঘোষের প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণে (দেশ বিনোদন ১৩৮২) ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে হারভেস্টার ভাস্কর্যের নামকরণ করা হয়েছে 'ছিন্নমস্তা'। একটি লিটল ম্যাগাজিন (স্বকাল) এ দেখলাম Head-less মানুষটি ধান ঝাড়ছে। ছবির প্রচুর প্রতিলিপি ছাড়া পাঠকের বুঝে উঠতে অসুবিধা হতে পারে ছবির নামে—যেমন বিড়লা একাডেমীর আলোচনা ও ছবি-সমৃদ্ধ ক্যাটালগে যা 'Autumn' দেশ বিনোদনে

তাই 'ক্লান্তি'। সাঁওতাল পুরুষের কাঁধে বাঁক—গোটা সংসার—জিনিষপত্র এবং ছোট ছেলে বাঁকে, সাথী যুবতী স্ত্রী—যার মাথায় বোঝা, এগিয়ে চলেছে প্রিয় কুকুরকে নিয়ে ধান কাটার মরসুমে কাজের ধান্ধায়। এখানেও গতি। এই প্রাণশক্তি ও গতিময়তার চূড়ান্ত প্রকাশ ১৯৩১ এর কাস্ট স্টোন এর মিথুন।

কিছুদূরে এ্যাগ্রোর সামনে আছে ভিস্তিওয়ালা-চামড়ার থলি থেকে দেহ বেঁকে চুরে উবু হয়ে জল ঢালছে ভিস্তিওয়ালা। রামকিংকর নিজেই অবশ্য বলেছেন এটি "সুরেন আর আমি দুজনে মিলে করি।" জল রঙে আঁকা এক পা তুলে ছুটে-যাওয়া ঘোষ বা ঘোষের পিঠে বসা ঘরে-ফেরা মানুষ অথবা জলের মধ্যে সন্তরণশীল মাছের ছবিতেও এই গতি। দর্শন বিভাগে পুরোনো দোতলা বাড়ির চৌহদ্দিতে যে কম্পোজিশন আছে তাতে নারী দেহের নানা আদল। অতিথি নিবাসের বাতিদানে আছে পাখীর আদল। স্থির ভাস্কর্য (প্রতিকৃতি ভাস্কর্য বাদ দিয়ে) বলতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যক্ষ-যক্ষী—এর জন্য রামকিংকর প্রচুর খসড়া মূর্তি গড়েছিলেন।

রামকিংকর যখন কাজ শুরু করেন তখন ভাস্কর বলতে পুরুষানুক্রমে যারা পাথর কাজ করেন—উড়িষ্যা রাজস্থানের শিল্পীরা; দক্ষিণ ভারতের ধাতু, কাঠ, পাথর এর প্রথাগত শিল্পী এবং ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অ্যাকাডেমিক ভাস্কর দু-তিনজন। এখনও অধিকাংশ মানুষ দাঁড়ানো বা বসা কৃষ্ণনগরের 'ছাচের পুতুল'কে ভাস্কর্য মনে করেন। কলকাতার অধিকাংশ ভাস্কর্যই তাই—সেদেশে রামকিংকরের ভাস্কর্য নিয়ে ঝড় উঠবে, অথবা উদাসীনতা দেখা দেবে এ'ত স্বাভাবিক। রামকিংকরের রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছুদিন আগে ঝড় উঠল অথচ এটি অসাধারণ শিল্প-সৃষ্টি। যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ঝড় উঠত তাও বুঝতাম—যদিও অহিভূষণ মালিক এটি সম্পর্কে লিখেছেন, "The revolt against the cliches of academic art is complete, yet no one will mistake it for something other than a portrait of the poet."

প্রাচীন কাল থেকেই মাটি এবং নারী—যা ফসলের আধার—মানুষের বিস্ময় শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রীতি লাভ করেছে—জীবনের প্রয়োজনেই। এই 'ফার্টিলিটি কাল্ট' থেকেই ভারী উরু স্তন এর মাতৃকামূর্তি শত সহস্র পাওয়া গেছে—পৃথিবীর নানা জায়গায়। তাছাড়া ভারতবর্ষ সন্তান উৎপাদনকেও শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এর একটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ এবং একটি পঙ্‌ক্তির প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "সন্তান প্রজনন ক্রিয়াটিও শিল্পকর্ম যে শিল্পকর্ম অন্যান্য শিল্পের মতই ছন্দোময় বলে আত্মসংস্কারের অন্যতম উপায়।" রামকিংকরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, "Is sex an intensive creative force ?" রামকিংকরের সাফ জবাব, "Sex is everything—without sex everything is barren." নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "মানুষের ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তির আবেগকে নিয়মে সংযমে শাসিত করে শক্তিতে রূপান্তরিত করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শিল্প সাহিত্যের চর্চা, যেহেতু এই নিয়ম সংযমের অনুশাসন ছাড়া অর্থবহ শক্তিগর্ভ শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হতেই পারে না।" রামকিংকর তা পেরেছিলেন।

ভারতবর্ষ আদিম রিপুকে জীবন-এর অপরিহার্য অংশ মনে করেছে—খ্রীষ্টীয় 'আদিম পাপ'এর কোনো শুচিবাই তার ছিল না—ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্য যুগের স্থাপত্যে তাই এত মিথুন ভাস্কর্য। নরনারীর কামবদ্ধ ভাস্কর্যে দেহের শ্রী লাবণ্য যেমন ফুটেছে, তেমনি দেহগত মিলনের আনন্দ উল্লাস ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গ বেয়ে। ভারতবর্ষ দেহকে পাপ মনে করে নি; দেহকে মন্দির মনে করেছে; ঈশ্বরের আবাস অথবা আরাধ্য-আরাধ্যার সন্নিধানের সোপান মনে করেছে, তন্ত্রসাধক, বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থী, বাউল সম্প্রদায় সহ ভারতবর্ষের বহু উপাসক সম্প্রদায়। দেহ সম্বন্ধে ঘোমটা দেওয়া, ঘুণধরা, তুকপুকে নীতিবোধ রামকিংকরকে স্পর্শ করে নি। সাক্ষাৎকারে রামকিংকরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "Do you think this middle-class morality and sexual inhibition have crippled our art ?' রামকিংকরের জবাব, "The great artists of the classical and mediaeval India could produce such great works because they did not suffer from all these moral hang-ups. I believe in the freedom of an artist." (Hindusthan Standard : Diwali Annual 1972).

তাই রামকিংকর জীবনকে এঁকেছেন তার সমগ্রতায়;—তাঁর কলের বাঁশিতে তাই যুবতী দেহের জলতরঙ্গ—উপচে-পড়া যৌবন; মিথুন মূর্তিতে জীবনের উল্লাস, ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট এ রাখা ব্রোঞ্জ-এর রমণী মূর্তি

পুরুস্টু বাহুমূল, স্তন যৌবন নিয়ে উপস্থিত—'হারভেস্টার' এই ভাস্কর্যও তার সেই জীবন যৌবনের জয়গান গাইছে—নগ্নিকা মূর্তি শিল্পের চূড়া স্পর্শ করেছে। যে নারী ফসল কাটছে বা ফসলের মাঠে কাজ করছে জলরঙ তেলরংয়ের ছবিতে তারও শক্তসমর্থ দেহ ফুটিয়ে তুলেছেন রামকিংকর—প্রাচীন উর্বরতা শক্তির উপাসক, যেন মাদার গডেসের উপাসক রামকিংকর। প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে রামকিংকরের দক্ষতার পরিচয় রয়েছে গাঙ্গুলী মশাই, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, এবং অন্ততঃ দুতিনটি রমণী প্রতিকৃতিতে। জয়া আপ্পাস্বামী সঙ্গত কারণেই লিখেছেন, "Ramkinkar is also a remarkable portrait sculptor. His portrait of a lady in bronze and the portrait head of Mr. Ganguli are masterpieces of draughtsmanship power and feeling."

রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল রামকিংকরকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। প্রভাস সেনের লেখায় দেখছি মাস্টার মশাই মাঝে মাঝে রামকিংকরকে কাজের ফাঁকে বিড়ি কি চা খেতে ডাকছেন—একথা ঠিক, বিশ্বভারতীর সেই টানাটানির যুগে অল্প সিমেণ্ট এবং সহজলভ্য বালি কাঁকরে রামকিংকরকে ভাস্কর্য করতে হয়েছে—এগুলি ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে—রামকিংকর বেঁচে থাকতেই এগুলির কোন কোনটিকে ব্রোঞ্জে ঢালাই করা যেতো। অশুন্তি ছাঁচের পুতুল বসছে যত্রতত্র। অথচ এ শতকের ভারতের সেরা ভাস্করের ভাস্কর্য ধ্বংসের মুখে।

রামকিংকরের আঁকা ছবি প্রসঙ্গে। চলচ্চিত্র পরিচালক প্রয়োজনে যেমন দ্রুত সঞ্চরণশীল স্ন্যাপশট্ ব্যবহার করেন তেমনি কয়েকটি ছবি খুব দ্রুত চোখের সামনে ভেসে উঠে সরে যায়—বুকের কাছে হাত কনুই ভাঁজ-করে-রাখা সেই মহিলার প্রতিকৃতি তৈলচিত্র—দুটি চোখে যার জীবনের সব কামনা তৃষ্ণা জড়ো হয়েছে; জলরংএ ভারী স্তন নিয়ে বসে আছে যে মা-কুকুর, জলরংএ ঝরনা-তলার নির্জনে কলসী কাখে বালিকা, তৈলচিত্র গ্রীষ্মের দুপুর—যে দুপুরে ওরা কাজ করে, ১৯৪৮ এ জলরংএ আঁকা ছুটে-চলা অথবা খুটিতে-বাঁধা ঘোষ, শেওলা-সবুজ এর পটে কালচে সিঁদুরে লাল দুটি সর্বজয়া ফুল; মা ও শিশু (এচিং)—শিশু খাটিয়ায়, মা ঝুঁকে, শিশুর হাত মায়ের গলার মালার দিকে ভারী স্তন শিশুর ঠোঁটের দিকে এগোচ্ছে…এমনি কত ছবি।

একটানা ৫৫ বৎসর কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। সবচেয়ে আপন শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি বারবার এসেছে তাঁর আঁকা ছবিতে—"প্রত্যেক ঋতুরই নিজস্ব রং আছে, নিজস্ব আবেদন। এমন কি রাত দিন দুটোই আলাদা রূপ, ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। প্রতিটি ঋতুই সে অর্থে ইমপরট্যান্ট্। আমার জল-রঙে আঁকা বিভিন্ন ল্যাণ্ডস্কেপে এসব ধরার চেষ্টা করেছি।" শুধু জলরঙে নয় পাশ্চাত্যের নানা শৈলী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন তৈলচিত্রে—সেখানেও বীরভূমের শরৎকাল, বসন্তকাল, কোপাই নদী, তালগাছ এঁকেছেন। বীরভূম ব্যতীত পুরী, রাজগীর, শিলং এবং নেপালের প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন—আঁকা-আকারে ছোট এই দৃশ্যচিত্রগুলি রামকিংকরের একান্ত নিজস্ব অঙ্কনরীতির সৃষ্টি—চেষ্টা করেও কারুর প্রভাব আবিষ্কার করা যাবে না। কখনও সেজান কখনও পিকাসোকে প্রিয় শিল্পী বলেছেন, "I like Cezanne very much" বা "পিকাসো আমার ফেভারিট", হয়ত একটি দুটি ছবিতে চকিতে সেজান (যেমন ললিতকলার রামকিংকর ২নং ছবি) বা পিকাসো উঁকি মারলেও প্রভাব খুঁজতে যাওয়া জীবনানন্দের বনলতা সেন এ এডগার অ্যালান পো-র 'To Helen' কবিতার প্রভাবের চাইতেও নিরর্থক হয়ে পড়ে। জয়া আপ্পাস্বামী ঠিকই মূল্যায়ন করেছেন, "Even the smallest drawings and etching shows an original vision and monumentality.

২.

শিল্পী গোপাল ঘোষ কি ধাঁচের মানুষ ছিলেন তা জানতে বন্ধু বিনয় ঘোষের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিই যথেষ্ট;—বিনয় ঘোষ গোপাল ঘোষ এর সঙ্গে উড়িষ্যার কয়েকটি জেলার গ্রামগঞ্জ ব্যাপকভাবে ঘুরেছেন—"গোপাল ঘোষ শিল্পী কিন্তু তথাকথিত শিল্পীসুলভ ন্যাকামির কণামাত্র নেই তাঁর চরিত্রে। অত্যন্ত কর্মঠ, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত পাশ্চাত্য শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব নিজে করতে পারেন এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করতে পারেন। পর্বতশৃঙ্গেই হোক, আর পাতালেই হোক পথচলায় তাঁর ক্লান্তি নেই। গরুর মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেছে দেখছি, ঘোড়াকে দেখেছি শ্রান্ত হয়ে ধুঁকতে, কিন্তু শিল্পীবন্ধু গোপাল ঘোষকে কখনও পথচলায় ক্লান্ত হতে দেখি নি।

তাঁকে একমাত্র ষ্ট্রীমলাইন্‌ড্‌ স্টীমইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ফ্লাস্কে একটু গরম চা আর থলে-ভর্তি সিগারেটের টিন থাকলেই হল—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত তিনি হেঁটেই মেরে দিতে পারেন, অবিচ্ছিন্ন ধারায় ধূমপান করে এবং মধ্যে মধ্যে গরম চা দিয়ে একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে।"

শিল্পী গোপাল ঘোষ পর্যটক গোপাল ঘোষও বটে। তাঁর নিজের কথায় "ঘুরেছি তো অনেক সারা জীবন—সমস্ত সময়টা ঘোরাতেই কাটত—সাইকেল নিয়েও ঘুরেছি বহুবার। সারা ভারত আমার দেখা।" জন্ম কলকাতায়, ছেলেবেলা কেটেছে হিমালয়ের কোলে সিমলায়। বাবা ছিলেন সামরিক বিভাগের ক্যাপটেন। ছেলের হাতে রঙ তুলি কাগজ তিনিই ধরিয়েছিলেন ছেলেবেলাতেই। "ছবি আঁকার ব্যাপারে আমার বাবাই ছিলেন প্রেরণা।" উত্তর প্রদেশের দুটি শহরেও কৈশোর ও প্রথমযৌবনের দিনগুলি কেটেছে—বেনারস আর এলাহাবাদে। বেনারসের গলি, পাণ্ডা তীর্থযাত্রী নদী ঘাট দারুণ ছাপ ফেলেছিল—প্রচুর এঁকেছেন প্রাচীন এই তীর্থক্ষেত্র নিয়ে। এলাহাবাদে অসহযোগ আন্দোলনে মেতেছিলেন বলে এবং চিত্রকলার প্রতি পুত্রের ঝোঁক দেখে জয়পুরের মহারাজার চারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন পিতা। জয়পুরে ছিলেন ১৯৩১-৩৫। জয়পুর সমেত রাজস্থানও তাঁর খুব প্রিয়। জয়পুর থেকে সোজা সুদূর দক্ষিণে মাদ্রাজে—বলা বাহুল্য, ভারতের সব কয়টি কলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তখন গুরু অবনীন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ—বেঙ্গল স্কুলের দিকপালরা। মাদ্রাজে তখন অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ। সামরিক বিভাগের ক্যাপটেনের পুত্র সম্ভবতঃ পিতার কাছ থেকেই কিছু গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন—যার একটি নিয়মানুবর্তিতা। এরকম বলা হয় যে রোজ অন্ততঃ একটি ছবি গোপাল ঘোষ আঁকতেনই—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-আহ্নিক কি গোয়ালার গোসেবার মত তা ছিল প্রাত্যহিক। শুধু শিল্পের প্রতি ভালবাসা থেকেই নয়—এই ইয়োরোপীয় সুলভ নিয়মানুবর্তিতা এবং অধ্যবসায় তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমন কি রোগশয্যাতেও। শ্রীপ্রভাত গুহর সৌজন্যে হাসপাতালে-আঁকা গোপাল ঘোষ এর একটা স্কেচ-বই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। গোপাল ঘোষ নিজেই লিখেছেন—"'Tropical Hospital P. P. Ward Bed no 5. এসব ছবি এঁকেছি। ৮।১০।৫৬ তারিখ থেকে (বিকাল) আঁকা চলছে: এবার আর রেখায় sketch করি

না, বং এ প্রাণভরে ছবি আঁকি আর বই পড়ি।" : গোপাল ঘোষ ৭।১০।৫৬ সময় ৬টা কলিকাতা পাশে লিখেছেন "তিন বৎসর আগেও Same hospital ও একই ward এ Bed No 4 এ প্রায় মাসখানেক ছিলাম। তখন কয়েকশত রেখায় নানান ছবি আঁকি।"

এই স্কেচ বই এ ৭।১০ এ আঁকা ১০টি ছবি, ১১ তারিখে ৪টি, ১৪ তারিখে আঁকা ১১টি মোট ২৫টি ছবি আছে। নীল রং এর ছড়াছড়ি এ স্কেচ বইয়ে,—নীল আকাশ, নীল পাহাড়, নীল সবুজের অরণ্য। এছাড়া লাল, গোলাপী, বেগুনী, হলুদ আর সবুজের ব্যবহার আছে। কয়েকটি ছবির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে এ স্কেচ বইয়ের—১. নীল আকাশ, নীল সবুজের জমাট অরণ্যে কমলালেবু রঙ। পর্বতচূড়া। খুব ভোরে পর্বতচূড়ায় এমনই সূর্য ঝরে। ২. বিস্কুট-রঙা কাগজে সাদার পটভূমিতে সবুজ পত্রশূন্য বৃক্ষকাণ্ড, পাখী। ৩. নীল, ইটরঙা নদী নৌকা মাঝি আকাশ, নদীর দুপারেই পাহাড়—পাহাড়ে বেগুনে, নীল রং এর ছোঁয়া। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জিন্দাবাহার শহর ঢাকা ছেড়ে ছবি আঁকার জন্যই মাদ্রাজে পাড়ি জমিয়েছিলেন ক্যালকাটা গ্রুপের পরিতোষ সেন—যাঁর অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি, "আমার প্রথম চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেবীপ্রসাদের কাছে নয়, গোপালের কাছে। প্রত্যহ ভোরে সে আমাকে টেনে নিয়ে যেত মাদ্রাজ শহরের পথে ঘাটের নানা দৃশ্য আঁকতে। ইতিপূর্বে এবিষয়ে আমার কোনো তালিমই ছিল না। তাঁর কাছেই আমি প্রথম ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকা শিখলাম।" শিল্পী পরিতোষ সেন যখন বলেন, "ছবি আঁকায় এবং লেখা পড়ায় তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তিতা আমার কাছে আজও একটি আদর্শ হয়ে আছে"—তখনই ক্যালকাটা গ্রুপের আর এক বিখ্যাত শিল্পী রথীন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মেজাজের তফাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—অনেকদিন যাবৎ বছরে দু-একটির বেশী ছবি রথীন্দ্র মৈত্র আঁকেন নি। সিমলা, বেনারসে, এলাহাবাদ, জয়পুর, মাদ্রাজের পর কলকাতায় থিতু হ'ন। অবশ্য একেবারে থিতু হবার লোক তিনি নন—"ঘুরেছি তো অনেক সারা জীবন"—সাইকেলে ভারত ভ্রমণে বের হ'ন—রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে জানিয়েছিলেন "শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তুমি ভারত ভ্রমণে বের হয়েছ। শিল্পীর চিত্রে তার উদ্দেশ্য সার্থক হোক, এই কামনা করি"; বঙ্গশ্রী পত্রিকায় গোপাল ঘোষ নিজের আঁকা ছবি সমেত

এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। বঙ্গশ্রী পত্রিকায় তিনি ইলাসট্রেশনের কাজও করেছেন। কয়েক বছর পর গিয়েছিলেন বিষ্ণু দে-র সঙ্গে দুমকা। সেখানে আলাপ হয় উইলিয়ম আর্চার এর সঙ্গে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ের এলুইন এবং আর্চার সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। পাহাড়ী চিত্রকলা, লোকচিত্রকলা ছাড়া আর্চার সাহেবের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল সাঁওতাল জীবনযাত্রা এবং সাঁওতালীদের সঙ্গীত নৃত্যের প্রতি। আর্চার সাহেবই গোপাল ঘোষকে সাঁওতাল পরগণার গ্রামে গ্রামে নিয়ে যান। তাঁর নিজের কথায় "ওদের ঘরবাড়ি, গৃহস্থলী নিকানো, মুরগী কাটা, মুরগীর লড়াই, দেওয়ালে ছবি আঁকা এই সব দেখে দেখে দিন কাটত। বেশ অনেকদিন ছিলাম দুম্‌কায়।" গোপাল ঘোষ বলেছেন, "দুমকার ল্যাণ্ডস্কেপ আমাকে টেনেছিল খুব।" আর এই দুমকা সিরিজের ছবি সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলেই একমত—এগুলি তুলনারহিত। অবশ্য কোন্ জায়গা যে সবচেয়ে বেশী ছাপ ফেলেছে তা বোধ হয় গোপাল ঘোষও জানতেন না—যেখানেই পর্যটক গোপাল ঘোষ সেখানেই শিল্পী গোপাল ঘোষের ছবি-আঁকার সরঞ্জামের বোঝা; যেখানেই ঘুরেছেন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন প্রচুর—বন্ধ ঘরে বসে আঁকা নয়, রোদ ঝলমলে ভারতবর্ষ, রঙ আর মহাদেশের বৈচিত্র্য নিয়ে যে দেশ দ্বিতীয়রহিত,—যার কোথাও পাহাড়ের চূড়ায় রুপালী বরফ কোথাও শুধু আদিগন্ত বিস্তৃত সোনালী বালু, কোথাও তা থৈ থৈ সমুদ্র কোথাও বা জলশূন্য উষর লাল কাঁকুরে মাটি, এই দেখা যায় খালবিল, সবুজে সবুজ ঝোপঝাড় অরণ্য ঐ আবার ছড়ানো ছিটানো কিছু খেজুর, কী এক পায়ে দাঁড়ানো তালগাছ। কী রঙের বাহার সমস্ত দেশে ভূপ্রকৃতিতে, তার মানুষজনের পোষাকে পাগড়িতে। তাই পর্যটক শিল্পী গোপাল ঘোষের ছবিতে এত রঙের বাহার। যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অঙ্কনে গোপাল ঘোষের জুড়ি নেই সেই গোপাল ঘোষ যেমন কালিতুলিতে অসংখ্য ড্রয়িং করেছেন তেমনি জলরঙ, প্যাস্টেলে নানারঙে এই প্রকৃতিকে ধরেছেন। চোখে দেখা ভারতবর্ষের রঙের বাহার, রঙের প্রতি ঝোঁক এনে দিয়েছিল—মনে রাখতে হ'বে গোপাল ঘোষ শুধু ফুল ভালবাসতেন বলেই ফুলের ছবি আঁকেন নি; ফুল পাখীর অসংখ্য ছবি আঁকার পেছনে আর একটি কারণও ছিল, ফুল পাখীর ছবিতে নানারঙ ব্যবহারের সুযোগ আছে।

কোন্ জায়গা তাকে বেশী টেনেছিল? "বেনারেস, রাজস্থান, ঢাকা, হিমালয়ের যেকোন জায়গা, দুমকা সবই আমাকে টানে মাঝে মাঝে মনে হয় রাজস্থান বোধহয় সবচেয়ে বেশি। তবে বেনারেস নিয়েও তো এঁকেছি অনেক।' টেনেছে ভূপ্রকৃতি, টেনেছে রঙ আর পরিশ্রমী গোপাল ঘোষ সেই রঙ ছড়িয়েছেন কাগজে, ক্যানভাসে।

চীনদেশে কনফুশিয়াস, লাওৎসে এবং জাপানে শিন্টো ধর্মমত এর প্রভাবে প্রকৃতির অনুধ্যান যেমন, ব্যক্তিজীবনে তেমনি চিত্রকলায় প্রভাব ফেলেছিল। সুঙ এবং মিঙ রাজবংশের রাজত্বকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রাঙ্কণে চীনা শিল্পীদের দক্ষতা চূড়ান্তে পৌঁছোয়। জাপান ও ল্যাণ্ডস্কেপ-এ অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। কামাকুরা ও আসিকাগা যুগে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কণে চূড়ান্ত স্ফূর্তি দেখি। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে চিত্রকলার অসামান্য দক্ষতা দেখালেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিত্রকলায় প্রকৃতি এসেছে প্রধানত পশ্চাদপট হিসেবেই। প্রতিবাদে, চকিতে অজন্তা ও সিত্তনবাসল, কী জাহাঙ্গীরের আমলের ফুল লতা পশু-পাখী, এবং রাজপুত কাংড়া চিত্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভেসে উঠতে পারে, কিন্তু থিতু হতেই হয় অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের শিলাইদহ দার্জিলিং পুরী রাঁচীর দৃশ্য-চিত্রে এসে। অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলালের অসংখ্য স্কেচের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে এবং যদিও বিষ্ণু দে মহাশয় যামিনী রায় এর ল্যাণ্ডস্কেপের প্রসঙ্গে লিখেছেন "আমি অন্তত কিছুতে ভুলতে পারি না। সংখ্যায় শতাধিক সেইসব বহির্দৃশ্য চিত্র" যার "বৈচিত্র্য ও অসামান্য দক্ষতায় অবাক হতে হয়"; তবু দ্বিজেন্দ্র মৈত্রর এ উক্তিকে আমরা গুরুত্ব দি, "Gopal Ghose is the first successful interpreter of nature in the field of visual art. Such an example of originality free from any semblance of imitation is, really, rare in modern Indian Art." এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও নিজের ঢাক নিজে পেটানোর যুগে শিল্পী পরিতোষ সেনকে আমরা শ্রদ্ধা না করে পারি না, কারণ তিনি সোচ্চারে বলেছেন, "গোপাল ঘোষ প্রাকৃতিক দৃশ্যে আনলেন এক নতুন ডাইমেনশন—যেটা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।...গোপাল ঘোষ সর্বপ্রথম এক ধরণের নিসর্গ চিত্র আঁকলেন যার ট্রিটমেন্ট সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এবং বর্ণে

উজ্জ্বল। আলোছায়ার খেলা না দেখিয়ে পুরোপুরি টু-ডাইমেনশনাল ল্যাণ্ড স্কেপ আঁকায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।"

গোপাল ঘোষ এর সঙ্গে বেঙ্গল স্কুল এবং ক্যালকাটা গ্রুপ এর নিকট সম্পর্ক ছিল, কিন্তু বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক রীতির দিক থেকে কেউই তাঁর নিকট আত্মীয় নয়। 'বনলতা সেন' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবির মতই তাঁর ছবির ভাষাও তাঁর নিজস্ব। সে কলম অবশ্যই কাংড়া রাজপুত কলম নয়, বেঙ্গল স্কুলের অবনীন্দ্র, নন্দলাল-এর প্রেরণা এবং মাদ্রাজের অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদের শিক্ষা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথের মতো ওয়াশ ছবি আঁকার চেষ্টা সত্ত্বেও বেঙ্গল স্কুলের কলম নয়, যেমন জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবি আঁকলেও তা যেমন গোপাল ঘোষের নিজস্ব কলমের ছবি নয়, স্বক্ষেত্র নয়, তেমনি রথীন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, নীরদ মজুমদার, প্রদোষ দাশগুপ্ত, পরিতোষ সেন, শুভো ঠাকুর এর ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্য হয়েও (১৯৪৮-এ গ্রুপ ছাড়েন) তিনি মেজাজ (mood) বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং আঙ্গিক রীতিতে যেন ক্যালকাটা গ্রুপের কেউ নন—আমরা বলতে চাইছি অহিভূষণ মালিক যাঁকে সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার স্তম্ভ বলেছেন তিনি বেঙ্গল স্কুল বা ক্যালকাটা গ্রুপের সৃষ্টি নন। নিজেও লিখেছেন, "স্বাধীনতা পত্রিকা থেকে দুর্ভিক্ষের ঐ স্কেচ নিয়ে যেত আমার কাছ থেকে। অনেকে সেইজন্য আমাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়েছে। আমি বলতুম আমি সব 'ইষ্ট'—আসলে ইন্‌ডিভিজুয়ালিস্ট।"

পত্রিকার ইলাসট্রেশন এর কাজ কিছু করলেও গোপাল ঘোষ চিত্রকলার শিক্ষকতা করেছেন ১৯৪০ থেকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট, স্কটিশ চার্চ কলেজের শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, শিবপুর বি. ই. কলেজ এবং সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে। আঙ্গিক রীতি এবং মাধ্যম এরও পরিবর্তন হয়েছে বার বার। যখন যে মাধ্যম গ্রহণ করেছেন যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে—যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগার ঘটেছে—সেই মাধ্যমে অজস্র অথচ শিল্পমূল্যে অবিনশ্বর ছবি বেরিয়েছে। সে প্যাস্টেলই হোক, টেম্পারা কি জলরঙেরই হোক। তেল রঙেও এঁকেছেন। একই ছবি জলরঙও প্যাস্টেলে এঁকেছেন। সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য, বনস্পতি, ফুল, পাতা, পাখি, পশু অজস্র এঁকেছেন—বলতে বাধ্য হচ্ছি, শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় একসময়ে নিজের আঁকা ছবির কপি,

একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নিজেই করেছেন, গোপাল ঘোষ এর কোন ছবিতেই অন্য ছবির গোপাল ঘোষ উঁকি মারে নি।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ড্রইং দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সম্ভবত জলরঙ ও প্যাস্টেল যাদুকরের তা ছিল পেন্সিল ড্রইং। অহিভূষণ মালিক যথার্থই লিখেছেন 'প্যাস্টেল দিয়ে অমন পেইন্টিং করতে একমাত্র গোপাল ঘোষই পারতেন।' ভারতীয় চিত্রকলায় নিসর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন মর্যাদা দান এবং অঙ্কণ রীতি ও মাধ্যম মিশ্রণ, মাধ্যম ব্যবহারে স্বতন্ত্রতায়, একান্ত নিজস্ব কলমের মৌলিকত্বে গোপাল ঘোষ অবিস্মরণীয় শিল্পী।

['উত্তরসূরি' পত্রিকার জন্ত রামকিংকর এবং গোপাল ঘোষ তাঁদের একাধিক শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছেন—যা গত দীর্ঘ বছরে ছাপা হয়েছে, জানিয়েছেন সম্পাদক শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য। এমন কি অরুণ ভট্টাচার্যের 'মিলিত সংসার' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদও শিল্পী রামকিংকরের। উত্তরসূরীতে প্রকাশিত এই দুই শিল্পীর এবং আরো আরো শিল্পীর ছবি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র চিত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারে। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ভেবে দেখতে পারেন। : লেখক]

পোলিশ কবি জেসলো মিলোস

১৯৮০ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন নির্বাসিত পোলিশ কবি জেসলো মিলোস। ইতিপূর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার বোরিস পাস্তেরনাক ও আলেকজান্দার সোলঝেনিৎসিন এই পুরস্কার অর্জন করেন। কিন্তু তিনজনই রাষ্ট্র কর্তৃক নানাভাবে বিড়ম্বিত। অথচ প্রত্যেকেই স্বদেশকাতরতায় বিষণ্ণ। ১৯১১ সালে জেসলো মিলোস লিথুয়ানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপের মানচিত্রে তখন পোলাণ্ড বা লিথুয়ানিয়ার কোন সীমারেখা চিহ্নিত ছিল না। তাঁর শিক্ষার জীবন সুরু হয় উইলনো এবং প্যারিসে। স্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁর মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটে। যাকে বলা হয় 'ডাবল পারস্‌পেক্‌টিভ'। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সমভাবে বিচার করার প্রবণতা তখন থেকেই সুরু হয়।

উইলনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মিলোস কিছুদিনের জন্য স্থানীয় বেতারে যোগদান করেন। সেই সময় তৎকালীন প্রশাসনের পরিচালনায় দুর্নীতি তাকে গভীরভাবে পীড়িত করে। এবং বাধ্য হয়েই তিনি উইলনো ছেড়ে সংস্কৃতির পীঠস্থান ওয়ারশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

যুদ্ধকালীন পোলিশ গুপ্তসংস্থার একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি একটি কাব্য সংকলনের গুরু দায়িত্ব বহন করেন: আন্‌কন্‌কার্ড সঙ' (১৯৭২)। সেই সময় বহু ইংরেজী কবিতা অনুবাদে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এমন কি টি. এস. এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্য গ্রন্থকেও তিনি পোলিশ ভাষায় রূপান্তরিত করেন। ১৯৪৫ সালে মিলোস পোলাণ্ডের একজন কূটনীতিবিদ হিসেবে আমেরিকায় কার্যভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কম্যুনিস্ট নীতির স্বরূপ তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসে অবস্থানকালে পোলিশ সরকারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সেদিন একজন পোলিশ কবির পক্ষে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু চরম সংকট মুহূর্তে নিজের মানবিক বৃত্তিই জয়ী হয়েছিলো। তখন তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল তিনি পোলিশ কবি। আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে তিনি এখন কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিত্যালয়ে স্লাভিক ভাষার অধ্যাপক।

মিলোসের সাহিত্য জীবন সুরু হয় ত্রিশের দশকের প্রথম পর্বে। পোলিশ সাহিত্যে তখন বিভিন্নভাবে রোমান্টিসিজম্, সিম্বলিজম্, পারনাসিজম্ ও সমসাময়িক ইমেজিজম্ ও ফিউচারিজমের প্রভাব। আধুনিকতার তরঙ্গ তরুণ কবিদের একই সঙ্গে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে। তৎকালীন একটি প্রতিষ্ঠিত কবিগোষ্ঠী 'স্কামান্দার' এর উল্লেখযোগ্য অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইতিপূর্বে কুড়ি দশকে পোলাণ্ডে ঝঞ্ঝার মতোই কাব্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। অথচ ত্রিশের দশকে সেই ঐতিহ্যপূর্ণ 'স্কামান্দার' তরুণদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হলো না। এর অন্যতম দুর্বলতা ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সতর্কতার অভাবে। তখনও পোলিশ কাব্যে চারণ কবিদের জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে পড়ে নি। এই পর্যায়ে আধুনিক কাব্যে ব্যক্তিগত সমস্যা গৌণ হয়ে পড়েছে। সেই স্থান অধিকার করেছে সংগ্রামের সুর।

ত্রিশের দশকের পোলিশ সাহিত্যে রাশিয়ায় প্রবর্তিত সিম্বলিজমের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সেই সময় পোলাণ্ডের সর্বত্র সামাজিক ও বৈপ্লবিক প্রতিবাদ এক সর্বনাশা ভূমিকা গ্রহণ করে, যাকে বলা হতো 'ক্যাটাস্ট্রফি'। মিলোস সেই পরিস্থিতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এবং তিনি 'ক্যাটাস্ট্রফিজম্' এর একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তখন তাঁর বহু কবিতায় কখনো প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠতো, আবার কখনো গভীর হতাশার সুর প্রতিধ্বনিত হতো।

এম. জুকোনস্কি, এল. সেনওয়াল্ড, জে. জাগোরস্কি এবং জেসলো মিলোস এর মতো শক্তিশালী তরুণ কবিগোষ্ঠী অ্যান্টি-ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্বের মধ্যে অনুক্ষণ মগ্ন থাকেন। তখন পোলাণ্ডে আভাস্ত গার্দে আন্দোলন সুরু হয়েছে। অতি বিলম্বে এই তরুণ কবিগোষ্ঠী নব্য রীতির তরঙ্গে যোগদান করেন, যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রমে সেই কবিদের সম্মুখে রূঢ় বাস্তব ও চিরায়ত কালের উপলব্ধি উভয় সংকটের অবতারণা করে।

মিলোসের কাব্য আলোচনার পূর্বে তাঁর সার্থক গদ্যরচনার উল্লেখ এখনো একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। বোরিস পাস্তেরনাকের ড. জিভাগোর মতই পশ্চিম ইউরোপে অবস্থানকালে মিলোস রচনা করেন 'দি ক্যাপটিভ মাইণ্ড'। এই গ্রন্থই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত করে।

একজন সৃজনশীল লেখকের দায়িত্ব নির্যাতিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবলম্বন করেই মিলোসের গবেষণা গ্রন্থ : "দি ক্যাপটিভ মাইণ্ড"। এই রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় ধ্রুপদী সাহিত্যের সমমর্যাদার জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখানে মিলোসের সহজাত 'ডাবল পারস্পেক্টিভ' মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যতম চরিত্র বেটা প্রতিশ্রুতিমান লেখকের জীবিকা ছেড়ে সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। কারণ যে কোন ঘটনার বহিরঙ্গে একজন সাংবাদিক অতি সহজেই হস্তক্ষেপ করতে পারে। অথচ সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোন চরিত্রের অন্তর্জগৎ বা পরিস্থিতির নৈতিক মান নির্ধারণের কোন দায়িত্ব সাংবাদিককে বহন করতে হয় না। তা বলে সাংবাদিক হিসেবে নৈতিক দিক থেকে আপোস মনোভাব নিয়েও সে বাঁচতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ মিলোস লিখেছেন : ব্যক্তিগতভাবে আমি আত্মবাদী কোন শিল্প-চর্চা পছন্দ করি না। আমার কাব্যই আমাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত করে রাখে, যার ফলে যেকোন সীমারেখা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি, বিশেষতঃ রীতির ক্ষেত্রে যে ধরণের অসাধুতা অবলম্বিত হয়। অবশ্য কোন কোন পর্যায়ে শিল্পী বা কবির অবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতারণাও পরীক্ষিত হয়। আমি সযত্নে সেই সীমা অতিক্রম করি না। যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোর চরম অভিজ্ঞতা আমাকে যেভাবে চিন্তিত করে তুলেছে তা হলো ব্যক্তিগত হতাশা বা পরাজয়কে, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়" (ক্যাপটিভ মাইণ্ড পৃ: ২০৬)।

'ক্যাপটিভ মাইণ্ড' এর সর্বত্র এক নাস্তিবোধ। মন বাধ্যবাধকতায় শৃঙ্খলিত। গোঁড়ামীর প্রান্তে প্রসারিত দীর্ঘপথে একসময় অনুসন্ধান পর্ব সূচিত হয়। মিলোস মূল বিষয়ের বা বক্তব্যের প্রয়োজনে চারজন লেখকের জীবনীর সারাংশকে ব্যবহার করেছেন। চারজনই কমবেশী স্তালিন যুগের কম্যুনিস্ট পোলিশ সরকারের মুখপাত্র। আলফা একজন নীতিবাদী লেখক ; বেটা হতাশ প্রেমিক ; গামা ইতিহাসের ক্রীতদাস সদৃশ অনুগামী ; ডেল্টা যেন মধ্যযুগের ফ্রান্সের প্রভেন্স প্রদেশের প্রেমমূলক একজন গীতি কবি। কিন্তু এঁদের কেউই ব্যক্তিগত জীবন বা সমষ্টিগত জনজীবনের কোন সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়। পরিবর্তে তারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিস্বার্থের বৃত্তে আবর্তিত হতে থাকে। আলফা শিষ্ট আচরণে শিক্ষিত একজন নীতিভ্রষ্ট লেখক হিসেবে পার্টির নীতির রূপায়ণে

প্রয়াসী হয়ে ওঠে। ব্যর্থ প্রেমিক বেটাকে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিতে হয়। গামা সেন্ট্রাল কমিটির নির্বাচিত সদস্য এবং লেখক গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধায়কও বটে। তাছাড়াও অতিরিক্ত পরিচয় তিনি 'বিবেকের রক্ষক'। ডেল্টার কিছুই হলো না, বরং সে দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন হবু কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এখানে মিলোস সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করে সত্য প্রকাশে মগ্ন হয়েছেন। তখন তাঁর কাছে অখণ্ড সমাজের স্বার্থরক্ষা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

পরবর্তী রচনা 'নেটিভ রিল্‌ম'। আত্মজীবনী মূলক হলেও সর্বত্র বিশ্বজনীন উপলব্ধি বিস্তৃত। মিলোস ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের মায়াময় বিচিত্র রূপকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'ডাবল পারস্পেক্টিভ' প্রয়োগের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, একান্ত অন্তরঙ্গ বা গোপন জীবনচর্যা ও জনজীবনের গতিপ্রকৃতির পর্যবেক্ষণ যথাযথ হয়ে উঠেছে। আশ্চর্যভাবে লক্ষণীয়, মিলোস 'কাব্য' বা 'শিল্প' এবং 'রাজনীতি'কে একসময় বিনিময় হিসেবেও ব্যবহার করেন।

প্রসঙ্গতঃ মিলোসের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

The vision of a small patch on the globe (Lithuania) to which I owe every thing suggests where I should draw the line. A three year old's love for his aunt or jealousy to..ards his father take up so much room in autobiographical writings because everything else, for instance the history of a country or a national group is treated as something 'normal' and therefore, of little interest to the narrator. But another method is possible. Instead of thrusting the individual into the foreground one can focuss attention on the background, looking upon oneself as a sociological phenomenon. Inner experience, as it is preserved in the memory will then be evaluated in the perspective of the changes one's milieu has undergone. The passing over of certain period, important for oneself, but

requiring too personal an explanation, will be a token of respect for those underground that exist in all of us and that are better left in peace (pp. 5-6).

এই গ্রন্থে ব্যক্তির ধারণা ও জনসাধারণের চিন্তাধারার মধ্যে মৌল পার্থক্য ক্রমে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় মানুষের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অথচ সে ব্যক্তিসত্তাকে সেখানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে পারে না। বরং মহাকালের মধ্যেই তাকে অবস্থান করতে হয়। মিলোসের ধারণায় :জীবনের পরম উপলব্ধি হলো অস্তিত্ব ও গতির অনুষঙ্গে অনুক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন। এই পর্যায়ে রূঢ় বাস্তবের কোন অবস্থার মধ্যেই নিজেকে সমর্পণ করা চলে না।

বস্তুতঃ 'দি ক্যাপটিভ মাইণ্ড' ও 'নেটিভ রিলম্' মিলোসের অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও সুরকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। এখানে অতীত এবং বর্তমান, ব্যক্তি এবং দল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির তুলনা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর স্বচ্ছ করে তুলেছে।

মিলোস ঔপন্যাসিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। 'দি ইউজ্যারপার্স' যুদ্ধোত্তর পোলাণ্ডের ঐতিহাসিক ঘটনার নাটকীয় বিবরণ। অধ্যাপক গিল বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং থুকিদিদিসের প্রখ্যাত অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। রাষ্ট্র তাঁর রচনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং গ্রীক সংস্কৃতির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে অধ্যাপক গিলের নাম ঘোষিত হয়। তিনি সেই ঐতিহ্য সংরক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং সুযোগবশতঃ থুকিদিদিসের রচনার অংশবিশেষ নিজের উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করতে থাকেন। মহাকাল অবিরাম এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। সেই ধারাবাহিকতায় একদিন পোলাণ্ড থেকে সব জর্মন অধিবাসীর বিতাড়ণ সম্পূর্ণ হয় এবং সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয় রাশিয়ানদের সদর্প আগমনে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। অধ্যাপক গিল তখনো অনুবাদ করে চলেন : "এথেনিয়ানগণ তাদের প্রধান গন্তব্যস্থল সিসিলি অভিমুখে সমুদ্র যাত্রা করে। সেই সঙ্গে তারা বহন করে নিয়ে চলে যুদ্ধ এবং মিত্রশক্তি।"

মিলোস যুদ্ধকালীন পোলাণ্ডের গোপন প্রতিরোধ সংস্থায় একদা সক্রিয়

ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ওয়ারশ'র উত্থান, রাশিয়ানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পরিণতিতে পোলাণ্ডবাসীর মোহমুক্তি। উপন্যাসে এই পটভূমিকা কালের তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। মূলতঃ 'ইউজ্যারপার্স' এক জটিল উপন্যাস। যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবতা, অবিরাম স্থান পরিবর্ত্তন, রাষ্ট্র বা দেশ দখল করার প্রবণতা বুদ্ধিজীবীদের পর্যায়ভুক্ত সব চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, অধ্যাপক গিলকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন দৃঢ় প্রত্যয়শীল মার্ক্সবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক, এবং বিশ্বের নানা সমস্যায় উদ্বিগ্ন বুদ্ধিজীবী। থুকিদিদিসের মন্তব্য এখানে খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ: "নিজের অপরাধের বিচারের জন্য এই পৃথিবীতে কেউই জীবিত থাকবে না।" মিলোস এই সময়কে মানুষের জীবনে ভীতি ও ত্রিশঙ্কুর অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর যুগের সর্বকনিষ্ঠ কবি হিসেবে মিলোস বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েমস অব্ দি কনসিল্ড টাইম' (১৯৩৩) পোলিশ কাব্য সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সমসাময়িক অগ্রজ কবিদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যর্থতা এই কাব্যগ্রন্থে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তখন মিলোসকে প্রচলিত ধারণার সীমারেখা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। এবং একজন রাগী তরুণের প্রতিমূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালে তিনি বিদ্রোহী সম্মানে ভূষিত হন।

ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক ও নৈতিক সংকটের মুখে কবি কাব্য বা শিল্পের প্রতি যথার্থ দায়িত্ব পালনে অতিমাত্রায় সচেতন। মিলোসের কাব্যে অলঙ্কারের শোভাবর্ধক প্রয়োগ মহৎ কবিতার প্রতিশ্রুতিকে বহন করে। যেমন 'আওয়ার কান্ট্রি'

Long trumpets high above the horizon
Rise slowly towards the lips.
Forests anchored in the skilled sky
Roads entangled as arms of an octopus
Wagging, nestled in hands
Trumpets blow upwards
Quiet, masculine, hard

We are greeted by them mourningly and simply
We fall in the sands of the roads, we rip
the grass ; it hurts.
The melody resounds in the woods. It
burns like vitriolic acid.

উইলনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে মিলোস তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রকাশক ছিলেন স্থানীয় এক ছাত্রসংস্থা 'সার্কল অব্ পোলিশ স্টাডিজ্'। সেই সময় পোলাণ্ডের কোন ব্যবসায়ী প্রকাশকই আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক যে কোন বিদ্রোহী কবির রচনা প্রকাশে অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে সাহসী হন নি। পাশাপাশি সাহিত্যপত্র 'লিটারেরী নিউজ্' শুধুমাত্র সাহিত্য সমবায়ের সভ্য ও অনুগামীদের নানাভাবে উৎসাহ দান করতো।

সমসাময়িক বহু লেখকদের তুলনায় মিলোস পোলিশ কাব্যজগতে এক দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কর্মজীবনের সূত্রে তিনি বিদেশের বহু লেখকের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে তিনি লিথুনিয়ান পরিবারের অস্কার মিলোসের ফরাসী কাব্যের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তখন নতুন নতুন সাহিত্য-ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। প্রচলিত গোঁড়ামী বা রক্ষণশীল ধারণা পরিহারে তিনি প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। কাব্যের বা নন্দনতত্ত্বের মৌল সমস্যা তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দিক থেকে উইলনো গোষ্ঠীর জাগারির সঙ্গে মিলোসের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু একদা সামাজিক দায়িত্বে তিনি অধিকতর মগ্ন ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'অ্যানথলজি অব স্যোসাল পোয়েট্স' (১৯৩৩) এই কাব্যসংকলন বামপন্থার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। মিলোসের 'ইন অনর অব্ মানি' ও 'এ স্টোরি' নির্বাচিত কবিতার অন্যতম। এখানে মূলতঃ সামাজিক প্রতিমার জড়বাদী ভাষ্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। যেমন

জীবনের বৃহৎ রণক্ষেত্রে মিস্টার প্রসিকিউটার
একই শক্তি তোমাকে আমাকে ঐক্যসূত্রে বাঁধে
দিনগুলোর অসাড়তা আমাদের শিরে
দুর্বহ তীব্র যেন কয়লার বিশাল খণ্ড

মাংস রুটি শিশুর কলহাস্য
এবং ভার্যার বসনের অধিকারে
বিষয় আদালতে তোমাকে অভিযুক্ত করে
জনগণের দীর্ঘঃশ্বাস শ্রুত হয়
সবুজ পোষাকে ক্রুশ দণ্ডায়মান
দেয়াল থেকে সূর্যের আলোতে
ঈগল দীপ্তিমান
কণ্ঠস্বরে আঘাত করো তোমার টুপীতে
স্বর্ণময় পুষ্পস্তবক স্থাপন করো মুদ্রার স্তবকে
মিস্টার প্রসিকিউটার।

মিলোসের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'থ্রি উইন্টার্স' (১৯৩৬) এ চিন্তার সঙ্গে শিল্পের সূক্ষ্ম উপলব্ধির সমন্বয় পরিবর্তনের সুরকেই যেন স্পষ্ট করে। কাব্যগত ঐতিহ্য অনুসরণ করে মিলোস শোকপূর্ণ কণ্ঠস্বরে রোমান্টিসিজম সঞ্চারিত করেন। যেমন "বার্ডস", "দি গেটস্ অব্ আর্সেনাল"। অবশ্য সাইপ্রিয়ান নরউইড এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন 'এলেজি' দার্শনিক ও ধ্রুপদী মর্যাদায় সমৃদ্ধ:

না, এর বিস্মরণে নয় স্মৃতিতে
গিরিশৃঙ্গের ঘন কুয়াশায় ও নয়
নয় রাজধানীর শ্রুতি পীড়িত শব্দে
শুধু শান্তির আশ্বাসে সমর্থ এই বিশ্ব

সংগ্রামের বর্ণগুলোর অতিক্রান্তিতে
হয় ক্রুশ অথবা প্রস্তর ফলক
যেন ট্রয়ের ধ্বংসের ওপর
ধ্বনিত বিহঙ্গের করুণ সঙ্গীত

প্রেম, আহার, পানীয় অনুক্ষণ
পথের অবিচ্ছিন্ন অংশ
কিন্তু দৃষ্টি এদের ওপর স্থির নয়

তন্দ্রাতুর নিদ্রালু নেত্রপল্লব নির্দয়
আলোতে ক্রমে দগ্ধ

তস্থুর সাক্ষাৎ লগ্নের পূর্বেই মহাকালের
ঘোষণা বিপদ সংকেত

উপযুক্ত বিশ্বস্ত প্রাণী ক্ষণজীবী
মানুষের অস্তিত্ব
ব্যর্থভাবে দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন তীব্র আলোর ধাঁধায়
অধিকার বঞ্চিত
এবং ভূমি থেকে উদ্ভূত কণ্ঠস্বর :
একি ব্যর্থ শোকযন্ত্রণার কালিমা
আমরা তোমাদের বলি, আমাদের
উত্তর পুরুষ ?

পূর্ববর্ত্তী কাব্যের চেয়ে 'থ্রি উইণ্টাস' মিলোসকে অধিকতর খ্যাতির সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে। এমন কি তাঁর কাব্যের কঠোর সমালোচক কে. ডাবলু জাওদজিনস্কি পর্যন্ত মিলোসের প্রসংশায় মুখর হয়ে ওঠেন। মিলোস এই কাব্যগ্রন্থে শব্দসূচীর বিন্যাসকে উহ্য রেখে বাক্যগঠন সংক্রান্ত এক কম্পিত প্রতিমা উদ্ভাবনে মগ্ন। ঐতিহ্যের রীতি তাই সাময়িকভাবে উপেক্ষিত।

যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে মিলোসের বিস্ময়কর স্বাক্ষর 'রেসক্যু' (১৯৪৫)। এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই তাঁর কাব্যের বৈপ্লবিক বিবর্তন সুরু হয়। যুদ্ধের কবিতার মধ্যেও সেই সুর ধ্বনিত হতে থাকে। এই পর্বে কবিতায় করুণরসের সঙ্গে কল্পনার প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়েছে। নির্বাচিত শব্দের ব্যবহারে কাব্য শরীর রমণীয় হয়ে ওঠেছে। রোমান্টিসিজমের প্রভাব থেকে তখনো তিনি মুক্ত হন নি। সেই সময় মিলোস জনপ্রিয় সঙ্গীত থেকে লোকনীতির পরিকল্পনা আবিষ্কার করেন। তাঁর ট্রাজিক কবিতায় প্যারালালিজম ও ছন্দের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন কবিতা বিশ্বজনীন মানবিকবোধে সমৃদ্ধ ছিল।

মিলোস তাঁর সমসাময়িক নির্বাসিত কবি মিস্কিউইজ, স্লোয়াস্কি এবং

নরউইডের মতো রোমান্টিক পূর্বসূরীদের পথ কখনো এড়িয়ে যেতে পারেন নি। তবুও তিনি একজন আধুনিক বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত।

যুদ্ধোত্তর পোলাণ্ডে মিলোসের অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত ছিল। তখন থেকেই তিনি চরম সংকটের শিকার হয়ে পড়েন। একদিকে শিল্পের সৌন্দর্যের উপলব্ধি অন্যদিকে মস্তিষ্ক-প্রসূত তত্ত্ব। সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু এই অবস্থা ক্রমে কেটে যায়। তাঁর মধ্যে কাব্যিক অধিকার প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কবিতার প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য এক অটল মনোভাব সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে বিসদৃশ কাব্য গ্রন্থ 'রেসকু' মিলোসকে একজন বিদ্রোহী কবি হিসেবেও চিহ্নিত করে। 'সমাজবাদ গঠনে' এই কাব্যগ্রন্থের কোন ভূমিকা নেই বলে তিনি কঠোর সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন।

আমেরিকা অবস্থানকালে তাঁর কবিতা অনাড়ম্বর সাজে সজ্জিত। যুদ্ধের বিষয় এবং ভয়াবহ অবস্থা তাঁর কাব্যকে আর প্রভাবিত করতে পারে নি। বরং কবির একান্ত অনুভবগত প্রতিমা কাব্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে। ছন্দের প্রতিও তিনি আর পূর্বের মতো সচেতন নন। এযেন নতুন এক মিলোসের আবির্ভাব। এই পর্বে যুক্তিগ্রাহ্য দীর্ঘ কবিতা রচনায় তিনি মগ্ন থাকেন। কবির জীবনের গভীর ভাবনার মাধ্যম হিসেবে শিশু-ভোলানো ছড়া রচনার রীতিকে গ্রহণ করেন। তাই কাব্যের ছন্দ কখনো মুক্ত কখনো আবৃত বা দুর্বোধ্য।

নির্বাসিত জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ডে লাইট' (১৯৫৫)—জন্মভূমির জন্য তাঁর মমতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। তাঁর একমাত্র পরিচয় মানুষ। তাঁকে ঘিরে রেখেছে স্মৃতি। স্বদেশ-কাতরতা আমাদের মনকেও সিক্ত করে।

আমার জন্মভূমি

নিজভূমে আমার প্রত্যাবর্ত্তন হবে না
বৃক্ষরাজি শোভিত পল্লীর হ্রদ
এখনো দৃষ্টিপথে ভেসে বেড়ায়
ছিন্ন মেঘ
যখনই ফিরে তাকাই
গোধূলির আঁধারে জলমগ্ন অগভীর চড়ায়
ফিসফিস শব্দ

শঙ্খচিলের তীক্ষ্ণ চীৎকার সূর্যাস্ত শীতল
সিক্ত
আরো উর্দ্ধে বুনোহাঁসের ডাক
আমার অমরাবতীতে ছায়ার হ্রদ নিদ্রায়
আমি আনত হয়ে দেখি
নিম্নে আমার জীবনের দীপ্তি
অতঃপর সবকিছু যেন আমাকে ভয়ে চমকিত করে
সেখানে, মৃত্যুর পূর্বলগ্নে আমাকে
পরম মুক্তি দান করে যায়।

১৯৫৭ সালে মিলোসের 'পোয়েটিক ট্রিটিজ' প্রকাশিত হয়। তার শিল্প চেতনা ও আদর্শগত বিশ্বের মধ্যে তখন তীব্র সংকট ঘনীভূত হয়েছে। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের সংঘর্ষ ও অভিজ্ঞতা বহন করে মিলোসকে কাব্যরচনায় উদ্যোগী হতে হয়।

'পোয়েটিক ট্রিটিজ' আধুনিক কাব্যরীতির ক্ষেত্রে সাহিত্য ও সমাজবাদের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপক নিরীক্ষণ মাত্র। এখানে যুদ্ধের তাৎপর্য যুদ্ধোত্তর যুগের উভয়সংকট, আমাদের সমকালের ট্র্যাজেডি ও অ্যাবসারডিটির মধ্যে কাব্যের গুরুত্ব বিশেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই পর্বে কবি ভাষার উৎসসন্ধানে মগ্ন। ভাষার ব্যবহার মূলতঃ যোগসূত্র রক্ষার সহজাত ক্ষমতা ধারণ করে।

"জন্মগত ভাষার লঘুকরণে
শব্দ যাদের কর্ণে পশে
দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয় আপেল বৃক্ষসারি, একটি নদী,
একটি বক্র পথরেখা
যেন এসবের দর্শন ঘটে বিজলী চমকে।"

এই কাব্যগ্রন্থে কবি আমাদের যুগের সব অশুভ-অমঙ্গলকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন। সেই কবিতার সমাপ্তি ঘটে :

সুখের দ্বীপে? না তোমার মধ্যে
আমার মধ্যে হোরেশিয়ান স্তবকে বায়ু নিমজ্জিত করে
বিদ্যালয়ের ডেস্কে কলমছুরিতে ক্ষোদিত রেখা

লবনাক্ত নির্জন প্রান্তর আমাদের সন্নিকটে
কোনদিন উপনীত হবে না :

মিলোসের 'গ্রীক পোর্ট্রেট' স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত। সূচনা পর্বে আমাদের সুদূর অতীতে নির্বাসিত করে এবং পরিণতিতে আমাদের উপস্থিতি ঘটে বর্ত্তমানে বাস্তবের সান্নিধ্যে। তখন গ্রীক মুখোসের অন্তরালে অন্য এক অন্তরঙ্গ পরিচিত মুখ ভেসে ওঠে :

আমি অতীতে
ফেলে আসি আমার স্বদেশ, বাড়ী এবং
রাষ্ট্র কার্যালয়
স্মরণ রেখো আমি লাভ বা রোমাঞ্চের
সন্ধানে নিযুক্ত
জাহাজের উপর আর আমি বিদেশী নই
রূপসজ্জাহীন মুখ আমার

মিলোসের সমগ্র রচনায় ভ্রমণের বিশেষ ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সঙ্গে অবিরাম নৈতিক অনুসন্ধান পর্বও বাদ পড়ে না। স্থানও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু স্থানের পরিবর্তন দ্রুত সম্পন্ন হয়। কারণ অস্তিত্ব ও গতি অবিরাম স্থান বদল করে। মিলোসের ব্যক্তিগত জীবন ও সমগ্র কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সেই অস্তিত্ব ও গতি অবিরাম নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে।

রাজা রাও-এর উদ্দেশ্যে মিলোসের কবিতা

রাজা আমার অনুরোধ, আমি জানি
সেই ব্যাধির কারণ

বছর বয়ে যায় আমি
মেনে নিতে পারি নে
যে প্রাসাদে আমার বাস
অনুভব করি হয়তো রয়েছি অন্য কোথায়

একটি মহানগরী, তরুরাজি, মানবের কণ্ঠস্বর······

কোথাও একদা সত্যিকার অন্তরঙ্গ একটি নগর ছিল
ছিল বৃক্ষরাজি, কণ্ঠস্বর, বন্ধুত্ব আর প্রেম

সংযুক্ত করো, যদি অভিলাষী হও আমার অদ্ভুত অবস্থা
সিজোফ্রেনিয়ার কিনারে
প্রত্যাশিত এক আশায়……

অবশেষে খুঁজে পেয়েছি এই তো আমার বাড়ী
এখানে, পূর্বে সমুদ্রের সূর্যাস্তের দীপ্তিমান অপার
সাগরবেলার অভিমুখে তোমার এশিয়ার সৈকত
বৃহৎ প্রজাতন্ত্রে পরিমিতভাবে কলুষিত।

বিজয় দেব

মহাভারতের দু'একটি ঘটনা : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

বহু পঠিত এ পয়ারের দু'টো শব্দ 'অমৃত' ও 'পুণ্য' আমাদের কাছে বিশেষ অর্থবহ বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, শব্দ দুটো নিঃসন্দেহে আমাদের এই মর্ত্যপৃথিবী ছাড়াও স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বের স্বীকৃতি বহন করে, দ্বিতীয়তঃ, পাপ-পুণ্যের যে বিশেষ ধারণা কাশীরামে উপ্ত, আজ তা বহুলাংশেই অনুপস্থিত। বিশেষতঃ যখন এই ঘোর ধর্ম-নিরপেক্ষতার যুগে হপ্‌কিন্সের এর সাথে একই চোখে দেখি 'why do sinners prosper ?' তখন প্রাচীনকালীন পাপ-পুণ্যের ধ্যান ধারণাটাকে শিকেয় না তুলে রেখে উপায় কি ? ওয়াজেদ আলি সাহেব ওঁর লেখার মধ্যে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের এক আবহমানকালীন ট্রাডিশন রয়েছে যা অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তমানতায় বাঁধা। কিন্তু আলী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি ট্রাডিশন কোন গ্রামের সাতবুড়ো অশ্বত্থ গাছের নীচে ভাঙ্গা মন্দিরের অনড় অটল শিবলিঙ্গ নয় ; যুগ হতে যুগে পরিবর্তনশীল জীবনের যে বৃহৎ স্রোত তারই চিহ্নবাহী এক উজ্জ্বল প্রয়োজনীয় অতীতকেই তো ট্রাডিশন বলবো। ট্রাডিশন নিয়ে এ কথা বলছি এই কারণেই যে প্রায়শই এমন একটা ওজর খাড়া করা হয়, 'তাসের দেশে'র সেই অকাট্য অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়মের মতো, 'মহাভারত' বা অনুরূপ কোন ধর্মগ্রন্থের কোন আলোচনা ধার্মিকের ভক্তিরসাপ্লুত দৃষ্টিকোণ ছাড়া সম্ভব নয়, তাতে ট্রাডিশন রসাতলে যায়। মান্ধাতার আমলের পুরাকালীন সেই ভক্তিরসের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে এমন হলফ করে বলা যাবে না। বিশেষতঃ, গ্রামে-গঞ্জে এবং শহরের উপকণ্ঠে ভাগবত-পাঠের স্থানগুলোয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তথা বণিতার জনাকীর্ণতায় এ সত্য স্বীকৃত যে 'ভক্তিরসে নদীয়া 'ডুবু ডুবু' না হলেও এখনও ভক্তিরস সরস্বতী বা ইছামতীর মতো পুরো হেজেমজে যায় নি। কিন্তু আমাদের যুগটার কথা ভুলবো কেমন করে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দাঁড়িয়ে 'বেধর্মী' 'যবন' যে গালই অদৃষ্টে জুটুক, যে কোন গ্রন্থ, তা 'ধর্ম'

কি 'অর্থ', 'কাম' কি 'মোক্ষ', জীবনের যা কিছু ছুঁয়েই হোক না কেন, তার পর্যালোচনা বৈজ্ঞানিক তথা যুক্তিবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়াই বিধেয়।

'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'—এ আপ্তবাক্য অর্বাচীন কালকে পরিহার করলে ভারতের ক্ষেত্রে একান্ত সঠিকভাবেই প্রযোজ্য। কি কাল, কি সাম্রাজ্য, 'মহাভারতে' উভয়েরই সীমানার বিস্তৃতি এতো বিরাট ও ব্যাপক যে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। প্রাচীন ভারতের এমন কোন ঠাঁই নেই যা 'মহাভারতে' অনুল্লেখিত বা অনালোচিত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এমন কোন দিক নেই যা ব্যাপক ও গভীরভাবে চিত্রিত হয় নি 'মহাভারতে'। সাহিত্য সমালোচকের নান্দনিক দৃষ্টিকোণ হতেই 'মহাভারত' যে শুধু মহৎ কীর্তি হিসাবে প্রশংসার অধিকারী তাই নয়, পুরাকালীন জীবনের এক উজ্জ্বল ও সত্য প্রতিবিম্ব হিসাবেও এ মহাকাব্য আমাদের কাছে শ্লাঘনীয়। এ আমাদের কাছে প্রাচীন ভারত-বিদ্যার বিশ্বকোষ।

ব্যাসদেব এ মহাকাব্যের রচয়িতা বা সংকলয়িতা যাই হোন না কেন, অসংখ্য জলছবির মতো পৃথিবীতে মানুষের প্রথম সৃষ্টিকাল হতে বহু বহু রাজার জন্ম-মৃত্যু একটা ধারাবাহিকতায় বাঁধা এ কাব্যে, একটা fantastic panorama উপস্থিত এখানে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে মহাকাব্যকারের শিল্পভাবনার ফলেই হোক বা অন্য যে কোন তাড়নার ফলেই হোক, তাঁর দৃষ্টিপাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দু'এক আদিপুরুষ সহ কুরু-পাণ্ডবদের জীবন কাহিনী, তাদের জীবনের নানা টানাপোড়েন, নানা সংঘাত ও নানা ঘাত-প্রতিঘাত। এবং একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না মহাকাব্যরচয়িতা কুরু-পাণ্ডবদের নাটকীয় এই জীবনেতিহাসের মধ্য দিয়ে তাঁর সমকালীন ভারতের ন্যায়-নীতি, ধর্ম-অধর্ম, আচার-আচরণের এক সম্যক ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

এখন, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপস্থাপনার আগে প্রাক্-স্বীকৃত হিসাবে সমাজ-তাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ হতে দু'টো জিনিষ উল্লেখ করতে চাই। প্রথমতঃ 'মহাভারত' যে সময়েই রচিত হোক না কেন, সে সময়ে রাজতন্ত্র তার প্রয়োজন-ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণী বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। দ্বিতীয়তঃ, আদিমকালের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটেছে। পুরুষ-শাসিত ও পুরুষ-প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পুরুষের অধীনতা স্বীকার

ঘটেছে পাকাপোক্তভাবে। আমরা জানি যে কোন সমাজের নীতি নিয়মগুলো গড়ে ওঠে সমাজের চালিকাশক্তি যে শ্রেণী তার সুখ সুবিধা ও পছন্দকে কেন্দ্র করে। 'মহাভারতে'র যুগেও এর অন্যথা হয় নি। তাই রাজতান্ত্রিক পুরুষেরা তাদের কামাচার তৃপ্তির সহায়ক হিসাবে নারীকে নানা নিগড়ের শিকলে বেঁধেছিল। তাই বহুবিবাহ পুরুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে একস্বামীত্বর দুর্ভেদ্য আগল টানা ছিল। আমরা প্রায়শই প্রাচীন ভারতের নারীর মহিমার কথা উল্লেখ করি তার স্বাধীনতা সচেতনতার কথা ব'লে। বৈদিক যুগের নারীদের ক্ষেত্রে হয়তো এই স্বাধীনতা কিয়দ্‌পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মহাভারতের যুগে সে তো শূন্যে বিলীন। অবশ্য পরবর্তীকালীন বৌদ্ধযুগ বা মুসলমান সাম্রাজ্যের কথা যদি ধরি, তাহলে তুলনায় 'মহাভারতে'র নারীকুল অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করেছে। বিশেষতঃ, বেশ কিছু ক্ষেত্রে কন্যাকে স্বয়ম্বরা করে নিজ পতি নির্বাচনে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কি রাজকার্য সম্পাদনে, কি জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, নারী কোন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, 'মহাভারতে' এ দৃশ্য বিরল। পাণ্ডবেরা মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কুন্তীর কোন প্রভাব অপরিলক্ষিত। দুর্যোধনকে পরিত্যাগের ব্যাপারে গান্ধারী নিছকই শুধু আকুল আবেদন করতে পারেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, কিন্তু রাজা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ঊনবিংশ শতকের আলোকিত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি, 'মহাভারতের' চিত্রাঙ্গদা নিতান্তই অর্জ্জুনের সাময়িক শয্যাসঙ্গিনী, যার একমাত্র লাভ অর্জ্জুনপুত্রের জননী হওয়ার সৌভাগ্য। 'মহাভারতে' যেটা স্পষ্ট সত্য সেটা হোল নারী-পুরুষের কামাচারের আধার তথা তার পুত্রের জননী। অবশ্য তার যৌন ভোগলিপ্সায় পুরুষ কতকগুলি নির্দ্ধারিত মূল্যবোধ বা taboos অলঙ্ঘ্যনীয়ভাবে মেনে চলেছে। যেমন, যে কোন নারী-সঙ্গ লাভের প্রাক্‌শর্ত হিসাবে দেখা যায় পুরুষ হয় ধর্ম-বিবাহ বা গান্ধর্ব-বিবাহ রূপ লোকাচার পালনের মধ্য দিয়ে সে নারীকে পত্নীরূপে স্বীকার করে নিয়েছে। এর অন্যথা পুরুষের ক্ষেত্রেও সমাজ-ধিকৃত অপরাধ বলে গণ্য হোত। তাই কামাতুর রাজা শান্তনু বিবাহ ব্যতিরেকে সত্যবতী সঙ্গ লাভে অক্ষম। আর পুরুষের ক্ষেত্রে যে taboo এমনভাবে মান্য, নারীর ক্ষেত্রে তো সেই নীতিধর্মের দেওয়াল আরও

জীবনভাবে অলঙ্ঘ্যনীয়। প্রতিটি নারী মনে প্রাণে একস্বামীত্বের আদর্শে বিশ্বাসী। বিচারিণী বা বহুচারিণী আখ্যা লাভ কোন নারী চায় না। তাই সমাজ-স্বীকৃত ন্যায়-নীতির স্খলন, যাকে আমরা সামাজিক ব্যভিচার বলতে পারি, তা প্রায় অ-দৃষ্ট। প্রাক্-বিবাহ জাত সন্তানকে স্বীকৃতিদানে কুন্তীর অক্ষমতা একথাই প্রমাণ করে যে কচিৎ পদস্খলন ঘটলেও তাকে 'চুপ., চাপ.' করে বিস্মৃতির অন্তরালে পাঠিয়ে দেওয়াই ছিল বিধেয়।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলোর আলোকেই মহাভারতে'র দু'টো ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই এখন, যা নিঃসন্দেহে taboo গুলোকে ভেঙেছে কোন আড়াল আব্‌ডাল না রেখেই। যদিও 'মহাভারতে' প্রতিটি কার্যকারণ সূত্রেই ধর্মের জাল ছড়ানো রয়েছে ব্যাপকভাবে, কিন্তু ধর্ম-সম্পর্কিত রূপক গুলোকে লাটাইতে সুতো গোটানোর মতো গুটিয়ে রেখে দিই, ঘটনাকে ঘটনা বলে দেখেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। পাণ্ডুর শাপগ্রস্থতার রূপকটাকে সরিয়ে রাখি। বরঞ্চ একথাই বলি অপুত্রক পাণ্ডু তার বন্ধ্যাত্বজনিত সন্তান প্রজননের অক্ষমতায় স্থিরীকৃত। কিন্তু পুত্রহীন জীবন যে নিষ্ফল। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—পুরুষের জীবনে সন্তান প্রাপ্তির বিশেষ গুরুত্বেরই প্রকাশ। তাই পুত্র লাভেচ্ছু পাণ্ডু কুন্তীকে অন্য পুরুষ সহবাসে পুত্র ধারণে প্রবুদ্ধ করেছে "হে কুন্তী! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদনে অনুজ্ঞা করিতেছি।" অবশ্য স্বামী-আদেশ সত্ত্বেও অন্য পুরুষ সহবাসে নারীর যে taboo তা কুন্তীর মধ্যে প্রবলভাবে উপ্ত। তাই স্বামীর এ ইচ্ছাকে সে ধিক্কারে জর্জরিত করেছে : "হে ধর্মাত্মন্! আমি তোমার ধর্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত, অতএব তোমার আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অশুচিৎ হইতেছে।..." কিন্তু পুত্র মুখ-দর্শনে পাণ্ডু এতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কুন্তীর সব অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে সে আদেশ দিয়েছে : "...কর্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে।" এরপর রাজার দ্বারা উপরোধিত কুন্তী রাজার অভিলষিত সন্তান উৎপাদনে ব্রতী হয়েছে। এবং এরই ফলশ্রুতি ধর্মের ঔরসজাত কুন্তীর গর্ভের বিবাহোত্তর প্রথম সন্তান

যুধিষ্ঠিরের জন্মলাভ। কিন্তু মজার ব্যাপার এক পুত্রলাভে পাণ্ডু সন্তুষ্ট নয়, যুধিষ্ঠিরে ক্ষত্রিয় ধর্মের পরিপন্থী ধর্মভাবের প্রাবল্য কুন্তীকে দ্বিতীয় সন্তান ধারণে আদেশ করার ওজর হিসাবে চিহ্নিত। প্রবল পরাক্রমশালী পুত্র লাভেচ্ছায় কুন্তী বায়ুর সহবাসকামী এবং ফলশ্রুতি ভীমের জন্ম। কিন্তু বারবার কুন্তীকে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী করার যে ইচ্ছা, সে কি কেবল অপুত্রক রাজার পুত্রলাভেচ্ছা প্রসূত? ইন্দ্রের সংসর্গে কুন্তীর তৃতীয় সন্তান উৎপাদন—অর্জ্জুনের জন্মলাভ আর এই তৃতীয় সন্তান সৃষ্টির সাফাই গাইতে ভীম জন্মের পরে পাণ্ডুর পুনর্বার চিন্তা: 'কি প্রকারে আমার এক সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে? যথাক্রমে ধর্মভাবাপন্ন, প্রবল পরাক্রমশালী ও সর্বগুণান্বিত তিন তিন সন্তান জন্মের পরেও পাণ্ডুর কুন্তীকে আর এক সন্তান উৎপাদনের জন্য তাড়িত করার পিছনে কোন সদিচ্ছা কাজ করেছে? অবশ্য কুন্তী পাণ্ডুর এই চতুর্থবারের প্রস্তাব প্রশংসনীয়ভাবে ও দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখান করেছে: "মহাত্মন! আর আমাকে পুরুষান্তর সংসর্গের অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পরপুরুষের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তর সংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে, পাঁচবার উক্তপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যা পদবাচ্য হইয়া থাকে…;" কিন্তু আমাদের আলোচনায় কুন্তীর সাহসিকতা লক্ষ্যণীয় নয়। লক্ষ্যণীয় পাণ্ডুর বিভিন্ন হাবভাব ও কার্য্যাদি। স্ত্রীসংসর্গে স্বাভাবিক যৌনাচারে অক্ষম এক পুরুষের যৌন বিকৃতিই ধরা পড়েছে পাণ্ডুর ব্যবহারে, যখন সে স্ত্রীকে বারবার উদ্বুদ্ধ করেছে বিভিন্ন পরপুরুষের সংসর্গ যাপনে। রতিক্রিয়া-অক্ষম পুরুষের অন্যপুরুষের রতিক্রিয়া দর্শনে যে আনন্দ, জানি না মহাভারতে পাণ্ডুর ক্ষেত্রে সেরকম কোন নিদর্শন কার্যকরী কিনা। এ প্রসঙ্গে এলিজাবেথ-উত্তর ইংলণ্ডের অবক্ষয়ী যুগের কথা উল্লেখ্য। নাট্যকার ডেকার তাঁর নাটক 'The Honest Whore' এ দেখিয়েছেন কেমন করে এক পুরুষ পতিতাবৃত্তি হতে উদ্ধার পেতে আগ্রহী এক নারীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার পরও আবার তাকে প্ররোচিত করেছে বন্ধুর সাথে পতিতাবৃত্তিকে নিয়োজিত হতে। পাণ্ডু-কুন্তী সম্পর্কিত এ ঘটনা মহাভারত-কারের সমকালীন যৌন-ভ্রষ্টাচার তথা যৌন বিকৃতিরই পরিচয় বহন করে।

দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণার কি করে পঞ্চস্বামী লাভ হোল সে ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। গুহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট কুন্তী ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে আগত অদেখা দ্রৌপদীকে 'ভিক্ষালব্ধ রমণীয় দ্রব্য' হিসাবে বর্ণিত হতে শুনে আদেশ দিলেন : 'বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।' আপাত দৃষ্টিতে এ ঘটনা মাতৃ-আদেশ পালনের পরাকাষ্ঠা হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী প্রাপ্তির আসল রহস্যও মহাভারতকার অনুল্লেখ্য রাখেন নি। "...পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট ও তদ্গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গবিকার প্রাদুর্ভূত হইল।...যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য সমুদয় স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জ্জনে লইয়া কহিলেন, 'দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।" সামাজিক স্বীকৃতির তকমা এঁটে একই রমণীর একই সাথে পঞ্চপুরুষের ভোগ্যা হওয়াটা যে একটু অস্বস্তিকরভাবে বিশ্রী ব্যাপার এবং সমাজের অনুমোদন যোগ্য নয়, মহাভারতকারের এ ধারণাটা স্পষ্ট ছিল। তাই দ্রুপদরাজ-সভায় যুধিষ্ঠিরের এবম্বিধ প্রস্তাবের পিঠে দ্রুপদের অননুমোদনীয় গলা শোনা যায় : "হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ আপনার উচিত হয় না।" পিতৃতান্ত্রিক এক বিশেষ সভ্যতার প্রেক্ষাপটে এ ঘটনা যে স্থিতিবান সামাজিক কাঠামোটাকেই ধ্বংসের প্রয়াসী, এই অনর্থ সম্বন্ধে সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ দ্বৈপায়নকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাচন : 'হে তপোধন! জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন? ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; ধর্মের গতি আমরা কিছুই জানি না; সুতরাং ধর্মাধর্মের নিশ্চয় করা আমাদিগের অসাধ্য। অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চস্বামীর মহিষী হইবে, ইহা আমরা কোনরূপেই ধর্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না।' কিন্তু শুধু ধৃষ্টদ্যুম্ন কেন, গোটা সমাজই অনুমোদন না করুক, ভবিতব্য আর অলঙ্ঘ্যনীয় মাতৃ আদেশ পালনের দোহাই পেরে ব্যাপারটা ঘটেছে। আগেই উল্লেখ

করেছি মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মহাভারতীয় যুগে প্রচলিত ছিল না, তাই একথা ভাববার অবকাশ নেই যে স্বেচ্ছাচারিণী দ্রৌপদী আপন ইচ্ছানুযায়ী কখনও এ পাণ্ডব, কখনও ও পাণ্ডবকে কামসংসর্গে আহ্বান করেছে। আবার যুগটা যদি মহাভারতীয় না হোত এবং দ্রৌপদী যদি নিতান্তই এক রমণীয় বস্তু হিসাবে বর্ণিত না হোত, তাহলেও এ ঘটনার একটা সামাজিক নিয়মবদ্ধ কারণ দর্শাবার সুযোগ থাকতো। আমাদের দেশে নারীমুক্তি কতখানি সফল, তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু যৌনজীবনে নারীমুক্তির সাফাই গাইতে অনেক বড় বড় বুদ্ধিজীবি এবং কবি সাহিত্যিক এগিয়ে এসেছেন। আজকের প্রেক্ষাপটে সব নারীপুরুষই মনে মনে বহুবিবাহ পূজারী এবং সুযোগ পেলে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে প্রত্যেকেই সাবলীল ও অনুশোচনাহীন, এমনই এক তত্ত্বের প্রচারে উদ্বুদ্ধ সমরেশ বসু তাঁর 'প্রাচীর' উপন্যাসে। কাল ও দেশের গণ্ডী পেরিয়ে গেলে মহাভারতের ও কাহিনী তো কোন সাড়া-জাগানো ব্যাপারই নয়। কিংসলে এনিস এর নায়িকা সাইমন তার ভাল-লাগা পুরুষের পাশে শুতে শুতে বলে 'তুমি আমার ৪৪তম পুরুষ।' কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হয়ে 'ভাললাগা' কথাটা দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ 'প্রাণবান এক রমণীয় বস্তু'র ঊর্দ্ধে দ্রৌপদীর মূল্য কখনই নির্ণীত হয় নি, আর নির্ণীত হয় নি বলেই যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিই নয়, স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ করে খেলতে পারে। যাই হোক্, দ্রৌপদীর সকাম স্বাধীন অস্তিত্ব যদি থাকতো, তাহলে পঞ্চস্বামী নিয়ে ঘর করার একটা স্বাভাবিক কার্যকারণ নির্দেশ করতে পারতাম। ফ্রাসোয়া সাগাঁ তাঁর **'The Four Chambered Heart'** উপন্যাসে হৃদয়কে সমান চারভাগে বিভক্ত করে চারটে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে দেখিয়েছেন যে চারটে আলাদা আলাদা স্থানে একই সময়ে হৃদয়ের লেনদেন সম্ভব। হৃদয়ের চার প্রকোষ্ঠ তত্ত্বে যদি বিশ্বাস করি, তাহলে পাঁচ প্রকোষ্ঠে বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব নয়। আর দ্রৌপদীর 'বস্তু' পর্যায়ভূক্তি না ঘটলে ধরে নিতে পারতাম উনি পঞ্চস্বামীকে হৃদয়ের পৃথক পৃথক পাঁচ কোঠায় স্থাপন করে বেশ আয়েশেই দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে ও বালাই-এর কথাই ওঠে না।

এখন চিন্তা করুন তো, ঠিকবিবাহের পরেই দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডব পরিবেষ্টিত

অবস্থায় দ্রুপদ রাজগৃহে বাসরসজ্জায়! কোন্ imagery আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে? কসাইখানার ঝোলানো এক টুকরো মাংসকে ঘিরে লোভী চক্‌চকে চোখে ক্ষুধার্ত পাঁচ শারমেয়ের উপবেশন? হয়তো উপমাটা একটু grotesque। কিন্তু Tolstoy এর সেই গল্পের প্রেক্ষাপট বোধহয় এই রকমই। বিজিত এক অঞ্চলের সরাইখানায় বসে বিজয়ী চার কশাক সৈন্য ঐ অঞ্চলেরই নতুন মা-হওয়া এক যুবতীকে ধরে এনে কোল হতে কোলে স্থানান্তরিত করে তাস আর কাম দু'খেলারই একই সময়ে মজা লুটেছে। যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, পঞ্চপাণ্ডব পরিবৃত দ্রৌপদীর ছবিটা কোনক্রমেই সুখদায়ক নয়। একটা বিশেষ সভ্যতার আঙিনায় দাঁড়িয়ে মহাভারতকারের এ ধারণাটা প্রখর ছিল যে ব্যবহারিক জীবনে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী যৌন সম্পর্ক বেশ অস্বস্তিকর। তাই মহর্ষি নারদ মুখনিসৃত সুন্দ-উপসুন্দের উপাখ্যানের উল্লেখ এবং উপসংহারে দ্রৌপদী সম্পর্কিত যৌন জীবনে পঞ্চপাণ্ডবের এক অবশ্য পালনীয় 'code of conduct' এর সৃষ্টি : "মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ মহর্ষি নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবে, তখন অন্যজন তথায় যাইতে পারিবে না; যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।"

ভারতচন্দ্রে বিদ্যা-সুন্দরের রতি ও বিপরীত রতিক্রিয়া বর্ণনা হয়তো রুচিশীল সংস্কৃতিবান পাঠকের কাছে অশালীন মনে হতে পারে, কিন্তু দুই অবিবাহিত যুবক-যুবতীর সকাম প্রেম, যারা বিবাহকার্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ে উন্মুখ, কখনই ভ্রষ্টাচার হিসাবে আখ্যাত হতে পারে না। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করে একই নারীকে পাঁচজন পুরুষের যুগপৎ ভোগ, ভ্রষ্টাচার ছাড়া অন্য কোন নামেই আখ্যাত হতে পারে না। আবার ইংলণ্ডের এলিজাবেথ-পরবর্তী যুগের কথা উল্লেখ করি। আমরা যাকে রক্তসম্পর্কিত নিষিদ্ধ সম্পর্ক বলি, সভ্যতার ক্রম-অগ্রগতির সাথে সাথে সেই সেই ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্ক স্থাপন একান্তই নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ঐ অবক্ষয়ী যুগে নাট্যকারেরা সেই নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলোকেই নাটকে নানা রঙে, রসে চিত্রিত করলেন। আমরা জানি সামাজিক ঐ অবক্ষয়ের যুগে

ঐটাই ছিল স্বাভাবিক। 'মহাভারত' রচয়িতার সমকালীন অবক্ষয়ই কি উল্লেখিত ঘটনায় প্রতিফলিত? মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার অনুসন্ধিৎসু পর্যালোচনা মনে হয় এ সিদ্ধান্তকে অপ্রামাণ্য রেখে দেয় না। আর একটি ঘটনার উল্লেখ বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাবৎ মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মযাজক ও যাযিকাদের বহু ভ্রষ্টাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু এ কাহিনীও ভূরি ভূরি বিদ্যমান যে কোন আর্ত নারীর উদ্ধারে বলিষ্ঠ পুরুষ তার সর্বস্ব পণ তথা জীবন উৎসর্গ করেছে। শিভ্যালরি নিঃসন্দেহে পুরুষের এক প্রশংসনীয় গুণ। কিন্তু কি ঘটেছিল দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ করে যুধিষ্ঠিরের হেরে যাওয়ার পর? বিস্রস্ত-বেশ দ্রৌপদীকে দুঃশাসন যখন চুল ধরে টেনে এনে বিবস্ত্রা করার জঘন্য নোংরা কাজে লিপ্ত হয়েছিল, সভার কোন কোণ হতে কি বিন্দুমাত্র একাজ প্রতিহত করার চেষ্টা হয়েছিল? হয়নি যে তা আমরা দ্রৌপদীর দুঃশাসনকে উদ্দেশ্য করে ধিক্কারের বাণী হতেই জানতে পারি: "হে দুরাত্মণ! আমি রজস্বলা; তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণ সমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিস্; ইহারা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধহয় উহাদিগের ইহাতে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্মে ধিক!"

শুধু উল্লেখিত ঘটনাগুলোই নয়, এমনি আরও অসংখ্য ঘটনা আছে যা নিঃসংশয়ে এ সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে 'মহাভারতে এক অবক্ষয়ী সমাজ-ব্যবস্থারই প্রতিফলন ঘটেছে।' বলাই বাহুল্য, মহাভারতের প্রকৃত ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই মাত্র দুত্রকটি ঘটনার উল্লেখ তৎকালের সামাজিক ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়েই সামান্য ইঙ্গিত দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে।

পূর্ণেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

দুই পারে দুই কবি

অনুপ মতিলাল

এই শতকের প্রথমার্ধে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু ভাষাভাষী সৃষ্টিশীল সাহিত্যেই একটি সুনিশ্চিত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল; বাংলা সাহিত্যে এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী প্রবহমানতার অনুষঙ্গে কিছুটা আকস্মিক ও সুফলা, যদিও, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এই অনিবার্য নতুন সংকেত, নতুন ব্যঞ্জনার প্রতিফলন প্রথমেই স্পষ্টত অনুভূত হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে 'সভ্যতার সঙ্কট' দেখেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছিল মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন। যুদ্ধজাত ক্লান্তি ও অনুর্বরতা, রক্তক্ষয় ও শূন্যতা এবং সেই সঙ্গে এদেশেও নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সামগ্রিকভাবেই বাংলা সাহিত্যে এনেছিল এক যন্ত্রণার্ত অভিজ্ঞতা। ইওরোপে দ্রুত-সঞ্চারী ফ্যাসীবাদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতা, স্বদেশে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, ডাণ্ডী অভিযান, বামপন্থী মতবাদের উত্থান, কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বঙ্গ বিভাজন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভ—মাত্র তিরিশ বছরের সংকীর্ণ ব্যাপ্তিতে, ঘনিষ্ঠ পারম্পর্যে সংঘটিত এই সব ঘটনায় স্বভাবতই দেশকাল আক্রান্ত হয়েছিল এক সুতীক্ষ্ণ অনিশ্চয়তায়। যেমন উপন্যাসে, ছোটগল্পে, তেমনি কবিতাতেও স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়েছিল এই সমকাল।

রবীন্দ্রনাথ নামক যে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এতদিন কাব্যাকাশে এক-মেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন, সুদীর্ঘ সত্তর বছরের কাব্যসাধনায় যে বটবৃক্ষ তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে সহসা মুক্ত হয়ে ভিন্নতর পথে যাত্রা, রাতারাতি অন্যতর মানসিকতার পরিস্ফুটন ইত্যাদি সমস্যায় সঙ্কটিত এবং গ্রহণে-বর্জনে, ঐতিহ্যে-আধুনিকতায়, সনাতনে-নতুনে বেপথুমান হলেন রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর প্রথম পঙ্‌ক্তি। প্রাক্তন বিশ্ববীক্ষার অবৈকল্যে আর আস্থা রইল না, একটা অহৈতুক নির্মম আন্দোলন আলোড়িত করল, মানুষের আপতিক ভিত্তি হ'ল নগ্ন—কবি নিয়োজিত হলেন অন্বেষণে। কীটস্ একবার মিল্টন

সম্পর্কে বলেছিলেন 'Life to him would be death to me'. রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও, সকল বিপন্ন দ্বিধা দুহাতে সরিয়ে দিয়ে, নতুন কবির দলও একই কথা ভাবলেন। রবীন্দ্র-গোলার্ধ থেকে মুক্তিই হল প্রাথমিক অন্বিষ্ট। এই কাব্যমুক্তি আন্দোলনের প্রগতি পরিক্রমার প্রথম পরিচ্ছেদটি তাই নানা সচেষ্ট সচেতনতার দ্বিধা থরথর চূড়ে স্থাপিত ছিল। অবশ্যই চিত্রকল্পের নতুনতায়, বক্তব্যের নতুনতর স্বাদে, উদ্যোগে, আবেদনে, অভিজ্ঞতার বিস্তৃতিতে কোথাও আন্তরিকতার অনটনও ছিল না। ক্লাসিক মানসিকতায়, পাণ্ডিত্যে তাঁদের কবিতা এক অনবদ্য শৈলীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্র-প্রভাবকে সজোরে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে এলেন বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, যাঁদের কাব্যকর্ম অমর পদবাচ্য হ'ল।

কিন্তু, বাংলা কবিতার এই দধীচি-দলের প্রয়াসের ভেতর লুকিয়েছিল আগন্তুক সিদ্ধির বরাভয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন সমাপ্তির কাছাকাছি, তখনই, চল্লিশ দশকের গোড়ায়, বাংলা কবিতার মূল পরিবর্তনের যাত্রাকাল সূচিত হ'ল। সমাজচেতনার যে অত্যধিক তীব্রতা অব্যবহিত রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যের যুগলক্ষণ ছিল, এই দশকের কবি যেন ক্রমশই তার থেকে মুক্তি পেতে চাইলেন, আত্যন্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আড়ালে তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন গীতিময়তার করকমলে। বিষয়ে, বর্ণনায়, উপলব্ধিতে এক নবতর কাব্যচেতনা গ'ড়ে উঠল। ছন্দে, শব্দে, উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে, দর্শনের বিভিন্নতায় এই প্রথম বাংলা কবিতা উত্তীর্ণ হ'ল এক অভিনব এবং পরিণত কাব্যলোক। ব্যক্তিক চেতনার গাঢ়তা ছিল যুগধর্ম। জেকিস বারজ্যাঁ (Jaques Barzun) বলেছিলেন, 'The first striking trait of the modern ego is self-consciouness.' সেই আত্মসচেতন ব্যক্তিক চৈতন্যের সঙ্গে এই প্রথম সামাজিক চৈতন্য অন্তর্লীন হ'ল, এক নতুন ভাবনার বোধন বসল যেন আধুনিক বাংলা কবিতায়। এলিয়টের কবিতা বিষয়ে নব্য-চিন্তা 'Poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion' অর্থাৎ আবেগবর্জনেই কবিতার সিদ্ধি এ ধারণা শিরোধার্য করে এ যুগের কবিকুল কাব্যরচনায় মনোযোগী হলেন। বিভিন্ন চিত্রকল্প, ভঙ্গিমা, ছন্দ-মিল নিরন্তর আবিষ্কার করে অনেকেই অনুসন্ধানী প্রতর্ক থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছেন সেই প্রার্থিত প্রমিতিতে যেখানে বক্তব্য

যাই হোক্ না কেন, কবিতা সামগ্রিক অর্থে একটি পূর্ণ অবয়ব পায়, নিটোল পরিপুষ্টি লাভ করে। আলোচ্য সময়েই প্রথম শব্দ নিয়ে শুরু হয় অনিঃশেষ নিরীক্ষা। কেননা এঁরা সকলেই উপলব্ধ ছিলেন সচেতনভাবে যে অভিজ্ঞতাকে কাব্যের শরীরে সরাসরি অনুবাদ করার দায়িত্ব শব্দের। কিন্তু এই শব্দানুসন্ধান শুধুমাত্র শব্দের জন্যেই শব্দ উপাসনা নয় (যেমনটি হয়েছিল সমকালীন ফরাসী দেশে, le mot juste), কবিতার অন্বিষ্ট লক্ষ্য আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সন্নিপাতে এ শুধু শব্দকে মাধ্যম হিসেবে দেখা। (মনে পড়ে, সমকালীন অরুণ ভট্টাচার্যের 'কিছু কিছু শব্দ হাসতে জানে, হাসায় / কিছু কিছু শব্দ কাঁদতে জানে, কাঁদায়' এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'তুমি যত ধোঁকা দাও তুমি যত / চালাক মাছের মত দূরে দূরে ঘোরাফেরা করো, / আমারও ততই / জেদ বেড়ে যায়, আমি / শব্দ নির্বাচনে তত সতর্ক হবার চেষ্টা করি। / ডাইনে বাঁয়ে জমে আছে শব্দের পাহাড়।')

চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে অগ্রযাত্রায় আধুনিক বাংলা কবিতা যে বিস্ময়কর বাঁক নিয়েছিল তার সার্বিক মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের অভিপ্রেত নয়, কেননা তাহলে প্রায় বেশ কিছু কবির কাব্যকর্মের অনুপুঙ্খ আলোচনা অত্যাবশ্যক, প্রয়োজন দীর্ঘ পরিসরের। আমি বেছে নিয়েছি আপাত বিরোধী দর্শনের অথচ মৌলিক সাদৃশ্য-সম্পন্ন দুই কবিকে—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

টি. এস. এলিয়ট বলেছিলেন "Poetry not only must be found only in suffering but can find its meterials only in suffering." বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, বোধকরি অবচেতনেই, এই এলিয়টীয় দর্শন পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। তাঁর কবিতা প্রতিনিয়তই যেন সমকালীন যন্ত্রণায় আর্ত এবং অস্থির। তাঁর যে সব কবিতা স্মরণে স্থির হয়ে আছে দীর্ঘকাল, সেগুলির প্রতিটিই চিত্রিত করে সংবেদ্য পৃথিবীর যন্ত্রণা ও কান্না, ক্রোধ ও অস্থিরতা। তাঁর প্রতিবেশ ছিল বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ, তাই, স্বভাবতই, সংবেদনশীল কবি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কোথাও আত্মস্থ হয়ে তৃপ্ত হতে পারেন নি। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছরের কাব্যসাধনায় তিনি এখনও সুস্থির নন; অন্বিষ্ট সত্যের জন্যে অন্তর্দাহে এখনও এই কবি ক্লিষ্ট এবং জীবন-জিজ্ঞাসায় মুখর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবি বলছেন:

"শুধু বেঁচে বর্তে থাকাই তো একজন মানুষের অস্তিত্ব নয়। নিজের ছোট্ট চিলেঘরটিতে বসে একতারা বাজিয়ে সারাজীবন প্রেম আর অপ্রেমের গান গাওয়া—তাও নয়। মানুষ কোনো ঈশ্বর প্রেমিক বৃক্ষ নয়; সারাজীবন ধরে তাকে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে হয়। আর শুধুই কি রাস্তা হাঁটা? অর্ধেক জীবন তো তার পায়ের নীচে কোনো মাটিই থাকে না তাহলে কিরকম রাস্তা একজন মানুষের? একজন কবির?"

এই পায়ের তলার মাটিকে জানাই কবির কাছে পরমার্থ লাভ, কেননা জীবনের বোধে সজীব কোনো কবির পক্ষেই এই সত্য পরিহার্য নয়

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধ'রে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
যেই গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
পাখিদের ক্ষুধা মেটে;
ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম! (মহাদেবের দুয়ার)

যে-কবি কালের সঙ্গে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করছেন, বেদনার পীড়নে ক্লান্ত হচ্ছেন, ব্যক্তিত্ব ও সংগ্রামের দ্বিবিধ সত্তা যাঁকে মানবিক পৃথিবীর বোধে ভাবিত করে রেখেছে সেই কবিই কিন্তু ক্লান্তির সমুদ্র পেরিয়ে মাঝে মাঝে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে ওঠার আশায় বলিষ্ঠ, কেননা তিনি জানেন

"সমস্ত ব্যাপারটাই অনুভব করার। অনুভব কোনো প্রশ্নের উত্তর নয়। সময়, স্বদেশ, মনুষ্যত্ব—কবি, কবিতা, কবিতার পাঠক—কোথাও যদি একসূত্রে বাঁধা যেতো? হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতো। হয়তো একদিন সব প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে, যেদিন আমরা সবাই মিলে পরিশুদ্ধ হবো।" (শ্রেষ্ঠ কবিতা: দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা)

ঠিক এমনই এক আশাবাদ হীরের টুকরোর মতো জলে ওঠে কবির অনুভবে,

সেই দুর্লভ অনুভূতি সকল অনুতপ্ত বিষাদ, বেদনার্ত অস্তিত্বের উর্দ্ধে গিয়ে কবিকে স্থাপন করে এক নতুন জীবনের প্রত্যয়ে :

… সময় কি হয়েছে তখন ?
চোখ তুলে দীঘি বউ ফসলের ক্ষেতকে শুধালো
তারপর শান্ত হাতে খুলে নিলো বুকের বসন,
সরবতের মতো তার স্তনে মুখ রেখে দিলো আলো
শিশুর মতন হয়ে। পৃথিবীর সর্বত্র হৃদয়
এসে গেল, গানে তার ভরে গেল গানের সময়॥ (চেতনা-সময়)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছন্দ-চেতনা বড় বিস্ময়কর। দুঃখবোধে, অকল্যাণের অমোঘ আঘাতে যখন তিনি আক্রান্ত তখনও আবার যখন তিনি নিবিড় প্রেমের সমুদ্রে নিমজ্জিত তখনও, এই কবি ছন্দকে বুকের ভেতর শুনতে পান। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এই কারণেই যে ক্ষুব্ধতা ও প্রেম, মৃত্যু ও জীবন সর্বত্রই তিনি আদ্যপান্ত ছন্দোময়।

এক. মারতে জানা যত সহজ
মরতে জানা তত সহজ নয়,
তাই কি ভাবিস্ ? তাই কি দেখাস্ ভয় ?
এইটুকু তো বুকের মণি
তাকেই আবার টুক্‌রো করা চাই ?
ভুলেই গেছিস্ ওরা আমার ভাই ! (একটি আত্মার শপথ)

দুই. আলোর সায়া দু-হাতে ছিঁড়ে ফেলে
এখুনি কেন নিবিড় হয়ে এলে ?
বলো, বলো,
শরীরে বুঝি শ্রাবণ এসে পড়েছে কেঁদে, বলেছে, 'দ্বার খোলো।'
… … … …
তনুতে কথা গানের মতো বাজে,
মুখের কথা হারালো কোন্ লাজে ?
বলো, বলো,

শরীরে বুঝি মাতাল হাওয়া পাগল হয়ে বলেছে, 'দ্বার খোলো !'

(রাত্রি-কে)

খুব সহজ চিত্রকল্প নির্মাণে ও প্রতীকী শব্দের ব্যবহারে কবি অনায়াস। ভাষার ব্যঞ্জনা ও সুমিত কাব্যশরীর গড়ে তোলায় কবি অনবদ্য শিল্পী। তাই তাঁর কবিতা এত প্রাণবন্ত ও স্রোতস্বিনী নদীর মত বেগবতী। কোনো অবস্থাতেই জীবনের অবিনশ্বর সুর থেকে কবি বিচ্যুত হ'ন না, তাই, বামপন্থা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ হয়েও কবিতায় তিনি চিরন্তন সুষমায় মহিমাময় মহান্। সুবিন্যস্ত পরিমিতি তাঁর প্রায় সকল কবিতাতেই ছড়িয়ে আছে। শ্রেণীবৈষম্যে আক্রান্ত এই পাপদষ্ট সমাজের অনাচারের প্রতি ক্রোধ বর্ষণেও কবি কি অসম্ভব মিতবাক্। 'ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে' বা 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে' কবিতাগুলি বিস্ময়কর। কবির পরিমিতি বোধের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উদ্ধৃত করছি :

ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম
শঙ্খচুড়ের কান্না :
'এ আনন্দ অসহ্য, বোন,
দিস্ নে লো আর, আর না।'
জেগে উঠলাম : দেখতে পেলাম
আর-না-দেবার সুখে
কেয়া ফুলটি ঘুমিয়ে আছে
বিষধরের বুকে। (ঘুমের মধ্যে)

বস্তবাদী অভিজ্ঞতা-অবলম্বী ও চেতনার এবং প্রত্যয়ের ধারাবাহিক প্রবহমানতায় বিশ্বাসী কবি নীরেন্দ্রনাথ ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেও সমসাময়িকতাকেই তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন। অন্বেষণী এবং বিষয়বস্তু-মগ্ন এই কবি সমস্ত কাব্যজীবনে অভাবনীয় উদ্যোগে আঙ্গিকচর্চা করেছেন আর সেই চর্চার অনুষঙ্গে শব্দকেও ইচ্ছে মতন ব্যবহারে তিনি অসম্ভব দক্ষ। কবিতাই তাঁর অস্তিত্ব, কাব্য তাঁর রক্তের ভেতর খেলা করে। 'কখনো এর, কখনো ওর দখলে / গিয়েও ফিরি তোমারই টানে, কবিতা। / আমাকে নাকি ভীষণ জানে সকলে, / তোমার থেকে বেশী কে জানে, কবিতা ?' 'নিজের

কাছে স্বীকারোক্তি' কবিতার এই ছত্রগুলি থেকে বোঝা যায় কবি কতখানি কবিতার কাছে কমিটেড্। কবিতার রহস্য তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে, নিজের ইগো-তে হেনেছে আঘাত, বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়েছেন কিন্তু তবু তাঁর সমর্পণের ভাষা খুব স্বচ্ছ 'আমি রাজ্য জয় করে এসেও / তোমার কাছে নত হয়েছি, কবিতা। / আমি হাজার দরজা ভালবেসেও / তোমার বন্ধ দুয়ারে মাথা কুটেছি;' কবিতার কাছে এমন নিঃশর্ত সমর্পণ আছে বলেই বিষয়বস্তু নির্বাচনেও কবির শুচিবায়ু মনোভাব নেই—যেমন করেই আসুক সে অন্যভাবে, সে-তো তবু কবিতা।

> এক একটা কবিতা যেন রমনীর নখে, ওষ্ঠে, জঙ্ঘাদেশে, হাতের মুদ্রায়
> বিষাক্ত ফুলের মতো ফোটে।
> এক একটা কবিতা যেন ঝড়ের ভিতর হয়ে ওঠে
> নিয়তির কণ্ঠস্বর। (কবিতা '৭০ : উলঙ্গ রাজা)

অভিজ্ঞতা-অর্জন বস্তুটি চলমান বলেই যে-কোন কবিই তাতে আস্থাবান্ হতে ভালবাসেন। নীরেন্দ্রনাথ তাই জিজ্ঞাসু, পূর্বোক্ত কবির মতই তিনি জীবনের নানা কূট প্রশ্নে' ঘটনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনে উৎসুক। সব কিছুকে পরখ করে দেখে নিলে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয় গড়ে ওঠে আর সেই 'পরম প্রত্যয়ের শান্তি / শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখে।' 'কবিতার দিকে' প্রবন্ধে নীরেন্দ্রনাথ বলছেন :

> "হোক্ আর নাই হোক্, আমার চোখ আর কান আমি খোলা রেখেছি। টান-টান করে বাড়িয়ে রেখেছি আমার আঙুল। সব কিছু আমাকে শুনতে হবে। সব কিছু আমি ছুঁতে চাই। জানিয়ে যেতে চাই, কোন্ দৃশ্য আর কোন্ কণ্ঠ আমার কেমন লেগেছিল; কোন্ বিদ্যুৎবাহী তারকে স্পর্শ করে আমি কতটা শিউরে উঠেছিলুম।"

জীবনের প্রাত্যহিক আটপৌরে অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে তাই নীরেন্দ্রনাথ যে কবিতা রচনা করেছেন তা' টুক্রো টুক্রো মুহূর্তকে সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনায় বিধৃত করেছে। 'বাতাসী' 'কলকাতার যীশু', অথবা 'রাজপথে কিছুক্ষণ' কবিতাগুলিই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর সমকালীন শহুরে সভ্যতার প্রতিবেশ, সেখানকার দুঃখ-বেদনা, আর্তি, প্রচ্ছন্ন কৌতুকে খুব সহজ চিত্রকল্পে এবং শব্দে অনায়াসেই নীরেন্দ্রনাথের কলমে ধরা পড়ে। 'এবং নেড়ীকুত্তাটিকে খুব যত্ন করে

আমার / সোফার ওপরে বসাই।/ তারপর টেলিফোনের মাউথ পীসটাকে / তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি, / যদি বাঁচতে চাস্ হারামজাদা, / তাহলে আয়, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল্ : / হ্যালো দম্‌দম্‌...হ্যালো দম্‌দম্‌...হ্যালো।' প্রতিদিনের গার্হস্থ্য, মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতাকে মুখের কথায়, কথ্য ভাষায় কাব্য-অন্তর্ভুক্ত করে কবি সচকিত করেন, রচনা করেন কবিতাতে মাঝে মাঝে ছোট-গল্পের মত নিপুন ডিটেল এবং চমক। 'আমি মশায় নামছি নে, / জায়গা যখন পেয়েই গেছি, / তখন এর উস্‌পার না-দেখে আমি ছাড়ব না।' বা 'এমন নয় যে শোবার দোষে ঘাড়ে ব্যাথা'—যথাক্রমে এস্‌পার উস্‌পার ও ঘুমের মধ্যে কলহ কবিতাদ্বয়ের ঐ ছত্রগুলি যে-কোন প্রাচীনপন্থী কাব্যপ্রেমিককে নিঃসন্দেহে বিব্রত করবে, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার এই নতুন ছন্দ ও আঙ্গিক-লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সহজেই পৌঁছে দেয় পাঠকের হৃদয়াভ্যন্তরে।

এই কবিই কিন্তু অন্যত্র জীবনের গভীরতর অন্বেষণে ভিন্নরূপে, গভীরতর চিত্রকল্পে উপস্থিত করেন নিজেকে; 'তারার তিমিরে' কবিতায় 'মনে হয় ভুলে গিয়ে ফুল, পাখি, পরিচিত বন্ধুদের নাম / আরো কিছুকাল এই অন্ধকারে থেকে যেতে হবে'—এই শেষ দুটি ছত্র অন্ধকারের উদ্বেগে বিপন্ন অথবা আলোর গোপন নিভৃত আকাঙ্ক্ষায় আশাবাদী কবিকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। 'অন্য যন্ত্রণার দিকে' কবিতায় যে শাশ্বত অনুসন্ধান, অন্বেষণের উল্লেখ, তা' এক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য এক শুদ্ধির অধ্যায়ে উদ্বর্তনের পরিচ্ছেদ। কিন্তু এই গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গেও মিশে থাকে কবির স্বভাবের গভীরে অবস্থিত সংস্কার, ঘরোয়া দুর্বলতা: 'একটা পরিচ্ছেদ আমাদের পিছনে পড়ে রইল। / থাক্। / পোড়া কাঠ আর ভাঙা কলসির দিকে / ফিরে তাকাবার নিয়ম নেই। / চলো, আর এক পরিচ্ছেদ আমাদের ডাকছে।'

সংস্কার, অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাস বারবার ঘুরে ফিরে নীরেন্দ্রনাথের কাব্যকর্মে এসেছে। নিরাভরণ ছন্দে, অনবদ্য প্রয়োগশৈলীতে রচিত এই কবিতাটি আমাকে টানে:

> হাত থেকে যদি চিরুনি খসে পড়ে, তাহলে কী হয়,
> আপনারা তা জানেন?
> জানেন না।

আমি কিন্তু জানি।
বাড়িতে কেউ-না কেউ আসে।
আঙুল দিয়ে যদি কেউ আঁচলটাকে বারবার জড়ায়,
বারবার জড়ায়,
তাহলে যে তার কিছু নিশ্চয়
অর্থ থাকে, আপনারা তা মানেন ?
মানেন না।
আমি কিন্তু মানি।
কেউ তাকে নির্ঘাত ভালবাসে।

(চিরুনি ; নক্ষত্র জয়ের জন্য)

এই কবি কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জানেন যে কবিতা নেহাৎ ভাবনাবিলাস নয়, শব্দ-ছন্দের ছেলেখেলা নয়, তার সর্বোপরি এক চিরন্তনী সামাজিক ভূমিকাও রয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সমাজের সংগ্রাম, সেই সমাজেরই জাতক এই কবি ; তাই কোথাও বা সেই বেদনার্ত, সকরুণ, দুঃস্থ সমাজের ভাষ্যকার হয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ, অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁর নৈতিক সংগ্রাম বেধেছে ; এই অনাচারের সঠিক মূল্যায়নে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতই কখনো তিনি পৃথিবীর গভীর অসুখ দেখেছেন, কবিতায় বিধৃত করেছেন সেই ক্ষুব্ধ মানসিকতা :

এক. দ্যাখো যদি পারো
ধূল্যবলুণ্ঠিত এই সংসারের সম্মান বাঁচাতে…
দ্যাখো পারো কিনা
অন্য কিছু দিতে তার হাতে।
দ্যাখো পারো কিনা এই সংসারের অসুখ সারাতে।

(অসুখী সংসারে)

দুই. কলকাতা শহরে
পয়সা মেলে, টাকাটা সিকিটা তাও মিলে যায়
কিন্তু ভিক্ষা কিছুতে মেলে না।

(নিকেল তোমার জন্য)

তিন. জানি রে সিতাংশু, তোর ঘরের চরিত্র আমি জানি।
ওখানে অনেক কষ্টে শোয়া চলে, কোনক্রমে
দাঁড়ানো চলে না।
(দৃশ্যের বাহিরে)

চার. যে পৃথিবী তোমাকে চায় নি,
তুমিও অক্লেশে তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারো ;
(চতুর্থ সন্তান)

শুধুমাত্র লিরিকধর্মী কবিতাতেই নীরেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত অথবা তিনি শুধুই প্রত্যক্ষ জীবনের ফটোগ্রাফিক ডিটেল রচনায় ব্যস্ত এই হেন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওপরের ছত্রগুলি তুলে ধরেছি এবং জেনেছি যে শুধুমাত্র ছন্দের ব্যবহার ছাড়া যন্ত্রণাদগ্ধ এই সভ্যতার অন্ধকারের বুক চিরে যেমন মানবিক অন্য দুই সমকালীন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তেমনি নীরেন্দ্রনাথও, যদিও তাঁর ভাষ্য পৃথক।

কবিতা ছাড়া অন্য কিছুকেই তাঁর বক্তব্যের মাধ্যম হিসেবে কবি কল্পনা করিতে পারেন না। নীরেন্দ্রনাথের যেন কোনো প্রার্থিত লক্ষ্য নেই, সময়ের সিঁড়ি বেয়ে তিনি কোনো বাঞ্ছিত শীর্ষে উঠে যেতে চান না। তাই মনে হয়, যে কবি বলেন, 'প্রতিটি নিঃশ্বাসে/যা-কিছু গ্রহণ করছি বুকের ভিতরে,/যা-কিছুতে হাত রাখছি, কিংবা বাঁ পায়ের/লাথি মেরে হটাচ্ছি যা-কিছু,/তাহাই কবিতা? সেই কবি বেশীটাই তাৎক্ষনিকতায় বিশ্বাসী হবেন, এতো স্বাভাবিক। অন্বেষী কবির অন্বেষার ফসল যদি পূর্ণাঙ্গ না হয় তবে তা তো সমকালের ঘেরাটোপে মাথা কুটে মরবে। কবি নিরীক্ষামগ্ন, শব্দের প্রয়োগে অতি সচেতন, অঙ্গিকের নিত্যনতুন গবেষণায় পরিশ্রমী—কিন্তু চিরকালীন কাব্যের কাছে তাঁর সমকালীন আবেদন কতটুকু ধরা থাকবে, এই নিয়ে বড় সংশয় হয় ; যদিও জানি, অনেকটা নীরেন্দ্রনাথের স্বীকৃতি থেকেই, তিনি নিজে এ নিয়ে মোটেই ভাবনাচিন্তা করতে চান না। হয়তো, তার কাব্যদর্শনের এইটেই মূল উপজীব্য। এই সাময়িক পৃথিবীতে সাময়িকতাকেই জীবনের দৃশ্যপটে ধরে রাখা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গদ্য

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথে বেশ কিছু পেছনে গেলে সাধারণ প্রায় সকলের মুখে একটা অনুযোগ শোনা যেত—সেটা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে। সে অনুযোগ কমে নি; বরং প্রতিদিন বেড়ে বেড়ে আজ অভিযোগের স্তরেই এসে দাঁড়িয়েছে। তা হল কবিতা আর কই? কবিতা বলে এখন কিছু আছে নাকি! না ছন্দ, না মিল এ আবার কি ধরণের কবিতা? একে গদ্য বললে ক্ষতি কি! অর্থহীন কিছু শব্দকে গদ্যভঙ্গিতে লিখে ছোট-বড় করে সাজিয়ে দেওয়া যদি কবিতা হয় তাহলে অমন কবিতা পড়ার দরকার নেই।

পাঠকদের এই সাধারণ বিরক্তি, এই অনীহা লক্ষ্যণীয়। যদিও এখানে আমি কবিতা কেন গদ্যর কাছাকাছি হয়ে গেল তা নিয়ে কোনো আলোচনা করছি না। এই লেখার বিষয়বস্তু কবিতা নিয়ে নয়, বরং গদ্য নিয়ে। হ্যাঁ, বিশেষ একজনের গদ্য লেখার বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে কবিতার প্রতি সাধারণ এই অভিযোগটুকুকেই আমি প্রথম তুলে নিলাম।

আমি যাঁর গদ্য নিয়ে আলোচনা করব তাঁর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ গদ্য পাঠক তাঁর গল্প উপন্যাস প্রভৃতি পড়ে স্বতই অভিযোগ করতে পারে—এ আবার কেমন গদ্য? এতো গদ্যের ভঙ্গিতে সাজানো পাতার পর পাতা কবিতা।

ছোট-বড় লাইন করে আরো কিছু দুর্বোধ্যতা মিশিয়ে দিলেই এঁর লেখাগুলো স্বচ্ছন্দে কবিতা হয়ে যেত। লেখক কি গদ্য লিখতে বসে ভুল করে কবিতা লিখে বসেছেন? সত্যিই এমন কথা মনে পড়ে যখন আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমগ্র গদ্য-সাহিত্য পড়তে থাকি।

সবচেয়ে বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একেবারেই গদ্য সাহিত্যিক, কবিতা তিনি কদাচ লেখেন নি; অন্তত ছাপার অক্ষরে তাঁর কোথাও কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না; অথচ আজকের গল্পকার ঔপন্যাসিকদের লেখা পড়তে বসলে তাঁকে এই একটি ব্যাপারের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে হয়। নিরেট তার ঠাস-বুনোন গদ্যগুলো যেন কেমন করে

অনায়াস কবিতা হয়ে যায়, যা মনে হয় লেখবার সময় কিংবা লেখার পরেও তিনি টের পান না।

এই প্রসঙ্গে প্রয়াত আর একজনের কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে—তিনি কমলকুমার মজুমদার; জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতোই যাঁর গদ্যানুক্রমে ছিল কবিতার রহস্যময় রূপান্তর।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দীর্ঘদিন গল্প উপন্যাস লিখছেন; তাঁর ছোট গল্প বোধ হয় বাস্তবতার দিক দিয়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী—অথচ সেই বাস্তব, জীবন-সংগ্রামে অন্তর্লিপ্ত গল্পগুলির মধ্যেই কবিতার ছত্র যেন পরম্পরা রহিত হয়ে স্বতোৎসারিত হয়েছে, যা তাঁর সমকালীন অন্য কোনো লেখকের রচনায় পাওয়া যায় না একমাত্র কমলকুমার মজুমদার ছাড়া। যদিও দুজনের গদ্যশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের।

আমার মনে হয় প্রতিটি লেখকের ভেতরেই অগোচরে একজন কবি বাস করে, যার প্রেরণায় লেখকের রচনা রসোত্তীর্ণ হয়। কিন্তু সেই লুকিয়ে থাকা কবি রচিত গদ্যে কচিৎ নিজেকে জাহির করে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বেলায় ঘটেছে ব্যতিক্রম। এখানে হৃদয়স্থিত কবিমন যেন অহরহ তাঁর রচনার মধ্যে নিজেকে বিশেষ এক মহিমায় হাজির করে পাঠককে অপূর্ব এক কল্পলোকের মায়াময়তায় নিয়ে যায় বাস্তবের সিঁড়ি ভেঙে।

'শালিক কি চড়ুই' গল্প বেশ কিছুকাল আগের; তার অনেক পরের গল্প 'গিরগিটি'; তারও পরের রচনা 'আলোর পাখি'—অথচ বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েও এরা যেন একটা সামগ্রিক সময়কে ধরে রেখেছে; যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সময়ের সঙ্গে জীবনের অপূর্ব সহবাস।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনায় যেন তুলির পর তুলি দিয়ে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প এঁকে গেছেন; তা এত অনায়াস, এত সুসম, যা একজন সমসাময়িক কবির নামকরা খুব বেশি কবিতার মধ্যে দেখা যায় না।

নির্জনতা, গাছগাছালির নিবিড় মায়ামমতা, সময়ের ভয়ঙ্করতা, জৈবিক ক্ষুধার প্রাকৃতিক নগ্নতা, ভাল লাগার মাধুরী মেশানো বিষন্নতা, জীবনের অমোঘ পরিণতি, নিষ্ঠুর নিয়তির আয়োজিত সত্যতা এ সব কিছুই তিনি এর নির্লিপ্ত মন নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় গদ্যে।

যা আসলে গদ্য হয়েও কবিতার কাছাকাছি, কাছাকাছি না বলে অনুগামী বা অনুসারী বলাই ভাল !

'মীরার দুপুর' 'সূর্যমুখী' উপন্যাসে, 'গ্রীষ্মবাসর'-এর মতো উপন্যাসোত্তম বড় গল্পে কি যাদুর কাঠি তিনি ছুঁইয়ে দিয়েছেন যা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। পাতার পর পাতা পড়তে ক্লান্তি আসে না। এ গদ্য পুরনো হয় না বারংবার পঠনেও, কারণ এ যে কবিতার সমগোত্রীয়।

জ্যোতিরিন্দ্র লিখেছেন প্রচুর। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু আজকের ক্ষয়ে-আসা মধ্যবিত্ত সমাজের রূঢ় বাস্তবতাকে নিয়েই। কাল্পনিক কোন গাল-গল্পের অবকাশ তাঁর রচনায় নেই, অথচ সেই রচনার বর্ণনা বচন ক্ষমতা, শব্দ নির্বাচন, বাক্য বিনাস, রূঢ়তাদের আড়াল করে উজ্জ্বল এক বর্ণময়তা প্রাণ পেয়ে হৃদয়ে সবটুকুকে গ্রাস করে। প্রেমের ব্যাপারে, প্রত্যাখ্যানে, জৈব চাহিদায়, দৈনন্দিন অভাব অভিযোগে সর্বত্রই কবিতায় সহস্পর্শ ঘিরে থাকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প উপন্যাসকে—যা অন্য কোনো লেখকের রচনায় এমন নিবিড় হয়ে ওঠে না।

শহুরে জীবনে অভ্যস্থ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্র কোথায় যেন নাগরিক নন। তাঁর সারল্য, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও অধিকাংশই শহুরে মধ্যবিত্ত জীব, অথচ এক নিরহঙ্কার গ্রাম্য অকপট বোধ থেকে তাদের তিনি তুলে ধরেছেন নিজের এক প্রত্যয়সিদ্ধ কায়দায় যা কবিতায় সাফল্যর বহন করে।

'বন্ধুপত্নী' গল্পের পরিবেশ বিষণ্ণতা গল্প শেষ হয়ে যাবার পর তার রস মনকে এমন এক জায়গায় পৌছে দেয় যা আপাতবুদ্ধিতে পৌছনো যায় না; শুধু উপলব্ধির পথ ধরে পাঠককে মোহগ্রস্থ ক'রে ধীরে ধীরে নিয়ে যায়। জ্যোতিরিন্দ্র এই অনায়াস-সিদ্ধ তাঁর সাহিত্য জীবনে ঈশ্বরের অকৃত্রিম আশীর্বাদ বলেই আমার বোধ হয়েছে; আর একমাত্র এ কারণেই তাকে হিংসা করতে ভয়ঙ্কর ইচ্ছে করে। আবার আর একদিকে মনে হয়েছে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট এই গদ্যভঙ্গির জন্য—যা গদ্য হয়েও অনাবিল কবিতা, তাঁর জনপ্রিয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে অনেকাংশে।

দীর্ঘদিন লিখেও, অনবদ্য সব গল্পের জন্ম দিয়েও, শরীরের লোমকূপে লোমকূপে রোমাঞ্চ ছড়িয়েও তিনি যে জনপ্রিয় হতে পারেন নি এটা পাঠকমাত্রেরই জানা। এর কারণ তাঁর গল্পে সেই জিনিস রয়েছে যা একমাত্র বিদগ্ধজন ও রসবেত্তা

ছাড়া সহজে গ্রহণ করতে পারেন না—তিনি সহজ সাধারণ পরিবেশ রচনা করেও কোথাও এক দুরালেখ্য গভীরে চলে যান যাঁর অর্থ সাধারণ পাঠক খুঁজে পায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আমার মতে লেখকদের লেখক—তিনি লেখকদের জন্যই যেন লেখেন। বোধহয় অনুচ্চারে বলতে চান দেখ কবিতা কত সুন্দর, কত গভীর, কত ব্যঞ্জনাময়। যেমন কবিরা, লেখকদের লেখক।

তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন' যেখানে কবিতার কোনো প্রশ্রয়ই নেই, সম্পূর্ণ ঝরঝরে গদ্যের পরিবেশ, সেখানেও তিনি ঝকঝকে ভাষার শৈলী ও বীরত্বকে পদ্যতে নিয়ে এসেছেন পরম অবহেলায়। আসল বড় লেখক মাত্রেই বড় কবি—একথা হয়তো প্রমাণ করা যায়, তবু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যে কোনো লেখা নিয়ে প্রমাণ না করেই সহজে বলতে পারা যায় এই গদ্য পদ্যছন্দে লেখা নয় তো? এবং একথাও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যায় এমন নিটোল সুন্দর কবিতা লেখবার জন্য লেখক সামান্যতম সচেতন চেষ্টা করেন নি। তাঁর অবচেতনে এক এক অনন্ত কবিতার ভাণ্ডার রয়ে গেছে যা থেকে তিনি তুলে তুলে পাঠকদের এতকাল উপহার দিয়ে আসছেন।

তাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গদ্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি বিপরীত দিক দিয়ে শুরু করেছিলাম—আজকের আধুনিক কবিতা সম্পর্কে পাঠকদের যে অভিযোগ তা কতখানি কবিতা, তেমনি বহু পাঠকই চোখ বুঁজে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কোনো গল্প বা উপন্যাস পড়ার পর জানতে পারে এইসব মুক্তোর মতো দ্যুতিময় রচনা-গুলো সত্যিই গদ্য!

সকল লেখকেরই লেখার কিছু কিছু পরিবর্তন উত্তরণ দেখা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। যত বয়স বাড়তে থাকে তত লেখার মধ্যে অভিজ্ঞতার উপলব্ধির চেতনার পরিপূর্ণতার ছাপগুলি ক্রমনিয়মানুসারে এসে যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তা পাই না। অদ্ভুত তার ক্ষমতা! সেই প্রথম বয়স থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় চার দশক জুড়ে তিনি এক ধরণের গদ্য লিখে আসছেন যা প্রথমদিন যেমন চমকপ্রদ ছিল আজও তাই। তখন যেমন জীবনের যে আলোছায়া তাঁর লেখাকে ঘিরে ছিল আজও তেমনি মগ্নতা চেতনায় আলো-আঁধারিতে তা ছেয়ে আছে। লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে আমি কিছু বলছি

না, কিন্তু গদ্যভঙ্গিতে কোনো ফাঁকি নেই, কোনো কায়দা নেই—অকপটে তিনি কাপড়ের পাটের পর পাট খুলে ধরছেন একই নিপুণতায়।

একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া যাক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প থেকে :

শিশুরা ঘামছে……

স্বপ্ন দেখে একটু হাসছে।

স্বপ্ন দেখে একটি কাঁদছে।

শিশুরা একরকম।

বাবারা একরকম না। একটি বয়স্ক মানুষে আর একটি বয়স্ক মানুষ থেকে সাত হাত দূরে থেকেছে।

আজ দুজন এসে রকে বসেছে। পাশাপাশি বসেছে।

বৃষ্টি হবে কি?

বসন্তে বৃষ্টি হলে মন্দ কি। দুটি বাবা এই প্রথম কথা বলল।

দেখুন, খুব পোকা উড়ছে।

পোকারা আলোর কাছে ছুটে এসেছে।

মালাই বরফ যাচ্ছে।

ডাকুন-না।

দুটি বাবা এক হয়ে গেছে। মাছ ধরতে না পেরে কবিতা লিখতে না পেরে প্রায় বুড়িয়ে যাওয়া দুটি মানুষ শিশু হয়ে গেছে। মাছ পোকা মালাই বরফে একরকম উৎসাহ, এক স্বাদ। বসন্তের বৃষ্টি দক্ষিণের হাওয়া। এক রং। একরকম অবসাদ। কখনও কখনও বাবারা শিশু হয়।

[দুই শিশু : আজ কোথায় যাবেন]

অজয় দাশগুপ্ত

বৃটিশ কাউন্সিলে কবি টনি কোনর

ব্রিটিশ কাউন্সিল ডিভিশনের ক'লকাতা শাখা প্রায়ই আমাদের ইওরোপীয় এবং মুখ্যত ইংলণ্ডীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সমকালীন ধারার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দেন। এমনই এক উদ্যোগে, বেশ কিছুদিন আগে, ক'লকাতায় এসেছিলেন ওদেশের এক বিশিষ্ট সাম্প্রতিক কবি, টনি কোনর (বর্তমানে মার্কিন প্রবাসী)।

জন অ্যান্টনি অগষ্টাস কোনরের জন্ম ম্যাঞ্চেষ্টার-এর ল্যাঙ্কাশায়ার শহরে, ১৯৩০-এ। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ট্যাক্স ড্রাইভার ও পরে টেক্সটাইল ডিজাইনার হিসেবে মূল্যবান যৌবন অতিবাহিত করেন। ষাটের দশক থেকেই তাঁর আশৈশব সাহিত্য-সাধনার ফললাভের সূচনা। ১৯৬১-৬৪, তিনি বোল্টন টেকনিকাল কলেজে লিবারেল ষ্টাডিজ-এর সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৭-৬৮ মার্কিন মুলুকের ম্যাসাচুসেটস্-এ আমহার্ষ্ট কলেজে ভিসিটিং পোয়েট হিসেবে কবিতা-বিষয়ক বক্তৃতা করেন। ১৯৬৮-৬৯ ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ওয়েসলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিটিং পোয়েট ও লেকচারার পদে বৃত হ'ন। ১৯৭১ থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন।

বিভিন্ন সময়ে লেখা এই কবির একগুচ্ছ কবিতা হাতে এসেছে। নিঃসন্দেহে, সাম্প্রতিক ইংরেজী কবিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রাসঙ্গিকতায় টনি কোনর একজন ব্রাত্য। কবিতা পড়লে মনে হয়, জীবন ও শিল্প দুই-ই কবির কাছে খুব জরুরি। কবিতাকে তিনি ডেকরেটিভ্ আর্ট মনে করেন না এবং স্বভাবতই সাহিত্যে কলাকৈবল্যে তাঁর বিশ্বাস নেই। কিছুটা খাপছাড়া, বাউণ্ডুলে মানসিকতা, যা শুধু কবির কাছেই প্রত্যাশিত, তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলিতে সহজেই চোখে পড়ে। অনুপুঙ্খ শব্দের চাতুরীতে গাঁথা চিত্রকল্পের পরম্পরায় চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে পারেন এই কবি। বর্ণিতব্যকে হুবহু আবহমণ্ডলে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসেও তিনি সফল। কোনরের কবিতা পাঠ করলে তাঁর দুই শালপ্রাংশু পূর্বসূরি, এলিয়ট এবং পাউণ্ডের চেয়ে মার্কিনী কবি রবার্ট ফ্রষ্টের কথাই বেশী মনে পড়ে।

টনি কোনরের কবিতার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, তিনি নিরুচ্চার শব্দে সোচ্চার বক্তব্য বুনে ফেলতে পারেন অনায়াসে। কবিতার জন্য আলাদা কোন বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট থাকে না, কবি জানেন। তাই গার্হস্থ্য জীবনের টুকিটাকি দুঃখসুখ, শৈশবের ফেলে-আসা স্মৃতি এবং বিবাহ এবং জাতির সেবা—সবকিছু নিয়েই গড়ে ওঠে কবিতা। একটি পূর্ণাবয়ব কবিতার শরীরে শব্দের আপাত বৈভব নেই, আছে প্রকৃত আধুনিক মানের উৎকৃষ্ট সহজধর্মিতা। যা স্বাভাবিক ও সহজ তার নিজস্ব একটি শক্তি থাকে। এবং সেই অর্থে টনি কোনর শক্তিমান কবি।

'Flights' কবিতাটির বিষয়বস্তু ফেলে-আসা শৈশবের স্বর্ণময় দিনগুলির রোমন্থন এবং শৈশবকে হারিয়ে ফেলার হা-হুতাশন। বস্তুত, শৈশবের সারল্য, গোপনতা ও সহজলভ্যতা ক্রমে যৌবনে কবিকে পঙ্গু করে, চলৎশক্তি রহিতও করে দেয়। যে-কবি তাঁর শৈশবে মাটি থেকে মাত্র আট ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেখেছেন জীবন, সকলের আড়ালে শুনেছেন বহু কলহ ও কথোপকথন এবং কখনই যে-সব অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক মনে হয় নি, সেই-কবি মধ্য জীবনে উপনীত হয়ে বলেন

> In mid-life I neither fly
> nor receive the frustrated dead.
> The days are women's bakeing smells,
> and the demanding cries of children.

অথবা খুব সহজ করে কোনর বলেন যে শৈশবের সেই 'gift of flight' বয়স বাড়লে কেমন উধাও হয়ে চলে যায়, যৌবনকে ফেলে রেখে যায়, অশক্ত, দুর্বল, 'Youth crippled the gift somewhat' বা 'By eighteen I could not rise at all' পঙ্ক্তি দুটি হতাশ্বাসের ভারী সরল স্বীকৃতি মনে হয়।

পিতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 'A death in the family' কবিতাটিতে সংবেদনশীল কোনরের পরিচয় মেলে। নিপুণ এবং গোছানো শব্দের বেড়া দিয়ে ঘেরা কবিতাটিকে খুব আধুনিক ছোটগল্পের মত মনে হয়। 'End of the world' কবিতার শুরুতেই চমকে উঠি

> The world's end came as a small dot
> at the end of a sentence.

হঠাৎ একদিন ঈশ্বর সমাহিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন 'I do not love you.' পৃথিবীর মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই অপ্রেম একদিন পৃথিবীকে হঠাৎ নিশ্চিহ্ন করে। কিন্তু কবির মনে হয় যে অমন নিষ্ঠুর ঘোষণার মুহূর্তে ঈশ্বরের কণ্ঠও কম্পিত ছিল। পৃথিবীর ভয়ঙ্কর শূন্যতার বর্ণনায় কবি লেখেন:

...no softening tact, no lover's cant
but sudden vacuum, total eclipse
at sense and meaning.

এখানে lover's cant এবং total eclipse শব্দ দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শূন্যতার বর্ণনায় অসাধারণ বলে মনে হয়।

'A Face' কবিতায় দোকানের জানলায় ঝুলে-থাকা একটি বিচিত্র মুখ কবির সত্তাকে আলোড়িত করে:

Then there's its passionate life
Which I'm sure I 'll never know:
How it behaves in private
When I forget it in grief,
anger, terror, pity, joy
or feeding an appetite.

স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত এইসব অনুভূতির কথা কবির জোরালো অথচ নম্র আঙ্গিকের মধ্যে ধরা পড়ে গভীর দ্যোতনায়।

টনি কোনরের কবিতার জন্ম হয় তাৎক্ষণিক অনুভবের চকিত মুহূর্তে, আহৃত আবেগের বিলম্বিত রোমন্থনে এই কবির বোধহয় আস্থা নেই। কবিতার আগমনে কোনো আবাহন নেই, ঢাক-ঢোল পেটানো উৎসব-বর্ণাঢ্য নেই, (এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবিরুল ইসলামের একটি কবিতা 'কবিতা যখন আসে, আসে: / কোনো আবাহন নেই গাড়ি জুড়ি নেই / অদূর দুয়ারে কেউ প্রস্তুত থাকে না / বাজে না রাত তিনটের অ্যালার্ম / কিংবা নোটিশ নেই এক-মিনিটেরও...) তবে, ঋদ্ধি, সংহতি, ধ্বনি-গৌরব, ভাবনা-দ্যোতনা বা চিত্রকল্প-অনুষঙ্গে কোনর এখনও তাঁর সাধনায় সিদ্ধিতে পৌছোন নি। বিশেষত, সম্প্রতিকালে তিনি দীর্ঘ এবং জটিল মননের কবিতা লিখছেন যখন

তখনই বড় মাপের ব্যাপ্তিতে নিজের সীমাবদ্ধতা হারিয়ে ফেলছেন। কিন্তু কবি হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবন-পঞ্জী দেখলেই বোঝা যায়, বাস্তবতার বহু দুর্গম উপল-খণ্ড পেরিয়ে শুধু কবিতার জন্যেই বেঁচে আছেন এই কবি। তাই তিনি সত্যবাদী, সোজা-সরল মানুষ। জীবনের কথা বলতেই ভালবাসেন।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, এ যাবৎ (১৯৬২ থেকে) টনি কোনরের আটটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। অন্য একটি নর্মান নিকলসনের সঙ্গে যৌথভাবে। কবিতা লেখা ছাড়াও মাঝে মধ্যে নাটক লেখেন এবং অনুবাদ করেন। ফ্রান্সিস ফোড নামক এক মহিলাকে ১৯৬১-তে বিয়ে করেন। বর্তমানে এঁদের তিনটি সন্তান। চুয়াল্লিশ, ব্রেনার্দ অ্যাভিনিউ, মিডলটন, কানেকটিকাট, শূন্য ছয় চার পাঁচ সাত, ইউ এস এ—এই ঠিকানায় বর্তমানে বসবাস করেন। ব্রিটেনে তাঁর কবিতা এখনও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য মনে করা হয় যে টনি কোনর সেই শ্রেণীর কবি যিনি 'now bringing new life to English Verse' (Saturday Review, 1968) এবং 'undoubtedly one of the best and most authentic of recent British Poets (Poetry, January, 1969)। ব্রিটিশ কাউন্সিল এমন আরও অনেক কবিদের কলকাতার কাব্যপিপাসু মানুষের মুখোমুখি নিয়ে আসুন, আমাদের আবেদন। কেননা, কবিতার তো কোন সীমান্তরেখা নেই।

অনুপ মতিলাল

কয়েকজন তরুণ কবি

অশোক সেনের দ্বিতীয় কবিতার বই 'মানুষ বড় রতন রে'—নামের মধ্যে দিয়ে কবির বক্তব্য স্পষ্ট। অশোকের অন্বিষ্ট শুভ্র অমলিন নিষ্পাপ জীবন। তবু চাওয়া পাওয়ার মধ্যে কোন মিল নেই—চাওয়া পাওয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। ফিরতে হঁয়—অশোক লেখেন' পারিজাত কবে ফুটবে মা? / আমি জানতে চাই / তুমি দরজা খোলো / অন্য একটি কবিতায় অশোক জড়িয়ে ধরতে চান নিবিড় মমতা দিয়ে। অশোক বল্লেন 'ত্যাখো এই হাতে কোন পাপ নেই'। অশোক ফিরে আসেন নিজের গভীরে যেখানে কোন পাপ নেই। অশোক লেখেন—'বাউল হে গান ধরে / হিংসা থাকে একমাস / আমরণ থাকে শুধু উষ্ণতা প্রণয়'। অশোক আবার আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'সমর্পণের হাত মেলেছি আমি / ভালোবাসার দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরো'।

অশোক তাঁর দ্বিতীয় বইয়ে প্রতিশ্রুতির চিহ্ন রেখেছেন। আশা করব তিনি ভবিষ্যতে লিখবেন।

'শব্দের শরীর' কৃষ্ণা বসুর প্রথম কবিতার বই। কবি কখনও চলে গেছেন 'হিরণ্ময় নদীর কিনারে' অথবা 'অরণ্যে আদিমতায় আমাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যায় / সেই মধ্যরাতের সর্বনাশা চাঁদ' কিংবা রক্তের গভীরে অনুভব করেছেন নিষ্পাপ বালকের কথা। কবিতার শব্দ সযত্ন নির্বাচিত। কবিতার মধ্যে তাঁর ভাবনা অনায়াসে বিচরণ করে। তাঁর চোখে 'স্মৃতি এক আশ্চর্য্য কাবুলী। অতীতের থেকে উঠে আসে। কবি বলেন, 'তার নষ্ট ঋণ কোনদিন শোধ হয় না। শুধু সুদটুকু নিয়ে চলে যায় একক আধারে—অতীতে।

কবি শীতল চৌধুরীর প্রথম কবিতার বই 'একাকী অলৌকিক ক্রন্দন'। কবির কবিতায় বিষাদ, বেদনা এবং প্রেম প্রভৃতি এসেছে। কোন কোন কবিতায় এক রহস্যময়তা এসেছে—'বাঁশি' কবিতাটি। শীতল লিখেছেন, 'ছিন্ন দুপুরে বাঁশি বাজে / কার বাঁশি? প্রথমে যে প্রশ্ন কবিতার শেষে আবার সেই প্রশ্ন ঘুরে এসেছে। কবিতাটি পড়বার পর বুকের গভীরে এক ধরণের তীব্রতা

আনে। শব্দচয়ন এবং চিত্রকল্প রচনায় কবি খুবই সচেষ্ট। 'পদচ্ছায়া' কবিতাটির আরম্ভে আমাদের ধাক্কা দেয়। 'চলে যাচ্ছে আমার শব্দের ধনুক ও ব্রহ্মজ্ঞান / চলে যাচ্ছে আমার ময়ূরপুচ্ছ পালক ও স্রোত / চলে যাচ্ছে আমার ত্রিকালের বাঁশি ও সামগান / কবিতার শেষে ভাঙনের ছায়া—'ভাঙছে তিল তিল করে ধ্বসে পড়ছে। আমার মেরুণ ঘর চিত্রিত জানালা'।

'সন্নিকটে যাব কবে' কবি হিমাদ্রি দত্তর প্রথম কবিতার বই। বারোটি কবিতা বইটিতে আছে। হিমাদ্রির কবিতায় জড়িয়ে আছে রোমান্টিকতা আবার রাজধানীর জীবনের রুদ্ধ জটিল বিষাদ ও বেদনা। হিমাদ্রির কবিতায় বৈচিত্র্য আছে। তাঁর 'শোক' কবিতাটি পাঠককে বিষাদে আচ্ছন্ন করে। হিমাদ্রি লেখেন 'আলজিভ চাপা দিয়ে, বেড়ে ওঠে হাসপাতালের সফেদ পাঁচিল ? / ভিতরে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, পঁচিশ বছর যুবকের হুঙ্কার ধ্বনি / এমন কেউ কি নেই কাছে পিঠে, কপালে যে হাত রেখে / বলে ওঠে—নদীর পাড়ে বৃষ্টি পড়ে এখন একটু ঘুমো। সরু জলের মত এক চাপা শোক / ইদানীং প্রতিটি বিকেলে গড়ায় বুক থেকে সমস্ত শরীর—কবিতাটি এক ধরণের রোমান্টিক হাহাকারে ভেঙে পড়ে। হিমাদ্রি অনুভূতির আরো গভীরে গিয়ে আমাদের আরো কবিতা শোনাবেন আশা করব।

পরবর্তী আলোচিত কবিতার বই কোনো একজন কবির নয়। দশজন কবির কবিতা নিয়ে সংকলন—'দশজন কবি।' সম্পাদনা করেছেন কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী। এই বইয়ের প্রথম কবি শম্ভুনাথ হাজারী। তাঁর কবিতার নাম 'রূপতীর্থ।' দীর্ঘ কবিতা। মিলযুক্ত। ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে তিনি কবিতার রূপ দিয়েছেন। দ্বিতীয় কবি ছদ্ম নামে লিখেছেন—তীর্থপথিক নামে। তাঁর কবিতায় রয়েছে আধ্যাত্মিকতা, দর্শন এবং প্রেম। কবিতাগুলো পাঠকের ভাল লাগতে পারে। ভাল লাগবে 'বাজাও এবার বাজনা বিসর্জনের কবিতাটি। এই বইয়ের পরবর্তী কবি বিশ্বনাথ ঘোষাল। আধুনিক কবিতার মেজাজ, সুর এবং শৈলী বিশ্বনাথ ঘোষালের কবিতায় অনুপস্থিত। তাঁর কবিতা স্পষ্ট এবং তাঁর বক্তব্যও সোজাসুজি। এরপর চিন্ময় কুমার মজুমদার। চিন্ময়ের কবিতার স্নিগ্ধতার জন্য ভাল লাগবে। এঁর পরে স্থান পেয়েছে গোপাল চন্দ্র পোদ্দারের কবিতা। তাঁর কবিতার মূল সুর প্রেম। সহজ, প্রগাঢ় ও তীব্র তার

কবিতাগুলোর আবেদন অনস্বীকার্য। বরুণ চক্রবর্তীর সাতটি কবিতার সুর বিদ্রোহের আগাছা উপড়ে ফেলে নতুন দিনের। এর পরের কবি সুপ্রিয় গুহঠাকুরতার সুরে বাস্তবতা, নতুন দিনের জন্য। তাঁর কিছু কিছু কবিতায় প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল চিহ্ন বর্তমান। কান্তিপ্রকাশ গুপ্ত পরের কবি। ভাল লাগবে 'নিস্প্রতীক অভিমান শ্রাবণে শ্রাবণে' বা ভবিতব্য নদী ও কবিতার স্নিগ্ধ সুর। সমসাময়িক ঘটনায় চিত্রাংকণ করার ক্ষমতা আছে। এরপরে পৌষালী পোদ্দারের কবিতা। গ্রাম বাংলার নদী, খাল বিল তাঁর কবিতায় এসেছে। কবিতাগুলো নরম ও স্নিগ্ধ। তবে আশা করব জীবনানন্দর প্রভাব অতিক্রম করে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন। সব শেষে সম্পাদক কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরীর কবিতার আলোচনা। তাঁর কবিতা স্পষ্ট অথচ স্নিগ্ধ। 'বুদ্ধদেব বসু' কবিতাটি আন্তরিকতায় উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ। 'আদর্শ' কবিতাটিও উল্লেখ করবার মত। ,

প্রদীপ মুন্সী

শিল্পী ত্রিভঙ্গ রায়

চিত্রশিল্পী, শিশু-সাহিত্যিক ও মৃৎশিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ত্রিভঙ্গ রায়। বর্ধমান জেলার বনপাস গ্রামের কামারপাড়ায় ১১ আশ্বিন ১৩১৩ সালে জন্ম। পিতা রোহিনী কুমার রায়, মাতা ভদ্রা দেবী। বালক ত্রিভঙ্গের গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া সুরু হয়। শৈশব থেকেই আপন মনে মাটি দিয়ে দেব-দেবীর মূর্ত্তি গড়া ও রং তুলি সাহায্যে পট লেখা তাঁর নিত্য কর্ম ছিল। বালকের হাতের কাজ দেখে একসময় শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব (অগ্নিযুগের যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়) খুবই মুগ্ধ হন এবং অবসর পেলেই চন্না আশ্রমে যেতে বলেন। পাঠশালার পড়া শেষ করে বোলপুর স্কুলে ভর্ত্তি হন। স্বামীজির নির্দেশ মত ড্রইং ও ছবি আঁকায় মননিবেশ করেন। কিছুদিন পর স্বামীজির একান্ত চেষ্টায় তাঁর অনুরাগী উত্তর কলিকাতা নিবাসী জীবনতারা হালদার মহাশয়ের নিকট ত্রিভঙ্গবাবুকে পাঠান। হালদার মদাশয়ের সঙ্গে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজদাদা সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিচয়। ত্রিভঙ্গবাবু সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আলাপ করিয়ে দেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বালকের আঁকা ছবি ও ড্রইংগুলি দেখে মুগ্ধ হন এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান (ইং ১৯২৮ সালের শেষ দিকে)। ত্রিভঙ্গ রায়ের হাতের কাজ দেখে শিল্পীগুরু উৎসাহ দেন ও জোড়াসাঁকোয় আসতে বলেন। তারপর থেকে চলল তাঁর শিক্ষা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে। এই ভাবে কয়েকমাস শিক্ষার পর ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ষ্টুডিও ঘরে ঢুকেই শিল্পীগুরুর নজর পড়ল একখানি ছবি "রাহুলের পিতৃধন প্রার্থনা"। ছবি দেখে অবনীন্দ্রনাথ খুশি হলেন। অবনীন্দ্রনাথ তরুণ শিল্পীকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্টাল আর্টসে শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। অল্পদিনেই তিনি ভারতীয় শিল্পধারায় ছবি এঁকে শিল্পরসিকদের প্রশংসা লাভ করেন। বহু চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্বর্ণ-পদক লাভ করে।

বাল্যবস্থা থেকেই ভারতীয় দেব দেবী সম্বন্ধে—পুরাণ; রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ পড়া ও জানার আগ্রহ ছিল। শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করে বহু ছবি এঁকেছেন। ছবি আঁকার সঙ্গে সাহিত্য চর্চাও করতেন।

পরবর্তীকালে তিনি লেবেল ডিজাইন, বই এর প্রচ্ছদপট, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি নানা ধরণের কাজ করতেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে সাবলিল রেখার মাধ্যমে ছবির বিষয়গুলি (illustration) রূপায়িত করায় তিনি অশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এসময় লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' সজ্জার অন্যতম সদস্য শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই চেষ্টায় দীর্ঘদিন বম্বাইতে চলচ্চিত্র ব্যবসায়িদের তাগিদে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সাজসজ্জার ডিজাইনের কাজ করে প্রশংসা লাভ করেন। চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তায় ত্রিভঙ্গবাবু কানপুর যান। সেখানে সিংহানীয়াদের দেবালয়গুলির দেওয়ালে তাঁর আঁকা ফ্রেসকোর কাজগুলি স্মরণীয় করে রেখেছে। মার্বেল পাথরের উপর বিভিন্ন রং এর পাথর সেট করে ঐ ছবিগুলি তৈয়ারী করা হয়েছিল। অবসর পেলেই অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন পদ্ধতিতে ওয়াশের ছবি আঁকতেন এবং পূজা-অর্চনার জন্য মাটি সাহায্যে দুর্গা প্রতিমা, সরস্বতী, বুদ্ধ, বালগোপাল ও রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈয়ারী করারও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ত্রিভঙ্গবাবুর আঁকা ছবি ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ও বিভিন্ন ব্যক্তির সংগ্রহে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শশালাতে তাঁর আঁকা কয়েকখানি ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে।

চিত্রশিল্পী ছাড়াও শিশু সাহিত্যিক হিসাবে ত্রিভঙ্গবাবুর পরিচিত রয়েছে। রূপকথা, গৌতম বুদ্ধ, রাঙাদির রূপকথা, ছুটির চিঠি, বাঙালা মায়ের রূপকথা ইত্যাদি লেখার রূপকথার গল্পগুলি পড়ে 'ঠাকুমার ঝুলি' প্রণেতা শ্রদ্ধেয় দক্ষিনা-রঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয় লিখেছিলেন, 'তাহার লেখার মধ্যে রূপকথার স্বাদ পাই।'

'অমৃত' সপ্তাহিক পত্রিকায়—১১শ বর্ষ ২৮ সংখ্যা-২রা অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ থেকে ১১শ বর্ষ ৫০ সংখ্যা—৮ই বৈশাখ ১৩৭৯ পর্যন্ত, মোট ২৩টি সংখ্যায়—"সংলাপে অগ্নিযুগ স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীমদ স্বামী নিরালম্ব)"

রচনাটি থেকে অগ্নিযুগের অনেক নেপথ্য কাহিনী জানতে পারা যায়। শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ত্রিভঙ্গ রায় ২১ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬, ৭৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

নির্মল দে

রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার আর্ট গ্যালারী

রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার জন্মলগ্ন সূচিত হয়েছিল ১৯৬১ সনে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রাকালে একটি মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হল—রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গত দু'শ বছরের সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থ ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ও নবজাগরণের বিষয়কে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে বাস্তব-ঐতিহাসিক গুরুত্ব সহকারে সশ্রদ্ধ ভাবে তুলে ধরা। রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালা কর্তৃপক্ষ গত আঠারো বছর ধরে সেই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার সযত্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

গত আড়াই বছর ধরে দু'শ বছরের জীর্ণ এই ঐতিহাসিক গৃহকে অনেক চিন্তা, অধ্যাবসায় এবং সরকারী অর্থানুকূল্যে সংরক্ষণ করার সাধ্যাতীত চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই সংরক্ষণ কালের ফাঁকে ফাঁকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রদর্শশালা কর্তৃপক্ষ এখানেই গত ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতার আধুনিকতম আর্ট গ্যালারীর উদ্বোধন নিষ্পন্ন করলেন।

আর্ট গ্যালারী প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্যায়ের সংরক্ষণ কর্ম হল—দীর্ঘ আঠারো বছর যাবৎ সংগৃহীত শিল্পকলার নিদর্শনগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ দান করা। এজন্য ল্যামিনেশন, লাইনিং, বিজ্ঞান সম্মত পুনরুদ্ধার এবং ফিউমিগেশন সবই ব্যাপকতম পর্যায়ে এদেশে প্রথম করলেন এই প্রদর্শশালার ব্যবস্থাপকগণ। তাঁদের তৃতীয় পর্যায়ের সংযোজন হল—প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রিত মিশ্র আলোর ব্যবহার, ইনকানডেসাণ্ট ও

ফ্লুরাসেন্ট আলোক বীক্ষণকে এদেশে প্রথম মিশ্রিত প্রয়োগ মূল্য দেওয়া হল আলোর প্রতিপালনকে নিরপেক্ষ করে।

আলোর এবংবিধ প্রক্ষেপণের ফলে শিল্প সম্পদের জীবন দীর্ঘ করা ও বর্ণ বিভ্রম পরিহার করার ক্ষেত্রে স্বতোৎসারিত সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হয়েছে। চতুর্থ সংযোজনটি হল—প্রদর্শিত চিত্র বস্তুর স্রষ্টাদের দ্বিভাষিক জীবন পঞ্জী রচনা। এ জাতীয় প্রচেষ্টা কোন সংগ্রহশালার পক্ষে এই প্রথম বলে মনে করা হচ্ছে। পঞ্চমত, আধুনিক বাঙলার তথা ভারতীয় চিত্রকলার দ্বি-স্তর ক্রিয়াকলাপ দর্শন ও অধ্যয়নের সুযোগ সীমিত পরিধির মধ্যে এই প্রথম হল।

এই দ্বি-স্তর পর্যায়ে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার বিন্যাস করা হয়েছে ঐতিহাসিক, গৃহগত, শিল্পগত ও শিল্পীগত গুণানুসারে।

একদিকে দেখানো হয়েছে জোড়াসাঁকোর কৌলিক গৌরবকে প্রায় অদর্শিত গিরীন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রবোধেন্দুনাথ, সুনয়নী দেবী, প্রতিমা ঠাকুর, সুভো-ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ, ব্রতীন্দ্রনাথ, অলোকেন্দ্রনাথ প্রভৃতির জলরং, প্যাস্টেল, ক্রেয়ন ইত্যাদি মাধ্যমে অঙ্কিকগত রচনার মধ্য দিয়ে। এই সব রচনায় এককালে স্টাডির গুরুত্ব বা পরবর্তীকালে সৃজনমূলক কম্পজিশনের বা বস্তুনিরপেক্ষ বিষয় বা আধুনিক চিন্তার সংযোগ ও বিক্রিয়া কিভাবে একটি পরিবারের মধ্যে সম্বলিত হয়েছে এবং কিভাবে সেই পারিবারিক প্রভাব একটি জাতির শিল্পকলায় জাগরণে সহায়ক হতে পেরেছে তা অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাবে পরম্পরা রক্ষা করে সজ্জিত করা হয়েছে। এই পরিবারের প্রভাব নিয়ে বা নিজস্ব চেষ্টায় যাঁরা বাঙলা তথা ভারতীয় চিত্রকলাকে নতুন সম্পদ দান করেছেন তাঁদের অনেকেরই প্রতিনিধি-মূলক চিত্র এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছেন অসিতকুমার হালদার, মুকুলচন্দ্র দে, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ ঘোষাল, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ পাল, প্রশান্ত রায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ত্রিভঙ্গ রায়, সুশীল সেন, কমলারঞ্জন ঠাকুর ও প্রিয়প্রসাদ গুপ্ত, এই শাখার আধুনিক সংযোজন হয়েছে নীরদ মজুমদারের চিত্রে।

অত্যাধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম আন্তর্জাতিক শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জন্য

একটি পৃথক কক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে আছে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত রচিত ২৭ খানি চিত্র। অসাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষণাক্রান্ত এই সাতাশ খানি চিত্র।

হিরণ্ময় রায় চৌধুরী, সুধীর খাস্তগীর ও রামকিঙ্কর বাইজের চারখানি ভাস্কর্য নিদর্শন প্রদর্শনীর অন্তর্ভূত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য ধারার চিত্রকল্পশাখায় টমাস রুডস্, এ, এস, হ্যারিস, উইলিয়াম বিটী, ব্যারণ ডি সুইটার, জেমস্ আর্চার, জর্জ বিনেরী, প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য শিল্পী; সৌতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পরেশনাথ সেন, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের অসাধারণ সব প্রতিকৃতি চিত্র এবং মূলতঃ ঠাকুরবাড়ীর যৌথ প্রতিকৃতির সংগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে।

সমর ভৌমিক

কবিতা, কবিতা-বিষয়ক ও অন্যান্য

কাব্যগ্রন্থ

মলয়শংকর দাশগুপ্ত : বাঘাম। বুক ট্রাস্ট, ৩০/১বি কলেজ রো, কলিকাতা ৯। টা. ১'০০

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে। প্রকাশক সুভাষ ভদ্র। ২৪/১ ক্রীক রো, কলকাতা ১৪। '৩০ পয়সা

কালীকৃষ্ণ গুহ : এক বছরের সামান্য কবিতা। প্রকাশক: গৌতম সেনগুপ্ত ২/এল কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা ১৯। টা ১'৫০

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : নিরন্ত নিরিখ। প্রজ্ঞা, ৭৭/১ মাহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। টা ৫'০০

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় : পিকাসোর নীল জামা। দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ৫'০০

উত্তম দাশ : জ্বালামুখে কবিতার। কবি ও কবিতা, ১০ রাজা রাজকৃষ্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৬। টা ৫'০০

দেবপ্রসাদ ঘোষ : জর্নাল ও অন্যান্য কবিতা। পূর্বাশা, ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা ৯। টা ৫'০০

সামসুল হক : সোনার ত্রিশূল। ইণ্ডিয়ানা, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ৫'০০

মঞ্জুভাষ মিত্র : কেন প্রতিধ্বনি। পথিকৃৎ, ৭ যতীন বাগচী রোড, কলকাতা ২৯। টা ৩'০০

বাপী সমাদ্দার
আলোক সোম
বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী : চরাচর, আমাদের। প্রকাশক নব-শ্রী, দেউলপাড়া, নৈহাটী। টা ৫'০০

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : খিলানের শাদা অহংকার। মহাপৃথিবী, ১১ ঠাকুরদাস দত্ত ১ম লেন, হাওড়া। টা ১.৫০

কমলেন্দু দাক্ষিত : মধ্যরাত্রে শেষ নৌকো। অনন্ত প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১৩। টা ৫.০০

জীবন গঙ্গোপাধ্যায় : কবিতার বুকেই। এষা, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা ৮৪। টা ১.০০

দীপা চক্রবর্তী : প্রিয় শব্দ প্রিয় কবিতা! প্রকাশক সৈকত হাজরা, ৫, কে. এল. চাটার্জি স্ট্রীট, বেলুড় মঠ, হাওড়া। টা ১.১০

রাজকুমার রায়চৌধুরী : নগ্ন শাদা হাড়। বাল্মীকি প্রকাশনী, ৩১ কালনা রোড, বর্ধমান। টা ২.০০

হিমাংশু জানা : প্রতিশ্রুত নই। বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা ৯। টা ৩.০০

শৈলেনকুমার দত্ত : অমৃতে অথৈ। পত্রমিতা, ৫১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। টা ১.০০

Sibnarayan Ray (ed) : Vak : An Anthology of Poems and Translation, Writers Workshop, 162/92 Lake Gardens, Calcutta 45. Rs. 20·00

সন্দীপ ঠাকুর
এইকো ঠাকুর : কোটি পাতার ছন্দ : জাপানী কবিতাগুচ্ছ। রূপা,
সুশান্ত বসু (অনু) ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১৩। টা ১৫.০০

কবিতা-বিষয়ক

সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী : নবীনচন্দ্রের কাব্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি; কলকাতা ৬। টা ১৫.০০

Sibnarayan Ray : Apartheid in Shakespeare and Other Reflections, United Writers. 70/2 Beliaghata Main Road, Calcutta 10, Rs. 45·00

অন্যান্য

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়	:	শরৎ সাহিত্যের স্বরূপ। রূপা, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ১৮.০০
অরুণ ভট্টাচার্য	:	ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস। উত্তরস্মৃরি প্রকাশনী, প্রাপ্তিস্থান: ইণ্ডিয়ানা ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ৪৫.০০
মানসী দাশগুপ্ত	:	ভেলা। পথিকৃৎ, ২৪ পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা ২৯ টা ৬.০০
অমিতাভ ঘোষ	:	শান্তিনিকেতনের শান্তিদেব। বিশ্ববীণা, ১৩/১ পঙ্কজ-মল্লিক সরণি, কলকাতা ১৯। টা ১০.০০
রাস্নুনারী কাওয়াবাতা	:	তুষার গ্রাম। সন্দীপ ঠাকুর (অনু) রূপা, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ৬.০০

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টসিধ ১১৬ বিবেকানন্দ রোড কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

পুঁথি পরিচয় ১-৪	পঞ্চানন মণ্ডল	টাকা ৯২·০০
রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয় ১	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৫·০০
রবীন্দ্র রচনা কোষ -৩	চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি	২১·০০
রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন	সান্ত্বনা মজুমদার	২৩·০০
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ	অমিয়কুমার সেন	৬·০০
স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য	পশুপতি শাশমল	৩৪·০০
আধুনিক ওড়িয়া কাব্যধারা (নবজাগরণ যুগ)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৪০·০০
চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা	ভি. ভি. ওয়াজেলওয়ার	১২·০০

The Decline of Buddhism in India	R. C. Mitra	Rs. 24 00
Introduction to Parsee Religion, Customs & Ceremonies	Madhusudan Mallik	12·00
Religious Movements in Modern Bengal	Benoygopal Roy	10·50
Indian Art and Aesthetics	H. Mitra	35·00
Poetry of Yeats	S. C. Sen	12·00
A Study of Universals	S. Sen	30·00
Charyagitikosha	P. C. Bagchi & S. B. Sastri	15·00
Asvaghosa : A Critical Study	B. N. Bhattacharya	60·00
Rasacandrika I-II	S. N. Ghosal	27·00
Tagore's Educational Philosophy	S. C. Sarkar	7·50

উত্তরসূরি ১১০/১১১

জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতার দুই প্রধান কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য একত্রে ৪টি কবিতাগ্রন্থ পরপর বাঙালী পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন।

১· হাওয়া দেয় (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ)

২· প্রেমের কবিতা

৩· নিসর্গ বিহঙ্গক

৪· প্রতিবাদের প্রতিরোধের কবিতা

কবিদের স্ব-নির্বাচিত এই ক'টি কাব্যগ্রন্থে বাঙালী পাঠক শতাব্দীর হতাশা-যন্ত্রণা, আলো, অন্ধকার, বিশ্বাস ও প্রতিরোধের কবিতা পাবেন যা একালে যেমন, চিরকালীন কাব্যের দরবারেও তেমনি স্থির আসন লাভে সমর্থ হবে।

প্রচ্ছদ : মলয়শংকর দাশগুপ্ত ॥

উত্তরসূরি ॥ ৭বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

ইণ্ডিয়ানা ॥ ২১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

দি বুক হোম ॥ ৩২ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

এক দশক পর

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো :

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের

কাব্যগ্রন্থ

পাখি জানে

প্রচ্ছদ। রঘুনাথ গোস্বামী

দাম। ৬·০০

প্রাপ্তিস্থান : উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলি-৭৩

বুক ট্রাস্ট ৩৯/১ বি, কলেজ রো। কলি-৯

নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলি-৭৩

সোহিনী প্রকাশনী। ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

অদ্বৈতবাদের প্রাচীন কাহিনী : স্বামী বিদ্যারণ্য ॥ ১৫·০০

আর্য্য মঞ্জুশ্রী সাবিত্রী ॥ সম্পাদনা : দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ॥ ১৫·০০

বৃন্দবনের ছয় গোস্বামী : ড. নরেশচন্দ্র জানা ॥ ১৫·০০

চণ্ডীমঙ্গল : রামানন্দ যতি বিরচিত : অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১৫·০০

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা : শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ২০·০০

এগারটি বাংলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্য নিদর্শন : সম্পাদনা : অমরেন্দ্রনাথ রায় ॥ ৬·০০

গোপীচন্দ্রের গান ॥ সম্পাদনা : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ॥ ১০·০০

গোবিন্দ বিজয় : ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র ॥ ২৫·০০

জ্ঞান ও কর্ম : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতা) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ॥ ৫·০০

মনসামঙ্গল ॥ দ্বারিকা দাস : সম্পাদনা : ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ॥ ২৫·০০

মহাভারত : কবি সঞ্জয় বিরচিত । ড. মুণীন্দ্রকুমার ঘোষ ॥ ৪০·০০

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাট্য সাহিত্যের অবদান : যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ ৩·০০

মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল : দিলীপকুমার রায় ॥ ৫·০০

মৈমনসিংহ গীতিকা : ড. দীনেশচন্দ্র সেন ॥ ২০·০০

রাজা রামমোহন সম্পর্কে : অরবিন্দ গুহ ॥ ৩·০০

প্রকাশন বিভাগ

৪৮, হাজরা রোড

কলিকাতা-১৯

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

পট দীপ ধ্বনি	অমর ঘোষ	50·00
রবীন্দ্র-সুভাষিত	বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	12·00
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	5·50
রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব	ড. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	8·00
ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ	ড. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	4·75
রবীন্দ্র দর্শন	ড. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	16·00
শিবভাবনা	ড. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	9·50
সংগীত-রত্নাকর	শার্ঙ্গদেব (অনুবাদ)	18 00
চৈতন্যোদয়	হরিশচন্দ্র সান্যাল	2·00
জ্ঞানদর্পণ	হরিশ্চন্দ্র সান্যাল	3·00
শিল্পতত্ত্ব	ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য	15·00
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু	ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ	6·00
বাংলা লোকনাট্য-সমীক্ষা	ড. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য	16·50
রবীন্দ্রদর্শন অভীক্ষণ	ড. সুধীরকুমার নন্দী	14·00
বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত	ড অরুণকুমার বসু	45·00

বিক্রয়কেন্দ্র

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
ও ৫৬এ, বি. টি. রোড, কলিকাতা ৫০

জিজ্ঞাসা, ১এ, কলেজ রো ও ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

যোগাযোগ : এমারেল্ড বাওয়ার, ৫৬এ, বি. টি. রোড, কলিকাতা-৫০

জন্মদিন

"শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই, যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব। বলে যাব এ প্রহসনের
মধ্য-অংকে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের;
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ১১৫২৬/৮১

হুকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চাম কাটে মজুমদার
ধেয়ে এলো দামোদর
দামোদরের দুকূল জুড়ে
ঝড়বিষ্টি ঝমঝম
বান রুখতে বাঁধ বাঁধে
কাজ কম্ম হরদম।
বাঁধ বাঁধতে হলে বেলা
বেড়ে যাবে বানের ঠেলা
ভাতে পড়ুক মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি
হোকনা কোদাল ভোঁতা....

চিত্র—পরাগ রায়
বয়স—১৩ বছর

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

উত্তরসূরি ॥ আবেদন / নিয়মাবলী

১. গ্রাহকবর্গের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁদের স্ব স্ব চাঁদা যা বাকী তা নতুন বর্ষে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন।

২. বহু গুণীজনকে আমরা উপহার স্বরূপ পত্রিকা পাঠাই। পত্রিকা-বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত এবং সমালোচনা পাঠালে সম্পাদক উপকৃত হবেন।

৩. উত্তরসূরি নতুন লেখকদের সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাঁদের কাছে অনুরোধ, লেখা পাঠান, ভালো লেখা। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. কুরুচিকর বিজ্ঞাপন কোন শর্তেই ছাপা হয় না। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে অনুরোধ, সুন্দর শোভন সুরুচির পরিচায়ক বিজ্ঞাপন দিন।

কর্মাধ্যক্ষ : উত্তরসূরি ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, সিঁথি। কলকাতা-৭০০০৫০। ফোন ৫২-২১৫২

প্রবন্ধ

স্মৃতিকথা

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরি । ১বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড । কলকাতা-৫০ । ফোন : ৫২-[illegible]

উত্তরসূরি ॥ ১১৯ ॥ বৈশাখ-আষাঢ় ॥ ১৩৮৮ ॥ ২৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥

প্রবন্ধ

কবিতাগুচ্ছ

কবিতাবলী

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য
উত্তরসূরি ॥ ১৪বি-৮ কাশিনাথ দত্ত রোড কলিকাতা ৫০ ॥ ফোন : ৫২-২০০৫

শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

সুধীন্দ্র-জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতা

অরুণ ভট্টাচার্য

উনিশশো একচল্লিশে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ। পঞ্চাশ দশকের মধ্যপাদে জীবনানন্দ গেলেন, সুধীন্দ্রনাথও মাত্র কয়েক বছর বাদে। আধুনিক কবিতার দুই অভিভাবক বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য কয়েক বছরের মধ্যেই চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ এবং এইসব কবিদের চলে-যাওয়ার মধ্যে ভারতবর্ষ, বিশেষত, বাংলাদেশে উত্তাল তরঙ্গ। উনিশশো সাতচল্লিশের ভারতবর্ষ। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে যে সময় এক করুণ ইতিহাসে পর্যবসিত হয়ে রয়েছে, আজও। নতুন দিল্লীতে যখন উৎসবের জয়ধ্বনি, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে তখন ক্রন্দনরোল। এখনো তা থামে নি। উনিশশো পাঁচ এ বৃটিশ শাসকবর্গ যা করেছিলেন: সাময়িক ভাবে, স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ তাকে স্থিরনিশ্চয় রূপ দান ক'রে পাকাপাকি ভৌগোলিক সীমানা নির্দ্ধারণ করে দিলেন। দুই বাংলা বিভক্ত হ'ল। এক তৃতীয়াংশ ভারতের অঙ্গীভূত। দুই-তৃতীয়াংশ তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হল। ভাগ্যদেবতার পরিহাস এই, এক-তৃতীয়াংশ ভূমি-সীমানা হতে খুব বেশী মুসলমান শ্রেণী ওপারে যায় নি, কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিসীমানা থেকে হিন্দু অধিবাসীরা প্রায় সবাই প্রাণভয়ে এক তৃতীয়াংশ ভূমি-সীমানায় এসে আছড়ে পড়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে সেই জের অদ্যাবধি টানতে হচ্ছে। আরও কতকাল, কে জানে! স্বাধীনতা-উত্তর কবিতা আলোচনায় এই পটভূমিই একমাত্র নয়, কিন্তু অপরিহার্য। বিক্ষুব্ধ বাঙালী, চিন্তাশীল বাঙালী, ভাবুক বাঙালী, প্রেমিক বাঙালী—বাঙালী চরিত্রের বিচিত্র বহুমুখিন্ আপাত-বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন তার কাব্যসাহিত্যে থাকবেই, এ কথা বস্তুগতভাবে সত্য। এই বহুমুখিন্ চরিত্রের ভিত্তিমূলে নিদারুণ ট্র্যাজেডি তাকে একই সঙ্গে বিরক্তি, হতাশা, ক্রোধ, অভিমান এবং বিরোধী রাজনীতির প্রতীক-চিহ্নিত করে দায় বহিয়েছে। বাঙালী তথা রক্ত / পরিস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত জাতি, মিশ্রণের মধ্যে ইতিহাসে স্থূলভাবে যে [illegible] [illegible] হিসেবে

করেছে। কাব্য তার হৃদয়ের মর্মমূলে। সুতরাং কবিতাতেই প্রতিবিম্বিত রূপ লাভ করেছে বাঙালীর এই চরিত্র, স্বাধীনতা অর্জন এবং দেশ-বিভাগজনিত এই আনন্দ-বেদনা স্থায়ীভাবে ক্রোধ বিরক্তি এবং হতাশায় অভিমানে এক বিচিত্র অনুষংগে রূপ লাভ করেছে। অবশ্য, একমাত্র সত্য কথা এটা নয়। অন্ধকারকে দূর করে একসময় আলোকবর্তিকা আমাদের নিরাশা থেকে রৌদ্রপ্রভাতে নিয়ে যায়। গত আট দশ বছরের কবিতায় এক নতুন ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। আগেও দেখতে পেয়েছি, মাঝে মধ্যে। সে যা হোক। সমকালের কবিতা আলোচনায় প্রধান অসুবিধে, সমালোচক তার সময়ের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ অভিঘাত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন না। অসুবিধে আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে, সেই সমালোচক যদি আলোচ্য সময়সীমার অন্তর্ভূত একজন কবি হন। নাটকের দৃশ্যাবলী বা চিত্রপট দেখবার জন্য যেমন একটি আনুমানিক দূরত্ব থাকা প্রয়োজন, সমালোচককেও সেই দূরত্ব মনের মধ্যে গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হয়। স্ব-কালের কাব্য-আলোচনায় একজন কবির এই অসুবিধে দেশে কালে লক্ষ্য করা গেছে। 'আধুনিক', 'সাম্প্রতিক' 'সমকাল' ইত্যাদি সময়সীমা-দ্বারা চিহ্নিত কালের কবিতা আলোচনায় যুগধর্ম এবং কালধর্ম বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে আমাদের সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। অনেক সময়েই দেখা গেছে; যুগের চাহিদা মিটেছে, কালের অনন্ত সীমানার অংশভাক্ তিনি হতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা এর স্বাক্ষর, অনেকাংশে নজরুলের কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যপক্ষে, যতই দিন যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে আমরা আধুনিক বা সমকাল ইত্যাদি সীমানা থেকে পৃথক করে কালের প্রবহমানতায় দেখতে পাচ্ছি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ প্রায় এই ত্রিশ বছর স্বাধীনতা-উত্তর কাল। অর্থাৎ বর্তমান আলোচনার সময়-সীমা। সাম্প্রতিক কবিতা বলেই একে চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যদিচ 'আধুনিক' শব্দটি ব্যবহার করলেও খুব অন্যায় হবে না। ১৯৩০ থেকে সাধারণভাবে বাংলা আধুনিক কবিতার সূত্রপাত মনে করা হয়ে থাকে, যে সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর রচনার ধারা নতুন করে বদলে দিলেন। আপাতত মনে হ'ল কবিরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে নতুন শব্দ শৈলী, ছন্দের পরীক্ষা দ্বারা কবিতার দিগন্ত বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭

সময়-সীমাকে আমরা আলোচ্য কালের ভূমিকারূপে গণ্য করতে পারি—এই সময়ের কবিতার মূল কাব্যলক্ষণগুলি আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। কোন কালের সাহিত্যসৃষ্টিই কিছু ভুঁই-ফোঁড় নয়। ১৯৪৮-এ যে-কবি নতুন করে কবিতা লিখেছেন তিনি ১৯৩০-এর কবিকে হয় আত্মস্থ করবেন, নয় সচেতনভাবে এক পাশে সরিয়ে রাখবেন। আর যদি তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী কবি হন, নিজের রাস্তা নিজে খুঁজে বার করবেন, যেমন করেছিলেন উইলিয়াম ব্লেক। এসব নানা কারণেই এই সতেরো বছরের কবিতার পটভূমি অপরিহার্য। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ এবং অবশেষে প্রত্যক্ষ ধাক্কা ভারতবর্ষকে, বিশেষত পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাংলা দেশকে,—বর্তমানের পূর্ব এবং পশ্চিম সম্মিলিত-ভাবে—সামলাতে হয়েছে। বোমাবর্ষণ, আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ পরপর ছায়াছবির মত এই সব ঘটনাবলীর সময়কাল মাত্র আট বছর, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭। পশ্চিমবঙ্গ এখনো পর্যন্ত সুস্থির হয় নি। যদি সেকারণে কখনো ক্রোধ, কখনো হতাশা বাংলা কবিতায় আত্মপ্রকাশ করে তাই হবে স্বাভাবিক। এর অন্তপ্রান্তও যে নেই তা নয়। বিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রতিফলন শুধু বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে না। কখনো তা সমাহিতি এবং সংযমের মধ্যেও রূপ পায়, নতুন দ্যোতনায় তাকে দেখা যায়। বাংলা কবিতায় তাও দুর্লভ নয়। দুটি কবিতার অংশ থেকে আমার বক্তব্যের অনুরণন শোনা যেতে পারে :

১.   ঘুমুতে চাই আমি মাটিতে বুক মেখে
মরণ চাই আমি আকাশে মুখ রেখে ;
তবুও হাঁটে তারা কৃষ্ণ বলরাম,
অন্ধ কুরুরাজ, কুরুক্ষেত্র।

তোমরা ফিরে যাও। কোথায় দ্বারকায়
নারীর দেহমদে পশুরা লুব্ধ ;
কোথায় শিশুকেও জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়
আহত নেকড়েরা ; এমনি যুদ্ধ !

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : প্রভাস)

২. …ফুল থেকে অন্যফুলে কী করে যে প্রজাপতি কোন পথ বেয়ে
হাওয়ার তরঙ্গ তুলে চলে গেল দেখতে পেল কিনা?
হে সুন্দর যৌবন কেন আত্মমুগ্ধ প্রাণের ছলনা,

কী করে যে প্রজাপতি…জানি না জানি না।

(মলয়শংকর দাশগুপ্ত : কী করে যে প্রজাপতি)

প্রথম কবির জন্মসাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে, দ্বিতীয় কবি জন্মেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে। মানসিকতার পার্থক্য, যদি যুগধর্ম দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে, অনিবার্য। দুটি কবিতায় দেখতে পাচ্ছি পৃথক ভাবনার অনুষংগ। মহাভারতের পটভূমিকা আশ্রয় করলেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে সমাজ এবং সাংস্কৃতিক ক্ষরণের ভয়াবহ চিত্রের মধ্য দিয়ে ক্রোধ, বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুজ কবি প্রজাপতির প্রতীকটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'হাওয়ার তরঙ্গ তুলে' প্রজাপতির চলে-যাওয়া 'সুন্দর যৌবন' কি দেখতে পেয়েছিল? এই কবিতার অভিঘাত, একেবারেই বিপরীত পটভূমির আশ্রয়ে, স্নিগ্ধ এক ভাবলাবণ্য যোজনা করেছে।

'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করছি', আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর এই সংজ্ঞার সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। কেননা এখানে তিনি আধুনিক কবিতার ভূমিকে চিহ্নিত করেছেন, ঘটনার উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু তিনি যখন ইঙ্গিত দিয়েছেন 'হয় তো এঁরাই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবেন যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিচেতনাসম্ভূত নয় সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত' তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী মেনে নিতে দ্বিধা হয়। আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পাদনাকালে অন্যতম সম্পাদক আইয়ুব সাহেব এই কথাগুলি বলেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, আধুনিক কবিতার প্রাণপুরুষ জীবনানন্দ বিষয়ে একটি কথাও তিনি বলেন নি। সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে, সমর সেন, বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেই—এবং বুদ্ধদেব বসুকে মনে মনে তিনি আধুনিক কবিতার নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। হয়তো একজন জীবনানন্দ নন, একজন অমিয় চক্রবর্তী নন (এঁর কথাও

ভূমিকাতে নেই)—সকলের সম্মিলিত অবদানেই আধুনিক কবিতার সৌধ গড়ে উঠেছে। তথাপি, এ তর্ক থেকেই যায় যে ব্যক্তিচেতনা-সম্ভূত কবিতা এবং সমাজবোধের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কবিতার স্থির লক্ষণগুলি কি কি? আইয়ুব সাহেব রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, 'তার জন্য কবির চাই শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, চাই ডায়েলেকটিক দৃষ্টি, চাই ইতিহাসের অর্থনীতি-মূলক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস।' প্রশ্ন জাগে, যে-কবি একজন 'ব্যক্তি' তিনি কি সমাজ বহির্ভূত? প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে স্বেচ্ছানির্বাসিত, জনসমাজবিহীন সমুদ্র-সৈকতে তিনি কি স্বপ্নে আচ্ছন্ন? তেমন অবস্থাতেও আমরা—তেমন অভিজ্ঞতার নিরিখেও—উঁচুদরের সাহিত্য পেয়েছি। এপ্রসঙ্গ বাদ দিয়েও একথা বলা চলে, কোন যুগেই কোন কবি সমাজ-বহির্ভূত জীব ছিল না। সমাজ-বোধের ভিত্তি চ্যসারের কাণ্টারব্যরী টেলসেও পাকাপোক্ত মিলবে—তার জন্য চ্যসারকে ডায়েলেকটিক দৃষ্টিভংগী অর্জন করতে হয় নি। আধুনিক কালের যে কবিকে উনি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে মনে করেছিলেন এই সব গুণাবলী তাঁদের মধ্যে বিধৃত রয়েছে বলে, দুর্ভাগ্যত তিনি কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছেন। বিশেষ একটি সময়সীমার মধ্যে সমর সেনের তৎকালীন কবিতায় যে ভবিষ্যতের চেতনার ইঙ্গিত ছিল—তাও নিতান্ত সাময়িক ভাবনাতেই পর্যবসিত হয়েছিল। সমর সেনের কবিতা বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সে-যুগের রচিত কবিতাবলী এই মুহূর্তে—বলা যেতে পারে, পঞ্চাশ দশক থেকেই—তরুণ কবি-কুলের ওপর আর কোন প্রভাব ফেলে নি। আধুনিক বাংলা কবিতা আইয়ুব সাহেব-নির্দেশিত পথে কিন্তু এগোয় নি, যদিচ শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সরকার পর্যন্ত এই বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পের রহস্য কি তাই চিরকালই unpredictable? পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত কবিতার ধারায় আবার নতুন করেই 'ব্যক্তি' মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—যদি আইয়ুব সাহেবের কথামত ব্যক্তি-চেতনা ও সমাজ চেতনা বিষয়টিকে আমরা চিন্তারাজ্যের পৃথক প্রকোষ্ঠ বলেই ধরে নিই। বড় কবিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-চেতনা সমাজ-চেতনা ইত্যাদি বিষয়গুলি পৃথক প্রকোষ্ঠ দাবী করে না। একটি সমগ্রতায় এসে বিলীন হয়, যেমন শেকস্‌পীয়ারে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ব্যক্তিচেতনা সমাজচেতনা ইত্যাদি কথাগুলি, অন্তত শিল্প-বিচারে, একান্তই ভুল পথ-প্রদর্শক। কোন ব্যক্তিই সমাজ-বহির্ভূত

নয়। তাঁর যে কোন চিন্তাই সমাজের অন্তর্ভূত ব্যক্তি মানুষেরই চিন্তা। বিশুদ্ধ কল্পনার রাজ্যে বাস করেও কোলরিজের 'কুবলা খান' রচনা সম্ভব এবং আজও তা সমান আদরণীয়। অথবা বৈষ্ণব কবিতার রসঘন অস্তিত্ব বা রামপ্রসাদের আন্তর উদ্বেলতা এবং বাউল সাধকদের গূঢ় চৈতন্যের উৎসার সম্ভব।

হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় চিন্তায় মার্কসবাদী, স্বাভাবিক কারণেই এমন একটি দৃষ্টিভংগীর তিনি সমর্থক যার দ্বারা কবিতা বা শিল্পকে বিশ্লেষণ করাই তাঁর স্বধর্ম। মজা এই, মার্কসবাদী দেশগুলিতেও আজ শিল্পচেতনা ব্যক্তিত্ব, অথবা সমাজ চেতনা সম্ভূত ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তার উল্টো ঢেউ উঠেছে। তাঁরাও আর, যাঁরা কিছুটা স্বাধীন চিন্তা করতে অভ্যস্ত এবং সাহসী প্রত্যয়ের অধিকারী, ফ্রেমে-আঁটা কথাবার্তা বলছেন না—তোতাপাখির শেখানো কথাবার্তার বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন।

বাংলা কবিতার আলোচনায় এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল। কেননা, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ এই পর্বে, তথাকথিত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শিল্প সাহিত্য বিচারের মূল নিরিখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে কারণে জীবনানন্দের মত কবি এঁদের কাছে প্রায় অনুচ্চারিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধন্যবাদ বুদ্ধদেব বসু এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে, যাঁরা এই কবিকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। সমর সেন, যথেষ্ট বন্দিত এবং নন্দিত হয়েও, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই 'মিছিলের মুখ' লেখবার পর থেকে এখন যে কবিতা লিখে চলেছেন—তা সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামক বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ একজন ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবিরই কবিতা। মিছিল, দাংগা, সংঘর্ষ, লক্-আউট, ঘেরাও ইত্যাদি বিষয়গুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্জাত কবিতা তা নয়। অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ক্রমশ নতুন এক রাস্তার দিকে এগুচ্ছেন যা মার্কসীয় তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

বাংলা কবিতার এই ভূমিকায় দেখা যাবে, প্রায় সবাই তৎকালীন অ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন—কারণ ফ্যাসীবাদ তখন সমগ্র মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই সেদিন বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণু দে হাত মিলিয়েছিলেন, তারাশঙ্কর এবং মানিক পাশাপাশি বিবৃতি দিয়েছেন। ফ্যাসীবাদ নির্মূল হল। ১৯৪৫-এর পর থেকে নতুন করে পৃথিবীর দেশগুলি

দুটি শিবিরে ভাগ হতে থাকলো। গণতান্ত্রিক দুনিয়া এবং কমিউনিষ্ট দুনিয়া। কমিউনিষ্ট দেশগুলি ক্রমশ নিজেদের সংহত করবার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে আত্ম-হননের দিকে যেতে শুরু করল। কোন্ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র যে আজ প্রকৃত মার্কস্‌বাদী তাই এখন গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'প্রকৃত মার্কস্‌বাদী' তত্ত্বকথা বলেন এরকম সাত আটটি দল এক এই দুর্ভাগা বাংলা দেশেই রয়েছে! এবং এর ঢেউ ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা দেশের সাহিত্য এবং কবিকুলের ওপর বর্তেছে। যাঁরা কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী কবি তাঁদের মধ্যেও কবিতার নানা চেহারা। অবশ্যই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সাহিত্যে তাই আমরা আশা করব, কিন্তু ব্যক্তিকে যদি 'সমাজ চেতনায় উদ্বুত কবি' বলে মার্কা-মারা করে দেওয়া হয়, তবে আশা করব সেই সকল কবিদের কবিতায় এক ধরণের সুস্থ নিশ্চিত আদর্শবাদ লক্ষ্য করা যাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একাধিক কমিউনিষ্ট কবি আজকাল যে-সব কবিতা লিখছেন—দু চারজন পরিচিতিও লাভ করেছেন—তাঁদের কাব্যে না রয়েছে সৎ আদর্শের আভাস, না একটি স্থির বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য। তাঁদের অনেকেরই কবিতা বরং বহুনিন্দিত 'ব্যক্তিসচেতন' কবিদের সক্ষম বা অক্ষম অনুকরণ। উদাহরণ দিতে লজ্জা বোধ করি। এও দেখেছি, কোন সাচ্চা কমিউনিষ্ট কবি একটি কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী পত্রিকায় মারদাঙ্গা কবিতা লিখছেন, আবার সেই কবিই (এঁদেরই ভাষায়) তথাকথিত 'প্রতিক্রিয়াশীল' কোন সাপ্তাহিকে সুযোগ পেলেই অন্য চরিত্রের পদ্য ছাপছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে, আগেই বলেছি, মুক্তির বা আনন্দের বান ডাকে নি। এই হতভাগ্য বাংলাদেশে গর্ব করবার মত এখন কিছুই নেই। দেশগঠনের বিরাট কর্মযজ্ঞে বাঙালীর স্থান এমনিতেই সঙ্কীর্ণ। সারা ভারতবর্ষের মানচিত্রে বাংলাদেশ এবং সংস্কৃতির যেটুকু মর্যাদা তা প্রায় একাই রবীন্দ্রনাথকে বহন করতে হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পরেও এই সব কথা মনে রেখেই বাংলা কবিতার একটা সুস্থির বিচার করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের সমকালের উল্লেখযোগ্য কবি কারা ছিলেন? অতুলপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলাল নিঃসন্দেহে। তারপর? মোহিতলাল যতীন্দ্র সেনগুপ্ত নজরুল? তারপর? অবশ্যই জীবনানন্দ। প্রায় একা জীবনানন্দ। যিনি রবীন্দ্রনাথের অমিত প্রভাবকে এক পাশে এবং অনায়াসে সরিয়ে দিয়ে নিজের রাস্তা করে

নিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে একটি প্রশ্ন আমার মনে এসেছে। জীবনানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই একটি বিশেষ চৈতন্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ‘কবি জীবনানন্দ’ প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ ঢেউ জীবনানন্দের তীরে আঘাত করেছে। আইয়ুব সাহেব নির্দেশিত বা হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঈঙ্গিত পথে বাংলা কবিতা এগোয় নি। এগিয়েছে একান্তই ‘নির্জন’ কবি জীবনানন্দের নির্দেশিত পথে। শিল্প এবং কাব্য ইতিহাস প্রমাণ করেছে—কোনো বাঁধাধরা রাস্তায় তারা চলতে অভ্যস্ত নয়—কবিতা এবং শিল্প—শব্দের মতই—উইট্‌গেনস্টাইনের ভাষায়—কোন সংস্কার বাঁধনে বাঁধা পড়ে না। ডায়েলেক্‌টিকস্‌ তত্ত্বে তো নয়ই।

অবশ্য ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ মনীশ ঘটক বুদ্ধদেব বসু সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আছেন আমাদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে। লিখছেন অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন অরুণকুমার সরকার। রয়েছেন চিত্ত ঘোষ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অলোকরঞ্জন আলোক সরকার এবং শঙ্খ ঘোষ, এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। রয়েছেন কবিতা সিংহ, মানস রায়চৌধুরী, তারাপদ রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আরো কবি যাঁদের বহু কবিতাই কবিতার নিরিখে সমান উত্তীর্ণ এবং আমার তাঁরা প্রিয় কবি। আমি শুধু বহু পরিচিত কবিদের নামই করেছি। অল্প পরিচিত কবিও অনেকে আছেন যাঁদের কবিতা রসের বিচারে বহু পরিচিতদের থেকে শিল্প বিচারে ন্যূন নয়। মলয়শংকরের মত ম্রিয়মান কবির কবিতা-পংক্তি উদ্ধার করে আমি একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছি ; অথবা কালীকৃষ্ণ গুহ-র কবিতা থেকেও উদ্ধার করা সম্ভব, বাংলা কবিতা জীবনানন্দের অমিত প্রতিভা-প্রজননের মধ্য দিয়ে আজ বহুবল্লভা। নীরেনের ‘বাতাসী’ কবিতাটির সঙ্গে সঙ্গেই মানস রায়চৌধুরীর ‘দিনযাপন’ পড়তে ইচ্ছে করে, সুনীলের কোন হৃদয়-নিংড়ানো পংক্তির পাশেই ত্রিশ-অনূর্ধ্ব কবির ছোট্ট একটি লিরিক বুকের মাঝে ধাক্কা দেয়। বাংলা কবিতা তাই এখন এক বহু নদ-নদী শাখানদী খাল-বিল বিস্তৃত মহাদেশ। উজ্জ্বলতা, কত প্রশান্তি, কত বিক্ষোভ, কত বেদনা। অরুণকুমার সরকারের প্রচণ্ড দুর্দমনীয় আকর্ষণ যে প্রেমের কবিতা তারই পাশে শঙ্খ ঘোষের স্থির জীবনজিজ্ঞাসার প্রশ্নগুলি। আলোক সরকার বা অলোকরঞ্জনের জগতে প্রবেশ করলে সেখানেই

চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। শক্তি'র অসামান্য শব্দ-চয়নিকার প্রেক্ষাপটের চালচিত্রে যে সব নবনব উন্মেষ তার সঙ্গে কোথায় মিল পাই দূর বাংলার কোন তরুণতম কবির দুচারটে হঠাৎ-ছিটকে-আসা দুরন্ত পংক্তি। বাংলা কবিতার এই জোয়ার সম্ভব হয়েছে ১৯৩৯-৪৭-এর কয়েকটি উন্মুখ বছরের জীবকোষে। ওদেশে রয়েছেন শামসুর রাহমান, আমাদের বন্ধু কবি, ওদেশের তরুণদের কবির কবি।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে কয়েকটি নাম আমাদের কাছে গায়ত্রী-মন্ত্রের মত। ফ্রয়েড, মার্কস্, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রঁলা, টলস্টয়, মানবেন্দ্রনাথ—আরো আছেন কেউ কেউ। প্রত্যক্ষত বাংলা কবিতায় যাদের কর্মধারার বা চিন্তাসূত্রের নিরিখ রয়েছে—এমন কয়েকটি নাম। কোন না কোন ভাবে এঁদের ব্যক্তিত্ব বা চিন্তাজগৎকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি কবিদের পক্ষে—সাহিত্যিকদের পক্ষে। আমি কবিতার 'ফর্ম'-এর প্রসঙ্গে বলছি না। "ফর্ম' হয়তো 'কনটেণ্ট'কে নিয়ে জড়িয়ে থাকে—হয়তো বা 'কনটেণ্ট'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—সে-তর্কে আপাতত না গিয়ে অথবা ফর্ম-কনটেণ্টের অদ্বৈতরূপ মুহূর্তে, ক্রোচে-পন্থীদের বক্তব্য অনুযায়ী ইনট্যুইশন-এক্সপ্রেশনে, ধরা পড়ে সে প্রশ্নকেও দূরে রেখে একথা বলতে চাই, কবিতার জন্য যে স্বকাল, স্বদেশ এবং বৃহত্তর পৃথিবীর মানচিত্র আমাদের সামনে নিয়ত ভেসে ওঠে তাকে চেনবার জানবার এবং দুহাত দিয়ে ধরবার জন্য এই বিশ্বনাগরিকতার দ্বারস্থ আমাদের হতে হয়েছে। কবিরা আজ বাংলাদেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামে বসে তুলসীমঞ্চের ম্রিয়মান প্রদীপটিকে স্মরণ করে কবিতা লিখলেও এই সব বিশ্বপথিক মানুষদের কথা মনে রাখেন। মনে রাখতে হয়।

কিন্তু এখানে একটি সংশয় দেখা দিয়েছে। বিশ্বনাগরিকতার শরিক হতে গিয়ে আমরা বহু সময়ে স্বভূমির রস আহরণে বঞ্চিত হয়েছি। তাই দেখেছি পঞ্চাশ ষাট দশকগুলির কবিতাতে বিদেশী ফরাসী জর্মন কবিদের অন্ধ অনুসৃতি। এমনকি প্রথম সারির কবিরাও যেন ভুলে গেলেন বাংলাদেশের শাক্লা বা দোপাটি বা চন্দনবীচির কথা। জীবনানন্দের কবিতায় যে গ্রামবাংলার মুখ আমাদের অন্তরের গূঢ় গোপন স্থানে আঘাত দেয়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রভাস' কবিতায় যে সর্বভারতীয় পটভূমির স্থিরনিশ্চয় প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করি, সেসময়কার কারো কারো কবিতাতে আবার যেন বড় বেশী বিদেশীয়ানা

আমাদের ক্লিষ্ট করে। একথা অবশ্যই সত্য—এখন কলকাতা, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো বা বেজিং একই আকাশের নীচে, একই মানচিত্রের অন্তর্গত—তথাপি যে-ফুলটি আমার বাড়ির প্রাঙ্গনে যে-রঙ যে-আহ্লাদ নিয়ে ফুটবে তা সহস্র মাইল দূরে ঊষর প্রান্তরে ফুটবে না। কবিতা সম্পর্কে শিল্প বিষয়ে এ মত বোধহয় নিশ্চিত। কেননা, যেখানেই তা প্রাণের স্পর্শে দ্যুতিময়, সেখানে বিশেষ মাটির গূঢ় গাঢ় রসসঞ্চয়।

চল্লিশ দশকে—অর্থাৎ সেই সময় থেকে যাঁরা কবিতা লিখলেন আমাদের সমবয়সী কবির দল—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন এবং লোকনাথ ভট্টাচার্য এখনো সমভাবে সক্রিয়। জগন্নাথ চক্রবর্তী বা নরেশ গুহ কবিতার জগৎ থেকে বোধহয় কিছুটা সরে গিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয়—পূর্বোক্ত চারজন কবি—চারটি পৃথক ঘরকে আশ্রয় করে রয়েছেন। অভিজ্ঞতার ব্যপ্তিতে এবং বিষয়ের অগাধ বিচরণেও তেমনি, মননের গভীরতায় এবং কবিকর্মের সুচারু দক্ষতাতেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্রমশ নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন। তিনি একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী কবি। কিন্তু যে সব অম্লান মুহূর্তে তিনি তাঁর বিশেষ বিশ্বাসটুকুকে প্রবহমান মানবিকতার সঙ্গে একাত্ম করতে পেরেছেন সেখানে তিনি অনায়াসেই অত্যন্ত সার্থক। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে যে শিল্পীর 'ডিটাচ্‌মেণ্ট' রয়েছে, যে 'অবজেকটিভিটি' মাঝে মাঝেই দেখা যায় তা বড় দুর্লভ :

> দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ যায়,
> দেখি, আর ঘুম পায়।

এই সব পংক্তি বড় গোপন স্থানে আঘাত দেয়। স্থান কালের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় এই সব চেতনা—যা বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ বা ইংরেজী কবিতায় কখনো সখনো কীটস্‌কে মনে পড়ায়।

আমার সমকালের কবি নরেশ গুহ বা জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতায় একধরণের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ আছে যা পাঠককে মুহূর্তে কাছে টানে। যুদ্ধ বা যুদ্ধপরবর্তী সাময়িক ঘটনাবলী নরেশ গুহকে প্রত্যক্ষভাবে তত আঘাত হানে নি, কিন্তু জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতায় একটি সচেতনতা কাজ করেছে যা মানবিক হৃদয়-দৌর্বল্যকে সজাগ করে। শুদ্ধসত্ত্ব বসু বা বটকৃষ্ণ দাস কবিতায় 'কর্ম'

নামক প্রারম্ভিক বিষয়ে অতি-সচেতন। মৃগাঙ্ক রায় আবার লিখেছেন—সহজ কবিতাই যাঁর নিরাভরণ সৌন্দর্য। শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ ধর, যাঁরা সম্প্রতি খুবই গভীর ভাবনার কবিতা আমাদের উপহার দিচ্ছেন, মনে হয় যেন, নিজের 'জট' ক্রমশ খুলতে খুলতে এগুচ্ছেন। এই সময়কার আরো কিছু কবিদের কথা আমার জানা, যাঁরা ক্রমশ লেখা বন্ধ করে দিলেন, যেমন সুনীল চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। দিলীপ রায়ের কথা বিষণ্ণ চিত্তে স্মরণ করি।

অব্যবহিত পরের কবি প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ সেনগুপ্ত, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত এবং বটকৃষ্ণ দে। এঁরা সবাই লিরিকধর্মী কবি। কল্যাণ সেনগুপ্ত ইদানীং রীতিমত ভালো লিখছেন। রাজলক্ষ্মী দেবী এবং বাণী রায়ের কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কবিতা সিংহর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু আর যাঁদের নাম করতেই হবে তাঁরা নবনীতা দেবসেন, প্রকৃতি ভট্টাচার্য, বিজয়া মুখোপাধ্যায় এবং কেতকী কুশারী ডাইসন। এঁদের কাউকেই 'মহিলা কবি' বলে পৃথকচিহ্নিত করবার মত কারণ ঘটে নি। নবনীতা বা বিজয়ার কবিতায় মননধর্মিতার ছাপ রয়েছে বিশেষভাবেই; সেখানে প্রকৃতি ভট্টাচার্য একটি, ছোট হলেও, নিজের জগৎ নিপুণভাবে গড়ে তুলেছেন। স্বদেশরঞ্জন দত্ত, শোভন সোম, আনন্দ বাগচী বা ঐ সময়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সুরজিৎ দাশগুপ্ত ক্রমশ কবিতা থেকে দূরে সরে গেছেন, যদিচ সকলের মধ্যেই একদা পূর্ণ প্রতিশ্রুতির লক্ষণ ছিল। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এবং অমিতাভ দাশগুপ্তেরও, একধরণের স্মার্টনেস পাঠককে উজ্জীবিত করে, কিন্তু সাময়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারাই বোধহয় বড় কবির লক্ষণ—এখানে দুই অমিতাভকেই ভাবতে হবে মনে হয়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতায় যে দার্শনিকতার আভাস আসে তাকে লাবণ্যে মণ্ডিত করবার দায়িত্ব থেকে কবি অব্যাহতি পাবেন না নিশ্চয়ই এবং এই প্রসঙ্গেই উল্টো কথা বলার রয়েছে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে—তাঁর কবিতার অসাধারণ লাবণ্য সত্ত্বেও কাব্যপাঠক আরো গভীর 'গভীরতা' আশা করে। অথচ হালকা চালে গভীর কথা শুনিয়েছেন সার্থকভাবে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সার্থকতার সঙ্গেই। তুষার চট্টোপাধ্যায় কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, পবিত্র মুখোপাধ্যায় বহু 'স্পর্ধার কবিতা' আমাদের উপহার দিয়েছেন, আত্ম-উন্মোচনেরও। দিব্যেন্দু

পালিতের কবিতায় রাজার বাড়ির কথা আমার চিরকাল স্মরণে থাকবে—এমন একটি সার্থক প্রতীক-ভাষ্য দুর্লভ। পরিশ্রমী কবি শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতাবলী কাব্যপাঠককে রীতিমত ভাবায়। মিষ্টি হাতের কবি বলে খ্যাতি ছিল অরবিন্দ গুহর, 'সমাজ সচেতন' কবি আখ্যা পেয়েছিলেন তরুণ সান্যাল। এঁরা বোধহয় আর কবিতা-লেখায় উৎসাহী নন। কিম্বা জানি না, মগ্ন হয়ে আছেন নিজস্ব বৃত্তে! পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল নন্দী, অসিতকুমার ভট্টাচার্য এবং শান্তিকুমার ঘোষ নিরলস কবিতাচর্চা থেকে বিরত হন নি। হন নি সুশীলকুমার গুপ্ত, আশিস সান্যাল, পরিমল চক্রবর্তীও। রীতিমত ভালো লিখছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, কবিরুল ইসলাম, গৌরাঙ্গ ভৌমিক। এঁদের কবিতায় অস্বাভাবিক দ্যুতি ছিটকে আসে। বাসুদেব দেব ছিমছাম, ফিটফাট, দুরন্ত। শংকর চট্টোপাধ্যায়কে মনে পড়ে—যিনি বেশ কিছু উজ্জ্বল কবিতা আমাদের উপহার দিয়ে কোন 'রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের' দিকে যাত্রা করেছেন।

এদেরই পরপর বিনয় মজুমদারের কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছে। এঁর কবিতা পাঠককে উৎসুক করে, মনে হয় ক্রমশ এঁর কাছাকাছি চলে যাই। উৎপলকুমার বসু একদা বহু ভালো কবিতা উপহার দিয়েছিলেন, এখন কি বিদায় নিয়েছেন কবিতার আসর থেকে! অকালে তুষার রায় এবং সুব্রত চক্রবর্তী চলে গেলেন। তুষারের 'ব্যাণ্ডমাস্টার' রীতিমত বিস্ময়কর কাব্যগ্রন্থ। এবং তরুণ সুব্রত বেশ কিছু কবিতা উপহার দিয়েছিলেন যা আমার মত প্রৌঢ় কবির কাছেও ঈর্ষণীয়। আরো লিখছেন কবিরা, শুধু কলকাতায় নয়, মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে, আলিপুর দুয়ারের জঙ্গল থেকে, বাঁকুড়ার রুক্ষ প্রান্তর থেকে কখনো কখনো সাড়া-জাগানো কবিতা আমার কাছে ছিটকে আসে। সচকিত হই, উৎফুল্ল হই। যুগপৎ আশা এবং সাহস জাগে। আমাদের কয়েকজনার নয়, জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় দুচারজন বড় কবির নয়, বহু কবির মিলিত ভালোবাসায় প্রবহমান বাংলা কবিতা এখনো প্রাণচঞ্চল, উন্মুখর তার কলধ্বনি; ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়।

এবারে কিছু বিষয়গত ধারণার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করি। স্বাধীনতা-উত্তর যুগকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। ১৯৪৭-১৯৫৫ প্রথম

পর্যায়। দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মহামারী ইত্যাদি। এর মধ্য দিয়ে কবিতায় যে সবসময় এধরণের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়। ১৯৫৫-১৯৭০ এ এবং ১৯৭০ থেকে এ পর্যন্ত আরো দুটি পর্যায় ভাগ করা যায়, সময় অনুযায়ী। 'তথাকথিত' সমাজসচেতনতা প্রথম পর্যায়ে প্রায় সকল কবিকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেল প্রেম, দেহচেতনা—এমনকি আত্মরতি বিষয়টি কবিতায় ভয়ানকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলো। এ সময় লক্ষণীয় যে মার্কস্‌বাদী কবিরা প্রত্যক্ষভাবে এধরণের আত্মকেন্দ্রিক এবং দেহসর্বস্ব কবিতাকে থিসীস হিসেবে নস্যাৎ করতে চাইলেও তাঁদের অনেকেই এজাতীয় কবিতায় হাত মক্স করেছেন। ১৯৭০ থেকে তরুণ কবিগোষ্ঠীর মধ্যে আরো একটু গভীর আত্মস্বীকার প্রশ্ন দেখা দিল। কবিতা হিসেবে এসকল যে কালের স্থায়ী আলমারিতে স্থান করে নেবে এখুনি তা মনে হয় না, কিন্তু বাংলা কবিতায় আত্মস্বীকার ব্যাপারটি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিল—সেই সুধীন্দ্রনাথের পর থেকে। আমি একথা বলি না, প্রত্যক্ষভাবে সুধীন্দ্রীয় প্রভাব এঁদের মধ্যে বইছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে—কিছুটা কবি ডানের মত—একটা 'মেটাফিজিক্যাল বায়াস' কবিতায় অনুপ্রবেশ করছে। বাংলা কবিতা আরো দশবারো বছরে কোথায় পৌছুবে জানা নেই—যে দ্রুতগতিতে ফর্ম, কন্টেণ্ট, ভাববিলাস, বিদ্রোহ, মগ্নচৈতন্য, আত্মরতি এসব বিষয় কবিতায় এসে যাচ্ছে তাতে সেই শিল্পের বিশেষণেই আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে যে art is ever elusive; বাংলা কবিতা যদি এভাবে নিজের পথ করে নেয়, ক্ষতি কি?

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের ইংরেজী রূপান্তর : রবীন্দ্রনাথ ও স্টার্জ মুর

বিজিতকুমার দত্ত

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে রোটেনস্টাইন, ইয়েটস এবং পাউণ্ডের কাছ থেকে যখন তাঁর 'সঙ অফারিংস'-এর অনুবাদ কবিতাগুলির জন্যে অশেষ প্রশংসা পেলেন তখন যে তিনি খুশী হয়েছিলেন সে বিষয়ে জানতে পারি সে-সময়ে লেখা তাঁর পত্রাবলী থেকে। তাঁর কবিতা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে তিনি যে তৃপ্তি পাবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৯১৩ সালের ১৮ মার্চ অজিত চক্রবর্তীকে -লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন 'বাংলায় যখন কবিতা প্রথম লিখ্‌ছিলুম তখন সেটা কেবলমাত্র কবির সঙ্গে কাব্যের মিলন ঘটেছিল। অর্থাৎ তখন আমার মনের সামনে আর কোনো অভিপ্রায় স্পষ্টত জাগ্রত ছিল না। এখন যখন এগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসেছি তখন আমার বধূর হাতের অন্ন সকলের পাতে পরিবেষণ করবার জন্যে ভোজের নিমন্ত্রণ করা গেছে। সুতরাং এর আনন্দ অন্যরকম। এই যজ্ঞের আয়োজনের উৎসাহে আমার মনকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। বারবার ঘুরে ফিরে কাটছি কুটচি মাজচি ঘষচি— একটা যেন ধুম পড়ে গেছে।'

'সঙ অফারিংস'-এর কবিতাগুচ্ছ কবির একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার ফসল— একটি বিশেষ ভাবনার প্রতিফলন। স্বভাবতই তাঁর ইচ্ছা হল অন্যান্য রচনারও অনুবাদ করতে। দেশে-বিদেশে তাঁর গুণমুগ্ধরাও তাঁকে অন্যান্য রচনার অনুবাদে উৎসাহ দিতে লাগলেন। উপরের পত্রে 'ধুম পড়ে গেছে' সেই কথাই প্রমাণ করে। এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অনুবাদ আমাদের হাতে এসে পৌচেছে। অত্যন্ত দ্রুততালে তিনি অনুবাদ করে যেতে লাগলেন। অন্যদেরও তাঁর রচনাবলীর অনুবাদকর্মে প্ররোচিত করলেন। কোন্ রচনা অনুবাদযোগ্য, অনুবাদে কোন্ পদ্ধতি নেওয়া উচিত এসব ভাববার বোধ করি সময় তাঁর ছিল না। বিদেশীদের কাছে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ বড় বেশি ব্যাকুল তখন। দেশে ফিরে এসেও তিনি বিদেশীর ভালোবাসাকে সযত্নে

লালন করেছেন। এবং মাঝে মাঝে তাঁর রচনা তর্জমার সাহায্যে বিদেশীদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এইরকম একটি অনুবাদকর্ম হল 'Karna and Kunti.' রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্বন্ধে এডওয়ার্ড টমসন সর্বদা অনুকূল মত দেন নি। কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রনাথের যে ক'টি তর্জমা সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করেছিলেন তার মধ্যে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' অন্যতম। তিনি বলেছেন, 'only Karna and Kunti seems to me adequately translated'.

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর ইংরেজি তর্জমা 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় বার হয় ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে। তর্জমায় অনুবাদকের নাম ছিল না। ঐ বছরেরই জুলাই মাসে 'মডার্ন রিভিউ'-তে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়। এবারেও অনুবাদকের নাম ছাপা হয় নি। 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' -এর অনুবাদক যে রবীন্দ্রনাথ এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের 'The Fugitive' ও পরে 'Collected Poems and Plays'এ গ্রন্থভুক্ত হয়। 'মডার্ন রিভিউ'-তে প্রকাশিত অনুবাদের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত অনুবাদটির কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' কাব্যনাট্য। ইংরেজি তর্জমা সংলাপময় গদ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ কবিতার অনুবাদে গদ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। গদ্যে কবিতার মেজাজ মর্জি যতটা রক্ষা করা সম্ভব ততটাই তিনি করেছেন। কবি স্টার্জ মুর 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে'র অনুবাদটি পড়ে খুশী হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষ্যের কাব্যনাট্য-রূপ দিতে চেয়েছিলেন। স্টার্জ মুর কাব্যনাট্য রচনায় সাফল্যলাভ করেছিলেন। কবিসমাজে তাঁর নাট্যকবিতা সমাদৃত হয়েছিল। এই কারণেই বোধ করি তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' ('চিত্রাঙ্গদা'র ইংরেজি রূপান্তর) এবং 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২২ সালের ২ মে তারিখের একটি পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন "আমি 'কর্ণ ও কুন্তী' কাব্যে রূপান্তরিত করে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। আমার মনে হয় আমি একেবারে অকৃতকার্য হই নি যদিও মূলের থেকে এর পরিবর্তন অনেকটা বেশি। আপনি কি কোনো পত্রিকায় এটি ছাপাতে আমাকে অনুমতি দেবেন? যদি 'আর্টস লীগ সার্ভিসে'র সদস্যবৃন্দ এটি মঞ্চস্থ করতে চায়—যেই ইচ্ছা তাঁরা প্রকাশ করেছেন—তাহলে কোনো দক্ষিণা আপনি অথবা

আমি না পেলে তাঁরা অভিনয় করবার অনুমতি পাবে কি?" 'আর্টস লীগ সার্ভিস' কোম্পানি সিঞ্জের 'রাইডার্স টু দি সী'র সুন্দর অভিনয় করেছিল—একথাও মুর রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মুর যে অভিনয়ের জন্যেই রূপান্তর-কর্মে উৎসাহী হয়েছিলেন এই পত্র থেকে তাও জানতে পারি। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ মুরের রূপান্তর পড়ে খুশী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি তর্জমায় বাংলা রচনাকে হুবহু অনুসরণ করার প্রয়াস আছে। যদিও মূলের কোনো কোনো শব্দ, উপমা, চরণ ইংরেজি তর্জমায় বাদ পড়েছে। অজিত চক্রবর্তীকে তিনি তাঁর অনুবাদকর্মের আদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন, 'বস্তুত নিজের লেখা ত ঠিক অনুবাদ করা যায় না। কারণ, নিজের লেখার উপর আমার অধিকার ত বাইরের অধিকার নয়, তা যদি হত তাহলে প্রত্যেক কথাটির কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হত। কিন্তু আমি তা করিনে। আমি কবিতার ভিতরের জিনিষটিকে ইংরেজিতে লেখবার চেষ্টা করি। তাতে ঢের তফাৎ হয়ে যায়। আমি না বলে দিলে তোমরা বোধ হয় অনেক কবিতা চিনতেই পারবে না।' এই রবীন্দ্রনাথের তর্জমার বিশিষ্ট রীতি।

মুরের কাছে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' 'প্রোফাউণ্ড' মনে হয়েছিল। এর কাব্যগুণ মুরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি বাংলা রচনার পরিচয় পান নি, পাওয়া সম্ভবও ছিল না, কারণ মুর বাংলা জানতেন না। কিন্তু বাংলা রচনা যে আরও সুন্দর—এ বিষয়ে মুর নিশ্চিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা পড়েই মূল সম্বন্ধে মুরের কৌতূহল জাগে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তর্জমার দ্বারা মুরের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এটা অনুবাদ-কবিতাটির সাফল্য সূচিত করে নিশ্চয়ই। কিন্তু মুর অনুবাদটিতে কিছু অভাবও লক্ষ্য করেছিলেন। তা না হলে তিনি আবার রূপান্তরে অগ্রসর হবেন কেন? 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' এর তর্জমায় রচনাটির নাট্য অংশ উপেক্ষিত হয়েছে এরকমই মুরের মনে হয়েছিল। মুর রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুসরণে একটি নাট্যকাব্য রচনায় আগ্রহী হলেন।

মুর এবং রবীন্দ্রনাথের রূপান্তরের মিল-অমিল সন্ধানের আগে রবীন্দ্রনাথ মূল-কে কেমনভাবে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করলেন তা দেখা যাক। কর্ণ আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে

কর্ণ নাম যার
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি—কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ।

বাংলা কাব্যনাট্যের নাম 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'। ইংরেজি অনুবাদে 'সংবাদ' বর্জিত। 'রাধাগর্ভজাত' কথাটিরও অনুবাদ নেই। কুন্তী যেখানে উপস্থিত সেখানে 'রাধা'র উল্লেখ প্রত্যাশিত। কর্ণের পালকমাতার কথা দর্শক-পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংঘাতের মৃদু কম্পনটিকে ধরে রেখেছিলেন বাংলা রচনায়। 'মাতঃ' সম্বোধনটিও ইংরেজি অনুবাদে বাদ পড়েছে। নারীর প্রতি বীর কর্ণের শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমবোধ এই সম্বোধনে প্রকাশিত হয়েছিল। নারীমাত্রেই জননী সম্বোধনে ভূষিত হওয়ার অর্থ জননী পূজার্হা। অনুবাদে কি এই দ্যোতনা পরিস্ফুট করা যেত না? কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে কুন্তী বলেছিলেন,

বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্বসাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্বলাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

তর্জমায় পাই, **I am the woman who first made you acquainted with that light you are worshipping.** দেখা যাচ্ছে শেষ দুই চরণের তর্জমা করা হয় নি। অথচ এই বিশেষ মুহূর্তটির জন্যে কুন্তীকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কত দ্বিধা, কত সঙ্কোচ কাটিয়ে কুন্তী আজ আপন পুত্রের করুণাপ্রার্থী—সে বেদনা ঐ দুই চরণে স্তব্ধ হয়ে আছে। কর্ণ বলেছিলেন তিনি সন্ধ্যাসবিতার বন্দনা করতে গঙ্গার তীরে এসেছেন। তর্জমায় সন্ধ্যা-সবিতার কিরণকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা রচনায় আগে 'জীবনের প্রথম প্রভাতে' এবং 'বিশ্বসাথে' কুন্তী কর্ণকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা রচনার 'জীবনের প্রথম প্রভাতে' অনেক বেশি আন্তরিক। জীবনের জড় সে মাতৃগর্ভ পর্যন্ত পৌঁছায়! কুন্তীর নিবেদনের পর কর্ণ বলেছিলেন,

দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্যকরঘাতে

শৈলতুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ 'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরে
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে
তোমা সাথে হে অপরিচিতা।

'নতনেত্রকিরণসম্পাতে'র অনুবাদে কেবল 'eyes' ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'নতনেত্র' শব্দে কুন্তীর অপরাধবোধ সূচিত হয়েছিল। 'সূর্যকরঘাতে শৈলতুষারের মতো'—অনুবাদে পাই 'Kiss of the morning sun melts the snow on a mountain top.' মূল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ সরে গেলেন। kiss কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। এই 'চুম্বন' মাতার পুত্রকে স্নেহচুম্বনের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'তব কণ্ঠস্বর……বেদনা'-র অনুবাদ 'your voice rouses a blind sadness within me of which the cause may well lie beyond the reach of my earliest memory.' এই অনুবাদ ব্যাখ্যামূলক। স্পষ্ট করবার প্রবণতা। গদ্য-অনুবাদে কাব্যের অতিরিক্তটুকু হারিয়ে গেল। শেষ দু'ছত্রের অনুবাদে 'রহস্য-ডোর' কেবলমাত্র mystery-তে সীমাবদ্ধ। 'ডোরে'র মাধুর্যটুকু বাদ পড়াতে মূলের রসগ্রহণে বাধা হল।

কুন্তী আত্মপরিচয় দিয়ে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করছেন। হস্তিনানগরে অস্ত্র-পরীক্ষার স্থলে কর্ণ অস্ত্রপরীক্ষায় উদ্যত হলে কৃপ কর্ণের বংশপরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। কর্ণের নীচবংশে জন্ম জেনে তাঁকে অস্ত্রপরীক্ষা থেকে বিরত করা হল। কর্ণ লজ্জিত। সমস্ত ঘটনাটির নীরব সাক্ষী মাতা কুন্তী। তাঁর বুক ভেঙে গেলেও সেদিন তিনি কর্ণকে পরিচয় দিতে পারেন নি। সে বেদনার কথা কুন্তী স্মরণ করলেন এই সন্ধ্যায়,

যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে—কাহার নয়ন
তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিস-চুম্বন।

এই অংশের অনুবাদ এইরকম, 'Who was that unhappy woman whose

eyes kissed your bare, slim body through tears that blessed you'. 'অভাগিনী' এবং 'বাক্যহীনা'র অনুবাদ একটি মাত্র শব্দ unhappy দ্বারা করা হল। Unhappy আক্ষরিক নয়, ভাবানুবাদও নয়। 'বাক্যহীনা' শব্দটি এখানে কোনোমতেই বাদ দেওয়া যায় না। 'স্নেহক্ষুধার……বক্ষে' অনুবাদে নেই। এমন হতে পারে ইংরেজিতে এই ইডিয়ম নেই। অথবা বিদেশী মানুষ বুঝবে না বলে রবীন্দ্রনাথ এই অংশটি বাদ দিলেন ? এই অমূল্য উপমাটি পরিত্যক্ত হওয়াতে মূলের আবেদন ইংরেজিতে সঞ্চারিত হল না।

প্রত্যাখ্যাত হলে কর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন,

আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষে অগ্নিসম তেজে
কে সে অভাগিনী।

কুন্তীর এই উক্তিতে নির্বাক কর্ণের লজ্জিত হওয়ার চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। কর্ণের অপমান কুন্তীকে ক্ষুব্ধ করেছে, তাঁর চিত্তকে দগ্ধ করেছে। অভাগিনী কুন্তী সে অপমান সেদিন সহ্য করেছিলেন নিজেকে দগ্ধ করে। এই সংবাদ এখন কর্ণকে নিশ্চয়ই বিচলিত করেছে। ইংরেজি অনুবাদে এই সংবাদ-অংশটি সম্প্রসারিত। কুন্তীর আবেগের উত্থান-পতনটি সযত্নে রচিত। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ, 'You stood speechless, like a thunder cloud at sunset flashing with an agony of suppressed light', 'আরক্ত আনত মুখ'-এর অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ একটি উপমার আশ্রয় নিলেন। আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে রবীন্দ্রনাথ যখন এই চরণটি লিখেছিলেন তখন তিনি বজ্রগর্ভ মেঘের কথা ভেবেছিলেন। ঐ বিশেষণগুলি (আরক্ত, আনত) আসলে ঐ রকম একটি বিস্তৃত উপমার নির্যাস ! অনুবাদে মূলের গূঢ় অর্থকে দীপ্ত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। হস্তিনানগরে দুর্যোধন কর্ণকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সেদিনের কুন্তীর অপার আনন্দ আজ কর্ণের গোচর করলেন তিনি।

ধন্য তারে।
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি

উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক-সাথে। * * *
সেইক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি যে তোমারে ওগো বীরমণি,
আশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

রবীন্দ্রনাথ এই চরণগুলির অনুবাদ করেছেন কেটে ছেঁটে, 'But there was one woman of the Pandava house whose heart glowed with joy at the heroic pride of such humility ;—even the mother of Arjuna !' বীরাঙ্গনা মাতার ছবি ফুটেছে এই অনুবাদে। কিন্তু 'অশ্রুবারি-রাশি' দিয়ে অভিষেক করার মধ্যে যে বেদনামাধুর্য ঝরে পড়েছে বাংলা রচনায় অনুবাদে তা নেই। 'বীরমণি' কথাটির ইংরেজি অনুবাদ সম্ভব কিনা জানি না কিন্তু এই শব্দটিতে মাতৃস্মৃতির যে মধু সঞ্চিত রয়েছে তাতো পাওয়া গেল না! রবীন্দ্রনাথ কি সমস্যায় পড়েছিলেন তা আমাদের স্পষ্ট জানা নেই, দেখা যাচ্ছে এখানে সমস্যার সমাধান হয় নি।

এরপর কর্ণ কুন্তীর যুদ্ধক্ষেত্রে আসার কারণ জানতে চাইলেন। কেননা তিনি তো 'কুরুকুলসেনাপতি'। কর্ণের এই উক্তি কুন্তীর কাছে মর্মান্তিক। এখানে কুন্তীর মথিত চিত্তের দীর্ণ উচ্চারণের প্রত্যাশা জাগবে দর্শকের। কুন্তী উত্তর দিয়েছিলেন, 'পুত্র ভিক্ষা আছে—/ বিফল না ফিরি যেন।' অনুবাদে 'আমি কুরু সেনাপতি' পরিত্যক্ত। এবং কুন্তীর উক্তির অনুবাদ এইরকম 'I have a boon to crave'. দ্বিতীয় ছত্রটি অনুবাদে অনুক্ত। কর্ণ এরপর বললেন, 'ভিক্ষা মোর কাছে! / আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর / যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।' অনুবাদে পাই, 'Command me, and whatever manhood and my honour as a kshatriya hermit shall be offered at your feet', 'পৌরুষ' এবং 'ধর্ম'র অনুবাদ manhood এবং honour কোনো দিক থেকেই সমর্থন করা যায় না। বিশেষত ধর্ম কথাটির মধ্যে ভারতীয় 'ধর্ম' পালনের যে অলঙ্ঘ্য নির্দেশ রয়েছে সে ভাবটি অনুবাদে স্পর্শ করতে পারে নি। কুন্তী কর্ণকে পাণ্ডবশিবিরে ফিরে আসবার জন্যে ব্যাকুল আহ্বান জানালে কর্ণ বললেন,

সাম্রাজ্যসম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহ মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

এই অংশ অনুবাদে বর্জিত। এর কোনো সদুত্তর আমাদের জানা নেই। যাই হোক, কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে কুন্তী বলেছিলেন,

পুত্র মোর, ওরে
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি এক দিন—সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে—
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহো আপনার স্থান।

ইংরেজি অনুবাদে এই অংশের মাত্র এই সংবাদটি পাই, 'Your own God-given right to your mother's love'. বলা বাহুল্য, কর্ণের সংশয়কে যখন অনুবাদে কিছুটা অনুক্ত রাখা হয়েছে তখন কুন্তীর উত্তরের অংশেও অনুরূপভাবে কিছু বর্জিত হবে সন্দেহ নেই। কুন্তীর মাতৃহৃদয়ের আবেগঘন রূপটি অনুবাদে দেখানো হল না। 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে'র দর্শক-পাঠকের কাছে আবেদন রয়েছে কাহিনীটির গীতিধর্মিতায়। গদ্য-অনুবাদে সে গীতিধর্মিতা বর্জিত (সর্বদা নয়) হওয়ায় মূলের লিরিকমাধুর্য থেকে আমরা বঞ্চিত হই। কোনো কোনো জায়গায় সেই কারণে অনুবাদ নিরুত্তাপ।

কুন্তীর ব্যাকুলতা কর্ণকে স্পর্শ করেছে। তিনিও হৃদয়াবেগে বিগলিত। তারই ফলে দেখি কর্ণ স্মৃতিরোমন্থনে করুণ। কর্ণ বলছেন, 'পুরাতন সত্যসম / তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।' অনুবাদে পরিত্যক্ত। কর্ণ বলছেন,

গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃতি আলয়ে,
চেতনাপ্রত্যূষে। * * *

অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।

অনুবাদে এ দুটি অংশ একটি বাক্যে পরিণত, 'Your voice leads me back to some primal world of infancy lost in twilight consciousness'. বাংলা রচনায় 'মায়াচ্ছন্ন লোক', 'বিস্মৃত আলয়', 'চেতনাপ্রত্যূষ' কত অর্থবহ! এসব শব্দ ব্যঞ্জনাগর্ভ। রোমাণ্টিক মায়াবী জগৎ ও জীবনের এক রহস্যলোক উদ্ঘাটন করে শব্দগুলি। অনুবাদে এসব বাদ পড়ায় ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে গেল। ইংরেজি বাক্যে লিরিকের বড়ই টানাটানি।

স্মৃতিচারণার মুহূর্তেও কর্ণ কিন্তু আত্মবিস্মৃত নয়। সেজন্যেই তিনি কুন্তীকে সম্বোধন করেন, 'রাজমাতঃ অয়ি'। কর্ণের দোলাচলচিত্তের নাটকীয় প্রকাশ এইভাবেই দেখানো হয়েছে। অনুবাদে কথা দুটি নেই। কর্ণের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনি,

'জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ'—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি।

অনুবাদে আছে "open your veil, show me your face!" her figure always vanished. দ্বিতীয়, তৃতীয় চরণের এই অনুবাদ নিতান্তই দায়সারা গোছের। কর্ণের 'তৃষার্ত উৎসুক স্বপন' স্বপ্নের শরীরী রূপ নিয়েছে। স্পর্শকাতর শরীর মাতৃদেহের মধ্যে তৃষ্ণার শান্তি খুঁজেছে। অনুবাদে তৃষ্ণার তীব্রতা হারিয়ে গেছে। দুঃসহ বেদনায় কর্ণ কুন্তীকে বলেছেন, 'কোথা যাব, লয়ে চলো'। কুন্তীও বলেছেন কর্ণকে পাণ্ডবশিবিরে যেতে। কর্ণ বললেন,

হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন। হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে! দেবী কহো আরবার
আমি পুত্র তব।

ইংরেজি অনুবাদে এই চরণগুলি পিষ্ট হয়েছে। কর্ণের উক্তি এইরকম, Am I there to find my lost mother for ever?' মূলে দেখতে পাই কর্ণের

স্বপ্নের ঘোর এখও কাটে নি। তাঁর বঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষোভও উচ্চারিত হয়েছে। কর্ণের গতিপথ চিরদিন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। ধ্রুবতারার প্রতি নির্ভরতা কর্ণের নেই। ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং ভাগ্যগর্বিত কর্ণ-পাণ্ডবপুত্রদের প্রতিতুলনা ঐ চরণগুলিতে বিস্তৃত। এই অংশের শেষ বাক্যটি কর্ণের আর্তনাদ। অনুবাদে এইসব ভাবনা, বেদনা অনুচ্চারিত রয়ে গেল। কুন্তী কর্ণকে পুত্র বলে সম্বোধন করলে কর্ণ তাঁর ভাগ্যহত জীবনের জন্যে কুন্তীকে অভিযুক্ত করছেন। কেন কুন্তী কর্ণকে নির্বাসন দিয়েছিলেন? কেন তিনি অবজ্ঞাত? তারপর কর্ণ বলেছেন,

> কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
> বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
> মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
> আপন সন্তান হতে করিলে হরণ
> সে কথার দি'য়োনা উত্তর।

অনুবাদে আছে, 'Leave my question unanswered! Never explain to me what made you rob your son of his mother's love!' কর্ণের উক্তিতে বিশ্ববিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল। ইংরেজি রূপান্তরে বিশেষের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলা রচনায় সামান্য থেকে বিশেষে চলে আসা। সামান্যকে উল্লেখ করার জন্যে কুন্তীর প্রতি কর্ণের অভিযোগ আরও মর্মান্তিক, আরও ব্যাপক। কর্ণের শেষ বাক্যটির (কহো মোরে, / আজ কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।) রূপান্তর এই রকম, 'Only tell me why you have come to-day to call me back to the ruins of heaven wrecked by your own hand?' এ নূতন সংযোজন। বাংলার সাদামাঠা বাক্যটি ইংরেজিতে উপমাসমৃদ্ধ হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই রূপান্তর কর্ণের বেদনার গভীর রূপটিকে স্পষ্ট করেছে।

কুন্তী শেষ পর্যন্ত বলেছেন, 'ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম / বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম শত খণ্ড করি।' তর্জমায় পাই, 'I am dogged by a curse more deadly than your reproaches.' শতবজ্রের ভয়ঙ্করতা এই তর্জমায় উদ্ভাসিত হল না কুন্তীর হাহাকার,

তবু হায়,
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে।

ইংরেজি তর্জমায় আছে, 'Through the great rent that yawned for my deserted first-born, all my life's pleasures have run to waste.' এই তর্জমা মূলকে স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু 'run to waste'-এর দ্যোতনা সমাপ্তির। মূলের ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতা এবং বিশ্বব্যাপী ভাবের অনুরণন ঐ বাক্যাংশে নেই। কুন্তী আরও বলেছেন,

বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতারে।

কুন্তীর এই অনিঃশেষ যাত্রার অম্লান চিত্র অনুবাদে ধরা পড়ে নি। অনুবাদকের এই স্বাধীনতা কতটা গ্রহণযোগ্য সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তিত করে। অমিয় চক্রবর্তীকে -লেখা বেশ কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে তিনি কত অবহেলা করেই না অনুবাদ করেছিলেন!

এর পর দেখি কর্ণের অনমনীয় দৃঢ়তা চূর্ণ হয়ে যায় কুন্তীর হাহাকারে। তিনি বলেন, 'মাতঃ, দেহো পদধূলি, দোহো পদধূলি, / লহো অশ্রু মোর।' অনুবাদে দ্বিতীয় চরণটিকে পাই। কিন্তু প্রথম চরণে কর্ণের হৃদয়ের আলোড়নটির প্রকাশ ঘটেছে নাটকীয়ভাবে। দুবার 'দোহো পদধূলি' উচ্চারিত হওয়ায় কর্ণের হৃদয়াবেগের তীব্রতা ফুটেছে। দ্বিতীয় চরণে সেই তীব্রতার অবসান। অনুবাদে অবশ্য একটা শান্তশ্রী ফুটে উঠেছে, কিন্তু নাটকীয় উত্তেজনাটুকু বাদ পড়ে গেছে। এরপর কুন্তী কর্ণকে নিজ অধিকার বুঝে নিতে বলেছেন,

রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো হে বৎস উদ্ধার।
ঢুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত

গাহিবেন বেদমন্ত্র—তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্নসিংহাসনে।

রবীন্দ্রনাথ এতগুলি চরণের অনুবাদ করেছেন মাত্র একটি ছত্রে, 'Be that as it may, come and win back the kingdom which is yours by right.' প্রথমত, এতগুলি নামের সঙ্গে বিদেশীদের পরিচয় দেবার দায়িত্ব অনুবাদক নিতে চাইলেন না বলে অনুবাদে বাদ দেবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, মহাভারতীয় সংস্কার বিদেশীদের থাকবার কথাও নয়। তৃতীয়ত, নাটকীয়তার দিক থেকেও সংক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ ভেবে থাকতে পারেন। এর পর কর্ণ বলেন,

মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে।

কুন্তীর পক্ষে বঞ্চিত কর্ণকে আবার মাতৃস্নেহ ফিরিয়ে দেওয়া সাধ্যাতীত — এই কর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ। এর অনুবাদ এইরকম, 'The quick bond of kindred which you severed at its root is dead, and can never grow again.' ইংরেজি বাক্যটি সংবাদ বহন করে—বাংলা রচনায় লিরিকের বেদনা। কর্ণের কথায় হতাশায় কুন্তী ভেঙ্গে পড়েন, 'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর / দণ্ড তব।' অনুবাদে আছে, How God's punishment invisibly grows from a tiny seed to a giant life! রবীন্দ্রনাথ একটি উপমার সাহায্য নিয়েছেন। এ উপমা খ্রীষ্টীয় দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিক থেকে এই উপমা প্রয়োগের নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে।

বাংলা রচনায় এর পর কর্ণের বিদায় সম্ভাষণ। রবীন্দ্রনাথ এখানে মূলের যথাযথ রূপ অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন। কেবল শেষ তিন ছত্রের

শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লাভে যশোলোভে রাজ্যলোভে অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেন নি! এমন হতে পারে যে কুন্তীর আবেদন

প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে কাহিনীটির শেষ হওয়া উচিত—রবীন্দ্রনাথ এরকমই ভেবেছিলেন। উদ্ধৃত তিনটি ছত্রের পূর্বে চারটি ছত্রে কর্ণের নির্মম অথচ করুণ বিদায়বার্তা উচ্চারিত,

> জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
> নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
> আমার নির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী
> দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।

এইখানেই যথার্থ নাটকের শেষ। পরের তিনটি ছত্র মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের মহিমাদ্যোতক কিন্তু শিল্পের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয়। হুমায়ুন কবীর এই কাব্যনাট্যটি অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এই তিন ছত্র বাদ দেন নি। তাঁর অনুবাদ এইরকম (Humayun Kabir : One Hundred and one Poems by Rabindranath Tagore), Only this benediction leave for me. Neither the lure of victory nor of fame nor of realm may ever turn me from the path of rectitude.

স্টার্জ মুর কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের কাহিনীটির নাম পরিবর্তন করে দিলেন। Karna and Kunti এই নামটি তাঁর পছন্দ হয় নি। তিনি কাহিনীটির নাট্যসম্ভাবনার দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন বলেই এ কাহিনীতে মাতা এবং পুত্রের দ্বন্দ্বটিকে প্রধান করতে চেয়েছেন। স্টার্জ মুর কাহিনীটির নাম দিলেন The Foundling Hero. এই নামকরণে নায়কের পরিচয়হীন এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত রূপের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তিনি 'Hero' অর্থাৎ বীর। নামকরণে মুরের নৈপুণ্য সহজেই লক্ষ করা যায়। মুর বাংলা জানতেন না বলে রবীন্দ্রনাথের বর্জিত অংশের রূপান্তর করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। মুর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অবলম্বনে যে কাহিনীটি রচনা করেছেন সেকথা জানিয়েছেন গোড়াতেই Adapted from English translation of Rabindranath Tagore's poem, Karna and Kunti. বিদেশীদের বোঝার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কর্ণ-কুন্তীর পরিচয় দিয়েছিলেন মাত্র দুটি ছত্রে। মুর সে পরিচয় আরও একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। কর্ণকে পরিত্যাগ করলেও কর্ণের কৌরব 'শিবিরে যোগদান পর্যন্ত

কুন্তী যে সব কিছুই জানতেন সে-কথা মুর তার 'পরিচয়ে' বলেছেন। কুন্তী যে পাণ্ডবজননী। সে জন্যে কর্ণ যে তাঁর পুত্র একথা তিনি গোপন রেখেছিলেন।

মুর নাটক আরম্ভ করেছেন এইভাবে। তৃতীয় বন্ধনীতে নাট্যনির্দেশ 'পর্দা উঠে গেলে দেখা গেল কর্ণ গঙ্গাতীরে ধ্যানমগ্ন। একজন নারী একটু দূরে, তিনি বসলেন। ক্ষণকাল নীরবতা।' মঞ্চসচেতন মুর যথার্থ নাটকীয় রীতিতে কাব্য-নাট্যের সূচনা করলেন। মুরের বিবরণে কুন্তী প্রথমে 'একজন নারী' রূপে পরিচিত। বলা বাহুল্য, নাটকীয় কৌতূহল বজায় রাখবার জন্যে কুন্তীর পরিচয় তিনি গোপন রাখলেন। কর্ণ পরিচয় দিলেন। অস্তগামী সূর্যের বন্দনা করছেন তিনি। কুন্তী জানালেন, যে-সূর্যের বন্দনা করছেন কর্ণ সেই সূর্যের সঙ্গে তিনিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কর্ণকে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বলেন, I do not understand. মুরের নায়ক কিন্তু কুন্তীর এই উক্তিতে উত্তেজিত হয়ে উঠলে `What can those words mean ? Wild as lunacy !' মুরের রূপান্তরে প্রশ্নাত্মক বাক্যটি তীক্ষ্ণ, শাণিত। দ্বিতীয় বাক্যটি একজন সৈনিকের উক্তি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। দুটি বাক্যই নাটকীয় উত্তেজনায় ভরপুর। এর পর রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বলেন, 'Your eyes melt my heart...' কিন্তু মুরের রূপান্তরে কর্ণের তেজোদ্দীপ্ত রূপটি অক্ষুণ্ণ, 'Yet their tone touched with flame this conscious cheek,' 'flame' কথাটি লক্ষণীয়। কর্ণের হৃদয়ের উত্তাপকে ঐ একটি শব্দের সাহায্যে দর্শক-শ্রোতা স্পর্শ করে। কর্ণের উত্তাপ যখন শান্ত হ'ল, তাঁর চিত্তে তখন আবেগের ফল্গুধারা। রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন বরফাচ্ছাদিত পর্বতের সঙ্গে। যেমন করে বরফ গ'লে পর্বত উদ্ভাসিত হয় তেমনি করে কর্ণের কাঠিন্য গলে যায়। কিন্তু মুরের রূপান্তরে পাই

To flush some snow-capped mountainous event
Long hid in night. How thine eyes sadden me !

আগের বাক্যে পেয়েছি flame, অর্থাৎ কর্ণের হৃদয় জ্বলে উঠছে এবং তারই আভাস তাঁর মুখে। সে মুখ আরক্তিম। বরফাচ্ছাদিত পর্বতে গুহান্বিত বহুকালের কোনো ঘটনা ঝিকিয়ে (flush) উঠছে কর্ণের হৃদয়ে। এর পরই কর্ণের বেদনার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় কর্ণের নম্ররূপের পরিচয়—মুরের রূপান্তরে কর্ণের পুরুষোচিত দৃপ্ততার প্রকাশ। কুন্তীর অপ্রত্যাশিত উক্তিতে,

Things that not even thought-winged memory

Can travel to, so far they lie behind,

Might yield such power as over-glooms my soul.

রবীন্দ্রনাথের ভাবকে ছুঁয়ে মুর কর্ণের বক্তব্যকে বিস্তৃত করেছেন। মুর কর্ণকে যেন একটু প্রগল্‌ভ করে তুললেন। আসলে বীর চরিত্রের ভাষণে যে অতিশয়িত রূপ সেক্সপীরীয় নায়কচরিত্রে লক্ষ করা যায় মুর সেই রীতিই এখানেই অনুসরণ করেছেন। উপমাসমৃদ্ধ (thought-winged memory can travel so) ভাষণ নায়কের রোমান্টিক বৈভবকে সূচিত করে। কর্ণ সেইরকম বীর। রবীন্দ্র-নাথের কর্ণ এরপর বলেন, 'Tell me, strange woman, what mystery binds my birth to you'. মুরের রূপান্তরে পাই, 'What mystery, O strange woman, links my birth/And earliest hours to thee ?'
'O' অব্যয়টি নাটকীয় গুণে সার্থক; 'earliest hours' বোধ করি কুন্তীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা (তিনি বলেছিলেন সূর্যের আলো-কে তিনিই প্রথম কর্ণকে চিনিয়েছিলেন)। অথবা রবীন্দ্রনাথের 'earliest memory'র প্রতিধ্বনি। কুন্তী কর্ণকে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। অস্ত গেলে তিনি আত্মপরিচয় দেবেন। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে সূর্যকে (prying sun) অস্তকালের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফেলুক এরকম বুঝিয়েছেন। মুর সূর্যের সম্বন্ধে লিখেছেন The scrutiny of day's eye'. মুরও এখানে অলঙ্কারের লোভ ত্যাগ করতে পারেন নি। রোমান্টিক কল্পনা এই উপমানকে টেনে এনেছে।

এরপর কুন্তী আত্মপরিচয় দিলেন। মুরও পাত্রীর (কুন্তীর) পরিচয়ে The woman পরিবর্তন করে লিখলেন Kunti. কুন্তীর পরিচয় পেয়ে কর্ণ বিস্মিত। 'Arjuna's mother ? Kunti ?...' কুন্তীও ঢোক গিলে বললেন ...'Mother of Arjuna···of thine opponent.' সংলাপে এ ধরনের ফুটকি ব্যবহারের তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়। চরিত্রগুলির দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে ঐ ফুটকি ব্যবহারে।

কুন্তী কর্ণের হস্তিনা নগরে প্রবেশের দৃশ্যটি যখন স্মরণে এনেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন 'কর্ণের প্রবেশ যেন নবোদিত সূর্যের মতো'; স্টার্জ মুর উপমাটিকে বদলে দিলেন, 'So morning challenges night's brightest star !' মুর

কর্ণের অস্ত্র-পরীক্ষার ক্ষেত্রটিকে এই উপমার দ্বারা দর্শকের গোচর করালেন। অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণই মুরের বর্ণনার লক্ষ্য ; বলা বাহুল্য, brightest star অর্জুন, এবং morning কর্ণ। উপমাটি সুন্দর। কর্ণের উপস্থিতিতে কুন্তীর চিত্তে যে স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল তার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় পাই, Whose eyes kissed your bare, slim body through tears that blessed you. এখানে পাই কুন্তীর চোখের জলে চুম্বন। মুরের রূপান্তর এইরকম,

> What wretched woman was it kissed thy limbs
> With looks as fond as lips, if less courageous ?

looks এর সঙ্গে lips এর উপমা গড়ে তোলাতে বক্তব্য স্পষ্ট হ'ল বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের সৌন্দর্য হারিয়ে গেল। আবার দৃশ্যেন্দ্রিয়ের (looks) সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রিয়ের (lips) যোগাযোগ ঘটিয়ে মুর দৃশ্যটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছেন —এও অনস্বীকার্য। কর্ণকে ব্রাহ্মণ কৃপ বংশগৌরবের খোঁটা দিলেন। কর্ণ নির্বাক। রবীন্দ্রনাথের তর্জমা, এই রকম, 'like a thunder-cloud at sunset flashing with an agony.' মুর রূপান্তরিত করলেন,

> Like full charged thunder-cloud at sunset, halted
> By the sun's will to end both day and storm
> With glory, bidden retire, though swollen with hail,
> Loud claps and bladed light, even thus thou stoodst,
> An agony of worth suppressed.

মুর রবীন্দ্রনাথের উপমাটিকে বিশদ করেছেন। বলা বাহুল্য, রোমান্টিক নাটকে উপমা নির্মাণের রীতিনীতি মুর এখানে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন। এই উচ্ছ্বাস ঘটনায়, চরিত্রে এবং দৃশ্যে অনেক সময়েই ব্যাপ্তি এনে দেয়।

কর্ণকে দুর্যোধন অঙ্গরাজ্যের অধিপতিরূপে বরণ করলেন। কর্ণ বিনয়ের সঙ্গে তা গ্রহণ করলেন। পাণ্ডবরা বিদ্রূপ করলেন। চিকের আড়ালে থেকে কুন্তী সব দেখলেন। দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কুন্তীর চিত্ত অভিষিক্ত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ কুন্তীর মুখে এই ভাষা দিয়েছেন, 'Praised be Duryodhana' আর মুর লিখলেন 'Blessed be he, Duryodhana'. এই শব্দের পরিবর্তনে দুজনের রচনায় কুন্তীচিত্তের দুই রূপ প্রকাশিত হয়। উভয়ের বর্ণনাই স্থান

কাল পাত্র উপযোগী। কিন্তু মুর বাংলা না জেনেও বাঙালী মায়ের স্নেহময়ী রূপটিকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। কর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত হলে পাণ্ডবেরা ক্রূর হাসিতে ধিক্কার দিয়েছিল কর্ণকে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কুন্তী কর্ণের গৌরবে গর্বিত এবং দীপ্ত। স্টার্জ মুর কিন্তু কুন্তীর মর্মবেদনাকেও উদ্ঘাটিত করলেন,

and yet

> One heart thronged round by those insulters, glowed
> While thine heroic meekness proudly braved them
> Glowed......

কর্ণ যে পাণ্ডবের ধিক্কারকে অহঙ্কার দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন মুর-অঙ্কিত কুন্তীর চোখে তা সহজে ধরা পড়েছিল। আসলে মুর দেখেছেন কর্ণের বীরত্বকে। সেজন্যে 'অহঙ্কার' এবং 'উপেক্ষা' এই বীর চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব। কেবল তাই নয়, কর্ণ-চরিত্রের পূর্বাপর সামঞ্জস্যও এইভাবে রক্ষিত হয়েছে।

কুন্তীর কথায় কর্ণ বিচলিত হন নি। রবীন্দ্রনাথ কর্ণের গম্ভীর রূপটিকে চিত্রিত করেছেন। কেবল একটি প্রশ্নে But what brings you here alone, Mother of kings, মুর রূপান্তরে ঈষৎ বদলে দিলেন,

> But what should bring thee alone at nightfall,
> Mother of kings ?

'at nightfall' এবং 'alone' এ দুটি শব্দ কুন্তীর আগমনে কর্ণের বিস্ময়বোধকে বাস্তব ভূমিকায় স্থাপিত করলেন মুর। কুন্তীর আবেদনের উত্তরে কর্ণ ক্ষত্রিয়-রূপে সব দিতে পারে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। মুর এই অংশ বর্জন করলেন। কেন ? ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা সম্বন্ধে বিদেশী পাঠক কিছু জানেন না বলে ? এই অংশ বাদ দেওয়ায় কর্ণের চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিকই অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেল।

কুন্তী কর্ণকে বুকে টেনে নিতে চাইলে কর্ণ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, a small chieftain of lowly descent. মুরের রূপান্তর দেখুন a paltry chieftain born / Wrechedly, meanly bred ?' যতদূর বুঝি, মুর শ্লেষটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেন আরও ঘনিষ্ঠভাবে। দ্বিতীয় ছত্রের Wretchedly কর্ণের বাল্যকালের স্মৃতিকে আরও নিবিড়ভাবে দর্শক স্পর্শ করতে পারে। কুন্তী পুত্রস্নেহাতুর—তৃষিত বক্ষে ফিরে আসবার জন্যে কুন্তী ব্যাকুল প্রার্থনা

জানালেন। বিধাতার অধিকারেই কর্ণ ফিরে আসুক একথাও কুন্তী জানালেন। রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় আছে God-given right. মুর এও বর্জন করেছেন। পরিবর্তে মাতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই ভালোবাসার অধিকারেই কর্ণ কুন্তীকে মা বলে গ্রহণ করুক।

বলা বাহুল্য, কুন্তীর স্নেহকাতরতায় কর্ণ অভিভূত। তিনি স্মৃতিরোমন্থন করছেন। তখন সমস্ত চরাচর অন্ধকারে লুপ্ত। প্রকৃতি স্তব্ধ। রবীন্দ্রনাথের গদ্য অনুবাদে নির্জনতার এই গম্ভীর রূপটির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। মুরও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। মুরের ভাষায় একটু অতিরিক্ত আভা পাই যেন। বর্ণনায় বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আভা। কিছু অংশ তুলে দিই,

Augmenting dusk
Subdues earth, silence weighs the waters down :
Thy voice draws me apart, bids fade afar
These neighbour camps and river, and lo ! I grope
Through that first world I knew and recollect
So sparely, for some clue to thy late speech.
In vain !......

যথার্থ নাটকীয় ভাষায় মুর কর্ণের ভাবনাকে স্পষ্ট করেছেন। আমরাও যেন কর্ণের শৈশবস্মৃতির সেই ধূসর প্রান্তে চলে যাই সন্তর্পণে। কর্ণের উক্তি এইভাবে বিন্যস্ত হওয়ার ফলে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'এর কি রীতিতে অনুবাদ করা উচিত আমরা যেন তা জেনে যাই। কর্ণ যখন কুন্তীর সঙ্গে কথা বলছেন তখন দূরে পাণ্ডবদের শিবিরে আলো জ্বলছে—এদিকে কৌরব শিবিরের। যেন এক আসন্ন বিপর্যয়ের স্তব্ধতা এখানে বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে পাই, 'like the suspended waves of a spell-arrested storm at sea'. মুরের কল্পনা পরিবেশের ভয়ঙ্করতা আরও ঘনিষ্টভাবে স্পর্শ করছে, 'Like swollen waves heaved up on a black sea, / Yet movelessely suspended.' এই উপমাটি নাটকীয় চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব এনে দিয়েছে।

কুন্তীর সমস্ত বেদনাকে ছাপিয়ে কর্ণের কারুণ্য কিভাবে প্লাবিত হয়েছে মুরের রূপান্তরে—তা দেখা যাক,

Thy voice asserts thee Arjuna's mother. Yet
Breaks into sobs with knowledge of what woman
Gave birth to me.

সমুদ্রের রুদ্ধ তরঙ্গ Breaks into sobs—এইখানে উপমাটির সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ আক্ষরিক। মুর নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন।

যাই হোক বিচলিত কুন্তী কর্ণকে দ্রুত পাণ্ডবশিবিরে চলে আসতে বলেছেন। কর্ণও যেন প্রস্তুত। কর্ণের কাছে, 'যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ—মিথ্যা মনে হয়।' রবীন্দ্রনাথ মূলে সেই তর্জমায় একটি নূতন উপমা যুক্ত করেছিলেন, 'Victory and fame and the rage of hatred have suddenly become untrue to me, as the delirious dream of a night in the serenity of the dawn.' এখানে গদ্যে রং ধরে পদ্যের। মুর উপমাটিকে বাদ দেন নি। কিন্তু বদলে দিয়েছেন,

as frantic nightmare
Shows in the moist serenity of dawn.

frantic nightmare অথবা delirious dream of a night-এর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, কোন্‌টি কাব্যনাট্যের পক্ষে উপযোগী ভাষা—ভাববার বিষয় বটে! মনে হয় রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় আবেগের স্পর্শ বেশি যদিও সে আবেগ গদ্যে বিস্তৃত হয়েছে। এরপর কর্ণ কুন্তীকে জিজ্ঞেস করলেন কুন্তী যেখানে কর্ণকে নিয়ে যেতে চাইছেন সেখানে তিনি কি মা-কে ফিরে পাবেন? কুন্তীর মথিত চিত্তের একটি মাত্র বাক্য পাই বাংলা রচনায়, 'পুত্র মোর।' মুর চমৎকারভাবে এখানে একটি নাটকীয় কার্যের বর্ণনা দিয়েছেন। কর্ণের কথা শোনার পর কুন্তীর উক্তির আগে তৃতীয় বন্ধনীতে আছে 'about to embrace him'. মাতার দুবাহুর মধ্যে পুত্রের ঝাঁপিয়ে পড়ার কী ব্যাকুলতা প্রকাশিত হল ঐ নাটকীয় নির্দেশের জন্যে! এরপরই কুন্তীর উক্তি 'O, my son!'

কুন্তীর ব্যাকুল আহ্বানকে কর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন। কাব্যনাট্যের এই অংশটি মাত্র ঘটনার উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছে। কর্ণের আবেগ এখানে রুদ্ধ, কিছুটা থমথমে—যেন একটা প্রাসাদে বন্দী এক নিঃসঙ্গ মানুষের ব্যর্থতা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মুর কর্ণের হৃদয়ের এই আরোহণ অবরোহণ-কে লক্ষ

করেছেন। °তিনি এখানে যথার্থ নাট্যভাষাকে খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আর অনুসরণ করছেন না; কর্ণের রুদ্ধকণ্ঠ এবারে পাষাণ ভেদ করে বেরিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় আবেগের তীব্রতা অবশ্যই আছে কিন্তু তা গদ্যে বিন্যস্ত হওয়ায় ঈষৎ বিবরণধর্মী। মুরের ভাষা,

Not yet !

I have a mother gentle, meek and dear,
Who gave me her best life, day after day.
Thou thirstest for my love ; must she not hunger,
If now I quench thy thirst ? What through this glory
Thou offerest me be mine, it cannot be
So mine is the place I fill ! Thou thirstest ?
Why, then, was I flung out like weed torn up
From its first soil, across king's garden wall ?
Why was this murderous gulf set 'twixt myself
And Arjuna, converting to the dire
Attraction of hate that of kind, near kinship ?
(a pause)
Thy silence aches, I feel thy shame work through
The darkness, till that tingles and my flesh
Dreads its contact. (pause)

I clench thy dumbness here

As the wise hand will crunch the stinging weed
Never reply ! Leave thou my question...
As is a child exposed in homeless night !

এই উক্তিতে মুর তৃতীয় বন্ধনীতে দুবার a pause ব্যবহার করেছেন। এতেই বোঝা যাবে মুর আবেগের আরোহণ-অবরোহণকে কত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। গতি-বিরতির সংঘাতে ভাষা কখনও উত্তাল কখনও নম্র।

এরপর মুর রবীন্দ্রনাথকে প্রায় বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। বিশেষণ,

কর্তা, ক্রিয়া, কর্মের কিছু অদলবদল নিশ্চয়ই আছে। কুন্তী যখন বুঝলেন কর্ণ কিছুতেই পাণ্ডবপক্ষ নেবেন না তখন আত্মধিকারে নিজের ভাগ্যকে তিনি মেনে নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বিধাতার শাস্তি একটি ক্ষুদ্র বীজরূপে ছিল। আজ তা মহীরুহে পরিণত। রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ অবশ্য মুর গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখেছেন,

The devious hazards of confused events,

Returned a giant foe to smite he sons :

Punished of God am I !

এই রূপান্তরে তৃতীয় চরণটি নিঃসঙ্গতার দ্যোতক। কর্ণ তো এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। কর্ণের বিদায় সম্বোধন যেমন করুণ তেমনি শান্ত,,

আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম।

রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় পাই, 'Peaceful and still though this night be, my heart is full of the music of a hopeless venture and baffled end'. বাংলা রচনার 'স্তব্ধতা' এবং 'শান্তরূপ'—যা অনন্ত রাত্রি এবং আকাশকে পরিব্যাপ্ত করে আছে তর্জমায় তা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। মুরের রূপান্তর এইরকম,

This heart beats to the tune of hope forlorn,

Drums to a baffled close !

রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় পাই কর্ণ কুন্তীকে অনুরোধ করছেন কৌরবপক্ষ ছাড়বার কথা কুন্তী যেন না বলেন। মুর একে একটু প্রসারিত করলেন,

Never ask me then,

To leave my valiant Kauravas to their doom;

Thou canst not offer terms which they can take ;

And I embrace no fortune they share not.

এখানে কর্ণের সততা পরিস্ফুট। একজন যথার্থ বীরের ধর্মপালনের আন্তরিকতাও এই রূপান্তরে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। গোড়া থেকে মুর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই লক্ষ করে এসেছিলেন। যবনিকা যখন নেমে আসে তখন মুর তৃতীয় বন্ধনীতে লেখেন **as she turns to go, the scene closes ;** মুর শ্রব্য নয়—কাহিনীটিকে দৃশ্যই করতে চেয়েছেন।[২]

১. স্টার্জ মুরের রচনাটি দুষ্প্রাপ্য। মুরের রচনাটির সঙ্গে পাঠকের পরিচিতির জন্যে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি। এই রচনাটি লণ্ডন থেকে শ্রীমতী অরুনিমা রায় ফোটোকপি করে আমাকে পাঠিয়েছেন।

২. বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অজিত চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্টার্জ মুরের পত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীভবতোষ দত্ত। সেজন্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয়

মঞ্জু ঘোষ

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয় 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভার' ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই[১] বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত ও অভিনীত হয়। অভিনয়ের তারিখ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী। সাধারণী পত্রিকার[২] বিবরণে জানা যায়:

"কল্য শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবনে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়াছিল।...... তাহার পর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নামে একটি গীতিকাব্য অভিনীত হয়।"

ইন্দিরা দেবী তাঁর 'শ্রুতি ও স্মৃতি'-তে এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "জ্যোতিকামশায়দের কি এক বিদ্বজ্জন সভা ছিল, তাতে বঙ্কিমবাবু আসতেন, আর সেই উপলক্ষেই প্রথম 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয় শুনেছি।"[৩]

এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত বিদগ্ধ সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, বিহারীলাল গুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতিরাও এই সভায় যোগ দিয়ে অভিনয় দেখেন। সাধারণের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম অভিনয়। এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর এবং 'মানময়ী'তে ইন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর এই দুটি অভিনয় তাঁর পরিবারের লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার ব্যাপারে বিশেষ করে সুর রচনার কাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে কোন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন নি। তিনি সংগীত ও কনসার্টের ভার নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রধান

ভূমিকায় এই অভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"এই দুটি গীতিনাট্যের (বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া) অভিনয়ে আমি-ই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল।"[৪] বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এই অভিনয় বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় উপস্থিত[৫] ব্যক্তিদের মুগ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে[৬] এই অভিনয়ের প্রশংসা করেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই মুগ্ধ হন যে তিনি একটি গান রচনা করে ফেলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই অভিনয় না দেখেই কেবলমাত্র অভিনয়ের সংবাদ[৭] পেয়ে খুশী হয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র[৮] লেখেন। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'শ্রুতি ও স্মৃতি'তে লিখেছেন :

"রবিকাকা যখন বাল্মীকি সেজে মধ্যমে 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা' তাঁর তখনকার পূর্ণস্বর সুকণ্ঠ রামপ্রসাদী সুরে গাইতেন তখন সে যে কি থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি হত তা' যারা না দেখেছে না শুনেছে, তাদের কি করে বোঝাব।"[৯] সরস্বতীর ভূমিকায় প্রতিভা দেবীর অভিনয়ও সুন্দর হয়েছিল। সাধারণী পত্রিকার[১০] বিবরণে পাওয়া যায় :

"...প্রতিভা নাম্নী তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগদেবী রূপে অভিনয় করেন। বঙ্গ-কুল-কুমারী কর্তৃক রঙ্গাব্দী এই প্রথম উজ্জ্বলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ ভূমির নব কলেবরের এই অভিষেকক্রিয়ায় প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন। তিনি সুকণ্ঠা, গীতিনিপুণা সতেজনয়না এবং ধীরপদবিক্ষেপকারিণী। তাঁহার গীতিভিনয়ে দর্শকবৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন।"

প্রথম দস্যুর ভূমিকায় অক্ষয় মজুমদারের অভিনয়ও প্রাণোচ্ছল হয়েছিল। পরে অভিনীত 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বহু অভিনয়ে এই ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি প্রচুর প্রশংসালাভ করেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ছাদে পাল খাটিয়ে, ষ্টেজ বেঁধে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়। কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'অতীতের স্মৃতি'তে বলেছেন : "১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম অভিনয়ের সময় একটু দুর্ঘটনা ঘটেছিল মনে হয়। ষ্টেজ বাঁধা হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছাদে। ঝড় উঠে সমস্ত বাঁশের কাঠামো ভেঙেচুরে একেবারে তছনছ করে দেয় তবু এই অভিনয় বন্ধ হয় নি।"[১১]

এই অভিনয়ের উৎসাহের ও মঞ্চসজ্জার উল্লেখযোগ্য বিবরণ রয়েছে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে। তিনি বলেছেন : "প্রথম যখন ইহাদের বাড়ীতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয় হয় তখন জ্যোতিবাবু নূতন শিকারী ; বন্দুক চালনা প্রভৃতিতে তখন তাঁহার প্রবল ঝোঁক ; অভিনয় উপলক্ষে তিনি নিজেই শিকার করিতে বাহির হইলেন, সত্যিকারের পাখী দেখাইবেন এই অভিপ্রায়। কিন্তু বিধাতার এমনি পরিহাস যে, সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তবু একটা পাখীও মারিতে পারিলেন না। শেষে সন্ধ্যার পর হতাশ হইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি কতকগুলি জীবন্ত বক লইয়া যাইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে দুইটি বক ক্রয় করিয়া পথে মারিয়া বাড়ী আনেন। তাহাই অভিনয়ে প্রদর্শিত হইয়াছিল।"[১২]

এই অভিনয়ে মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করার চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য 'বাল্মিকীপ্রতিভা'র পূর্বে ঠাকুরবাড়ীতে নব নাটকের অভিনয়ের সময় দৃশ্যগুলিকে বাস্তবানুগ করা হয়েছিল এবং এই দৃশ্যসজ্জা খুব প্রশংসাও লাভ করেছিল।[১৩] প্রথম অভিনয়ের এক সপ্তাহ পরেই আবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয়।[১৪] ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কালমৃগয়া' থেকে কিছু অংশ নিয়ে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। এর পূর্বে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র যেসব অভিনয় হয় তা প্রথম সংস্করণকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম অভিনয় হয় ১২৯২ সালের ২০শে ফাল্গুন। এই অভিনয়েও রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকার অভিনয় করেন।[১৫] এরপর আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য টাকা তুলবার প্রয়োজন হলে বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হয় ষ্টার থিয়েটারে টিকিট বিক্রী করে।[১৬] বাল্মীকিপ্রতিভার সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অভিনয় হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে।[১৭]

এই অভিনয়ের ইতিহাস সম্পর্কে ইন্দিরাদেবী লিখেছেন :

"বাবা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) একবার বিলেত থেকে আসবার সময়ে তাঁর সহযাত্রী তখকার লাটপত্নী লেডী ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ী আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।...কলকাতায় আসবার পর লাটপত্নী এই নিমন্ত্রণরক্ষার অভিপ্রায় জানালে তাঁর জন্য বাল্মীকিপ্রতিভার একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা

হয়।"[১৮] লেডী ল্যান্সডাউনের সঙ্গে ছোটলাটপত্নী লেডী এলিয়ট ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ।[১৯] ফলে নানারকম ব্যবস্থাও হয়েছিল। এবারের অভিনয়ে ষ্টেজ সাজানোর ভার পড়েছিল নীতিন্দ্রনাথের উপর। তিনি নানাভাবে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বিভিন্ন দৃশ্যগুলিকে বাস্তবানুগ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ষ্টেজে বনজঙ্গল, পদ্মবন ও বৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছিল। পিছনে আয়নাতে আলো ফেলে বিদ্যুৎ এবং ছাদের এপাশ থেকে ওপাশ দম্বেল গড়িয়ে গড়িয়ে সেইদিনের আওয়াজও করা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'তে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।[২০] দিনেন্দ্রনাথ দস্যু সেজে তাঁর টাট্টু ঘোড়ার পিঠে লুঠের মাল বস্তা বোঝাই করে ষ্টেজে হাজির হয়েছিলেন।[২১] 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বিভিন্ন চরিত্রের সাজসজ্জাতেও এবার কিছুটা নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য দস্যুদের থেকে বাল্মীকিকে আলাদা করার জন্য পিঠের দিকে লম্বা জোব্বা মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। একটা শাঁখও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে দস্যুদের ডাকবার জন্য।[২২] বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটির সঙ্গে আমরা পরিচিত তা এই সময়ই তোলা হয়।[২৩]

দস্যুদের কাবুলীওয়ালাদের মতো সমস্ত ঢাকা পোষাকে সাজানো হয়েছিল। এর আগের সব অভিনয়ে দস্যুদের সারা-শরীর ঢাকা পোষাক ছিল না। খালি গায়ের উপর বুকে সরু লাল শালুর ফেটি বাঁধা থাকতো। কিন্তু এবারের অভিনয়ে সাহেব-মেমরা আসবেন। তাঁদের সামনে খালি গায়ে অভিনয় করা ঠিক হবে না তাই কাবুলীওয়ালাদের মতো পোশাক তৈরি করা হয়েছিল।[২৪]

অক্ষয় মজুমদারের দস্যু সর্দারের সাজটি চমৎকার হয়েছিল। তাঁর বিশাল ভুঁড়ির উপর বালিশ বেঁধে সেটিকে আরও বিশালরূপ দেওয়া হয়েছিল। অভিনয়ও করতেন দুর্দান্ত। কোন অবস্থাতেই কেউ তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারতো না। এবারের অভিনয়ে তিনি ষ্টেজে একটু অসুবিধায় পড়েছিলেন কিন্তু সেটাও প্রবল প্রতাপের সঙ্গে মানিয়ে দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : "সিন উঠল। এখন অক্ষয়বাবুর পালা, তিনি কেন জানি না, পাশ থেকে ষ্টেজে না ঢুকে ও পাশ দিয়ে ঘুরে মাঝখান দিয়ে ভিতর থেকে রী-রে-রে বলে

হাঁক দিয়ে যেই তেড়ে বেরিয়েছেন, নিতুদা অনেক-সব দড়িদড়ার কীর্তি করেছিলেন বলেছি, এখন তারই একটা দড়িতে অক্ষয়বাবুর গলা গেল বেঁধে। কিছুতেই আর খোলে না। মহাবিপদ; আমি পিছন থেকে আস্তে আস্তে দড়িটা তুলে দিতেই অক্ষয়বাবু একলাফে ষ্টেজের সামনে গিয়ে গান ধরলেন

আঃ বেঁচেছি এখন।
শর্মা ওদিক আর নন।
গোলমালে ফাঁকতালে……সটকেছি কেমন
সা—ফ সটকেছি কেমন।

এই গান গাইতেই, আর তার উপর অক্ষয়বাবুর গলা, চারিদিক থেকে হাততালি পড়তে লাগল। প্রথম গানেই এবারে মাৎ।[২৫] লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে মামুলি পৌরাণিক রীতি অনুসারে লাল ও সাদা জরির বেশে সাজানো হতো।[২৬] এই অভিনয়ে সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ইন্দিরা দেবী।[২৭]

রথীন্দ্রনাথ এই অভিনয় সম্পর্কে বলেছেন:

……it was performed in the courtyard of our house in the presence of Lady Lansdowne. The cast, drawn from our own family, were nearly all accomplished musicians and some of them no mean actors." [২৮]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের লেডী ল্যান্সডাউনের পার্টিতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের পর আর তেমন কোন অভিনয়ের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। আবার অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"Passages were obtained on a boat sailing from Calcutta to London. The evening before the boat sailed there was a party at Sir Ashutosh Chaudhuri's palatial residence, where a performance of father's operatic play 'Balmiki Pratibha' was given. Preparations had been going on for a long time and Dinendranath had been chosen to play the part of 'Balmiki'. Father, of course, had to be present." [২৯]

বিলাতযাত্রার আগে এই যে অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে এটি হলো

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চের অভিনয়ের বিবরণ। বিলেত যাওয়ার দিন স্থির হয়েছিল ১৯শে মার্চ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই যাত্রাদিনের কথা নির্ঝরিণী সরকারকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন।[৩০] কিন্তু এই নির্দিষ্ট দিনে তাঁর বিলেত যাওয়া হয় নি; লোকজন ফুলমালা নিয়ে জাহাজ ঘাটে উপস্থিত হলেও অসুস্থতাবশত কবি সেবার যেতে পারলেন না।[৩১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রাঁচিতে লেখা ডায়েরী থেকে ঐ বিষয়ে কিছুটা জানা যায়। তিনি লিখেছেন—"...আজ মেজবৌঠানরা নিশ্চয়ই আসবেন...কিন্তু এলেন না। আজ তাঁর চিঠি পেয়ে জানলুম বাল্মীকি-অভিনয়ের সাজের ভার তাঁর উপর পড়ায় আটকে পড়েছেন।[৩২]

রবীন্দ্রভবন পাঠাগারে রক্ষিত 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয়পত্রী থেকে জানা যায়, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২২ মার্চ শুক্রবার কলকাতায় আবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয়। এবারে দিনেন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেন শোভনা দেবী [৩৩] এবং সরস্বতীর ভূমিকায় অশোকা দেবী।[৩৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ওই তারিখে লেখা ডায়েরীতেও[৩৫] এই অভিনয়ের বিবরণ রয়েছে। তিনি লিখেছেন—"আজ রাত্রে বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হল। ইন্দুমাধব মল্লিকের পাশে বসেছিলুম। লাহোরিণীর সঙ্গে দেখা হল। রবি গিয়েছিলেন। Lady Hardinge এর খুব ভালো লেগেছিল।"

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৫ইমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মদিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমার জন্মদিন। ৬৩ বৎসরে পদার্পণ করলুম। আজ ২৫।২৬ জন নিমন্ত্রিত এসেছিল, 'বাল্মীকিপ্রতিভা" গেয়ে শুনিয়ে দিলুম।" তাঁর ডায়েরীর বিবরণে দেখা যায় নানান উপলক্ষে তিনি 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গেয়ে শোনাচ্ছেন।[৩৬] রাঁচিতেও তিনি একবার 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় করান।[৩৭] ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর কলকাতার ইম্পিরিয়াল ফাণ্ডের সাহায্যার্থে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় হয়।[৩৮] এই অভিনয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন সংগীতসংঘ। অভিনয়পত্রী ছাপা হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের ছবিসহ। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এই অভিনয়ে দস্যু দলে ছিলেন।

বাল্মীকিপ্রতিভার পরবর্তী অভিনয়ের লিখিত বিবরণ ঠিকমতো পাওয়া যায় না। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যার বিবরণে দেখা

যাচ্ছে ওই বছর চারবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হচ্ছে। এর মধ্যে ২৬শে ভাদ্রের অভিনয়ে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বিবরণ ঠিকমতো পাওয়া না গেলেও 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বহু উপলক্ষে বহুবার অভিনীত হয়েছে। ইন্দিরা দেবী বলেছেন :

"এই এক বাল্মীকিপ্রতিভা যে কতবার কত সূত্রে অভিনীত হয়েছে এবং আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অপ্রত্যাশিত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা বলতে গেলে একটা বই হয়ে যায়"।[৩৯] বহুবার অভিনয় দেখার ফলে এই গীতিনাট্য ঠাকুর পরিবারের অনেকের মনে একটা ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়েরীতেও দেখেছি কোন একটা উপলক্ষে তিনি বাল্মীকিপ্রতিভা গেয়ে শোনাচ্ছেন। প্রতিভা দেবীর বোন অভিজ্ঞা সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী বলেছেন—"অভি একাসনে বসে সমস্ত বাল্মীকিপ্রতিভা বা মায়ার খেলার গানগুলি প্রথম থেকে অভিনয় করে গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে পারত।"[৪০]

গগনেন্দ্র-কন্যা সুজাতাদেবী তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন 'বাল্মীকিপ্রতিভার' অভিনয় কতখানি তাঁর পিতার মনে ছাপ রেখেছিল। তিনি বলেছেন "...... একবার একটা চারফুট কাঠের স্টেজ তৈরী করেছিলেন তাতে সীন, ড্রপসীন ফুট-লাইট ছিল। কতকগুলি চার ইঞ্চি সাইজের বিবি পুতুল কিনে এনে, তাদের সাদা পোষাক পরিয়ে মাথার চুল দিয়ে মুখে পেন্ট করে ঠিক করলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কয়েকটি দৃশ্য দেখাবেন। স্টেজে ডাকাতদের সর্দার ভুঁড়ি ফুলিয়ে তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনদেবীরা নাচছে। বাল্মীকির সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও দেখিয়েছিলেন। এটা দেখবার মতো হয়েছিল।[৪১] স্টেজ বানিয়ে দৃশ্যের কথা ভাবতে গিয়ে গগনেন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কথা-ই মনে হয়েছিল। আর এই মনে হওয়ার পিছনেই ছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা'র বহুল অভিনয়ের প্রভাব।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম গীতিনাট্যটি তাঁর শিক্ষানবিশীর যুগে রচিত হলেও এর মধ্যে তিনি এমন ভাবনার, চরিত্রের, সুরের ও অভিনয়ের সংস্থাপন করেছিলেন যে ঠাকুর পরিবারে রচিত অন্য অনেক নাটকের অভিনয় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের বিবরণ-ই প্রমাণ দেয় যে পারিবারিক নানা উৎসব

অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বাইরের নানা প্রয়োজন এই গীতিনাট্যটির অভিনয়ের কথা-ই সকলে মনে করেছেন। এদিক থেকে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রথমদিকে রচিত হলেও এর আকর্ষণীয় ক্ষমতা আজও অটুট।

১. ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ ঠাকুরবাড়িতে এই সভা স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তের বৎসর। শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশমহাশয় এই সম্মিলনের নামকরণ করেন।

২. ১২৮৭, ১৭ই ফাল্গুন, ইং ১৮৮১, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

৩. ইন্দিরা দেবী। শ্রুতি ও স্মৃতি, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পৃঃ ৩৬

৪., ৫. জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী শতবার্ষিক সং ১০ম খণ্ড। পৃঃ ৯১

৬. দ্রঃ বঙ্গদর্শন। ১২৮৮, আশ্বিন পৃঃ ২৮

৭. দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ১৩৭৭ পৃঃ ১০৩

৮. দ্রঃ প্রিয়নাথ সেন। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃঃ ২০৯

৯. ইন্দিরা দেবী। শ্রুতি ও স্মৃতি। পৃঃ

১০. সাধারণী, ১২৮৭, ১৭ই ফাল্গুন ইং ১৮৮১, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

১১. অতীতের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্রঃ গীতবিতান, ১ম বর্ষ ১৩৫০ মাঘ। পৃঃ ৬০

১২. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৩২৬ পৃঃ ১৬২

১৩. তদেব পৃঃ ১০৮

১৪. অভিনয়ের তারিখ ১৮৮১, ৫ই মার্চ শনিবার, ১২৮৭, ২৩শে ফাল্গুন শ্রীপঞ্চমী তিথি। দ্রঃ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। রবিচ্ছবি, ১৯৬১ পৃঃ ৯৫

১৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড ১৩৭৭ পৃঃ ৩১৬

১৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। ঘরোয়া ১৯৭১ পৃঃ ১২৩

১৭. শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা পৃঃ ৪৯

১৮. ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রস্মৃতি, ১৯৬৭ পৃঃ ৩১

১৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। ঘরোয়া ১৯৭১ পৃঃ ১২৫-১৩২

২০. তদেব পৃঃ ১২৮

২২. তদেব। পৃঃ ১২৬

২৩. শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা। পৃঃ ৬০

২৪. অবনীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ। ঘরোয়া পৃঃ ১২৪-১২৫

২৫. তদেব পৃঃ ১২৭

২৬ ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রস্মৃতি। পৃঃ ৩৮

২৭. শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা।

২৮, Rathindranath Tagore : On the Edges of Time. 1958, Page 15

২৯. তদেব। পৃঃ ১১২

৩০. দ্রঃ চিঠিপত্র (৭ম খণ্ড) ২২ সংখ্যক পত্র।

৩১. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, রবীন্দ্র সংস্পর্শে জয়ন্তী উৎসর্গ পৃঃ ১৯৩

৩২. দ্রঃ Ms. 354 (D) 1912, 1st March.

৩৩. হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

৩৪. আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী-পরিবারের কন্যা

৩৫ দ্রঃ Ms. 354(D) 1912; দিনলিপির তারিখ—22nd March Friday. Calcutta.

৩৬. দ্রঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী Ms. 354 (C)

৩৭. অভিনয়ের তারিখ 1918, 18th June

৩৮. দ্রঃ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিতে অভিনয়ের অনুষ্ঠানসূচী।

৩৯. ইন্দিরা দেবী, রবীন্দ্রস্মৃতি ১৩৬৭ পৃঃ ২২

৪০. ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রস্মৃতি। পৃঃ ২২

৪১. সুজাতা দেবী। স্মৃতিকথা। গগনেন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যা

একটি রবীন্দ্রগল্প : অন্য দৃষ্টিকোণ

ক্ষেত্র গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের গল্পের শব্দধৃত শরীরের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে তার অনেক লুকোনো রূপের খোঁজ মিলবে, অনেক অনেক নিভৃত স্বাদ পাওয়া যাবে, পড়তে গিয়ে এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে। এখানে 'মানভঞ্জন' গল্পের কথা বলব। এই এই লেখাটি নির্বাচনের বিশেষ কারণ এটুকুই, লেখাটি নানা চিন্তা জাগিয়ে তোলে। [অবশ্য এ-রকম আরও বহু গল্প আছে।] গল্পটি সে-দলের নয়, দুকথায় যারা ফুরিয়ে যায়।

অনেকটা ক্ষমতা এবং বেশ কিছু দুর্বলতা থাকায় কখনো এ-গল্প পাঠককে ভীষণ উৎসাহিত করে, কখনো ম্রিয়মান। কলকাতা শহরের গল্প, অনেকটা কলকাতাকে নিয়েই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ, নগরকেন্দ্রিক সমাজবাস্তবতার একটা অধ্যায় তীক্ষ্ণভাবে ধরা হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে গ্রাম অনেক বেশি এসেছে, কিন্তু শহরের জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে দুর্ভেদ্য ছিল, এ-কথা বলা চলল না। কলকাতা এ-গল্পে শুধু পটভূমি নয়, অনেকখানি বিষয়ও বটে।

রবীন্দ্রনাথ গল্পের গোড়া বেঁধেছেন গোপীনাথ শীলের বাড়ির সামান্য একটু ছবি দিয়ে: রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকার সর্বোচ্চতলের ঘরে

> গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণদারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপ ফুলের গাছ—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইঁট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এনগ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে;···

এই একটি বর্ণনায় গোপীনাথদের শ্রেণীস্বভাব ফুটে উঠেছে। ধনবানের উচ্চতল প্রাসাদ, সেখানে টবে বেল-গোলাপ এবং অবরোধে যুবতী স্ত্রী ফুটে থাকে। ছাতের চারধারে উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে সামান্য ফাঁক দিয়ে বাইরের জগৎ কতটা-বা দেখা যায়,—শুধু জানা যায় যে বন্ধন কঠিন, অন্তরাল দুর্ভেদ্য। চূড়ান্ত

হল 'শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তি'র ফটো—গৃহস্বামীর রুচি ও লালসার নিদর্শনই নয়, নায়িকার কামনাতুর চরিত্রের তথা প্রবৃত্তির-তাড়িত গোটা কাহিনীর দিক থেকেও ইঙ্গিতবহ।

কলকাতার ধনী বাবু সম্প্রদায়ের গোপীনাথ,—তার এই গৃহবর্ণনা থেকে শুরু করে ইয়ারবন্ধু, থিয়েটার-বিলাস, রক্ষিতা অভিনেত্রীর সঙ্গ প্রভৃতি পরিচয়ে—সুনিশ্চিত শ্রেণী-প্রতিনিধি। এরকম বাবু বাংলা সাহিত্যে অনেক দেখেছি, গোপীনাথ অবাক করে না। রবীন্দ্রনাথ এখানে সার্থক চিত্রকর; কিন্তু চরিত্রে ব্যক্তিগত কোনো অভিনব ও স্বতন্ত্র মাত্রা বা জটিলতা আনতে প্রয়াসী নন। গোপীনাথের মনের হদিশ নেবার চেষ্টা যদিও লেখক একবার করেছিলেন। যেমন

> গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ।

এখানেও ভাষার আবেষ্টনী ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ; জীবনরহস্যে নামার সিঁড়ি নয়। এ ধরণের লম্পট ইয়ারবাজ বাবুদের বিদ্রূপ আহত করতে আরও ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেই মধুসূদন, দীনবন্ধু দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এ-কাহিনী ব্যঙ্গ রসাব্যয়ী প্রহসন নয়, সমাজহিতও নয়। যদিও কলকাতার অলস ধনী-সমাজ পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থের বিলাসী অপচয় নিয়ে গল্পের একটি প্রান্ত দখল করে আছে, আর আছে কলকাতার সমকালীন পেশাদারী থিয়েটারের দুনিয়া। রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবে ছিলেন অন্য প্রান্তের, পাবলিক স্টেজের সঙ্গে তাঁর কখনো আত্মীয়তা ঘটে নি। কিন্তু বহিরঙ্গ অভিজ্ঞতা ছাড়াও তিনি সমাজবাস্তবতার নানা স্তরের মর্মভেদে সমর্থ ছিলেন—যে-কোনো বড় লেখককে তা হতে হয়। মঞ্চের নায়িকার ভূমিকা-বিপর্যয়, লম্পট ধনীর পেট্রনেজের স্বরূপ, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে-যাওয়া রমণীর থিয়েটারে আশ্রয় গ্রহণ, অভিনেত্রীর রক্ষিতা জীবন, দর্শকের রুচি প্রসঙ্গ বিশিষ্ট কাহিনীর সূত্র ধরে এলেও প্রতিনিধি স্থানীয়।

রবীন্দ্রনাথের এ গল্পে তিরস্কার আছে। তার সবটাই গোপীনাথের উচ্ছৃঙ্খল লাম্পট্যকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গল্পটি গোপীনাথের নয়, তার স্ত্রী গিরিবালার। লেখকের ক্যামেরা ঘুরে ঘুরে শীলেদের তেতলা বাড়ির ছাদ, শোবার ঘর, গৃহবধূ

গিরির রূপযৌবনে নিবদ্ধ হয়েছে, তারপরে তার হৃদয় তথা চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করেছে। সেখানে ব্যঙ্গ নেই। নায়িকাকে ঘিরে ভাষা যৌবন-সৌন্দর্যে ও বাসনায় মদবিহ্বল হয়ে উঠেছে। ভাবের মতো ভাষাও ফেনিল—

> মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িল যায়, নবযৌবন এবং নবীনসৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে—তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুর নিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্রভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই বর্ণনা অবশ্য ছবি হয়ে উঠেছে, আর রবীন্দ্র-গল্পে শব্দে-গড়া নানা ছবিই আমরা দেখে থাকি। স্থির বা গতিশীল, কোথাও তা চলমান দূর থেকে গেছে, কাছ থেকে দূরে, কাল থেকে কালান্তরে। যেমন, 'নিশীথে'। কখনো দুই বিপরীত দৃশ্য যার পটবদল ঘটে মুহুর্মুহু। যেমন, 'কঙ্কাল'-এ। ধ্বনিময় চিত্র বাক্যহীন স্তব্ধতা ফোটাবার জন্য এসেছে 'মহামায়া'য়। এ-ছবি আরেক ধরণের। স্থির নয়, চলমানও নয়। আসলে এই নারীর প্রতিকৃতি ফ্রেমের সীমা ভেঙে 'চঞ্চল' 'তরল' 'উদ্দাম' 'উচ্ছৃঙ্খল' হয়ে উঠেছে। পটের সমতলে একে আটকে রাখা যাচ্ছে না। 'মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া' পড়ে যায়, গিরিবালার যৌবন যেমন তার 'সর্বাঙ্গে…ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে' তেমনই এই ছবি শাসন-সংযমের রাশ ছিঁড়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। এই ছবিই গিরিবালার চরিত্র। একটি বহির্মুখিতা, অস্থির চাঞ্চল্য, নৈষ্কর্ম্যের উদ্দামতা, আপনাকে ব্যক্ত করার অন্যকে আকর্ষণ করার ব্যগ্রতা তার 'বাহুর বিক্ষেপে' 'গ্রীবার ভঙ্গীতে' এবং আরও বেশি করে 'নূপুর নিক্কণে' 'তরল হাস্যে' 'ক্ষিপ্র ভাষায়' 'উজ্জ্বল কটাক্ষে' ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ছবি উদ্ধার করা যাক, যা ঠিক এই বর্ণনার সর্বোত্তম সহযোগী।—

> আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে ; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দ দন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—

দৈনন্দিন চুল-বাঁধা নয়, বিশেষ কারণেও তার এই প্রসাধন নয়। 'অসময়ে' শব্দটি লক্ষ্য করার—এবং ব্যাপারটা যে অকারণ তা সহজে বোধগম্য। এর উৎস তার স্বভাবের ভেতরে। যে ছবিটা সে নিজেকে নিয়ে এভাবে তৈরি করল তাকে এককথায় বলা যায় 'সেক্সি'। 'দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া' বাক্যাংশের ইঙ্গিত ভুল হবার নয়।

গিরিবালার রূপের বর্ণনা গল্পের গোড়ার দিকে তিন অনুচ্ছেদ জুড়ে আছে। শব্দসংখ্যা তিনশ সাত। বেশ বিস্তৃত বলতে হবে। সচরাচর এমন থাকে না। একটা অকারণ চাঞ্চল্য,—বাস্তবে যা নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ দেহভঙ্গিতে তাতে ক্রিয়ার বিভ্রম সৃষ্টি। সুন্দরী যুবতীর এই জাতীয় কাজকেই সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা শৃঙ্গারের অনুভাব বলতেন। বঙ্কিমচন্দ্রে শব্দ-নৈপুণ্যই মতিবিবির রূপকে 'ভোলাপশাস' করে তুলেছিল। রচনারীতির পার্থক্য সত্ত্বেও এখানে তার সাদৃশ্য আছে। আরও সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজের গল্প 'কঙ্কালে'র নায়িকার সঙ্গে। কঙ্কালের সেই রূপসী এবং গিরিবালা যে-সব দিক থেকে তুলনীয় এবং অ-তুলনীয়ও বটে তা সূত্রাকারে বিশ্লেষিত হচ্ছে—

১. দুজনেই অসামান্য রূপসী, সে রূপে যৌবনের মদ-বিহ্বলতা। কিন্তু গিরিবালা সেক্সি, অপরা সেনশুয়াস।

২. রূপ সম্বন্ধে এরা অতি সচেতন। কঙ্কালের নায়িকা আত্মরূপ মুগ্ধও। আপন সৌন্দর্যসম্ভোগে তার নার্সিসাস-বৃত্তি। জটিল আত্মিক ব্যাধিতে ঐ রূপ তার অস্তিত্বের মূলে ক্ষয় ধরিয়েছিল। গিরিবালা অনেকটা সাংসারিক; তার মন সহজ পথের; যদিও দাসীর সাহচর্য ও স্তুতির ধরণে কিছুটা স্থূলতা, কচিৎ মানসবিকারের (মনস্তত্ত্ববিদেরা যাকে লেসবিয়ান-ইজম বলেন) আভাস।

৩. রূপের শক্তি বিশ্বজয়ের—পুরুষকে পদানত করবার—এই বোধ এদের তীব্র; পুরুষ ক্ষণকালের জন্য জীবনে এসেছে এবং মিলিয়ে গিয়েছে—দুজনেরই। গিরিবালার ক্ষেত্রে ঐ পুরুষ তার স্বামী, তার বাস্তব দৈনন্দিন সংসর্গে—বিরূপতায় সে পীড়িত। একদিক থেকে দেখলে তাই তার সংগ্রাম বঞ্চিতা গৃহবধূর মুক্তির সংগ্রাম। কঙ্কালের রূপসী যে-পুরুষকে পেয়েছিল সে অনেকখানি তার নিজের কল্পনা দিয়ে তৈরি। তার মুক্তি সেই ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন বিসর্জনে বা আত্মহত্যায়।

আসলে কামোদ্দীপক রূপযৌবন সত্ত্বেও গিরিবালা পারিবারিক-সামাজিক, এবং যখন সংসারত্যাগী তখনও থিয়েটারী দুনিয়ায় প্রান্তিক সমাজে আশ্রয় নিয়েছিল। ওই তার মুক্তি। ভেবে-চিন্তেই লেখক তার নাম দিয়েছেন গিরিবালা। যদিও বাঙালির পরমপ্রিয় পর্বতকন্যার প্রসঙ্গ উপমাচ্ছলেও তোলেন নি, কারুণ্য সঞ্চারের কিছু চেষ্টা করেন নি। ঐ নামের কোমল অনুষঙ্গও গিরিবালার মূল ধাতুতে নেই। গল্পে-ঘটা পরিণাম ছিল তার স্বভাবেই। শুধুই স্বামীর অত্যাচারের ফল নয় তার অভিনেত্রী জীবনে প্রবেশ। সে-জন্যই যে সমাজ-সমীক্ষার নিদর্শন নয়—'কি ভাবে গৃহবধূ বেশ্যা-অভিনেত্রী[১] হয়ে ওঠে'। তার মন আর তার জট-পাকানো জীবন, ব্যক্তি-চিত্তের কুটিলতা আর সামাজিক টানা-পরেন মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক। তার প্রতি মমতায় দ্রব হবার সুযোগ রাখেন না। কিন্তু পাঠককে সে বিষণ্ণ করে, বহু দর্শকের উল্লাসধ্বনির সম্বর্ধনায় তার রূপের পুজো—এই মূঢ় অহংকারেও। সে নরম শান্ত ভালো মেয়ে নয়, কল্যাণী গৃহবধূ নয়। কিন্তু তবু সে 'গিরিবালা', বাঙালি ঘরের মেয়ে, যার যূপের দুটি কাঠ তৈরি করেছে নিজের স্বভাব আর স্বামী-সমাজ মিলে। কঙ্কালের নায়িকার কোনো নামই নেই, সে বঞ্চিতা বিধবা হলেও তা গল্পের দূর পটভূমি। অনামা সেই রূপসী তার তীক্ষ্ণবোধে, মৌনপ্রায় আত্মসমাহিত নির্জনতায় একটা ঝুলন্ত করোটি—অস্থির দিকে আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে—সেখানে জীবন প্রশ্রয় পায় না, সে গিরিবালা নয়।

এ গল্পের প্রধান দুর্বলতা দৃষ্টিকোণ বদলে যাওয়ায়, ঘটনায় চমৎকারিত্ব আনার জন্যই অভিনেত্রী গিরিবালাকে হঠাৎ হাজির করতে লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গল্পে দেখার জানলাটার পরিবর্তন ঘটালেন। দীর্ঘ প্রথম পরিচ্ছেদ পড়ি গিরিবালার দৃষ্টিতে। অনেক ছোট দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গোপীনাথের চোখে পাঠককে চোখ রাখতে হয়। সে দেখায় বিস্ময় ক্রোধ অপমানিতের লাঞ্ছনা—এসব থাকলেও আমাদের কিছু যায় আসে না। সেটা কাহিনীর বাইরের মহল। গিরিবালার মন কোথায় গেল ?

১. সমকালে এই বিশেষ শব্দটিই ব্যবহৃত হত।

রবীন্দ্রসংগীতের রূপান্তর

মীনাক্ষী মিত্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ও পরিমার্জন নিজেই ঘটিয়েছেন। গানের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন ও পরিমার্জনা (একই গানের ভিন্ন পাঠ) অবশ্যম্ভাবীরূপেই এসেছে।

কবির এহেন রূপান্তর (কবিতা থেকে গান এবং গান থেকে কবিতা) সম্বন্ধে বেশ কিছু বলার আছে। গানের পাঠান্তরে নতুন গান যেমন পাওয়া যায় তেমনি অনেক কবিতা রূপান্তরিত হয়ে গান-রূপ লাভ করেছে, অন্যদিকে আগে গান হিসেবে সৃষ্টি হয়ে পরে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কবিতা হয়ে উঠেছে—এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। গীতিকবিতা একই কালে গান ও কবিতার গুণসম্পন্ন—দেশান্তরে ও যুগান্তরে 'লিরিক' নামে এর পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এর যেন বিশেষ সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় কারণ তাঁর গদ্য, পদ্য সব রচনাতেই প্রায় এই লিরিকের গুণ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে বর্তমান। 'লিপিকা'তে সুরসংযোগ অনায়াসেই সম্ভব—এমন ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। আমরা জানি, কবিতার ছন্দকে বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় সুর দিতে চেষ্টা করে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার মধ্যে বিশেষ কোন ভেদকে স্বীকার করতেন না। তাঁর হৃদয়ভাব উন্মোচনে কবিতা ও সংগীত ছিল যুগ্মবাহন। এই রূপান্তরের মধ্যে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ যুগপৎ গান ও কবিতা, দ্বিতীয়তঃ, কবিতা থেকে গানে রূপান্তর, তৃতীয়তঃ গান থেকে কবিতায় রূপান্তর। দুএকটি গানের বিশদ আলোচনা করে প্রতিটি শ্রেণীকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপান্তরের প্রথম শ্রেণীতে (যুগপৎ কবিতা গান) যে গানগুলিকে ফেলা হয়েছে, কবিতা হিসাবে তাদের জন্ম আগে, না গান হিসাবে তাদের সৃষ্টি আগে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলবার পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ রচনারই দুই রূপের সৃষ্টি কাছাকাছি সময়ে বা একইকালে, যেমন 'খাঁচার পাখি ছিল' (সোনার তরী'র 'দুই পাখী' কবিতা) রচনাটির সময়

১২৯৯ সালের ১৭শে আষাঢ়। ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণে এটি 'নরনারী' শিরোনামে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসেই ঐ পত্রিকাতেই এই কবিতার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে প্রথম রচনাকাল, কবিতা হিসাবে পত্রিকায় প্রকাশ, এবং সুরসংযোজনার কালের মধ্যে ব্যবধান খুবই অল্প। এই কারণেই এগুলিকে যুগপৎ কবিতা ও গান বলে ধরা যেতে পারে। 'আমি নিশি নিশি কত' (বিরহ, কড়ি ও কোমল) কবিতার রচনাকাল শ্রাবণ, ১২৯৩। ১২৯৩ (ভাদ্র-আশ্বিন) সালের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় এর গানরূপ পাওয়া যায়। (স্বরলিপি গীতিমালা ১৩০৪)। 'বন্ধু কিসের তরে' ('হতভাগ্যের গান' কল্পনা) কবিতার রচনাকাল ১৩০৪ সালের ৭ই আশ্বিন। পরিবর্ধিত একটি রূপ পাওয়া যায় ১৩০৫ সালের ৭ই আষাঢ়। ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসে 'ভারতী'তে এর গানরূপের উল্লেখ আছে (হতভাগ্যের গান। বিভাস—একতালা)। 'এবার চলিনু তবে' (বিদায়। বিভাস। কল্পনা) কবিতার জন্মলগ্ন ৭ই আশ্বিন ১৩০৪। 'গান' বিভাস শিরোনামে এর সংগীত রূপ পাওয়া যায় ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসে 'প্রদীপ' পত্রিকায়। এই শ্রেণীর রচনাগুলির কবিতা ও গানরূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর নেই।

রূপান্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত (কবিতা গানে পরিণত/রূপান্তরিত) গানগুলি কবিতা হিসাবে আগে রচিত, সাধারণত: বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে এর গীত-রূপটি পাওয়া যায়। যেমন ক্ষণিকার 'কৃষ্ণকলি' কবিতার রচনা ৪ঠা আষাঢ়, ১৩০৭। এটি গানে ('কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি') পরিণত হয়েছে দীর্ঘদিন পরে ১৩৩৮ সালে। কবিতায় ও গানের মধ্যে পাঠভেদ কিছু নেই। এ ধরণের রূপান্তরে অন্যান্য কিছু রচনায় আবার দুই রূপের মধ্যে যথেষ্ট পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষণিকার অবিনয় কবিতার প্রথম রচনাকাল ১লা আষাঢ়, ১৩০৭। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন যে কবিতাটি সুরারোপিত হয় ১৩৪০ সালে। এই 'হে নিরুপমা' গানটি চারস্তবক সমন্বিত। কিন্তু 'অবিনয়' কবিতায় স্তবক ছিল পাঁচটি। স্তবকবিন্যাসে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কবিতার তৃতীয় স্তবকটি গানে প্রথম স্তবক হয়েছে:

'হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা

('গী. বি ২৮৬।।৩১)

মনে হয় গান বলেই যেন গানের প্রসঙ্গটিকে এখানে আগে এনেছেন। কবিতার দ্বিতীয় স্তবক গানে শেষ স্তবকে পরিণত। কবিতার স্তবকে আছে :

'হে নিরুপমা
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ ;
করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে
মারিছে উঁকি।
বাতাস করিছে দুরন্তপনা
ঘরেতে ঢুকি।'

এ জায়গায় গানে কিছু পাঠের বদল ঘটেছে—

'হ নিরুপমা'
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে॥'

কবিতার দ্বিতীয় স্তবককে গানের শেষে আনলেন বলে বক্তব্যকে যেন একটু পরিবর্তিত করতে হল। কবিতার মাঝখানে যা বলা হয়েছিল তা দিয়ে যেন গানের শেষ করা যায় না। বক্তব্যকে আরও যেন কিছুটা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়েছে, গানের পাঠের উপযুক্ত কিছু কথারও আমদানি করতে হয়েছে।

যেসকল রচনা কবিতা হিসাবেই বিশিষ্ট, অথচ তার সবটায় বা অংশে বা তার রূপান্তরে সুরসংযোজনার ফলে গান বলে স্বীকৃত, সেগুলিও এই শ্রেণীতে ধরা হয়েছে। যেমন চিত্রা কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতা 'উর্বশী' (প্রথম রচনা ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২) আটস্তবক বিশিষ্ট। ১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণে এই কবিতার কিছু অংশে সুর দেওয়া হয় শাপমোচন উপলক্ষে। গানে স্তবক মাত্র দুটি।

প্রথম স্তবক অবিকৃত, কবিতার চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকের অংশ মিলিয়ে গানের শেষ স্তবকটি তৈরী। পূরবী কাব্য গ্রন্থের 'আন্‌মনা' (প্রথম রচনা ১৮ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতায় দুটি স্তবক। এ কবিতায় সুরসংযোজিত হয় ১৩৩৮ সালে শাপমোচন উপলক্ষে। গানে কিছু ছত্র বাদ পড়েছে। কবিতার প্রথম স্তবকটি গানে পুরোপুরি গৃহীত, দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম ছত্র কয়েকটি বাদ পড়েছে।

সুরসংযোগের সহায়তাকল্পে যে শব্দগত পরিবর্তন ঘটে তা সাধারণতঃ তৎসম শব্দের তদ্ভব রূপান্তর এবং যুক্তবর্ণের সরলীকরণ। কিন্তু কিছু গানে তার উল্টো পদ্ধতিও দেখা যায়। যেমন উপরে উদ্ধৃত আন্‌মনা কবিতায় আছে :

আন্‌মনা গো আন্‌মনা
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনবনা।

গানে 'মালা' কে করেছেন মাল্য :

'আনমনা, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনবনা। (গীবি ৩০৪ ॥ ৮০)

কবিতাটির মধ্যে অনেক যুক্তস্বর ও তৎসম শব্দ আছে। রবীন্দ্রনাথ গানে সেগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে, একটি মাত্র সরল শব্দকেও সংস্কৃত করেছেন। স্বরবর্ণের অর্থাৎ স্বরের আশ্রয়ে সুরবিহারের সুবিধে থাকে এটা সাধারণভাবে সত্য হলেও বিশেষ গানের, বিশেষ ছন্দের বা সুর—তালের প্রয়োজনে তথাকথিত যুক্তাক্ষরের বা রুদ্ধদলেরও যে উপযোগিতা আছে, সেকথাই এখানে আরও বেশী করে প্রমাণিত হয়েছে। এরকম আরও কিছু গানের উল্লেখ করা যায় : ওগো বধূ সুন্দরী—গী বি ৫০৫ ॥ ১২১ নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়—ঐ ৪৪৭ ॥ ৫৫ মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি—ঐ ৫.০ ॥ ২০৬ নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র প্রভৃতি—ঐ ৫৭৮ ॥ ৭৯

গানের উপযোগী শব্দ বদল এবং নতুন শব্দের আবির্তাব—এই প্রসঙ্গে পূরবী কাব্যের দীর্ঘ কবিতা 'পঁচিশে বৈশাখ' (প্রথম রচনা ২৫শে বৈশাখ ১৩২৯) এবং তার রূপান্তরে 'হে নূতন' (গী.বি ৮৬৮ ॥ ১৭) গানটির কথা বলা চলে। এই কবিতা ও গানের রূপান্তরে (সুরারোপ ২৩ বৈশাখ ১৩৪৮) কিছু শব্দের পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো :

কবিতায়—'তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন'

গানে—'তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন'

কবিতায়—'ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়'

গানে—'ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়'

'কুজ্ঝটিকা', 'অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়' প্রভৃতি শব্দ গদ্যাত্মক—এই কারণে সুর তাতে বাধা পেত বলে মনে হয় এই পরিবর্তন। কুজ্ঝটিকা ও কুহেলিকা, অনন্ত ও অসীম প্রায় সমার্থক শব্দ, কিন্তু গানে দ্বিতীয় শব্দগুলির প্রয়োগ যেন বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

মানসী কাব্যগ্রন্থের 'তবু' কবিতার প্রথম রচনাকাল ১২৯৪ সালে ১৫ই অগ্রহায়ণ (ইংরাজী ১৮৮৭ খ্রীঃ)। এটি গানে রূপান্তরিত হয়েছে বেশ কিছু সময় পরে (১২৯৯ সালের চৈত্রমাসে (১৮৯৩ খ্রীঃ)। এর স্বরলিপি ভারতীতে প্রকাশিত হয়। দুটি রূপ পরপর উদ্ধৃত করলে রূপান্তরটি স্পষ্ট হবে :

তবু : মানসী

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

তবু মনে রেখো, যদি বড় কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি—
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদ ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা।

তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

গীতবিতান ৩৩০ ॥ ১৫১

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে :
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি
তবু মনে রেখো॥
যদি জল আসে আঁখি পাতে
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদপ্রাতে—
তবু মনে রেখো॥
যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে
তবু মনে রেখো॥

বৈচিত্র্যপিয়াসী রবীন্দ্রনাথের রচনার সমসাময়িক মানসিকতার প্রভাব প্রায় লক্ষ্য করা যায়। কালপ্রভাবে সেই কবির মনোভাবনার (Poetic mood) পরিবর্তনও ঘটেছে বারে বারে, রচনাতেও তার ছাপ পড়েছে যথারীতি।

'তবু' কবিতাটি মানসী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। কালানুক্রমে মানসীর কবিতাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মে থেকে ১৮৯০ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মানসীর কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। মোটামুটি এক এক ঝোঁকে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা লেখা হয়ে যায়, তারপর কবিতা লেখার বিরতি। এইভাবে চার ঝোঁকে মানসীর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। 'তবু' কবিতা মানসী কবিতাবলীর প্রথম পর্যায়ভুক্ত।

মানসীর কবিতাবলীর পর্যায়গত পার্থক্য কেবল কালগত দূরত্বের জন্য নয়, একঝোঁকে কবিমনের এক একটি বিশেষ মানসিকতা ঐসব কবিতাগুচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে। নবজাতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে'। মানসী ঋতুর প্রথম দফার কবিতার মধ্যে

'কড়ি ও কোমলে'র দেহাশ্রিত প্রেমের প্রতি সহজ অবসাদবোধ অথচ তারই প্রতি এক অনিবার্য মমতাবোধের দোলাচল বৃত্তিতে কবিমন অকারণ বেদনাবোধে উদাসীন। এই কবিতায় কবি একদিক থেকে অনুভব করছেন কড়ি ও কোমলের যে প্রেমবোধ তার থেকে বিদায় নেবার সময় এসেছে, অথচ সেই জীবন্ত প্রেমচেতনার মধ্যে কবির অবস্থান কি একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে? সেই 'পুরাতন প্রেম' কি একান্তই নিরর্থক?

কড়ি ও কোমলের প্রেমচেতনা নিরুপাধি প্রেয়সীর মূর্তিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে এই 'তবু' কবিতায়। দেহাশ্রিত প্রেমের জন্য আক্ষেপ এই কবিতায় অনেকটা রক্তমাংসের ব্যক্তিগত উত্তাপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয়। এই ব্যক্তিগত প্রেমের স্পর্শ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কড়ি ও কোমল থেকে কিছুদিন পর্যন্ত অনুভব করা গেলেও রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা নৈর্ব্যক্তিক। তাঁর কাব্যে প্রেমের সর্বজনীন, সর্বকালীন রূপকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

রূপান্তরিত গানের পাঠের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কবিতার ঐ জীবন্ত আক্ষেপ উদ্বেলতার তীব্রতা সেখানে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বের ব্যক্তিগত অনুভবের উত্তাপ আকৃতি পিছনে সরে গেছে, এগিয়ে এসেছে কাব্যের রূপসুষমা। এই গানটির সৃষ্টিকালে কাব্যজগতে সোনার-তরী রচনার ঋতু চলমান। রবীন্দ্র কবিভাবনা তখন আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত, অসীমাভিসারী। সোনার তরী রবীন্দ্র-রচনায় নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-পিপাসার এক স্বর্ণযুগ। এছাড়া রূপগঠনগত সৌন্দর্যের প্রতি কবি চিরকালই সচেতন। শব্দ প্রয়োগ ও রূপকল্পের দিক দিয়ে কড়ি ও কোমলের প্রথমার্ধে লিখিত 'তবু' কবিতাটি ছিল অনেকখানি নিরলংকার। সুশৃঙ্খল রূপসুষমা (ধ্বনির ঝংকার, ছন্দের সুসংগঠন, শব্দাবলীর লালিত্য) গঠনের চেষ্টা সে রচনাতে ছিল প্রচ্ছন্ন। কবিতার পাঠে যা সহজ, সরল খুঁটিনাটি প্রত্যক্ষভাষণের সহজ আবেদনে ব্যক্ত, পরবর্তী গানের পাঠে তা আরও সুষমা-মণ্ডিত, ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। কবিতার details গানে কমেছে স্বাভাবিক ভাবেই।

'তবু মনে রেখো—যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস-বিষাদ-ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,

অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে,

অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা

এই একই বক্তব্য গানের পাঠে আরও সুন্দর ও গভীর ব্যঞ্জনাময় :

যদি জল আসে আঁখি পাতে,

একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,

একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদপ্রাতে—

তবু মনে রেখো ॥

বাণীর পরিবর্তনে, বলবার কৌশলে গানের পাঠের আবেদন আরও সার্থক ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে বলা যায়।

পূরবী কাব্যগ্রন্থের 'বদল' কবিতাটির প্রথম রচনাকাল ১৩৩১ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখে। আধার পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে জানা যায় যে এটি গানে রূপান্তরিত হয় ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। দুই রচনার বিষয় এক হলেও কাঠামো, প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে। এই দুইয়ের রূপান্তর লক্ষ্য করার মতো :

বদল : পূরবী

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি,

আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল।

শুধালেম তারে, যদি এ বদল করি

হার হবে কার বল্।'

হাসি কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী,

'এসো-না, বদল করি।

দিয়ে মোর হার লব ফলভার

অশ্রুর রসে ভরা।'

চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার—

নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,

করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে। হাসি

আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগন দেশে;
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।'

গীতবিতান ৩৬৭॥ ২৪৫

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা॥
সহসা আসিল, কহিল সে সুন্দরী 'এসো-না বদল করি'।
মুখপানে তার চাহিলাম, মরি মরি, নিদয়া সে মনোহরা॥
সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা, চাহিল সকৌতুকে।
আমি লয়ে তার নবফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' যেতে যেতে কয় হেসে, দূরে চলে গেল ত্বরা।
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা॥

পাশাপাশি দুটি পাঠ রেখে দেখা যায় যে গানের তুলনায় কবিতা বর্ণনার দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবিতায় রয়েছে ধারাবাহিক কাহিনীর অনুষঙ্গ, গানে তা বেশ কিছুটা সংকুচিত। কবিতার বিভিন্ন সংলাপ ও বর্ণনা গানে বর্জিত হয়েছে, কোন অংশ সংক্ষেপিত ও রূপান্তরিত। যেমন কবিতার প্রথম অংশে নায়কের প্রস্তাব শোনা যায়:

শুধালেম তারে, 'যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।'

গানে এ প্রস্তাব অনুপস্থিত বলা চলে। কবিতার শেষাংশে যে একটি তাপদগ্ধ দিনের চিত্র অঙ্কিত—তার বর্ণনা গানে পাওয়া যায় না। গানের পাঠ ...শিত হওয়ার বলা চলে যে সেখানে আভাসের আধিক্য দেখা দিয়েছে। ...ঙ্গিতের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, কারণ গান প্রধানতঃ বাণীপ্রধান

বর্ণনাময় হবে না, তাকে সংকেতময় হতে হবে। তাই স্বাভাবিক কারণেই কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা গানে বর্জিত। গানে আকস্মিকতা অনেকক্ষেত্রে যেমন এ গানে বেশি। নায়কের প্রস্তাব ব্যতিরেকেই নায়িকা প্রস্তাব এনেছে :

'সহসা আসিল, কহিল সে সুন্দরী 'এসো-না বদল করি'।

এই 'সহসা' শব্দটির মধ্যেই একটি আকস্মিকতা, একটি নাটকীয়তা ধ্বনিত।

রবীন্দ্রকাব্যে যে বিচিত্ররূপিণীর সাক্ষাৎ বহুভাবে পাওয়া গিয়েছে, এ দুই রচনার 'নিদয়া সে মনোহরা' যেন তারই অন্যতমা। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী'র কথা মনে আসে। 'বদল' কবিতার নায়িকা গীতরূপের নায়িকা অপেক্ষা যেন অনেক বেশি প্রগলভ, কৌতুকময়ী, বিচিত্ররূপিণী। মনোহারিত্বের তুলনায় নিষ্ঠুরতা তার কোন অংশে কম নয়। গানের নায়িকা অনেক বেশি স্নিগ্ধ শুধু নয়, সে বেদনাবিধুরাও বটে। কৌতুকের মাধ্যমে হলেও সে সুচিন্তিতভাবে বেদনার ভার গ্রহণে সম্মত। কবিতায় কিন্তু এই সম্মতি বা অভিপ্রায় যেন এসেছে খানিকটা লীলাচ্ছলে—তাই সেক্ষেত্রে সে অধিক কৌতুকময়ী। গানের নায়িকার মতো ততটা নিদয়া নয়।

দুটি রচনার নায়ককেই 'মায়ার খেলা'র নায়কের সঙ্গে তুলনা করা চলে। জীবনোল্লাসের দিকেই এদের অধিক আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য পরিণামে এ চরিত্র হৃদয়কে স্পর্শ করে। এরকম অনেক গানের কথাই বলা যায়, কিন্তু বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় তাই কয়েকটির শুধুমাত্র উল্লেখ করেই এখানে থামতে হচ্ছে :

কড়ি ও কোমলের 'আমি ধরা দিয়েছি গো' (হৃদয় আসন) কবিতার ১-৮ ছত্র গানে পরিণত হয়েছে। গান রচনা ('এ শুধু অলস মায়া') সম্পূর্ণ কবিতাটি গানে গৃহীত। মানসীর 'কে আমারে যেন' (ভুলে) কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক রূপান্তরিত গানে নেই। 'সোনার তরী'র 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ' (হৃদয়-যমুনা) দ্বিতীয় স্তবক বাদে গানে গৃহীত। চিত্রার 'কেন নিভে গেল বাতি' (দুরাকাঙ্ক্ষা) পুরোপুরি গানে রূপান্তরিত। চৈতালি কাব্যের 'তুমি পড়িতেছ হেসে' দ্বিতীয় স্তবক বাদে গানে পরিণত। কল্পনা কাব্যের 'ওই আসে ওই অতি' (বর্ষামঙ্গল—১৭ বৈশাখ, ১৩০৪) গানে রূপান্তরিত (পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক বর্জিত)। সুরারোপ শেষবর্ষণ গীতাভিনয় উপলক্ষে (১৩২৩)। 'সে আসি

কহিল প্রিয়ে' (স্পর্ধা) সম্পূর্ণ কবিতা গানে গৃহীত। ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'নীলনবঘনে' (আষাঢ় ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) গানে পরিণত (যথাক্রমে কবিতার ১, ৩, ২, ৪ স্তবক গানে গৃহীত)। 'হৃদয় আমার' (নববর্ষা—২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) কবিতার ১, ৬, ৮ স্তবক গানে পরিণত। 'যাবই আমি যাবই' (বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী) পরিবর্তন পূর্বক যথাক্রমে কবিতার ২, ৪, ৩, ৫ স্তবক গানে গৃহীত শিশু কাব্যের 'তোমার কটিতটের ধটি' (৫ শ্রাবণ, ১৩১০, খেলা) কবিতার ১, ২, ৪ স্তবক (২টি স্তবক বাদ) গানে গৃহীত। সুরারোপ গীতোৎসব (১৩৩৮) উপলক্ষে। বলাকা কাব্যের 'তুমি কি কেবলই ছবি' (৩ কার্তিক, ১৩২১) দীর্ঘ কবিতাটির সূচনার ৯ ও শেষ স্তবকের ১০ ছত্র গানে গৃহীত। সুরারোপ শাপমোচন (১৩৩৮) উপলক্ষে। মহুয়া কাব্যের বেশ কিছু সম্পূর্ণ কবিতায় ('বাহির পথে বিবাগী হিয়া,' 'প্রাঙ্গণে মোর,' 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা,' 'আমার নয়ন তব নয়নের') সুরারোপ হয়েছে ১৩৪০ সালের ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে। কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল ১৩৩৪-৩৫ সালের যে কোন মাসে।

রূপান্তরের তৃতীয় শ্রেণীতে (গান কবিতায় পরিণত / রূপান্তরিত) যে গানগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি গান হিসেবেই আগে রচিত, পরে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কবিতায় পরিণত হয়ে কাব্যগ্রন্থে স্থান করে নিয়েছে। রচনাগুলি যে প্রথমে গান হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল তার পক্ষে পাণ্ডুলিপি, সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রভৃতি প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'একি সত্য সকলই সত্য' রচনাটির কথা এখানে বলা যেতে পারে। মজুমদার পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথের একটি খসড়া খাতা। এতে 'একি সত্য সকলই সত্য' রচনাটি পাওয়া যায়, রচনা তারিখও কবির হাতে লিখিত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এর 'রবীন্দ্রজীবনে গীত রচনার একটি অজ্ঞাতযুগ' প্রবন্ধে (শারদীয়া দেশ ১৩৭৮) একথা উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীকানাই সামন্ত তাঁর 'কবিপ্রতিভা' গ্রন্থের শেষে উপরিউক্ত পাণ্ডুলিপি-ধৃত গানের তালিকা দিয়েছেন। খসড়া খাতাতে ঐ গানের যে রূপটি পাওয়া যায় তা গীতবিতানে প্রকাশিত গানের পাঠের সঙ্গে অভিন্ন এবং গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা ঐ গানের যে স্বরলিপি চিত্র মুদ্রিত আছে তার সঙ্গেও কোন অমিল নেই। এই সকল প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে গান হিসাবেই এ রচনা

প্রথম ১৩ই আশ্বিন ১৩০৪ এ রচিত হয়। পরে কল্পনার 'প্রণয় প্রশ্ন' কবিতাটি এই গানেরই রূপান্তরিত পাঠ। এইরকম বেশ কিছু গান পরে কবিতারূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে নতুন চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ করে সানাই কাব্যগ্রন্থে এই ধরণের দৃষ্টান্ত খুব বেশী। 'যদি হায় জীবন পূরণ' গানের (প্রথম রচনা আধার পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী: ১৪-২২ মার্চ, ১৯৩৯) পরিবর্তিত কবিতারূপ (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) উদ্‌বৃত্ত নামে সানাই কাব্যে স্থান পেয়েছে। দুটি রূপকে চোখের সামনে রাখলে প্রথমে দুটিকে একেবারে পৃথক রচনা মনে হয়:

গীতবিতান ৩৬২ ॥ ২২৮

যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে জানে—
চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
ভাবনার প্রাঙ্গণে ॥
বৈশাখের শীর্ণ নদী ভরা স্রোতের দান না পায় যদি
তবু সংকুচিত তীরে তীরে
ক্ষীণধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,
পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি ॥
মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যতটুকু পাই রয় উচ্ছ্বেলিতে।
দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত
যত্নে ধরে রাখি,
সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন ॥

উদ্‌বৃত্ত : সানাই

তব দক্ষিণ হাতের পরশ
করনি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলোছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন।

বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রমাদ না দিল যদি.
শুধু কুন্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসী মন।
যতটুকু পাই ভীরুবাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।

সানাই কাব্যগ্রন্থের 'উদ্‌বৃত্ত' কবিতার প্রথম স্তবকে আছে দৃঢ় বঞ্চনার কথা, তারপর উপমা দ্বারা সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

'তব দক্ষিণ হাতের পরশ
করনি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলোছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে অলিপন।'

'তব দক্ষিণ হাতের পরশ' বলতে যাঁরই কথা কবি এখানে বলতে চান, তাঁর সেই দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত। কবি তাঁর জীবনের সেই পরিচালককে যেন উদ্দেশ্য করে বলছেন যে 'তোমার এই দেওয়া-না-দেওয়াটা আমার জীবনের ভাবনার প্রাঙ্গণে যেন আলোছায়ার আসা যাওয়ার মতো'—অর্থাৎ ব্যাপারটি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। দ্বিতীয় স্তবকে উপমা দিয়ে সুরু—বঞ্চনার উপলব্ধি আবার শেষে এসেছে। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে যেন একটাই তত্ত্ব ছড়িয়ে আছে। দুটি স্তবক একই বক্তব্যের প্রকাশ—যার সূচনায় ও শেষে বিষয়, মাঝখানে বিষয়ী। কবিতার পরিশেষে (৩য় স্তবকে) নৈরাশ্য থেকে সান্ত্বনার সন্ধান—যে নৈরাশ্য প্রথম স্তবকের এবং দ্বিতীয় স্তবকের শেষে।

গানের পাঠটি 'হায়' (নৈরাশ্যসূচক), 'যদি' (অবলম্বনশীল) অব্যয় দিয়ে

আরম্ভ হলেও বেদনাবোধের প্রাবল্য যেন কিছুটা কম। নৈরাশ্য, অপূর্ণতাবোধ বা বেদনা কবিতায় গানের পাঠের তুলনায় যেন একটু বেশি সোচ্চার।

'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে জানে—

গানের সূচনায় বেদনাবোধ সত্ত্বেও সেই বেদনা নিশ্চয়াত্মক প্রতীতিতে পরিণত—'মন তবু জানে জানে'। এই পলাতক পরশখানি যা দেয় তাই যেন 'পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি'। অকৃপণকরের পরশে জীবনের পূর্ণতা না ঘটলেও যতটুকু পেয়েছি তাতেই ধন্য হয়েছি—এই মনোভাব অন্য একটি গানের ছত্রকে স্মরণে আনে :

'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' (গী. বি ২৩৪ ॥ ৫৭৫) শেষ চরণে বলা হয়েছে যে দুই হাতের অঞ্জলি পেতে যেটুকু লাভ হয়েছে সেটিকেই ভাগ্য বলে মেনে নিতে হয়। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সেই পূর্ণতা অর্জনের প্রত্যাশা যেন কবিতা অপেক্ষা গানে কিছুটা বেশি।

কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক জুড়ে যে তত্ত্বটি ছড়ানো, গানে যেন তাই সংহত রূপে প্রকাশিত। কবিতার 'বৈশাখে কৃশ নদী' অপেক্ষা গানে 'বৈশাখে শীর্ণ নদী' কথাটি যেন অনেক নিকট সম্পর্কের শব্দ। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের শেষাংশটি অনেক বেশি কাব্যোৎকর্ষপূর্ণ বলা যায় :

'শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারায়
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসী মন।'

তবে গানের এই অংশ যেন কিছুটা মানবিক, হৃদয়ের কাছের ব্যাপার।

'তবু সংকুচিত তীরে তীরে
ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,
পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি ॥

বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গির বিচারের দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় কবিতার বক্তব্য যেন বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে উচ্চস্তরের দিকে। অন্যদিকে গানের বক্তব্য যেন অনেকটা মানবিক হয়ে উঠেছে।

'ধূসর জীবনের গোধূলিতে' গানটি দুটি রূপ গীতবিতানে পাওয়া যায়, সানাই কাব্যগ্রন্থের 'নতুন রঙ' কবিতাটি এই দুটি গানরূপেরই পরবর্তী কাব্যরূপ :

গীতবিতান ৩৬৫ ॥ ২৩৬

(আধার পাণ্ডুলিপি অনুসারে রচনা ১০৩৯ সালের ১৪ থেকে ২২ মার্চ -এর মধ্যে যে কোনদিন)

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি
সেই সুরের কায়া মোর সাধের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী,
তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বলে ॥
দেখি তার বিরহী মূর্তি বেহাগের তানে
সকরুণ নত নয়ানে।
পূর্ণিমা জ্যোৎস্নালোকে মিলে যায়
জাগ্রত কোকিল-কাকলিতে, মোর বাঁশির গীতে ॥

গীতবিতান ৩৭৪ ॥ ২৫৬

(আধার পাণ্ডুলিপি অনুসারে রচনা ১৯৩৯ এ ২২ থেকে ২৮ মার্চ এর মধ্যে)

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি।
বসন্তের ফুলের পরাগে যেই রঙ জাগে,
ঘুম-ভাঙা পিককলিতে সেই রঙ লাগে,
যেই রঙ পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্লসপ্তমীর তিথি ॥
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে,
সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝর কল্লোলে,
দক্ষিণ সমীরণে ভাসে, পূর্ণিমাজ্যোৎস্নায় হাসে
সে আমারি স্বপ্নের অতিথি ॥

সানাই : নতুন রঙ (রচনা ১৩ জানুয়ারী, ১৯৪০)

এ ধূসর জীবনের গোধূলি
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,

মুছে আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জন গীতি।
ফাগুনের চম্পকরাগে
সেই রঙ জাগে,
ঘুম ভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রঙ লাগে,
সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি।
এই ছবি ভৈরবী-আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি।

১৯৩৯ সালের ১৪ থেকে ২২শে মার্চ এর মধ্যে লেখা 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি' গানটি এবং ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪০'এ লেখা সানাই অন্তর্গত 'নতুন রঙ' কবিতার পাঠটি তুলনা করে পড়লে কবিজীবনের শেষপর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ কি এক বিস্ময়কর শিল্পকৌশলের অধিকারী হয়েছিলেন তা অনুভব করা যায়। এক একটি রচনাকে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে কি অপূর্বভাবে নতুন করে তুলতেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই দুই পাঠের মাঝামাঝি আর একটি পাঠের কথা উল্লেখ করতে হয় সেটি গীতবিতানের অন্যতম পাঠ।

এই রচনাত্রয় জীবনের শেষ পর্বে রচিত—জীবনের অস্তদিগন্তে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর বার্ধক্যজয়ী শিল্পীমনের এক অলৌকিক কাল্পনিক ভাবনার কথা বর্ণনা করেছেন। জীবনের একদা রঙীন প্রাঙ্গণ ধূসর হয়ে এসেছে। কবি দীর্ঘ-জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন—কিন্তু স্তিমিত ইন্দ্রিয়চেতনায় ক্ষীণ হয়ে আসা স্মৃতিচিত্রগুলিকে চিরকালের মতো আজও কবি তাঁর অপরাজিত কল্পনায় তুলির অভিনব স্পর্শে উজ্জ্বল করে তুলতে সমর্থ। শিল্পীমনের অতৃপ্তির প্রেরণায়,

তাঁর পরিণত কল্পনাশক্তির ইসারায় সেই বিবর্ণ স্মৃতি পটটিতে নতুন রঙ লাগিয়ে চলেছেন—হয়তো এ পুরোনো কাঠামোর আধারে নতুন ছবি গড়ে উঠল কারণ স্মৃতিচিত্র দীর্ঘদিন পরে অটুট থাকা সম্ভব নয়।

তিনটি ভিন্ন পাঠের মধ্যে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে গান হিসেবে প্রথমে রচিত পাঠটির কাব্যসম্পদ খুবই উচ্চাঙ্গের। কবিতার তুলনায় এ পাঠে transferred epithet অলংকারের বাহুল্য ঘটেছে—যেমন ধূসর জীবন, ক্লান্ত আলো ইত্যাদি। 'নতুন রঙ' কবিতার প্রথম দুই স্তবকের ভাব সংহত হয়েছে গানের প্রথম তিনছত্রে :

'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি।
সেই সুরের কথা মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী
তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে॥' (গী. বি ৩৬৫ ॥ ২৩৬)

এই ভাবনাই কবিতাতে দুই স্তবক মিলিয়ে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ কবিতায় প্রথম স্তবকের ভাবনার প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় স্তবকে প্রবাহিত। প্রতি স্তবকের শেষে শেষ চরণের অন্ত্যানুপ্রাস যেন গানের ধূয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।

গানের যে দ্বিতীয় পাঠ পাওয়া যায় তা কবিতার নিকটবর্তী। কবিতায় এ বর্ণনাই অনেক বাস্তবমূর্তি পেয়েছে। গানের এই পাঠের অন্ত্যানুপ্রাসগুলিকে কবি তাঁর পরবর্তী কবিতার পাঠে প্রায় যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। গানের প্রথম পাঠে যে সুর নিরালম্ব, নিরুপাধি, অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, তা দ্বিতীয় পাঠে স্পষ্টতর। প্রথম পাঠে 'সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি……' গানের দ্বিতীয় পাঠে সে গান আর কারও নয়, ব্যক্তিস্বাক্ষর মুদ্রাঙ্কিত মোর গীতি। গানের প্রথম পাঠের সংহত পাঠ দ্বিতীয় পাঠের মাধ্যমে কবিতায় হয়ে উঠেছে অনেক বেশি স্পষ্ট ও বস্তুনির্ভর।

শব্দসমাবেশের অবর্ণনীয় মাধুরী কবির অলৌকিক শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করে। 'গুঞ্জনগীতি' কথাটির সৌন্দর্য এ প্রসঙ্গে মনে আসে। কতকগুলি image যেমন সুন্দর তেমনি গভীর আভাসময়। যেমন 'সেই রঙপিয়ালের ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি' বা 'যেই রঙ পিয়াল ছায়ায় ঢালে শুক্ল সপ্তমীর তিথি', 'বুকের লালিম রঙে রাঙানো'—এ যেন বার্ধক্যজয়ী কবির বহু অভিজ্ঞতাপূর্ণ প্রেমের মৃদুকোমল 'লালিম রঙ'।

এছাড়া নানা গান পাওয়া যায় যেগুলি প্রথমে গান হিসেবে লিখিত হয়ে পরে কবিতায় রূপান্তরিত। 'জানি তোমার অজানা' (১৬ চৈত্র ১৩৩২), 'অনেকদিনের আমার যে গান' (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ পূর্ব), 'আরো একটু বোসো তুমি' (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ পূর্ব), 'কাহার গলায় পরাবি গানের' (২৯ মাঘ ১৩৩৪) প্রভৃতি গানগুলি পরে মহুয়া কাব্যে যথাক্রমে উদ্‌ঘাত (২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫), পুরাতন (পৌষ ১৩৩৫), গুপ্তধন (১৪ কার্তিক ১৩৩৫), নিবেদন (২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫) প্রভৃতি নামে নতুন রূপে স্থান করে নিয়েছে।

সানাই কাব্যগ্রন্থের দেওয়ানেওয়া (পরিবর্তিত কবিতা-রূপ ১০ জানুয়ারী ১৯৪০), আহ্বান (১০ জানুয়ারী ১৯৪০), কৃপণা (জানুয়ারী '৪০), প্রভৃতি কবিতাগুলির গান-রূপ ছিল যথাক্রমে 'বাদল দিনের প্রথম' (৩০ জুলাই, ১৯৩৯), 'এসো গো জেলে দিয়ে যাও' (১ আগষ্ট ১৯৩৯), 'এসেছিনু দ্বারে তব' (আধার পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩৯)।

গুরুদেব, শৈলদা এবং আমাদের ২৫শে বৈশাখ

তেরশো আশির শেষপ্রান্তে বসে আমি আজ স্মরণ করছি তেরশো চল্লিশ দশকের ২৫শে বৈশাখের দিনগুলিকে—। যে দিনগুলি আমার কেটেছে অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমায়; শৈলদার দেশ এবং আমারও দেশ ছিল। প্রতি বছর এই দিনটিতে আমার সকলের আগে মনে পড়ে আমাদের শৈলদাকে, (এখানকার শৈলজাদা) তারপর মনে পড়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে। নীতিগতভাবে হয়তো গুরুদেবকেই আগে স্মরণ হওয়ার কথা। কিন্তু আমার জীবনের একটা দুর্ভাগ্য যে, গুরুদেবকে আমি কখনো দেখি নি চোখের সামনে। তিনি আমার ধ্যানের বস্তু। আর সেই ধ্যানের মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছি শৈলদার কাছে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন আমার বয়স ১৫-১৬ হবে। ইংরাজী ১৯৩৪-৩৫ সাল হবে। প্রতি বছর যখন চৈত্র মাসের "যাই যাই"— তখন থেকে আমাদের নেত্রকোণার ছোট্ট প্রাচীন শহরে ২৫শে বৈশাখের প্রস্তুতির সাড়া পড়ে যেতো। কবে শৈলদা আসছেন সবার চোখে সেই জিজ্ঞাসা। শৈলদা থাকতেন উকিল পাড়ায়। ১লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করেই শৈলদা চলে আসতেন নিজের জন্মস্থান নেত্রকোণায়। আমরা তখন সব পাড়ার মানুষ এক হয়ে যেতাম শৈলদার ডাকে। চলতো ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠানের পাঠ বিতরণ ও রিহার্সেল। রিহার্সেল হতো স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে—রোজ ছুটির পর।

তখনকার দিনে আমাদের অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ আজকার মত সবার মনে স্থান পান নি। আমি ছিলাম অতি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা গান বাজনা খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু বাইরে গিয়ে অথবা বাড়ীতে মাষ্টার রেখে এখনকার মত মেয়েদের গান শেখার চল বড় একটা ছিল না। বাবা ও মায়ের কাছেই আমার গান শেখা আরম্ভ হয়েছিল। রোজ সকাল সন্ধ্যায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাবার প্রেরণায় গলা সাধা চলতো। ক্রমে

গান-জানা মেয়ে বলে পরিচিত পরিজনদের কাছে আমার বেশ নাম হয়েছিল, এখন মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারি—সংগীত শাস্ত্রের কিছুই জানা হয় নি।

রবীন্দ্রসংগীত আমাদের বাড়ীতে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। লুকিয়ে শিখতে হতো রবীন্দ্রনাথের গান। আমার বাবা রবিবাবুর (রবীন্দ্রনাথের) গান শুনলে রেগে যেতেন। বলতেন "কাঁদুনে গান"। যারা রবীন্দ্র-সংগীত গাইতেন তাদের বলা হতো "রবিঠাকুরের চেলা"—। আর রবীন্দ্রজয়ন্তীর নামে অনেকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। এ হেন স্থান, কাল পাত্র নিয়ে ছিল শৈলদার কাজ।

আমার বাবা শৈলদাকে খুব স্নেহ করতেন। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গান গাইবার জন্য আমার ডাক পড়তো প্রায় প্রতিবছরেই। কিন্তু যেবার শৈলদা কোন কারণে নেত্রকোণা যেতে পারতেন না, সে বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে আমাকে অংশ নিতে বাবা অনুমতি দিতেন না। বাবা বলতেন "শৈলজার কথা আলাদা, ওঁর ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের উপর কোন কথা চলেনা।" মোট কথা, আমার বাবা ছিলেন শৈলদার গানে মুগ্ধ। সে গান কোন্ গান, কার গান এই প্রশ্ন বাবার মনে আসতো না।

আমাদের ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠান হতো বেশীর ভাগই স্থানীয় "দত্ত হাইস্কুলে"। প্রায় প্রতি বৎসর সেদিন যথারীতি কালবৈশাখীর ঝড় উঠতো সন্ধ্যাবেলায়, নয়তো নামতো মুষলধারে বৃষ্টি। স্কুলঘরের টিনের চালে রাজসমারোহে কান-ফাটা শব্দে প্রকৃতিদেবী বর্ষার কবির আবাহন বাদ্য বাজাতেন। আমরা ছেলেমেয়েরা পূজারীর সাজে শৈলদার মুখের দিকে তাকিয়ে, পত্রপুষ্পে, ধূপগন্ধে সজ্জিত গুরুদেবের প্রতিকৃতির তলায় বসে থাকতাম। কখন বৃষ্টি থামবে, আর আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে পারবে।

আমাদের সময়ে গানের দলের মেয়েদের পোষাক ছিল—গেরুয়া ছোপানো লালপেড়ে শাড়ী আর লাল শালু কাপড়ের তৈরী ব্লাউজ। ব্লাউজের ডান হাতের উপরে রবীন্দ্র-টাইপে লেখা "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" কথাটা সাদা সূতোয় সেলাই করে লেখা থাকতো। এলোচুলের খোঁপায় পত্রপুষ্পে গুজে, চন্দনে ছোপানো বেলফুলে আঁকা টিপ কপালে। আমরা বরণডালা নিয়ে গুরুদেবকে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করতাম একজন একজন করে। শৈলদার সেদিন অন্যরূপ দেখতাম। এক জ্যোতির্ময় মূর্তি, শ্বেতশুভ্র সাজে বিস্ময়-স্তব্ধ নিবেদিত প্রাণ শৈলদা সর্বাগ্রে

গুরুদেবকে মাল্যভূষিত করে পূজারীর ভক্তি-অর্ঘ্য ঢেলে দিতেন। তারপর আমরা একে একে তাঁকে অনুসরণ করতাম।

ছেলেদের সাজ ছিল কাঁধে রুপালী রাংতা বসানো পাড়ে আর আঁচলে ঝলমল গেরুয়া চাদর। সাদা ধুতি পরণে আর কপালে সেই চন্দনের ছাপ। বেদ গান "যদেবি প্রস্ফুরন্নিব—" দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতো। আমাদের মনে একটা পুজা পুজা ভাব হতো সেদিন। সেদিনের শৈলদার কণ্ঠ ছিল উদাত্ত, ভাব মাধুর্যে ভরপুর। আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইতেন। সেদিনের সেই আনন্দের স্মৃতি আজও মনে নবীনতার ছোঁয়া দিয়ে যায়।

আজকাল শুনতে পাই শৈলদা নাকি গান গাইতেন না—শুধু এস্রাজ বাজাতেন। কথাটায় মনে ব্যথা লাগে। বরং বলা যায়—এস্রাজের ঝঙ্কারের সঙ্গে শৈলদার গানের সুর এক হয়ে যেতো; সেই দুই সুরের দ্বৈত ঝঙ্কার আমরা শুনেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শৈলদা এস্রাজ বাজিয়ে আমাদের গান শুনিয়েছেন। শান্তিনিকেতন থেকে দেশে গেলে প্রথম দেখা হতেই বলতেন—"এবার গুরুদেব অকৃপণ হাতে ডালা ভ'রে দিয়েছেন।" সেই গানের ডালা আমাদের কাছে ঢেলে দিয়েই ছিল তাঁর তৃপ্তি। জানিনা কণ্ঠ মাধুর্যে, এবং রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ উত্তরস্মৃরি আজকাল কজন আছেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে অনুষ্ঠান-সূচীর বৈচিত্র্যের দিকে শৈলদার খুব লক্ষ্য ছিল। একক সংগীত, দ্বৈত সংগীত, সম্মিলিত সংগীত, গানে গ্রন্থনায় বর্ষামঙ্গল, ঋতুমঙ্গল আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য—ইত্যাদি সবই অনুষ্ঠান সূচীতে স্থান পেত। শৈলদা একবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে গাইবার জন্য আমাকে "যৌবন সরসী নীরে" এই গানটা শিখিয়েছিলেন, আমিও খুব যত্ন করে গানটা শিখেছিলাম। কিন্তু ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে শৈলদা আমাকে গানটার উচ্চগ্রামের লাইনগুলি দাগ দিয়ে বললেন যে ঐ লাইনগুলি আমাকে গাইতে হবে না—, বললেন, ঐ লাইনগুলি তিনি নিজে গাইবেন। আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম—তবে কি ঐখানটায় আমার সুর ভুল হচ্ছে? কিন্তু আমি তো ঠিক তাঁর মত করেই গাইতে চেষ্টা করেছি। যাই হোক শৈলদার নির্দেশ-মতই গান হলো—, গান খুব ভাল হলো। পরে জানতে পেরেছিলাম—যে

ওটার নাম "ডুয়েট গান"। সেদিন সত্য চৌধুরী (আমার ভাই) গেয়েছিল—"জাগো হে রুদ্র জাগো" আর তার সঙ্গে ছিল রমলা গুহের রুদ্র নাচ। অপূর্ব।

আর একবার শৈলদা আমাকে "কাঁদালে তুমি মোরে" গানটা একক গাইতে দিয়েছিলেন। ২৫শে বৈশাখ এলো। আমরা অনেকেই গান গাইলাম। বিমল চৌধুরী গেয়েছিলেন—"যদি জীবন পূরণ নাই হলো—" আমি গাইলাম—"কাঁদালে তুমি মোরে—।" শৈলদা ও তাঁর মামা সুরেশ মজুমদার —এঁরা দু'জনে আমার দুপাশে এস্রাজ বাজালেন। গান ভাল হলো—শৈলদা খুশীর হাসিতে তা জানালেন। অনুষ্ঠান শেষ হলো।

কিন্তু কদিন পর তীব্র সমালোচনা বের হলো "ভাস্কর" নামে তখনকার এক সাপ্তাহিক কাগজে। ময়মনসিংহ থেকে বোধহয় কাগজটা বের হতো। গানের লাইন তুলে তুলে তীব্র সমালোচনা। "ভালবাসার ঘায়ে—" "তোমার অভি-সারে—"—"দিবে না তবু ছেড়ে—" ইত্যাদি কথা একটি কুমারী মেয়ের মুখে নিতান্ত অশোভন এবং অশ্লীল। রবীন্দ্র জয়ন্তীর উদ্যোক্তা শৈলজাবাবুর রুচিকেও প্রশংসা করা যায় না ইত্যাদি। শৈলদা কাগজটা এনে আমাকে পড়তে দিলেন। আমি লজ্জা বোধ করলাম। তখন ছিল জীবনের নিতান্ত সরলতা ও নির্ভরতার বয়স। শৈলদা আমার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিলেন।

পূর্ব বাংলার ঐরূপ জনমানবের কাছে, যেখানে পরাজয় এবং বিদ্রূপই ছিল প্রধান প্রাপ্য, যেখানে যশ ও সুনাম ছিল বাড়তি পাওনা, সেখানে বীরোচিত মন নিয়ে, সাধকের মতে শৈলদা কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে চলেছিলেন। সেখানকার মানুষের মনে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের ভাব-মূর্তিকে। আজ মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কলমে বুঝি শৈলদারই মনের কথাটা—"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে।"

কয়েক বছর আরও কেটে গেল। শৈলদার আশা আর এক ধাপ এগিয়েছে। এবার রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য আর গীতিনাট্য উপহার দিলেন তিনি নেত্রকোণার মানুষকে। প্রথমে করালেন 'চিত্রাঙ্গদা'—নমিতা রায় ১১।১২ বছরের একটি মেয়ে—চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় দর্শকদের সম্মোহিত করেছিল। তারপর হলো 'পরিশোধ' (শ্যামা) মুকুল সেন শ্যামার ভূমিকায়—মুকুল বর্ধন বজ্রসেনের ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করেছিল। আমাকে দিয়ে গড়ালেন এদের গয়না। নিজের

হাতে পেষ্টবোর্ড কেটে, নানা ডিজাইনে অঙ্গাভরণ, রাংতা আর পুঁতির সোনালি, রূপালি আভায় ঝলমল। নিজের হাতে শৈলদা সাজাতেন। একাধারে দৃশ্যসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, প্রযোজনা, নির্দেশনা সব কিছুই শৈলদা। যন্ত্রের সুর বেধে দেওয়া সবি আমরা বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছি আজও কাণে শুনতে পাই শৈলদার কণ্ঠে—"রাজার আদেশ ভাই চোর ধরা চাই—'। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী অভিনয় দেখতে দেখতে অধীর আগ্রহে ভেবেছে—"What comes next" ?

এরপর এলো "চণ্ডালিকা।' মুকুল বর্ধনকে সাজালেন প্রকৃতি—আমাকে মায়া। বাদলাকে দইওয়ালা ও চুরিওয়ালার ভূমিকায় আর একজনকে। বাদলাকেই পরে আনন্দের ভূমিকায় দেখালেন। চণ্ডালিকায় মায়ের ভূমিকা আমার কাছে কিছুটা অস্বস্তিকর লেগেছিল। কিন্তু শৈলদার ইচ্ছার বাইরে তো যাওয়া যায় না। আমাকে সাজিয়েছিলেন, শ্রদ্ধেয় করুণাকেতন সেনের স্ত্রী মিসেস সুধা সেন। শ্রীযুক্ত সেন ছিলেন তখন নেত্রকোনা মহকুমার এস. ডি. ও. এঁদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কাজে কর্মে।

এর পরের ধাপে শৈলদার ভীষণ দুঃসাহসিকতা ও একগুয়েমীর পরিচয় পাই। সেবার ২৫শে বৈশাখে শৈলদা ঠিক করলেন আমাদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-নাট্য অরূপরতন (রাজা) করাবেন। নাটকের বিষয়বস্তু সব বোঝালেন আমাদের। সুদর্শনা সুরঙ্গমার ভাবমূর্তি ব্যাখ্যা করলেন। আসল রাজা, নকল রাজা ঠাকুরদা—সবার পরিচয় ব্যাখ্যা করলেন। এক কথায়—এই রূপক নাট্যের উচ্চ-ব্যাখ্যা আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিলেন। নাটকটি আমাদের কাছে ভাল লাগলো, আমরা সবাই খুসী হলাম। শৈলদা প্রথমে আমাদের গানগুলি শেখাতে আরম্ভ করলেন। প্রস্তাবনায়—"চোখ ওদের ছুটে চলে গো—" গানটা শেখালেন। তা ছাড়া সবাইকেই শেখালেন,—"আজি দখিন দুয়ার খোলা—" "আমরা সবাই রাজা" "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে—" ইত্যাদি ঠাকুর্দার ভূমিকার জন্য শেখালেন—"আমার জীর্ণ পাতায় যাবার বেলায়—" সুদর্শনার ভূমিকার জন্য শেখালেন—"খোল খোল দ্বার", "প্রভু বল বল কবে" "আমি যখন ছিলেম অন্ধ", "আমার—অভিমানের বদলে আজ—" ইত্যাদি। আমাদের প্রস্তুতি অনেকটা এগিয়ে গেল। আমাদের সময় মাইকের

চল ছিল না এখনকার মত। কাজেই অভিনয়ে অকৃত্রিম কণ্ঠদান অপরিহার্য্য ছিল। ভারি বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা উচ্চকণ্ঠে পাঠ মুখস্থ করতাম।

পুরো নাটকের রিহার্সেল শুরু হবে। শৈলদা বললেন, পুরুষের ভূমিকায় ছেলেরা পাঠ করবে—মেয়েরা আর পুরুষ সাজবে না। পাঠ বিতরন শুরু হলো। সুদর্শনা, মুকুল বর্ধন—সুরঙ্গমা, বিমল চৌধুরী ঠাকুর্দা, বাদলা নকল রাজা, আর আসল রাজা হবেন চিত্তরবাবু অথবা তারুমামা। সব কিছুই প্রায় সবাই মেনে নিল। কিন্তু গোল বাধলো রাজার পাঠ নিয়ে। নেত্রকোণার মত গেঁয়ো শহরে ছেলে-মেয়ের ডায়লগ কল্পনাতীত। কিন্তু শৈলদা অটল। সকলে বিপদ গুণলো। শৈলদার গোঁয়ার্তুমির কিছু কিছু সমালোচনাও হলো। কিন্তু শৈলদার যুক্তির মূল কথা ছিল "শান্তিনিকেতনের মত করে অনুষ্ঠান করার আমার নিজের দেশে—এ আমার অধিকার" একনিষ্ঠ গোঁয়ার শৈলদার পক্ষে কেউ গেল না। আমিও আপত্তি জানালাম রাজার ভূমিকায় ছেলেদের অংশ গ্রহণে। লোক নিন্দাকে আমরা বড় ভয় করতাম। বাদলার দিদি মিনুকে রাজার পাঠ দিতে আমি শৈলদাকে অনুরোধ করলাম। শৈলদা খুবই মর্মাহত হলেন। তাঁর শান্ত সৌম্য মূর্তি গাম্ভীর্যের পাথরে পরিণত হলো। সেই সঙ্গে আমাদের আনন্দ উচ্ছলতাও নিবে গেল। শৈলদাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস করো নেই। আমরা ঠিক করে নিলাম—অরূপরতন আর হবে না।

বেশ কয়দিন কেটে গেল। একদিন একজন সাহস করে "অরূপরতন" হবে কিনা শৈলদাকে জিজ্ঞেস করলো। কারণ আমরা সবাই তো অর্দ্ধপ্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। এ সময় এরূপ আকস্মিক ছেদ পড়ায় আমরা একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম। শৈলদা রায় দিলেন সবাই চাইলে হবে। রিহার্সেল শুরু হয়ে গেল। রাজার পাঠ কাউকে দেওয়া হলো না। শৈলদা রিহার্সেলের সময় ঐখানটা শুধু একবার পড়ে যেতেন পরের ভূমিকায় এগোবার জন্য। আর সকলেই—যার যার পাঠ রিহার্সেল দিতে লাগলো। ২৫শে বৈশাখ কবিবন্দনা ও কয়েকটি নির্বাচিত গান ও আবৃত্তি দিয়ে শুধু তারিখ-পালন করা হলো। প্রকৃত অনুষ্ঠানের দিন কিছু পিছিয়ে দেওয়া হলো।

অনুষ্ঠানের আগের দিন ষ্টেজ ও ড্রেস রিহার্সেলের জন্য আমরা সদলবলে স্থানীয় আঞ্জুমান হাই স্কুলে সন্ধ্যাবেলা মিলিত হ'লাম। শৈলদা হল ঘরের

শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে সবার কণ্ঠ সেখানে পৌঁছে কিনা পরীক্ষা করিতে লাগলেন এবং সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখনও আমরা কেউ জানিনা যে, রাজার পাঠটা কে করবে। শৈলদা নাকি একদিন কাকে বলেছিলেন যে, রাজা ছাড়াই "অরূপরতন" হবে। আমরা একটা ধাঁধাঁর মধ্যে রয়ে গেলাম। ষ্টেজ রিহার্সেলের দিনও শৈলদাই রাজার পাঠ পড়ে গেলেন। পরদিন অনুষ্ঠান। শৈলদা একসময় আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন যে রাজা অহঙ্কারী সুদর্শনাকে তো দর্শন দিচ্ছেন না, সুদর্শনা শুধু রাজার কণ্ঠস্বরই শুনতে পাবে— আর শৈলদা নিজেই সেই নেপথ্য পাঠে—রাজার কণ্ঠ দেবেন। সুদর্শনার সাজে সজ্জিতা হয়ে সেদিনকার সেই অপূর্ব অনুভূতি আজও আমি অনুভব করি। মনে আছে—সেই অন্ধকারের দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে আমি আপন সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কি এক অপূর্ব অনুভূতিতে সে দিনের সুদর্শনা চোখের জলে ভেসেছিল। অভিনয় শেষে শৈলদার একনিষ্ঠতা, জেদ এবং সর্বোপরি তাঁর একক ক্ষমতা দেখে সবাই নির্বাক বিস্ময়ে পরাজয়ের জয়ে গর্ববোধ করেছিল। আজকার এই লেখা শুধুই স্মৃতিচারণ।—ভুলে যাওয়া আধো-মনে-পড়া সম্পদ তো আরও পেয়েছি—শৈলদার কাছে। সে সব বলা তো সম্ভব নয়। শৈলদার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু আছে কিনা আমি জানি না। এই সর্বত্যাগী মানুষটির জীবনবোধ গুরুদেবের জীবনসত্তায় এক হ'য়ে মিশে আছে। আর শৈলদার কাছে যা পেয়েছি যা নিয়েছি—তুলনা তার নাই।

প্রমীলা দত্ত (চৌধুরী)

স্বতন্ত্রভূমিতে চারজন কবি: কিছু অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ

বিজয় দেব

[এক]

কবিতার স্বরূপ নির্ধারণে মৃত্যুর একযুগ পূর্বে একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন—কবিতা কবির অবিলম্ব দুঃখকে সহৃদয় পাঠকের পরীক্ষা ও আলোচনার বিষয়ীভূত করে তুলবে। বস্তুতঃ সেই অভিপ্রায়ই সর্বসমক্ষে কবিসত্তার একধরণের উন্মোচন। একদা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি হার্ডি বেদনার মুহূর্তে রচনা করেছিলেন বিয়োগান্তক কবিতা। এমন কি এক গভীর সংকট কালে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতা অস্তিত্ব এবং জীবনের দেবত্বকে ভাবাবেশে সঞ্চারিত করে। হাইনরিখ জিমার গুরুত্ব আরোপ করেন: "We think of egos, individuals, lives, not of life."

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিশের দশকের কবিগণ একান্ত স্বাধীন চেতনা বহন করে সৃষ্টিপর্বে মগ্ন হলেন। সুরু হলো নিজস্ব কণ্ঠস্বরের ব্যাপক অনুসন্ধান। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধারার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রবণতাও অনুভব করলেন। তখন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে নব্যরীতির পন্থা আবিষ্কারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। অবশ্য স্বাতন্ত্র্যের শিরোপায় ভূষিত হয়ে পুনরায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বেই প্রত্যাবর্তন শেষ করলেন সেই কবিগণ। কবি অমিয় চক্রবর্ত্তী মন্তব্য করেছেন: "এ হলো পারম্পর্যের সৃষ্টিতত্ত্ব"; তিনি সেখানে শিল্পে ও সাহিত্যে বিশ্ব-প্রপঞ্চের প্রতি স্থির দৃষ্টি স্থাপন করে কাব্য রচনায় উদ্যোগী হতে কবিগণকে আহ্বান করেছেন। চল্লিশ দশকেই কবি সমর সেন সবাইকে চমকিত করে কাব্যরচনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি ক্রটী-স্বীকার পত্রে অবশ্য উল্লেখ করেছেন: "সে সব দিনগুলোতে কাব্য বস্তুতঃ বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের অংশরূপে চিহ্নিত ছিলো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের অন্তর্গত জ্ঞানের শর্তও সেখানে গভীরভাবে নিহিত।

যেমন আব্দুল করিম খাঁ, যামিনী রায়, বাক্, বিটোফেন, মার্ক্স, লেনিন এমন কি ফ্রয়েড, শেলী রবীন্দ্রনাথও পর্যাপ্ত নয়। ইংরেজ লেখকগোষ্ঠীও যথেষ্ট নয়।"

মহাযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায় কিছু সংখ্যক কবিকে দায়িত্ব সচেতন করে। অবশ্য স্বাভাবিকভাবে মহাযুদ্ধ প্রায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। তখন শব্দমূল বা ধাতু-সংক্রান্ত দিক থেকে এক অনাবিষ্কৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বৈকি! একজন কবি বা গল্পলেখকের উপর অর্পিত কর্ম—অভিজ্ঞতার সান্নিধ্যলাভের অনতিবিলম্বে শব্দগত বা অভিধানগত পরিভাষার ঘনিষ্টতা অধিকার করা। যদিও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এই সব কাব্যচর্চায় প্রাক-স্বাধীনতা সময়ের ঝোঁকও লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত: তা হলে কি এইসব কবিদের রচনায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি?

অমিয় চক্রবর্তী এক তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কেত দান করেছেন: "আধুনিক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মান আশ্চর্য ভাবে ভারসাম্য বহন করে চলেছে। তার একমাত্র কারণ হলো তাঁর কবিপ্রতিভা পূর্ণ কাব্যিক দায়িত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুগকে গ্রহণ করেছে।"

আধুনিক কবিতা প্রকৃতি এবং মানুষের সংকল্প বা অভিলাষের সঙ্গে সাময়িক যোগসূত্র রচনা করে। সেই পর্যায়ে ঐক্য বা একত্বের জ্ঞান শিল্পীর কাছে নতুন দায়িত্ব অর্পণ করে। যুদ্ধ ও সভ্যতার মহাপ্লাবন এবং একটি যুগের অবিরাম ট্র্যাজেডিও কবিদের সচেতন ক'রে সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে। রবার্ট লিণ্ড বলেছেন: "কাব্য এক দ্বৈত উৎসমুখ থেকে প্রবাহিত। যেমন উপযোগবাদী জনক এবং সৌন্দর্যচেতনাময়ী জননী থেকেই কাব্যের উদ্ভব ঘটে। কবি অমিয় চক্রবর্তী উপযোগবাদী জনক সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। অনিবার্য-ভাবে তিনি নন্দনতত্ত্বের জননীর আবশ্যিক কর্তব্য ও বিশুদ্ধতায় আঘাতও করেন। তখন তিনি সামাজিক দায়িত্বের বা বিশ্বাসের নিকট সমর্পিত।

মার্ক্সবাদে অনুপ্রাণিত কবি বিষ্ণু দে নিওমেটাফিজিক্যাল কবি হপ্‌কিন্সকে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজনে। তিনি সেখানে মায়াকভস্কির মতো সামাজিক এবং আত্মিক সংকটের প্রয়োগকরণের দায়িত্বও সমর্থন করেন, একটি কবিতার অন্তরালে যা অবিরাম সক্রিয় তা হলো:

১. ব্যক্তির আংশিক অস্তিত্বের ওপর এক গোষ্ঠীভুক্ত কর্মের বিন্যাস স্থাপিত হয়। ২. সমগ্র কবিতায় বিচ্ছিন্ন সংলাপ ঐকতানিক যাদুমন্ত্রের সম্পূর্ণতা দান করে। ৩. কবি এখানে মুক্ত কণ্ঠে 'ভাবপ্রবণতা বিমুক্ত'কে অভিযুক্ত করেন এবং সংবেদনশীলতা ও সমন্বয়ে যোগসূত্র নিয়ে রচনায় উদ্যোগী হন।

এই সব নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কখনো কখনো জনসাধারণের জন্য একান্ত ভাবে সমর্পিত কাব্য থেকে কবিগণ দ্রুত প্রস্থান করেন নির্বাচিত সমষ্টির কাছে। এই গোষ্ঠীভুক্ত কবিগণ "গোঁড়া বলে চিহ্নিত নয়" মন্তব্য কোন এক প্রতিষ্ঠিত কবির। এই যুগের কবিদের প্রবণতা হলো জনগণের কাব্যকে পরিহার করে আইভরি টাওয়ারের দিকে নিজেদের গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট করা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, অরুণ ভট্টাচার্য এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যরীতি বিশেষ ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত। অলোকরঞ্জনের কবিতায় নিত্য প্রবাহিত সুরমূর্ছনায় এক মরমীয়ার অন্বেষণ। শব্দ ভেঙেচুরে তিনি নির্মাণ করেন এক শিল্প-সৌধ। শব্দের আভিধানিক মুক্তিদানে কবি একান্তভাবে মগ্ন। অরুণ ভট্টাচার্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের রাগে বাঁধা পর্দা নিয়ে শব্দগত রাজ্যে প্রবেশ করেন। একদা এই জগৎ তাঁকে ঘনিষ্ঠ করে রাখতো, ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে দিগন্তের তমালকুঞ্জ থেকে বাঁশীর সুর যেন অনুসন্ধানের পর্বকে নির্দিষ্ট করে। শঙ্খ ঘোষের সহজ রীতি কখনো দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতা বলে চিহ্নিত। তাঁর কাব্যের পটভূমিকায় বিরাজমান ম্যাকবেথ অদ্ভুত মানুষের অবস্থা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। তিনি প্রত্যাশা করেন পাঠক যেন উদ্বুদ্ধ হয় তাঁর কাব্যের অতলে তাঁকে আবিষ্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা চটকদার, বুঝিবা ছন্দের সুষমায় সজ্জিত কখনো সমতাহীন। অথচ মহনীয় অনিশ্চিতের উপাদান সংগ্রহ করে কবি ইঙ্গিতময় করে তোলেন—যেমন তিস্তা, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, চালসা, সামসিঙ। এদের প্রতিধ্বনি স্বভাবতঃ এক অনুপ্রাশজাত জগৎ সৃষ্টি করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাব্যকে কয়েকটি অংশে বিভাজিত করেছেন—কেমন—ক. প্রতিদ্বন্দ্বী দুদল খেলোয়াড় দ্বিধাবিভক্ত। খ. করাতের সাহায্যে দিবারাত্র খণ্ডিত। গ. সমগ্র বিশ্বজগৎ একটি ফুটবল মাত্র।

আধুনিক বাংলা কাব্যে সম্প্রতি ব্যক্তিগত সম্ভাবনার প্রকাশকে ত্বরান্বিত

করে। কবি আবেগ বা অর্থের সাহয্যে গ্রহণ করেন না বরং কবিতার অন্বেষণে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখেন। কখনো সৌন্দর্যের মধ্যে সত্য উপলব্ধিই একদা কীটসের তত্ত্বকে প্রসাধিত করে। চল্লিশের দশকের কবিগণের সম্মুখে অবস্থিত সংকট তাঁদের সচেতন করে। সেই সময় স্রষ্টা তাঁর গ্রাহক সম্বন্ধেও দায়িত্ব অনুভব করেন। পঞ্চাশের দশকে কাব্যের গুরুত্ব প্রসঙ্গে প্রধান ভূমিকা গ্রাহক তথা পাঠকের। পরবর্তী পর্যায়ে ষাটের দশকে স্রষ্টা তখন স্বাধিকার সচেতন।

জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-যুগপরবর্তী বাংলা কবিতা এক মরুভূমি সদৃশ প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত ঐতিহ্যের অনুশীলন শুদ্ধ। এমন কি ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নেই, বরং করুণভাবে উপেক্ষিত। এখন স্বাভাবিক ভাবে অনুকরণপ্রিয়তা কবিদের উত্তেজিত করে। বিদেশী সভ্যতার মান এবং সমৃদ্ধির প্রলোভন কবিদের নতুন করে অনুপ্রাণিত করে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত কবিগণ অন্তর্ভুক্ত। এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বীটনিক বা হাংরি জেনারেশনের সুর লক্ষ্য করেছিলেন। এই পর্যায়ে সমগ্র কাব্যজগতে কোন ব্যক্তিগত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি বরং বলা যেতে পারে, সামগ্রিক প্রচেষ্টা বাংলা কাব্যকে ব্যথিত করেছে। কবিতা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত নয়। এটি অনাস্থা থেকে শক্তির প্রয়াস মাত্র। এবং অতি আধুনিক কবিমন স্বাতন্ত্র্যবোধে নিজেদের পরিচিত করতেও উৎসাহ অনুভব করেন নি, অথচ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তীব্র দীপ্তিতে কবি অনায়াসে এক রূপকথা, বিশ্ব নির্মাণ করতে সমর্থ হন। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবানন্দ দাশ অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগণ।

পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী কবিগণ অনুক্ষণ সমাজ বা সমসাময়িক সমস্যা বা জৈবিক প্রশ্নকে হৃদয়ে বরণ করে কাব্যরচনায় তন্ময় হয়েছেন। সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের আদি যে প্রশ্ন তা যেন অনুপস্থিতই থেকে যায়। আমি কে? এই স্বরূপ উন্মোচনের সাধনা ও পরিলক্ষিত হয় নি। সুতরাং উপলব্ধির জগতে তখন এক শূন্যতা বিরাজমান।

প্রসঙ্গতঃ ক্লান্তির সুর যখন বাংলা কাব্যকে পীড়িত করে রেখেছে তখন ব্যাতিক্রমে উজ্জল ক'জন কবি স্বকীয় রীতির বৈশিষ্ট্যে পাঠকদের সঞ্জীবিত করে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ঐতিহ্যের অনুশীলনে শব্দ বা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র রীতি এবং জীবনদর্শন।

[দুই]

"যৌবনবাউল' কাব্যগ্রন্থ বাঙালী কাব্যরসিক মহলে প্রথম বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এই কাব্যগ্রন্থই রীতি এবং উপলব্ধির মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় রচনা, সামগ্রিক প্রয়াসের ধারাবাহিকতা মুক্ত থেকে প্রসন্ন এক একক বিশ্ব রচনা। জনমানসের মধ্যে তাঁকে যেন মুহূর্তেই চিহ্নিত করা যায়। এ রীতি ভিন্ন, নির্মাণ-কৌশল ভিন্ন, জীবন-অন্বেষণও ভিন্ন।

'যৌবনবাউল' এর ঐকতান গায়ক দলের মেলায় প্রবেশের পূর্ববর্তী অংশ 'উৎসর্গ' কবিতা কবি মরমীয়া অভিজ্ঞতার আনন্দরূপে পরিপূর্ণ। তাঁর হাতে দোতারা, পরনে গৈরিক বাস। আর নৃত্যে-সঙ্গীতে ছড়িয়ে পড়ে জীবনের রহস্য। বাউলের আর্তি বারবার ঝরে পড়ছে :

পটভূমি অন্ধকার আপন স্বত্ব অধিকার
রাখুক আমি শরীর নোয়াবো না।
একটি মাত্র রাখাল যাক এ মাঠে একলা প'ড়ে থাক
নীরবে আমি এ মাঠ ছাড়বো না।

কবি অলোকরঞ্জন জীবনের অতলে ডুব দিয়েছেন, প্রয়োগকর্ম বাউলের, অনুশীলন করেন অনুক্ষণ আপন ঐতিহ্যের, তিনি যোগ করেন বাউলের সুর এই বিশ্ব-পরিক্রমার। পরম জিজ্ঞাসার শাশ্বত রূপকে গ্রহণ করেছেন আপন স্বভাবে : তাই তো অলোকরঞ্জন ব্যক্তিগত অনুভবে স্বয়ং বাউল। যৌবনবাউলের এই প্রস্তাবনা শেকস্‌পীয়ারের নাট্য মুখবন্ধের অনুকরণে প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য ভাবে স্থাপন করে নিজস্ব রীতিতে।

একদা বিস্ময়কর কবিতা 'অন্ধ বাউল'এ কবি অস্তিত্বের অতি নিবিড় উৎস-মুখে ধ্যানমগ্ন। আমি কে? কি সেই স্বরূপ? সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যে অবিরাম অন্বেষণ তারেই অন্তর্গত অলোকরঞ্জন। ভারতবর্ষের অস্তির অনুভবকে

নিজেকে সমর্পিত করেছেন অতি সন্তর্পণে। অবশ্য বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণিক ভীরুতা ভিন্ন একবিশ্ব উন্মোচিত করে আমাদের সম্মুখে। উদ্যানের সৌরভে মুগ্ধ অনুভূতি। কিন্তু কোথায় সৌরভের উৎস? এ প্রশ্ন তো অনাদিকালের।

"আয় তাকে মন করবি চুরি,
সে আছে কোথায় কেউ জানে না—
অথবা সে যেন অধরা সুবাস।"

তাকে লাভ করার কামনা অলোকরঞ্জনের মধ্যে গভীর বেদনা সৃষ্টি করে। সুরু হয় অন্বেষণ, বাউলের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে বাউল সঙ্গীত, প্রতীচ্যের প্রভাবে নাস্তির সংশয়ে অলোকরঞ্জন ক্ষতবিক্ষত হন নি বরং অস্তির প্রশান্ত ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেছেন, মুক্তির সন্ধানে তিনি নিজেই ব্যাকুল হন নি; সেই সঙ্গে শব্দ পরিবেশকেও মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। এখানে অলোকরঞ্জন এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রতিটি শব্দ ও দ্যোতনা বাউলমনকেও একই সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করে রেখেছে, তাঁর কণ্ঠভরা গান আমাদের মুগ্ধ করে, এমন কি আমার মধ্যে এক উদাসী বাউলকে অধিষ্ঠিত করে। তখন অনিবার্যভাবে বাংলা কাব্যের পোড়ামাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাউলের সঙ্গীতরসের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

'নিষিদ্ধ কোজাগরী'র মধ্যখানে অলোকরঞ্জন এক নতুন বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে। শব্দের বিন্যাসে নানাভাবে সমন্বয় যোগাযোগ প্রভৃতির খেলা চলেছে অবিরত। ভিন্ন এক সংস্কৃতি, নতুন এক ঐতিহ্য তাঁর লীলাভূমির চতুর্দিকে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছে, অথচ দূর থেকে ভেসে আসছে যমুনা পুলিনের বাঁশীর সুর, অলোকরঞ্জন তখন শিল্পী, ময়দানে, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের মধ্যে সেতুরচনার দায়িত্ব যেন তাঁর ওপর অর্পিত। কিন্তু বিশ্বে শোনিত-স্রোত প্রবাহিত, তা সত্ত্বেও দূরদেশী রাখালের সুমধুর বাঁশীর সুর তাকে গৃহছাড়া করে। ব্যাকুল হৃদয়ে পথে বেরিয়ে আসেন।

"আমিও, অথচ যে-রাখাল দূরদেশী,
আমি তাঁর কাছে সপেছি মনপ্রাণ,"

অথবা

"রাখালিয়া গীতি হাতে নিয়ে ভাজিল,"

এই কবিতায় অলোকরঞ্জন যেমনি দুটো ঐতিহ্যের মধ্যে অঙ্গুরী বিনিময় সম্পন্ন করেছেন তেমনি ইংরেজী শব্দ ও বাংলা শব্দের সহবাস্থান পরিবেশ রমণীয় করে তোলার প্রয়াসী হয়েছেন, অবশ্য তিনি খুবই শব্দ-সচেতন বলে দুটো ভাষার স্ব স্ব প্রতিমা স্পষ্টতা লাভ করেছে। প্রসঙ্গতঃ অলোকরঞ্জন দ্রুত ধাবমান কালের স্রোতে অবস্থান করেও যেন অবিচল নির্বিকার। কারণ ঐতিহ্য তাঁর চেতনার অভ্যন্তরে আপন নিয়মে কাজ করে চলেছে।

'রক্তাক্ত ঝরোখা'য় পরম বিশ্বাস অনুসন্ধান পর্ব। ঈশ্বর। নির্ভরতা। পরিবেশ ও যুগ-মথিত ব্যক্তির বিশ্বাসের অন্বেষণ এক নতুন সুরের দিগন্তে অলোকরঞ্জন নিজেকে সাময়িক নির্বাসিত করেন। তাঁর বিস্মিত দৃষ্টিতে রক্তাক্ত ঝরোখা। অতীত উচ্চারিত। বৌদ্ধ জৈন বা যজুর্মন্ত্রের ব্রাহ্ম মুহূর্তে আবাহন গান—গৃহকোনে মাধবী কাননে অতি নিভৃতে অবস্থান করে। দ্বিধা তাকে ক্ষণিক বিচলিত করে। একি পরমার্থ অনুসন্ধান? না একদিকে গৃহকোণ অন্যদিকে অনন্তকালের যন্ত্রণায় মানুষের এক অগ্নিপরীক্ষা। তিনি অমোঘ নিয়মে প্রত্যক্ষ করেন :

> "হেমন্ত বুদ্ধের ঋতু, জৈন সন্ন্যাসীর ঋতু শীত,
> কার ধর্ম বেছে নেবো? যজুর্মন্ত্রের উচ্চারণে
> ... ...
> ... ...
> নিয়ে গেছে যে নারীর বহিরঙ্গ তীব্র একরোখা
> ক্ষুধার্ত বালক ভাসে নির্বাণের সুনীল সাগরে
> বাতিঘরে হেমন্ত নিশীথসূর্য রক্তাক্ত ঝরোখা।"

হৃদয় মন এক রূপকল্প জগৎ নির্মাণে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিমা শোনিতে সিক্ত। জাফরি-কাটা বাতায়নে অনাবিল মৃদুমন্দ আশ্বাসের এবং নির্ভাবনার সমীরণ বয়ে চলেছে। ধীরে প্রবাহিত রক্তের রঙে সুপ্ত যন্ত্রণাকে উত্তেজিত করছে। অলোকরঞ্জন হৃদয়ের এই দৃশ্য অবলোকন করে স্তব্ধ। চিরায়ত মাথুরের বেদনা পরিবেশকে বিষন্ন করে তুলেছে।

> "তমাল ডালে পল্লবিত মেরুণরঙের রোদ্দুর"

শোনিত-সিক্ত হৃদয়ের গবাক্ষের অন্য প্রান্তে রয়েছে চিরকালীন কামনা। ৫. তমাল তো বাসনা কামনারই বৈভব। মুহূর্তে অলোকরঞ্জন এ যুগের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করেন :

"পূর্ণেন্দু আমাকে তুমি বাগানের মধ্যে নিয়ে চলো,
পূর্ণেন্দু, চুম্বন দাও আমাকে, সন্তান না দিয়ে।"

তাহলে কি যৌবনবাউলের 'অধরা' বিস্মরণে অদৃশ্য ? তিনি দিক পরিবর্তনে সচেতন। স্বরূপ অনুসন্ধান এখনো অব্যাহত। এক গভীর অন্তর্গত বিষাদ অলোকরঞ্জনকে শুদ্ধ করে। এমন কি উত্তরাধিকারে তা সমর্পণও করেন

"তোমাকে সব দিলাম ভালবেসে
তুমি ওদের দিয়ো—"

'রক্তাক্ত ঝরোখা'র শব্দচয়ন যেমনি এক মায়াজাল রচনা করে তেমনি কবির ইতিহাস-সচেতন উপলব্ধি কাব্যকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

একটি ঘুমের টেরাকোটা : অলোকরঞ্জন শিল্প-চৈতন্যের অন্তর্গত সত্তার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। শুদ্ধচৈতন্যে তিনি নিজেকে অতি নম্রভাবে নিবেদন করেছেন। মন্দির গাত্রে শোভিত পোড়ামাটির শিল্পকর্ম রাগসঙ্গীতের বিলম্বিত সুরকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখে। সৌন্দর্যচেতনা কবির উন্মোচন-মুহূর্তকে দ্রুত করে। এইক্ষণ রাতের মালকোষ রাগের। যেমন—"ট্রেন থামলো সাহেবগঞ্জে,"

ট্রেন চললো থার্ডক্লাসের মৃণ্ময় কামরায়
দেহাতি সাতজন
একটি ঘুমে স্তব্ধ অসাড় নকশার মতন।"

জীবনের একটি রূপ মাত্র। তিনি সৃষ্টিকর্তা। অনুভবের বিশ্বে তাঁর স্বাধীন বিহার। এই মুহূর্তে মানুষের অবিনশ্বর চিত্রকে স্থির করে রেখেছেন। সৌন্দর্য-তত্ত্বের আদর্শ দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে প্রায় অদৃশ্য। এখানে কবি অলোকরঞ্জন কীটসের 'গ্রীসিয়ান আর্ন' এর সুরকে যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। বস্তুতঃ এই কবিতা এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

গিলোটিনে আলপনা : অলোকরঞ্জনের সম্মুখে নিয়তি। কালের প্রবাহ ঘটনা সমষ্টিকে গ্রহণ করেছে। একমাত্র মানুষ অসহায়। একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস যেন। কখনও মানুষের দায়িত্ব উপলক্ষের মধ্যেই সীমিত। সাময়িকভাবে বাউলের বসন অন্তর্হিত বুঝি বা।

> "ফাঁসির মঞ্চে ঈশ্বরী এক, সকল দেহে স্তন
> শতলক্ষ নারীর যৌথ আত্মবিসর্জন
> গড়েছে এই ঈশ্বরীকে যদিও অন্ধ সে
> স্তনের চোখে তাকিয়ে আছে
> একি অপার করুণা তার ঘাতকের উদ্দেশে।"

নিয়তির রূপ অন্ধ, সে ক্রীড়নক মাত্র, অথচ তার ওপর ঈশ্বরীর অপার করুণা, অলোকরঞ্জন স্ব-ভূমি বিচ্যুত, অনুভবের কুরুক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য। বাস্তব তাকে বিব্রত করে, অস্থির এবং উত্তেজিত করে। কিন্তু পলায়নের পথ যে রুদ্ধ, তাহলে রহস্যের কারণ কি ? অনুসন্ধান ? পরবর্তী স্তরে গভীর উত্তরণ। বিষণ্ণতা বা হতাশাও আচ্ছন্ন করে না। প্রতিনিয়ত সংঘটিত ঘটনা তো নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত।

> "তার আগেই তো আমরা মৃত
> মৃতদেহের পরেও এত মোহ।"

মায়াবদ্ধ জীব এই অভিজ্ঞান আমাদের। পরিধি প্রশস্ত নয়, এমন কি পরিসীমা অতিক্রমণের প্রয়াশও প্রায় দুর্লভ। সুতরাং প্রতীক্ষার পরম লগ্নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হয়। বিশ্বরূপ দর্শনের লগ্ন। গাণ্ডীব ত্যাগ বিনা তো তা সম্ভব নয়। অন্তিম মুহূর্তে তাই নিয়তি আমাদের আলোকিত করে। অলোকরঞ্জন এই পর্বে নিজেকে পূর্ণভাবে নির্বিকল্প স্তরে স্থাপন করেছে।

সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' অলোকরঞ্জন পরিণত, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য সমভাবে অনুশীলনের বৃত্তে ধরা পড়েছে। কবি, বয়সে বা কালের চক্রে আহত। সামর্থ্য লুণ্ঠিত। তাঁর অন্তরজগতে গৃহকাতরতা, কখনো ক্ষ্যাপা বাউলের দিগন্তবিস্তৃত গান। শব্দ স্বাধীনতা লাভ করে যেন সঙ্গীতময়। কবির ব্যাকুল হৃদয় দশদিগন্ত জুড়ে বিরাট কম্পন সৃষ্টি করে।

অলোকরঞ্জন গৃহকাতর, গৃহে প্রত্যাবর্তনের কামনা তাঁকে বিষণ্ণ করে :

তারপর যত দুঃখী দেশ মিলে তৃতীয় পৃথিবী
ভারতবর্ষের চেয়ে দুঃখী দেশ আমার হৃদয়"

এ যেন কান্না। অথচ বহুদূর থেকে ভেসে আসছে বাউলের গান।

তিসি বনে একা শিশু ভেসে আছে নিশুতি উদাস।'

বিস্মৃত নয় কবি, সমগ্র জীবনব্যাপী যে বাউলকে হৃদয়ে পালন করে এসেছেন তারই প্রতিধ্বনি সর্বত্র। বাংলা শব্দ ভেঙে কখনো গড়ে এক যাদুকরী ক্রীড়ায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। নির্মিত হয়েছে শব্দের বিভিন্ন প্রতিমা। এই কাব্যগ্রন্থে মরমীয়া মনের ওপরে বাস্তবের প্রতিক্রিয়া মৃদু সমীরণে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তখন অলোকরঞ্জন তৃতীয় বিশ্ব-প্রসঙ্গের দায়িত্ব বহন করে নিজেকে প্রসন্ন করে তোলেন। সময় ও স্থানের ধর্মকে উপেক্ষা করার এক বিনীত প্রতিরোধও গড়ে ওঠে।

বাংলা কাব্য জগতের আধুনিক পর্যায়ে অলোকরঞ্জন এক বলিষ্ঠ রীতি প্রবর্তনের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। ঐতিহ্যের অনুশীলনে ও উপলব্ধিতে এক চিরায়ত অনুসন্ধান পর্ব তাঁর অন্তরশরীরে সক্রিয়। বাউলের কণ্ঠ-নিঃসৃত সুর বয়ে চলে সর্বত্র। ক্লান্ত পাঠক তখন নতুন রসে রসিক হয়ে ওঠেন।

"দেশ বিদেশের বাসা আমার যখনই যাই আমি
হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশী।
বাজাতে গিয়ে ঠোঁট ছড়ে যায়
সুরের রক্তে বাঁশী ভেজায়।"

অলোকরঞ্জনের সত্তার অনু-পরমাণু পূর্ণতানে ঐতিহ্যের স্নানে পরিশুদ্ধ। কোথাও আর সংশয় নেই বিকার নেই। বাসনা কামনারও অবশিষ্ট নেই। সর্বত্যাগী বাউল, তাঁর হৃদয়ে সদা প্রবহমান আনন্দরস, অধরাকে পাবার ব্যাকুলতা তাঁর সর্ব দেহে, এই ঐতিহ্য অলোকরঞ্জনকে স্বতন্ত্র কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে, প্রসঙ্গত আইরিশ কবি ইয়েটস যে কেল্টিক মীথে আত্মার অধিকার বহন করে চলেছিলেন—অলোকরঞ্জনও সার্থকভাবে সেই অঙ্গীকারকে মর্যাদায় সম্ভ্রমে অধিষ্ঠিত করেছেন॥

[তিন]

অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় সমকালের আর্ত চিৎকার নেই। বাচনিক-স্নিগ্ধ, অন্তর্মুখী মননে সমৃদ্ধ। মেজাজে ও শব্দচয়নে লাবণ্যময়, কবিতার শরীর নির্মাণে তিনি মগ্ন। স্বভাবতঃ জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরবর্তী যুগে যে কাব্যরচনার প্রয়াস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্ভর নয় বরং অনুসরণে অনুকরণে প্রভাবে সামগ্রিক প্রচেষ্টা মাত্র, সেখানে অনিবার্যভাবে ক্লান্তির অসুস্থ হাওয়া প্রবাহিত, কবিদের মধ্যে জৈবিক তাড়না বা সাময়িক পরিবেষ্টিত সমস্যাই প্রধান। অন্তরশরীর আবিষ্কারের ক্ষীণমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই। সেই লগ্নকালে অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার বহিরঙ্গ শিল্প-অনুরাগে অলোকরঞ্জন, শঙ্খ ঘোষ, কখনো বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে সৌহার্দ্য রচনা করে।

ভিন্ন স্বভাবে এই চারজন কবি, প্রত্যেকেই নিজস্ব বৃত্ত পরিক্রমায় অক্লান্ত। সহজাত শিল্প-নির্মাণে সবাই দক্ষ। কাব্যের নির্দিষ্ট কোন নির্বাচিত বিষয় নেই—বরং উপলব্ধির এক শিল্প রূপান্তরে এই কবিগণ বিশুদ্ধ। তাঁদের একমাত্র কামনা শুদ্ধ চৈতন্যের সান্নিধ্যলাভ। ব্যাক্তিস্বরূপ নিরূপণের দায়িত্ব বহন করে কখনো কখনো কালের প্রবাহকে উপেক্ষা করে না। প্রত্যেকেই সময়ের স্রোতে সন্তরণ-পটু। অথচ উদ্ভূত সীমাহীন প্রশ্নের সমাধানে ভাবমুক্ত হবার প্রবণতাও লক্ষ্য করার মতো। অনাদি জিজ্ঞাসা সম্পর্কিত যথার্থ উত্তর কবিকেই দান করতে হয়। কবি অরুণ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বভাব-কবির ঐতিহ্য রক্তে বহন করেন। শুদ্ধ চৈতন্যে অঙ্গীভূত হবার ধ্যানে তাঁরা নিবিষ্ট। সুতরাং কাব্যে পূর্ণতা রচনার প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হলে সে দায়িত্ব পাঠককেই বহন করতে হবে।

'মিলিত সংসার' কাব্যগ্রন্থে অরুণ ভট্টাচার্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ চলমান সংসারের এক নিরুপম খুশিকে আবিষ্কার করেছেন। গানের সুর সেই সংসারের গৃহকোণে অনুরণিত হচ্ছে। যৌথ দায়িত্ব যৌথ সুখ তো অপার আনন্দেরই প্রকাশ। তখন এ পৃথিবীতে মৃত্যু নেই। তীব্র উপেক্ষা মৃত্যুকে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। অরুণ ভট্টাচার্যকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে এই পৃথিবী, মানুষ ভালোবাসা স্বাধীনতা, পার্থিব নিয়ম ও মানুষের এক নির্বিকল্প অবস্থা কাব্যকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

"মাছেদের মিলিত সংসারে
হাসিখুশি সোনাঝরা দিন
এবার ফুরোলো! অতএব
খেলাঘরে যদিও রঙিন
আশা ছিল স্বপ্ন ছিল তার
বর্ণালী আঁশের ঝিকিমিকি
মৃত্যুকে অবজ্ঞা জানাবার"

এই বিশ্ব-প্রজনন জন্ম মৃত্যু নিয়মে পরিক্রমণশীল। তা সত্ত্বেও মৃত্যু জীবনের বর্ণালী আঁশের দৌরাত্ম্যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয়। বরং মৃত্যু প্রায় অবহেলিত। এ কি গীতার কোন একটি অংশের উপলব্ধি মাত্র! কবি এখানে খুবই আবেগবিহ্বল। সুতরাং শব্দের মায়াজাল যেন কবির প্রয়াসকে চিহ্নিত করে বিশেষভাবে।

'সমর্পিত শৈশবে': প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি তাঁর মধ্যে প্রায় সমাপ্ত। বর্তমান থেকে নিষ্কৃতিলাভ অতি দ্রুত তাঁকে নির্বাসিত করে শৈশবের প্রান্তরে, পাহাড়ের চূড়ায়। অথচ এই বয়স কত গন্ধময়; নির্মম নিদারুণ সর্বত্র হাহাকার। নির্ভাবনার কোমল স্পর্শ কি তাহলে নিঃশেষ?

"নিম্নে এই ভয়াবহ মানুষের শব
দেখতে দেখতে কখন তার উজ্জ্বল শৈশবে
ফিরতে পারবে ভেবে এক অপার ইচ্ছায়
গাঢ়বর্ণ পাহাড়টাকে বারবার জড়িয়ে ধরছে।"

অরুণ ভট্টাচার্য ক্রমশ বাস্তবকে অনুভব করছেন। নির্মম যন্ত্রণা পার্থিব শৃঙ্খলে বাঁধা। ক্ষমা নেই। ভয়াবহ পরিস্থিতির এই রূপ প্রত্যক্ষ করে' কৈশোরের দিনগুলোর মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করতে চান। অরুণ ভট্টাচার্যের মধ্যে এই পর্যায়ে বাস্তব ঘনিষ্ঠতা সাময়িক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মানসিকতা তখনও পরিবেশ-নির্ভর হয়ে ওঠে নি। 'সমর্পিত শৈশব' কাব্যগ্রন্থেই সর্বপ্রথম তাঁর কবি-চরিত্রটিকে আমরা ধরতে পারছি। অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বাস্তবের চিত্র মিলিত হয়েছে লাবণ্যময় গীতিধারায়।

'ভয়ঙ্কর ভাবনা' কবিতাটির রূপ বাস্তবেরই প্রতিধ্বনি। কবি পীড়িত, ভীত সন্ত্রস্ত। এই বিশ্ব জটিল বাস্তবের ছবি মাত্র। তিনি অসহায়, ছিন্নমূল। অপ্রসন্ন মানসিকতা বহন করে অগ্রসর হয়েছেন তিনি

"আমি আর উঠব না, নামবো না কখনো আবার
যেমন আছি হে একলা স্থাণুবৎ নিশ্চিন্ত দুপুরে।"

আশা আর প্রজ্জ্বলিত নেই। সময় বিভিন্ন চিত্র নির্মাণ করে চলেছে, হাহাকার আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করে' সুতরাং একটি আশ্রয় নিতান্ত প্রয়োজন। নিমজ্জিত ব্যক্তির বাঁচার প্রচেষ্টা যেন। অস্থিরতা কবিকে তাড়িয়ে ফিরছে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, এতো বিশ্বাসের চিত্র নয়, বরং হতাশার জটিল আবর্তে শৃঙ্খলিত। মুক্তি নেই, বরং স্থবিরতা ক্রমে আক্রান্ত করে তাকে।

'বাড়ি' অরুণ ভট্টাচার্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা। তাঁর কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হিসেবে 'বাড়ি' সুচিহ্নিত। এই পর্বে ক্ষণিক যেন নিজেকে অন্বেষণের বেদনা অনুভব করছেন। আবেগ বা পৃথিবী একদা তাঁকে পরিবেষ্টিত করে রাখতো। কিন্তু

"সারারাত আমার মধ্যে
অন্য কে কে যেন কথা বলছে,
সে ভাষা আমি বুঝি নি।"

এই তো পথের সুরু। স্বরূপ-নির্ণয়ের দীর্ঘ পথযাত্রা। আত্ম-জিজ্ঞাসার এতো সুন্দর বর্ণনা সচরাচর বাংলা কাব্যে দেখা যায় না! অরুণ ভট্টাচার্যের মধ্যে তখন যেন নির্দিষ্ট জীবন রহস্যময় হয়ে ওঠেছে। রীতির দিক দিয়েও এই কবিতা আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

'সময় অসময়ের কবিতা': এই পর্বে যৌবনের বর্ণাঢ্য আড়ম্বর সম্পূর্ণ। সম্রাটের ভূষণে তিনি সজ্জিত। অথচ সেই মহাকাল গ্রাস করে সব। পার্থিব অস্তিত্ব একসময় হৃত সর্বস্ব অবসন্ন। 'নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বী'র যে ব্যঞ্জনা অরুণ ভট্টাচার্য এই কাব্যগ্রন্থে যেন সেই তলকে আশ্রয় করতে চেয়েছেন।

"রাজা আমার
ভর সন্ধ্যেবেলা ওই শেষ-সূর্যের পাগলকরা

গোধূলি আলোয়

তোমাকে চিনতে সত্যি বড় কষ্ট হয়।

এই পর্যায়ে শুধুমাত্র অন্বেষণের পটভূমিকা রচিত। অনাবৃত সত্য প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা ক্রমে সঞ্চিত হচ্ছে। 'তুমি কে?' অনুসন্ধান কাব্যে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার অবতারণা করেছে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে এই কবিতা স্থায়ী অনুরাগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে মনে হয়।

'কখন তোমার ডাক শুনব' কবিতটিতে পূরবীর বিষণ্ণ চেতনাকে উন্মুখ করে। কুয়াসার গাঢ়তা অতিক্রম করা প্রায় দুরূহ। কিন্তু আত্মমগ্ন কবির কাছেই একমাত্র এই ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

"আমার স্বপ্নের ধ্বনিরা কেউ কেউ

তোমার কাছে যেতে চায়

তুমি শুনতে পাও না।"

এখানে অরুণ ভট্টাচার্য জীবনের দিক পরিবর্তনে নিজেকে প্রায় প্রস্তুত করে রেখেছেন। এইতো ক্রান্তিকাল। শিল্পীর ব্যঞ্জনা এই কবিতার পরম সম্পদ বিশেষ।

'এই মুহূর্তে চিরকালীন' যেন প্রি-র‍্যাফেলাইটদের রীতি বা ধর্মকেই সঞ্জীবিত করে রেখেছে। এই চিত্রময় অনুভূতির প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবে এক পরিণত শিল্পী বহন করছেন। জল-রঙে আঁকা। আনন্দের উজ্জলতায় বর্ণাঢ্য। চেতনায় নিত্য বহমান। অরুণ ভট্টাচার্য চিত্র-শিল্পী নন, তা সত্ত্বেও চিত্র নির্মাণ-কৌশল তাঁর অজানা নয়। মনে পড়ে

"গাছের পাতার এক সবুজের কত রঙ দেখতে পাও সুরেশ,

এক সবুজের কত রঙ।"

শিল্পী গোপাল ঘোষকে উৎসর্গীকৃত কবিতায় তিনি দ্বিতীয়বার বর্ণচ্ছটা আবিষ্কার করেছেন যেন।

"ঈশ্বরপ্রতিমা": এই কবিতারচনার পর্যায়ে অরুণ ভট্টাচার্য যেন অলোকরঞ্জনের সন্নিকটবর্তী। অলোকরঞ্জন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত এক বাউল, অরুণ ভট্টাচার্য মরমীয়া সুরের সন্ধানে করছেন ইতস্তত।

"অন্ধকার বাড়ি" আশ্চর্য এক রীতি-সমৃদ্ধ কবিতা। সুরু তো অন্বেষণে?

ডিলান টমাসের প্রতিধ্বনি যেন এই কবিতায় সঞ্চারিত। রহস্যকে অনুভব করে নিজেকে খুঁজতে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। অন্ধকার পরিমণ্ডলেই তো দীপ্তিমান সত্তা প্রসন্ন হয়ে ওঠবে। সহজ করে নয়, বরং জটিলতার রাজ্য অতিক্রম করে তাকে লাভ করা। অরুণ ভট্টাচার্য এই কবিতায় নিশ্চিন্ত এক মরমীয়া সুরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

> "ডাকতে ডাকতে আমার হাত শীতল হয়ে আসে
> হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে, চোখ ক্রমশ জ্বলতে থাকে।
> অরুণ বাড়ি আছো ; অরুণ !"

এতো আত্ম-আবিষ্কারের চিরায়ত অনুসন্ধান। সমগ্র কাব্য ক্রমে দর্শনে ও ব্যঞ্জনায় এক অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতে রূপান্তর লাভ করে।

অরুণ ভট্টাচার্য বুদ্ধি এবং বিবেকে নিয়ন্ত্রিত। 'শব্দ দ্রুততর শোনা যাচ্ছে' কবিতায় তিনি অনুক্ষণ শব্দ-প্রতিমার নূপুর নিক্বণে সচেতন। বিশ্ব-নিখিলের রহস্য উন্মোচনের সম্ভাবনার উপলব্ধি যেন তাঁকে অতি দ্রুত অবসন্ন করে তুলছে।

> "সামনে তাকাতে চাই না, আমি পিছনে ফিরতেও না
> বড় ঘুম আসছে আমার, শুধু আমাকে ঘুমোতে দাও।"

অরুণ ভট্টাচার্য মরমীয়ার মতো নিজেকে সমর্পিত করেন। এই অনুভব কি তাঁর আয়ত্তের সীমায় ! ঐতিহ্যকে অরুণ ভট্টাচার্য অনুশীলনে ধ্যানে আত্মস্থ করেছেন। তারই পরিণতি এই সৃষ্টি। এই কবিতায় ব্যঞ্জনায় শব্দের প্রতিমা-নির্মাণে এবং উপলব্ধির নিষ্ঠায় বাংলা কাব্যজগৎকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বিশেষত্ব সর্বত্র শব্দ ক্রমে দ্রুততর শোনা যাচ্ছে। কবিতাটির চিত্রকাব্য পাঠক মনে অনায়াসে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গতঃ 'ঈশ্বর প্রতিমা' ও 'সময় অসময়ের কবিতা' কাব্যগ্রন্থের কবিতা সম্বন্ধে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মন্তব্য বিশেষ এক রীতিকে স্পষ্ট করে : "দুখানি বই প্রায় এক সঙ্গে পড়ছি……মগ্ন উন্মোচনের মতো মনে হচ্ছে।" অমলেন্দু বসু অরুণ ভট্টাচার্যের "শুভ্র নীলিমার স্বপ্ন" কবিতা প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করেছেন : "এই শ্লেষ প্রয়োগ চল্লিশের দশকে ক্রমেই কমে এসেছে, কারণ ধ্বংসের পাশেই আবার নির্মিত হচ্ছে বিশ্বাস-প্রাকার……নিবিড় অন্ধকার মিলিয়ে যায় অস্তির আলোকে।"

[চার]

নিবিড় মায়ায় শিল্প-সুষমায় অন্তরে অনুক্ষণ স্মৃতি নির্মাণ করে চলেন শঙ্খ ঘোষ। শব্দ ছন্দ যুগ্মভাবে কাব্যকে প্রসন্ন করে। কিন্তু ঐতিহ্য অনুভবের অন্তর্গত নয়। বরং ম্যাকবেথ-এর ভূমিকা প্রায় বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত। মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণে তাঁর সময় অতিবাহিত। কারণ এই মানুষ essence এবং anguish এর উপসর্গের বৃত্তে আবর্তিত। হয়তো কখনো কখনো এই পরিমণ্ডল থেকে অব্যাহতি লাভে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একটি পলাতক মনের সৃষ্টি হয়। উদাসীনতা তাঁর রক্তে ক্রমে প্রবাহিত হতে থাকে।

> "মনে রেখো একজন শারীরিক যজ্ঞ হয়ে
> ফিরে গিয়েছিল এই পথে"

একান্ত ছন্দহীন পরিবেশেও নিজেকে আমূল প্রত্যক্ষ করাই শঙ্খ ঘোষের একদা ঈপ্সিত ছিল; আত্ম-আবিষ্কারে মগ্ন থেকেই তিনি বিশ্ব-নির্মাণে এক অসাধারণ কুশলী শিল্পী।

> "তখন দুজনে জানে, যা কিছু এসেছে ফেলে ঘরে
> সবই ছিল সুখময়, শুধু সুখে ধমনী ছিল না।"

(আদিম লতাগুল্মময়)

ইতিহাস বা ওপারে অতীতের সমৃদ্ধ পৃথিবীতে আশ্রয় প্রার্থনা করা তাঁর সুপ্ত অভিলাষ। জীবনানন্দের সেই পংক্তি 'অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে' চকিতে মনে পড়ে।

'দিনগুলি রাতগুলি' পর্বে শঙ্খ ঘোষ পূর্ণভাবে পার্থিব। এক বিশ্বনিখিলের মুক্তিকামনায় ব্যাকুল। পরিবর্তে নিজেকে বিদ্ধ বা আহত হতে হয় তাতেও বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। যদি পৃথিবীর সবত্র তাঁর দেহ বিলীন হয় তবুও। এখানে কবি একজন অতি-সংবেদনশীল পৃথিবীর মানুষ মাত্র।

> ' আমার জীবন থেকে বড়ো
> পৃথিবী বিস্তৃত করো দৃঢ় মেঘে তৃণে সূর্যে ভয়
> জীর্ণ তার ঝড়ে।"

এই কামনা তাঁকে জীবন-প্রেমিক করে তুলেছে। এই পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত রয়েছে তাঁর সহৃদয় কামনা।

"সত্তা" (নিহিত পাতালছায়া) কবিতা শঙ্খ ঘোষের মধ্যে অনুসন্ধানের বীজ রোপন করেছে। জীবন-চর্যার অনুষঙ্গে অন্তঃকারীদের স্পর্শলাভের সুপ্ত ইচ্ছা তাঁকে কখনো কখনো অস্থির করে: "শব্দগুলি অন্ধকার নীরব, নিঃশ্রেয়/ এখনো না, আমি সীমার প্রান্তে আসি নি।"

'সত্তা'র আবিষ্কারে অন্ধকারে অভিযান পরিচালনা একান্ত প্রয়োজন। শঙ্খ ঘোষ 'শব্দগুলি'র শরীর অবলম্বন করে ক্রমে অন্য এক মূর্ত প্রতিমার সন্ধানে বেরিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' ও 'আদিম লতাগুল্মময়'। পর্যায়ে কবি শান্ত স্থির এবং অতি পরিমিত, দুঃখ কষ্ট পার্থিব নিয়ম আর তাঁকে বিব্রত করে না। ম্যাকবেথের পর্যবেক্ষণ যেন ক্ষান্ত, বুঝি বা সমাপ্ত। কালের বিরাট রূপ তাঁর অন্তঃশরীরের ছায়া বিস্তার করেছে। তাই দুঃখ সুখ সব যে স্মৃতিতে সমর্পিত তার বোধ সমগ্র চেতনায়, তিনি সেই অবকাশ মুহূর্তে শুদ্ধ চৈতন্যের দুর্লভ স্পর্শ কামনায় ব্যাকুল।

"প্রচ্ছদ পড়ুক চোখে, শান্তি হোক শিরা
ভুলুক দিনের যত সমবেত ভুল
দুঃখ রেখে যাক মুখে চন্দন প্রলেপ—"

শঙ্খ ঘোষ অভিজ্ঞতার আলোক বহন ক'রে জ্ঞানের বরলাভ করেন। এ জীবন আর বাসনা নয়, এ জীবন সুখে দুঃখে নির্বিকার। এ বোধ তো কবিকে অনু-সন্ধানের প্রতিশ্রুতিকেই আহ্বান করে।

শব্দ নিয়ে মন নিয়ে বোধ নিয়ে লুকোচুরি খেলা, রহস্য আবৃত জীবন তারও যে নানা খেলা, নানা রূপ এই ভাবনায় শঙ্খ ঘোষ এক আনন্দের প্রবল ঝঞ্ঝা বইয়ে দেন। মুহূর্তে মেঘের সঞ্চার আবার পলায়ন, এরই মধ্যবিন্দুতে একটি জীবন ; ব্যঞ্জনায় এই কবিতা একটি অসামান্য সঙ্গীতের সুমধুর রেশ রেখে যায়

যা মেঘ যা উড়ে যা
কিশোরী রূপপুরে যা

* * *

যা মেঘ যা দূরে দূরে যা
সমস্ত রূপ পুড়ে যা।"

শঙ্খ ঘোষ রূপ অরূপের লীলাখেলায় অনুক্ষণ মগ্ন। ভারতের সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই শঙ্খ ঘোষ এই যুগ এই পৃথিবীকে একান্তে ভালবেসেছেন। তিনি কখনো প্রগলভ হয়ে পড়েন নি এবং তাঁর গতিপথকে কখনো মন্থরও করেন নি। শঙ্খ ঘোষ আধুনিক বাংলা কবিতায় এক প্রসন্ন অথচ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

[পাঁচ]

শক্তি চট্টোপাধ্যায় শব্দে ছন্দে এক মাদকতা সৃষ্টি করেন। তাঁর কাব্য অনুপ্রাসে যে ছন্দ রচনা করে তাতে কাব্যের শরীর আশ্চর্য রমণীয় মোহময় হয়ে ওঠে। সময় সময় লঘু হাওয়াতেও তিনি হৃদয়ে ঝড় তুলতে জানেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় শুধুই কবি। তাঁর অন্তরে বাউলের মতো এক ভিন্ন পুরুষের অবস্থান, সে কবি। আধুনিক কবি যখন অনুকরণকে একটি ঐতিহ্য হিসেবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেই গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র ; তিনি কি পূর্বসূরী কি বিদেশী কারুর কাছেই বিনীত-চিত্ত নন। তিনি মাটির দেশকে মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই ধূপগুড়ি ময়নাগুড়ি এসব স্থান তার মধ্যে এক অন্তঃশরীর নির্মাণ করেছে। সাম্প্রতিক কবিতা যখন একক প্রচেষ্টার কোন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রায় অসমর্থ তখনই তিনি অন্যতম স্বতন্ত্র কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। কবিতায় তিনি সুরও বেঁধে দিয়েছেন। অনুসরণ করেছেন নিভৃতে রবীন্দ্রনাথকে কখনো জীবনানন্দকে, অনুকরণের কোন প্রমাণ রাখেন নি। বলা যেতে পারে, আত্মস্থ করেছেন শ্রদ্ধেয় কবিদের। তিনি তাই সুনিপুণ শিল্পী। অবশ্য, 'তুমি কে ?' এই অন্বেষণ তাঁর ভাবনার গভীরে এখনো কোন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে পারে নি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই পৃথিবীকেই অতি সযত্নে গভীরে মমতায় হৃদয়ে বরণ করে রেখেছেন।

"প্রভু হে কেন শুকালো ফুল, মুড়ালো গাছ পীতল মালা
দরদী মুখে মলিন হাসি বুঝি নি ছিল শিলাকূট

প্রিয় আমার নিয়েছো সব ভ্রান্ত কর, নীরব, লুলা
স্বপ্ন নওে স্মৃতি নাও পদ্মনাভ অক্ষিপুটে।”

শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বপ্ন বা স্মৃতির অনুষঙ্গে জীবনকে গ্রহণ করেন নি। বরং এ জীবনের সব যেন তাঁর কাছে এক সঙ্গীত, এখানে শুধু আনন্দ, মৃদঙ্গের বাদ্য জীবনকেও ছন্দোবদ্ধ করে তুলেছে। শব্দ স্পর্শের অন্তর্গত পার্থিব সম্পদকেই তিনি একমাত্র হৃদয়ে গ্রহণ করতে অভিলাষী। কালের প্রবাহে সব গ্রাস করলেও কবিকে বিষণ্নতা বা হতাশা কখনো বিচলিত করে নি। সান্ত্বনার প্রতিশ্রুতি প্রবাহিত হয় ধমনীতে এই হয়তো নিয়ম।

‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দের’ জগত থেকে তিনি সরে এসে যে কবিতাবলী উপহার দিয়েছেন তার নামপত্র “ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো।”

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবনবিলাসী কবি, এ পৃথিবী তার হৃদয়। কিন্তু এই পর্বের কবিতায় তিনি যেন হৃদয়ের অবস্থান অনুসন্ধানে মগ্ন। জটিলতার আবর্তে ‘আমি কে?’ ‘আমি কি?’ এই অন্বেষণ তাঁকে পাগল করে, ক্ষণিকের জন্য তাঁকে গেরুয়া বসনে সজ্জিত বলেও ভ্রম হয়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় কি বাউলের একতারার সুরে মগ্ন?

এখনো ছিলো অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা।”

এই ছন্দ লালিত্যে রবীন্দ্রনাথের সুর কানে বাজে। অনুকরণ নয়, অনুসরণও নয়। তবু কোথায় যেন ইঙ্গিতে তার কিছুটা জানিয়ে দেয়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবনের রহস্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, জীবন অন্ধকার ও জটিলতার মধ্যে অবস্থিত। হৃদয়কে খুঁজে নেবার প্রয়োজনে তাই তাঁকে বাউল হতে হয়, বাউলের হাতেই যে সেই হৃদয়পুরের চাবিকাঠি। এই প্রচেষ্টা সত্যিই শক্তিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে বাংলার কাব্যজগতে। পৃথিবীর বিশাল প্রাকার ধ্বংস করে রহস্যময় বিশ্বে পদার্পণ করার এক প্রতিশ্রুতি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। শব্দের দ্যোতনা ব্যঞ্জনা এবং উপলব্ধি এক চিত্রকাব্য রচনা করেছে, শক্তি সেখানে এক সুনিপুণ শিল্পী।

‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’ কবিতাবলীতে অনুপ্রাসে নির্মিত এক বিস্মিত জগৎ, যাদুকরী মোহে শব্দে ছন্দে এমন কি কাব্যশরীরে শক্তি স্বভাবশিল্পী, এই পৃথিবী

বিষণ্ন করে না ক্লান্ত করে না। জীবনের ধর্মকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে শক্তি বিচলিত নন, তাই সান্ত্বনার প্রয়োজন একেবারেই অর্থহীন, উপলব্ধি তাঁর স্পষ্ট এবং গূঢ়। তিনি ক্রমে এক নির্বিকল্প অবস্থা লাভ করতে চান।

"হারায় ওরা হারায় ওরা এমনি করে হারায়
বাধা যে দেয় তাকে এবং সম্মুখে পা বাড়ায়।"

এতো স্বাভাবিক। সমাধানও অসম্ভব নয়। এই বোধ বহন করেই শক্তি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছেন ক্রমশ, আরো ক্রমশ।

অরুণ ভট্টাচার্য

মহাকবি ভাস স্মরণীয়েষু

প্রতিমাগৃহের কাছে একরাশ বাতাস বহিছে।

প্রতিমাগৃহের কাছে আমাদের
নতজানু হতে হবে।

ওইখানে উন্মুখর ইতিহাস
আমাদের বলে গেছে
মানুষের মৃত্যু আছে। মানুষের
দেশকালসন্ততির মৃত্যু নেই।

প্রতিমাগৃহের কাছে আমাদের
পিতামহীদের শব
উন্মনা বাতাস ঘিরে আজো স্থির
হিরণ্ময় রয়ে গেছে।

প্রিয় শব্দ জাদুকরী

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। হঠাৎ
আমার কাঁধের ঝোলা থেকে
প্রিয় শব্দগুলি দুদ্দাড়
সামনের পুকুরে লাফ দিয়ে
মুহূর্তে সব মাছ হয়ে গেলো। দেখতে থাকলুম, ওদের
কি অগাধ মুক্তি।

সাঁতার দিচ্ছে এধার ওধার। জলে
ঘাই মারছে দু-চারবার। তলিয়ে যাচ্ছে
কোথায় অন্ধকারে।

সেই থেকে সারা রাত্রি
পুকুরপাড়ে বসে থাকলুম, চোখ কেটে
জল এলো, আমার
চোখের জলে পুকুরপাড় ভেসে গেলো,
জল থইথই উজাড়-করা মাঠে
মাছগুলি আবার, রুপালি মাছগুলি
আমার কোলের কাছে চলে এলো।

আমি আদর করে তাদের গায়ে হাত বুলোতেই
একে একে সব মাছগুলি,
কী আশ্চর্য ছ্যাখো,
আমার সব প্রিয় শব্দ হয়ে আমারই কাছে ফিরে এলো।

নিছকই খেলা

বুড়ো বাজিকর মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে
খেলা দেখাচ্ছিল। নিছকই খেলা।
আমরা তিনবন্ধু বসেছিলাম তিন দিকে। বাজিকর
ঠিক যেন টিপ করে আমাদেরই দিকে স্পষ্ট তাকালো
ইঙ্গিতে জানালো
তার কাছে চলে আসবার।

তিন দিক থেকে আমরা গেলাম বাজিকরের দিকে। বাজিকর
একটি রুমাল দিল, নতুন রুমাল।
একটি রুমাল তিন বন্ধুকে।

দেখতে দেখতে একটি রুমাল তিনটি রুমালে পরিণত হল।
আমরা তিনবন্ধু মিশে গেলাম এক দেহে,
অস্পষ্ট কানে এলো দর্শকদের প্রচণ্ড উত্তেজনা।

খেলা, নিছকই খেলা দেখাচ্ছিল বাজিকর গোধূলির শেষ বেলায়।

একরাশ গন্ধের আড়ালে

নতুন বাড়িটায় ঢুকলে ঝকঝকে সাদা চুনকামের গন্ধ।

নতুন বাড়িটায় এখনো
লোকজন আসে নি। আমি
নির্জন ঘরগুলোর মধ্যে, বারান্দায়, চিলেকুঠিতে,
ঠাকুরদালানে ঘুরে বেড়ালাম ইচ্ছেমত।
একটা আশ্চর্য গন্ধ নিয়ে
ঘুরে বেড়ালাম, একটা মাতাল হাওয়া
শিরশির করে গায়ে জড়িয়ে রইলো শীতসকালে চাদরের মত।

এই নির্জন বাড়িটায় আমাকে থাকতে হবে। এবং
নিঃসঙ্গ। শুধুমাত্র সকালসন্ধ্যায় সূর্যরশ্মি
পায়রাগুলির পালক জড়িয়ে
ঘুলঘুলি পার হয়ে আসতে পারে যেন। চুনকামের গন্ধ সরিয়ে।

আর কিছু নয়।

পাখিরা ঘুম যায়

আমার বুকের কাছাকাছি কে যেন
নির্জন দুপুরে খেলা করে। সেসময়
পাখিরা ঘুম যায়।

পাখিরা ঘুম যায়। সেসময়
মাছেরা জলের ওপর ঘাই মারে। ছলাৎছল
ছলাৎছল, সারা শরীরে মৈথুনের
উপলব্ধি হয়।

উপলব্ধি হয় যেন নির্জন দুপুরে রমণীরা
নিটোল স্তন দুটি রৌদ্রে মেলে ধরে,
সূর্যরশ্মি গুড়ো গুড়ো হয়ে রমণীদের শরীর জুড়ে
ফাল্গুনের অলসতা এনে দেয়।

মাছেরা জলের ওপর ঘাই মারে। পাখীরা ঘুম যায়,
নির্জন দুপুরে কে যেন আমার
বুকের কাছাকাছি খেলা করে।

চিরদিনের

কাল রাত্রে আমি ভুবনের বাড়ি যাবো ভেবেছিলাম।

ভাবনার মুহূর্তমধ্যে আমি
ভুবনদের হলঘরে পৌঁছে গেলুম।

হলঘরের মাঝখানে ডাইনিং টেবল্,

হরেকরকম মজাদার খাবার। তার চারপাশে
বসেছে লাল নীল বেগুনি সবুজ মৌমাছিদের মেলা।

তাকিয়ে দেখি ভুবনের আলমারি থেকে
বইগুলি সব একে একে নেমে আসছে। আমি
নির্বোধের মত ভুবনের দিকে তাকিয়ে।
একটি টকটকে লাল-বাঁধানো বই
আমার সামনে এসে মাটিতে মেলে ধরলো শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা।
বললো, ছাখো তো কিছু বুঝতে পারো কিনা।

কালো অক্ষরের পরিবর্তে আমি স্পষ্ট দেখলুম,
অনিন্দ্য নারীদেহ,
পুরুষের বুকে মাথা রেখে বিশ্বস্ত ক্লান্তিতে।

বেলা বহে যায়

(অগ্নি-কে)

এমনি এক একটা দুপুর যায়।

রৌদ্র আসে যায় ছাতিমতলায়, মেঘ জমে
পুকুরপাড়ে। গা ভাসিয়ে মহিষের দল
স্নান করে দামাল শিশুর মত।

এমনি এক একটা দুপুর যায়

ঘণ্টা বাজে স্কুলবাড়িতে, নারকোল গাছের আড়ালে
গড়ানো সূর্যের আলো, হলুদ প্রজাপতি
নীলমণিলতার আড়ালে গা-ঢাকা-দেওয়া, এই সব
আরো সব দুপুর-গড়ানো বিকেলে।

এমনি যায়, দুপুর বহে যায়।
ট্রেণের হুইস্‌ল্‌, মাঝ-স্টেশনে আচমকা
এঞ্জিনের ধুয়ো-ঝাড়া। উড়াল বকপাখির অথৈ শূন্যে
আলগা গা-ভাসানো, এই সব
জীবনাযপনের খেলা-খেলা।

এমনি এক একটা দুপুর যায়,
বেলা বহে যায়।

আমন্ত্রণলিপি

এসো, আমরা সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে
চৌরাস্তার মোড়ে
যে যার পথ হেঁটে যাই।
সার্কাসের লাল-নীল মুহূর্তগুলি
গাছগাছালির অন্ধকারে
বহুদিন নিঃশ্বাস নিতে পারবে। আমরা ততক্ষণ
আর এক সীমান্তে।

হয়তো বা আর এক চৌরাস্তার মোড়ে
সার্কাসের জন্য মশাল জ্বালাবো।

আমন্ত্রণলিপি ছাপা হবে :
বাজিকরের ইন্দ্রজাল দেখতে চলে আসুন,
এখনো কিছু জায়গা আছে।

কারপভ-করচনয় কাহিনী

কাগজে দেখছি দুটি মানবসন্তান আজ প্রায়
এক মাস হ'ল দাবার ঘুঁটি চেলে যাচ্ছে। ক্রমাগতই
ফিরতি খেলা হচ্ছে। কী যে প্যাচ, কোথাকার
ঘোড়া কোথায় যাচ্ছে, হাতি অথবা রাজা স্বয়ং
এদিক ওদিক নড়ে চড়ে বসছে। অথচ
দেখুন একবার, কেউ হঠবার পাত্র নয়।

বস্তুত হার-জিৎ কোনটাই ঘটনা নয়। শুধুমাত্র
ঘটনা হচ্ছে
হাতি ঘোড়া এবং পদাতিক
সবাই মিলে উন্মুক্ত প্রান্তরে
যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে। গাছ-পিঁপড়ে কাঠ-পিঁপড়ে
কিছু উড়ন্ত ঘাস-ফড়িং
সবাই মিলে নিরাপদ আস্তানা থেকে
এই সব খেলা দেখে বৌ ছেলেমেয়েদের কাছে
রাত্রিবেলা মজাদার গপ্পো বলছে।

বাঁশিওয়ালা

আমার লেখার টেবিলের ওপর বসেই, কী আশ্চর্য গ্যাখো,
একটা বাঁশিওয়ালা সুর ধরেছে। সেই সুর
যা শুনলে মুহূর্তে
সমস্ত গা গুলিয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে, যেন
মন্ত্রপুতঃ সাপটি হেলেদুলে তার প্রচণ্ড ফণাটি
বাঁশিওয়ালার দিকে মেলে ধরেছে।

বাজাও, বাঁশিওয়ালা বাজাও।
আমার শীতল শরীরের ধমণীতে
আমার বিষমন্ত্র যেন ওঙ্কারধ্বনিতে পরিণত হয়। বাজাও

এরা দুজন, এই বাঁশিওয়ালা আর সাপটি
কী জ্বালাতন করছে আমার লেখার টেবিলে। কবিতা
লিখতে দেবে না মনে হচ্ছে। শুধু শুনছি। শুধু দেখছি
সাপটির আদর, বাঁশিওয়ালার আদর। যেন বিশ্বভুবন
ওদের সঙ্গে মাখামাখি। যেন আমি, আমার কলম,
আমার সব কিছু অবান্তর। শুধু
ওরাই দুজন।

বাজাও, বাঁশিওয়ালা বাজাও।

সমুদ্র কাছে এসো

আমার বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা থেকে
সমুদ্র দেখতে পাই, অনুভব করি

এর আয়তন, গাঢ় নীলিমা এবং
বিস্তার।

এই বারান্দায় বসে উন্মুখ ঝাউগাছের শিহর এবং
সমুদ্রকন্যাদের মৈথুন দেখা যায়।
দেখি ধীবরদের নগ্ন উল্লাস।

এসব কথা, মনে হতে পারে, দিবাস্বপ্ন।
কিন্তু আমি অনুভব করি
আমার স্নায়ুর উত্তাপ এবং
লক্ষ্য করি ধমনীর ভিতর
রক্তকণিকার দ্রুত সঞ্চার।

সমুদ্র কাছে এসো। তোমার ঊর্মিরাশি
আমার বালিশে বিছানায়
কিছু শঙ্খমালা উপহার দিয়ে যাক।

অর্থহীন সংলাপ

আপনি কি আমাকে চেনেন, অথবা
আমিই কি আপনাকে সুস্থির জানি! অথচ দেখুন,
আমরা তো একই বাড়িতে, পাশাপাশি ঘরে
দীর্ঘ যৌবন কাটালুম।

আয়নায় তাকালে আমার মুখে ভাঁজ দেখতে পাই
আপনার মুখের কালো রেখাটি

একান্ত দর্পণে আপনিও দেখে থাকেন।
আমরা বয়সে বাড়ছি—একই সঙ্গে, একই
বাড়ির পাশাপাশি ঘরে।

অথচ আপনি কি সত্যি আমাকে চেনেন?
আমিও কি আপনাকে, আজও!

এসব প্রশ্ন এবং তার উত্তর বরং জমা থাক
উত্তরপুরুষের জন্য।

অনন্ত বাসরে যাবো

কন্যা তোকে যৌবন দিয়েছি
দিয়েছি অতুল রূপরাশি।
তোকে পুরুষ দিয়েছি
সহবাসে যার
যৌবন উদ্বেল হবে।
কন্যা তোর শরীরের ভাঁজে
অম্লান মিথুন-মূর্তি, তোর
শিশুর আদল
প্রপিতামহের মুখে।

কন্যা তোর মুখশ্রী এবার
সমুদ্রমন্থিত
কল্যাণী লক্ষ্মীর।

এবার আমাকে ছুটি দে, আমি
অনন্ত বাসরে যাবো।

বাড়ি-ফেরা

(অনুপ -কে)

মাঝরাস্তায় প্রায়শই আমার
হোঁচট খেতে হয়।
ছোট বড় গর্ত ; ঝোড়ো হাওয়ায়
নিশ্চিত ঠাহর পাইনে, কোথাকার পথরেখা
কোথায় মিশেছে, কি
একান্তই মেশে নি। হয়তো বা খানাখন্দের পাড়ে
বেতগাছের, কাঁটালতার ঝোপে গিয়ে
ঢাল জমেছে। আমার
সময় বড় কম। তাই তাড়াহুড়ো, তাই
হুদ্দাড় এলোমেলো পথ-চলা, তাই
কিছু টের পাই নে।
পড়ি-মরি করে ছুটতে থাকি
যেখানে যাব-বলে-ভাবছি-সেই নিশানার দিকে।

পৌঁছুতে পারি না তবু। ঠিকমত। ঠিক সময়ে।

ফেরবার পথে পা দুটিকে টেনে টেনে চলি ;
যদি লক্ষ্যে পৌঁছুতে নাই পারি, পেছনে
হাঁটতে হাঁটতে একসময়
বাড়ির দরজায় ফিরতে পারবো।

আকাশকে নানাভাবে দেখতে চাই

আমি আকাশকে নানাভাবে দেখতে চাই। এবং
বিভিন্ন সময়ে। কখনো মধ্যরাত্রে ছাদে

চিৎ হয়ে শুয়ে, কখনো নিঃসঙ্গ দুপুরে
পশ্চিমের জানালা থেকে। ধু ধু প্রান্তরের মাঝে
দাঁড়িয়ে থেকে আকাশকে অন্যভাবে দেখা যায়,
বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের ভালোবাসায়।
মাঝ পদ্মায় স্টিমার থেকে কৈশোরের
আকাশ দেখা। এবং
বিভিন্ন বয়সে।

ইদানিং আকাশকে আমি ঘরের চৌহদ্দির
মধ্যে দেখতে ইচ্ছা করি। বলি,
তুমি আমার কাছে এসো, বিছানায়
ব'সো, আমার আতপ্ত শরীরে তোমার
লাল টকটকে শাড়ি বিছিয়ে দাও।

আকাশ ভাঙ্গার মুহূর্তগুলি

এই মুহূর্তে মনে হ'ল টেবল্‌-ল্যাম্পটা ভেঙ্গে
টুকরো টুকরো হয়ে গেল,
ভাঙ্গবার মুহূর্তে এক একটা সরু
বিদ্যুৎরেখা আমাকে চারিপাশ থেকে
ঘিরে ধরলো। আমি
তার আবর্ত থেকে কিছুতেই আর
বেরুতে পারছি না।

সম্ভবত এইরকমই হয়, ভরসন্ধ্যের
পূর্বমুহূর্তে আকাশ এমনি করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়

অস্তসূর্যের মেঘেরা
ছিন্নভিন্ন হয়ে হালকা নীল ঈষৎ রক্তিম বা
কোমল গোলাপী আভায় ভালোবাসা বিতরণ করে।

টেবল্-ল্যাম্পটার ভাঙা কাঁচগুলো
সযত্নে রেখে দিয়েছি। হয়তো কোনদিন
আকাশ ভাঙার মুহূর্তগুলি
আমাকে কেউ উপহার দিতে পারে।

দীর্ঘ উপমা

তার মুখশ্রীতে মেঘবর্ণ প্রাসাদের ভাস্কর্য
তার শাড়ীর আঁচলে যৌবন খেলা করে
বক্ষোবাসে উদ্দাম হাওয়া বহে যায়।
আমি তাকে চিনতে পারি নি।

তার চিবুকে কর্ণমূলে, ওষ্ঠের
ঘন সান্নিধ্যে বিদ্যুৎরেখা, তার
বহুবল্লভা হৃদয় নিংড়ে এই যৌবন
দ্রুত যায়, দ্রুত বহে যায়।
আমি তাকে চিনতে পারি নি আজও।

তবু তার যৌবনকে ভালবাসতে সাধ যায়
তার বহুবল্লভা হৃদয় নিংড়ে
কি সুখ কি দুঃখকে নিজের কাছে বন্দী করে রাখি।

আমি তাকে আর চিনতে চাই না। কেননা জানি
তার দুরন্ত যৌবন আমারই বাসনার কোন
দীর্ঘ উপমা।

কুমারকিশোরকে মনে পড়ে

মাঝে মধ্যেই আমার মুখ বদলে যায়,
নাক চোখ ভুরু ওষ্ঠ সব কেমন অচেনা মনে হয়
দর্পণে ছায়া পড়লেই
কেমন দূরত্ব ঘনিয়ে আসে।

সম্ভবত সেই কুমারকিশোর বয়স থেকেই
এরকম হয়ে আসছে। সম্ভবত
শৈশবের হাতছানি
ফিরে ফিরে ডাকছে।

দর্পণে তাকাতে বড় ভয়। বড়
উতল দীর্ঘশ্বাস। হায়, আমার সেই
কুমারকিশোর!

দেবতা জানেন

আমার দেবতা জানেন, আমি
আজো পর্যন্ত কোন খেলায়

জিততে পারি নি। সেই
বালকবয়স থেকে আমার
পিছনের সারিতে বসবার আসন।
সেই কৈশোর থেকে বৃথা স্বপ্ন-দেখা।
সেই যৌবন থেকে পরাজয়ের স্মৃতি
আমি বহন করে আসছি।

আমার দেবতা জানেন, আজ আমার
যাবার লগ্ন এলো।

এই মুহূর্তে আমি একটিমাত্র খেলায় জিতেছি, আমি
আমার দেবতাকে বুকের মধ্যে স্থির
দেখতে পাচ্ছি।

আমার দেবতা।

নিছক স্বপ্ন

দ্রুত বাড়িটা পার হয়ে চলে যাচ্ছিলাম, বারান্দার
দিকে না তাকিয়ে। যা ভয় করছিলাম ঠিক তাই, কিছুদূর
এসে পিছন থেকে ডাক শুনলাম, আপনাকে
যে ডাকছে !

এ ডাক ফেরাবার সাধ্য নেই আমার জানতাম, রাহুগ্রস্ত
যেন, টিমিটিমি পায়ে সেই বাড়িটার
সেই বারান্দার সেই দেওয়াল-বেয়ে-ওঠা আশ্চর্য গাছটার
কাছে দাঁড়ালাম। আসুন। দরজার-আড়াল-করা

কপাট থেকে সেই বীণানিন্দিত কণ্ঠের
ধ্বনি। কে যেন আমাকে হাত ধরে ধরে
সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিয়ে গেল। দরজার
কাছে এসে দাঁড়ালুম, সেই মেহগনি রঙের
বর্মি টিকের পোবাকী আলমারি, ছায়া পড়ছে
দুজনার, একসঙ্গে, যা একদা আমাদের
কত স্মৃতির গল্প হয়ে আছে আজও।

আসুন। ঘরে ঢুকতেই সমস্ত রক্ত যেন দ্রুত
শিরার ভিতর যাতায়াত শুরু করল, যেন ট্রেনের হুইসল্, যেন
এঞ্জিনের ঘটা-ঘটাং শব্দের ব্যস্ততা। সেই আশ্চর্য সুন্দর
সেই স্মৃতিগন্ধবহ ঘরের উত্তরে দক্ষিণে দুটি সুঠাম পালংকে
দুটি দেহ স্থবির। দেহ নয়, স্পষ্ট দেখলুম দুটি অপছায়া
শবাসনে স্থির। ঝকঝকে দাঁত, কান, ইন্দ্রিয়ের
শীতল আরাম। আসুন। সে যেন ভয়-তাড়াবার
মন্ত্রধ্বনি আমার।

যে গোপন ঘরটিতে আমরা বিশ্ব থেকে পৃথক
হয়ে সময় চুরি করে নিতুম সেখানে
যাবার কথা হল। তার সেই শীতল হাতে আমার
তপ্ত হাত রাখতে বলল।

মশারি ছিন্নভিন্ন, জানালার বিলাসিনী পর্দায়
চিড় ধরেছে, পুরনো অয়েল-পেন্টিঙ্
এখনো স্থির। বসুন। আমার
স্নায়ু, শরীরের প্রতিটি রক্তকণা, সমস্ত
স্বেদবিন্দু উত্তাল।
তারপর আমার কিছু মনে নেই।

কমলেশ চক্রবর্ত্তী

প্রথমা রাধা

কেউ দূর থেকে পরিত্রাহি ডাকে
এই নামে ; অনেকদিন শুনিনি
শুনলেই চমকে উঠি বিভুঁয়ে
রাধা-রাধা—ট্রেণের বাঁশীর শব্দে
নাম কাঁপে বিশাল আকাশ জুড়ে
নিচে শাখায় শাখায় ছায়াদের খেলা
খুঁজে পাওয়া ভীষণ কঠিন কারণ
জামাটা ময়লা, চুলে মর্মরিত পল্লবের
ধূসরতা অথচ লুকানো নেই—হয়নি প্রতীকী

ইস্টিশনে থামা ট্রেন ছাখে
বিস্ফারিত স্ফটিকের মতো চোখে

তবে কি আমিও নেমে যাবো ট্রেণ থেকে
খুব নিচু হ'য়ে সবিনয়ে তার মুখ
ফর্শা রুমালে মুছায়ে—নশ্বর কোনো উপহার !

এতো ধূর্ত হওয়া সাজে না—শুধু বলা যায়—
এই গণ্ডী টেনে দিলাম বিশ্বের দিকে
সাবধান রাধা—কখনো হয়ো না পার ॥

দ্বিতীয়া রাধা

ট্রেন থেমে গেলে পাতা ঝরে যায়
কিছুক্ষণ নীরব দর্শক হ'য়ে দাঁড়ালে একেলা
দেখা হবে ছদ্মবেশী কিশোরীর ম্লানমুখ,

বনফুল, কিছু লতাগুল্ম, শ্যামল দূর্বার মঞ্জরী,
দলছুট গাভী উচাটন প্রান্তর সীমায়,
তবু একা ফিশফিশ কথা কবে তির্যক পথের রেখা
কাছে-দূরে যেখানে ভুবন তোমাকে ছুঁয়েই
চৈতন্যের সাহচর্য পায়।
প্রতিদিন ট্রেণ থামে কোনো ইস্টিশনে
অথবা তিন নম্বর গুমটির কাছে
পাতা ঝরে কিশোরীর সম্মুখে পাশে পদমূলে—
অলৌকিক এই ঘটনার পরিণতি না জেনে, সে
উদ্বেলিত হাতে বিদায় জানায়—ট্রেণ-পথ-উদ্ধারণ
যা কিছু বিরিয়া আছে চরাচর
যা কিছু পেছনে রেখে যেতে হবে—
সমর্পিত সকল আশ্রয়।

অসুখ

আমার হয়েছে এক গভীর অসুখ
আরোগ্যের অতীত যা—
রক্ত নাকি বুকের ভিতর উৎফুল্ল কীট
যাদের আমিও ছদ্মবেশী মৃত্যু ভেবে হয়েছি প্রগাঢ়

যৌবন বস্তুত সোনার কপাট
পেছনে উঠোন জমকালো প্রাচীন প্রাসাদ
অর্গলমুক্ত গবাক্ষ বিনিদ্র ইশারা
উধাও দিগন্তে—
কবে সেই পথে হেঁটে যেতে যেতে নিঃশব্দে মসৃণ
বাঁশের বিবর্ণ পাতা দেখেছিলাম

আসলে তা ছিলো আমারই অতীত
ইচ্ছা অনিচ্ছার অবতীর্ণ দিনরাত্রি
যুগল সর্পের খেলা ছোটোবেলার চোখে
নতুন বস্ত্রে তার চিহ্ন ধরে রাখা
অথবা যা কিছু প্রাপণীয় সব ভুলে
গভীরে গভীরতর রোষে গোপন অসুখ
ছদ্মবেশী মৃত্যু ভেবে প্রগাঢ় যৌবনে
পৌঁছে গিয়েছিলাম নিঃশব্দ বিকেলে।

জন্ম : ১৯৩৮, বর্ধমান। প্রথম কবিতা অধুনালুপ্ত উত্তরবঙ্গ পত্রিকায়, নাম মনে নেই। কোন কাব্যগ্রন্থ নেই। একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছে আছে।

সুশীলকুমার গুপ্ত

শীত

পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, মাথায় উত্তাল
রঙিন বোঁচকায় বাঁধা সোয়েটার শাল।
সুদূর কাশ্মীর থেকে কলকাতার ঘরে
উষ্ণতা বিলিয়ে যায়,
তবু তীব্র জ্বরে

কলকাতা কাঁপছে রাত্রিদিন।
পারো যদি আন তবে, নির্মম কঠিন
সে উষ্ণতা যাতে গ'লে শীত
ফুলের বন্যায় মোছে করুণ অতীত,
মানবিক উষ্ণতায় করে জড়াজড়ি
সভ্যতার জীব,
মিথ্যা হানাহানি মৃত্যুর প্রহরী।

অধিকার

কেড়েছো মরার অধিকার।
আরও কত শাস্তি আছে,
হে সভ্যতা, বল এইবার।
ভিক্ষা করা অপরাধ,
খুঁটে খাওয়া মানা,
আভিজাত্য সুরক্ষায় আছে সান্ত্রী থানা।
ক্ষুধারোগে মারবে তুমি আইন মাফিক,
জীবন-যৌবন কিনবে বিনামূল্যে
কালের বণিক।
তুমি মারলে নেই কোনো দোষ;
ধর্মাধিকরণ আছে,
তদন্তের নকশা-কাটা সোনালী পাপোশ।
তা'তে জুতো মুছে ঢুকবে ঘরে,
প্রশংসার পাখি ডাকবে
বেতারে খবরে।

হে সভ্যতা, তুমি বন্দী আজ
আমারই মতন,
বল কিভাবে বাঁচাবে
রুগ্ন সংসার সমাজ।

আকর্ষণ

নেই তার কোনো আকর্ষণ,
কণ্টকিত সময়ের শীতার্ত শয্যায়
প'ড়ে আছে মৃতের মতন।

নিহত বিশ্বাস,
চূর্ণ স্বপ্ন,
চ্যুত প্রেম ;
সে মহান শতাব্দীর করুণ শিকার।
মধুপেরা ফিরে গেছে,
দেহ জুড়ে লোভের প্রহার ;
সংসার নিয়েছে তুলে
শোণিতের হেম।

সভ্যতার সহোদরা ভুলের পুতুল
কি ক'রে প্রতিমা হবে ?
রক্তময় ফুল
ফিরে পাবে নক্ষত্রের মূল ?

সুশীলকুমার গুপ্ত। জন্ম ১৯২৬। জন্মস্থান হুগলী জেলার তারকেশ্বরে। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'রাত্রিশেষে' অধুনালুপ্ত ছোটদের 'মাসপয়লা' মাসিক পত্রিকা (মাঘ ১৩৪৪)-য়। কাব্যগ্রন্থ "রৌদ্র-জ্যোৎস্না' (১৯৫১), 'আলোর আকাশ' (১৯৫১), 'কবিতা, তোমাকে' (১৯৭৭) ও 'Most Beloved' (1979)। কাব্যনাটক 'সমান্তরাল'।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

শুধু-ই বিষাদ সাক্ষী

শুধু-ই বিষাদ সাক্ষী
শুধুই বিষাদ
হে আমার অমল প্রতিমা।

কতোই যে জ্বলে গেল জীবনের খাণ্ডব-দহনে

কাকলীমুখর যতো ছায়াগুলি অগম গহনে
যতোদূর নিভৃতির সীমা—
শুধু-ই বিষাদ সাক্ষী, শুধু-ই বিষাদ!
শুধু সেই মুখরেখা, অমলিন, মরে না, মরে না……
এ যে কোন্ শ্বেতপদ্ম, পাপড়ি কি কখনও ঝরে না,
সে কিশোরী অমল মহিমা।
কতোই সহজে সব চলে গেল, কতোই সহজে
এই কান্না, অধরে ধরে না।
শুধু-ই অন্ধার হয় অস্থি-শিরা-পেশীর প্রাসাদ
আমার তো কথা নেই, কী নিরর্থ বাদ-প্রতিবাদ
শুধু-ই বিষাদ সাক্ষী, শুধু-ই বিষাদ
রে কাল নিষাদ
হায় স্বপ্ন বিস্ময় গরিমা॥

আলাদিন, ওরে আলাদিন

পাথর সরিয়ে দাও, পাথর সরিয়ে দাও, পাথর সরিয়ে দাও, আমি
শুধু শ্বাস নেব শুধু, শুধু একবার শ্বাস! যাদুকর ওরে যাদুকর—
তোর হাসি কী দারুণ! পিশাচেরও চোখে জল, অথচ কী অবিচল তুই!
সমস্ত জীবন তোর করতলগত ফল,-বিনিময়ে এ কোন্ প্রদীপ?
কখনও জ্বলে না আলো, মলিন বিবর ছেড়ে উঠে আসে ধূমল দানব
কেবল-ই আদেশ দাও, কেবলই আদেশ একি। শুনি এই অসহ্য আদেশ!
পালঙ্কে প্রতীক্ষা করে সমস্ত রজনি-যাম ভাষা-নেই-সম্রাট দুহিতা
দলিত দেহের স্বাদ নিয়ে ফিরে আসি স্বেদে স্নান করে গ্লানির গভীরে
কেবল-ই আদেশ দাও, কেবলই আদেশ দাও, ক্ষমাহীন ধূমল দানব!
সম্রাট প্রতীক্ষা করে, দাস দাসী কোলাহল, আর আমি শুনি সারাদিন
এ কোন্ পৃথিবী তোর চারিপাশে এলোমেলো,…আলাদিন ওরে আলাদিন

কে তোর জীবন কেড়ে, এ-ভাবে ছড়ালো পথে, ভেঙে দিল ধূলোর ওপর
বিনিময়ে একি দীপ! কখনো জ্বলেনা আলো। একি দীপ ধাতু না পাথর
মা-র ছেলে ঘর ছেড়ে, বেলা যেত পথে পথে, বিকেলে আকাশ ঘুড়ি, পরে—
মায়ের হাতের-স্বাদে-মাখাভাত মুখে আর মায়ের নিবিড় গাঢ় স্বরে
কোমল ঘুমের তাপ। সে কোথায়- সে কোথায়? চারিপাশে ভাঙাচোরা দিন
মাথায় কি ঝিঁঝি ডাকে, কে যে সারাদিন ডাকে, আলাদিন ওরে আলাদিন
কে তোর জীবন কেড়ে এমন প্রদীপ দিল, আলো যাতে কখনো জ্বলে না।

সময় সময়াতীত

প্রাকার-পরিখা চিহ্ন, দরোয়াজা গম্বুজ মিনার
শাহ কি সম্রাট কেউ ছিলেন, এ-বিশাল চত্বরে
এখন ট্যুরিস্ট ঘোরে, বীরপুঞ্জ শায়িত কবরে
চারিদিকে ধুধু মাঠ···ইতস্তত শূন্য জলাধার।

কতোটুকু চোখে পড়ে তোমার চতুর কামেরার।
কতোদিন সঙ্গে রহে ভ্রমণ কি রমণের স্মৃতি?
ফাঁপানো চুলের কূলে বাতাসের পরকীয়া প্রীতি।
পৃথিবীর জপমালা আবর্তিত শুধু বারবার
সময়ের শবাসনে উদাসীন ধ্যান করে কার?
শালিখ ওড়ায় ধূলো, কাঠবিড়ালীর ছুটোছুটি
এই নিয়ে সারাদিন খেলা করে পরমা প্রকৃতি
এবং নক্ষত্রপুঞ্জ, আকাশ বিস্তৃত অন্ধকার॥

জন্ম ১৯৩১ কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'সমুদ্রের প্রতি', প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বাতাবরণ। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ আলাদিন, ওরে আলাদিন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভালবাসার ভুবন আমার চোখের জলের ভুবন
কারা যেন চোখের জলকে অপবিত্র বলে
তার পাপ লেগেছে তোকে, পাপ লেগেছে আমার কবিতায়

যাদের আছে তিনটি লেজ তারা কেমন আগুন হয়ে জ্বলে,
পবিত্র হয়। সেই কবিতা লিখতে গিয়ে আমি
ঘুরেছি মহাভারত—পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে, কুরুক্ষেত্রের
ধর্মযুদ্ধে, গিয়েছি দ্বারকায় ;
দেখেছি যুদ্ধে আগুন আছে, নেই শুধু সেই পাঁচটি
গ্রামের ধর্মীয় ভূস্বামীর

রাজা হওয়ার স্পর্ধা। চোখের জলে কর্ণের শীতল দুটি পা
ধুয়ে দিচ্ছেন রাজাধিরাজ—ধর্মেও সেই পাপ লেগেছে, ভুবন,
কবির আদিম পাপ।

৭ জুলাই ১৯৮১

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

'এক্ষুনি রোদ্দুরের দল এসে
ব্যারিটন শুরু করে দেবে'
বলল কেউ 'তোমরা এখন
যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে,'—
শুনে কিন্তু কেঁপে উঠল খুব

যারা এইখানে এতক্ষণ
রোদ্দুরেই গান গাইছিল
কিন্তু তারা কোনো দল নয়,
বন্ধু তাই মানদণ্ড জানে
তাই বুঝি একরঙা রোদ্দুরের দল
তাদের ভীষণ সাজা দেবে।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ঘুনের মতো একা কাঙাল

কে দোলাচ্ছ রাতের কালো গোলাপটাকে!
আমি তো হাত পেতেই আছি হাওয়ার বাঁকে-
একটি দুটি গন্ধ দিও খোঁপা খুলে।

গন্ধগুলো বাজিয়ে সুরে রাত ফুরুলে
চলে যাব গরঠিকানা শতচ্ছিন্ন—
অভিমান বা বিরহ নয়, নয় অচিহ্ন,

শুধু অমোঘ ঘুনের মতো একা কাঙাল
পেরিয়ে যাব সমাজবিধি সুখের নাগাল॥

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতা-ঝরার দিনে

জ্বরের ঘোরে পাতা-ঝরার শব্দ শুনি
মন-ছুঁই ঝড়ের বাতাসে।
বলেছিলে

পাতা-ঝরার দিনেও পাশে থাকবে
বাতাসের মন-ছুঁই আঁচলে
জড়িয়ে।
অথবা নতুন পাতায় নতুন ফুলের
সাবেকি গন্ধ ফুটতেই
রিক্ত ভাল।
রিক্ত আমার মুকুল-ছুট প্রাঙ্গণ
তোমার নাগাল-ছুট চিন্তায়
বিজড়িত।
গাছের আড়াল থেকে গাছ তো সরে না
বৃক্ষ-ছুট শাখা তো মরে না, তবু
বলেছিলে।

১ কার্তিক, ১৩৮৪

একটু কাঁদুক

দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে—
রাস্তার মোড়ে বাঁক নিয়ে
চলে গেলে—
আকুল হাত-নাড়া, মেঘলা চোখ।

আহা, একটু কাঁদুক—
কান্না না হলে বুকের আকাশে
তারা ফোটে না।

২১ বৈশাখ, ১৩৮৪

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

ইচ্ছা

[লোরকা থেকে]

কেবল তোমারই হৃদয়ের উষ্ণতা, আর কিছুই না।
আমার দেবোদ্যানে কোনো কোকিল নেই, নেই বীণার স্বর,
মহতা নদীর সঙ্গোপনও আছে একটি ছোট ঝরনার।
নেই বাতাসের বর্ষা মুকুলিত পত্রে, হয়না এক্ষণে পাতা ঝরামর্মর
মহতি আলোকে জোনাকি জ্বলিবে পরস্পরে
মাঠে বিনিময় ভাঙা চাহনির।
এক পরমা বিশ্রান্তি, সেখানে আমাদের চুম্বন রণিত
কথার প্রতিস্বরে হবে নিবারিত দূরত্বের
এবং তোমারই হৃদয়ের উষ্ণতা বিনা কিছু আর না।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

তোমার স্পর্ধা

তোমার দীপ্ত অহংকারে আমার কথা ছত্রখান হয়ে যায়,
কথারা নতজানু হয়ে শব্দের সম্ভার
তোমাকে নিবেদন করে,
তুমি শুনেও শোনো না ;
শুধু দু' চোখ ভরে ঘৃণা
ছড়িয়ে দিতে দিতে চলে যাও হাওয়ার আড়ালে
হাওয়ার আড়ালে আরও হাওয়া
ঘৃণার দহনে জ্বলতে জ্বলতে
একদিন প্রতিদিন

নতজানু শব্দপুঞ্জ
ভিতর থেকে ভালোবাসায় উড়ে উড়ে যায়

তোমার চারপাশে আমার কথা, কিছু সংলাপ
টুকরো ভাবনা

একদিন প্রতিদিন জলতে জলতে
ভিতরে ভিতরে ভালোবাসায় সোনা হয়
তোমার দীপ্ত অহংকারে কথারা তবু থেকে থেকে
নতজানু
তুমি তবু ঘৃণা ছড়িয়ে দাও
এবং যতই ঘৃণা ছড়াও, ততই আমার শব্দপুঞ্জ
তোমাকে খুঁজে খুঁজে গভীরভাবে স্পর্শ করে,
তোমার স্পর্ধা
আমাকে ভালোবাসতে শেখায়।

কালীকৃষ্ণ গুহ

অপেক্ষা

সারাদিন তার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকি, সিগারেট খাই।
সে যখন আসে, একটিও কথা বলতে
পারি না—
সিগারেটের প্যাকেট শূন্য, অবিন্যস্ত চুল

চারদিক হাহা শূন্যতা.........

বাসুদেব দেব

সেই গেলাশ

এই সেই গেলাশ কোন আঙুলের ছাপ নেই
কোন পাপ নেই কোন পানীয় নেই
কোন শোক নেই কোন স্মৃতি নেই
ঝকঝকে, প্রথম, যান্ত্রিক, কম্পাশহীন

হেমন্তের নরম বালিশ ঘিরে এখন বাদামি হাওয়া
মানুষজন চলে যাবার পর
আবছা অন্ধকারে পতঙ্গদের ঘোরাফেরা
সবাই চলে যাচ্ছে একে একে, এরকমই নিয়ম
বেহায়া বলীয়ান সেই গেলাশ
ঘরের শূন্যতার মধ্যে
উৎসব
সেই গ্রাম্য ব্যাকুল ঠোঁটের অস্ফুট দুঃখ, বাঁশবাগানের ছায়া
আর খুব কাছে নারী তোমার ঘামতেল মাখা
মুখের ঢল, আবেগমাখা কাঁপন,
আমার শ্রাবণ

বুক পুড়ে যায়, শহর পোড়ে, ওড়ে ধুলো ঝড়, বৃষ্টির চাবুক
মানুষজন চলে যাচ্ছে একে একে, ফেলে যাচ্ছে, এ রকমই নিয়ম
কেবল সেই গেলাশ…একা…কেবল সেই গেলাশ

শান্তিকুমার ঘোষ

রেলগাড়ী চলেছে

রেলগাড়ী চলেছে সূর্যোদয়ের বিপরীত মুখে
মেঘ ছেয়ে আছে নীলা আকাশ

আরো নিবিড় গোটা পাহাড় থেকে সানু
পাতাহারা গাছ,—তরুর ভেতর
শুধু পলাশের রক্তিমা

মানুষের হাতের স্পর্শে সেজে উঠবে ওই খেত-জমি
নতুন-ছাওয়া কুটির
নামবে তাদের জন্য
দেব-করুণা

কেতকী কুশারী ডাইসন

যেমন শোবার ঘরে

যেমন শোবার ঘরে কচি বাচ্চা কেঁদে উঠলে
রান্নাঘরে মায়ের বুকে
ব্যথায় দুধ নেমে আসে,

যেমন দুধ দোয়ার আগে
ভরা বাঁট টনটনায়,
সারি সারি, আতুর, ডাকে গাভীরা,

তেমনই ব্যথা দেয় আমাকে
আমার সব কাজে
দিনে রাতে আমার ভালোবাসারা।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রার্থনার ইচ্ছা

দুটো হাত জুড়তে চেয়েছিলুম

বাড়ি ফিরলে আলো নেই
একটা মুখের সঙ্গে আরেকটা মুখ
তার সঙ্গে আরেকটা মানে একটাই মুখ

এই কিনা দিনের আলোয় দেখাদেখি—
যখন ঢালি লাল
গেলাসে পড়লেই সাদা

যেখানে যেখানে হাত
কাঁটাতারের বেড়—
ভোঁতা পিন নিয়ে
গ্রামোফোনের রেকর্ড ঘুরছে—

দেখার মুখ ছোঁয়ার জল
এবং এইসব খুঁজতে খুঁজতে
দু হাত জোড় করার চেষ্টা—

প্রার্থনার অন্ধকার তো পাওয়াই গেল না

মানসী দাশগুপ্ত

বৃক্ষের মতন

কেন যে এমন একা-একা লাগে অথচ
সবাই চেনা ; সবই চেনা। গলির ভিতরে
জলে ভিজে কালো পাতা, কালো, কিন্তু সবুজ তো ছিলো ?

তা নইলে পাতা আর কী রকম হয় ?
হেঁট মুখে যেতে যেতে মুখ তুললেই অন্য চোখে ছায়া
দেখি আঁকা মুখ, রঙীন, বানানো,

কথা বললে চমকাই : কে ডাকে এবং
কেন ? এ তো সে গলার স্বর নয়—যে গলার গানে
'নতুন ফাগুনে যবে' ফিরে ফিরে গুঞ্জরিত কলি

বেজেছিল, বেজে উঠেছিল।

তবু ডাকে, নিশি ডাকে
'প্রতিশ্রুতি, পথ হারিয়েছ ?'

যখন আসবে রাম, দৃষ্টি গেল, দেখতে পাবো না।
তুমি যে তুমিই ছিলে, না-জেনেই চলে যেতে হবে।
যে তোমার প্রতীক্ষায় ঘামে ঘামে রোমাঞ্চ শিশির
অশ্রুর মতন জমে যেন সে আমার চোখ
জল ভরে রেখে দেয় পা দুটি ধুইয়ে দেবে বলে—
সে চরণরেখা পথে পড়লো কি ? চোখে পড়বে না।
অবশ্য তোমার স্পর্শে রোমকূপ চক্ষু হয়ে যায়,
স্বেদ দিবা চন্দনের মতো সাজে আরতি থালায়—
তুমি কী না পারো রাম !
অরাতিদমন, যুদ্ধ, অকালবোধন,
মায়াময় মিত্রতায় বরাভয়দান,—সমস্ত তোমার সাধ্য।
স্বেচ্ছায় সম্পৃত, কাঙ্খিত সুখের স্বাদ ওষ্ঠে রাখো,
পান নাহি করো। অথচ আশ্চর্য দেখো, হারানো শরৎ
ফিরে দিতে তুমিও পারো না।

পরিমল চক্রবর্তী

আলো

ঘুম থেকে উঠেই প্রথম দৃশ্য চোখে পড়লো :
অন্ধকার থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এসে আলোর শিশুরা
সারাটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে।…
তারপর কখন ধীরে ধীরে সকাল গড়িয়ে
দুপুর হ'লো, দুপুর গড়ালো বিকেলে,
বিকেল গড়ালো সন্ধ্যায়
এবং তারপর ঘনালো রাত্রি, অন্ধ রাত্রি।… …

প্রদ্যুম্ন মিত্র

অচেনায়

সমস্ত বাতাস তোমার মুখের দিকে ছুটে যায়,
একরাশ অন্ধকার ফ্রেমে আঁটা তোমার মমতা
আর্ত ঢাকে চোখ, ভুলে গেছ
আজীবন করুণাহীনতা,
আমারও মরণসন্ধি ওইদিকে বেহুঁশ হটেছে
সমস্ত দুপুর বেলা বৃক্ষ তার শিকড়ে ফিরেছে
রৌদ্রের পরাঙ্মুখী ঝড় এলো আর্ত নিশিডাকে,
চৌচির বনের ক্ষুধা ছিঁড়ে ফেলে গন্ধের জ্যোৎস্নাকে॥

জগত লাহা

গদ্য-পদ্য সম্পর্কে

আজকাল কি সব লিখছেন মহাশয়
গদ্য
পদ্য
একেবারে ঝুলঝাল—
হচ্ছে না
কিস্সু হচ্ছে না।

মসৃণ ম্যাপলিথো কাগজের ঝকমকে লাইনো টাইপে
জাগ্রত মানুষ কই?
সবাই এখন বিনিদ্রায় কিংবা নিদ্রাসীন কেন?
সেইসব শ্রমশীল যুবা
এবং মর্মগ্রাহী লজ্জাশীল নারীরা কোথায়?
সেই স্মৃতিময় প্রকৃতি
এবং প্রীতিময় ঈশ্বরকেই-বা কোথায় বিদেয় দিলেন?

আপাতত কিছুদিন ছুটি নেন:
হ্যাঁ হ্যাঁ, ছুটি নেন—লাগাতার মাস-ছয় ঠেসে ঘুমোন
ঘুম ভাঙলে আড়মোড়া ভেঙে শীতের খোলসটা ছেড়ে ফেলুন
তারপরে আস্তিন গুটিয়ে শাদা পালকের কলম বাগিয়ে
এন্তার লিখতে থাকুন—

যেমন গদ্যের অনুপ্রাসে যুবক
পদ্যের অন্ত্য মিলে নারী
আর গদ্য-পদ্যের অলৌকিক বিন্যাসে: অর্ধনারীশ্বর॥

আনন্দ ঘোষ হাজরা

পাতা ঝরে···ঝ'রে যায়

দ্যাখো পাতা ঝ'রে গেছে বিপর্যস্ত চূর্ণ মেঘ জলহীন
কৃশ ও পাণ্ডুর
পোশাকবিহীন বৃক্ষে নগ্ন শাখা ঘোরতর রাত্রির মতন
এবং বৃক্ষের নিচে সারি সারি মৃতদেহ, মানুষের এবং পশুর—
কালো শাখা প্রশাখায় ভিড় করে স্বাভাবিক অসংখ্য শকুন
এইবার ছিঁড়ে খাবে পচা মাংস তাহাদের বীভৎস শীৎকার
তাদেরই কানের কাছে মনে হবে অফুরান্ আনন্দ সংগীত।

অথচ এখানে এই বৃক্ষতলে চাষীদের হাট ছিলো, মানুষের ভিড়
সম্পন্ন শাখায় ছিলো অবিশ্রাম সশব্দ সবুজ
পাখিদের অনিবার বক্ররেখ উড্ডীন উল্লাস
তখনই হয়তো কেউ সখ ক'রে পুষেছে খেচর বাজ
হয়ত উদ্দেশ্য ছিলো কিছু
তখনই হয়তো কেউ সখ ক'রে পাখিদের অমোঘ আহ্বানে
সাড়া দিয়ে
বহু পাখি পুষেছে বাড়িতে দানা দিয়ে
চানা দিয়ে; পাখিদের রূপান্তর কখন ঘটেছে হায়
কেউ তো জানে না।

পাতা ঝ'রে যাবে ব'লে দিন যায় রাত্রি যায় মাস যায় বছর বছর
পাতা ঝরে, ঝ'রে যায়, নগ্ন হয়, কালো হয় বৃক্ষ শাখা
ম'রে যায় মানুষের দল
অজস্র শকুন এসে উড়ে বসে চেয়ে দেখে তাহাদের জলন্ত সময়
ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে শেষে কঠিন নিরেট লৌহবলয়ের মতো মনে হয়।

অশোককুমার মহান্তী

ঈশ্বরের মুখ

মুখখানি তার নিপাট ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময় কাকে যেন ভালো বেসে বেসে
সে জানে সর্বদা করুণ কাতর নেত্রে কেউ তার দিকে চেয়ে রয়
এবং সে কামনা ও কাম্য কর্মফলে কখনো স্ববাস ছেড়ে
প্রবাসের দিকে মুখ রাখে

কোথাও নিষ্পত্তি নেই, অনন্ত আকাশ হয়ে ভালোবাসা পথ ভাঙে
যতদূরে মানুষেরা হেঁটে যেতে পারে
বিজনে নির্জনে কিংবা জনতায় সাগরে পর্বতে
যেখানে যেখানে তারা ঘর বাঁধে, সেখানে সে আগেভাগে
বসে থাকে স্থির
মুখখানি উজ্জ্বল আগুন যেন, দাহ কিংবা নয়ন আরাম
নিপাট ছড়িয়ে যায় বিশ্বময় কাকে যেন ভালো বেসে বেসে

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিরোধ

চাঁদ, না চাঁদের মায়া
হলুদ নদীতে ?
লি পো তো প্রেমিক,
হাঁটুজলে ডাকিনীর ছায়া
টেনে নিয়ে গেল তাকে
অজানা পাড়িতে।

দেবতা কি অধিষ্ঠাতা
খচিত নীলের ?
খেলিস ভাবুক,
উল্টে-পাল্টে আকাশের পাতা
নক্ষত্র তাড়িয়ে শেষে
ডোবে সে কুয়োতে।

এভাবে হাতছানি ভায়
জ্ঞান ও কবিতা,
আমি, বিরোধ দেখি না
মৃত্যুর কামড় নিতে চাই শুধু
প্রেমিকার দাঁতে।

কিরণশঙ্কর মৈত্র

মা

মা, তোমাকে মনে পড়ে না
তুমি শুধু স্মৃতি ছবিতে, মালায়,
সে-ছবি ভেসে গেছে
পুব বাংলার উজানে

মা, তোমাকে মনে পড়ে না ;
শুধু দীর্ঘশ্বাস, দৌড়
চারিদিকে হায়েনা, ভালুক,
বা উদ্যত গভীর খাদ,
কখনও অজান্তে কপালে হাত রেখে
সঞ্জীবনী বিদেহী কল্যাণ কামনা।

মা, তোমাকে মনে পড়ে না—
উজ্জ্বল আলো, টুং টাং,
স্বপ্নলোক, সুবাসিত নারী ;
পিঁড়ি-পাতা ভুলে গেছি
সিঁদুর সীমন্তিনী মঙ্গল-প্রতিমা।

মা, তোমাকে মনে পড়ে না—
সাত সাগর, অন্তরীক্ষে উন্মাদনা
মৃত্যু খেলে যায় পলকে পলকে :
মোহিনী মর্মর-নারী, স্পন্দিত স্তন
জীবন ঝিলিক হানে একটি অক্ষরে

মা, তোমাকে মনে পড়ে না ॥

গোকুলেশ্বর ঘোষ

নাস্তিক

তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমি চলেছিলাম ভুলপথে
অগ্নিদগ্ধ মৌমাছি যেমন অন্ধ হ'য়ে ঘুরে মরে আপন মৌচাকে
তোমার ছলনা যদি আজো দেখে থাকে ভুল পথ
জীবনের সকল প্রয়াস যদি হয় ভস্মে ঘৃতাহুতি
তোমার প্রতিমা আমি ধ্বংস করবো আগুনে পুড়িয়ে
যে-ভাবে নাস্তিক তার ঈশ্বরকে চরম শাস্তি দেয়।

মুরারিশংকর ভট্টাচার্য

দেখি নি এমন পরাভব

দেখি নি এমন পরাভব ভাবি নি কখনো
নিজেই নিজস্ব যুদ্ধে রক্ত মেখে ফিরি
প্রতিটি সন্ধ্যায়, তবু কোন সন্ধি নেই ;
প্রত্যহ প্রত্যুষে তুমি রণক্ষেত্রে ডেকে
নিয়ে যাও।

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

অনন্বসন্ধান

এখনও তো তোর জলে-জঙ্গলে বাস
কবে গৃহবাসী হবি ?
ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকা সব শেষ
জীবনের সব ছবি
তোকে তো আমি খুঁজিই-নি তাই
গিয়েছি জলের ধারে
বালিপাথরের স্বচ্ছ আলোয় মাছেদের ঝিলিমিলি
আমাকে যখন ফিরিয়েই দিলি বারবার, তিনবারে
পদ্মপাতায় মাছেরা বলল ; হায়, কাকে খুঁজেছিলি ?

সব ছেড়ে দিলে কিছুই থাকে না বেদনার সম্বল
আমাদের কাছে খুলে বল্ তোর সবটুকু অন্বেষা
নিয়ে যাব তোকে দুপুরের কাছে ঐ দূর মেঘে মেশা
দুপুরের ঘরে জমা আছে এক নীল জলপম্বল

কৃষ্ণা বসু

আসলে নিজেই সে

আসলে নিজেই সে একটি কবিতা।
সে যে কেন কবিতার কাছে যায়!
প্রাণপণে নিজেকে মন্থন করে তুলে আনে
নোনা স্বাদ, গন্ধ, ভ্রম, অন্তহীন পাপ;
তার সমস্ত শরীর জুড়ে মেদুর কবিতা ঘনিয়েছে;
পায়ের পাতায় তার পদ্মপাতার কারুকাজ,
স্তনের গভীরে তার ডুবে আছে সমুদ্রের প্রগাঢ় বিস্ময়,
তাকে ঘিরে তাকে পেয়ে কবিতাই জেগে ওঠে,
তবু কবিতার জন্য তার ঘুম নেই।
শৈশব মন্থন করে পুরোনো কাঁথার গন্ধ,
জলে ডোবা দালানের ছবি, বন্যার সকাল,
সমবয়সীর মুখে শীতের কুলের স্বাদ,
সব সে ছিঁড়ে টেনে এনে সাজায় কবিতা;
আর নিসর্গ সাজিয়েছে তাকে
ভুরুর ভঙ্গির থেকে চিকণ চিবুক,
আঙুলের ডগা থেকে ঊর্ধ বাহুমূল,—
কবিতার মতো এই তার তরঙ্গে তরঙ্গে জেগে ওঠা,
সে যে কেন কবিতার কাছে যায়
—এ রকম ভেবে সেই যুবা
ম্লান মুখে হেঁটে গেল প্রত্যাখ্যাত আপন আঁধারে—

দীপঙ্কর সেন

নবজাতকের প্রতি

নির্নিমেষ দৃষ্টি রাখো হৃদয়ে
যে হৃদয় বনবাসী হরিণ।

সেই প্রেমে হৃদয় মেলাও
যে প্রেম নিষিদ্ধ ফল হলে ক্ষতি নেই।
বনবাসে প্রেম হোক সাথী
বনবাস নিসর্গ চিত্রের।

চিত্রে সেই সাঁওতাল-যুবক
যে যুবক জীবন-প্রেমিক।

বিমান ভট্টাচার্য

এখানে গানের চেয়ে

এখানে
গানের চেয়ে বাজনা বেশী
আলোর চেয়ে আঁধার বেশী
মানুষ না
নিন্দুক প্রতিবেশী
লজ্জার মাথা খেয়ে
করে পরচর্চা নীতি
দেশের এই রীতি
সামনে গেলে
মারবে পিছন থেকে

উপরে উঠিয়ে দিয়ে
মই কেড়ে নেবে, এখানে
জীবনের চেয়ে মৃত্যুর ভয়
কিছুটা বেশী ; প্রাণ যায় তবু
যারা গান গায় কিঞ্চিত সুখের
শোনা যায় না।

এখানে
গানের চেয়ে বাজনা বেশী।

শান্তি সিংহ

দুটি শ্লোক

১. কাল নয়, বহতা প্রেমের স্রোতে উঠে এসো আদর্শ মননে,
শিল্পে উজ্জীবন হোক।
স্বাধ্যায় চেতনা আজ বড়ো বেশী প্রয়োজন, ভয়ংকর দিনরাত
খুবলে নিচ্ছে তাজা কল্‌জে, বারুদ কার্তুজ আজ উদ্যানের বাহার বাড়ায়
এ সময় হড়কা বানের মতো প্রেম হোক, সুষুম্নায় উর্ধ্বমুখী বজ্রসংবেদন !

২. মশা মাছির মতো ভন্‌ভনিয়ে সরে যায় সহস্র মানুষ
কেয়ো কেঁচোর মতো বুকে হেঁটে বেঁচে থাকে প্রবল বর্ষায়
কিছু সামাজিক প্রাণ ঘোলা জলে খেবতে রাগিনী নাকি অর্কেস্ট্রা বাজায়
কোটিকে গুটিক লোক বুকের গুহায় খোঁজে আত্মার আলোক !

সমীর চৌধুরী

মুখ

মাঝে মাঝেই কিছু অমলিন সুখের স্মৃতি
বড়ই ভাবিয়ে তোলে আমাকে।

কোথায় যে দেখেছি তাদের, কবে যে দেখেছি
কিছুতেই মনে পড়ে না।
এখন তাকাই সেদিকে শুধু, ম্লান মুখ, বিষণ্ণ চোখ
কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেখানে
গোপন হত্যার দলিল, প্রিয়জন হারানোর শোক ;
কাটা দাগ, ব্রণ, চাপা কান্না ঠোঁটের ফাঁকে ;
মাঝে মাঝে পথ হাঁটি আর দেখি—
এইসব কাটা চেরা মুখ, অভিমানী ঠোঁট
অমলিন মুখের স্মৃতি বড়ই সুদূর অনর্থক খুঁজি—
নিজেরও মুখে বুঝি কবে যেন তার পড়েছে আঁচড় ৷

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

পাহাড়ে ঢেকেছে সূর্য

পাহাড়ে ঢেকেছে সূর্য
গুহাবাসী আগে টের পায়
পায় না চুড়োয়-ঘোরা
মৌমাছি
পন্নগ
ছদ্মবেশে নেমে-আসা
স্ফটিক চন্দ্রমা

অমল পাল

কোন দিকে

কোন্ দিকে যাবো?
কোন্ পথে গেলে, রক্তে পায়ের ছাপ পড়বে না?
কোন্ পথে, ভাই বা বন্ধুর লাশ প'ড়ে নেই?

কোন্ দিকে তাকাবো?
ওদিকে স্বৈরিণী পাড়া:
আমার সাধের বোন বন্ধক দিয়েছি।
ওদিকে চৌমাথা মোড়:
বাটি হাতে বিকলাঙ্গ পুত্রকে রেখেছি—

কোন্ দিকে তাকাবো?
বলো, কোথায় পালাবে?

অরুণা বসু

কোথাও গোপন কিছু

খুঁজতে যাবে কি দূরের
চৌরাস্তায়? না দাঁড়িয়ে-
থাকা বাসস্টাণ্ডের বাসের ভিতরে?
হেঁটে যাবে ওই পদ্মদিঘির পাড়
ধ'রে সাঁকোর ওধারে? না, খুঁজতে
যাবে নৈহাটী পার ক'রে ব্যাণ্ডেল-
চার্চের মধ্যে?

৭ কোথাও যেও না

নিরুদ্দেশের খোঁজ পাবে
তোমার ওই অন্তর কোণে
যদি থাকে, থাক আজো
একান্ত গোপনে ॥

শিশির গুহ

ভেতরে বাউল

ইচ্ছে ছিল না ফিরে আসার
তবু আসতে হোল—
সাজানো বাগান, গেরস্থালী ছেড়ে।
কি ভেঁপু বাজিয়েছ গভীর ভেতরে
কে যেন হুকুম পাঠালো
—ছাড়ো ছাড়ো সব আমার আমার
কে কার হে এই নকল সংসারে !

বড় মায়ার মধ্যে আছি—
আমার ঘরের দেয়ালে থাকতো
যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথের ছবি
রজনীগন্ধরা পা ডুবিয়ে টবে,
তোমার ভাল লাগার জন্য আমি
মাঝে মাঝে আবৃত্তি করে উঠতাম তারস্বরে।
সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি হতেই
খাবার টেবিলে মুখোমুখি
না বলা কয়েক লক্ষ কথা
বলে উঠতাম আমরা।

এর ভেতরেই তুমি ডাক পাঠালে।
যারা অক্লেশে সব ছেড়েছুড়ে যায়
তারা নমস্য, আমি পারি না
আমার ভীষণ কষ্ট হয় ভেতর থেকে
অথচ তোমার আহ্বান ফেরাতে পারি না
শঙ্খের মতন বুকের ভেতর বাজে
বাউল হয়ে মন কোথায় যায় গেরস্থালী ছেড়ে।

দীপংকর কর

প্রতিবেশী ভায়োলিন বাদকের উদ্দেশ্যে

তুমি একটি ছড় টানলে
ভায়োলিনে
দুঃখরা সব এল
আর একটি ছড় টানলে
ভায়োলিনে
দুঃখরা মেঘ হয়ে গেল
আরও একটি ছড় টানলে
ভায়োলিনে
বৃষ্টি নেমে এল
আর, আরও একটি ছড় টানলে
ভায়োলিনে
মাটি ফুল ফলে ভরে উঠল

এভাবে ছড় টানতে টানতে
তোমার ভায়োলিন
একসময় ডুকরে কেঁদে উঠল।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শূন্যতা

মেয়েটাকে যেই ছেড়েছি অ্যাকোরিয়াম জলে
সিঁটিয়ে গেলো, চমকে গেলো, উঠলো, কেঁপে ভয়ে,
অমন হিজল শরীরখানা ছোট্ট হতে হতে
ককিয়ে ওঠে, 'এমন জলে মানাই নাকি আমি ?'

তখন তাকে আবার তুলে দিলাম সমুদ্দুরে,
উঠলো তুফান, ঢেউএর কাঁপন মাতলো তাকে নিয়ে
তার সে শরীর ফাঁপলো ফুলে, ছাপিয়ে গেলো জল—
বিশাল হতে হতে তাকে পেলো না কেউ খুঁজে।

রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়

চর

মধ্যিখানে চর সৃষ্টি হয়, দেখি
এতটা দেখাও কেন নদী, বড্ড বেশি না ?
ঝর্‌ঝর্‌ করে বালি ঝরে পড়ছে, মনে হয়
তুমি সমস্ত সময় ধরে শয্যায় শুয়ে।
পাগল-করা দৃষ্টি চোখ ঝল্‌সে দেয়, তবু মন ঠিক রেখে
চোখে চোখ রাখতে গিয়ে পুরনো স্মৃতি টুকরো হয়ে যায়।
দুটো সাপ বেদেনীর হাতে ঝুল্‌তে ঝুলতে চলে যায়
সব কিছু পড়ে থাকে—।
ছুঁতে গেলে দেখা যায় মধ্যে মধ্যে নুড়ি
ঝিনুকের, শামুকের অবশিষ্ট দেহ।

শ্যামলজিৎ সাহা

স্রোত

পর্দায় কাউকে নয়, অদ্যাবধি কাউকেই দেখি না দারুণ কাছাকাছি ॥
এইদিনে অসহায় ছুটে আসে নীলবাড়ি ঘিরে
সব ধাঁধা মোছাঁপোছা অসম্পূর্ণ চোখ।
বাজছে দুন্দুভি সব রকমের। আছি ওষ্ঠে গ্রীবায়, থাকি না পুচ্ছে।

গালিফ স্ট্রীটের রাস্তা। তিনদিকে সরু গলি চাকাফাটা সমস্ত রকম লালগাড়ি ॥
ফাঁকা দূরদেশে কোথাও রোদের স্রোত নতুন মধ্যাহ্ন ঘিরে দূরতম
অন্তমিলনে গভীর প্রত্যক্ষে আসে না মানুষ, না পাথর। সারাবেলা
এই পথে বিনা পরিচয়ে কেউ আসতে চাইলে অবাধ নির্ণিখে কেন
ঘটে যায় কত সমর্পণ! নিয়ম ভাঙ্গার সুপরিসরে আজ
সোমবার শুরু হক, সারা সপ্তাহের হিমআলো।
এই চোখে নানারঙ ঘোড়া উড্ডীনে দেখায় কত ছুটি ওড়াচ্ছে আকাশ-স্মরণীয় ॥

এই মুখে আলাপ, প্রত্যহে এই কথা সকলেই মানে, মানি আমরাও।
তার মানে উপস্থে দু'জনে আছি আমি, তার ছায়া
অন্য কেউ কাছে আসতে চাইলে দেখে এসো রোজ অস্ত্রশস্ত্র।
মিলন কখনো টলমল নিবিড় মর্মকে রাখে না কী স্রোত!

সৈকত রক্ষিত

এ মানুষ আর সে মানুষ

এতো যখন মানুষ
দুটো নষ্ট হলেই কি?
মরা মানুষ ঝরা মানুষ
গলা-পচা-ফাটা মানুষ

এ মানুষ আর সে মানুষ
সবাই নাকি মানুষ ?

জলের মতো বইছে মানুষ
পাতার মতো উড়ছে
দুটো মানুষ নষ্ট হ'লে
কার কপালটা পুড়ছে ?

মানুষ বলে, মানুষ আয়
দু'জনেরই এক বিছানায়
সোহাগ আছে আদর আছে
তোর কী মানুষ চায় ?
—নদীর মতো লম্বা মানুষ
গাছের মতো শক্ত
এইটে যদি থাকতো !
ধুলোর মতো সস্তা মানুষ
পাথর বুকে রাখতো ?

মাটির মানুষ পাথর হ'য়েও
সইতে পারে নি
এতো যখন মানুষ
দুটো নষ্ট হ'লেই কি ?

পীযুষ রাউত

পুলকেশ কতদূর যাওয়া হবে তোর

পুলকেশের অস্থির অদ্ভুত চোখে ভারতের মানচিত্র স্পষ্ট হলে তথায়
দীর্ঘ কয়েক হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত দুই সৈকত-খণ্ডের ছবি একদিন
আলোকিত হলে শপথ বাক্যের মত গভীর গম্ভীর কণ্ঠে সে স্বগতোক্তি করে,—
'আর কখনো আমি পাহাড়ে যাব না।'

অন্যদিন

পশ্চিম থেকে কিছুটা নীচু হয়ে দূর আর্যাবর্তের উত্তর ধরে পুবের দিকে চলে গেছে
ঢেউ ঢেউ যে উত্তুংগ পর্বত—তার কোন শৈলশহরে অবস্থানকালে
পুলকেশ একইরকম গভীর গম্ভীর কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে,—
'আর কখনো আমি সমুদ্রে যাব না।'

দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামে দোল খাচ্ছে অস্থিরতা নামে প্রচণ্ড অসুখ। তবু
কোনক্রমেই সে মৃত নয়। অন্তর-বাহির উভয় প্রদেশ জুড়ে
পাগল উত্তাল কালো মেঘ হননে যতই তৎপর হোক, বিষণ্ণতার অনুগত হতে
শেখে নি সে। শুধু অস্থিরতা নামে বিষম অসুখ। তাহলে, পুলকেশ,
কতদূর যাওয়া হবে তোর?

সত্যসাধন চেল

মুখ

তুমি তো এখনো আছো এই শীতে ঘুমের ভিতরে,
পাতার শিরের মতো প্রীতি ও বন্ধনে স্থির প্রেমে ;
তুমি না থাকলে সই কে জাগাবে শস্যহীন মাঠ,
কে বাজাবে শাঁখ, পুজোর আল্পনা এঁকে ধান-দূর্বায়-পল্লবে
কে সাজাবে প্রতিমা মন্দির,
কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিলে, দেখে নিও পরাণের মা
হোরতুকী ফুলের মতো, শান্ত ওই চৌরিপাতা মুখ,
জেগে উঠবে আবার আমাদের আশ্বিনের মাঠে।

উর্ণেন্দু দাশ

শব্দব্রহ্ম

খেলার নিয়মে কিছু ভুলচুক—
ভুলের আড়ালে কোনো পাপ,
একদিন খেলাচ্ছলে সহসাই ভুল ভাঙে ; ভেঙে যায় কাঁচ—
তখন-দর্পণ জুড়ে প্রত্যয়ের ছন্নছায় তুলোট উড়াল ;
ভস্মের অতলে জ্বলে ধূপের মতোন প্রিয়-স্মৃতির কুসুম,
বীজপত্র, প্রত্নশস্য, রতিমুদ্রা, বংশ লতিকা।......
যশোধারা !   এই ভুল নাভিমূলে তোমার ত্রিশূল,—
এই পাপ তোমার তূণীর।

এভাবেই প্রাতিস্বিক শব্দের মিছিল, একদিন
অতর্কিতে থেমে যায় : সমস্ত জগত যেন শব্দহীন এক ফ্রিজ শট্‌,—
ডায়ালে কাঁটার ফাঁকে নির্ভুল সময় ঘুরছে—শব্দ নেই ;
নিসর্গের হাত ধরে যথাবিধি ঋতু-বিবর্তন—কোনো শব্দ নেই ;
শরীরে হোমাগ্নি জ্বেলে বালিকা যুবতী হচ্ছে,—
প্রজাতির অমোঘ বিধানে
মানুষের জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, যুগান্তের উত্থান-পতন—
অথচ কোথাও শব্দ নেই।......
খেলার নিয়মে তবু ভুল ভাঙে ;   যথারীতি সরে যায় কাঁচ—
বিষাদ-দর্পণে ওড়ে স্মৃতির বিবর্ণ ছাই, বীজশস্য, তমসুক, আহত কুসুম :
যশোধারা !   ভস্মগর্ভে মেলে ধরো তৃতীয় নয়ন।

রবি ভট্টাচার্য

অন্তর্জলে খেলে

কখন কী ভাবে খেলে শব্দ বর্ণমালা
তুমি জানো, আনন্দপুরুষ ?

হাড়গোড় বের করা চোয়াড়ে বৃক্ষের মতো
নির্ঘুম যন্ত্রণা নিয়ে তুমি থাক হলুদ সভায়।

গন্ধ নেই বর্ণ নেই ফুল
এও এক অভিজ্ঞতা ফুলের সময়।
দেয়ালে দেয়ালে ছায়া ছায়ানৃত্য খড়ের কাঠামো
উঞ্ছবৃত্তি মানুষীর প্রেত
তোমার দুপুর ভোর কিশোরীর ফ্রক শাড়ি
কেটে যায় বর্ণচোরা ইঁদুর সময়।
কী দিয়ে জুড়াবে তুমি আমার দু'চোখ
স্বপ্নহীন নীল অন্ধকার

সংশয় অসুখ লজ্জা ছাড়া
আর কোন গল্প আছে, অন্য কোন, ভিখিরি মেয়ের ?

অন্তর্জলে খেলে অজান্তে মৌরলা মাছ
দোহাই ফেলো না জাল, চুপ !

দিব্য মুখোপাধ্যায়

আলাপ

ক্রমশঃই ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টে যাচ্ছে
আজ থেকে আবার শুরু হল ম্যানড্রেকের নতুন গল্প

ডাউন ট্রেনে চড়ে একদিন দেখে আসব
কেমন আছে বিশু আর বিশুর বৌ।

কেদার ভাদুড়ী

রাধা

তোমাকে বিষন্ন দেখি, দুর্মদ আগুনে পোড়ে মুখ
কি হলো কি, তুমি বলো, কি হলো যে, মেয়ে :
কোনোদিকে দৃষ্টি নেই, স্থিরবদ্ধ সত্য অভিজ্ঞানে
শূন্যে ওড়ে পুষ্পমেঘ, শিকড়ে মাখিয়ে

সহস্র মাটির কাব্যে কৃষ্ণকাম রসের অধীরে
রাধা নামে ব'সে আছো অযুত নিযুত বর্ষ যমুনার তীরে।

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

বাস্তু

যেখানে সবাই ছিল এখন সেখানে কেউ নেই
থাকার মহিমা আর নেই,
যা-কিছু এখন শুধু লতা ও গুল্মের অধিকারে !

আমার মায়ের বাড়ি পরিত্যক্ত অন্ধকারে
বন্দী হোয়ে আছে,
সারাদিন পোড়োভিটের আনাচে-কানাচে
ঘুঘু ডাকে, পাতা ঝরে, বিপর্যস্ত হাওয়া
বয়ে যায়,—
শালের জঙ্গলে চাঁদ ওঠে নির্জন একাকী সন্ধ্যায়।
পিছনে বনাঞ্চল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হোতে থাকে,
'চূর্ণি' নামে নদীর বিজনে জাগে মন্দিরের চূড়ো ;
ঈশ্বর থাকেন বড় একা, সঙ্গীহীন !
তাঁর জন্যে আমার মায়ের প্রদীপ জ্বলে নাকো,
স্মৃতিতে জীর্ণ হয় রাত, রাতের মলিন।

কীরকম মায়া লাগে, সজল কষ্ট এসে অনুনয় করে,
সে ব্যথা অসীম মনোময় ;
বাস্তুভিটের টান মায়ের স্নেহের চেয়ে বড় মনে হয়

দেবী রায়

কয়েকটি কবিতা

১. মাছ

এক গভীর জলাশ্রয়ী মাছ
আরো গভীরতবের সন্ধান
পেতে চেয়ে, পাঁকে
তার সর্বাঙ্গ ডোবাচ্ছে।

২. কথা

কথা, চলতে থাকে
বিষয় থেকে
বিষয়ান্তরে যায় ;

কথা কেবলি
ঘুর্ণিজালে
পাক খেয়ে ঘোরে।

৩. অবহেলা

উনি নমস্য ব্যক্তি
ইনি ?
হেঁজি পেঁজি

হেলা-কে কোরো না-হেলা
আঙুল উঁচিয়ে শুধোয়, এক নগণ্য অবহেলা

হরপ্রসাদ মিত্র

সরগম

রসিকগঞ্জে যেতে যেতে হাওয়াগাড়ির যাত্রী
ভরতপুরে বোশেখ মাসে দেখ্‌তে একটি পাত্রী
—না, না, নিজের জন্যে নয়।
মতিবাবুর ছেলের জন্যে—তাও কি বলতে হয়?

সেদিন সে কী গরম! এবং দেউলিয়ায় গিয়ে
গঞ্জের সেই দোকানগুলির একটিতে পৌছিয়ে
অশোকবাবু চায়ের সঙ্গে দিলেন কিছু খাদ্য
স্বাদ ছিল তার সরেশ।—এবং পথেই ছিল বাদ্য।
আহা, তা মোটেই নয় কানে শোনার
তা মোটে নয় শ্রব্য।

শুধু গোলাপ এবং যুঁই।
সংগীতসমুদ্রে কী যে সরগমে পৌঁছোই!

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা দিনের হার

সারা দিনের হার বুকে চেপে বিছনা নিবিয়ে শুয়ে আছি।
ঘুম আসে না। চারধার দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে ঝুলকালির আঁচ।
এক বিন্দু পুঁতির দানার মতো সুখকাঁটা গুমরে উঠল,
ভেতরকোটর থেকে উঠে এল ভ্রমরগুঞ্জন। ঘুম আসে না।

ডানা-খসা গুঞ্জনের খেদ—একটানা—
পাথরবিচির মতো বুক বুকে চেপে শুয়ে আছি।
নেবা বিছানার আঁচ—কেন এত জেগে আছো? কেন?
শালুক কোসকা-দাগা চলপুকুরের কালো শ্লেটে
ঢেউয়ের কনক পুঁতি ছিঁড়ে খসে যায়। ঘুম আসে না।

সাময়িকপত্র বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি]

১. পত্রিকার নাম : উত্তরস্মৃরি

২. ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

৩. প্রকাশ স্থান : ৭বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড,
কলিকাতা ৫০

৪. মুদ্রক : শ্রীরমেন রায়, প্রিণ্ট্স্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

৫. সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য
৭বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০

৬. প্রকাশক : অরুণ ভট্টাচার্য, ৭বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড,
কলিকাতা ৫০

৭. মালিকানা/অংশীদার : অরুণ ভট্টাচার্য, ৭বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড
কলিকাতা ৫০

আমার বিশ্বাস মতে উপরোক্ত সমস্ত তথ্য সত্য

স্বাঃ অরুণ ভট্টাচার্য

প্রকাশক

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিণ্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রেসের ফোন : ৩৫-১০৮৭ ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

উ ত্ত র সূ রি

বিষয়ে জরুরি বিজ্ঞপ্তি

কাগজ, ব্লক, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। একারণে পত্রিকা-প্রকাশ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এজন্য নিবেদন এই :

১. যাঁরা গ্রাহক তালিকাভুক্ত, এই পত্রিকার ১১২ সংখ্যা পাবার পরই বাকি চাঁদা পাঠান। কার কত বাকী তা জানবার জন্য অপেক্ষা না করে অন্তত এক বর্ষের ১৫·০০ টাকা চাঁদা এম. ও. করে পাঠান। একমাসের মধ্যে এই সাহায্য না পেলে ধরে নেবো তাঁরা এই পত্রিকার ব্যাপারে উৎসাহী নন। তাঁদের কাছে আর উত্তরসূরি পাঠানো সম্ভব হবে না।

২. বাংলাদেশের বহু শিক্ষাব্রতী, মনীষীবৃন্দ, শিল্পী সাহিত্যিকবৃন্দের আমরা, একটি নির্বাচিত তালিকা অনুযায়ী, সৌজন্য-সংখ্যা পাঠিয়ে থাকি। যেমন বহু আগ্রহী পাঠক রয়েছেন, তেমনি কিছু রয়েছেন, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, যাঁরা এই দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে একটি সামান্য পোস্টকার্ড দিয়েও প্রাপ্তি স্বীকার করেন নি। এরপর একমাসের মধ্যে তাঁদের কোন সংবাদ না পেলে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁদের নাম বাদ দিতে বাধ্য হবো।

স্বাক্ষর : অরুণ ভট্টাচার্য ॥ সম্পাদক : উত্তরসূরি

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।"
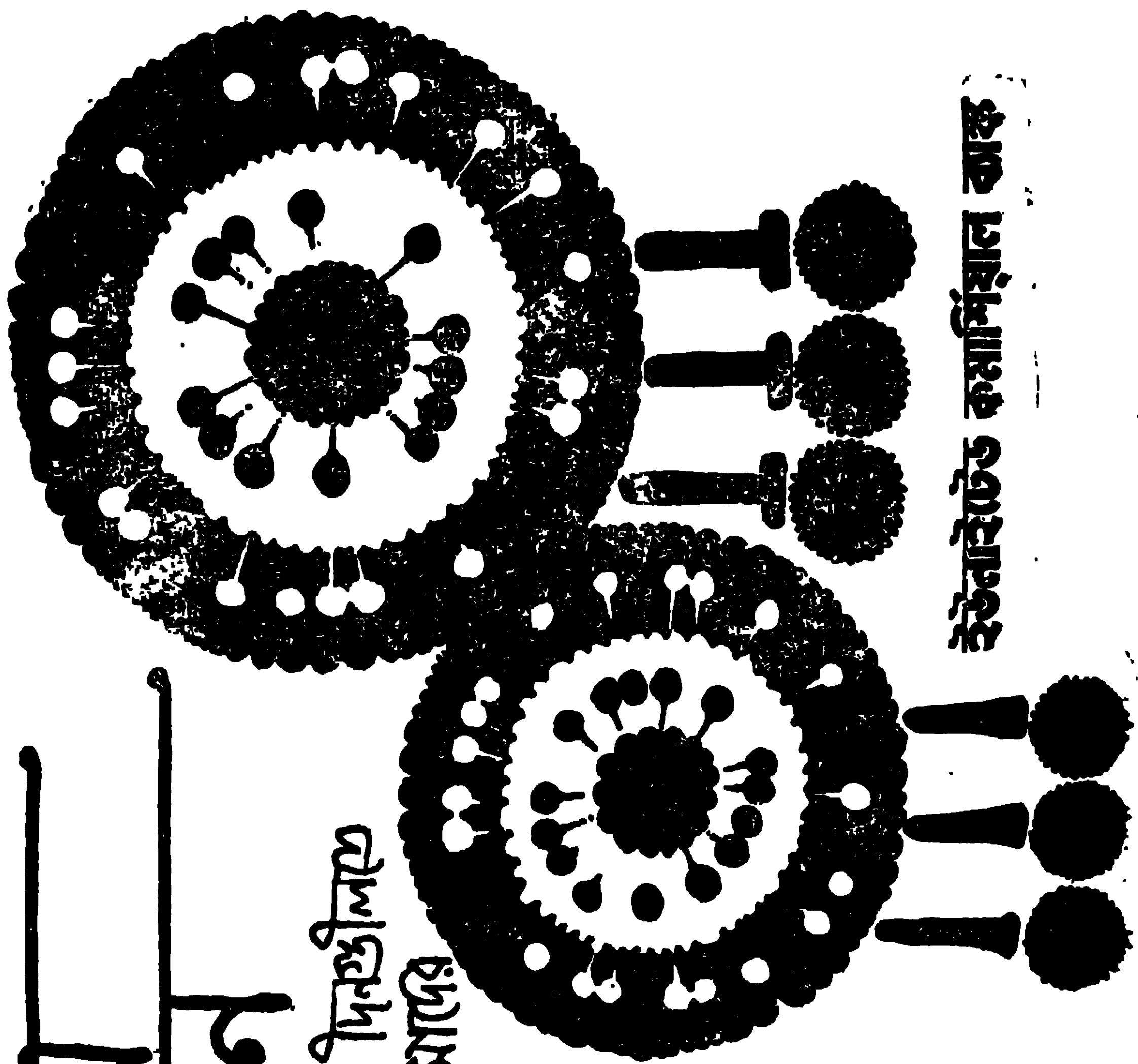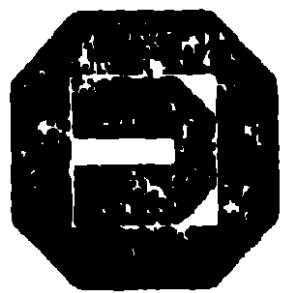
মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসব ও ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে রাজ্যের জনগণের কাছে আমার আবেদন, সংযম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে উৎসব পালন করুন। কোন রকম আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। উৎসবের সময় চাঁদা আদায়ের নামে কোন ধরণের জুলুম যাতে কেউ করতে না পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিশেষ দায়িত্ব।

পথের ওপর উৎসবের এলাকাকে সম্প্রসারিত করবেন না—কারণ এর ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাইক্রোফোনের অত্যাচার থেকে জনজীবনকে মুক্ত রাখুন।

উৎসবের সময় বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন।

উৎসবের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখুন ও তা আরো সম্প্রসারিত করুন। কোন অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে রাজ্যের জনগণের সকল অংশের সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ একান্তই প্রয়োজন।

জ্যোতি বসু

২২০৪৪।৮১ আই. সি. এ.

পুরোনো কলকাতার সঙ্গে যে-নামটি অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে তা হচ্ছে ভীমচন্দ্র নাগ। একসময়ে বহুবাজার বা বউবাজার অঞ্চলকে বনেদী মনে করা হ'ত। ভীমচন্দ্র নাগ সেই প্রাচীন উত্তরাধিকারকে এখনো ধরে রেখেছে।

মিষ্টান্ন শিল্পে অগ্রণী ভীমচন্দ্র নাগ তার ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি।

●

নীহাররঞ্জন রায় ক্রোড়পত্র

বর্ষসংখ্যা

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য ॥ ৯বি-৮ কে. সি. ঘোষ রোড, কলকাতা ৫০
ফোন : ৫২-২৪৫২

আচার্য নীহাররঞ্জন রায়

জানুয়ারী ১৯০৩—আগস্ট ১৯০১)

বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও ভাষা

নীহাররঞ্জন রায়

১.

বিগত পঁচিশ বছরে, বৃহত্তর পৃথিবীর কথা না হয় বাদই দিলাম, শুধু মাত্র বঙ্গভাষাভাষী, বঙ্গসংস্কৃতিপুষ্ট প্রায় বারো তেরো কোটি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান জনসাধারণের সামগ্রিক জীবনে মস্ত একটা ওলোটপালট ঘটে গেল, মনে হয় যেন জীবনের মানচিত্রটাই গেল বুঝি বদলে। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতিক অদল বদলের কথা তত বলছিনে যেহেতু সে সব কথা তো রয়েছে খবরের কাগজের পাতায়, নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে। আমার চিত্ত ও চেতনায় যে ভাবনা সক্রিয় তা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে নিয়ে। এই জীবনের মানচিত্রে কত সীমা ও সীমান্তরেখার, কত রঙ ও কত উচ্চাবচ ভূমিবিন্যাসের, কত নদনদী খালবিলের অদল বদল যে হলো এবং হচ্ছে, আজও তার জরিপ হয়ত হয় নি। কিন্তু একটি তথ্য তো সূর্যালোকের মত স্পষ্ট, এবং তা হচ্ছে এই যে, এই পঁচিশ বছরে একটি নূতন বঙ্গভাষাভাষী মানব বংশ সাবালক হয়ে উঠেছে শুধু নয়, পরিণত বোধ ও বুদ্ধি নিয়ে তারা পৃথিবী ও পৃথিবীর মানব সমাজকে দেখছে, দেখছে নূতন এক দৃষ্টিতে, যে-দৃষ্টির সঙ্গে আমার আপনার স্পষ্ট পরিচয় নেই। যে-সব বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর বিগত দেড়শ-দু'শ বছরের বঙ্গভাষাভাষী মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি আমরা গড়ে তুলেছিলাম এবং যা ছিল আমাদের আবাস ও আশ্রয়, সে সব বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর এই নূতন মানব বংশের কিছুমাত্র নির্ভরতা নেই, থাকলেও যতটুকু আছে তা অত্যন্ত শিথিলমূল। অতীত ও পরম্পরার সঙ্গে আমার যে আত্মীয়তা সে-আত্মীয়তার গভীর কোনো অনুভূতি আজকের সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত নব যৌবনের মধ্যেও নেই। এ কোনো ব্যক্তিগত ভালমন্দ লাগার, ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, নৈর্ব্যক্তিক একটি ধারণার বিনীত স্বীকৃতি মাত্র।

পঁচিশ বছর আগে অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পর তখনও এক দশক অতিক্রান্ত হয় নি, উদ্বাস্তু, উৎক্ষিপ্ত, উন্মথিত বাঙালী কঠোর নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রামের

সম্মুখীন হয়েও বাঁচবার দুর্মর সংকল্পে দৃঢ়। বাঙালীর সেই মূর্তি তখন আমার চোখে দীপ্যমান ছিল; সেই দীপের জ্যোতিতে আমি আপনাদের আশার বাণী শুনিয়েছিলাম, আমার নিজের ও আমার শ্রোতাদের চিত্ত ও চেতনায় নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করতে প্রয়াস করেছিলাম। এর পর আরও দু'এক বৎসর বাঙালী জীবনের গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয়েছিল, বোধ হয় আমি খুব ভুল করি নি।

তারপর দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে কি যেন কি হাওয়া শুরু হ'য়ে গেল। সমস্ত বাঙালী জীবন ও তার সযত্ন-লালিত সংস্কৃতি দেখতে দেখতে রাজনৈতিক দাবাখেলার গুটি হয়ে গেল, এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল ও দলপতিরা চতুরঙ্গ বল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই খেলায়। সেই খেলাই চলছে গত পঁচিশ বছর ধরে, এবং তারই ফলে আজ সমস্ত বাঙালী জীবন ও সমাজ প্রায় তছ্‌নছ্ হয়ে যেতে বসেছে। ভাষা ও ভাষা শিক্ষা, কবি ও লেখক, চিত্রকর ও নাট্যকার, অধ্যাপক ও গবেষক, ব্যবসায়ী ও দালাল, জোতদার ও বর্গাদার, ভাগচাষী ও ভূমিহীন শ্রমিক, স্কুল কলেজ য়ুনিভার্সিটি দেখতে দেখতে সবই হয়ে গেল রাজনৈতিক পণ্য; কে কি দরে বিক্রীত হবেন যে-নীলামের বাজারে সেই বাজারের নামই তো হচ্ছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কেন্দ্র, পঞ্চায়েৎ থেকে পার্লামেণ্ট পর্যন্ত। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও মন্ত্রীর শুধু নয়, তাঁর দপ্তরের বড় কেরানীদের টেলিফোনাহ্বানে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যান মন্ত্রালয়ে। সমাজের ও সংস্কৃতির অবস্থা যখন এই স্তরে এসে নামে, তখন চিত্ত অসাড় হয়, বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, জীবন বিস্বাদ লাগে, এবং বলতে ভয় হয়, মানুষের উপর বিশ্বাসও বুঝি হারিয়ে যেতে চায়!

কিন্তু আমি ইতিহাসের ছাত্র; বহু মানব সমাজ ও সংস্কৃতির উত্থান পতনের ইতিহাস আমার অজানা নয়! অজানা নয় যে, মানুষের ইতিহাসে, যে কোনো মানব সমাজের ইতিহাসে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসের দেশে, পঁচিশ বছর পঞ্চাশ বছর একশ বছর নিরবচ্ছিন্ন কাল সমুদ্রে ছোট বড় জলবিন্দু মাত্র। আজ যা আমার চিত্ত ও চেতনাকে ব্যথাতুর করছে, শতাব্দীর ইতিহাসে কাল বা পরশু তা না-ও থাকতে পারে। "ক্ষতি যত ক্ষত / মিছে সব হতে মিছে॥ নিমেষের কুশাঙ্কুর / পড়ে রবে নীচে॥" তা ছাড়া,

আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ে মানুষ ; তিনি বলেছেন, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। এই মহাভারতীয় আপ্তবাক্যে আমি বিশ্বাসী।

সুতরাং, বাঙালী, বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্যতে আমার বিশ্বাস অটুট ; তা যদি না হবে তা হলে আমি বাঁচবো কি নিয়ে, কোন্ পরিচয়ে, মানসাশ্রয় পাবো কোথায়। বাংলা ভাষা যে আমার প্রাণের নিঃশ্বাস, জীবনের আশ্বাস।

কিন্তু যত অটুট, যত গভীরই থাকুক আমার বিশ্বাস, বাঙালীর ইতিহাস ও বাঙালী সমাজের নিষ্ঠাবান ছাত্র হয়েও চলমান বাঙালী জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো অর্থবহ সামগ্রিক বিশ্লেষণ, তার অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতের কোনো স্পষ্ট রেখাচিত্র আজ আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত করতে পারছিনে। আমার এ অক্ষমতা আমি অকপটে স্বীকার করছি। বিগত দু'এক বছরের ভেতর বাঙালী মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সংকট সম্বন্ধে নানা আলোচনা-বিশ্লেষণ এদিক-সেদিকে আমি করেছি, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায়ই। কিন্তু সে-সমস্তই অতীত রোমন্থন, বুদ্ধিজীবীর আত্মানুসন্ধান। তা থেকে ভবিষ্যতের দিশা যে খুব কিছু পাওয়া যায়, এমন মনে হয় না, শুধু এইটুকু ছাড়া যে, উনিশ ও বিশ শতকে বঙ্গভাষাভাষী জনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে বুর্জোয়া নগরনির্ভর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন তার পরিধি যত সীমিত ও অগভীরই হোক, তাকে একেবারে নস্যাৎ করা, এমনকি অবজ্ঞা করাও হবে মূর্খতারই নামান্তর। সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব যাঁরা ঘটিয়েছেন আমাদের কালে, সেই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনও তা কখনও করেন নি ; এমন কি ষ্ট্যালিনও নন। এঁরা কেউই বুর্জোয়া সংস্কৃতির, এমন কি মানব সংস্কৃতির কোনো সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারকেই অস্বীকার করেননি, অবজ্ঞা দূরে থাক। আর, মাও-জে-ডঙ তাঁর কালচারেল রেভেল্যুশন করতে গিয়ে যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছিলেন তা আর আজ কারু অজানা নয়।

সে যাই হোক এবার আপনাদের অনুগ্রহের দান এই সম্মানের আসন থেকে গভীর সুরে কোনো গভীর কথা শুনাতে আসি নি , যত সাধই থাকুক সাধ্যে তা কুলোবে না। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একান্তভাবে সমাজনির্ভর, সমাজই তার একান্ত আশ্রয়, এবং সেই সমাজে রাজনীতি, অর্থ-

নীতি সমস্তই অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আমি এ-ও বিশ্বাস করি, যে-কোনো যুগের সাহিত্যে, শিল্পে ও সামগ্রিক সংস্কৃতিতে সমসাময়িক যুগের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত ও প্রতিফলিত হয়; কি ভাবে ও রূপে তা হবে তা একান্তই নির্ভর করে কবি, লেখক ও শিল্পীর বুদ্ধির দীপ্তি, বোধির প্রজ্ঞা, চিত্ত ও চেতনার তীক্ষ্ণতা, সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতা ও সামগ্রিক জীবনবোধের উপর।

শুধু এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই আমাদের সামগ্রিক জীবন ও সমাজ এবং সেই জীবন ও সমাজনির্ভর যে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি তার কথা একটু বলে নিলাম। তা না হলে নিরঙ্কুশ শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

একটু আগে বলেছি, আমি আশা ও উদ্দীপনার বাণী শুনাতে পারবো না, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আমরা হতাশায় ম্রিয়মান হয়ে বসে থাকবো। বরং নূতন করে আবার স্বপ্ন দেখবো, নতুন করে পুরাতন সংকল্প-মন্ত্র উচ্চারণ করবো—

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্মধামে।..."

আজকে আমি দু'টি মাত্র সীমিত বিষয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো, একটি, আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সে-শিক্ষায় ভাষা-শিক্ষার স্থান এবং দ্বিতীয়টি, চলমান বাংলা গদ্যের ভাষা। দু'টি বিষয়ই খুব 'গাদ্যিক', সন্দেহ নেই; কিন্তু উপায়ও নেই, সাহিত্য মাত্রই ভাষানির্ভর, এবং সাহিত্য শুধু নয়, সমাজও ভাষানির্ভর। ভাষা ছাড়া সমাজ নেই, সমাজ ছাড়া ভাষা নেই। সুতরাং, আমি যদি বেশ কিছুটা সময় আপনাদের নিই এই ভাষা প্রসঙ্গে, আশা করি, আপনারা আপত্তি করবেন না।

২.

আমার মূল বক্তব্যের পূর্বে সম্প্রতি যে ক'জন খ্যাতকীর্তি বাঙালীর দেহাবসান ঘটেছে তা স্মরণ করি। বিগত বর্ষের বিয়োগপঞ্জী দীর্ঘ এবং আমার পক্ষে বড় বেদনাবহ। দীর্ঘায়ু হবার দুঃখ নেই, এমন নয়। অনেক দুঃখের

একটি হচ্ছে, যত বেশি বয়স বাড়ে প্রিয়জন বিয়োগের দুঃখও বাড়ে; সমবয়সী বন্ধুজনেরা একে একে সরে যান জীবনের অন্তরালে, আর কমবয়সী প্রীতি-ভাজনেরা অগ্রজদের ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ খসে পড়েন জীবনের মালা থেকে, তারা যেমন খসে পড়ে আকাশ থেকে। আর, যার বয়স বাড়তেই থাকে তার নিঃসঙ্গতাও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হয়, আত্মার আত্মীয়তার পরিধি ক্রমশ সীমিত হতে থাকে। যে বর্ষ অতিক্রান্ত হলো প্রায়, সে বর্ষে পরিধির সংকুচন আমার পক্ষে বড় বেশি হলো। আমার ব্যক্তিগত জীবন দরিদ্রতর হলো, বোধ হয় সাম্প্রতিক বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনও। কিছু ছবি আর দেখা যাবে না, কিছু সুর আর শোনা যাবে না, কিছু কণ্ঠ আর উচ্চারিত হবে না। জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি ও বিলয়ের এই তো অমোঘ নিয়ম!

তখনকার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বদিকে একটি পুরানো বাড়ীর দোতলায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্ট্যাল আর্টের ছোট দপ্তর এবং তার চেয়ে ছোট একটি ষ্টুডিও। আমি তখন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক। ষ্টুডিওর পাশের ঘরটিতে শিল্পী গোপাল ঘোষের বাস, সেই ঘরটির খাট ও মেঝের উপর আর পাশের ষ্টুডিওতে গোপালের ছবি আঁকার কারখানা। পুরো দশটি বছর, চল্লিশের পুরো দশকটাই বোধ হয়, তাঁর কেটেছে ওই দুটি ঘরে, আমি তার নিকটতম প্রতিবেশী এবং অগ্রজোপম সুহৃদ। ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট চিত্তে স্কেচ করে যাচ্ছেন ছবি এঁকে যাচ্ছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, লাল আর হলুদ, নীল আর সবুজ ফুটে উঠছে স্তবকে স্তবকে, তীক্ষ্ণ দ্রুতরেখা জীবনকে দোলা দিচ্চে, লতাপাতা গাছ-পালা পাখী-পাখনা জল-মাটি মানুষ চরাচর সব নূতন প্রাণ পাচ্ছে রঙ আর রেখার প্রাণবন্ত ভাষায়। ছবি যখন আঁকছেন না, তখন ডায়েরী লিখছেন অথবা পড়ছেন বার্নার্ড শ বা বার্ট্রেণ্ড রাসেল, অথবাকাঁধে একটা ঝোলা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন পথে ঘাটে মাঠে হাটে বাজারে, দুদিন হয়ত তাঁর দেখাই নেই। স্বল্পবাক, অন্তর্মুখীন, অসাধারণ সংবেদনশীল এই প্রতিভাবান শিল্পীটির তুলি ও মন সজাগ ছিল মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্তও।

আদিম প্রাণের নির্বাধ বিস্ফোরণ দেখেছিলাম রামকিঙ্করের জীবনে ও শিল্পে। যেমন তাঁর উর্মিউচ্ছল অট্টহাসির জীবনরোল আর মাঠ-কাঁপানো গলা-ফাটানো গান, যেমন তাঁর শান্তিনিকেতনের প্রান্তরের মত উন্মুক্ত প্রশস্ত হৃদয় আর বক্ষের

মতন দৃঢ় পেশীবহুল বাহু, ঠিক তেমনই তাঁর সৃষ্টি—স্টীলে কংক্রিটে পাথরে—প্রাণ প্রাচুর্যে জীবনকে যেন ছাপিয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা দিকে, শক্তির বিচ্ছুরণে উদ্বেলিত করছে জীবনের দিগন্ত। সুজাতা, সাঁওতাল পরিবার, যক্ষ আর যক্ষী, আশ্রমের কেন্দ্রে প্রাচীনতম কুঠি বাড়ীটির সামনে নবীনতম বিমূর্ত রূপের মূর্ত ছন্দময় একটি রূপ, আর তাঁর অসংখ্য স্কেচ আর ছবি, আর তাঁর ছবি, আর তাঁর ব্যক্তিত্ব রামকিঙ্করের যে উদ্বেলিত জীবনকে আমাদের এত কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল সেই জীবন চলে গেল আমাদের চোখের আড়ালে ; পড়ে রইলো তাঁর সৃষ্টির অগুণতি টুকরোগুলো।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা কি আর বলবো! নন্দলালের শিষ্য ও দক্ষিণ বাহু, রামকিঙ্করের বন্ধু ও সহকর্মী, সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম গুরু ও ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ বিনোদবিহারী যে-জগতে বাস করতেন সে বুঝি আমার আপনার জগৎ নয়। সে যেন এমন একটা জগৎ যেখানে বস্তু ও কল্পনা, মাটি ও আকাশ, মানুষ ও প্রকৃতি একই সঙ্গে এক গভীর প্রেম ও প্রীতিময় মিথুন আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে বিরাজ করে। এমন উপলব্ধি না হলে কি সম্ভব হতো, বিধাতা যাঁর চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছেন দ্রুত, সেই তিনি শুধু চারিত্রিক বীর্য আর জীবনে গভীর বিশ্বাসের উপর ভর করে শান্তিনিকেতনে চীনা-ভবনের প্রায় সিলিং-ঘেঁষা মাচানের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে পুরু কাঁচের লেনসের আর আয়নার সাহায্য নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নূতন নূতন জীবনাকৃতির ছবি এঁকে এঁকে যাচ্ছেন, গুচ্ছের পর গুচ্ছে দিনের পর দিন, ঠিক যেমন করে মিকেল এঞ্জেলো এঁকেছিলেন সিস্টাইন চ্যাপেলের ছাতের ছবিগুলো। চীনা-ভবনে সে দৃশ্য আমি দেখেছি, বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। বিধাতা শেষ পর্যন্ত তাঁর মর্ত্য দৃষ্টি একেবারেই কেড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু যত তিনি নিয়েছিলেন তত বুঝি তিনি দিয়েছিলেন তাঁর অন্তশ্চক্ষুর তেজোময় দীপ্তি। সেই দীপ্তি চোখে নিয়ে শেষবারের জন্য চোখ বুঁজেছেন। আমরা চোখ মেলে দেখলাম তিনি নেই।

দেবব্রত বিশ্বাস যাঁকে তার বাল্যবয়স থেকে জানতাম জর্জ বলে এবং পারিবারিক সূত্রে যে ছিল আমার অনুজোপম, সেই দেবব্রত চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গানকে সূক্ষ্ম, মার্জিত, পরিশীলিত মধ্যবিত্ত কণ্ঠ থেকে তুলে নিয়ে যাবে সাধারণ মানুষের নির্বাধ নির্বন্ধ কণ্ঠে যে-কণ্ঠ দিগন্ত কাঁপায়, শত চিত্তে সাড়া

জাগায়, সহস্র চিত্তকে এক সূত্রে গাঁথে। ভালমন্দ জানিনে, কিন্তু গান-পাগল জর্জের জীবন সাধনাটাই ছিল এই পথে : শিল্পকে সঙ্গীতকে গণজীবনের জীয়ন-কাঠি করে গড়ে তোলা। ব্রহ্মসংগীত থেকে শুরু করে গণনাট্য সংঘের ঘূর্ণী পথে রবীন্দ্রসংগীতের শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব শৈলীর গান ছিল তাঁর দীর্ণ জীর্ণ হতভাগ্য মানুষকে জাগাবার, বাঁচাবার মন্ত্র। সে-মন্ত্র, সে-সংগীতশৈলী সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তজ্জনিত হতাশা ও দুঃখ, ও সরব-নীরব নালিশ তার শেষ জীবনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে, পুড়ে পুড়ে ছাই করেছে। শিল্পীর এ পরিণতি মর্মান্তিক, অথচ এমন নয় যা অস্বাভাবিক বা অনৈতিহাসিক। তবু, জর্জের মৃত্যুতে সমসাময়িক বাঙ্গালী জীবন দরিদ্রতর হলো, একথা মনে না করে পারছিনে।

উত্তর ক'লকাতার মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের একই পাঁচমিশেলী মেসে একই ঘরে একই জীর্ণ তক্তাপোষের উপর একই ব্যক্তি দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী প্রায় যাপন করে, জীবনটাকে তুড়ি মেরে জীর্ণ বস্ত্রের মত এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন যে পথভোলা, মহাবিবাগী, ছন্নছাড়া মানুষটি তাঁর নাম শিবরাম চক্রবর্তী। সারাটা জীবন তিনি যাঁদের সঙ্গে কাটালেন তাঁর মানস জগতে, তাঁরা সব কিশোর কিশোরী, মানস-মিথুন মধুর আত্মীয়তা তাদের সঙ্গে, হাস্যপরিহাসময় এক পরিবেশের মধ্যে। আর, বয়সে যাঁরা বড় তাঁদের সঙ্গে তো সমস্ত সম্বন্ধটাই হাস্যপরিহাস ঠাট্টা তামাসার। অশনে বসনে সাজে সজ্জায় দৃষ্টিলেশহীন, নিজের সম্বন্ধে একান্ত অবজ্ঞাবিলাসী। এই মানুষটির সঙ্গে এ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল ; যোগসূত্রে ছিলেন একাধিক বিপ্লবী রাজনৈতিক বন্ধু। তারপর আর বহুদিন আর কোনো বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তবু, উত্তর ও মধ্য ক'লকাতায় ফুটপাথে কদাচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে কাছে এসে হাত ধরে বলতেন, "হে বন্ধু, আছো তো ভালো ?" তারপর আর কোনো কথা নেই, বলা নেই, কহা নেই, ধাঁ করে ঢুকে পড়তেন নিকটতম সস্তা, নোংরা যে কোনো একটি চা-এর দোকানে। অথচ, অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, মৃত্যুর মাত্র দু'তিন মাস আগে শিবরাম তাঁর জীবনের শেষ পুরস্কার, একটি রৌপ্য পদক ও কিছু বই, নিয়ে গেলেন আমারই হাত থেকে কবি কালিদাস রায়-এর এক স্মৃতি-সন্ধ্যায়। যাবার আগে বলেছিলেন, 'আমি তো আর বেশি চলা ফেরা করতে পারি নে,

তবু একদিন আসবো, বসে বসে গল্প করবো।' আসা আর তাঁর হয় নি। আমি জানি, তাতে শিবরাম চক্রবর্তীর কিছু ক্ষতি হয় নি; ক্ষতি যা হয়েছে তা আমার।

সর্বশেষে যার কথা বলছি সেই বিনয়, বিনয় ঘোষ, সে ছিল আমার অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহকর্মী, সুহৃৎ। তার মৃত্যুর পর অনেকে অনেক কথা বলেছেন, লিখেছেন; সে সম্বন্ধে আমার কিছুই বলবার নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দেখেন নিজেদের দৃষ্টির আলোকে; আমিও তার ব্যতিক্রম নয়। বিনয়ের মনের গড়নের ইতিহাস আমার অজানা নয়, কারণ সে-ইতিহাসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা রচিত হয়েছে আমার চোখের নীচে, আমার সজ্ঞান সচেতনতার সীমার মধ্যে। আজও সেই ইতিহাস আমার গৌরব। তবু, স্বীকার করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই, বিনয় আমাকে অতিক্রম করে, অথবা এড়িয়ে গিয়ে নিজের পথ নিজে খুঁজে নিয়েছিল; তারও মালমশলা আমিই জোগাড় করে দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সে নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল। তার ফলে পশ্চিম বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি নিয়ে সে তাঁর যা বিশ্লেষণ ও বিচার রেখে গেছে তা যে শুধু পরিমাণে প্রচুর তা-ই নয়, গুণে ও অর্থময়তায়ও তা মূল্যবান। বিনয়কে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে শত মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু গর্ব আছে আমার; সেই গর্বই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার স্বীকৃতি।

৩.

মানব শিশু মায়ের কোলে যে ভাষা শেখে, শিশু ও কিশোর যে-সমাজে বাস করে সে-সমাজ থেকে যে ভাষা সে মুখে তুলে নেয় সেই ভাষাই তার পরিণত জীবনের ভাষার বুনিয়াদ, সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষের আটপৌরে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম তাতেই চলে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র সে বুনিয়াদের উপর সেই ভাষাভাষী সমাজের ক্রমবর্ধমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির তলের উপর তলে হাজার কোঠার বিচিত্র, বিরাট ও সমৃদ্ধ সৌধ গড়ে তোলা যায় না। জীবন যত প্রসারিত হয়, যত বেশি জটিল ও সমস্যা-সংকুল হয়, তার দাবি দাওয়া, আশা আকাঙ্ক্ষা যত বাড়ে, স্বপ্নকল্পনা যত সূক্ষ্ম ও গভীর হয় সেই ভাষাকে তত বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হয়, মার্জিত ও পরিশীলিত হতে হয়। সজ্ঞান সচেতনায়, প্রয়োজনের

তাড়নায় সামাজিক মানুষই এই মার্জনা, এই পরিশীলন, এই শৃঙ্খলা রচনা-ক্রিয়াটি করে। এই ক্রিয়ার যোগফলকেই আমরা বলি ভাষার ব্যাকরণ, নীতি নিয়ম, রূপকালঙ্কার ইত্যাদি। এই যে বিচিত্র উপায়ে অবিরাম পরিশীলিত ভাষা এ-ভাষা কেউ মাতৃক্রোড়ে শেখে না, প্রকৃতির দোলনায় বসে স্বভাবের তাড়নায়ও নয়। বহু আয়াস-প্রয়াসে, সজ্ঞানে সচেতনভাবে এ ভাষা শিখতে হয়, আয়ত্ত করতে হয়। এ ভাষা আয়ত্ত না করলে বৃহত্তর সমাজে কোনো প্রকার আদান-প্রদানই সম্ভব হতে পারে না, এমন কি সমাজ-রচনাই সম্ভব হয় না, জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনচর্চা, শিল্পসাহিত্যসৃষ্টি, বুদ্ধির অনুশীলন, ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তির বিকাশ, ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সুষ্ঠু ও অর্থবহ আচরণ ইত্যাদির কথা না হয় বাদই দিলাম। ভাষাই বস্তুত মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক ও ধারক। এইই হচ্ছে ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার অমোঘ যুক্তি, এবং এই শিক্ষাক্রিয়ার কোনো বিরতি জীবনের কোনো পর্যায়েই থাকতে পারে না। যদি তা হয় তা হলে মানবসংস্কৃতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

বিরামবিরতিহীন ভাষা-সাধনার আর একটি গভীরতর যুক্তিও আছে। ভাষা বড় আশ্চর্য জিনিস। সহজে একথা আমাদের ধারণায় আসে না যে, বয়স্ক মানুষ যে চিন্তা করে, ভাবে, স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে তার মাধ্যম কিন্তু তার ভাষা। যতক্ষণ পর্যন্ত এ-সব চিন্তাভাবনা স্বপ্নকল্পনা অস্ফুট অব্যক্ত থাকে, ততক্ষণ সে-সব ছায়াছবির, প্রতীকপ্রতিমার, কিন্তু যে মুহূর্তে তা স্ফুট হলো, ব্যক্ত হলো সেই মুহূর্তেই তা ভাষাশ্রিত হয়ে গেল। সুতরাং মানুষের চিন্তাভাবনা স্বপ্নকল্পনাকে ব্যক্ত করতে হলে ভাষা যদি যথেষ্ট আয়ত্ত না থাকে তা হলে চিন্তাভাবনা স্বপ্নকল্পনা পঙ্গু, আড়ষ্ট ও দুর্বল হতে বাধ্য। বস্তুত, ভাষার বুনানী ও বিন্যাস এবং মানুষের চিন্তা ভাবনা স্বপ্নকল্পনার বুনুনি ও বিন্যাস অত্যন্ত গভীর উদ্বাহবন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ। এ-তথ্য যার জানা নেই মানবসমাজের গড়ন ও বিকাশের ইতিহাস তার কাছে অর্গলবদ্ধ।

অবিরাম ভাষা-শিক্ষার এই যেখানে সাধারণ যুক্তি এবং সে-যুক্তি যখন পৃথিবীর বিবুধমণ্ডলে সর্বত্র স্বীকৃত, তখন বাংলা ভাষাভাষী বিজ্ঞানী মহলে হঠাৎ একদিন শোনা গেল, যাঁরা বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েট হবে তাঁদের বাংলা ও ইংরেজি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়তে হবে না, পরীক্ষাও দিতে হবে না। ভাষা-

শিক্ষার তাঁদের কোনও প্রয়োজন নেই। শুনে কিছুক্ষণের জন্ম বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খুব বিস্মিত হইনি, কারণ একথা আমার অজানা ছিল না যে, মোটামুটি ১৯৫০'-উত্তর বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা—দু'চারজন প্রাচীনতর লোক ছাড়া—কেউই বাংলায় বিজ্ঞানের কথা বলতেন না, বলতে পারতেন না। অর্থাৎ বিজ্ঞান তাঁরা কতটুকু আয়ত্ত করেছেন তার পরীক্ষা তাঁরা দেন নি, দিতে প্রস্তুতও ছিলেন না! কে কতটুকু কি শিখেছে এবং কতটুকু সে শিক্ষা দিতে সমর্থ তার একটা পরীক্ষা তো নিজের ভাষায় তার কতটুকু সে রূপায়িত করে তুলতে পারে, তার উপর! সে পরীক্ষা তাঁরা দিতে অস্বীকার করলেন শুধু নয়, তাঁদের ছাত্রছাত্রীদেরও বারণ করলেন তার সম্মুখীন হতে!

কিছুদিন পর শোনা গেল, শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের নয়, স্নাতক হবার জন্ম যাঁরা বি. এ. বা বি. কম পড়বেন তাঁদের ডিগ্রি পরীক্ষায় ভাষা জ্ঞানের পরীক্ষা তেমন কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয়, যেহেতু বাংলা ও ইংরেজি ভাষা-পরীক্ষাতেই বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে ফেল করে। সুতরাং তাঁদের সুবিধার জন্ম ভাষাশিক্ষা ও পরীক্ষাকে যতটা সস্তাদরে বিক্রী করে সমাজের একাংশর মতানুকূল্য পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজন বলে আমাদের শিক্ষাকর্তৃপক্ষ মনে করেছেন, এবং তা বিধিবদ্ধও করেছেন। জয় হোক তাঁদের! যখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, বি. এ.-বি. কম-বি. এসসি পাশ করা ছেলেমেয়েরা দু' পৃষ্ঠার একটা চিঠিতে দশটি বানান ভুল করে, শব্দ চয়ন করতে শেখেনি, পদাংশ বিন্যাস জানে না, সুগঠিত কোনো বাক্য রচনা করতে পারে না, সুশৃঙ্খলায় কোনো চিন্তাভাবনাকে ব্যক্ত করতে পারে না, তখন আমাদের শিক্ষাকর্তৃপক্ষেরা স্নাতকস্তরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে নিশ্চয়ই দেশের মহদুপকার সাধন করেছেন! কোথায় আমরা ভাষা-শিক্ষার উপর জোর বেশী করে দেবো তা নয়, সেটাই আরও শিথিল না করলেই নয়! কারণ, ভাষা-শিক্ষার অন্য নাম যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক শৃঙ্খলার সংরক্ষণ, সে কথা আমরা ভুলে গেছি। এই শৃঙ্খলার সংরক্ষণ আমরা চাইনে। এ শৃঙ্খলা বোধ হয় বুর্জোয়া শৃঙ্খলার পরিপোষক, এবং সেই হেতু পরিত্যজ্য!!

বাংলাভাষার সংস্কার যা করবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা করেছেন; এ-বিষয়ে

আমার আর কিছু বলবার নেই। এই সম্মেলনে আপনারা আমায় একটু সুযোগ দিলেন ; সেই সুযোগ নিয়ে আমার ব্যক্তিগত বেদনা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করলাম মাত্র, আমার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসকে কিছুটা মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বাংলাভাষা সম্বন্ধে যা শুনবার তা তো শোনা হলো, কিন্তু ইংরেজি কি আমরা পড়বো, পড়লে কতটা পড়বো, কতটা শিখবো। যেহেতু ইংরেজি অ-ভারতীয় ভাষা, একদা বিজয়ী শাসকদের ভাষা সেই হেতু ইংরেজি একেবারেই কি পরিত্যজ্য ? যদি তা না হয় তবে কতটুকু কোথায় গ্রহণীয় কোথায় পরিত্যজ্য ?

প্রশ্নটা ইংরেজি ভাষা নিয়ে নয়। আসলে কথাটা হচ্ছে, আমরা সমৃদ্ধ শক্তিশালী বিদেশি কোনো ভাষা, এমন ভাষা যার আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি সর্বত্র স্বীকৃত, তেমন কোনো ভাষা শিখবো কি না, শিখলে কতটা শিখবো। এ-ভাষা হতে পারতো ফ্রেঞ্চ বা রুশী বা স্প্যানিশ বা জার্মান কিন্তু তা হয়নি, হয়নি একটি বিরাট ঐতিহাসিক কারণে, এবং সে ইতিহাসকে আপাতত মুছে ফেলে দেবার কোনো উপায় নাই। ইংরেজি ভাষাটা এসেছে ইতিহাসের স্রোতে। গত প্রায় দেড়শ বছর ধরে দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি ভাষার চর্চা করেছেন, এবং যদিও দেড়শ বছর পরও তাঁরা শতকরা দু'জন কি আড়াই জন মাত্র, দেশের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি, আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব আজও কিন্তু এঁদেরই হাতে ; এঁদের গড়া বিধিবিধান আইনকানুন শিক্ষাসমাজ আদর্শবিশ্বাস প্রভৃতিই আমাদের সামগ্রিক জীবনের নিয়ামক। আর, অন্যদিকে ইংরেজের সাম্রাজ্য আজ অতীত ইতিহাস মাত্র, কিন্তু ইংরেজি ভাষার সাম্রাজ্য ক্রমবর্ধমান। সুতরাং স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি একটা ভাষা যদি শিখতেই হয় তা হলে ইংরেজিই সেই ভাষা যা আমাদের শেখা উচিত, এবং তা-ই স্বাভাবিক। এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিদেশি একটি ভাষা শেখা, এবং ভাল করেই শেখা যে উচিত, এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কারণ, কোনো জীবন্ত সমৃদ্ধ সংস্কৃতিমান সমাজের ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নানা দেশ নানা সংস্কৃতির সঙ্গে সে সমাজের যোগাযোগ ঘটে, নানা বস্তু, ভাব, আদর্শ, কল্পনা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আদান-প্রদান হয়। এই যোগাযোগ ও

আদান-প্রদানের আশ্রয় ও মাধ্যমই হচ্ছে বিদেশি কোনো একটি কি দু'টি ভাষা। আমাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি হচ্ছে সেই বিদেশি ভাষার সদর দরজা যার মাধ্যমে আমরা প্রাগ্রসর পৃথিবীর সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছি গত দু'শ বছর ধরে। আর, যে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আমাদের গর্ব, সেই ভাষা ও সাহিত্যের যে সমৃদ্ধ রূপ আজ আমাদের গোচর তা কি সম্ভব হতো আধুনিক ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সদর দরজা যদি আমাদের সামনে উন্মুক্ত না থাকতো? বাংলা গদ্য ও কবিতার আধুনিক যে-ভাষা, বিচিত্র অলিগলিতে সাহিত্যের যে বিচিত্র রূপ তার পেছনে ইংরেজি ও ইংরেজীর মাধ্যমে অন্য গুটি দুই পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রেরণা যে কত ব্যাপ্ত ও গভীর তা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই।

সুতরাং ইংরেজি না শেখার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না, এবং শিখতেই যদি হয় প্রাথমিক স্তর থেকেই শেখা ভালো। কিন্তু, সে ইংরেজি শেখাটা হওয়া চাই মাতৃভাষার মাধ্যমে, এবং তা ভাষাশিক্ষার আধুনিক পদ্ধতিতে। বস্তুত, শিক্ষার মাধ্যম যে কলেজে স্নাতকস্তরেও, মাধ্যমিক স্তরে তো বটেই, মাতৃভাষাই হওয়া উচিত এ-সম্বন্ধে আমি কৃতনিশ্চয়। মাধ্যমিক স্তরেই যাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হবে, তাঁদের সে স্তর পর্যন্ত ইংরেজি পড়তেই হবে, বিশুদ্ধ জীবিকা-সংস্থানের জন্যই। কিন্তু যাঁরা জীবনের নানা উচ্চতর ক্ষেত্রে সমাজের দায়দায়িত্ব নির্বাহ করবেন, সমাজকে নেতৃত্ব দেবেন, নানা সামাজিক কর্মের নিয়ামক হবেন, সাহিত্য সৃষ্টি করবেন নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, বিদ্যা ও অবিদ্যার চর্চা করবেন তাঁদের সকলকেই ইংরেজি একটু ভালো করেই শিখতে হবে, অন্তত একেবারে স্নাতক-স্তর পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিজ্ঞাননির্ভর, একান্ত বুদ্ধিনির্ভর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকীর্ণ পৃথিবীতে।

মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ভাষা শেখার যে নীতি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে আমি তার অন্যতম সমর্থক। প্রাথমিক স্তরে বাংলা বা যা যার মাতৃভাষা এবং ইংরেজির কথা বলেছি। মাধ্যমিক স্তরে এসে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দী শেখা সকলেরই উচিত হবে, সর্বভারতীয় যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের জন্য, ভারতীয় ঐক্যবোধের পরিপোষণের জন্য। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় কেউ যদি হিন্দীর বদলে, মাধ্যমিক স্তরেই, সংস্কৃত বা আরবী বা ফার্সী পড়তে চান তাকে

তা পড়তে সুযোগ দেওয়া উচিত হবে। উচিত হবে দু'টি কারণে; প্রথমত উত্তরভারতীয় সমস্ত ভাষার মধ্যে বাংলাভাষাই বোধ হয় একমাত্র ভাষা যার সঙ্গে সংস্কৃত-এর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম। সেই হেতু বাংলাভাষার ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁদের সংস্কৃত শেখবার একটা সুযোগ থাকা উচিত, মাধ্যমিক ও স্নাতক এই দুই স্তরেই। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতই তো পরম্পরাগত ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সুতরাং, সে-ভাষাটা শেখবার একটা সুযোগও সমভাবেই থাকা উচিত। বাঙালী মুসলমানদের তরফ থেকে আরবী ও ফার্সী সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে।

৪.

কিছুদিন যাবতই বাংলা গদ্যভাষার চলমান রূপ নিয়ে চিত্তে কিছু শংকাবোধ করছিলাম। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনায় এবং ছোটখাট সাহিত্য-সভায় আমার এ-শংকা কিছু ব্যক্তও করেছিলাম। আজ এই বিপুল সম্মেলনের সুযোগে আমার এই শংকার কথাটা প্রকাশ্যে এবং একটু সবিস্তারে নিবেদন করি।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিয়ে অনেক সাধুপ্রচেষ্টা হয়েছে, উনিশ শতকে হয়েছে, আমাদের কালেও কিছু কম হয় নি; এখনও হচ্ছে। কিন্তু এ-সব রচনায় ইতিহাস যতটা আছে, গদ্যের নির্মিতির আলোচনা-বিশ্লেষণ ও তার বিচার ততটা নেই। তার ফলে বাংলা গদ্যের চরিত্রের সুস্পষ্ট রূপ এখনও আমাদের কাছে খুব গোচর নয়। তবু, ইতিহাস হিসেবে এ সব রচনা অতি মূল্যবান এবং সকল জিজ্ঞাসুরই অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু, তার পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি ইতিহাসের ছাত্র, কিন্তু আমি অতীত-বিলাসী নয়। বাস করি আমি একান্ত বর্তমানে, তাকিয়ে থাকি ভবিষ্যতের দিকে। বাংলা গদ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যতই আমার অন্যতম চিন্তার বিষয়। এ-গদ্যের অতীত আমার জানা প্রয়োজন বর্তমান বাংলা গদ্যকে বুঝবার জন্য, তার চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য, এবং তার চেয়েও যা বড় প্রয়োজন, আগামী কালের গদ্যের পথ-নির্দেশ পাবার জন্য! জানি, ভাষা নির্মাণ করেন ভাষার লেখকরা, মননশীল, কল্পনাকুশল, সচেতন ও সংবেদনশীল লেখকেরা, পণ্ডিতেরা নন, বৈয়াকরণিক-ভাষাতাত্ত্বিক-শব্দতাত্ত্বিকেরা নন, ঐতিহাসিকেরা তো ননই। তবু লেখকরা,

অবশ্য দায়িত্ব-সচেতন লেখকরাও তো সামাজিক জীব, এবং সামাজিক প্রয়োজন-চেতনাও যে-কোনো লেখকের সর্বতোভদ্র জীবন-চেতনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ভূমিকার মন্তব্য সেই স্পষ্ট বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই বিশ্বাস প্রোথিত একটি সামাজিক সত্যের উপর। সে-সত্যটি হচ্ছে, ভাষা সামাজিক বস্তু, সমাজ ছাড়া ভাষা নেই, ভাষা ছাড়া সমাজ নেই। দায়িত্ব সচেতন যে-কোনো লেখক তা জানেন বলে আমার ধারণা।

নিজে আমি বৈয়াকরণিক নই, শব্দতাত্ত্বিক নই, ভাষাতাত্ত্বিকও নই। সুতরাং যে-বিষয় সম্বন্ধে বলছি, সে-বিষয়ে কিছু বলবার অধিকারই হয়তো আমার নেই, এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকারী-ভেদে আমি বিশ্বাসী। তবু যে বলতে সাহসী হয়েছি তার প্রধান কারণ আমি সামাজিক জীব, এবং বঙ্গভাষাভাষী সমাজ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন। তদুপরি আমি বাংলা গদ্যের দীনতম হলেও অন্যতম লেখক; প্রাণের টানে আমাকে বাংলা গদ্য লিখতেই হয়; পরিমাণে ইংরেজীর চেয়ে হয়তো কম, কিন্তু তা হলেও বাংলা গদ্য না লিখে আমার উপায় নেই।

তবু, সবিনয়ে স্বীকার করি, আমি নিজেই আমার নিজের গদ্যভাষার কঠোরতম সমালোচক। আমি ভালোই জানি, আমার গদ্য রচনা বহুক্ষেত্রে খুব শিথিল, শ্লথগতি, যার নির্মাণে কোনো পারিপাট্য নেই, কোনো নান্দনিকতার স্পর্শমাত্রও হয়তো নেই। বেশ জানি, যা প্রথম লিখি তার একাধিকবার পরিশোধন, পরিমার্জন, পরিলিখন প্রয়োজন, কিন্তু অকপটে স্বীকার করি, সে-সময় ও সুযোগ আমার জীবনে আমি পাই নি, আজ এই আশী ছুঁই ছুঁই বয়সেও পাচ্ছিনে। মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রাম, মানবজীবনের সকলদিকে প্রবল আকর্ষণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের আকর্ষণ, ভারতশিল্পে-ইতিহাসে সমাজতত্ত্বে গবেষণালব্ধ স্বল্প আমার যতটুকু সঞ্চয় তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়াস, ইত্যাদি সমস্ত মিলে যে পরিশোধন, পরিমার্জন, পরিলিখনের প্রয়োজন ছিল, তার অবসর আমাকে দেয় নি। এ আমার কিছু অজুহাত নয়, নালিশও কিছু নয়। হয়তো এর অন্যথা কিছু হতে পারতো না; তা হলে আমি অন্য মানুষ হতাম। তবু, জীবনের শেষলগ্নে ত্রুটি স্বীকৃতি রেখে গেলে বোধহয় কিছুটা দায়মুক্ত হওয়া যায়।

যাই হোক, যেহেতু বাংলা গদ্য আমি লিখি এবং সেই গদ্যই আমার ব্যক্তিত্ব

ও চিন্তার একমাত্র বাহক, ঠিক সেই হেতুতেই চলমান বাংলা গদ্য নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা কিছু আছে। সচেতন, যথেষ্ট সময় ও সুযোগ হাতে আছে এমন মুহূর্তে যখন আমি কিছু লিখি তখন সেই সব চিন্তাভাবনা আমার চিত্তে সক্রিয় থাকে, সে-গুলোকে আমি কাজে লাগাই, যেমন সব দায়িত্বশীল লেখকই করে থাকেন। রচনা নামক সম্যক প্রক্রিয়ায় এটি একটি ক্রিয়া, যাকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সময় যখন থাকে না, ইচ্ছা যখন ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় না তখন রচনা শিথিল হয়, শ্লথগতি হয়, যুক্তি শৃঙ্খলায় সাজানো আর হয় না। তেমন রচনা আমারও আছে এবং আমিও এই বিরূপ সমালোচনার উদ্দিষ্ট।

কথা উঠতে পারে, ওঠা উচিত, আমি যে-প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাইছি তা কি শুধু বাংলা গদ্যের, বাংলা কবিতার ভাষা নিয়ে কিছু নয়, নাটকের ভাষার কিছু নয়? না, অন্তত আপাতত আমার তা মনে হচ্ছে না; কবিতার ও নাটকের চলমান ভাষার রূপ ও চরিত্র নিয়ে শংকাবোধ করবার কোনো কারণ এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। কেন একথা বলছি, তার ভেতর এখন আর প্রবেশ করবো না।

এইমাত্র বলেছি, যেহেতু আমি গদ্য লিখি সেই হেতু গদ্য নিয়ে আমার একটু চিন্তাভাবনা আছে। কিন্তু গদ্য লেখক হলেও আমি বাংলা গদ্যের নির্মাতা কেউ নয়; অত বড় সাহস ও স্পর্দ্ধা আমার নেই। সুতরাং যে-চিন্তাভাবনার কথা বলছি তা প্রধানত বাংলা গদ্যের অন্যতম মনোযোগী পাঠক হিসেবে, গৌণত লেখক হিসেবে।

বাংলা গদ্যের বয়স দু'শ বছরেরও কম; রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে তার সূত্রপাত। কথাটা শুনতে অবাক লাগে, একটু রাগও যে না হয় এমন নয়; কিন্তু কথাটা সত্য। এর আগে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বা সরকারী বা ব্যবসা-বাণিজ্যগত দলিলপত্র ছাড়া গদ্যের কোনো ব্যবহারই ছিল না। মৌখিক বা লিখিত সাহিত্য যা ছিল তা সব কিছুই ছিল পদ্যে বা কবিতায়, এবং সে সাহিত্য মুখ্যত বিবরণাত্মক ও কল্পনাশ্রয়ী ভাবাত্মক ও পুরাণাশ্রয়ী। বিশুদ্ধ মননশীল, পরিশীলিত, সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাশ্রয়ী, বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর রচনা যখন কেউ লিখতেন (খুব কম লোকই তা করতেন) তখন তিনি তা সংস্কৃত ভাষাতেই লিখতেন, সে-ভাষাভিজ্ঞ লোকদের জন্যই। বাংলার আশ্রয় কেউ সাধারণত

নিতেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া এমন দৃষ্টান্ত আর বড় একটা নেই। কিন্তু সে-স্তরের লেখক ও পাঠক তো ছিলেন 'কোটিকে গুটিক', এককোটি লোকের সমাজে মাত্র কয়েকজন। সুতরাং, মননশীলতা বলে কোনো বস্তু, চিন্তাশ্রয়ী মানস বলে কোনো জিনিস বঙ্গ ভাষাভাষী সমাজে গড়ে ওঠবার কোনো বিশেষ সুযোগই ছিল এমন মনে হয় না, দু'চারটি ছোট ছোট কেন্দ্রে ছাড়া। ইতিহাসেও তেমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। আর, মননক্রিয়ার বা মননশীলতার, বুদ্ধি ও চিন্তার চর্চার সুযোগ ও অভ্যাস যে-সমাজে থাকে না সে-সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য দুর্বল, পাণ্ডুর ও মেরুদণ্ডহীন হতে বাধ্য। এমন যে শুধুমাত্র বর্ণনাত্মক, বিবরণাত্মক, কল্পনাশ্রয়ী গদ্য, সে-গদ্যও মানবচিত্তে গ্রহণীয় হতে হলে তার ভেতর যুক্তি-শৃঙ্খলা, কার্যকারণ পরম্পরা, নিয়মসংযমে বাঁধা শব্দচয়ন, পদবিন্যাস ও বাক্যগঠনের রীতিপদ্ধতি ইত্যাদি মেনে চলতে হয়, সুস্পষ্ট বোধগম্যতার দাবি স্বীকার করে নিতে হয়। তেমন গদ্যের পরিচয়ও উনিশ শতকের আগে বিশেষ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রেও রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়ই প্রাক্‌প্রত্যূষের সূচক। সুতরাং গদ্যভাষার ভেতর দিয়ে যে যুক্তিশৃঙ্খলা ও মননশীলতার, যে-যথাযথতার ও বস্তুময়তার সঞ্চার হয় সমাজের চিত্ত ও চেতনায়, তার বিশেষ কোনো সুযোগ মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে ছিল না।

তা ছাড়া, যাঁরা বাংলা ভাষার স্বভাব জানেন, তাঁরা একথাও জানেন, আগেও অনেকে একথা বলেছেন, এ-ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি, হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরের তারতম্যহীনতা, পদবিন্যাস ও বাক্যগঠন রীতি এমন, যাতে এই গদ্যরীতিতে দৃঢ়তার সঞ্চার করা বড় কঠিন, পারা যায় না বললেই চলে। বাক্যগুলোর ঝোঁক কেমন যেন এলিয়ে পড়ার দিকে। বাংলা গদ্য-নির্মাণে যাঁরা প্রথম ব্রতী হন সেই রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয়ের চোখেই এই ত্রুটি ধরা পড়েছিল। এ-ত্রুটি সংশোধন করে বাংলা গদ্যে দার্ঢ্য সঞ্চারের জন্য এঁরা সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এঁরা দুজনাই শাস্ত্রচর্চা ও বিচার যখন করেছেন তখন তো একেবারে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা ও বাকভঙ্গি একেবারে ঘেঁষে ঘেঁষেই চলেছেন, কেউ বা কোথাও কম। এঁরা দুজন বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক গদ্য যখন লিখেছেন তখন তাঁদের ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা হয়ত নয়, কিন্তু সংস্কৃত-নির্ভর, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পরেও যাঁরা বাংলা গদ্য নির্মাণে অগ্রণী হয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ভাষায়

দৃঢ়তা সঞ্চারের জন্য প্রায় সর্বদাই তৎসম ও তদ্ভব শব্দ, সন্ধি-সমাস, কৃৎ-তদ্ধিত শতৃশানচ প্রত্যয়, সংস্কৃত শব্দ ও পদবিন্যাসের ধ্বনিমহিমা প্রভৃতি ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করছেন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা না হয় বাদই দিলাম; তাঁরা তো করেইছেন; বঙ্কিমচন্দ্র তো তাঁর উপন্যাস প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিতেও করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও করেছেন, বিশেষ ভাবে করেছেন তাঁর মননশীল প্রবন্ধাদিতে; রাজা ও প্রজা থেকে শুরু করে সভ্যতার সংকট পর্যন্ত সে-প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তাঁর সাহিত্যালোচনার ভাষা ও ধ্বনি তো একান্তই সংস্কৃত-এর প্রতিধ্বনি। ক্রিয়াপদের রূপ যাই হোক, চলিত ভাষার সবচেয়ে সোচ্চার প্রবক্তা প্রমথ চৌধুরীও যখন মননশীল রচনা লিখেছেন তখন তিনিও সংস্কৃত-এর প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেন নি। আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যিনি বলতেন সংস্কৃত হচ্ছে বাংলার অতি-অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ যার কথা স্মৃতিতে ধারণ করবার প্রয়োজন বাংলা গদ্যলেখকদের একেবারেই নেই, তিনিই কি পেরেছিলেন? তাঁর প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়, বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও সমালোচনা ও বিশ্লেষণে কি সংস্কৃত ও সংস্কৃতাশ্রিত সাহিত্যের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় না? হ্যাঁ, যায় না একমাত্র ভাষার যাদুকর অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে, কিন্তু অবনীন্দ্র-গদ্যে তো রূপকথা, কল্পকাহিনী, পশুপক্ষী ভূতপত্রীর দেশের কথাই লেখা যায়, সে-গদ্যে কি অন্য আর কিছু লেখা যায়! মননশীল, যুক্তিনির্ভর রচনা দূরে থাক, গল্প-উপন্যাসও বোধ হয় লেখা যায় না সে ভাষায়।

বর্ণনাত্মক-বিবরণাত্মক গদ্যে, অর্থাৎ গল্প উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী আত্মচরিত জাতীয় রচনায় লিখিত ভাষা ক্রমশ লোকের মুখের ভাষার কাছাকাছি এসে গেছে, ক্রমশ আরও যাচ্ছে; সহজ হবার দিকে, প্রাঞ্জলতার দিকে, দেশজ শব্দ ও দেশীয় বাক্‌ভঙ্গি, পদ ও পদাংশ ব্যবহারের দিকে প্রবণতা বাড়ছে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক, এবং এতে কিছু শংকাবোধের কারণ নেই। কারণ যে নেই তার প্রধান হেতু হচ্ছে, গদ্য যুক্তিনির্ভর; বুদ্ধির ও যুক্তির নিয়মশৃঙ্খল, কার্যকারণ-পরম্পরার নিয়মশৃঙ্খল তাকে মেনে চলতেই হয়, তা না হলে পাঠকচিত্তে স্বীকৃতি লাভ করা যায় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের ভাষা, এমন কি শেষের কবিতা এবং রবিবার এর গল্প তিনটির ভাষাও। আর শরৎচন্দ্রের কথা যদি এ-প্রসঙ্গে বলতেই হয় তাহলে আমার বলতে দ্বিধা নেই,

শরৎচন্দ্রের গদ্যের ভিত্ তো রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে, চোখের বালিতে, চতুরঙ্গে, ঘরে বাইরেতে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই; সংক্ষেপে বোধ হয় বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের পর যাঁরা সার্থক গল্প-উপন্যাস বা আত্মচরিত ইত্যাদি লিখছেন, ভাষার দিক থেকে তাঁরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র অনুসারী; কারু বা বাঁধুনী শিথিল, কারু বা ঠাস বুনানো, কারু গতি শ্লথ বা উপলব্যথিত, কারু বা দ্রুত ও তির্যক। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধি, যুক্তি ও কার্যকারণ পরম্পরার শৃঙ্খলা ছাড়া পাঠকচিত্তে স্বীকৃতি লাভ করা যায় না সেইহেতু কোনো লেখকই তাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই শৃঙ্খলাকে মূর্ত করে তোলে যে বস্তু তার নাম ভাষা। গদ্য ভাষার যাদু এই শৃঙ্খলার ভিতরই নিহিত। এই শৃঙ্খলারই অন্য নাম ছন্দ, তাল, লয়, মান, পরিমিতিবোধ, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাবোধ ইত্যাদি। এক কথায়, ভাষার শুচিতাবোধ। চমকে উঠবার কোনো কারণ নেই, এই শুচিতাই ভাষার প্রাণ। গল্পে-উপন্যাসে কল্পনার মুক্তগতির স্থান তো আছেই, কিন্তু গদ্যরচনায় সে-মুক্তগতি, বিহঙ্গকেও যুক্তি ও বুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

এ পর্যন্ত যা বলেছি তার "ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" হচ্ছে এই;

ক. বাংলা ভাষার মেরুদণ্ডাস্থির নির্মিতি দুর্বল; সেজন্য বাংলা গদ্যের নির্মাতারা সকলেই সংস্কৃত-এর দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন। একথা আর নূতন কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলা গদ্যে দার্ঢ্য সঞ্চার করতে হলে সংস্কৃত-এর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই, অবশ্যই যদি আমরা বাংলা গদ্যের চরিত্ররক্ষায় আগ্রহী থাকি।

খ. গদ্যের ধর্ম বুদ্ধি, যুক্তি ও কার্যকারণপরম্পরায় স্বীকৃতি-নির্ভর; তা না হলে কোনো গদ্যভাষা পাঠকচিত্তে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। অন্য কথায় ও অন্যার্থে, গদ্যভাষা মানসিক শৃঙ্খলানির্ভর, কবিতার মতো ততটা কল্পনানির্ভর নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়-নির্ভরও নয়। তৎসত্ত্বেও, কবিতার মতই, গদ্যেরও ছন্দ আছে, তাললয়মান আছে, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাবোধ আছে, পরিমিতিবোধ আছে। এই মৌলিক শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো ভাষা গড়ে উঠতে পারে না। এই শৃঙ্খলার মধ্যেই নিহিত আছে ভাষার শুচিতা; এই শুচিতাই ভাষার প্রাণ।

এতক্ষণে সময় হলো চলমান গদ্য সম্বন্ধে আমার শংকার কথা বলবার। এর পর আমার যা বক্তব্য তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

কিছুদিন যাবতই লক্ষ্য করছি বিগত প্রায় দুই তিন দশক যাবত আমাদের গল্প-উপন্যাসের গদ্যে, belles letters যার বাংলা আমরা করেছি রম্যরচনা, সেই গদ্যে, আত্মচরিত, ভ্রমণকাহিনী জাতীয় রচনার গদ্যে বেশ কিছু শৈথিল্য; সকলের রচনায় অবশ্য নয় কিন্তু অনেকের রচনায় এবং সেই অনেকের মধ্যে বহুখ্যাত বহুলপঠিত লেখকরাও আছেন। এই শৈথিল্য ধরা পড়ে শব্দচয়নে, পদবিন্যাসে, বাক্যগঠনে, যতিচিহ্ন ব্যবহারে, অনুচ্ছেদবিভঙ্গে, বয়নের অপরিপাট্যে, ধ্বনি-প্রতিধ্বনির প্রতি মনোযোগের অভাবে। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা কঠিন নয়, কিন্তু লেখকেরা প্রত্যেকেই আমার ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ, প্রীতিভাজন বন্ধু। সুতরাং দৃষ্টান্ত উল্লেখে বিরত থাকা ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই। তবে একথাও না বলে উপায় নেই যে, আমাদের গদ্যের ভাষা নিয়ে একটু সচেতন হবার সময় হয়েছে, যেহেতু ভাষার শুচিতার উপর নির্ভর করে বঙ্গভাষাভাষী সমাজের জনসাধারণের চরিত্রের শুচিতা। এ শুচিতা কোনো ছুঁৎমার্গীয় শুচিতা নয়; যে শুচিতার কথা একটু আগে বলেছি এ সেই শুচিতা। 'যাবনী মিশাল' ভাষায়, আনকোরা কাঁচামাটির, কাদামাটির কটু গন্ধমেশানো দেশজ শব্দ, পদ, স্ল্যাঙ, গালিগালাজে-বোনা ভাষায়ও আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এই মেশানো, এই ধরণের বোনার মধ্যেও একটা পরিমিতিবোধের, ছন্দবোধের, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাবোধের, সর্বোপরি একটা সমাজবোধের প্রশ্ন আছে। এ-সব প্রশ্নের চেতনা যে ভাষার রীতি ও রূপের মধ্যে নেই সে-ভাষা সমাজের আবহকে দূষিত করে।

ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও কারু আপত্তি কিছু থাকতে পারে না; পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকবে এটাই তো একটা জীবন্ত চলমান ভাষার যৌবনের লক্ষণ। তা না হলে ভাষার অগ্রগতি হবে কি করে! এ-বিশ্বাস আছে বলেই না অভিধান ঘেঁটে ঘেঁটে হোঁচট খেতে খেতেও সুধীন্দ্রনাথের গদ্য পড়ি, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হলেও কমল মজুমদারের গদ্য পড়ি, যেমন করে একসময়ে পড়েছিলাম জয়েস-এর 'Ulysses' থেকে শুরু করে 'Finnegans Wake' পর্যন্ত ছাত্রের মত প্রত্যেকটি শব্দ, পদ, ছত্র, বাক্য অনুসরণ করে করে। মানুষ পরিশ্রম করে কিছু ফল লাভের আশায়। কষ্ট করে জয়েস পড়ে লাভ হয়েছে এই, বুঝতে পেরেছি ইংরেজি ভাষার দিগন্ত প্রসারিত করতে না পারলেও মানুষের

চেতনায় দিগন্ত প্রসারিত করবার একটা পথ তিনি দেখিয়েছেন, এবং তা ভাষা পরীক্ষার মাধ্যমে। ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে কমল মজুমদারের 'অন্তর্জলি যাত্রা' সম্বন্ধে। কিন্তু তাঁর পরের রচনাগুলি সম্বন্ধে কি বলবো, জানিনে। সকল ধর্মেই esoterism বলে একটা বস্তু থাকে; সমাজের ক্ষুদ্র একটি কোণে, গুহার অন্ধকারে, নানা অবুদ্ধিগ্রাহ্য অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেখানে হয়, যেমন হয়েছিল আমাদের দেশে বজ্রযানী-সহজযানী বৌদ্ধদের মধ্যে, নাথপন্থীদের মধ্যে, অবধূত-কাপালিকদের মধ্যে। ভাষার ব্যাপারেও এ-ধরণের esoteric পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পারে, হয়ও। কিন্তু তার কি কোনো বৃহত্তর সামাজিক মূল্য আছে? আমার কেমন যেন একটা আশংকা হয়, এই esoterism-র মোহাকর্ষণ কি এ ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায় না? সুধীন্দ্রনাথ যখন বাংলা গদ্যে দার্ঢ্য সঞ্চারের জন্য অপ্রচলিত তৎসম বা তদ্ভব শব্দ ও পদ ব্যবহার করেন তখন আমি প্রশংসমান, কিন্তু তাঁর গদ্যেও এ-ধরনের esoterism নেই এ-কথা বলতে আমি অক্ষম। এ-কথা আমার অজানা নয় যে, কোনো প্রাচীন শব্দ, পদ বা কাহিনীর নূতন অর্থসন্ধান ও প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসের স্বাধীনতা যে-কোনো লেখকেরই আছে। এ-ধরণের নূতন অর্থের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ যে কত করেছেন তার হিশেব নেই, এবং এমনভাবে করেছেন যে সহজে তা বোঝাই যায় না; অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন অর্থ আমরা ভুলেই গেছি, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অর্থই এখন দাঁড়িয়ে গেছে। এ ধরণের চেষ্টা সুধীন্দ্রনাথও করেছেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে কি তা সার্থক হয়েছে? Art for art's sake অর্থে কলাকৈবল্য শব্দের ব্যবহার তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত; এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে।

ভাষা সামাজিক বস্তু; সমাজের প্রয়োজনে তার সৃষ্টি, বিকাশ ও পরিণতি। সমাজের কথা এড়িয়ে গিয়ে বা আড়াল করে একান্ত ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ যে-ভাষায়, সে-গদ্যভাষা সামাজিক আদান-প্রদানের, ভাব ও চিন্তা বিনিময়ের ভাষা হতে পারে না।

আমার শংকার দ্বিতীয় কারণ, পশ্চিমবঙ্গের চলমান সাংবাদিকতার ভাষা। গত দশবারো বছরে এ-ভাষার প্রভাব দ্রুত বর্ধমান, এবং আজ তা খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসে গল্প উপন্যাস রম্যরচনার ভাষায় ঢুকে পড়েছে

বানের জলের মত। দেখতে দেখতে যেন কল্পনাশ্রয়ী ও বর্ণনাত্মক সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠলো সব রম্যরচনার ভাষা, যে রম্যতা চটুল, তির্যক, ক্ষণিক। স্থিরচিত্তে ভাবতে গেলে মনে হয়, সাংবাদিকতার ভাষা হওয়া উচিত স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, নৈর্ব্যক্তিক ও যথাযথতার প্রতিচ্ছবি; নিরলঙ্কার নয় কিন্তু নিবর্ণাঢ্য। কিন্তু, নানা কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই এখানে ওখানে দু-চার-দশ খানা জাতীয় সংবাদপত্র ছাড়া, বিশেষভাবে সংবাদ ও সংবাদ-নির্ভর মন্তব্যবাহী সাপ্তাহিকে-পাক্ষিকে, সাংবাদিকতার ভাষা আর কোথাও নৈর্ব্যক্তিক নেই, দ্ব্যর্থহীন নেই, যথাযথতার প্রতিচ্ছবি নেই, বরং অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে বর্ণাঢ্য, চিত্রালু চটুল, চতুর ও তির্যক এবং পক্ষপাতদুষ্ট। যে-মন্তব্য করলাম তা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Time, Newsweek প্রভৃতি সাপ্তাহিক। ভালর জন্য কি মন্দর জন্য, জানিনে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের সার্থক, প্রতিপত্তিশালী সম্পাদক, বার্তা-প্রতিবেদক ও বার্তা সম্পাদক যাঁরা তাঁরা সকলেই এই জাতীয় বিদেশী সাপ্তাহিক-পাক্ষিকগুলোর হুবহু নকল করে যাওয়াই সাংবাদিকতার চরম ও পরম উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন; ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলোর তো কথাই নেই, বাংলাগুলোতেও। সবচেয়ে বড় এবং আমার মতে ক্ষতিকর, প্রভাব পড়েছে Time, Newsweek-র ইংরেজি গদ্যের প্রভাব বাংলা গদ্যের উপর। সেই ভাসা ভাসা চটুল চাতুর্য যাকে বলা হয় smartness, ব্যক্তিগত ভালো বা মন্দ লাগার বর্ণাঢ্য বর্ণনা, ভাষার তির্যক গতি, বাকভঙ্গির অপূর্ব কুশলতা বা sophistica'ion! বাঙ্গালী পাঠক এ-গদ্য পড়ে মুগ্ধ, এবং হয়ত ভাবেন যে, এই হচ্ছে বাংলা ভাষার যথার্থ রূপ ও রীতি!

বাংলা সাংবাদিকতার এই ভাষায় আমার শংকিত হবার কারণ হয়তো কিছু নেই। আমি জানি, সকালবেলায় ধূমায়িত চা-এর সঙ্গে সঙ্গে যে বাংলা দৈনিকটি পড়া হয় বেলা ১০টার পর তা মাটির ধূলোয় গড়াগড়ি যায়, কেউ আর তার দিকে ফিরেও তাকায় না। কিন্তু সমাজ জীবনে ক্ষণিকের জীবন-তৃষ্ণাও যে মেটায় তারও তো কিছু দাবি দাওয়া থাকে; সে দাবি দাওয়া কি এত সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায়? বোধ হয় যায় না। ঠিক এই কারণেই অন্তত শহুরে বাঙালীর রুচি গত দশ পনেরো বছরে এই ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে, এবং তারই ফলে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ভাষার

অনুপ্রবেশ ঘটছে, ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। এমন কি কলকাতা শহরতলীর মুখের ভাষায়ও তা ঢুকে গেছে। যে-যুগে আমরা বাস করছি, সে-যুগে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরাবগাহ।

আমি রাজনৈতিক নেতা নয়, সামাজিক নেতাও নয়। আমি মানব সংস্কৃতির ইতিহাসের দীনতম একজন ছাত্র মাত্র। সেই হিশেবে আমি একটি শংকার কথা নিবেদন করলাম, সভয়ে, সবিনয়ে।

শেষ করার আগে একটি প্রার্থনা উচ্চারণ করি, রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে—

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক, হে ভগবান।

[জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৯৮০ ডিসেম্বরের অধিবেশনে সভাপতির মূল ভাষণ। সম্পাদক : উত্তরস্থরি]

নীহাররঞ্জনের ইতিহাস-চেতনা

যদুনাথ সরকার

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা আমাদের অবশ্য-পঠিতব্য প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথনির্দেশ করিবে।

নীহাররঞ্জন বিনয়ের সঙ্গে বলিয়াছেন, '...আমি কোনও নূতন শিলালিপি বা তাম্রপট্টের সন্ধান পাই নাই, কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই।... যেসমস্ত তথ্য ও উপাদান পণ্ডিতমহলে অল্পবিস্তর পরিচিত ও আলোচিত প্রায় তাহা হইতেই আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি।...আমি শুধু প্রাচীন বাংলার ও প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস একটি নূতন কার্যকারণসম্বন্ধগত যুক্তিপরম্পরায় একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র।...এই যুক্তি ও দৃষ্টি অনুসরণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের...সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়।.. নূতন নূতন উপাদান প্রায়শ আবিষ্কৃত হইতেছে।...আমি শুধু কাঠামো রচনার প্রয়াস করিয়াছি— ভবিষ্যৎ বাঙালী ঐতিহাসিকেরা ইহাতে রক্তমাংস যোজনা করিবেন, এই আশা ও বিশ্বাসে।...'

মনীষার যে সমৃদ্ধি এই গ্রন্থে পরিস্ফুট, সেই সমৃদ্ধি যাঁহার আছে তিনি বিনয়ী হইবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তবু নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত নূতন তথ্য প্রচুর পরিমানে আবিষ্কৃত না হইবে, যতদিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ গবেষণার ফল ব্যাপক ও গভীর ভাবে বাঙালীর প্রাচীন জীবনের ইতিহাস আলোকিত না করিবে, ততদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থের অতি উচ্চ আসন আর কেহ অধিকার করিতে পারিবে না, ইহার মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকিবে। ইতিহাসের যে বিরাট দৃশ্য এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত এবং যে মহামূল্যবান্ বিভাগটি এই গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা বুঝিতে হইলে এবং তাহাতে বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ এবং নীহাররঞ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্যগুলি বারবার আলোচনা করা ভিন্ন অন্য গতি নাই।

এই গ্রন্থ আমাদের দেশের ইতিহাস-আলোচনায় নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। পরবর্তী গবেষকরা ইহাকে ভিত্তিরূপে লইয়া কাজ আরম্ভ না করিলে আমাদের নিজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিস্তার সম্ভব হইবে না।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া, ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্যপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস বিষয়েই শুধু নয়, সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থ ইহার আগে কেহই লেখেন নাই। শুধু ইহার আকারে নহে, শাখাপল্লবে নহে, বিষয়-নির্বাচনে নহে,—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি নীহাররঞ্জনের অটুট নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, অসংখ্য ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গির সজীব বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, উচ্চস্তরের বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা, এবং সর্বোপরি সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি এই গ্রন্থকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের জগতে অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গ্রন্থকার অনেক নূতন শব্দ চয়ন করিতে, নূতন পদাংশ ও বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; দুরূহ ভাব ও অনভ্যস্ত ভঙ্গি ও চিন্তা আত্মস্থ করিয়া অর্থ ও ব্যঞ্জনাময় ভাষায় সেগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। তথ্যবহুল মননশীল গ্রন্থ বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় খুব বেশি রচিত হয় নাই. এমতাবস্থায় এই কাজটি যেমন কঠিন তেমনি নূতন। অথচ, নীহাররঞ্জনের ভাষার বেগ ও উদ্দীপনা দেখিয়া মনে হয়, এ কাজ যেন তিনি খুব সহজেই করিয়াছেন। বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাত্মতা না হইলে এই সাফল্য সম্ভব নয়। কোথাও কোথাও তাঁহার বিবরণ ও মন্তব্যের ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে এই ধরণের সার্থক প্রয়াস আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

ইংরাজি ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইলে নীহাররঞ্জন ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হইতেন; গ্রন্থের প্রচার বেশি হইত, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুদূরব্যাপী হইত। কিন্তু তিনি যে তাহা করেন নাই ইহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগেরই প্রমাণ।

বিষয়-গৌরবেও এই গ্রন্থ অনন্যপূর্ব। এই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছে বাংলার ইতিহাস নহে, বাঙালীর ইতিহাস; অর্থাৎ, ইহা বাংলাদেশের রাজা, রাজ-কর্মচারী, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন-বিস্তার প্রভৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্যে লিখিত নহে, কারণ,

সেরূপ 'গ্রহ বাহ্য' ইতিহাস তো আগে অনেক লেখা হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙালীর লোক-ইতিহাস; ইহাতে বাঙালীর জনসাধারণের, বাঙালী জাতির সমগ্র জীবন-ধারার যথার্থ পরিচয় দিবার জন্য আত্যন্ত চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, এই ঐতিহাসিক কাব্যটির 'নায়ক' রাজবংশ নহে, ধনীসমাজ নহে, পণ্ডিতবর্গ নহে, জাতীয় চিন্তায় শিক্ষিত নেতাদের সমাজ নহে যাহাদের বলা হয় জনসাধারণ, যাহারা উচ্চ বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ও স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরে, যাহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক তাহারাই এই ইতিকথার 'নায়ক'—যদিও নীহাররঞ্জন প্রথমোক্ত শ্রেণী ও সমাজের লোকেদের কথা ভুলেন নাই, তাহাদের ইতিহাসও বাদ দেন নাই। এই নিম্নতর কিন্তু বৃহত্তম সামাজিক স্তরকে প্রধান আলোচ্য বিষয় করাই এই গ্রন্থের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য ও অনন্যপূর্বত্ব। অথচ, এইরূপ সামাজিক ইতিহাসই বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত সমাজে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা হয়।

সত্য বটে, ইহার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত (ইংরাজি ভাষায়) বাংলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে এবং খুব সংক্ষিপ্তাকারে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন রচিত "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী" (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ পুস্তিকামালা, ১২ নং) বাংলা পুস্তিকাটিতে এইরূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সেই দুই গ্রন্থের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে আংশিক আলোচনার স্থান মাত্র ছিল, তাহাদের পরিকল্পনাও ছিল অন্য প্রকৃতির।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের বিরাট গ্রন্থের সমস্তটারই বিষয়বস্তু হইতেছে, বাংলার লোকদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, ধর্মকর্ম, সংস্কৃতি, ধনসম্পদ প্রভৃতি। অর্থাৎ, বাঙালী জাতি কি করিয়া ক্রমে ক্রমে আজিকার বাঙালীতে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা। বাংলার লোকেরা একেবারে আদিতে কেমন ছিল, কখন কোথা হইতে কে আসিল, এই ভূখণ্ডের নদনদী-পাহাড়-প্রান্তর-বন-খাল-বিল কালক্রমে কিরূপে পরিবর্তিত হইল, ভৌগোলিক প্রভাব এই প্রদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে কোথায় কি কি কাজ করিয়াছে, বাঙালীর দেহে কোন্ কোন্ জাতির রক্ত কি পরিমাণে মিশিয়াছে, অতীত যুগের ভূমিসংস্থা, কৃষি-পদ্ধতি, শিল্প-

ব্যবসা-বাণিজ্য, অশন-বসন, ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, এক কথায় প্রাচীন বাঙালী জীবনের সকল দিক হাজার বৎসর ধরিয়া কালের স্রোতের আঘাতে আঘাতে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইল—এই সব তলাইয়া বুঝিবার এবং যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, এবং আমার সংশয় নাই, নীহাররঞ্জনের চেষ্টা অসামান্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক গবেষণার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই শুধু বুঝিতে পারিবেন, এই সুকঠিন কার্যে কি অসীম ধৈর্য, কি অক্লান্ত শ্রমশীলতা, কি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, কি মার্জিত অথচ সূক্ষ্ম বোধ ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে এই ধরণের গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত দুরূহ সাধনা, এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ আরও দুরূহ। নীহাররঞ্জন তাঁহার সাধনায় অপূর্ব সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

নীহাররঞ্জনের সুবৃহৎ গ্রন্থে কোথাও আমাদের প্রচলিত 'অমুক জাতির ইতিহাস' শ্রেণীর বইগুলির 'গুলিখোরী' মত ও প্রবাদে অন্ধ বিশ্বাস নাই। আমার পরিচিত জনৈক বাঙালী লেখক তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভাদুড়ী বংশ চম্বল নদীর দক্ষিণে (আগ্রা ও গোয়ালিয়রের মাঝামাঝি) 'ভাদাওর' প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের আদিপুরুষ সেখানে সামন্ত ছিলেন! তিনি যদি দিল্লীর বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পড়িতেন, তবে অতি সহজেই জানিতে পারিতেন যে, 'ভাদাওরীয়া' একটি ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশ, ব্রাহ্মণ নহে; তাঁহাদের অনেকে বাদশাহদের মনসবদার ছিলেন।

এইরূপ জ্ঞানহীন বিচারবুদ্ধিহীন আলোচনার কোন চিহ্নই এই গ্রন্থে নাই। সর্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে নীহাররঞ্জন পণ্ডিত-সুলভ অহংকারে কোথাও নিজের মত গায়ের জোরে প্রচারের চেষ্টা করেন নাই; সর্বত্রই তিনি পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করিয়া, নূতন যুক্তি দিয়া, সমস্ত প্রমাণপঞ্জী বিচার করিয়া, তাহার পর নিজের সিদ্ধান্ত পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরের ও নিজের উপাদানের নাম, পাঠনির্দেশ প্রভৃতি দিয়া পাঠক যাহাতে সন্দেহভঞ্জন করিতে এবং নিজের স্বাধীন মত গঠন করিতে পারে, সে কাজে তিনি সাহায্যের ত্রুটি করেন নাই। ইহার পরও মুখবন্ধের শেষে তিনি লিখিয়াছেন, '…আমার কোনও কথাই শেষ কথা নয়।…এই কাঠামো রচনার প্রয়াস সত্যে পৌঁছিবার নিম্নতর স্তর; এই স্তর যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে সত্যে

পৌঁছিতে কিছুমাত্র সহায়তা করে, তবেই আমার দেশের এবং আমার জাতির এই ইতিহাস রচনা সার্থক।' ইহাইতো যথার্থ ঐতিহাসিকের যথার্থ জ্ঞানীর উক্তি।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার সুবিস্তৃত বিষয়সূচী এবং গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় না পড়িলে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না; সে-সম্বন্ধে পরিচয়-পত্রে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের দু'একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আবশ্যক।

এই গ্রন্থ আমাদের একটি নূতন জিনিস দিতেছে। বাংলা দেশের যে 'পলিটিক্যাল হিষ্টরী' অর্থাৎ জড় ঘটনাগুলি আমরা পূর্বসূরীদের গবেষণার ফলে প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে আজ জানিতে পারিয়াছি সেই ঘটনাগুলির মূল কারণ কি কি, কোন্ কোন্ শক্তির প্রভাবে আমাদের জনসমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বর্তমানের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং সেই সেই শক্তিগুলি কি প্রণালীতে কোন্ কোন্ সুযোগে কাজ করিয়াছে, গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় নীহাররঞ্জন সর্বত্র তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'the why and how of the people's evolution', তাহাই গ্রন্থকার বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্র, দৈনন্দিন জীবন, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্মকর্ম যখনই যাহার আলোচনা তিনি করিয়াছেন, প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে কাহার কি সম্বন্ধ তাহার বিচার ও আলোচনাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তাহাই এই গ্রন্থের সুগভীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই বাঙালী জাতির অভিব্যক্তির সর্বাঙ্গ চিত্রটি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে নীহাররঞ্জন যে-ভাবে আমাদের প্রাচীন জীবনপ্রবাহের সমগ্র ধারাটিকে, 'বাঙালী জীবনের মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে' ধরিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথ্যের ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া এমনভাবে এত বড় ও সার্থক চেষ্টা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই। ঐতিহাসিকের কর্তব্য-জ্ঞানের ও সামাজিক অনুভূতির এমন পরিচয় আমাদের দেশে ইতিহাস-চর্চায় বিরল, অথবা নাই বলিলেই চলে।

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য, দেশের ও দেশের জনসাধারণের প্রতি নীহাররঞ্জনের গভীর অনুরাগ। তথ্যবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ভিতরেও সেই অনুরাগ

খরা না পড়িয়া যায় নাই। আর, সেই অনুরাগ হৃদয়ে না থাকিলে গ্রন্থকার হয়ত এই বিরাট গ্রন্থ রচনার অনুপ্রেরণাই পাইতেন না।

তথ্যবিবৃতি বা আলোচনায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতি কোথাও নাই এমন কথা আমি বলিতে পারি না, গ্রন্থকারও সেই দাবি করেন নাই এবং কেহই তাহা করিবেন না। ছিদ্রান্বেষী হইলে তেমন ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু কিছু ধরা পড়িবে, বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই ধরণের দৃষ্টি লইয়া এ গ্রন্থ যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হইবেন; তাঁহাদের কাছে এই গ্রন্থের অপূর্বত্ব ও গভীর মহিমা ধরা পড়িবে না। সেই মহিমাই বিচারের বস্তু, ছিদ্রগুলি নয়।

এই বিরাট অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থখানি বড় আকারে প্রায় নয়শত পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। এখানি আদিপর্ব মাত্র, অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় পর্যন্ত পৌঁছিয়া এই খণ্ডের গ্রন্থকার থামিয়াছেন। মুসলিম ও ইংরাজ যুগে এই ধরণের বাঙালীর ইতিহাস রচনা এখনও বাকি আছে। একজন লোকের জীবনে, অথবা একজন পণ্ডিতের একক শ্রমে কি তাহা এই আদিপর্বের মত সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করা সম্ভব হইবে? নীহাররঞ্জন অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করি, ভগবান তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দান করুন যাহার বলে তিনি বাকি দুই যুগের ইতিহাসও এমনই সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার কীর্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

যদি কেহ এই গ্রন্থের অন্ধকার অংশগুলি পড়িয়া অসন্তুষ্ট হন তবে তিনি Coulton-প্রণীত Social Life in Mediaeval England (1916) গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখুন। পেঙ্গুইন-সিরিজে নব-প্রকাশিত Britain under the Romans বইখানাও পড়িয়া দেখুন। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ দেশে ঐ প্রাচীন যুগেও কত অধিক পরিমাণে এবং কত বিচিত্র ধরণের ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে; তাহার তুলনায় বাংলা দেশের হিন্দুযুগের নিদর্শন অত্যন্ত স্বল্প। এরূপ উপাদানবৃক্ষহীন ঐতিহাসিক মরুভূমিতে নীহাররঞ্জন যে ফসল ফলাইয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্য ও সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে আমার দুইটি মন্তব্য

গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়কেই জানাইতেছি। প্রথমতঃ, সরল বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনধিক ২৫০ পৃষ্ঠায় একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ অবিলম্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত, এবং মূল্যেও তাহা সহজলভ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গে সঙ্গে অনধিক ৩৫০ পৃষ্ঠায় ইহার একটি ইংরাজি সারাংশও প্রকাশিত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঐতিহাসিকেরা নিজ নিজ জাতির ইতিহাস রচনার একটি আদর্শ লাভ করিবে, যাহা এদেশের সাহিত্য ও ইতিহাস-চর্চায় একেবারেই নাই।

২০ আশ্বিন, ১৩৫৬

আচার্য নীহাররঞ্জন রায়

অনুপ মতিলাল

বৈচিত্র্যে, বৈদগ্ধে, ক্লাসিক সন্ধিৎসায়, সাংস্কৃতিক আভিজাত্যে, অনুসন্ধানের বহুমুখিনতায় নীহাররঞ্জন ছিলেন ইতালীয় রেনেশাঁসের বিশেষার্থে প্রকৃত হিউম্যানিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের আবহে এবং প্রতিবেশের প্রচ্ছায়ায় লালিত এই শালপ্রাংশু মনীষীর পরম প্রকাশ হয়েছিলো আত্মসংস্কৃতির পরিশীলিত উন্মীলনে। সুদীর্ঘ জীবন ধ'রে তিনি সব্যসাচীর মত ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম ও শিক্ষার মত সুব্যাপ্ত পরিসীমায় স্বচ্ছন্দে বিহার করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চেতনা ছিল, আর সেই সহজাত প্রতিভার দ্বারাই সমগ্র জীবন-যজ্ঞে উন্মুক্ত করেছেন গবেষণার নানা নতুন দিগন্ত।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় কাহেত গ্রামে নীহাররঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন এক শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারে। পিতা মহেন্দ্রচন্দ্র হোমরায় গভীর স্বদেশানুরাগে ১৯০৫ খ্রীঃ শিক্ষা দপ্তরের চাকরি ছেড়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ময়মনসিংহের জাতীয় বিদ্যালয়ে (যেখানে নীহাররঞ্জনের পিতা চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশসেবার্থে শিক্ষকতা শুরু করেন) নীহাররঞ্জনের শৈশব-শিক্ষার সূচনা। সেখানেই তাঁর জাতীয়তাবাদের প্রথম স্ফুরণ। মাতার নাম জ্ঞানদা দেবী।

স্কুলের ছাত্র থাকাকালীনই কিছুটা পিতৃপ্রভাবে, কিছুটা আশৈশব লালিত জাতীয়তাবোধে নীহাররঞ্জন অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ নেন। এই সব রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই তিনি ১৯২৪-এ শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৯২৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাস করেন। সেই বছরেই 'উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাস' বিষয়ে তাঁর মৌলিক রচনার জন্য মৃণালিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর, সরকারী বৃত্তি পেয়ে পরবর্তী তিনবছর ভারতীয় শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেন। ব্রহ্মদেশে

ব্রহ্মণ্য দেবতাদের বিষয়ে একটি মৌলিক রচনার জন্য ১৯২৯-এ তিনি গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন এবং এই রচনাকর্মের জন্য ১৯৩০-৩২ এর সময়কালের জন্য আরও একটি গবেষণা বৃত্তি পান। ইতিমধ্যেই ব্রহ্মদেশে স্থাপত্য সম্পর্কিত একটি গবেষণাধর্মী রচনার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং ব্রহ্মদেশে শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ক রচনার জন্য মউআট স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯৩২-এ তাঁর প্রথম বই Brahmanical Gods in Burma প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয় Sanskrit Buddhisim in Purma. শিল্প-ঐতিহাসিক ডুরোইসেল (Duroiselle)-র যুগান্তকারী প্রয়াসের পর এই বিষয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আর কেউ করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘকাল পরে এই সেদিন ১৯৭০-৭২-এ তিনি ইউনেসকোর তরফে ব্রহ্মদেশ সরকারের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উপদেষ্টার পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৯২৬-এ অসহযোগ আন্দোলনের পর যিনি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, সেই নীহাররঞ্জন ১৯৩০-এর দশকে আবার প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংগে সংযুক্ত হলেন। সুভাষচন্দ্রের 'লিবার্টি' পত্রিকার তিনি সাহিত্যসচিব ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপনার পাশাপাশি 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৩১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৩৫-এ ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ পান। পরের বছর রয়াল ইউনিভার্সিটি অব লিডেন থেকে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন। বিলেতে থাকাকালীন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনো করেন। ১৯৩৭-এ দেশে ফিরে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হ'ন। ১৯৪৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে রীডার পদে নিযুক্ত হ'ন। ১৯৪৬-এ বাগেশ্বরী অধ্যাপক। শেষোক্ত পদে তিনি সুদীর্ঘ কুড়ি বছর বৃত ছিলেন। এইবছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর Maurya and Sunga Art, যে বইতে তিনি স্পষ্টতই জানালেন যে শিল্পের সঙ্গে সমাজের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

১৯৩৯-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁকে অধরচন্দ্র মুখার্জী বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানায়। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো'। পরে এই বক্তৃতামালার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল সেই বিশাল সৌধ

যার নাম 'বাঙালীর ইতিহাস' আদি পর্ব। ১৯৪২-এ তিনি যখন স্বদেশী আন্দোলনের শরিক হিসেবে দেড়বছরের জন্য কারাবরণ করেন, তখনই, জেলে বসে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিটির খসড়া রচিত হয়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ এই ইতিহাসকে মহাগ্রন্থ বলে অভিহিত করেন। র‍্যাংকে প্রবর্ত্তিত পজিটিভিস্ট পদ্ধতি পরিত্যাগ করে, এই প্রথম একজন বাঙালী ঐতিহাসিক ডি. ডি. কোশাম্বী প্রবর্তিত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করলেন। গজদন্ত মিনারে যাদের অধিষ্ঠান সেই রাজা, মন্ত্রী, রাজন্যবর্গের পরিবর্তে, এই গ্রন্থে সসম্মান আসন পেল শ্রেষ্ঠী, শিল্পী, কামার, জেলে, কুমোর এবং ভূমিহীন কৃষক। তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যায় আলোকিত হ'ল জনতত্ত্ব, ভূগোল, ধনোৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি এবং শ্রেণীবিন্যাস। এই গ্রন্থের নবতম সংস্করণের পাঠপঞ্জী থেকে বোঝা যায় নীহাররঞ্জনের বিপুল পাণ্ডিত্যের সুবিশাল পরিমাপ। ১৯৪৯-এ এই বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫১-য় এই গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা'।

অক্লান্তকর্মা এই মানুষটির প্রকৃত ব্যস্ত জীবনের সূচনা ৫০-এর দশকে। সমস্ত দশক ধ'রে তিনি বিভিন্ন মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে বক্তৃতা করেন। ১৯৫৭-য় তিনি রাজ্যসভার সদস্য হ'ন। ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভার সদস্য পদ অলংকৃত করেন। ১৯৬৫-তে সিমলায় ইনডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অব্ অ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ্ এর জন্মকাল থেকেই তিনি এই সংস্থাটির পরিচালক নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য, তাঁরই উদ্যোগে এই গবেষণা সংস্থাটি গড়ে ওঠে। পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি এই সংস্থাটির উন্নয়নকল্পেই নিবেদিত ছিলেন। ১৯৬৭-তে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হ'ন। এই ষাটের দশকেই তিনি কেরালা, বরোদা এবং ৭০'এ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপকের পদে বৃত হ'ন। বেনারস, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৯-এ ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই মনীষী-প্রতিম প্রতিনিধি বহু দেশ সফর করেছেন, বহু সংস্থার আচার্য হয়েছেন। সাহিত্য আকাদেমী, ললিতকলা আকাদেমী ও সঙ্গীত নাটক আকাদেমী—কৃষ্টি সংশ্লিষ্ট

এই তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকাগোষ্ঠী এবং জ্ঞানপীঠ কমিটির চেয়ারম্যান হ'ন। 'ক্রান্তি' সাহিত্যপত্র এবং হুমায়ুন কবীর পরিকল্পিক 'India' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন একসময়ে। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৮০-তে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত ত্রিংশতিতম প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, ক্রমান্বয়ে সংস্কৃতিচেতনা বিষয়ে কাজ করে একই সঙ্গে তিনি ভারত সরকার নিয়োজিত 'পে কমিশনের' সদস্য হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং শেষ জীবনে মৃত্যুর মাত্র দশ দিন পূর্বে শিক্ষাসংক্রান্ত একশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট লেখা শেষ করেন! মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টরিকাল রিসার্চ-এর চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হ'ন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিশ্বভারতীর পরিচালন সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এই বহুধা-বিস্তৃত কর্মজীবনের পাশাপাশিই নীহাররঞ্জন নিরলস বিদ্যাচর্চা করেছেন। ১৯৫০-য় প্রকাশিত হয় 'দি মেকিং অব্ গ্রেটার ইণ্ডিয়া'। ১৯৬৭-তে প্রকাশিত হয় 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ'। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ছিলো রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬৯-এ এই গ্রন্থটি আকাদেমী পুরস্কার লাভ করে। ১৯৭৩-এ প্রকাশিত হয় 'আইডিয়া অ্যাণ্ড ইমেজ ইন ইণ্ডিয়ান আর্ট'। ১৯৭৪-এ 'অ্যান অ্যাপ্রোচ টু ইণ্ডিয়ান আর্ট', ১৯৭৫-এ 'মোগল কোর্ট পেইন্টিং'-এ সোশ্যাল অ্যাণ্ড ফর্মাল অ্যানালিসিস। এছাড়াও তাঁর 'শিখ গুরুজ্ অ্যাণ্ড শিখ সোসাইটি' শিখজাতির ইতিহাস বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বহুমুখী চেতনায় বিধৃত তাঁর মনীষা শেষ জীবনে নিয়োজিত হয়েছিল 'কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি' এই তিনটি শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণে। বর্তমান রচনায় তাঁর রচনা-তালিকা অসম্পূর্ণ, কারণ বহু পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর চিন্তার উন্মীলনী প্রজ্ঞা। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, 'বারোমাস' পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক রচনা 'ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা' এবং শিবনারায়ণ রায়-সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় নবজাগরণ বিষয়ে তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ 'উনিশ শতকী বাঙ্গালীর পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পুনর্বিবেচনা' (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)।

'বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় নীহাররঞ্জন

একদা লিখেছিলেন "গ্রীক চিন্তানায়ক হিরাক্লিটাস বলেছেন, মানুষ একই নদীতে দুবার স্নান করে না। হেরাক্লিটাস যে-অর্থেই কথাটা বলে থাকুন একটা অর্থ নিশ্চয়ই এই যে, মানুষ একই অভিজ্ঞতার প্রবাহে একাধিকবার অবগাহন করতে চায় না, বোধহয় সম্ভবও নয়; নূতন থেকে নূতনতর অভিজ্ঞতা তাকে আকর্ষণ করে"—নীহাররঞ্জনের সমগ্র জীবনের দর্পণেই তাঁর এই উপলব্ধির মূল্যায়ন সম্ভব।

ভারত তথা বিশ্বের এই বাগ্‌বিদগ্ধ মনীষীর আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ চিত্তে অবনত হই।

কবিতার ভাবনাঃ নীহাররঞ্জন কি গবেষক না মুলত কবি (১২)

অরুণ ভট্টাচার্য

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে,—আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং নীহাররঞ্জন রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক,—ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সূত্র কি ছিল মনে নেই। এটুকু মনে আছে, পুরনো সেনেট হাউসের (এ প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্মকর্তাদের যাঁরা সেনেট হাউসটি ভেঙে দিয়ে খাঁচাওয়ালা বহুতল বাড়ি বানালেন, প্রাচীন শিল্পরক্ষণ যে জাতীয় কর্তব্য এ বোধ এ দেশে অতি অল্প লোকেরই আছে! কি শিক্ষানীতিতে কি রাজনীতিতে আমরা কোন জিনিষ ভাঙতেই প্রস্তুত! গড়তে নয়।) ওপরতলার একটি সাজানো ঘরে গুটি কয় প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্রছাত্রী নিয়ে নীহাররঞ্জন বসে আছেন! ক্লাশ নিচ্ছেন না ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পড়ন্ত বিকেলের রোদে গল্প করছেন ঠিক বুঝতে পারি নি। নিশ্চয়ই পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু সেই পড়ানোর ভঙ্গিটিতে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের সহজ মধুর সম্পর্কটি এক লহমাতেই ধরা পড়ে গিয়েছিলো। সামান্য একটি ছাত্রের পক্ষে তখনই কিংবদন্তীতে পরিণত নীহাররঞ্জনের ঘরে গিয়ে কিছু পরিচয় করে আসা—এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্নেহদৃষ্টিতে পড়া—আজ আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়। এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর, আরো অনেকের মতই, আমিও তাঁর অতি কাছের, অতি অন্তরঙ্গ মানুষ ছিলুম। মিশেছি বন্ধুর মত, ছাত্রের মত, পেয়েছি একজন শিক্ষককে —যে শিক্ষক ছাত্রের কাছেও কিছু শিখবার উদারতা লালন করতেন—এই দীর্ঘ দীর্ঘ বছরে তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা, তাঁর শিল্পচর্চা, রবীন্দ্র ও রাগ সঙ্গীত এবং লৌকিক সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, তাঁর সমাজচিন্তা, তাঁর প্রায়-দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা, ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতি তাঁর নিতান্ত অনুরাগ, সর্বোপরি সকল বিষয়ে তাঁর গবেষণামুখী দৃষ্টিভংগী আমাকে বিস্মিত করেছে বরাবর। ভেবেছি এর একমাত্র সূত্র, নীহাররঞ্জনের চিন্তা ভাবনায় মানুষ সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক

ধারণার এবং মানবসংস্কৃতি সম্বন্ধেও সেই একই সমগ্র ধারণার ফল; তিনি total man-এর কথা ভেবেছেন total culture এর কথা ভেবেছেন। যে ঐতিহাসিক নিছক শিলালিপি পড়ছে দিবারাত্র—কিন্তু রামকিঙ্করের সাঁওতাল দম্পতি সম্বন্ধে একান্ত নিরুৎসাহ, মনে হয়, নীহাররঞ্জন তাঁকে পূর্ণ মানুষ ভাবতে পারতেন না। এবং এই সূত্র ধরেই আমি অন্য একটি জিজ্ঞাসায় পৌঁছুতে চাই: নীহাররঞ্জন কি মূলত গবেষক, না মূলত কবি! যে-কবি তাঁর কল্পনার নেত্রে এই জগৎ সংসারের চলমান ইতিহাসকে শিলালিপির মধ্যেই আবদ্ধ দেখেন নি, মানবমানবীর প্রতিদিনের প্রাণস্পন্দন যিনি মুহূর্তে মুহূর্তে লক্ষ্য করে কবিচিত্তের মতই দ্রব মথিত হতেন?

নীহাররঞ্জন মূলত কেন কবি সেই প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছিল দীর্ঘদিন পূর্বে যখন তিনি সিমলা ইনস্টিট্যুটের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। সে সময় আমি একটি সরকারী চাকুরি করতুম এবং আমার দপ্তরটির নামে বৈজ্ঞানিক দপ্তর হলেও দিনের পর দিন দেখেছি সেখানকার তথাকথিত বৈজ্ঞানিকরা নব্বই জন কেরাণীরও অধম। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মানসিকতা আমার দীর্ঘ চাকুরী জীবনে মাত্র কয়েকজনেরই দেখেছি যাঁদের নাম হাতে গুণে বলা যায়। আমি সামান্য বিজ্ঞান পড়েছিলুম একদা, আমারও যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং অঙ্ক বা পদার্থ বিদ্যার প্রতি যে অনুরাগ ছিল বেশীর ভাগ উচ্চ-চাকুরেদের অনেকেরই তাও ছিল না। এ অবস্থায় দিনের পর দিন আমার চাকুরীর প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে যাচ্ছিল। একান্ত নিরুপায় হয়েই নীহাররঞ্জনকে জানিয়েছিলুম, 'আপনি আমাকে সিমলায় নিয়ে চলুন, আমি এই দমবন্ধকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাই।' ভেবেছিলুম, উনি আমার কথাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন, কারণ বাঙালী সন্তানের জীবনের যে চরম লক্ষ্য সরকারী চাকুরিতে, আমি তখন সেরকম একটি পদে কাজ করি। নীহাররঞ্জন জানালেন, আমি শীঘ্র কলকাতায় যাচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন।

টেলিফোনে জেনে নিয়ে নীহাররঞ্জনের বাড়ি গেলাম। আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'এমন একটি ভালো কাজ ছেড়ে কেন সিমলা যেতে চান'। আমি সব খুলে বললাম। নীহাররঞ্জনের সঙ্গে আমাদের একটি ঘনিষ্ঠ নিবিড় উত্তাপজনিত সম্পর্ক ছিল, যে কোন কথা বলতেই তাঁকে, আমার অন্তত, বাঁধত না।

উনি আমার কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সচরাচর এমন গম্ভীর মুখ আমি নীহাররঞ্জনের দেখি নি। পরে ধীরে ধীরে বললেন 'অরুণ বাবু, আপনার মত লোককে সিমলায় একটি ফেলোশিপ দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর নয়। কিন্তু আমি ভাবছি 'উত্তরসূরি'র কথা, যে কবিতার পত্রিকাটিকে আপনি পুত্রস্নেহে দীর্ঘকাল লালন করেছেন, তা যে বন্ধ হয়ে যাবে! আপনার হয়তো সিমলায় গিয়ে তিনবছরে একটা বড় গবেষণা-গ্রন্থ লেখা হবে, ছাপাও হবে, পণ্ডিতমহলে খ্যাতিও হবে, কিন্তু কবি অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতা লেখায় যে ছেদ পড়তে পারে! আমি কিছুতেই চাই না, আপনার কবিতা লেখায় বাধা আসুক, আপনার উত্তরসূরি বন্ধ হয়ে যাক।' এই কথা কয়টি গভীর বেদনার সঙ্গে বলে উনি টেবিলে ঝুঁকে কী যেন লিখতে থাকলেন। আমি বুঝলাম, লেখাটা ভণিতা, ওঁর সে সময় প্রচণ্ড আবেগ জমে ছিল, আমারও চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল। এর পূর্বে কোনদিন নীহাররঞ্জনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি নি, কেন যে করিনি তাও জানি না, আসলে উনি সবসময়ই এমন বন্ধুর মত মিশতেন যে প্রণাম করবার কথা মনে হোত না। সেদিন উঠে আচমকা প্রণাম করতেই উনি দুহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি প্রায় ভাঙা গলায় বললুম, 'এই দীর্ঘদিন কবিতাচর্চায় আমি এরকম সম্মান কারু কাছে পাই নি যা আপনার কাছে আজ পেলুম। কবিতাই লিখব, উত্তরসূরি প্রকাশ করব। সিমলা যাবার আমার প্রয়োজন নেই।' বলে আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বসলুম। উনি কিন্তু তখনও কিছু ভাবছিলেন। একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা, কলকাতায় যদি কোন গবেষণার কাজ হয় তা আমি দেখছি'। উনি পরে অযাচিতভাবে (আমি ঘুণাক্ষরেও জানতামও না) বরুণ দে মহাশয়ের কাছে আমার জন্য স্যার যদুনাথ সরকারের বাড়িতে গবেষকের জন্য চিঠি দিয়ে-ছিলেন। জানলাম, যখন অপ্রত্যাশিতভাবে আমি বরুণ দে মহাশয়ের একটি চিঠি পেলাম। সেখানে অবশ্য আমার কাজ হয়নি। হয়েও হয়নি। সে কারণ আমি এখনও সঠিক জানি না। বন্ধুবর অশোক সেন মহাশয় বা সহপাঠী কেউ কেউ বোধহয় জানতে পারেন। যাই হোক, সেদিনই বাড়ি ফেরবার পথে, হাল্কা মনে, এই কথাটি ভাবতে ভাবতে আসছিলুম, নীহাররঞ্জন কি গবেষক না মূলত কবি! অবশ্য কবি যে গবেষক হবেন না, এমন কথা নয়।

আমাদের দেশে মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন, পরবর্তীকালে ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, এখনো রয়েছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ বা অলোকরঞ্জন, শঙ্খ ঘোষ। বিদেশেও অনেকে আছেন। কিন্তু নীহাররঞ্জনের বিষয় যে ভিন্ন! একদিকে কবিতা এবং অন্য- দিকে ইতিহাস।

আমার মনে হয়েছে নীহাররঞ্জনের কবি-মনই তাঁকে প্রাচীন ইতিহাসের যে স্বাভাবিক রোমান্টিক আকর্ষণ রয়েছে সেদিকে নিয়ে গেছে। যাদুঘরের শতবার্ষিক ঘরে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবসে জানা গেল, একদা তিনি কবিতাও লিখেছেন। সেসব কবিতা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আছে। সংকোচবশত তিনি কখনো প্রকাশ করার কথা ভাবেন নি। কিন্তু ভেবে দেখা যাক, তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইটি কোন্ সূত্র থেকে শুরু! শুধু কি সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি, শুধু কি একজন সাম্যবাদীর দৃষ্টি! (এ পোড়া দেশে শেষ জীবনে নীহাররঞ্জনকে ভাষা বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করার জন্য তথাকথিত সাম্যবাদীদের গালমন্দ খেতে হয়েছে। এমন কি যাঁরা তাঁর ছাত্রস্থানীয় তাঁদের কাছেও। অথচ তথাকথিত সাম্যবাদীরা জেনে রাখুন, নীহাররঞ্জনই সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর 'জনগণতান্ত্রিক' ইতিহাস লিখেছেন—যা ভারতবর্ষে এপর্যন্ত কোন সাম্যবাদী পণ্ডিত বা নেতা কল্পনাও করতে পারতেন না! আমার কথার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে আচার্য যদুনাথ সরকারের লেখা থেকেই।) আমার মনে হয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে, প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন ইতিহাসকে বহু দূর থেকে কবির দৃষ্টিতে ('distance lends enchantment to the view'!) এবং কাছ থেকে সাম্যবাদী সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন—প্রতিটি মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যকে, তাঁদের কথাবার্তা, তাঁদের কাজকর্ম, তাঁদের আচার আচরণ, শিল্পচর্চা এই সমস্তকে তিনি এই প্রগাঢ় জ্ঞানে স্বীকার করেছিলেন, চণ্ডীদাসের মতই, যে, সবার উপরে মানুষ সত্য। তাই 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' একজন কবির স্বপ্নালোকিত দেখার মত এবং সেই স্বপ্নের ভিত্তিমূলে রয়েছিল সত্য-অনুসন্ধিৎসা।

নীহাররঞ্জনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়েছিল হুমায়ুন কবির পরিচালিত 'India' পত্রিকার সূত্রে। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও কবির সাহেব একটি ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রিকার কথা ভাবছিলেন। তখন আমি তরুণ লেখক। চতুরঙ্গে মাঝেমধ্যে লিখি, কিছু কাজও করে দিই। একই

বাড়ির দোতালায় চতুরঙ্গ, একতলায় পূর্বাশা। পূর্বাশায় নিয়মিত আমার কবিতা ছাপা হোত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের আনুকুল্যে। বন্ধুবর স্বর্গত আতাওয়ার রহমানের মধ্যস্থতায় 'India' পত্রিকার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এল। সম্পাদক নীহাররঞ্জন রায়। কবির সাহেব এমন একজন তরুণ সাহিত্যপ্রেমী খুঁজছিলেন যিনি ইংরেজীর ছাত্র হলে ভালো হয়; সাহিত্য ভালোবাসেন এবং গোঁড়ামী-বর্জিত রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনার শেষে উনি সিদ্ধান্তে এলেন, এই তিনটি গুণাবলী (গুণাবলী অর্থে গুণ নয়, চাকুরীর qualification!) আমার মধ্যে রয়েছে। তখন প্রতি সপ্তাহেই নীহাররঞ্জনের ঘরে যেতে হত। ছাপা হ'ত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস-এ, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন আমার বড়দা কুসুমকুমার ভট্টাচার্য। ওঁর কাছেই লেখা, প্রুফ ইত্যাদি নিয়ে যেতাম, হাতে কলমে সেই আমার প্রেসের কাজ শেখা। বড়দা এবং নীহাররঞ্জন পরস্পর খুবই অনুরক্ত ছিলেন—সেই সূত্রে আমি খুব অল্প সময়ে নীহাররঞ্জনের কাছের মানুষ হয়ে গেলুম। নীহাররঞ্জন মূল প্রবন্ধগুলি দেখে দিতেন। শর্ট নোটস, সমালোচনা, লেটার্স টু দি এডিটর ইত্যাদি আমি দেখতুম।

'India' পত্রিকা বেশীদিন চলল না, কিন্তু নীহাররঞ্জনের সঙ্গে আমার স্থায়ী এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল—তখন ১৯৪৮-৪৯ সালের মত হবে। স্মৃতিতে দিন তারিখ সঠিক থাকে না, হাতের কাছে India-র কোন সংখ্যাও নেই। কিন্তু স্মৃতিতে থাকে হৃদয়ের উত্তাপ, হৃদয়ের বেদনা। সেই উত্তাপ এবং বেদনাই এই লেখার সূত্র। তখন নীহাররঞ্জন হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি ছেড়ে (সেটা আমি জানতুম না, আমার অগ্রজ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেদিন আমাদের জানালেন) ড. শরৎ ব্যানার্জি রোডের একটা বাড়িতে এলেন। সেখানে আমি প্রায় নিয়ম করে যেতুম এবং মনে আছে, তখনই উনি প্রায় সখেদে বলতেন, 'বাঙালীর ইতিহাস' লেখা ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছে, কে ছাপবে। কী দুশ্চিন্তা দেখেছি ওর! একদিকে ওই মহাগ্রন্থ লেখার উৎসাহ। অন্যদিকে রুচিবান ভদ্র প্রকাশক পাবার অনিশ্চয়তা। এমন কথাও তখন আমায় বলেছেন, 'যা কিছু আছে জমানো—এবং যা কিছু বিক্রী করে পেতে পারি তাই দিয়ে আমি নিজেই এ বই ছাপবো।'

সেই মহাগ্রন্থ অবশেষে বেরুলো, আচার্য যদুনাথ সরকার স্বয়ং যে গ্রন্থ সম্বন্ধে শেষ কথা বলে গিয়েছেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু এই মহাগ্রন্থ লেখার সময় এবং ছাপা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি এই মানুষটিকে কত ঘনিষ্ঠভাবে যে দেখেছি, দেখে বিস্মিত হয়েছি তাঁর অসামান্য কর্মক্ষমতা দেখে—অথচ চলাফেরায় মনে হবে যেন কোন কবি বা শিল্পী—যার আপাত কোন জাগতিক ভাবনা নেই। তারপর উনি এশিয়াটিক সোসাইটির ভার নিলেন। আমার অফিসদপ্তরের ঠিক একটি বাড়ি পরেই। এহেন সুযোগ কে ছাড়ে! আমি অফিস ফেরত প্রায়ই যেতুম ওঁর ঘরে—এশিয়াটিক সোসাইটির গুরু দায়িত্বের মধ্যেও কখনও বলতেন না, আমার কাজ বড় বেশী, আপনি অন্য দিন আসুন! বরং উঠতে চাইলে আরো বসতে বলতেন। হাতে কলম এবং নোট লেখা, এবং সেই সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনা চলত। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ওঁর গ্রন্থটির শেষ পর্যায়কে আমি বলেছিলুম, অনেকটা মুখের ওপর, যেন ক্লাশ-নোট হয়েছে। আশংকা করছিলুম, ক্ষুণ্ণ হবেন। আশ্চর্য, মৃদু হাসলেন, বললেন, 'ঠিকই বলেছেন অরুণবাবু, কাঁচা বয়সের লেখা। বইটি আবার পুরো পরিমার্জনা করব।' ওঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, বলতেন আধুনিক বাঙালীর পরিচয় রবীন্দ্রনাথে, তথাপি অন্ধ স্তাবক ছিলেন না; তার প্রমাণ মিলবে নীহাররঞ্জনের চটি বইটিতে যেখানে উনি রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্টি' শব্দটির আপত্তিকে অত্যন্ত যুক্তি সহকারে নাকচ করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির ঘরেই আমার সঙ্গে গভীর পরিচয় হয় সরসী সরস্বতী, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং এস. আর. দাশের। এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মূলে ছিলেন নীহাররঞ্জন।

নীহাররঞ্জন এর সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনার কথা এখনকার তরুণরা হয়তো জানেন না। লোকসভার সদস্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে মিলে উনি 'ক্রান্তি' নামে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন কয়েকবছর। ওইরকম উচ্চমানের রুচিশীল পত্রিকা বাংলা ভাষায় ইদানিং বেশী প্রকাশিত হয়নি। বলাই বাহুল্য, সেই পত্রিকায় আমি বহু কবিতা লিখেছি এবং যদিও সেসময় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল, 'ক্রান্তি' সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা হয়। তখন থেকেই জানি, নীহাররঞ্জন বীরেন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ভালোবাসতেন। নানা সূত্রেই নীহাররঞ্জনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়ে পারিবারিক সম্পর্কে এসো দাঁড়ালো। সময় পেলেই ওঁর বাড়িতে যেতুম। এরকম একটি বিরল সন্ধ্যেবেলার বিরল কাহিনী নিবেদন করি।

"উত্তরসূরির" পাঠকরা সবাই জানেন, আমার জীবনানন্দ-প্রীতির কথা। প্রায় সকল তরুণ বাঙালী কবির মতো আমিও জীবনানন্দের একজন নিভৃত প্রেমিক। অথচ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে নানা কারণেই আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁর কবিতাও মহৎ কাব্যের আসরে স্থান করেছে, আমার ধারণা। তথাপি জীবনানন্দের কবিতা আমার নিজের কাছে আরো ঘনিষ্ঠ, আরো উত্তাপবাহী মনে হোত। আমি জানতুম নীহাররঞ্জনের জীবনানন্দ-প্রীতির কথা। অনেকটা মজা করেই, সেই সন্ধ্যেবেলা ঘনালো অন্ধকারে, পূর্ণ দাস রোডের বাড়ির একতলার ঘরে আমি হঠাৎই ওঁকে বললুম, 'যাই বলুন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার জগৎ অনেক বিস্তৃত, সময় এবং বিশ্বজগৎ এবং বিশ্ব-চেতনা সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন বিধৃত হয়েছে জীবনানন্দে তা তেমনভাবে উপস্থিত নয়। জীবনানন্দ নিছকই ইন্দ্রিয়-চেতনার কবি, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে মননশীলতায় সমৃদ্ধ।' এই কথা যেই বলেছি, বয়স্ক নীহাররঞ্জন, বাগেশ্বরী অধ্যাপক নীহাররঞ্জন একজন তরুণতম কবির মত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমি মনে মনে এইটেই চাইছিলুম। আমার তীর স্থির লক্ষ্যভেদ করেছে এবং আমার কথা যে উনি অবিশ্বাস করেন নি তার কারণ, উনি জানতেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সূত্রে সুধীন্দ্রনাথের বাড়ি আমার অবাধ যাতায়াত ছিল।

তারপর উত্তেজিত নীহাররঞ্জনের কাছে সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতার যে তুলনামূলক আলোচনা প্রায় দুঘণ্টা ধরে শুনেছি তা চিরকাল আমার স্মরণে থাকবে। পরবর্তীকালে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দু-দুবার জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এবং প্রতিবারই নীহাররঞ্জনের সেই গভীর আন্তরিক আলোচনা আমার কাজে এসেছিল। কবিতাকে যে কত প্রাণের সম্পদ ভেবে উনি গ্রহণ করতেন তা একমাত্র কবিরাই জানতেন—যেসব কবি তাঁর কাছের মানুষ ছিল।

একবার মনে আছে, আমাদের এক বন্ধু—যাঁর বাতিক ছিল কবিদের কবিতা স্বকণ্ঠের আবৃত্তিতে টেপ এ ধরে রাখা—বললেন, আপনাদের কয়েকজন কবির কবিতা আমি ধরে রাখতে চাই। গল্পচ্ছলে কথাটা নীহাররঞ্জনের কানে তোলা হোল। তখন উনি পূর্ণদাস রোডের নূতন বাড়িতে সবে গৃহপ্রবেশ করেছেন। আমাদের উনি সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, 'আমার বাড়িতে আসর হোক, আমি হোস্ট।' একতলার ছোট ছোট দুটি ঘর তখন লম্বা একখানা বড় ঘর ছিল। সেই ঘরে কবিতার আসর বসল। অরুণকুমার সরকার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আমি নিজেদের কবিতা পড়েছিলুম। নীহাররঞ্জন সম্ভবত জীবনানন্দের কবিতা পড়েছিলেন। সেই ধুতি-চাদরে-পাঞ্জাবীতে সেদিনের তরুণ উৎসাহে বাইরের কারুপক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না যে ইনি ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন। কবি বলে সবারই ভ্রম হবার কথা! সেই টেপটি কি এখনো অক্ষত আছে! কে জানে? থাকলে বড় একটি সুন্দর স্মৃতিচিত্র বাঙ্গালীর সম্পদ হয়ে থাকতো।

'উত্তরসূরি' পত্রিকায় আমি একবার পরিকল্পনা করি চল্লিশ দশকের কবিদের নিয়ে একটা সংকলন করা যায় কিনা—যদিচ আমি নিজে 'দশক' ব্যাপারটি খুব পছন্দ করতুম না। একদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার তৎকালীন অফিসঘরে এলেন। এই সংকলন নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হ'ল এবং আমার যে স্বাভাবিক সংকোচ ছিল তা আমার এই অগ্রজ দুই কবির উৎসাহে কেটে গেল। এঁরা দুজনই বাংলা কবিতার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, বিশেষ করে সুভাষ তো দেশে বিদেশে কত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনিও যখন এতো উৎসাহ দেখালেন তখন আমি কোমর বেঁধে লেগে গেলুম।

সংকলনটি বেরুলো। শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু বসু একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে এর মর্যাদা বাড়ালেন। কবি মলয়শংকর-কৃত প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ শোভিত এই সংকলনটি এখন সকল কবিদের কাছেই অতিপরিচিত। এবিষয়ে বলবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যা বলবার তা হোল, গ্রন্থটি আমি সম্পাদক হিসেবে উৎসর্গ করেছিলুম নীহাররঞ্জন রায়কে। আমার ঘনিষ্ঠ এবং শিক্ষকস্থানীয় তিনজনকে আমি কবিতার অক্লান্ত পাঠক মনে করি, যাঁরা কবি নন। এঁরা হলেন নীহাররঞ্জন রায়, অমলেন্দু বসু এবং রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। কিন্তু মনে রাখতে

হবে, শেষের দুজন ইংরেজী সাহিত্যেরই অধ্যাপক ও বাংলা কাব্য সাহিত্যে যাঁদের লিখিত অবদান আছে। সেক্ষেত্রে নীহাররঞ্জন ইতিহাস সংস্কৃতি এবং শিল্পচর্চারই বেশি কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রীতি এতোই স্বতোৎসারিত, কবিদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এতো অকৃত্রিম যে বইটি উৎসর্গ করবার সময় তাঁর কথাই আমার সর্বপ্রথম মনে এলো।

সুভাষ এবং বীরেন এবং আমি মিলিতভাবে স্থির করলুম বইটি প্রকাশ উপলক্ষ্যে একটু আড্ডা এবং হৈচৈ করা যাক। নীহাররঞ্জনকে আমরা এসপ্ল্যানেড কফি হাউসে আমন্ত্রণ জানালুম। উনি বালকের মত উৎসাহে রাজি হয়ে গেলেন। এবং এলেন। এবং বেশীর ভাগ কবিদের আগেই ট্যাক্সি থেকে নামলেন। সেদিন আমরা ছোট কফি হাউসে—কবিদের কাছে হাউস্ অব লর্ডস্ নামে যা পরিচিত—জমা হলুম। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং আমি। লোকনাথ ভট্টাচার্য দিল্লীতে, মণীন্দ্র রায় বোধহয় ব্যস্ত ছিলেন কোথাও। রাম বসু কি এসেছিলেন? ঠিক মনে নেই।

কফি হাউসে আমরা বইটি নীহাররঞ্জনের হাতে তুলে দিলুম। ওঁর মুখে চোখে যে ঔজ্জ্বল্য, যে আনন্দের আভা সেদিন দেখেছিলাম তা কি ওঁর বহু বহু সম্মানপ্রাপ্তিকে ম্লান করে দেয় নি! কবিদেরই পণ্ডিতরা পুরস্কৃত করেন—কবিরা পণ্ডিতকে কবে কোথায় পুরস্কৃত করেছে?—বোধহয় এমন একটি আনন্দ এবং তৃপ্তি লক্ষ্য করেছিলাম ওঁর মুখে। প্রায় দুঘণ্টা কফি এবং আড্ডা চলল। একসময় সভা শেষ হ'ল। আমরা যে যার বাইরে এলুম। একটা ট্যাক্সি ধরা হ'ল নীহাররঞ্জনের জন্য। উনি একা উঠলেন না। বললেন, সবাই উঠুন, তবে আমি উঠব। শেষে দক্ষিণের কবিরা প্রায় সবাই, সুভাষ বীরেন মঙ্গলা, অরুণ সরকার, ওঁর সঙ্গে গেলেন হৈ হৈ করতে। গাড়ি চৌরঙ্গীর ভীড়ে মিলিয়ে গেল। উত্তর কলকাতার কবি আমি ও নীরেন ধীরে ধীরে রাস্তা পেরোলুম।

নীহাররঞ্জন সকল কবিকেই বুকে জড়িয়ে ধরতেন সমানভাবে। কিন্তু সমানভাবেই কি? তিনিও তো রক্ত মাংসের মানুষ। একটু বেশী কম কি থাকবে না সেই ভালোবাসায়! আমি যতদূর জানি, সুভাষকে উনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন, তারপর বীরেনকে। আমার ধারণা, আমি তৃতীয়

স্থানে। সেজন্য আমার কোন ক্ষোভ নেই। সুভাষ এবং বীরেন দুজনেই আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। আর কবি হিসেবে? নিঃসন্দেহে ওঁরা দুজন আমার চেয়ে অনেক বড়। এমন তৃতীয় স্থান আমার অঙ্গের ভূষণ। নীহাররঞ্জনের ভালোবাসার হিসেবে এতটুকু ভুল হয় নি!

বিষ্ণু

দুটি ছড়া

দুর্ভিক্ষ

১.

চুরি জুয়াচুরি জন্মে তার—
ফলো বটে, তবু রাজদুয়ার
সদা যায় আগে, উদোর পাপ
বুদো ভোগে—মজা এ বাংলার

২.

আমরা খুঁজেছি বিলেতী বইতে আপন দেশ
বার বার তাই দেশের মানুষ ডাইনে বাঁয়ে
ঘুরিয়েছি, আর হয়রাণ হয়ে শেষ
আমরা খুঁজেছি হরেক বইতে আপন দেশ—
মাঝে মাঝে বই হারিয়েছি মোড়ে নিরুদ্দেশ !
ভাবছি এবার ফিরব মোড়ল আপন গাঁয়ে ॥

কবি বিষ্ণু দে-র কোন পরিচিতি প্রয়োজন করে না বলেই সম্পাদকের বিশ্বাস।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কী যাদু তোমার গানে

সমস্ত আকাশটা কবিতা হয়ে যাচ্ছে
সারাদিনের ব্রত সেরে সবিতৃদেব এখন প্রসন্ন
তিনি বিদায় নিচ্ছেন, প্রকৃতি তাকে শেষবারের মতো
প্রেম নিবেদন করছেন

সারা রাত তার কেটে যাবে বিরহে,
অন্ধকার নেমে আসবে
কখনও তার কোলে একটি শিশু আসে
সেদিন পূর্ণিমা

আজ নয়

মাটির ওপর পিঁপড়ের মতো গাছ, পশু
পাখি, মানুষ
কেউ হাঁটে না, কেউ হাঁটে
কেউ ঘুমুতে যায়, কেউ জেগে থাকে

একটা রাত, একটা কালো বেড়ালের
মতো রাত

তারপর আবার কবিতা
সূর্যদেব!
কী যাদু তোমার গানে, পৃথিবীর দুঃখ ধুয়ে দিয়ে…

৩ আগষ্ট, ১৯৮১

পিথিবী তোর আয়না কোথায় ?

(আমার মা-কে)

১.

রাঙাকুসুম বিহান লাগে
বসুমতীর খোঁপায়
যেন লজ্জাবতীর শরম ;

লাগে রে, যৌবনের সুখ লাগে !

'ও সোনা ! তুই নিজের মুখ
দেখবি ব'লে
ভোর না হ'তে জলে নামিস ?'

'না, কিছুতেই না !
তুই কিছুই জানিস না—
জলে শরীর জুড়োয় ।'

২.

দেখতে দেখতে ফুল ঝ'রে যায়,
জীবনটা এক অবাক স্বপ্ন !

'পৃথিবী, তোর আয়না কোথায়, ?'—
'কিছুই এখন মনে থাকে না।'

সন্ধ্যা-পিদিম আলো দেখায়,
চাঁদ-কপালে কে আসে ? কে ?

ও কিছু না, বাতাস !

৩.

জীবনটা এক অবাক স্বপ্ন
দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যায়,
ফুরিয়ে যায় !

'পিথিবী, তোর আয়না কোথায় ?'
(থুথ্‌থুরে এক বুড়ি
ঘুম-পাড়ানীর গান গাইছে…)
'বুড়ি-মা, তোর খোঁপার ফুল
কোন নদীর জলে ভাসছে ?'

'ও মণি ! তোর মনে আছে ?'

'লাগে রে, যৌবনের সুখ লাগে
ভোলা কী যায় ?'

'মরণ ! তুই জোয়ান ছেলে,
ফুলের জন্য কাঁদিস !
তোর জন্য আকাশ-ভরা লক্ষ তারা··

৪.

ঘুম আসে না ;
ঘরেও না, বাইরেও না !
কবে শুনতাম ঠাকুরমার মুখের গল্প,
কবে ছিলাম জোয়ান ছেলে—
কিছুই এখন মনে পড়ে না।

'পিথিবী ! তোকে বলতে হবে
একমাথা চুল, অবাক খোঁপা
কোন পাহাড়ে রেখে এলি ?'

'বোকা ছেলে! তুই আমাকে
সত্যিকারের লজ্জা দিলি!
ঘর দেখলি, আকাশ দেখলি;
এবার বল, আর কি দেখলি?'

'বাতাস! শুধু বাতাস!'

'তার কাছে যা। যত গান তোর,
যত কান্না—
সব পিপাসার জবাব পাবি।'

'বুড়ি মা, তুই ভীষণ চালাক!—
কে বলে, তোর বয়েস গেছে?'

'ভোর হয়েছে, এবার একটু ঘুমুতে দে!'

৫.

কিছুতে কিছু আসে যায় না

ঘর পেরুলেই নদী, নদীর ধারে শ্মশান;

'ও বাপজান! কাকে আনলি?'—
'যার ঘুম পায়, তাকে।'

রাঙাকুসুম আগুন লাগে শরীর জুড়ে…

সে-সব কথা বাতাস জানে॥

২৫ আগষ্ট, ১৯৮১

চিত্ত ঘোষ

নীল হওয়া

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম
আমার সারা শরীর নীল হয়ে গিয়েছে।
আমি দেখলাম আকাশের সূর্য নীল
মেঘ নীল, গাছপালা নীল, মাটি নীল।
কাঁধের পেশীতে ঝুলিয়ে জোয়ান জেলেরা
তাদের নীল রঙের নৌকোগুলো
সমুদ্রের জলে ভাসাল।
আর আমরা সমুদ্রের কাছে বসে থাকলাম
নীল মাছের প্রত্যাশায়।

মিল নেই

বাঁকুড়ার ঘোড়া ছুটিয়ে
এক নতুন সওয়ার বহুদূর থেকে
পুরোনো ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল।
তাকে দেখার জন্য যারা ভিড় জমিয়েছিল
চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল
যে তাদের মন ভরে নি।
মনে মনে তারা ঘোড়া আর তার সওয়ারকে নিয়ে
যে ছবি তৈরি করেছিল
তার সঙ্গে আসলের কোন মিলই নেই
কারণ তারা তো ঘোড়দৌড়ের মাঠের
ঘোড়া আর সইস দেখতে অভ্যস্ত।

ছেলেটা

ছেলেটার ছেঁড়া প্যান্টের পকেটে
একটাও মার্বেল নেই
আতশী কাচ নেই।
সারাদিন ঢিল কুড়িয়ে কুড়িয়ে
পকেট ভর্তি ক'রে
বেপরোয়াভাবে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে
ছেলেটা দেখল
জারুল গাছের মগডালে
একটা লাল বল আটকে আছে।
সেদিকে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে
সূর্যটাকে পশ্চিমে চলিয়ে দিয়ে
মিষ্টির দোকানের
ডাঁইকরা এঁটো পাতার পাশ দিয়ে
যেতে যেতে
ছেলেটা একটা নীল মাছি হয়ে গেল।

জন্ম—১৯২১, ঢাকা। পড়াশোনা—ঢাকায়। পেশা—সাংবাদিকতা
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—অন্তরা ১৯৫১, শুধু সীমায় যেতে ১৯৬২, পরবাসী ঘুরে ঘুরে ১৯৭৮।

অরুণ ভট্টাচার্য

এই মুহূর্তে, স্থবিরতা

এই মুহূর্তে আমার জানালার কাছে আকাশ নেমে এলো।
এই মুহূর্তে পাখিপাখালির ডাক শুনে
গাছপালা উধাও হ'ল শূন্যে। এই মুহূর্তে
আমি দেখতে পেলুম আমারই শরীরকে,
বাইরের বাগানে শেফালিকা ফুল কুড়োতে।

এইসব মুহূর্তগুলি আমাকে কোথায় টানে,
আমার ভিতর দ্রিমিদ্রিমি মেঘের ডাক
আকাশ যেন কান পেতে শোনে।

এই সব মুহূর্তগুলি চিরকাল
স্থবির থেকে যাবে মনে হয়।

১৫.৭.৮১

প্রহরগুলি গুনেছিলাম

এইমাত্র চলে গেল হরতনের বিবি।

আমি সকালবেলা বসে বসে বকুলফুলের মালা গেঁথেছিলাম;
আমি সারা দুপুর ধরে নিস্তব্ধ প্রহরগুলি গুনেছিলাম।
আমি গভীর গভীরতর রাত্রি জেগে শুকতারার প্রতীক্ষায় আছি।

এইমাত্র চলে গেল ইস্কাবনের সাহেব।

রাজা ও রাণীর ছবি দুটি আমি
ড্রেসিং টেবিলের পাশে সাজিয়ে রেখেছি।

যখন আমার মন খারাপ হয়
ওদের সেই চলে-যাওয়ার দৃশ্যপট দেখি।

১.৮.৮১

বিশ্বভুবন স্তব্ধতায় জেগে-ওঠা

শেষ ট্রেন মুহূর্তে ছেড়ে গেল। প্ল্যাটফর্মে
আমি বসে রইলুম। নিবিড়
আকাশে দূর নক্ষত্র দেখা গেল।

এমনি নক্ষত্র দেখা যায়। নির্জন আকাশতলে
আরো নিঃসঙ্গ প্ল্যাটফর্মে
শেষ ট্রেন চলে গেলে পর
বিশ্বভুবন স্তব্ধতায় জেগে ওঠে।

এই আমার ঘর। এই চিরকালের
প্ল্যাটফর্মে দুদণ্ড-বসা, এই আকাশতল
চারিদিকে বনভূমি,—
বিশ্বভুবন স্তব্ধতায় জেগে-ওঠা।

২.১২.৮১

শেষ চিঠির উত্তরে

কৃষ্ণা, ঊষার অস্পষ্ট অন্ধকারে যে-পাখিটা উড়ে গেলো
আর সে ঘরে ফিরবে না।

আহত অভিমানে
অথবা
প্রৌঢ়ত্বের অনাদৃত সময়সীমায়
কেউ আর ঘরে ফিরতে চায় না।

কৃষ্ণা, আমি গত সন্ধ্যায়
নদীর ধারে বুড়ী অশ্বত্থ গাছের শাখায়
পাখিটাকে বসে থাকতে দেখেছি।
দেখে ডাকলুম, 'আয় কাছে আয়।'

ঘরে ফিরতে চায় না পাখি। আমার কথা
বোধহয় বুঝেছিল,
তাই
নদীর তীরে বাঁধা নৌকোর গলুইতে বসে
মাঝিকে বললো, 'আমাকে পৌঁছে দাও
সেই অকূলে
যেখান থেকে আর ঘরে ফিরতে হবে না কখনো'।

আমি বোকার মত নদীর তীরে বসেছিলুম, কৃষ্ণা
যখন তুই ডাকতে এলি। সেই উষার অস্পষ্ট অন্ধকারে।

১৫.১০.৮১

সমুদ্র কাছে এসো (২)

সমুদ্র, তুমি কাছে এসো
আমার বুকের ঢেউগুলিকে
শান্ত করে দাও।

সমুদ্র, তুমি কাছে এসো
নীল বুদ্‌বুদের মালা
আমার কণ্ঠে
পরিয়ে দিয়ে যাও।

সমুদ্র, তুমি আমার কাছে এসো
পৃথিবীর আদিমতম পাপ
শুদ্ধ করে দাও।

২০.১০.৮১

সিদ্ধেশ্বর সেন

সুগতের জ্যোৎস্না

ঘরবাড়ি ভেসেও গিয়েছে
সুগতের জ্যোৎস্নায়—
এই-ই তবে, জন্মের-ও আকাশ

ঘরবাড়ি মিশেছে কোথায়—
সুগত দেখালে
অন্ত অধিবাস

জ্যোৎস্না পড়ে, পরিনির্বাণের চরাচর
করুণায়
শান্ত হ'য়ে আছে ॥

আখর

বসে আছি আমি বিদ্যুৎ-মোড়া ঘর
আকাশ কেনবা—
তোমার প্রভাস্বর

বর্ষণে আঁখি চমকায় বাড়ে স্মৃতি
যেন আজ কেউ
দিয়ে গেল উদ্ধৃতি—

তোমার দোহাকোষের একটি
আখর

চিনে বুঝি নেওয়া
আমার-ও রাত্রি-দিবা

পরিতস্তাবধূতিকার এ ঘর ॥

চিরন্তনতার ধৈর্যে

তুমিই তো, চেয়েছিলে দেখাতে
তোমার আত্মতা

কোথাও স্পষ্ট ক'রে দিলে, কোথাও
বা চাপা

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে যেমন
রঙের
বিন্যাস ও বিকলন

বিকলনই তো বলব, যখন
তা দ্রুত
ভাঙে বা বদ্‌লায়, গড়ন

এক-একটি ধাপে, আদিগন্ত যাপে
তৎসবিতুর্বরনীয়ের ওঠা
ও নামায়

বা বিকীরণের অন্তর্লীন তাৎপর্যে—
তমসারও পারে

পরতে-পরতে বিন্যাসের আবেগময় ঐশ্বর্য
ভাঙা-গড়ায়
তীব্র

সেই অপরিমেয় রূপ-ই তবে, বিভঙ্গে
ভিন্ন মাত্রা পায়

চিরন্তনতার ধৈর্যে ॥

জন্ম ১৯২৬। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অরণি'তে, 'প্রস্তুতি'। ১৯৭১ তে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছন্দমুক্তির লিরিক'। প্রকাশিতব্য কবিতাগ্রন্থ 'সিঁড়ির শেষের কবিতা ৫'।

আলোক সরকার

মুহূর্ত

ফুলগুলো দেখতে খুব ভালো লাগলো। একবার দেখলাম
তারপর আবার দেখলাম।

যতক্ষণ ফুলগুলো দেখছিলাম ততক্ষণ
ফুলগুলোর কথাই ভাবছিলাম।

নীল রঙের পাপড়ি, তার ভিতরের
লাল আর হলুদ মেশানো কেশর।

হাওয়ায় একটু একটু দুলছিল, যখন দুলছিল
সারা পৃথিবীটাই দুলছিল সঙ্গে-সঙ্গে।

সেটা একটাই মুহূর্ত কেবল একটা বিকেল
সকাল নয় সন্ধে নয় দুপুর নয়।

হলুদ আর লাল মেশানো কেশর নীল রঙের পাপড়ি
ঝেঁকে উপচে পড়ছে গাছ

দশবারোটা গাছ, দশবারোটা গাছ মিলিয়ে
কতো বড়ো কত বড়ো সেই বাগান

পুরো একটা পৃথিবী আর তার মাঝখানে আমি
ফুলগুলো ছাড়া আর কিছুই দুলছিল না।

প্রেম

ঘরটা সুন্দর ক'রে সাজিয়েছিলে। আমি ভাবছিলুম
কত না পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমায়।

ঘরের ভিতরে এলাম আর তখনই
সারা ঘরটাই তুলে দিলে আমায়।

এমন ক'রে দেওয়া কজন পারে? সাজিয়ে তোলা
সে তো আর সহজ কথা নয়।

এমনকি ঘরের মেঝেতেও রঙ রাখোনি কোনো, দেয়ালে তো বটেই
সাদা আর শূন্য, তো একই কথা।

ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ সারাটা ঘরই
আমার হাঁটাচলায় বাঁধা দেয়নি কোনো।

কোথায় সরিয়ে ফেললে ফুলদানি, তেপায়া টেবিল
না জানি কতো কষ্ট হয়েছে ঘর সাজাতে তোমার!

এমনকি সেই আলমারি, আলমারির পিছনের কালো দাগ
সব দাগ মোছামুছির কাজ কি সহজ!

আমার জন্যে কত দরদ তোমার সারা ঘরটাই
ধবধব খাঁ-খাঁ রঙের সাদা

আর সেই গমগম শব্দ—এইরকম একটা ঘর
আমরা থাকবো বলেই তো তুমি রচনা করেছো।

পুবদিক

বয়স কিছুতেই বাড়ছে না। এখন এই সকালবেলায়
তোমার হাত ধ'রে দৌড়ে পার হচ্ছি হিজলতলা।

তুমিও বেণী দুলিয়ে ছুটছো, লাফিয়ে উঠে
ছিঁড়ে নিচ্ছ লাল টকটকে রঙ্গন।

আর ওই শরৎকালের রোদ্দুর—তুমি মনে করতে পারো
এমন একটাও মুহূর্ত যখন ঝলমল সোনালী আলো ছিল না?

কারা উঁকি দিয়ে দেখছে আমাদের? কেউ কি দেখছে?
শরৎকাল এমন একটা আলো যা কিছুই দেখায় না

কেবল এই দৌড়ে যাওয়া লাফ দিয়ে উঠে
নাড়া দেওয়া শিউলিডালে, শিউলিও ঝরে অবিশ্রাম।

সারাটা জীবন শিউলি ঝরছে অবিশ্রাম। হলুদ রঙের বোঁটা
কতো নিশ্চিত আর তীক্ষ্ণ সেই অভিমান, শিউলিডালের উপর

সাদা কুয়াশার রঙে তাকিয়ে আছে হেমন্ত? কেই বা তাকে দেখছে!
জমাট দানা বেঁধে উঠছে হলুদ আর সেই অহংকার—

দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরি আঁচল, চলো চলো পুবদিকে
পুবদিক ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না, আরো আরো পুবদিক।

রচনাকাল: ১৯৩২। রচনাস্থান: কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায়। শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: অমৃতসম্ভব রাত্রি। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ: খোলামকুচি।

বৈদিক সাহিত্যে অক্ষর এবং শব্দ-অর্থের দ্যোতনা

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্রাচীন সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় এই যুগের অবাচীন মন নিয়ে করা কষ্টকর। কষ্টকর এইজন্যে, এই নিয়ে বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রক্ষা করেছেন, যেমন তার সঠিক কাল-নির্ণয়ের ব্যাপারে তেমনি তার প্রকৃতি-নির্ণয়ের ব্যাপারে। কাল ব্যাপারে যতটা মতবিরোধ কিন্তু শব্দের তদর্থ নির্ণয়ে ততটা নয়। যেমন অর্থে শব্দ নিয়ে সবাই বলেছেন—এ সেই সময়কার ঘটনা যখন তাদের ধর্ম কৃষিযুগের সাথে যুক্ত ছিল। তবু এর প্রকৃতি নিয়ে ভিন্ন মত তৈরী হয়েছে, এই কৃষি নিয়ে বিভিন্ন শব্দ—'পঞ্চক্ষিতি' 'পঞ্চকৃষ্টি'। অর্থে শব্দ কী কোন শ্রেণীবাচক না ধর্মবাচক? শ্রেণী হলে একভাবে চিন্তা করতে হয়, ধর্ম হলে অন্যভাবে। কিন্তু ভাষ্যকাররা একটি সুবিধা তৈরী করেছেন, যখন শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে দেখেছেন। কৃ শব্দ বৈদিক অর্থ চাষ করা, এবং আর্য শব্দ সেই অর্থে স্পষ্ট। কিন্তু স্থান এবং স্থিতি ব্যাপারে 'পঞ্চকৃষ্টি'-র ব্যাপারে বিভিন্ন ভাষ্যকার দুই অর্থ রেখেছেন, যাস্কসায়ণ এই অর্থে দেব-গন্ধর্ব-নিষাদ প্রভৃতি ধরেছেন। ম্যাক্সমূলার, মুইর (Muir)—ফাইভ নেশানস্ ও ফাইভ্ ট্রাইবস্ অর্থে। নেশনস্ কিম্বা ট্রাইবস্ আমাদের কাছে যতটা প্রচলিত কিম্বা পরিচিত, গন্ধর্ব দেব সেই অর্থে নয়। কিন্তু কিছু পণ্ডিতের ধারণা, গন্ধর্ব গান্ধার দেশের প্রাক্ নাম, এবং এই গান্ধার দেশের কথা ঋগ্বেদের নদীর ধারায় যায়া স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। কিন্তু দেব শব্দ? মহাভারতের ধারণানুসারে হিমালয়কে দেবস্থানের পথ বলে দেখান হয়েছে এবং অথর্ববেদের একটি ঋকেও (১৯।৫।৩।৮) সেই রকম ধারণা রাখে। প্রসঙ্গটি আর একদিক থেকেও বিবেচ্য, যাস্ক দেব শব্দে বিষয় বলে রেখেছেন, এই অর্থে দেব শব্দ ব্যাপক অর্থ প্রকাশক। একজন আধুনিক ভাষ্যকার নিষাদ অর্থটাকে আরও ব্যাপক করেছেন। পণ্ডিত রাধাকুমুদ নিষাদ-গন্ধর্ব অর্থ অন্য কিছু নয়, আর্যধর্ম বিস্তারের পর পরবর্তী ঘটনা মনে করেছেন : 'mark of inferiority is being wiped out...The non-Aryan began to count as an Aryan.'[১]

প্রশ্নটি এই জন্যেই রাখা হচ্ছে, এতসব পরিচিতির পর চতুর্থ পাঠকের কাছে কি ধরণের বিভ্রান্তি আনে? এবং সতর্কতা অবলম্বন না করলে সেই বিভ্রান্তি আরও বিশেষ ধরণের বিসম্বাদ তৈরী করতে পারে। মুইর-এর ধারণানুসারে তারা ট্রাইবাল, কিন্তু প্রকৃতই কী ঋগ্বেদের নিষাদ বলে যে শ্রেণী তা কি সেই ধরণের ট্রাইবাল, ঋগ্বেদের দাস কিম্বা দস্যু সেই রকম। এ ধরণের চিন্তাও সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে—বর্ণ তাদের অন্যরকম হলেও, এই দাস কিম্বা দস্যুরাই দ্রাবিড় সভ্যতার ধারক, এই দাস কিম্বা দস্যুরাই ঋগ্বেদের পণিশ্রেণীর বাহক এবং ঋগ্বেদীয় শ্রেণীর বিবেচনায় যারা বৈশ্য এবং অজ্ঞাবাদের পোষকতা না করে ভিন্নযজ্ঞের পোষকতাবাদী। আমরা এখনই সেই প্রসঙ্গে না-গিয়ে য়ুরোপীয় এক শ্রেণীর পণ্ডিত যে কথাটা বেশী করে রেখেছেন, আর্যধর্ম এক জাতীয় কেল্টিক ধরণের দস্যুতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই আলোচনায় যাবার আগে আমরা ঋগ্বেদের আরেও কতগুলো বিশেষ শব্দ ধরতে চেষ্টা করব।

যদু শব্দ সেই যুগের ঐতিহাসিক তাৎপর্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এই শব্দের অর্থ আবার জলও হয়, যেহেতু যদু সমুদ্রপারের মানুষ ছিলেন? এবং সমুদ্র হলে তা কোন সমুদ্র? 'রয়ি' শব্দ সেই যুগে ধনের পরিবর্তে ব্যবহার হত, অনেক পণ্ডিতের ধারণা— রাজা শব্দের আদি নিবাস এই 'রয়ি' শব্দে। গো কিম্বা অশ্ব শব্দ আমরা বর্তমানে যেভাবে দেখি, পশুবাচক এই দুই শব্দ সেই যুগে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হত। আমরা যখন যা-ই ভাবি না কেন, সেই যুগের গঠনাত্মক বোধ ধরবার জন্যে পরিবর্তনের এই সূত্রগুলোই আমাদের কাছে একমাত্র বীজস্বরূপ নথি। এই দিয়েই ধারণা করা যেতে পারে—তাদের কালের বিশ্বাস-ধর্ম-আচরণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি ধরণের রূপান্তর এনেছিল। বিশ্বামিত্রের একটি ঋকের বর্ণনা আলোচনার্থ রাখি। তাঁর সেই ঋকে (৩.৯.৯) এই কথা আছে—৩৩৩৯ জন দেবগণ অগ্নির পূজা করেছেন। এই বর্ণাত্মক সংখ্যায় এই আছে, যা আগে দেব-এর আলোচনার বীজস্বরূপ আমি রেখেছি, এই দেব কারা —যারা অগ্নির পূজা করেছেন? এবং তাদের সংখ্যাই কি এই ঋকে বর্ণিত? এবং দেবস্থান যদি হিমালয় হয় এ কি সেই স্থান দিয়ে চিহ্নিত? কিন্তু পণ্ডিতেরা এর অর্থ এক একরকম করেছেন, সায়ণএর অর্থ ধরেছেন—এ হচ্ছে দেব-এর মহিমাবাচক সংখ্যা। নিরুক্তকারের ধারণানুসারে দেব-এর অর্থ যদি বিষয় হয়,

তাহ'লে সায়ণের ঐ ব্যাখ্যা সামনে রেখে ধারণা করতে পারি—অগ্নির কারকতা সন্ধানে এতগুলো বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে তার মহিমা পেয়ে শেষ পর্যন্ত ৩৩-এ পৌছেছিল। এই ঋকের 'নব' শব্দটা তাহ'লে তার-এ পরিপূরক। যদি তাই হয় তাহলে বহু সময় তার জন্যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্বমিত্রের আর একটি ঋকের উল্লেখ রাখি। সেই ঋকে দেখা যায়—পুরাতন মধ্যতন ও বর্তমান প্রসঙ্গে মন্তব্য (৩।৩২।১৩)। এই মন্তব্যে সুষ্ঠভাবে ধরা পড়ে, বিশ্বমিত্রের পূর্বেও ইন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যয় করা হয়েছে, যদিও সে কালের বাস্তব ভিত্তি ছিল; কিন্তু তার সঠিক বিবরণ এই ধরণের উল্লেখে নেই, শুধু ইঙ্গিত রেখে সামান্য উল্লেখ ছাড়া। কিন্তু শুধুমাত্র উল্লেখে ভ্রমও তৈরী করতে পারে, যেমন ভ্রম তৈরী করে ঐ ধরণের ৩৩৩৯ সংখ্যা। তবু এই ধরণের ইঙ্গিতাত্মক উক্তিই হবে একমাত্র নথি। কিন্তু একটি বিষয়ে নৈশ্চিত্য আছে, বস্তু জগৎ-এর সঠিক জ্ঞান নিয়েই তারা তাদের বক্তব্যকে রেখেছিল, এই অঙ্গীকারের ভিতর যেমন তাদের সামাজিক সম্পর্কের কথাও ধরা আছে, তেমনি আছে বিশ্বাস আচরণ নিয়ে নীতিবোধের বিষয়, তেমনি আছে ঐতিহাসিক চেতনা নিয়ে প্রাক্‌কাহিনী রক্ষা করার অনুপ্রেরণা যা বৈদিক ভাষায় বলা হয়েছে—শ্রুতি। সূর্যের বিভিন্ন নাম নিয়ে যখন তার সত্তার কথা রক্ষা করা হয়, তখন ধরা যায় পুষ। কোনসময়ের সূর্য কিম্বা মিত্র কিম্বা সবিতা। ঠিক এইরকম অগ্নির বিভিন্ন নাম, জাতবেদা বনস্পতি। যেমন ঋক্ষ নক্ষত্র, ঋক্ষ মানে ভল্লুক। এত পশু থাকতে হঠাৎ এই নক্ষত্র ভল্লুকের সাথে যুক্ত হল কেন, এ কি তাদের সেই সময়কার ঘটনা যখন পশু হিসেবে শ্বেতভল্লুকই ছিল একমাত্র ঘটনার বিষয়? তাহলে এ কি তুষারযুগের শেষ অধ্যায়ের ঘটনা যখন আশ্রয়ের জন্যে বিভিন্ন স্থানে দৌড়তে হোয়েছিল, না কি মাদলিনিয়ান—মানে প্রাচীন প্রস্তরযুগের সময়? যদি বস্তুগ্রাহ্য জীবনের দ্বারা তাদের কাল নির্ধারিত হোয়ে থাকে তাহ'লে এই ধরণের চিন্তা আসা স্বাভাবিক, কারণ আমরা দেখেছি, এই ঋক্ষ নক্ষত্রই পরবর্তীকালে নাম নিয়েছিল—সাতজন ঋষির নাম সঙ্গী করে সপ্তর্ষি! আরও স্পষ্ট হয়, যখন দেখি জ্ঞানের ধারণাকে সম্বন্ধ রেখে বস্তুর রূপান্তরের ধারণাকে স্পষ্ট করে ধরার চেষ্টা, যেমন একটি ঋক্: এই অগ্নি যেমন জলে তেমনি প্রস্তরের ভিতর তেমনি বনে-জাত ওষধির ভিতর (২।১।১)।

বিভিন্ন বস্তুর ভিতর অগ্নির এই অবস্থান, এর নাম কি দেওয়া যায়— বিজ্ঞানগত আচার নিয়ে প্রথম কর্ম না অজ্ঞাবাদের প্রথম সোপান ? অগ্নির নাম যে জাতবেদা কিম্বা বনস্পতি তার প্রথম সূত্র ? যেভাবেই ভাবি না কেন, তারা যখন দ্যাবাপৃথিবীর সূত্র ধরে অগ্রসর হতে চেয়েছিল তখন এই ধরনের জ্ঞানই তাদের কর্মক্ষমতার ব্যবস্থা রেখেছিল। ইন্দ্রের নৈসর্গিক সূত্রকে যদি ধরতে হয় তাহলে অগ্নির এই অবস্থানগত তাৎপর্যের অর্থ বুঝে নিতে হবে। অগ্নি যেমন সূর্যকে বুঝবার প্রথম কারক ছিল, তেমনি শক্তির রূপ বোঝার জন্যে ইন্দ্ররূপী ব্যক্তি তাদের দ্বিতীয় কারক ছিল। সেজন্যে তাদের সাহিত্যে এই দুই দেব নিয়ে (কিম্বা বিষয় নিয়ে) সূক্তের আধিক্য এত বেশী। এটা যেমন জ্ঞানগত বিষয়ের ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে এসেছে তেমনি জ্ঞাতভাবেও। অজ্ঞাতসারে মানে, স্থানস্থিতি নিয়ে যুদ্ধের সময় আগুনের ব্যবহার যেমন তাদের সাহায্য করেছিল তেমনি সাহায্য করেছিল ইন্দ্রের শক্তিরূপী ঘটনাগুলো। সেজন্যে প্রাথমিক অধ্যায়ে ঐহিক বোধ নিয়ে ইন্দ্র যেমন একজন বিশেষ পুরুষ ছিল, পরবর্তীকালে সেই পুরুষই লেজেণ্ডস-এর আকার নিয়ে নৈসর্গিক জগৎ-এর শক্তিতে রূপান্তরিত হল, যেমন ঋক্ষ নক্ষত্র সপ্তর্ষিতে। এটাই বৈদিক যুগের দ্বিতীয় অধ্যায়, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাই আমরা যুদ্ধকালীন অধ্যায় রেখে সূক্তগুলোতে পাই, তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক রুচি কিভাবে পরিবর্তিত হোয়েছে তার সংবাদও। এগুলোকে ধরে রাখবার জন্যে পুরাণ কাহিনীর প্রয়োজন হোয়েছিল, যার ইংরেজী ধারণায় এক নাম 'cosmological myths or accounts', বৈদিক ধারণায় বিশ্বতত্ত্ব। কিন্তু য়ুরোপীয় হুইলার-পিগোট প্রভৃতির চিন্তামানস এটা ধরতে পারেন নি। ইন্দ্রের যুদ্ধকর্মজনিত ঘটনাগুলোর ওপর দৃষ্টি রেখে তাঁদের পুরো মানসিকতা-যুদ্ধের দ্বারা আক্রান্ত হোয়ে এক ধরণের ট্রাইবাল মানসিকতার দ্বারা চালিত হোয়েছে। যদিও আমরা জানি, এই ঋগ্বেদে যুদ্ধের বিবরণ নিয়ে চারটে বৃহৎ যুদ্ধের বর্ণনা আছে। প্রথম যুদ্ধ ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের, দ্বিতীয় ইন্দ্রপন্থী শম্বরের সঙ্গে—যার স্থায়িত্ব চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ছিল। তারপরেই দেখি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন নিয়ে একটি সময়, যাকে বলা যেতে পারে নহুষ-কশ্যপের কাল, এই যুগের ধারণানুসারে প্রথম রেনেসাঁস—যেখানে দেখি ঐহিক চিন্তা ছাড়া তাদের চিন্তা অন্যদিকে চলে গিয়েছিল, যুদ্ধের

যান্ত্রিকতার ভিতরও নাক্ষত্রিক জগৎ-এর সাথে যুক্ত থাকো। এর পরেই দেখি তৃতীয় যুদ্ধ, পণি নামক বৈশ্যভাবাপন্ন শ্রেণীদের সঙ্গে এবং এই যুদ্ধেরই পরিণতি-স্বরূপ শেষ যুদ্ধ সুদাসের সঙ্গে। এই শেষ যুদ্ধের পর দেখা যায়, আর্য সংস্কৃতি প্রসারের ব্যবস্থা নিয়ে দ্বিতীয় প্ররোচন.। তৃতীয় যুদ্ধ আরম্ভের আগে, অর্থাৎ কশ্যপ-নহুষের সময়ে, যা কেবল আকারের ভিতর নিবদ্ধ ছিল তা সাকারের রূপ গ্রহণ করেছে। পণি শ্রেণীভুক্ত বৃ-বুর সঙ্গে ভরদ্বাজের যে সম্মিলন তা তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। বৃ-বু যেমন যাজ্ঞিক ও প্রাজ্ঞ তেমনি আর্যধারক ভরদ্বাজ! কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতকুলের ট্রাইবাল মানস এই সম্পর্কের কথা ঋগ্বেদীয় আচার থেকে খুঁজে বের করতে পারেন নি, কিম্বা বোঝেন নি। করলে টের পেতেন—সংঘর্ষের পর সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হয় নি, বরঞ্চ তার অস্তিত্ব আরও দৃঢ়বদ্ধ হোয়েছিল। কক্ষীবাণের সূক্ত তার সংবাদদাতা। সেখানে দেখা যায়, কক্ষীবান শিক্ষালাভের জন্যে গান্ধার থেকে এসে ঘটনাচক্রে সিন্ধুদেশের রাজার সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত হোয়েছিলেন (১।১২৫-২৬ সূক্ত)। যদি য়ুরোপীয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে হয়, আর্যদের কাজাইট্ ধরণের মানসিকতা সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের কারক, কিন্তু এই ধরণের যোগাযোগ তা অস্বীকার করে। বরঞ্চ কক্ষীবানের সূক্ত এই কথাই বলে, বিশেষ সাংস্কৃতিক বন্ধনের এই সময়কার হিমালয়ের চতুষ্পার্শ পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও আসে, এই কক্ষীবান কোন সময়ের—তাকে কি খৃঃ পূঃ ২৩০০ অব্দের পরে আনা যায়? যদি তা না-হয় তাহ'লে আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কথা স্বীকার করতে হয়—এই দুই সভ্যতা পাশাপাশি থেকে পরস্পর পরস্পরের প্রতিপূরক ছিল। বৈদিক সূক্তের ক্রিয়াপদগুলো লক্ষ্য করলেও ধরা যায়, তাদের যুদ্ধের প্রায় বর্ণনাই তাদের প্রাককালের বর্ণনাগুলো স্মরণ করে রচিত। এবং এ-ও বোঝা যায়, তাদের জ্ঞানগত ক্ষেত্রে শক্তির চেতনা জাগ্রত রাখবার জন্যেই এই ধরণের মানসক্রিয়ার প্রয়োজন হোয়ে পড়েছিল—যা ইন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে এই প্রবন্ধে একটু আগে বলা হোয়েছে। আমরা মেটারলিংকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি: 'Have we not here the whole of Darwinian evolution confirmed by geology and foreseen at least 6000 years ago?'[২] এই উক্তি কি পিগোট প্রভৃতির চিন্তা থেকে ভিন্নতর নয়?

এই ধরণের সময় সংকেতকে পিগোট বোধ হয় 'ফ্যাণ্টাসি' বলে অসূয়া দেখাবেন, যে অসূয়া তিনি তিলককে নিয়ে দেখিয়েছেন। কিন্তু আমাদের কাছে শিল্পে শালীনতা বোধ নিয়ে য়ুরোপের একটি সময়ের কথা মনে হয়: 'the theorizers of the 16th century were debating (by highly codified and crabbed conventions)...... In real life a sad event tends to concentrate or purify our sad feelings to the point where we either do not notice, or may even resent...'।[৩] এবং এখানকার 'sad event'? সঠিক বিচারের মানসিকতার অসদ্ভাব না বিশেষভাবে 'codified conventions' দ্বারা চালিত মানস?

আলোচনার্থ তিন ধরণের মন্তব্য পাশাপাশি রেখে যদি আমরা অগ্রসর হই, উত্তর বোধ হয় পাব।

ঋগ্বেদীয় সাহিত্য নিয়ে পিগোটের মন্তব্য: 'artless barbarism...in sophisticated sanskrit verse' (এখানে sanskrit verse শব্দদ্বয় লক্ষণীয়), পিগোট তাঁর 'Pre-historic India' বই-তে ম্যাক্সমুলারের এই উদ্ধৃতিটা রক্ষা করেছেন: 'even sublime, but frequently childish, vulgar and obscure' (এখানেও vulgar ও obscure শব্দদ্বয় দ্রষ্টব্য), এবং কিছুটা উচ্ছ্বাস রেখে মেটারলিংকের মন্তব্য: 'where from the depths of agnosticism which thousands of years have augmented'—এই তিন মন্তব্যের সাক্ষাৎ পেয়ে পাঠক হিসাবে আমাদের কর্তব্য? স্পষ্ট তিন ধরণের প্রতিক্রিয়া, পিগোটের কেল্টিক ধরণের অসূয়া রেখে মন্তব্য, এবং অসূয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ম্যাক্সমুলারের মন্তব্য উদ্ধার, এবং এই দুই মন্তব্যের বিরুদ্ধসাক্ষ্য রেখে মেটারলিংকের ধারণা। অন্য কোন প্রসঙ্গ না-রেখে আমরা কি চসারের দিকে তাকাব? কেউ যদি বলেন, সেকস্‌পীয়রের 'comprehensive soul'-এর কথা চসারে নেই, কি হয়? কিম্বা কেউ যদি বলেন, সেকস্‌পীয়রের বীজ চসারে নিহিত, তা কী ভুল?

উত্তরের ভিতর না-গিয়ে আমরা শুধু বৈদিক সাহিত্যের একটি সূক্তের উল্লেখ রাখি। সপ্তম মণ্ডলের শেষ সূক্তটিতে (৭।১০৪) যুদ্ধের বর্ণনা নিয়ে যেসব আয়ুধের বিবরণ রাখা হোয়েছে তা প্রাচীন প্রস্তর যুগের ধারণার কথা আনে,

কিন্তু এই সূক্তেই নৈতিক বোধ নিয়ে দু'টো মূল্যবান শব্দ নিহিত—সচ্চ, অসচ্চ। এই দুই শব্দ কী তাদের বিশ্বতত্ত্ব ধারণার প্রথম বীজ? প্রশ্নটি নঞর্থকরূপে না-রেখে সদর্থকরূপে রাখি। উপনিষদের মূর্ত-অমূর্ত, কিম্বা পরা-অপরা, কিম্বা পরা-অবর, কিম্বা বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে ঋগ্বেদের সেই বিখ্যাত সূক্তটি (১০।৮২), এইসব ধারণা কিম্বা বিশ্বাসের আদি জনক এই রকম—সচ্চ অসচ্চ শব্দ। বৈদিক পাঠকেরাও জানেন কি কারণের জন্যে সেই যুগে বশিষ্ঠ মিথরূপে গ্রাহ্য। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা রাধাকুমুদের একটি উদ্ধৃতি আশ্রয় নিই : 'Vedic education is to be studied as an integral part of Vedic thought and life. It will be understood in the light of certain concepts and technical terms in which are concealed and stored up the traditions governing the general philosophy and scheme of life of the Vedic age. These terms came to be established as the outcome of an important movement and trends of thought which they reflect........ The "Key-words" of Vedic Culture supplying cue to much of Vedic thought that appears to be somewhat mystical and mysterious, and strange modern ways of thinking.'[৪]

এই ধরণের 'Key-words' কিম্বা বীজস্বরূপ শব্দই সেই যুগের মানসক্ষেত্র ধরবার সাহায্য করে, যা বশিষ্ঠের 'সচ্চ অসচ্চ' শব্দের ভিতর ছিলো। যখন ঋক থেকে ঋষি শব্দের গঠন দেখি তখন ঋগ্বেদীয় ছন্দের রচয়িতা কারা এবং কোন সমাজমানসের ধারক তা স্পষ্ট হয়, কিম্বা যজ্ঞের ধারণা থেকে ঋত্বিক শব্দের আবির্ভাব হয়, তখন বুঝতে পারি বিপ্রমনীষী-ধীরা কোন তাৎপর্য বহন করে। নাক্ষত্রিক জগৎ-এর প্রতিকী শব্দ সপ্তর্ষি এবং তা সংযুক্ত করে যে 'পুরাণ' শব্দ যার আর এক ইংরেজী নাম 'symbol of creation', এর তাৎপর্যগত অর্থ আরও প্রসারিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য, এই শব্দগুলো কোনক্রমেই পিগোটের কেল্টিক ধারণা নিয়ে বারবারিয়ান শব্দের সাথে যোগ করা যায় না! বরঞ্চ তা প্রশস্ত মানসিকতা রেখে অন্যরকম, আগেই বলা হোয়েছে দু ধরণের সাংস্কৃতির মানসিকতার যোগফলই এই ধারাকে আরও প্রস্ফুটিত করেছে, ভারতীয় চিন্তা-

মানসিকতার ঐতিহ্য বলে কোন বস্তু যদি থেকে থাকে তা এই ধারার প্রতিশ্রুতি, এবং তা রক্তের সাথে যোগ রেখে একটি যুগের পর আর একটি যুগকে রক্ষা করেছে, পরবর্তীকালে বোধ হয় মহাভারতীয় যুগের শেষ পর্বে তা বোধ হয় ভাগ হ'তে আরম্ভ করেছে। ব্রাহ্মণ শব্দটা তখন অন্যরকম ধারণা পোষণ করছিল, তার প্রথম সাক্ষ্য কপিল, পরবর্তী সাক্ষ্য বুদ্ধ। শব্দের আন্তরধর্ম যে কি বিরাট ছিল, তা ধরা যায় কপিল এবং বুদ্ধের মূল বৈদিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত না-হবার প্রচেষ্টায়।

যদিও প্রসঙ্গটা অবান্তর, তবু শব্দের ঐতিহ্যগত শক্তি যে কি বিরাট তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। সবাই বোধ হয় স্বীকার করবেন, যোগী শব্দের আদি বীজ ঐ বৈদিক ঋক শব্দে। সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত কিছু ভাস্কর্যের বিভাসে তার আন্তরলক্ষণ স্পষ্ট। বসার ভঙ্গীতে, বসনভূষণে, হাঁটুর ওপর যেভাবে হাত রাখবার ব্যবস্থা—সিন্ধুসভ্যতার নগরকেন্দ্রিক মানসিকতার জন্যে হুইলার একটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য দেখে নাম দিয়েছেন—প্রিষ্টকিং, কিন্তু তার বিশেষণ রেখেছেন এই বলে—'state of *yogi* or myst'cal contemplation'। জানি না এই বিশ্লেষণ হুইলার সচেতন মনে রেখেছেন কিনা, রাখলে এই ধরণের বিবরণ কিছুতেই আনতে পারতেন না: 'The sculptural art as the Indus has produced there has no real affinity with the sculptures of Sumer......Indus terracotas are in a different world from those of Mesopotamia......The integrety of Indus Civilization stands unchallenged.'[৫] মৃৎপাত্রের ওপর যেসব বৃষ-অশ্বথের প্রতিরূপ কিম্বা সেই শিল্পের পশ্চাৎপটে নক্ষত্রের অনুকল্প রেখে বিভাস কোন্ ঐতিহ্যের প্রতিভাস? কিম্বা এই বৈদিক সাহিত্যের-ই অথর্ববেদের ধারায় ঐহিক বিজ্ঞান নিয়ে সেই যুগের রসায়নশাস্ত্রের এই বিরাট প্রতিভাস তার কারক কারাপণি শ্রেণী, না যার আধুনিক নাম সিন্ধুসভ্যতা?

প্রশ্ন হলেও, তার উত্তর সাপেক্ষানুমানের।

২.

কিন্তু মুস্কিল, সংরক্ষণশীল মন উপরোক্ত ঘটনা 'আরোপিত' বলে পাশ কাটাতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি সেই সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপাদান

ধরবার দু'টো রাস্তা আছে, যেমন তার ভৌগোলিক সূত্রের দ্বারা যেসব দেশের বর্ণনা রাখা হয়েছে তার প্রাচীনতার দ্বারা কৃষি ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে যেসব উপাদানের বর্ণনা আছে তার পরিচয়ের দ্বারা, পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মূল্যায়ন যেভাবে এসেছে তার সময়চিহ্নের দ্বারা—আবার ব্যক্তিই সামাজিক ক্ষেত্রে একটি সমস্যা তৈরী করে শ্রেণীচেতনাকে আরও প্রশস্ততর করল, যেমন নবম মণ্ডলে ব্যক্তির পারিবারিক গণ্ডী নিয়ে যে-চেতনার কথা আছে দশম মণ্ডলে সেই ব্যক্তিই শ্রেণীগত চেতনায় অন্যরকম মূল্যায়নের কথা বলছে, এবং স্পষ্টভাবে বলছে—কোনটা প্রাচীন এবং কোনটা আধুনিক। কিম্বা যুদ্ধোপকরণে যখন প্রস্তরনির্মিত আয়ুধের কথা আসে তখন তা যে-ধরণের প্রাচীনতার কথা বলে, কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্রে যখন রথ গরু দ্বারা চালিত হয় তখন সেই প্রাচীনতার সীমা আরও কমে যায়!

আরো মুস্কিল হচ্ছে, বেশ কিছু শব্দ এবং ভৌগোলিক সংবাদের দ্বারা। 'নিবিদ' বলে একটি মন্ত্রের সংবাদ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, এই মন্ত্রের বিষয় বেদ থেকেও প্রাচীনতর এবং এই মন্ত্রের ধারকেরাও তেমনি। বৈদিক সূক্তে তা দেখা যায়, প্রয়োজনার্থে বৈদিক ঋষিরা এই নিবিদ মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের বক্তব্যকে স্থাপন করছেন—এতে ধারণা হয় সেই 'নিবিদ' মন্ত্রের ঋষি এবং বৈদিক ঋষিরা একই সাংস্কৃতিক মানস দ্বারা চালিত হতেন, যদি তা না হতেন তাঁরা এই নিবিদ মন্ত্রগুলো বর্জন করতেন! কিন্তু প্রশ্ন, এরা কত কালের প্রাচীন—এই সংবাদ ঋগ্বেদের সংহিতায় নেই। আবার কিছু কিছু আছে ভৌগোলিক সমস্যা নিয়ে। বৈদিক সূক্তগুলোতে দেখা যায়, বিশেষত বসন্তের সমুদ্র তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়, যেখানে শুধু বিষয়ে না—ক্রীড়াক্ষেত্রের মানসে নৌকায় বিহার তাঁর কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল। তাঁর এক ঋকে দেখা যায় (৭।৯৫।২) সরস্বতী নদীর গতি সমুদ্রাভিমুখে, এ কোন্ সমুদ্র? যে সমুদ্র হিমালয় ও প্রাচীন আর্যাবর্তকে বিভক্ত রেখেছিল? বহু ঋকের দ্বারাই ধারণা হয়, সিন্ধুকে যেভাবে নদী বলে দেখি, অতিপ্রাচীনকালে বোধ হয় তা ছিল না—অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তের বিবরণের দ্বারা সিন্ধুকে সমুদ্র বলেই ধারণা আসে।

যেহেতু এগুলো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সেই হেতু তার সমাধানও তত সরল

রেখায় আসে না। যেমন এই সাহিত্যের ছন্দ, যার একটি কথা আছে অপৌরুষেয় আর একদিকে তা রক্ষার জন্যে বিধিব্যবস্থা। যখনই ঋকের জন্ম নেয় তা কি অপৌরুষেয় আকার নিয়ে আসে, আসলে সেই বস্তুটি কী? এবং তার পরিমার্জনার জন্যে এত সব অঙ্গ বা ব্যাকরণ, কিম্বা ধ্বনিযুক্ত স্বরের ব্যবহার—তার ভিতর কী অপৌরুষেয় রীতিই কার্যকরী ছিল না কি বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে আর একটি বিশেষ বস্তু? প্রাচীন কথায় যার নাম লিপিমালা আধুনিক ভাষায় যার নাম—বর্ণ বা অক্ষর! যদি থেকে থাকে তা কি সেই প্রাচীন যুগের প্রত্যন্ত সময়ে না তারও পূর্ববর্তী? প্রশ্নটি এই কারণেই রাখা হচ্ছে, ঋগ্বেদের প্রাচীন ঋষিদের দ্বারা রচিত একটি ঋকে (৯৷৬৭৷৩২) আরও প্রাচীন ঋষিদের উল্লেখ রেখে বলা হচ্ছে, ঋক্‌পাঠের ব্যবস্থাকে কিভাবে প্ররোচক ধর্ম হিসাবে রক্ষা করতে হয়। এবং তাই যদি হয়, এ আমরা অনায়াসে ধারণা করে নিতে পারি, এই পাঠচর্চা তাঁদের ধারণানুযায়ীই অত্যন্ত প্রাচীন, হয় তা লিপিমালার দ্বারা না-হয় অপৌরুষেয় মানসিকতার অধিকারী হোয়ে আর একটি শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে সেই শ্রেণীরও কারক হয়েছিল, যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল—শ্রুতর্ষি। এখানকার পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন, অপৌরুষেয় প্রবচন থাকলেও তার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে অন্যবস্তুর প্রয়োজন হয়েছিল। সেইদিকে যাবার আগে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আর একটি ঘটনার প্ররোচনা আমাদের দৃষ্টি টেনে নেয়। কশ্যপের সময়ে যে নহুষ তিনি কী আর এক ধর্মের প্রবক্তা? (এখানে বলে রাখা ভাল, ধর্ম শব্দ বৈদিক যুগে কখনই ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে দেখা হয় নি, তার সরল অর্থ বিধান কিম্বা শাসন।) কিন্তু নহুষের ঘটনায় আমরা দেখি অন্য একটি শাসনের ঘটনা। যদি আমাদের পরবর্তী সাহিত্য কিম্বা ইতিহাস মেনে নিতে হয়, তাতে দেখি—পুরাণ মহাভারতে—ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতি এবং তার স্থানে নহুষের স্বর্গপ্রাপ্তি ও সেখানকার রাজা হওয়া। এটা ইঙ্গিতাত্মক ঘটনা, ইন্দ্রের কালের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা অন্য ইতিহাস-ও বলে। প্রাচীন ইরানীয় ইতিহাসে দেখা যায়, যারা ইন্দ্রের ধর্ম স্বীকার না-করে অন্য ধর্মের স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল তাদেরই 'অসুর' বলা হত। আমাদের সাহিত্যে-ও দেখা যায়—ঋগ্বেদীয় সাহিত্যে যে-অসুর শব্দ দেব-এর বিশেষণে প্রযুক্ত পরবর্তী কালে তার ভিতর রাজসিকতার গুণারোপ করে এই 'অসুর'

শব্দ ভিন্ন চেহারা নিয়েছিল—গীতায় এ নিয়ে একটি বর্ণনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ কথাগুলো এজন্যেই বলা হচ্ছে, একটি শব্দ পার্শ্ববর্তী প্রকৃতি নিয়ে তার প্রাথমিক গুণ থেকে বিচ্যুত হোয়ে কিভাবে পাল্টে যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঋগ্বেদীয় ছন্দ, যা ম্যাকডোনালের ভাষায়—'a remarkable degree of metrical skill'—সেই ছন্দ ঠিক এইভাবে না, তার মানসক্ষেত্র কিভাবে বিভিন্ন শব্দের দ্বারা ব্যাপক হোয়ে প্রসারিত হচ্ছে তা ধরা যায়। এর কালকে সহজ করে ধরবার জন্যে আমরা কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কশ্যপকেই ধরব, যেহেতু এই কশ্যপ-নহুষের সময়েই ঋগ্বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটেছে। এবং তাদের 'অপৌরুষেয়' শব্দটা, যদি তার প্রকৃতই ঐশ্বর্য থেকে থাকে, কিভাবে এসেছে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই গ্রীক্ নিয়মের আপ্তবাক্য নয়—তার ভিতর 'inspired'-গত প্ররোচনা থাকলেও তা 'out of sense' নয়। বরঞ্চ তা বাল্মীকির মানসক্ষেত্রের মত, ক্রৌঞ্চের ঘটনা দেখার পর যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ আমরা দেখেছি, বাস্তবর্জিত বিষয় তাদের মনকে কখনই বিচলিত করতে পারে নি, বরঞ্চ কোন বিষয়ের বস্তুগত বিশ্লেষণের পর তার স্বরূপবর্ণনা রেখেছিল। এ যেমন ঐহিক ক্ষেত্রজাত বিষয় নিয়ে এসেছিল তেমনি ঘটেছিল নৈসর্গিক-তত্ত্বজাত বিষয়ের ক্ষেত্রে। যে কথা আমরা এই প্রবন্ধে আগে কিছুটা অগ্নি কিম্বা ইন্দ্রের ধারণা নিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি, দ্যাবাপৃথিবী শব্দটা সেই বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে রাখলে তা ধরতে আরও সুবিধা হয়। ছন্দের ঘটনাটা-ও আমরা সেই হিসাবে দেখতে চেষ্টা করব।

ছন্দের সংখ্যা নিয়ে একটি ঋকের বর্ণনা: পঞ্চদশ সহস্র উক্থ আছে (মানে ছন্দ), দ্যাবাপৃথিবী যেমন বৃহৎ এই উক্থের পরিমাণও তেমনি (১০।১১৪।৮)। এখানে সংখ্যার প্রয়োগ যেমন লক্ষণীয় তেমনি লক্ষণীয় আক্ষরিক অর্থে দ্যাবা-পৃথিবীর সাথে তার তুলনা। এই সূক্তে এই ইঙ্গিত-ও আছে, এমন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কি আছেন যিনি সর্বছন্দে জ্ঞানবৃদ্ধ? আবার কশ্যপের আর একটি ইঙ্গিত: ছন্দোময় বাক্য উচ্চারণ করতে করতে ব্রহ্মা সোমের আনন্দবর্ধন করছেন (৯।১১৩।৬)। এ কোন্ ব্রহ্মা যিনি ঋত্বিক ব্রহ্মা, না সেই প্রবাদপুরুষ যিনি বৈদিক সাহিত্যে একজন মিথ্‌রূপে গণ্য? কিন্তু এই ঋকের আনন্দ 'শব্দটি' দ্রষ্টব্য, সেই যুগে সঙ্গীতাত্মক বোধ কিভাবে এসেছে তার ইঙ্গিতবাহক

শব্দ। যেভাবেই দেখি না কেন, দ্যাবাপৃথিবী কিম্বা আনন্দ—তাদের মানসিক বোধকে ধরবার জন্যে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। যে-কথা এই প্রবন্ধে পূর্বে বলা হোয়েছে, যেখানে আকৃতি ছিল ঐহিক পর্যায়ে তা বদলে নৈসর্গিক ধারণার সাথে যুক্ত হচ্ছে। কশ্যপের আর একটি ঋক্: আকাশের গ্রহনক্ষত্র ও সূর্যের বিভা যেন আমাদের কাছে জাজ্জল্যমান থাকে (৯।৯১।৬)। পুষা নামক সূর্য যাযাবর যুগে যেভাবে ছিল, সেখানে ছিল স্থানস্থিতি নিয়ে আকৃতি (সুক্ত ১।৪২।১ কিম্বা ৬।৫৪।১) এখানে সেই আকৃতি পরিবর্তিত হোয়ে আকাশের গ্রহনক্ষত্রের সাথে সম্বন্ধ রাখতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও আসে তারা কি করতে পেরেছিল—ঐহিক জগৎ-এর সম্পর্ক ছাড়া মনের ক্ষেত্রের জন্যে আরও একটা জগৎ আছে, তা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন যে সদর্থক ছিল, এই ঋকগুলোর প্ররোচক ধর্মই তার ইঙ্গিত বহন করে। আরও কয়েকটি ঋকের দিকে দৃষ্টি দিলে তা বোধ হয় স্পষ্ট করা যায়। যেমন

দশম মণ্ডলের একটি ঋক: যিনি মুনি, আকাশে বিচরণ করার মানসিকতা রেখে তিনি সব কিছু দেখতে পান, তার ভিতরে প্রবেশ করে সর্বস্থানে ভ্রমণ-পারঙ্গম হন (১০।১৩৬।৪-৫)। আমাদের পূর্ব পরিচিত 'যোগী' শব্দ যা আমরা হুইলারের সিন্ধুসভ্যতার ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে তার আন্তরধর্ম কিভাবে আসে তার কারণ এখানে (স্পষ্টভাবে না হলেও) বিভাসের আকার রেখে বর্ণিত। ওপরে যেসব ঋকের কথা রেখেছি তাতে এই কথাও স্পষ্ট, আকাশের প্রসঙ্গ রেখে তাদের নিষ্ঠা কিভাবে আন্তরিকতার সাথে বর্ধিত হচ্ছে। কিন্তু মুস্কিল বোধ হয় আধুনিক ভাষ্যকারদের কাছে—তারা দশম মণ্ডলের ঐ ঋক বোধ হয় খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবেন না, যেহেতু সেই যুগানুযায়ী এই ঋকের ঋষি আধুনিক। সেজন্যে আরও একটি প্রাচীন ঋকের দিকে তাকাই। তৃতীয় মণ্ডলের একটি ঋক্: কবিদের জিজ্ঞেস করা সৎকার্য ও মনঃসংযম দ্বারা স্বর্গ সৃষ্টি করেছিলেন (৩।৩৮।২)। এখানে বসিষ্ঠের সেই সচ্চ-'অসচ্চ' শব্দটি কি স্পষ্ট করে উল্লেখিত। সৎকার্য ও মনঃসংযম, এই দুই শব্দ 'কবি'-র তাৎপর্য যেমন রক্ষা করছে তেমনি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে একটি বিশিষ্ট কর্মপ্রেরণায়। এটাই মেটারলিংকের ভাষায় যেমন ছিল—ইভোল্যুশন, তেমনি ঐ ভূখণ্ডের আর একজন ম্যাকডোনালের ভাষায় 'a true expression of infinite'।

সেজন্যে সমস্ত ব্যাপারটাই যদি বিশ্লেষণের আধারে রেখে অগ্রসর হওয়া যায়, দেখা যায় সপ্তঋষির রচিত সূক্তের শেষ ঋকটি পাঠচর্চা নিয়ে একটি স্পষ্ট নির্দেশ আরও দেয় সেই কালের দ্বারা রচিত অন্যান্য সূক্ত কিম্বা ঋকে, যার ভিতর—ভাণ্ডার বিভিন্ন ভাব নিয়ে যেমন কথা আছে, তেমনি আছে প্রচলিত-অপ্রচলিত ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে, ভাষার গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে, পণ্ডিত-অপণ্ডিতের প্রশ্ন নিয়ে, শিক্ষার ব্যাপারে ব্যাকরণের প্রসঙ্গ নিয়ে—এই সব বিষয় স্পষ্টভাবে বলে দ্যায়, প্রথম দিকে মন্ত্রের ব্যাপারে অপৌরুষেয় বলে একটি বস্তু থাকলেও, যুগের প্রয়োজনানুযায়ী একটি লিখিত ভাষা ছিল, না-হয় অতসব বিধির প্রসঙ্গ আসে না। যে কথা আগে বলা হোয়েছে শ্রুতির প্রসঙ্গ নিয়ে। শ্রুতি শব্দটা তারা কখনই 'কবি' কিম্বা 'দ্রষ্টা' শব্দের সাথে এক পংক্তিতে রাখে নি, যারা কাব্যগুণ-সম্পন্ন না, যাস্কের ভাষায় যারা 'অবর' কিম্বা নিকৃষ্ট তাদেরকেই শ্রুতর্ষি বলা হত, এবং তাদেরকেই বেদসংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হত। স্মৃতি ধরার যোগ্যতা দেখার পর তাদেরকে শিক্ষার জন্যে গ্রহণ করা হত। এ ছাড়া বৈদিক ভাষার আরও একটি শব্দ যার নাম—গাথা, পুরোপুরি মনুষ্যরচিত, ডিভাইন নয়। এত সব ঘটনা, স্পষ্ট করে, প্রাথমিক যুগে 'অপৌরুষেয়' মন্ত্রের রচনা থাকলেও পরবর্তী যুগে লিখিত ভাষা বলে একটি বস্তু প্রচলিত হোয়ে গিয়েছিল, এই কথা বর্তমানে আধুনিক পণ্ডিতেরা-ও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। তা প্রথম দিকে চিত্রলিপি বা pictograph আকারে ছিল, পরে হয়ত তা বর্ণমালার আকার নিয়েছে—যার ইতিহাস কিছুটা সিন্ধুলিপিতে কিছুটা ব্রাহ্মীলিপিতে। আলোচনার্থে রাধাকুমুদের মন্তব্য সামনে রাখি: 'several passages of the Rigveda have been already cited showing definite reference to *Akshara* as the root of the Rigveda explained by Sayana...of 1.164.41 which refers to expansion of speech in a thousand (i.e. innumerable) letters...Again the verses vi. 53. 5-8 use metaphors which can only be suggested by the practice of writing in vogue...The evolution of letters alphabets and writing may, therefore, be assumed as aid to learning for an age which paid so much attention to the purity

and rules of pronunciation of the text.'[৬] এখানে দুই ঋষির যে ঋক্ নির্দেশ হিসাবে রাখা হোয়েছে প্রথমটির রচয়িতা দীর্ঘতমা এবং পরেরটি ভরদ্বাজের, কাল হিসাবে দীর্ঘতমা ও ভরদ্বাজের সেই যুগানুযায়ী ব্যবধান বেশ প্রচুর। এ ছাড়া বৃহস্পতির ঋক্ ও নির্দেশ হিসাবে রাধাকুমুদ রেখেছেন, এবং রাধাকুমুদের শেষ লাইনটি-ও দ্রষ্টব্য—উচ্চারণের শুদ্ধতা ও স্বরসঙ্গতিরক্ষণের জন্যে বিধি। যে বিধির ব্যাপারে আমি এই উল্লেখ রাখতে বাধ্য হোয়েছিলাম—এইসব ঘটনার ধারক হিসাবে সেই কাল, যেখানে সামাজিক ক্ষেত্রের প্রসারতা অনেক বেশী করে ঘটে গিয়েছে, যেখানে পূর্বে ছিল ঋকের গান একক পরিবেশে তা চলে যাচ্ছে সমষ্টিগত ক্ষেত্রে। শ্রুতর্ষির অনুষঙ্গ নিয়ে যে-কথা আগে বলেছি, সেটা আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি জ্ঞানযুক্ত বিষয়বস্তু আলোচনার জন্যে তারা একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করত, বৈদিকভাষায় যার নাম সত্র। শ্রুতর্ষি-র ব্যাপারটা ছিল গুরু ও শিষ্যের ভিতর, কিন্তু সত্রের ঘটনাটা ছিল বিভিন্ন পণ্ডিত-সমাগমের দ্বারা, যারা বিভিন্ন শাখা-র দ্বারা বিভক্ত ছিল এবং এইসব শাখা-র উচ্চারণ পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন এই সম্বন্ধে মধুসূদন সরস্বতীর বক্তব্য রাধাকুমুদ এইভাবে বলেছেন: 'for each veda there are several Sakhas, and their differences arise from various readings'। এইগুলো এইজন্যে বলা হচ্ছে সমস্ত অধ্যায় একটি প্রাথমিক অবস্থা থেকে কিভাবে সমস্যা থেকে সমস্যাতর অবস্থায় চলে গিয়েছিল, তার রীতি ও শুদ্ধতা রক্ষার জন্যই কেবল না, যেহেতু তা পরিবারকেন্দ্রিক আওতা থেকে বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের ভিতর। আমরা দীর্ঘতমা ও বৃহস্পতির যে সময়টা পাই, সেই সময় ও সেই যুগানুযায়ী আর একটি দ্বিতীয় রেনেসাঁসের সময়, যে-যুগ আমরা দেখেছি কশ্যপ প্রভৃতির সময়ে তা থেকে এই সময় আরও দুর্বোধ্য জটিলতর হোয়ে গিয়েছিল। ভাষার দিকে যেমন নতুন আকার নিচ্ছে, ব্যবহারেও শ্লেষবিদ্রূপের পরিচিতি দেখা যাচ্ছে, যেমন বৃহস্পতির উক্তি—যাদের সঠিক জ্ঞান নেবার শক্তির অভাবে তাদের ভাষার দিকে না-এসে মাঠে কিম্বা তাতলীনীয় থাকা শুভ (১০।৭১।৯)। এই সব ঘটনার দ্বারা আমরা ধারণা করে নিতে পারি, লিখিত ভাষা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, যা নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের ভিতর সন্দেহ, তার ব্যাকরণগত নিয়ম-ও তেমনি একটি

বিশেষ স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। রাধাকুমুদের আর একটি উদ্ধৃতির আশ্রয় নিই :
'The Rigvedic sanskrit exhibits a much greater variety of forms than classical sanskrit more numerous cast-forms than both nominal and pronominal inflexion, more participles and gerunds, greater evolution of verbal forms as illustrated in the frequent use of subjective and infi itive which alone has twelve forms of which only one has survived in classical sanskrit and lastly greater elaboration in respect of accent.'[৭] এই উদ্ধৃতির ভিতরও দেখা যায়, ব্যাকরণশাস্ত্রের যে এত বিধিবিধান তার একমাত্র কারণই ছিল সেই সংহিতার উচ্চারণের ক্ষেত্রে শুদ্ধতা রক্ষা করা। এবং সেই যুগে এই শুদ্ধতা রক্ষা করার ব্যাপারে যাদের ব্যবহার করা হতো তাদের শ্রেণী হিসাবে 'চারণ' নামও দেওয়া হোয়েছিল যাদের ইংরেজীতে বলা হত—'living library'।

এবং উপরোক্ত বিধি বিধানগুলো সামনে রেখে আমরা এখন স্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি, ঋগ্বেদীয় সাহিত্যে যা আমরা ছন্দ বলে দেখি, তার পেছনে সেই ছন্দের ধারা রক্ষার জন্যে কি ধরণের কর্মযজ্ঞ ছিল। আজকালের ধারণায়, একটি যুগের পরিবর্তনে যে ধরণের সময়সীমার পরিচয় পাই, সেই সময়সীমার পরিচিতি রেখে সেই যুগকে বোধহয় চিহ্নিত করা যায় না, নিশ্চয় সেই যুগানুযায়ী তা কয়েকহাজার বছরের প্রয়োজন হোয়েছিল। কশ্যপের কালে যে আকার ছিল সহজগম্য কিন্তু বৃহস্পতি দীর্ঘতমার সময়ে তা সেইভাবে সহজবোধ্য ছিল না, ছিল পুরোপুরি দুর্বোধ্য। অলংকার শাস্ত্রের দু'টো উদাহরণ সামনে রেখে তার আভাস নিতে চেষ্টা করি।

অত্রি ঋষি অত্যন্ত প্রাচীন ঋষি, বিশিষ্ট গোত্রপ্রবরদের ভিতর একজন, সপ্তর্ষির ভিতর একজন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডল তারই পরিবারভুক্ত ও অনুসারকদের দ্বারা তৈরী। এই মণ্ডলে 'বৃষ' শব্দের অনুপ্রাস নিয়ে একটি ঋক্ এই রকম : বৃষা গ্রীবা বৃষা মদো বৃষা সোমো অয়ং সুতঃ/বৃষগ্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম (৫।২০।৩)। এখানে বৃষ শব্দ সেই যুগের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না-করে ব্যবহার করা হোয়েছে বর্ষণের কারক অর্থে অভীষ্টবর্ষী হিসাবে। এর বাংলা

ঊর্জমায় এইরকম সোমবর্ষণের জন্যে যে-প্রস্তর তা বর্ষণকারী, সোমজনিত যে হর্ষ তা-ও সেইরকম, তার নিঃসৃতরসের ধারা-ও তাই, হে বর্ষণকারী ইন্দ্র। তুমিই মরুৎদের সহায়ক হোয়ে প্রকৃত বৃত্রহন্তা! ইন্দ্র কিংবা বৃত্র যদি ঐতিহাসিক অর্থে পুরুষ হয় এখানে সেই ঐতিহাসিক পুরুষ নৈসর্গিক অর্থে পর্যবসিত। দ্যাবা-পৃথিবী যদি জ্ঞান জগৎ-এর নৈসর্গিক নিয়মে প্রথম সঙ্গী হয় সেই সঙ্গী নিসর্গের তাৎপর্য নিয়ে নতুন ভাবে পরিবেশিতা এটা কী পরিক্রমাজনিত অনুষঙ্গ?

দ্বি তীয় উদাহরণ রাখি দীর্ঘতমা ঋষির একটি সূক্ত থেকে। যেখানে দেখা যাবে উপমা তার বিষয়ীভূত প্রসঙ্গ নিয়ে কত ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করেছে। আলোচনার সুবিধার্থেই সমস্ত ঋকটাই বা লায় রাখছি। সর্বসেবনীয় জগৎপালক হোতার মধ্যমভ্রাতা সর্বস্থানে ব্যাপ্ত, তার তৃতীয় ভ্রাতা ধারণকর্তা, এই ভ্রাতৃ-গণের মধ্যে সাতপুত্র বিশপতি শুধু দৃশ্য (।১৬৪।১)। এই সূক্তের যদি সায়ণ ভাষ্য না-থাকত এর উদ্ধার করা দুষ্কর হত। সায়ণ হোতার অর্থ করেছেন— আদিত্য, মধ্যম ভ্রাতার অর্থ বায়ু, তৃতীয় ভ্রাতার অর্থ অগ্নি, সাতপুত্র হচ্ছে সূর্যের সাতটি রং। পরিচিত শব্দগুলো প্রতীকের দ্বারা আশ্রিত হোয়ে কিভাবে তার অর্থ—আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয়—সিম্বলিজম্, কোলরিজের ভাষায় 'Words into things and living things too'—কোলরিজের এই বয়ান রেখে-এ-ও কি সেইরকম? যে-হোতা যাজ্ঞিক কারণের মানে যুক্ত তা নৈসর্গিক আকার রেখে অলংকৃত হোয়ে আরও ব্যাপকতর রূপ নিল, অন্যান্য শব্দগুলো-ও সেইরকম, এবং এ কী উপমা ও উপমেয়র রূপ রেখে আরও দুর্বোধ্য! ম্যাকস্-মূলারের ভাষায় তাই 'অবস্কিওর'—এবং আমাদের জিজ্ঞাসা—অত্রি থেকে এই দীর্ঘতমার ব্যবধান?

৩.

কাব্যবিচারের ধারা নিয়ে এলিয়ট তাঁর নর্টন বক্তৃতা শেষ করার সময় একটি উক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন—'lines only sing when they cannot kiss', এবং এই বক্তব্যটা ঘুরিয়ে এলিয়ট তাঁর বক্তব্যটা এইভাবে শেষ করেছিলেন: 'poets only talk when they cannot sing'। আমি এলিয়টের প্রসঙ্গ এই জন্যেই রাখছি না, যেহেতু তিনি বৈদিক সাহিত্যের একজন সৎপাঠক

ছিলেন। রাখছি এইজন্যে, বৈদিক সাহিত্যের স্বরসঙ্গতিকে ধরতে এইরকম বিন্যাস সাহায্য করে। আরও রাখছি এই কারণের জন্যে, তিনি ঐতিহ্যবোধের ধারক হিসাবে তার একজন উত্তরসাধক ছিলেন, যার বীজ ভল্টেয়ারে জন্ম নিয়েছিল (যদিও তা অন্যভাবে) এবং গিবন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা যে-কারণের জন্যে ভল্টেয়ারের সেই দিক্‌কে স্বীকার করেছিলেন 'from barbarian to civilization'। কিন্তু পিগোট প্রভৃতিরা কেল্টিক মানসিকতা নিয়ে 'codified conventions'-এর দ্বারা সম্বদ্ধ। পিগোটের এই কথা যদি সত্য হয়— the introduction of agriculture in the fourth or fifth millenium B. C. and from which the bulk of our information on pre historic India comes'—তাহলে 'যব' বলে যে একমাত্র শস্যের কথা ঋগ্বেদে আছে (যা পিগোটও স্বীকার করেন) তার সময়সীমা কি পরিপ্রেক্ষিতে আসে, সুমের না মিশর ? কিন্তু কৃষিকর্মের উপাদান নিয়ে যেসব দ্রব্যের বর্ণনা আছে, তা কোন যুগের কথা বলে ? এগুলো উপাদান, এইসব দৃষ্টির সাথে নিজেকে সম্বদ্ধ না রেখে পাশ কাটাতে গেলে বুদ্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য মেলে না, কিম্বা আমাদের দেশে ঐ বৈদিক সাহিত্যের পরে যে-সব সাহিত্যের সৃষ্টি হোয়েছে তার ভিতরেও সেই যুগের বহু উপাদান ছড়ানো-ছিটানো। যেমন মহাভারত-রামায়ন। একটি সাধারণ উদাহরণ, মহাভারতে দেখা যায় যুধিষ্ঠির যখন তাঁর নগরে যাচ্ছেন তার বর্ণনা এই বলে রাখা হচ্ছে— তখন রোহিণী নক্ষত্র, বসন্ত কাল। এই রোহিণী নক্ষত্রে যখন বসন্ত কাল হত, এখন থেকে কত বৎসর আগে, তা কী খৃঃ পূঃ ২৪০০ অব্দের পরে রাখা যায় ? রামায়ণেও এই রকম সংবাদ রামের জন্মসংবাদ নিয়ে রাখা হোয়েছে—তখন পুনর্বসু নক্ষত্র, চৈত্র মাস, তা কী খৃঃ পূঃ ৪০০০ অব্দের পরে আসে ? এবং ঋগ্বেদেও দশম মণ্ডলে 'রাম' বলে একজন খ্যাতনামা রাজার সংবাদ পাওয়া যায়, সে কোন্ রাম ?

কিন্তু মুস্কিল, আমাদের কাছে ধরে দেওয়া হোয়েছে আয়নার টোপে ধরে দেওয়া একটি সংবাদ—খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ ! এ দেখে আমাদের পণ্ডিতজন আক্ষেপ করেন : 'আমরা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে ও ইতিহাসে ভ্রান্তমতই ছাত্রদের শিখাইতেছি।'[৮] পণ্ডিতজন আর্যভাষার অনুপান নিয়ে হিন্দি-ভাষার উল্লেখ

রাখেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতজনের এই কথা-ও আছে—যেমন রেমণ্ড ড্রেক-এর : 'waves of light-skinned Aryans migrated from the crowded plains of the Ganges and skirting the Himalaya, swept southwards Persia, westwards to Greece and on to the Gaul, bringing their culture and their Gods, and Sanskrit, the language of civilization, the root of tongue we speak today.'৯

এ কি গ্রাহ্য? আধুনিক কালে আরও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে ড্রেক্-এর এই কথার স্বীকৃতি দেয়—যেমন ইতালি ও রাশিয়ায়, এবং আমরা-ও জানি—সুমের কিম্বা রুশীয় টার্কিস্থানে প্রাচীন প্রস্তরযুগের নথিপত্রে এমন কতগুলো সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সংবাদ আছে যা অন্য দেশের সংস্কৃতির দ্বারা পরিশ্রুত—পিগোট প্রভৃতিরা বলতে পারেন নি, এরা কারা! এরাই কী ড্রেক্-এর সেই 'light-skinned Aryans'?

আমরা ঐতিহাসিক তাৎপর্যে না গিয়ে সামবেদে রক্ষিত একটি স্বস্তিবচনের আশ্রয় নি : কল্যাণকর বস্তু, দেখবার জন্যেই আমাদের চোখ, কল্যাণকর বাক্য শুনবার জন্যেই আমাদের কান, সেজন্যেই বেঁচে থাকা আমাদের সার্থকতা। (১৮৭৪) বাক্-এর এই ধরণের বিভাস দেখে মেটারলিংক উচ্ছ্বাসের আধিক্যে জিজ্ঞাসা এনেছিলেন : 'Is it possible to find in our human annals, words more majestic, words more full of solemn anguish, more august, more devout, terrible?'

উত্তর—ঐ সামবেদের স্বস্তিবচন!

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর জন্যে আমি হরফ প্রকাশনীর ঋগ্বেদ সংহিতা সামবেদ সংহিতা ও অথর্ববেদ সংহিতার সাহায্য নিয়েছি। পিগোট সম্বন্ধে যে-উল্লেখ এই প্রবন্ধে রাখা হোয়েছে তা তাঁর 'Pre-historic India' বই-এর ওপর নির্ভর করে। এ ছাড়া নিম্নলিখিত বইগুলোর সাহায্য বিশেষভাবে নিয়েছি :

১. Aacient Indian Education : Radhakumud Mukherji p-52

২. ঐ থেকে উদ্ধৃতি পৃঃ ৪৯

৩. A short History of Literary Criticism: W. K. Wimsatt p-163

৪. As in 1 p-1

৫. The Indus Civilization: S. M. Wheeler, p-136

৬. As in 1 p-28

৭. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিগদর্শন-রূপরেখা : পশুপতি মাল : পৃঃ ২

৮. Spacemen in the Ancient East. W. Raymond Drake Ch. III, p-31

মেটারলিংক, ম্যাকডোনালের যে মন্তব্য এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হোয়েছে তা সবই রাধাকুমুদের 'Ancient Indian Education' বই থেকে নেওয়া। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার কোথায় মিল, এ ধরবার জন্যে স্বামী শংকরানন্দের 'Rig-Vedic Culture of the Pre-historic India' বইখানা পড়ে দেখতে পারেন, তাঁর ঐ বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে স্পষ্ট করে প্রমাণের দ্বারা দেখান হোয়েছে—'মহেঞ্জোদড়োতে সিন্ধু সভ্যতার যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, তা ঋগ্বেদে বিধৃত বৈদিক সভ্যতারই একটি সুপরিণত অঙ্গ।' ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'Man in India' সিরিজের প্রবন্ধগুলোতেও এই অনুসন্ধিৎসার অনেক জিজ্ঞাসার সন্ধান মিলতে পারে।

মৈথিলী সঙ্গীতগ্রন্থ রাগতরঙ্গিণী

রাজ্যেশ্বর মিত্র

মিথিলার কবি লোচন ঝা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করে (১৬৮১) অষ্টাদশ শতকের রাজা নরপতি ঠাকুরের অনুরোধক্রমে "রাগতরঙ্গিণী" নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রধানতঃ কাব্যে রচিত; কিন্তু এতে কিছু গদ্যে আলোচনাও আছে। সর্বাপেক্ষা যেটা চিত্তাকর্ষক, সেটা হচ্ছে এই যে, গ্রন্থটির তিনভাগই মৈথিলীভাষায় লেখা এবং একভাগ মাত্র সংস্কৃতে রচিত। গ্রন্থকার প্রধানতঃ তিরহুত তথা মৈথিল জনপদের রাগসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অঞ্চলের গানের বিবিধ বিশেষত্ব বর্তমান। তার মধ্যে যেটি প্রধান সেটি হল কবি বিদ্যাপতির সঙ্গীত সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট একটি চিন্তা ছিল, সেটিই এগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। মধ্যযুগে মিথিলার সঙ্গে বাংলার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল; সেই সূত্রে মিথিলার সাঙ্গীতিক প্রভাবও বাংলায় কম পড়েনি। অতএব এদিক থেকেও এই গ্রন্থটির অনুশীলন প্রয়োজন। এ পর্যন্ত এটি যে কেন অনুবাদ করা হয়নি সেটাই আশ্চর্য ঠেকে। গ্রন্থটি যে এখানে একেবার অপরিচিত ছিল এমন নয়; পূর্ববর্তীযুগে একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি এর পাণ্ডুলিপি দেখেছেন এবং বিদ্যাপতির কোনও কোনও পদ সংগ্রহও করেছেন; কিন্তু এর বেশী আর করা হয়নি। অবশ্য, তাঁরা যে সব পাণ্ডুলিপি দেখেছেন সেগুলি পূর্ণাঙ্গ ছিল না এবং কয়েকটিতে সঙ্গীতাংশ কমই ছিল। তবে, সঙ্গীতের দিক থেকে আগ্রহ নিয়ে এই পাণ্ডুলিপি দেখা হয়নি। প্রধান উদ্দেশ্য বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ হওয়াতে এদিকটা কেউই মনোযোগপূর্বক অনুধাবন করেন নি। অবশেষে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র দ্বারাভাঙা রাজপ্রেস থেকে 'মৈথিলি কবি লোচন' কৃত "রাগতরঙ্গিণী" গ্রন্থটি সম্পাদিত করে প্রকাশ করলেন। এই গ্রন্থটকে প্রায় পূর্ণাঙ্গই বলা চলে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে দেখা গেল আমাদের বৈষ্ণবপদাবলীর সুবৃহৎ সঙ্কলন-গুলিতেও বহু পদের অভাব রয়েছে। এমনকি শেষতম বৈষ্ণব কবিতার যে সঙ্কলন পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করে গেছেন, তাতেও বিদ্যাপতির বেশ কিছু পদ পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীও অপরাপর মৈথিল কবিদের কোনও পদই সন্নিবেশিত হয়েছে বলে মনে হল না। প্রকৃতপক্ষে রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থে

মিথিলার উৎকৃষ্টতম বহু বৈষ্ণব পদ সংরক্ষিত হয়েছে এবং পদকর্তাদের সংখ্যা আঠারো উনিশজনের কম নয়। এই সব পদের সঙ্গে বাংলাভাষার সম্পর্ক সুনিবিড়; অতএব এগুলি সঙ্কলিত হওয়া একান্তভাবেই প্রয়োজন ছিল। বর্তমান প্রবীণ অধ্যাপকদের কেহ কেহ এই গ্রন্থের রেফারেন্স তাঁদের গ্রন্থে প্রদান করেছেন এবং অপেক্ষাকৃত নবীনদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক যে এই গ্রন্থের সঙ্গে অপরিচিত, এমনটা আমার মনে হয় না; তথাপি গ্রন্থটির গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ মহলে আদৌ স্বীকৃত হয়নি। সঙ্গীত জগতে এই গ্রন্থটির আলোচনাও অকিঞ্চিৎকর বললেই চলে এবং বর্তমান সঙ্গীত জগতের যে অবস্থা তাতে এ বিষয়ে কিছু আশা না করাই বোধ করি ভাল। তাই, আস্থা আমাদের সাহিত্যজগতের সুধীজনের প্রতিই সমাধিক; কেননা এ পর্যন্ত সংস্কৃত বা অপর ভাষায় গ্রন্থাদি যাঁরা সুসম্পাদিত করে বের করেছেন তাঁরা উক্ত জগতেরই বিদ্বজ্জন।

"রাগতরঙ্গিণী" গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সঙ্গীত-বিষয়ক আলোচনা করেছিলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর "বাংলার সঙ্গীতাচার্য" নামক প্রবন্ধে যেটি গীতবিতান বার্ষিকী ('মাঘ ১৩৫০') সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ক্ষিতিমোহন যে বইটি দেখেছিলেন সেটি এলাহাবাদ থেকে পুণায় প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে প্রস্তুত করা হয়। পাণ্ডুলিপিটিতে মৈথিলী অংশ একেবারেই ছিল না এবং সংস্কৃত অংশও অনেকটা বর্জিত ছিল। অধ্যাপক জয়কান্ত মিশ্র তদীয় "History of Maithili Lietrature" নামক গ্রন্থে এবিষয়ে আলোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আসলে লোচন বল্লাল সেনের সমসাময়িক ছিলেন না। তাঁর গ্রন্থে তাল সম্বন্ধেও কোনও আলোচনা নেই, তবে মিথিলার অবহট্ট সঙ্গীতে যেভাবে তাল প্রযুক্ত হত, সে সম্বন্ধে অবশ্য বহু আলোচনা আছে। অতএব, এই গ্রন্থটি যে যথার্থ নয় এবং বিভ্রান্তিকর সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। লোচনের শুদ্ধ পাঠযুক্ত গ্রন্থে জনক এবং জন্য রাগ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা নেই, তার পরিবর্তে তিনি বারটি মুখ্য রাগের উল্লেখ করেন, যেগুলির মধ্যে প্রাচ্যভারতের রাগগুলি সংস্থিত ছিল। অনুমান হয় পূর্বপ্রাপ্ত গ্রন্থটিতে অনেকাংশে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল;—এর কারণ লোচনের মূলগ্রন্থে অপর মতবাদকে অনুপ্রবিষ্ট করা। লোচনের যথার্থ বিবৃতি এইরূপ :

১. ভৈরবীতে সংস্থিত রাগসমূহ
নীলাম্বরী = ১

২. টোড়ীতে সংস্থিত রাগ
কাপি (কাফী) = ১

৩. গৌরীতে সংস্থিত রাগসমূহ
গুণময়মালব, শ্রীগৌরী, চৈতিগৌরী, পাহাড়ীগৌরিকা, দেশী টোড়ী, দেশকার, ত্রিবণ, মূলতানী ধনাশ্রী, বসন্তক, রামকরী, গুর্জরী, বহুলী, রেবা, ভাটিয়াল, খট্, মালবশ্রী, জয়তশ্রী, আসাবরী, দেবগান্ধার, সিন্ধী আসাবরী, গুণকারী = ২১

৪. কর্ণাট
ষাড়বকানর, বাগেশ্বরী-কানর, খাম্বাইচী, সোরঠ, পরজমারু, জৈজয়ন্তী, ককুভা, কামোদী, গৌরকেদার, মালকৌশিক, হিন্দোল, সুঘরাই, আড়ানা, গৌরকানর, শ্রী = ১৫

৫. কেদারে সংস্থিত রাগসমূহ
কেদারনাট, আভীরনাট, খাম্বাবতী, শঙ্করাভরণ, বিহাগরা, হাম্বীর, শ্যাম, ছায়ানাট, ভূপালী, ভীমপলাসিকা, কৌশিক, মারু = ১২

৬. ইমনে সংস্থিত রাগসমূহ
শুদ্ধকল্যাণ, পুরিয়া, জয়ৎকল্যাণ = ৩

৭. শারঙ্গে সংস্থিত রাগসমূহ
পটমঞ্জরী, বৃন্দাবনী, সামন্ত, বড়হংসক = ৪

৮. মেঘে সংস্থিত রাগসমূহ
মেঘমল্লার, গৌরশারঙ্গ, নট, বেলাবলী, অলাহিয়া, শুদ্ধসুহব, দশীসুহব, দেশাখ্য, শুদ্ধ-নাট = ৯

৯. ধনাশ্রীতে সংস্থিত রাগ
ললিতা = ১

১০. পূর্বা
এতে অবস্থিত কোনও রাগ না থাকায় পূর্বাকেই সংস্থিত রাগ বলা হয়েছে।

১১. মুখারী ১২. দীপক

গ্রন্থে এই দুটি রাগে সংস্থিত রাগগুলির বিবরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে এই অংশ লিপিকারের প্রমাদবশতঃ লিখিত হয়নি। তবে, কোমল ধৈবতযুক্ত শুদ্ধ স্বরগ্রামের রাগকে মুখারীতে সংস্থিত বলা হয়েছে।

উপরে যে রাগসংস্থিতি দেওয়া হল তার সঙ্গে ক্ষিতিমোহন যে তথ্য সঙ্কলন করেছেন তার অনেকাংশে মিল নেই। অতএব জনক ও জন্য রাগের উদ্ভাবক লোচন ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তি হবেন। কিন্তু, রাগতরঙ্গিণীর ক্ষেত্রে এই প্রাচ্যভারতের রাগালোচনা নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার। এই অংশটুকু কেবলমাত্র তিরহুতে তথা মিথিলায় আচরিত সঙ্গীতাদির সংযোজক হিসাবেই দেওয়া হয়েছে। লোচন প্রাচ্যদেশীয় মৈথিলী রাগসঙ্গীতের বিবরণ দিয়েছেন। তাই দুটির যাতে কিঞ্চিৎ তুলনা করা যায় এই কারণেই তিনি রাগসংস্থিতির উল্লেখ করেছেন।

লোচন প্রণীত যথার্থ রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থে সর্বসমেত পাঁচটি তরঙ্গ আছে। প্রথম তরঙ্গে পুংরাগ সমূহের রূপবর্ণনা করা হয়েছে। এই সব বর্ণনায় সংস্কৃতের সঙ্গে মৈথিলীপদও প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় তরঙ্গে অনুরূপভাবে রাগিণী মূর্তি নিরূপণ করা হয়েছে। তৃতীয়তরঙ্গে মিথিলাগতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ তরঙ্গে তিরভুক্তি দেশীয় (তিরহুত অঞ্চলের) সংকীর্ণ রাগাদির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এই দুটি পরিচ্ছেদই বইটির মূল বিষয়বস্তুকে পরিচিত করেছে। পঞ্চম তরঙ্গে সাধারণভাবে রাগসংস্থান এবং নায়ক, নায়িকা প্রভৃতি আলঙ্কারিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

গ্রন্থারম্ভে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। মহেশ নামক একজন সুপণ্ডিত রাজা মিথিলায় রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র শুভঙ্কর তাঁরই মত কীর্তিমান রাজা ছিলেন। শুভঙ্করের বহু পুত্রের মধ্যে কেবলমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র সুন্দরই জীবিত ছিলেন। তাঁর উপযুক্ত বীর পুত্র ছিলেন মিথিলার অধিপতি মহীনাথ ঠাকুর। এঁরই যোগ্য অনুজ ছিলেন নরপতি ঠাকুর। ইনি ছিলেন মিথিলায় প্রচলিত দেশীগানে বিলক্ষণ পণ্ডিত। এঁকে "ধ্বনিগান সিদ্ধ" বলা হয়েছে। ধ্বনি বলতে আমরা আজকাল যাকে "ধুন" বলি তাই বোঝায়। তখনকার দিনে দেশীয় সিরিক গানকেও ধ্বনিগানের পর্যায়ে ফেলা হত।

নরপতি ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে একজন সুবংশজাত বিপ্র তাঁর কীর্তির বিস্তারে উদ্যোগী হলেন। উদ্যোগটি হচ্ছে এই

কিঞ্চিৎ সমাহৃত্য কুতশ্চিদন্যৎ-
স্বয়ঞ্চ সম্পাদ্য পদপ্রবন্ধম্।
বিতন্যতে লোচন নামধেয়
দ্বিজেন সা রাগতরঙ্গিণীয়ম্॥

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, লোচন নামক একজন ব্রাহ্মণ রাগতরঙ্গিণী নামক একটি গ্রন্থ সংকলিত করেন। এটি প্রধানতঃ পদপ্রবন্ধের সংকলন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু পদ অন্যত্র থেকে আহরণ করেন এবং নিজের রচিত পদও সন্নিবেশিত করেন।

এরপর তিনি জানাচ্ছেন যে এই রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থটি এমন যে এটি বিদগ্ধ গুণীবৃন্দ এবং অতিসাধারণ অজ্ঞ সম্প্রদায়, উভয়েরই হৃদয়গ্রাহী হবে, কারণ এতে যে রাগ সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে সেগুলি সকলেরই "কর্ণরম্য" অর্থাৎ শ্রুতিসুখদায়ক। তিনি আরও বলছেন যে "সকল লোকসাধারণঝটিতি উদ্বোধ হেতু" (সর্বসাধারণ যাতে সহজেই খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে পারে) তিনি তদীয় গ্রন্থটি মধ্যদেশভাষাকে আশ্রয় করে রচনা করেছেন।

এই যে "মধ্যদেশভাষা"—এটি কিন্তু ব্রজভাষা নয়, এটি আসলে মিথিলার অপভ্রংশ বা অবহট্ট ভাষা, যাতে বিদ্যাপতি তাঁর পদসমূহ রচনা করে গেছেন। সাধারণতঃ মধ্যদেশভাষা বলতে গোয়ালীয়র অঞ্চলের একপ্রকার দেশী ভাষা বোঝায়; কিন্তু এক্ষেত্রে মিথিলার তিরহুত অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষাকেই মধ্য-দেশীয় ভাষা বলা হয়েছে। এই ভাষার সঙ্গে মধ্যভারতের প্রাকৃত ভাষারও কিছু কিছু মিল দেখা যায়। এই কারণে ক্রমে আরও একটি কৃত্রিম কাব্যভাষার উৎপত্তি হয়েছিল যাকে বলা হত ব্রজবুলি। সাধারণ্যে ব্রজবুলি শব্দটি প্রচলিত হলেও এটি সমর্থিত নয়; স্বীকৃত ভাষা হচ্ছে—সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ (বা অপভ্রষ্ট তথা অবহট্ট)। প্রাকৃত ভাষারই আরও ভ্রষ্ট বা প্রচলিতরূপ হচ্ছে অপভ্রংশ। মিথিলায় এই অপভ্রংশকেই মৈথিলী অবহট্ট বলা হয়ে এসেছে।

লোচনের নিজের বিবরণ থেকেই জানা গেল যে তিনি মৈথিল ব্রাহ্মণ এবং রাজা নরপতি ঠাকুরের সময় তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। লোচনের পিতার নাম

ছিল বাবু ঝা; ইনি মহামহোপাধ্যায় বাবু ঝা নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা উজান দেশে অবস্থিত ছিলেন এবং এঁদের বংশ বোধ করি এখনও বিদ্যমান।

রাগ এবং রাগিণীর দেব ও দেবী মূর্তি লোচন কিভাবে মৈথিলী ভাষায় রচনা করেছেন তার দুটি নমুনা দেওয়া গেল :

রাগ ভৈরব

জটাজুটতটগঙ্গ বসনসিত অঙ্গভূঅঙ্গম,
বরদ করদ কৃতদেববরদবাহন চঢ়ি জঙ্গম।
আসন গজবরখাল ধবলশশিভাল বিরাজই,
তীনিনয়ন চিতচঞেন জপত ভাবকদুখ ভাজই।
করকলিতশূল নৃকপাল অরু রাগরাজ অতি মধুররব।
ভৈরব হয় দুই নাহিঁ জগ জেহিগাবত সবসমঞে সব॥

ভৈরররাগিণী বঙ্গালী

কুণ্ডলকরন রবি মণ্ডল বরন তন,
তামেঁ নিত লেপিত বিভূতি সিত ছায় হএ।
বামে কর কীলিত ত্রিশূল করমূল তল
লম্বিত অধারী বরনারী শিরদার হএ॥
জটাজুট রাজএ কুঁচ কুটসে বিরাজএ
এহি বীচ বাজা বাজে তব আনন্দ অপারহএ॥
সোহত সুঘাট পটপাট কে বিরাগ রাত
রাগিনি বংগালী ভীম ভৈরও ভরতা রহএ॥

এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় বানান সব সময় নিয়মানুযায়ী নয় এবং আরও নানা উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে বর্ণাদির ক্ষেত্রেও এই অপভ্রংশ সম্পূর্ণ দেশী প্রচলনকেই স্বীকার করে নিয়েছে।

রাগরাগিণীর রূপবর্ণনা এবং মূর্তি নিরূপণের পরে লোচন শর্মা সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন যে তিনি "রাগসঙ্গীত সংগ্রহ" নামক একটি গ্রন্থে বহু সাঙ্গীতিক বিবরণ প্রদান করেছেন। এই গ্রন্থখানি বোধ করি আজ পর্যন্ত লাভ করা সম্ভব হয়নি। এরই

পরে তিনি মূল মিথিলার সঙ্গীত এবং বিদ্যাপতির সঙ্গীত সম্বন্ধীয় ধারণার প্রসঙ্গে এসেছেন। বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

লোচন তাঁর বিষয়বস্তুর সূত্রপাত করেছেন "গীতগতি" এই অধ্যায়টি নিয়ে। দেশে দেশে যে সব গীত প্রচলিত আছে, সেগুলি উক্ত দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রাগকে আশ্রয় করে অনুষ্ঠিত হয়; একেই তিনি "দেশীয় গীতগতি" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন,—গীতগতয়ঃ দেশ্যশ্চ তদ্রাগাশ্রিতাস্তা স্তাস্তদ্দেশগীতগতয়ঃ। এখানে তিনি মার্গ সঙ্গীতের আলোচনা করেননি বলে কোনও উদাহরণ প্রদান করেননি। তবে, প্রথমে কিছু উদাহরণ প্রদান করা উচিত এই বিবেচনা করে তিনি গ্রন্থারম্ভে ছয়টি রাগ এবং তাদের রাগিণী সমূহের পরিচয় সামান্য পরিমাণে দিয়েছেন। গ্রন্থশেষে আবার উক্ত প্রসঙ্গে রাগাদির বিস্তৃততর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লোচন অপরাপর দেশীয় গীতগতির পরিপ্রেক্ষিতে মিথিলায় দেশজ গীত প্রসঙ্গে বলছেন,—"দেশ্যামপি সুদেশীয়ত্বাৎ প্রথমং মিথিলাপভ্রংশ ভাষয়া শ্রীবিদ্যাপতিকবিনিবদ্ধাস্তাস্তা মৈথিলগীতগতয়ঃ প্রদর্শ্যন্তে।" অর্থাৎ, দেশী গীতাদির মধ্যে সুদেশীয় রচনা হিসাবে প্রথমে মিথিলার অপভ্রংশ ভাষায় শ্রীবিদ্যাপতি কবিকর্তৃক নিবদ্ধ সেই সব বিশিষ্ট মৈথিল-গীতের গতি সমূহ প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই উক্তিতে বোঝা গেল বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীতে প্রধানতঃ মৈথিল অপভ্রংশ (অবহট্ট) ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এইবার গ্রন্থকার মৈথিলগীতগতির ইতিবৃত্ত প্রদান করছেন। বৃত্তান্তটি এই রূপ। ভবভূতি নামক একজন সুবংশজাত রাজকুলোদ্ভব ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্বান ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি স্বকীয় প্রতিভায় কাব্যগুলিকে "পুরাণ প্রতিম" (পুরাণের মত) করে তুলেছিয়লন। এইভাবে তিনি যে সব পুরাণকথা প্রস্তুত করেছিলেন সেগুলিকে কথকতার আকার দেওয়া হল। তৎকালে সুমতি নামক একজন কলাবৎ ছিলেন, তিনি কথকতাও করতেন। তিনিই ভবভূতি রচিত পুরাণ কাব্যকে ভেঙে কথকতায় পরিণত করে সেটি রাজ-সভায় পড়ে এবং গেয়ে শোনালেন। সুমতির পুত্র জয়ত পিতার মতই প্রতিভা-সম্পন্ন কথক ছিলেন। রাজা শিবসিংহ (রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪১২/১৪১৩ থেকে ১৪১৮) তাঁকে পণ্ডিতপ্রবর কবিশেখর বিদ্যাপতির হাতে সমর্পণ করলেন। এঁরা দুজন এবং অপর সঙ্গীতজ্ঞগণ এই নবপ্রবর্তিত কথাকাব্যের গানগুলিতে

কয়েকটি রাগকে অবলম্বন করলেন। গানগুলির বিশেষ অর্থযোজনার জন্য কবি বিদ্যাপতি তাঁর গানগুলিতে ধ্রুবা যোজনার পরিকল্পনা করলেন। এঁদের মধ্যে রাজ সভায় গায়করূপে অগ্রবর্তী হলেন জয়ত। তাঁর পুত্র বিতৃষ্ণকৃষ্ণও নিজ দেশের রাজসভায় কথক ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তারপর মিথিলার রাজ সভায় কথকরূপে আবির্ভূত হলেন হরিহর মল্লিক। তাঁর তিন পুত্র ছিলেন,—খড়্গরাম, ঘনশ্যাম এবং কল্লীরাম। এঁদের মধ্যে ঘনশ্যাম গায়ক ছিলেন। তাঁর তিন ছেলে রামান্ত, লক্ষ্মীরাঘব এবং টীকা—এঁরাও উত্তম গায়ক ছিলেন। এই ভাবে, কবি বিদ্যাপতি যে সমস্ত রাগ অবলম্বন করে গান রচনা করেছিলেন এবং তাঁর অনুসরণে পরবর্তীকালে অপর যাঁরা সেইভাবে গান প্রস্তুত করেছিলেন,—সেইগুলি রাজা নরপতি ঠাকুর কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে লোচন চেষ্টা-পূর্বক একত্রিত করে লিখে রেখেছিলেন।

যে রাগসমূহ বিদ্যাপতি এবং তৎপরবর্তীকালের সঙ্গীত রচয়িতারা প্রয়োগ করেছিলেন সেগুলি হল :

ভৈরবী, বরাড়ী, কৌশিক, দেশাখ, রামকরী, ললিকা, কেদার, কামোদ, শ্রী, বসন্ত, মালব, আসাবরী, মলারী, ভূপালী এবং গুর্জরী।

এই রাগগুলি সর্বদেশে ব্যবহৃত হলেও এদের বিশেষত্বহেতু এরা মিথিলা-গতির মধ্যে পড়ে; অর্থাৎ মিথিলায় বিদ্যাপতিপ্রবর্তিত বিশেষ বিশেষ স্টাইলে এইগুলি প্রযুক্ত হয়েছিল, এই কারণে লোচন এই গুলিকে তিরভুক্তির স্বকীয় বলে নির্দেশ করেছেন এবং এইগুলি তাঁর মতে বিজাতীয় গতিকে অবলম্বন করে সংস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ, এইসব রাগ রাগিণীতে সাধারণ সর্বত্র প্রচলিত যে সব গান গাওয়া হত,—এগুলি তদতিরিক্ত তিরভুক্তি দেশীয় লক্ষণ সমন্বিত হওয়াতে এক একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, এই কারণেই তিরভুক্তি দেশে (মিথিলার তিরহুতে) প্রচলিত এই সব রাগ-রাগিণী সমন্বিত গীতকে "বিজাতীয়" বলা হয়েছে। লোচন আরও বলছেন যে তিরভুক্তিতে তো এইসই রাগরাগিণীর গান বিলক্ষণ ভাবে ছিলই, এতদ্ব্যতীত কাছাকাছি অন্যান্য দেশেও প্রচলিত হয়েছিল এবং স্বরভেদ অনুসারে এদের বিশেষ বিশেষ নামও দেওয়া হয়েছিল। বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত তথাকথিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামক কাব্যগ্রন্থেও আমরা মিথিলাগতির এই রাগসমূহের অনেকগুলির উল্লেখ

পেয়ে থাকি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় যে মিথিলায় প্রচলিত কথকদের রচনার প্রভাব ছিল,—এসব অনুমানও আমাদের অসঙ্গত মনে হয় না।

সমগ্র মিথিলাগীতগতি পর্যায় এপর্যন্ত রাগগতির উল্লেখ করে লোচন তাল-গতির প্রসঙ্গে এসেছেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে ভৈরবী রাগে গীত "রজনীজনিত গুরুজাগর" গানটির উল্লেখ করে স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে এই গানে পূর্বেকার তালপদ্ধতি অনুসারে দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত এই সব সংযোগে রচিত চচ্চৎপুট বা চাচপুট জাতীয় মার্গতালকে মিথিলার গায়ন-রীতিতে পরিত্যাগ করা হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত যে সব পদ্ধতি তৎকালে অব্যুৎপন্ন বা অপ্রতিভাত অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ছিল, সেগুলিকেও অনুসরণ করবার চেষ্টা না করে সত্বর, মধ্যম এবং বিলম্বিত এই তিনটি গতি অবলম্বন করে গান-গুলি সম্পাদন করা হত। জয়দেবের এই গানটির দুটি অংশ সত্বর এবং দুটি অংশ মধ্যগতিতে গাওয়া হত। এই প্রথাও যে বিদ্যাপতির চিন্তা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এই তালগতিদ্বারা কি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি উপলব্ধি করা আবশ্যক। বিদ্যাপতি তথা মিথিলায় গীতি-প্রবর্তকদের মতে যে পদ্ধতিতে আমরা রাগসঙ্গীতে একটি নির্দিষ্ট তালকে অবলম্বন করে বারবারই সমে এসে তালের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করি, সেই পদ্ধতিতে গানের পরিমাপ যুক্তিযুক্ত নয়। যে কোনও গানের একটি নির্দিষ্ট গতি আছে যাতে সে গানটি চলে থাকে, কোনও গান সত্বর গতিতে গাইলে ভাল লাগে, কোনটি মধ্যম গতির উপযুক্ত, কোনটি বা বিলম্বিত গতিতে গাইলে শোভন হয়। সামগ্রিকভাবে একটা গানের এই যে পরিমাপ বা মাননির্ণয় একেই লোচন তালগতি বলেছেন। এমন বহু গান আছে যাকে সত্বর মধ্যম বিলম্বিত তিনটি গতি প্রয়োগ করেও রসসৃষ্টি করা যায়। এই মাননির্ণয়কেই আমরা "লয়" বলে চিহ্নিত করি। আমরা গতানুগতিক নিয়মে গানে তাল প্রয়োগ করি বলেই তালের সঙ্গে লয় সম্বন্ধেও অবহিত থাকতে হয়। কিন্তু যদি একটি গতিকেই সম্পূর্ণ গানের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োজিত হতে দেখি তাহলে সেই গতিকেই তাল বা পরিমাপ বলে গণ্য করতে হয়। এই হচ্ছে "তালগতি"র অন্তর্নিহিত চিন্তা।

এখন প্রশ্ন ওঠে এই তালগতি ছন্দের পরিপূরক হয় কিনা। যখন আমরা

একটা গান একতালে, ত্রিতালে বা ঝাঁপতালে গাই, তখন তার একটা ছন্দ আমাদের গানকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ; কিন্তু তালগতিতে সেই প্রতিটি পদের ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয় না। এই কারণেই মিথিলাগতি পর্যায়ে লোচন তালগতির পরে ছন্দোগতির আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এটিও নিঃসন্দেহে অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত বিদ্যাপতির চিন্তার ফল।

মিথিলার দেশীয় পদ্ধতিতে যে সব রাগসঙ্গীত গাওয়া হতে লাগল তাতে ওস্তাদির সুযোগ রাখা হয়নি, তা বিস্তু মুখ্যতঃ কাব্যসঙ্গীত বা লিরিক গান। এই গানগুলিতে পদের অক্ষর সমূহ যে মাত্রা সংখ্যার সৃষ্টি করছে সেই হিসাবে ছন্দকে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কবিতার ছন্দকে রক্ষা করেই গানের ছন্দ নির্ণয় করা হয়েছে। লোচন এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন মিথিলায় ভৈরব রাগের রাগিণী বরাড়ীর প্রকারভেদ গুলির উল্লেখ প্রসঙ্গে, এখান থেকেই তিনি মিথিলার নিজস্ব গীতপদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। লোচন বলছেন বিভিন্ন প্রকার বরাড়ীকে অবলম্বন করে যে সব গান গাওয়া হয়, সেগুলি অনেকে কেবলমাত্র ছন্দের নীতি মেনে নিয়ে তাদের অনুষ্ঠান সম্পাদন করে থাকেন। ছন্দের নীতি বলা হলেই সেটি কিরূপ সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। সেটি নিরসনের জন্যই তিনি বলছেন—"ছন্দাংস্তু লঘুগুরুঘটিত্বেন তদ্ব্যবস্থা", অর্থাৎ ছন্দ সমূহ লঘু এবং গুরুর সন্নিবেশে রচিত এবং এক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাই মেনে চলা হয়। এর পর ছন্দসম্পর্কীয় লঘুগুরুর নিয়মাবলী এবং তিনটি বর্ণ নিয়ে সঙ্গীতে বা কাব্যে যে গণ গুলির প্রবর্তন করা হয়েছিল, সেইগুলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এটা মনে রাখা কর্তব্য যে বাংলার মত মৈথিলী ভাষাতেও ব্যবহারিক প্রয়োগ অনুসারেই লঘু, গুরু নির্ধারিত হয়—এটা সংস্কৃতের নিয়ম মেনে চলে না। এই ভাবে প্রতি রাগিণীর গানগুলিতে কবিতার চলন অনুযায়ী ছন্দ নির্দিষ্ট করলে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার হতে বাধ্য, সেক্ষেত্রে সেগুলিকে কিভাবে পরিচিত করা যাবে সে প্রশ্ন ওঠে। এই সমস্যার সমাধান করে যে রাগ বা রাগিণীতে ছন্দ পরিকল্পিত হচ্ছে, সেই ছন্দটি সেই রাগ বা রাগিণীর নামেই প্রচারিত হত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ভৈরবীতে যদি একটি গান রচনা করা হয়, তাহলে তার ছন্দটিও ভৈরবীছন্দ বলে প্রচারিত হবে এবং এইরূপ একাধিক ভৈরবী ছন্দের গান বাঁধা যেতে পারে। কিভাবে এটি পরিকল্পিত হয়েছিল সেটি

রাগতরঙ্গিণীতে প্রদত্ত "রাঘবীয় বরাড়ী" ছন্দের একটি বিদ্যাপতি রচিত গান উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই রাগের গানে যে ছন্দ অবলম্বন করা হয়েছে, তার লক্ষণ সম্বন্ধে লোচন বলছেন,

সপ্তবিংশতি মাত্রাভিঃ পদস্য প্রথমার্দ্ধকম্।
দ্বিতীয়ার্দ্ধে তু বিন্যস্তাস্ত্রিংশন্মাত্রাস্তু যদ্‌গতাঃ॥
ধ্রুবকঃ নবমাত্রাভিরর্দ্ধমর্দ্ধস্তুদস্তিনম্।
চতুর্দশমিতাভিস্তু বিরতৌ বহুধা গুরুঃ॥
অনেনামাংকেনাপি নিয়মেন বিভূষিতম্।
একদ্বিত্রিকলাহীনমেকদ্বিত্রিকলাধিকম্॥
রাঘবীয়বরাড়ীয়ং ছন্দস্তামত্র সন্নয়েৎ॥

অর্থাৎ :—পদের প্রথমার্ধের মাত্রাসংখ্যা হবে সপ্তবিংশতি এবং দ্বিতীয়ার্ধে এই সংখ্যা ত্রিংশৎ মাত্রায় বিন্যস্ত হবে। ধ্রুব অংশটির প্রথমার্ধ নবসংখ্যক মাত্রায় গঠিত হবে এবং তার অবশিষ্ট অর্ধাংশে চতুর্দশ মাত্রা থাকবে। বিরতিকালে বহু গুরু মাত্রার সন্নিবেশ হতে পারে। এই রকম "অমানক" (যার নির্দিষ্ট মান নেই) ভাবে প্রবর্তিত হলেও গানটি নিয়মের দ্বারাই বিভূষিত হবে। লোচন আরও বলছেন যে এই রূপে নির্দিষ্ট রাঘবীয় বরাড়ীয় ছন্দে প্রয়োজনবোধে, পদবিশেষে এক, দুই বা তিনটি কলা কম হতে পারে অথবা বেশীও থাকতে পারে।

উদাহরণ সহযোগে এই ছন্দটি বোঝাবার আগে মাত্রা এবং কলা সম্পর্কে একটা কথা বলা আবশ্যক। যাঁরা কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছন্দানুশীলন করেন তাঁরা হয়ত এই তফাৎটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং কলা বা মাত্রাকে এক করেই দেখবেন। আসলে মাত্রা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট মাপ বা "মেজার"; এর কোনও প্রত্যয় হয় না; কিন্তু কলা বললে একটি অংশমাত্র বোঝায়। ইচ্ছে করলে তার ইতরবিশেষ ঘটানো যায়। গানের বেলায় অনেকে চতুর্মাত্রিক গান গাইবার সময় প্রত্যেকটি মাত্রা আলাদা আলাদা ভাবে না দেখিয়ে একটু আড়িতে গান করেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত চারটি মাত্রা ঠিকই মিলে যায়; এই যে ইতরবিশেষ এইটি কলাদ্বারাই পূরণ করা হয়ে থাকে। কলা বস্তুটা মাত্রায় কাজ করলেও এইভাবে স্বীয় অংশকে বিপর্যস্ত করেও অবশেষে ভাগটিকে সুসম্পূর্ণ করে তোলে। এখানেও একটু উদাহরণ দিই।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

প থে যে। তে কা লা। ডে কে ছি। ল মো রে।

এখানে প্রত্যেক বর্ণ একমাত্রিক এবং ছত্রটির মাত্রা সংখ্যা বারো। কিন্তু ডবল করে গাইলে এটি এই রকম দাঁড়াবে।

১ ১ ১ ১ ১ ১

পথে যেতে কালা। ডেকে ছিল মোরে।

যদিচ এখানে দ্বাদশমাত্রিক পদটি ষট্‌মাত্রিক হয়ে গেল, তথাপি মাত্রার পরিমাপ কিন্তু একই আছে। সঙ্গীতের শৈলীতে একে বলে "দুন" করা। এখানে যেটি হল,—সেটি হচ্ছে এই যে "দুন"-এর ক্ষেত্রে এক মাত্রা দ্বিকল হয়ে গেল। এইভাবে আজকাল বিলম্বিত খেয়ালে বা টপ্পা, ঠুংরির যৎ তালে, কলার সাহায্যে মাত্রার বিভাজন ঠিক রেখে গাওয়া হয়। কিন্তু চলতি প্রথায় যেটা দ্বাদশ মাত্রা সেটাকে দ্বাদশকল বললেও ভুল হয় না, কেনন' দীর্ঘকাল ধরে দুটি শব্দই এক অর্থে চলে আসছে। এইবার ছন্দোগতির উদাহরণ দেওয়া যাক।

॥ রাঘববরাড়ীয় ছন্দ ॥

সাঁঝক বেরাঁ জমুনাক তীরাঁ
    কদবেরি বনতরুতরাঁ
অকমি কানরা কি কহব কালা
    সোআঁহি জুঝল সখি কুসুম সরা॥
    মোহি ভেটল কানু,
    অনতত্র কাহিনী কহহ জনু।
উরচির হরী করে কচধরী
অধর পিবত মুখ হেরী।
পুবু পুবু ভোরা পরস কুচ মোরা
    নিধনে পাওল জনি কনয়ক চোরা॥
অরে রে জুবতী বুঝলি জুগতী
    দোসর মধুর মধুপতী
    তোরে অনুমানে বিত্যাপতি ভানে
    রাত্র শিবসিংহ লাখিমা দেই রমনে॥ (বিত্যাপতি)

এই ছন্দের মাত্রাভাগ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন উঠছে লঘু, গুরু বর্ণ নিয়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলার মত মৈথিলীতেও সংস্কৃত বা প্রাকৃতের নিয়মে লঘুগুরু যথাযথভাবে মেনে চলা হয় না। পঠনের ঐতিহ্য বা ছন্দের প্রয়োজনে লঘুবর্ণও দীর্ঘের মত দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে, আবার দীর্ঘবর্ণও লঘুর মত উচ্চারিত হয়। অতএব, বিদ্যাপতি কিভাবে মাত্রানুযায়ী বর্ণগুলির বিন্যাস করে গিয়েছিলেন, তা সঠিকভাবে অনুমান করা অসম্ভব। মিথিলাগতিতে গণনিয়মও মেনে চলা হয়েছে। কিন্তু সেটাও মৈথিলী উচ্চারণ অনুসারেই প্রযুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত গানটিকে কিভাবে মাত্রাসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তার চেষ্টা এইভাবে করা যেতে পারে।

।পদের প্রথমার্ধ।

সাঁ • ঝ ক। বে • রা •। জ মু না ক। তী • রা •।
ক দ বে রি। ব ন ত রু। ত রা •।

মাত্রাসংখ্যা—২৭ (সাতাশ)

।পদের দ্বিতীয়ার্ধ।

অ ক মি কা। • ন রা •। কি ক হ ব। কা • লা •।
মো হাঁ হি জু। ঝ ল স খি। কু সু ম স। রা •।

মাত্রাসংখ্যা—৩০ (তিরিশ)

।ধ্রুবার প্রথমার্ধ।

মো হি ত্তে •। ট ল কা নু। হ।

মাত্রাসংখ্যা—৯ (নয়)

।ধ্রুবার অবশিষ্টার্ধ।

অ ন ত এ। ক হি নী •। ক হ হ জ। নূ •।

মাত্রাসংখ্যা—১৪ (চোদ্দ)

অবশ্য বিদ্যাপতির এই গানটি মূলতঃ এইভাবে গাওয়ানো হয়েছিল কিনা জানা যায় না, তবে ছন্দের বর্ণিত লক্ষণের সঙ্গে পদের এই বিভাজন অসঙ্গত

হয় না। পূর্বেই বলেছি মৈথিলী পদ্ধতিতে রাগগুলির নামেই তালগুলিকে পরিচিত করানো হয়েছে। সেটা যে কেন করা হয়েছে সে সম্বন্ধেও কিছু অনুমান করা যায়। মাত্রা সংখ্যা পদ অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়ায় যে ব্যাপারটা ঘটেছে সেটিকেই লোচন "অমানক" আখ্যা দিয়েছেন ; অর্থাৎ,—এই বিশেষ ছন্দকে একটি নির্দিষ্ট তালের পর্যায়ে ফেলা যাবে না, কেননা তার মান পদহিসাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া, মাত্রা সংখ্যা যে বরাবর সমতা রক্ষা করে চলবে, এমন নির্দেশও দেওয়া হয়নি ; বলা হয়েছে, প্রয়োজনে ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। এইসব কারণেই যে রাগ অবলম্বন করে গানটি গাওয়া হচ্ছে, তার ছন্দটিকেও সেই রাগের নামের সঙ্গেই যুক্ত করা হয়েছে। ছন্দোলক্ষণে বলা হয়েছে বিরতিকালে গুরু মাত্রার সন্নিবেশ হবে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে প্রতি পদার্ধের শেষ বিরতির আগের বর্ণগুলি গুরুবর্ণ, যথা—রাঁ, রা, কান্, নৃ—এইগুলি। "কান্" শব্দটির পরে একটি লঘুবর্ণ "হু" আছে বটে, কিন্তু এখানেই ধ্রুবার প্রথমার্ধের বিরতি হয়েছে।

গানটির বর্ণিত অংশ (টেক্স্ট্) থেকে দেখা যায় মৈথিলী অপভ্রংশে বানানের কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না এবং "ষ বা "শ" প্রায় ব্যবহৃতই হত না।

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা এই ধরণের ভাষার সঙ্গে অভিজ্ঞ নন, তাঁরা গানটির অর্থ বুঝতে চাইবেন,—এটা স্বাভাবিক, অতএব গানটিতে কি বলা হয়েছে, সেটি দেওয়া গেল।

সন্ধে বেলায় যমুনার তীরে কদমবনের তলায় আমার অঙ্কে কলসী ছিল। সখি, কি বলব, কালা সোজাসুজি কুসুমশর যোজন করল। কানু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। আমি যেন একটা অন্য প্রকার কাহিনী (অঘটনের বৃত্তান্ত) বিবৃত করছি। বক্ষের বস্ত্র হরণ করে, স্তনে হস্তার্পণ করে, আমার মুখ দেখতে দেখতে সে আমার অধর পান করতে লাগল। বারবার বিভোর হয়ে সে আমার স্তন স্পর্শ করতে লাগল। চোর যেন নির্ধন ব্যক্তির কাছে সোনার সন্ধান পেয়ে গেল। বিদ্যাপতি বলছেন—ওহে যুবতি তোমায় দেখে অনুমান হচ্ছে যে তোমার দোসর যে মনোরম মধুসূদন, সেই যুক্তি তুমি বুঝেছ। লখিমা দেবীর সঙ্গে রমণে রত রাজা শিবসিংহের নাম কবি ভণিতাস্বরূপ যুক্ত করেছেন।

এইবার আমরা সমস্ত আলোচনার একটি সারাংশ প্রদান করতে পারি।

এই আলোচনার বিষয়বস্তু হল "মিথিলাগীতগতি"—যা কবিকুলতিলক বিদ্যাপতি প্রবর্তন করে গেছেন। এই গীতগতি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি রাগগতি, যা কেবলমাত্র মিথিলায় প্রচলিত দেশী রাগকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টি তালগতি, যাতে সমগ্র গানটি কি লয়ে চলেছে (সত্বর, মধ্য, বিলম্বিত) সেটি নির্ণয় করা হয়। তৃতীয়টি ছন্দোগতি,—যাতে কোন গানটি কবিতার ছন্দ অনুসারে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে সেটি নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ, মিথিলায়, বিশেষ করে তিরহুৎ অঞ্চলে যখন কোনও একটি গান উক্ত দেশের রীতি অনুসারে নির্ধারিত কোনও রাগকে অবলম্বন করে সত্বর, মধ্য, বিলম্বিত—এই তিনটি লয়কে গ্রহণ করে, কাব্যপ্রযুক্ত ছন্দকে আশ্রয় করে অনুষ্ঠিত হয়,—তখন সেটি "মিথিলাগীতগতি"র পর্যায়ে পড়ে। লোচন শর্মা এইরূপ সাতানব্বইটি প্রকার-ভেদের উল্লেখ করেছেন তদীয় রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ছন্দসম্পর্কিত রূপকল্পটি রবীন্দ্রনাথ নিজেও সমর্থন করেছিলেন, যদিচ তিনি বিদ্যাপতির এই চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যে যুক্তি এবং পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন, বিদ্যাপতি তাঁর জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বেই সেটি মিথিলায় প্রচলিত করে গিয়েছিলেন। বিদ্যাপতির জন্ম আনুমানিক ১৩৬০ সালে আর রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে। অর্থাৎ উভয়ের জন্মের ব্যবধান, পাঁচশো বছর। অবশ্য প্রাকৃত প্রবন্ধ-সঙ্গীতেও ছন্দের ব্যবহারে ঔদার্য ছিল; কিন্তু বিদ্যাপতির পরিকল্পনায় নূতনত্ব বর্তমান।

অরুণ মিত্র

আলো-আঁধারির তামাশা

আলো-আঁধারির তামাশা আমাকে জাগিয়ে রেখেছে এতকাল ওঃ এ কী চোখ টেনে দেখা লম্বা সরবন হঠাৎ বিজ্‌লি ছুটিয়ে কাঁপে স'রে যায় আমি ঠাওর করতে গেলে ঠাসা ছায়া আঁবার। পর্দার ফাঁক দিয়ে পর পর কত মুখ অথবা কথা অথবা হৃৎপিণ্ড অথবা স্মৃতি, আমি মনে পড়াব কাছে টানব তাকাব যেখান থেকে আমার রাস্তা বেরিয়ে চ'লে এসেছে অথচ আমি থম্‌কে আছি শেষবেলায়, তেরছা আলোয় চোখ রেখেছি কি অম্‌নি হিজিবিজি দুটো পাশ মাঝখানে সেঁটে গেল। ওই মেয়েকে আমি লক্ষ্য করি সে এমন ঝলক নিয়ে খেলায় তার শাড়িতে যতক্ষণ সে হাঁটে এতদূর পর্যন্ত কিরণ ছড়ায় অথচ তার দিকে তাকিয়ে আমার ধাঁধা-লাগে তার শেষ ভঙ্গিটা সে এমন কুয়াশায় ঢেকে দেয় আমি থেকে যাই এক অন্ধ এলাকায় যেখানে কোনো রং জ্বলে না পাঁপড়ি খোলে না যেখানে পৃথিবী গুহায় গুহায় চক্কর দেয়।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ত্রইকা ছুটছে

ত্রইকা ছুটছে তুষার-তন্দ্রা ছিন্ন চূর্ণ, ঘূর্ণি
ছুটছে সময় বর্তমান ও ত্রইকা
দু'পাশ মাড়িয়ে ন্যাড়া গাছগুলো দশ হাত তুলে দুদ্দাড়
জালিকাজ-করা আকাশ মাথায় পিছলে
পিছলে যাচ্ছে পেছনে অতীতে কিংবা—
পিছলে চলছে সময় টানছে ত্রইকা

নিচে মরা মাটি, অমেয় তুষার, তিন ঘোড়া খ্যাপা উল্কা
স্লেজগাড়ি ছ্যাখে নিরুদ্দেশের স্বপ্ন
সময় মাড়িয়ে ডানা মেলে দিয়ে আমি আজ
শাদা শূন্যতা হিম শূন্যতা এড়াতে কেবল খুঁজছি
কোথায় দু'চোখ শ্যামচ্ছায়ার বনটা
বুকের আগুনে কবে প্রাণ পাবে ধু-ধু মাঠ এই মনটা

জাগবৃক্ষ্ ছাড়ালে 'স্বর্ণবলয়'এ বুড়ো বাঘবন্দী
ডাইনে ও বাঁয়ে ভ্লাদিমির সুজদাল
হাতছানি দেয়, দুই ঘোড়া বড় আনচান পথ ভুলতে—
তবুও ত্রইকা ক'টা শতাব্দী টপকে
সোজা চলে এল যেখানে যন্ত্র দিগ্বিজয়ের মন্ত্র
আওড়ায়, মাতে নবনির্মাণে গোটা সোভিয়েত দেশটা

ত্রইকা ছুটেছে মহারাশিয়ার হৃৎকেন্দ্রের গ্রীষ্মে।

মৃগাঙ্ক রায়

ঘুড়ি

আমাকে একটু বাড়তে দাও
ওই কালোসবুজ একতেল ঘুড়িটার
পাশ কাটিয়ে
তুলে দেব আমার ঘুড়ি,
শহরের বাড়িঘর, গাছগাছালি,
ল্যাম্পপোষ্ট, গোম্বুজের গম্ভীর ঘড়ি
আর কারখানার চিমনী পার হয়ে
কালো পাথরের তৈরি
মেঘের হর্ম্যচূড়ার কাছে
উড়িয়ে দেব আমার চিত্রল চৌরঙ্গী।
এ আমার স্বপ্ন নয়
বিদ্যুতের কাছে যাওয়া॥

সুশীলকুমার গুপ্ত

মানবিক

শুধু সেতু মেট্রোরেল রকেট জাহাজ টিভি নয়,
নয় শুধু রাজপথ অভ্রভেদী অট্টালিকামালা,
রাষ্ট্রসংঘ শান্তির সনদ।
সেই সঙ্গে এল
আরো পঙ্গু প্রতিবন্ধী মানুষের দল,
স্থষ্টিখেকো পঙ্গপাল, সভাতায় অনাথ আশ্রমে
ভবিষ্যৎ বংশধর, শতাব্দীর কসাইখানায়
আরো সামাজিক শব, শোকযাত্রা, মগ্ন হিমঘরে
আরো বাসী শস্য, বিশ্বমঞ্চে আরো দক্ষ বিদূষক।

কিন্তু কেন ? এ জিজ্ঞাসা কতটুকু পেয়েছে উত্তর
সভ্যতার জ্ঞানপাপী ধৃতরাষ্ট্রদের কাছে ? তারা জেনেও জানে না
মানুষকে বাদ দিয়ে যন্ত্রিত সৃষ্টিকে কোনোভাবে
বাঁচানো যায় না ; বৃথা চেষ্টা করে যুগের কৌরব !

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

পাখির ছড়া

'কুটুম আয়, কুটুম আয়'
একটানা সে ডেকে যায়
আম্রবকুল সাথী ।

হঠাৎ যে কে সাঁঝ বেলাতে
উড়ে এসে জুড়ে বসেন
ফিঙে
কুটুম তখন বহুদূরে—

দূরে কাছে মন চলে যায়
মন জানে না পাখি ।

শান্তিকুমার ঘোষ

না-ফেরা

অ্যাল্‌বাট্রস—বোটেলের নাম
ভ্লাতাভা নদীর উপর তরণীবাস
পাড়ের গোলাপ-বিতান ও সোপান-পংক্তি
পেরিয়ে

চতুর্দশ শতকের সাঁকো
প্রাচীন প্রাগের মুমূর্ষু প্রাসাদ
ক্ষয়ে-যাওয়া পাথর কাফ্‌কার স্বর্ণগলির

নদীর বাঁ দিকে
নগরের উপর ঝুঁকে-থাকা পাহাড়ের বিজন প্রান্তে
আমার হ'য়ে একটিবার দাঁড়িয়ো তুমি
স্মরণের দরজা খুলে দেখবে সোনালি আশায়
ভ'রে আছে বাল্যভূমি
আলতো পা ফেলো—মাড়িয়ো না স্বপ্নগুলি

সব ছেড়ে-আসা, আর কোনো দিন না-দেখা
আসন্ন মুহূর্ত বিদায়ের…
পিছনে জ্ব'লে যাচ্ছে ব্রিজ, ধ্ব'সে পড়ে মিনার
ক্ষুরস্থ ধার … আগুন আর জল
কালো ও সাদার ভেতর দিয়ে
পার হচ্ছি আমি

মধুর বিষাদ

স্পন্দন জড়িয়ে থাকে পদার্থে
মরেনি গোলাপ কুয়াশায়
ফেরা
না-ই হ'ল যদি
আছে বিশাল পৃথিবী
আর ঝাঁপ-দিয়ে-পড়া

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের এলিয়ট

এলিয়ট সাহেব শুধু রেবর্ডপ্লেয়ারে
ঘুরে ঘুরে একটি সুর বাজিয়ে যান
নির্জন বুকের ভেতর
বাইরে যাওয়ার পথ সব বন্ধ
এত বাস গাড়ি যাতায়াত চা-পান উষ্ণতা
এবং সেলাম
এবং শুধুই বিজ্ঞাপন
এলিয়ট ঘরে বসে গান শোনেন
গান গান
রথের মেলায় পাখি কিনে
অবিকল বিজ্ঞাপনহীন
শব্দগুলি শুনতে চান
শব্দের ভিতরে সবই
তবে কেন বাইরে অপচয় !

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুটন্তি রঙন

শেকল কাটানো ফুল ক্ষিতি অপ্ তেজ—কিছু আরো
টানা পাচিলের পিঠে ছুটন্তি রঙন, অত করে
ছুটছ কেন ?
লোহা খায় কলজে চিবোয় হাত ভর্তি আগুন—
দড়ি দড়ি নীল শিরা ঝাঁ ঝাঁ করে ভর্তি আগুন—

একটু একটু করে আগুন সেঁতার গেরো খুলে দিয়ে
দু পাশ চাইতে চাইতে চলে— ক্রমাগত—
কাকে দেখছ? আমার চৌকাঠ ছেড়ে পাছে যাই, ভয়।
ফটিক আয়নার পারা ঘষে তুলে ফেলে যদি চাই,
ডিঙি পেড়ে দেখি মস্ত ময়ালপথের পিঠে মরে আছে সন্ধ্যার ট্র্যাফিক,
স্তূপ পাতালের চালে গোল হয়ে বসেছে দেহাতি···
চার ঘড়ি লোহাকাঁটার চোখের ওপর দিয়ে
বেললতার মতো কাঠবেড়ালি
চোরা পথে ছুটে যায় যাওয়া-পথে ফুটে ফুটে ওঠে বার বার···

টানা পাঁচিলের পিঠে ছুটতি রঙন, অত ছুটে
কোথায় যাচ্ছ?

দিব্যেন্দু পালিত

রাজেনবাবু

রাজেনবাবুর দিনগুলো ছিল
রাতের মতো,
আর রাতগুলো দিন।
আসতেন যখন-তখন—
আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর দিয়ে
বেল টিপতেন দরজায়।
সে-জন্যে তার মনে আক্ষেপ ছিল না কোনো,
ছিল না অনুশোচনা;
হেঁ-হেঁ হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বলতেন,
জানো তো, আমাকে কেউ ভদ্রলোক
ভাবে না।

রাজেনবাবুর জন্যেই গভীর মধ্যরাতে
জলে উঠত আমাদের বাড়ির আলো,
হেঁসেল থেকে ভেসে আসত হলুদে কুসুমের গন্ধ—
আর চায়ে চামচ নাড়ার শব্দ।
কার্নিশ-পেরুনো বিড়ালের থাবা-চাটা টের পেয়ে
সশঙ্কিত আকাশে ডানা মেলতো
খোপের পায়রাগুলো।

রাজেনবাবু বলতেন, কি আশ্চর্য
ট্রামবাস বন্ধ হয়ে যায় এতো তাড়াতাড়ি?
মানুষ যাবে কোথায়?
আর ট্যাক্সিরও যা ভাড়া—
সত্যি বলতে কি, আমার চারদিনের খোরাকি।
থাক, আমার কথা থাক।
তোমাদের ফ্ল্যাট কেনার কী হলো?
কাগজে দেখলাম গাড়ির দাম বাড়ছে—,
নতুন খবর বলো? ওরা কেমন আছে?
কী বললে ক্যানসার!
ঘাবড়াবার কিছু নেই—ক্যানসারও ভালো হয়;
এরকম অনেক কেসই আমি জানি।
বৌমা, তুমি এতো রোগা হয়ে গেছ কেন!
অ্যানিমিয়া নয় তো?
রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে নাও—ইত্যাদি।

রাজেনবাবু সম্পর্কে আমাদের কোনো
কৌতূহল ছিল না—
না তার আসা সম্পর্কে,
না তার চলে যাওয়া সম্পর্কে

তাঁকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে
সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমরা
উঠে পড়তুম ছাদে—
আমাদের চোখ থাকত তাঁর দিকে ;
পয়সা বাঁচানোর জন্যে যেভাবে মানুষ
দূর থেকেই লক্ষ করে ভেল্‌কিওলাকে।

তারপর অনেকদিনই আর এলেন না রাজেনবাবু—
চলে গেল বছরের পর বছর।
সে-জন্যে আমাদের মনে ছিল না কোনো কৌতূহল
কিংবা প্রশ্ন, এর ওর কাছে
খবর-নেওয়া।

শুধু যতিহীন মধ্যরাতের ঘুমে নিরাপদ হতে হতে
এক-একদিন
ভুলে-যাওয়া থেকে ক্রমশ মনে পড়ত,
অনেক অনেকদিন না-আসা লোকটির নাম ছিল
রাজেনবাবু।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

সাঁকো

কেননা এখনও আমি এপারে দাঁড়িয়ে
সাঁকোর ওপারে স্থানু তোমার শরীর
ছোঁয়াছুঁয়ি হবে—ছিল নিবিষ্ট বিশ্বাস
কে সাঁকো পেরোবে তবু এই তিতিক্ষায়

এতদিনে ক্রমান্বয়ে সূর্য গেছে পাটে
পাথর হয়েছে জল।
যদি আমি যাই
পাটিপে পাটিপে তুমি যদি চলে আসো
যা চেয়েছি দুজনেই—খুব ছোঁয়াছুঁয়ি
এখন কীভাবে? নিচে জল না, পাথর

নবনীতা দেবসেন

মর্মরের সেতু

জলপ্রপাতের ধারে স্তব্ধ হয়ে আছি
অদৃশ্য স্রোতের শব্দ
ঝরঝর তুমুল গর্জন

কোথাও তো কেউ নেই
কাকে বলবো, লণ্ঠনটা ধরো
আমি অন্ধকারে শুধু
সেতুটুকু পার হয়ে যাই?

অমাবস্যার মাঠে আলো দিক
অথবা না দিক
ধ্রুবতারা,
অথবা
লুব্ধক—
আমার মুশকিল নেই—
অন্ধকার যত গাঢ় হোক
পায়ে পায়ে পথ কেটে বেকসুর

পার হয়ে যাবো
তেপান্তর, কি ভুশুণ্ডীর মাঠ—
প্রতিটি ঘাসের সঙ্গে
আমার যে আজন্মের
সখিত্ব রয়েছে !
মুশকিল, মর্মরসেতু—
জন্মমৃত্যু বাড় নেই যার
তার সঙ্গে আড়াআড়ি
এ জন্মের মতো।

অথচ পেরুতে হবে, মধ্যপথে
স্তব্ধ হয়ে আছি
অন্তহীন ধারাশব্দ
বেজে যায় ভিতরে বাহিরে

কোথাও যে কেউ নেই,
কাকে বলবো, লণ্ঠনটা ধরো—
আমি এবারের মতো
মর্মরের সেতুবন্ধটুকু
পার হয়ে   ঘাসে নেমে যাই ?

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আমরা কাছেই আছি

দ্রুত ট্রেন লোহার সাঁকোয় চ'লে গেলে
বেগুনী-হলুদ আলো কিছুক্ষণ খেলা করে,
তারপর স্পষ্ট নিভে যায়।

আমরা কাছেই আছি, পুরোটা দেখতে পাই না,
কিছুটা তো দেখি,
মাঝেমাঝে ঘোর লাগে, পঞ্চাননতলা থেকে
বোমার শব্দ ভেসে আসে,
মানুষের ক্রোধ-হিংসা-শিহরণ ছাপিয়ে তবুও
সময়মতন ট্রেন আসে, যায়,
আমরা কাছেই থাকি, কিছু কিছু দেখি, শুনি, পুরোটা বুঝি না।

কোথাও অস্থির এক স্রোত আছে, মাঝেমাঝে জল উপ্‌চে পড়ে।
আমরা হাঁপিয়ে উঠি, একবুক জল ঠেলে ঘরে ফিরতে হয়।
কোথাও কঠিন এক পাহাড় রয়েছে, পাথর গড়িয়ে নিচে পড়ে,
আমরা আঘাত পাই, বেঁচে উঠি, তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে
সব দেখি।
দ্রুত ট্রেন, আমরা কাছেই আছি,
তুমি আর কতোদূরে যাবে?

তারাপদ রায়

আগুন

আমরা স্বপ্নের ভিতর দিয়ে নির্বিবাদে চলে আসি
আমাদের গায়ে স্বপ্নের আগুনের
আঁচটুকু পর্যন্ত লাগে না।
অথচ স্বপ্নের মধ্যে আমাদের কি জ্বালা পোড়া,
দমবন্ধ ঘরে ধোঁয়া-আগুন,
দূরে কুয়াশাভরা রাস্তায়
অদৃশ্য দমকলের ঘণ্টা বাজছে।

এখন আমাদের ঘুম ভেঙেছে।
স্বপ্নের আগুনের আঁচ এখন আমাদের থেকে দূরে।
কিন্তু এক কুয়াসাবিলীন রাস্তায়
দৃষ্টির অগোচর এক দমকলের গাড়ি থেকে
এখনো কান পেতে থাকলে
অল্প অল্প শোনা যাচ্ছে
বিপদসঙ্কেতের ঘণ্টাধ্বনি।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

দারিদ্র

প্রতি ব্যর্থ কবিতার জন্য আমি নতুন আক্রোশে জ্বলে উঠি!
একছুটে চলে যাই নদীর শরীরে, ডুব দিয়ে বলি
নদী আমার চোখের জল কেউ তো টের পায়নি?
আমি নতুন ঢেউ-এর স্নেহ সরাতে সরাতে তীরে উঠে আসি
দেখি উঁচু হয়ে ছুটে আসছে নতুন জোয়ার
শূন্য মাল্লাবিরল নৌকা তীর ছেড়ে চলে যাচ্ছে মধ্য জলস্রোতে।
প্রতি ব্যর্থ প্রেমের জন্যই আমি অক্ষরের শেষ আবরণ
ছিঁড়ে হাল্কা মেঘের মতো দিগন্তে ছড়াই; তারা কালো
হয়, বজ্রনির্ঘোষে ফাটে আমার জন্মান্ধ হাহাকার;
কোথাও কি ভ্রান্তি ছিল! রূপান্ধ যুবক
শরীরের রমনীয় উঁচু নিচু আনন্দগুলি
নিতান্তই লিখেছিল অযৌন কৌতুকে?
একটা ভাল-উঁচু পদ্যের জন্য শৈশবের প্রথম প্রয়াস
হাঁটু ভেঙে পড়েছিল আশ্বিনের নতুন দূর্বায়,
শিশিরবিন্দুর মতো ফোঁটা ফোঁটা রক্তে ভরে উঠলো মাটি,
নারী রানী হয়ে হেঁটে গিয়েছিল, পদচিহ্নের কথা তার মনেই পড়েনি।

তারপর থেকে প্রতিটি অবহেলায় আমি ধনুকছিলার মতো বেঁকে
মেরেছি তুমুল লাফ—যেন নিজেই শক্রম্ন তীর
অক্ষরের লৌকিক বিক্ষোভে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি,
বঞ্চনাকে বসিয়েছি পয়ারের কুমারী জঙ্ঘায়
সেকি পুরুষের সুলভ সাধ্যের কোনো প্রতিশোধ নিতে !
কলকাতার দশতলা কংক্রীটে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে
ছড়িয়ে দিয়েছি ছেঁড়া কাগজের টুকরো নশ্বরতা
নেমে এসে তারপর আরো একবার সমতল মানুষ হয়েছি,
শ্মশানের পাশে গিয়ে দেখেছি কবিতা ও মানুষের সহমরণ।
সমস্ত সুরুর শেষ দেখে উঠে এসে আমি আমার শেষের সুরু
শব্দে লিখেছি। মধ্যরাত্রির রাস্তায় চীৎকার করে
জাগিয়েছি ঘুমন্ত ভিখারী, তৎক্ষণাৎ নতজানু হয়ে
বলেছি আমাকে মাপ করো, আমি ভুল কবিতা লিখেছি।

এভাবেই আমার ভালবাসা আর আমার অহঙ্কার
কেউ কারো কাছে আত্মসমর্পণ করেনি,
প্রতিটি ব্যর্থ কবিতা আমাকে দাম্ভিক এবং
বিষম দরিদ্র করে রেখে চলে গেছে।

বিজয়কুমার দত্ত

প্রতিমা

যেন মরুভূমির বালিতে রেখেছি পা,
সূর্য ঠিক মাথার ওপর :
যেন শীতের দুপুরে অফুরান বরফ ঝরার কালবেলা,
আকাশে রোদ দেখা যায়নি পুরো দিন

তোমার চোখের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে
চমকে পেছিয়ে আসি, আর
ঠিক সেই মুহূর্তেই এইসব প্রতিতুলনাই
বড় বেশী মনে পড়ে।
অথচ আমি তো চেয়েছি সব ভুলে থাকতেই—
তাই পেরিয়ে এলাম কত নদী আর মাঠ,
বালিয়াড়ি এবং পাহাড়ের চড়াই উৎরাই
বুকের মধ্যে শুধু ধরে রাখি
বরফের মত জমাট ভালোবাসা
যদি তোমার পায়ের ছন্দে তা গলে যায়,
ধুইয়ে দেয়, তোমার ফিরে যাওয়া পথের
রুক্ষ বালি ও কাঁকর।

এই বাকপ্রতিমার কোন তুলনা
আজো আমার জানা নেই।

মঞ্জুভাষ মিত্র

মধুগ্রামে নিভৃত সাগর

মধুগ্রামে নিভৃত সাগর
সারাদিন নীল ঢেউ তোলে
মাছদল খেলা করে শরতের স্বচ্ছ বাতাসে
নগ্ননারী ছুটে আসে তার হাসির ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়
মায়াদ্বীপে স্ফটিক মন্দির মণিদীপ সারারাত জ্বলে
নগ্নদেবীর দেহ ঘিরে ফুল ফল বৃক্ষ বিলাস
সৌন্দর্য্যের জন্ম হয়, সঙ্গীতধ্বনির বেশে হৃদয়গভীরে
মহাস্বপ্ন জেগে ওঠে : একদিন চলে যাবো বিদেশের পথে

গ্রন্থাগারে ম্যুজিয়মে দাঁড়াবো ছবির নীচে অর্পিত ভাস্বর
মধুগ্রামে নিভৃত সাগর
কত স্বপ্ন মেরে ফেলে কত স্বপ্ন প্রত্যহ জন্মায়
গায়ে আলপনা আঁকা রাশি রাশি ঝিনুকের মতো
সূর্য্য ডোবে, যুগ্ম ঠোঁটে পিষ্ট হয় বৃহৎ বাদাম
ফুল ফল গাঢ়ভাবে দেবীর নগ্নদেহ ঘিরে ধরে
ছুটে আসে শরতের স্বচ্ছ বৃষ্টি রোদের কোমল নৌকা
সুন্দরের মুখ দেখা যায়, বৃক্ষে বৃক্ষে সমাকীর্ণ স্ফটিক মন্দির
শঙ্খ বাজে ; গ্রন্থাগারে মূল্যবান বইএর ভিতর
মৃত সব মানুষের করোটির দামীশিল্প : জ্ঞান প্রেম মৈত্রী
সুরক্ষিত হয়

আমি ওই মৃতদের ভালোবাসি, ভালোবাসি চিত্রের রমণী
এ সবের আবিষ্কার আমিই করেছি
বৃক্ষে ও বাতাসে এমন রোদের দেশ বৃহৎ কোমল
কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন ? স্ফটিকমন্দির
জোৎস্নারাত্রে এখন দাঁড়িয়ে থাকে কেন তার ক্ষুদ্র দেবীটিরে নিয়ে ?
এইসব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া আর করবো না, সঙ্গীতের নৌকা
ভেসে যায় উত্তরের দিকে…

রবীন সুর

নৈঃশব্দ্য

যতো নিকটে যাই
নৈঃশব্দ্য তার ভরাট শরীর নিয়ে
সম্ভাবিত ভবিষ্যৎ উঁচিয়ে
শান্তি দেয়।

শান্তি নেই দমবন্ধ ঘরের নির্জনে।
আলো নিবু নিবু
হাওয়া এসে ঘা-খেয়ে ফিরে যায়
নীরেট গুমোটের উল্টোদিকে।

এ-সময় একটি শিশুর কান্না
হামাটানা অস্থির আব্দার
অথবা খিলখিল হাসি
ঠিকমত পাওয়া গেলে
ঘর ছেড়ে-যাওয়ার কথা
ভুলে যাওয়া যেত।

অমিতাভ গুপ্ত

কয়েকটি কবিতা

মনে পড়ে

কখনো মৃত্যুর পরে মনে পড়ে, অথচ গভীর
সবুজের আভা নিয়ে ইতোমধ্যে বুনোঘাস, দেখা গেছে জলের মরিচা

সে ছিল সামান্য, একা, মানুষের পক্ষে যতখানি
ম্লান হওয়া সম্ভব ততখানি ঝুঁকে পড়ে
সূর্যাস্তের দৃশ্যাবলী সেও দেখেছিল

এখন তাকেই শুধু মনে পড়ে, অথচ জলের
মরিচার মতো লাল সূর্য ডোবে, পুনরায় সূর্য ডুবে যায়।

মহাকালী

ছাই থেকে লাফিয়ে উঠছে আগুন, এবং আগুন থেকে
লাফিয়ে উঠছে লাল আঙ্‌রাখা
বনজ স্থির উদ্ভিদের ডালপালা সরিয়ে
জেগে উঠছে আকাশের মতো বিশাল চোখ
পুজারী এবং দেবী গ্রহণ করছেন জন্ম
একই সাথে।

একটি পাণ্ডুলিপি : মেঘের প্রতি

অতঃপর এই মেঘের ছায়ায় আমাদের সব অস্বচ্ছতা
টের পেয়েছি—শুনেছি এই মেঘের রূপেই শ্রীচৈতন্য
তাঁর শ্যামলিম অভিষ্টকে চিনে নিতেন, আমরা শুধু
খুঁজে বেড়াই খুঁজে বেড়াই

এবং আকাশজুড়ে আবার মেঘের প্রবল
ক্ষুব্ধ ছবি, এই আমাদের নিজের মধ্যে যা কিছু নয় স্পষ্ট তেমন
তারই গোপন আগুন নিয়ে দুরন্ত বিদ্যুত
জ্বলে, জ্বালায়···দুঃখ ছাড়া মানুষকে কি মানায় এখন ?

কে জাগে

আকাশে, মাটির নিচে, মতিচ্ছন্ন শুক্রতার নীলে
কে জাগে রে ? তোকে চাই, শুধু তোকে চাই
দেখা-নাদেখার গল্প সারারাত আড়ষ্ট শিশিরে
ঝরে পড়ে, ঘাসের উপরে আমি মুখ রেখে শুই
আকাশে বাড়াই হাত, শুক্রতাকে বুকে টেনে ভাবি
কী নীল আমার বিষ। কে জাগে রে ? পাবো না উত্তর ?

অগ্নি এবং জল

আমাদের রহস্যময় আহ্বানে ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছি আমরা এবং আগুনের
ঢেউয়ের মধ্যে আমাদের হাত

সাড়া দাও আমাদের চাঞ্চল্য ও ব্যক্তিগত সমাধিফলকের উপাসনায়
সাড়া দাও, শোনো, এইসব সমাধিলিপির আর্তস্বর

শ্মশানের উদ্‌ভ্রান্ত চুল্লির মতো জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে মানুষ
এমনকি তারাও, যারা অগ্নি এবং জলের উপাসক।

উপসংহার

প্রসঙ্গ হ'তে অন্যকথায় যাই
অন্ধের মতো সাবধানী, সচকিত
প্রসঙ্গ ছিল, হে অনির্বচনীয়,
তোমার সকল ক্ষমাহীনতার কথা

অন্ধের মতো এবার তাহ'লে খুঁজি
তোমার যোগ্য উপমা ও ভাবছবি।

চিঠি

বহুদূর থেকে ওই ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসে
কোথায় আরতি হয়, কোন্ সে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে ওঠে সকালে সন্ধ্যায়
সেখানে বিগ্রহ কোন্ দেবতার। মানুষের আর্তি দিয়ে গড়া?

অসম্ভব ভালবাসা মুঠিতে ধরেছি আজ, অপটু হাতের লেখা এলেমেলো, ছোট
একটি চিঠির মতো। প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায়
যে চিঠি হয় না শেষ। বহুদূর থেকে শুধু ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসে।
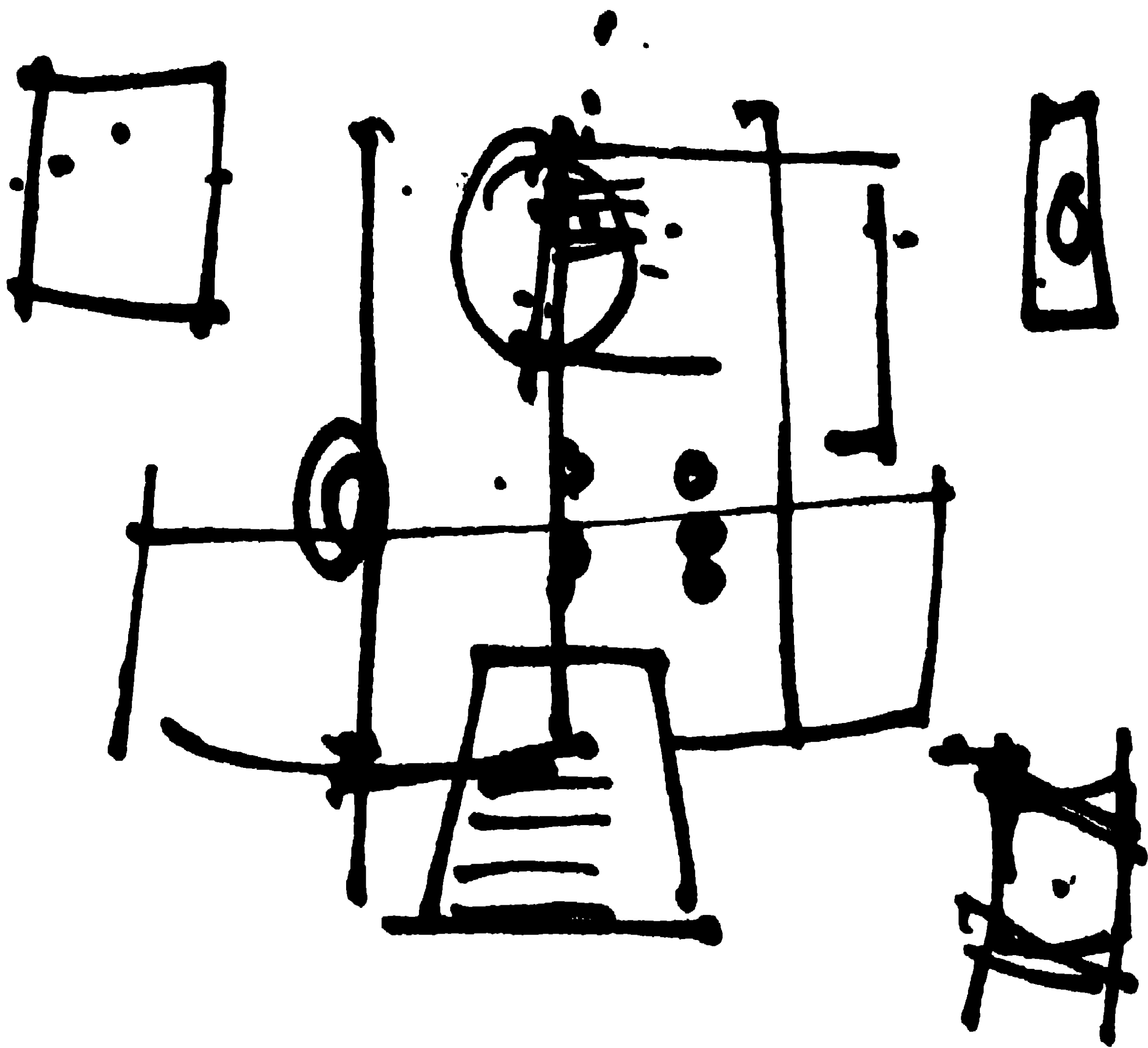
নক্সা : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়: জীবন ও শিল্প

অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী

১৯৫৭ তে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি রহিত হ'বার পর প্রায় বিশ বছর আলো-না-দেখা বিনোদবিহারী লিখেছেন, 'আজ আমি আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি।' উঁচুনীচু বন্ধুর ঊষর ডাঙার খোয়াই-এ দাঁড়িয়ে-থাকা খাড়া তালগাছ—নিঃসঙ্গ কিন্তু মাথা তুলে যে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও—এই তালগাছ যেন তাঁর প্রতীক, তাঁর প্রেরণা। অন্ধকারের প্রতিনিধি হয়েও সাদা কাগজের ওপর নানা রঙের ছোপছাপ দিয়ে ছবি আঁকা বন্ধ হ'লেও কালো চশমা পরিহিত বিনোদবিহারী থেমে যাননি, মেনে নেননি এই শেষ, এইবার থামার পালা। বিনোদবিহারী অপরাজেয় পৌরুষের প্রতীক। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ক্রোমাষ্টার কলমে ছবি এঁকেছেন, মোমের পুতুল গড়েছেন, রঙীন কাগজের কোলাজ রচনা করেছেন, রঙিন টালির ম্যুরাল করেছেন আর মুখে মুখে বলে গেছেন, অন্য কেউ লিখেছেন স্মৃতিকথা চিত্রশিল্পীদের সম্পর্কে প্রবন্ধ, শিল্পচর্চার ইতিহাস, মহাভারত ও ভারত-শিল্প থেকে সুরু করে এমনকি রন্ধনশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ, গোটা পৃথিবীর সৌন্দর্যতত্ত্ব ও শিল্পকলার তুলনারহিত আলোচনা, এমনকি ছোট গল্প পর্যন্ত। পারিবারিক প্রভাব, বিশেষ করে দাদা বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে তাঁর চরিত্রে এই দৃঢ়তা, আপোষহীন অপরাজেয় সংগ্রামী মনোভাব গড়ে উঠেছিল মনে হয়।

জন্ম বেহালাতে মাতুলালয়ে ১৯০৩ সালে। তের বছর পর্যন্ত কেটেছে উত্তর কলকাতায়—মাঝে মাঝে বনবিহারীর নানা কর্মস্থলে। "আমি জন্মেছিলাম সামনে লম্বা অনিশ্চিতের ছায়া নিয়ে"—জন্মমুহূর্ত থেকেই একটা চোখ ছিল নষ্ট, অন্যটি ছিল খুবই দুর্বল। ডাক্তার বলেছে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে; লেখাপড়া করলে আরও দ্রুত হবে; চশমা হয়েছে, এস্কুল সেস্কুল করে অবশেষে ঘরে বন্দী—মোটা চশমা চোখের ইস্কুলে ঠাঁই হচ্ছে না, সমবয়সীরা খেলাধূলা করে, তাঁর খেলাও বন্ধ। স্কুলে যাওয়াও বন্ধ। বই পড়েন আর ছবি আঁকেন। বাড়ীর প্রায় সবাই ছবি আঁকতে পারত—দাদা বনবিহারী বাংলার এক শ্রেষ্ঠ

কার্টুনিস্ট—যদিও নানা মাসিক এর পাতাতেই তা এখনও চাপা—যার সম্বন্ধে পরিমল গোস্বামী বলেছেন, "বাংলা দেশে দুজন মাত্র শক্তিশালী কার্টুনিস্টের আবির্ভাব ঘটেছিল গত যুগে, বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর"। বনবিহারীর প্রভাব-এর কথা বলেছেন বিনোদবিহারী—এ প্রভাব তাঁর চরিত্র ও জীবনচর্চায় চোখে পড়ে—তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক যাঁর লেখায় এবং রেখায়, বিনোদবিহারীর ছবিতে, লেখাতে তাঁর কোন প্রভাব নেই (ব্যঙ্গাত্মক রচনা পড়তে ভালবাসতেন এবং 'লৌহপক্ষী' মনে রেখেও)। ছবির প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছেন বরঞ্চ দাদা বিজনবিহারী,—দাদা বিজনবিহারীর সঙ্গে কেষ্ট দাস পালের স্টাচুয়ার রেলিং-এ ছবির প্রদর্শনী দেখা, চোরাবাজারে ছবি ও বই দেখা, ফুটপাথে অবনীন্দ্র, সুরেন গাঙ্গুলি কি নন্দলালের ছাপা ছবি কেনার কথা জানিয়েছেন। ছবি এঁকে জীবিকা উপার্জন করা যাবে এ কল্পনা তখন অনেকেই করতেন না। তাই বিজনবিহারী হলেন মাইনিং এঞ্জিনিয়ার—শিল্পী হিসাবে পরিচিতি না পেলেও সারাজীবন শিল্পীর মতই কাটিয়েছেন—বিনোদবিহারী নিজেই বলেছেন, শিল্পের জগতে প্রবেশের মুহূর্তে আমার দাদার উৎসাহ ভুলে যেতেও আমি পারি না। ছবি এঁকে জীবিকা অর্জন করা যাবে না ভেবেই বিজনবিহারীকে মাইনিং এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয়েছে। পারিবারিক অঙ্কন-প্রীতি এবং বিজনবিহারীর উৎসাহে ছবি আঁকতেন বিনোদবিহারী। ডাক্তারও বলেছিলেন, "শশী সেন ডাক্তার বলেছিলেন ও আঁকতে চায় ত আঁকাই শেখান, পাঁচ রকম কাজ না করাই ভাল।" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন, "বিদ্যালয়ের ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ও ছবি আঁকত। তাকে গিয়ে বললাম লেখাপড়া শিখে আর কি হবে, চল ছবি আঁকায় যোগ দেবে।' অভিভাবকের অনুমতিপত্র পরে আনিয়ে দেবার কথা বলে বিধুশেখর শাস্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বিনোদবিহারী ছবি আঁকায় যোগ দিলেন। বিজনবিহারীর বেলায় যে সম্মতির অভাব ছিল বিনোদবিহারীর বেলায় তা করা হয়নি—নিশ্চয়ই তাঁর ঝোঁক ছাড়াও, ডাক্তারের নির্দেশ।

বাবা বিপিনবিহারীর দুটি উপদেশ : মানুষকে কখনো লাঞ্ছিত করবে না কখনো বঞ্চিত করবে না, আর ঋণ নিয়ে শোধ দেবে," বনবিহারীরা ছয় ভাই-ই মেনে চলেছেন জীবনভর। পিতৃপুরুষের বৈভব সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পুত্রদের, মা অপর্ণা

দেবী বলেছিলেন "যা গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কি লাভ, যা আছে তাইতে তোরা খুশি থাক, এই আমি চাই", বিনোদবিহারী তাঁর দুর্বল দৃষ্টিশক্তিকে মেনে নিয়েই সাধনার পথে এগিয়েছেন—হয়ত মা র এই উক্তি পাথেয় হয়েছে। বনবিহারীর কর্মস্থল গোদাগাড়ির পর দ্বিতীয় স্মৃতি পাকশি শহরকে কেন্দ্র করে। বনবিহারী এখানে রেলের ডাক্তার। "লনের মাঝখানে মস্ত স্থলপদ্মের গাছ—কি তার শোভা। কুঁড়ি খুলে বেরিয়ে আসে ধবধবে সাদা ফুল ক্রমে গোলাপি থেকে লাল হয়ে পোড়া লোহার মত রং হয়, তার পর ঝরে যায় সবুজ ঘাসের ওপর। স্থলপদ্মের গাছ সারাজীবন দেখেছি, কিন্তু এত বড় গাছ পরে কখনো আর আমি দেখিনি। ১৯৪০-এ শান্তিনিকেতনে টেম্পারা মাধ্যমের 'স্থলপদ্ম' ছবিটি মনে পড়ে—স্মৃতিতে বুঝিবা পাকসীর রেল কলোনী। "বালক বয়সের অত্যন্ত তুচ্ছ সব ঘটনা কিন্তু সেগুলোকে কোনো মানুষই তাচ্ছিল্য করতে পারে না, জীবন প্রভাতের নির্মল আলোর মতোই এই সব স্মৃতি উজ্জল হয়ে থাকে মানুষের মনে।" ধরে আনা এক হুতুম পেঁচা সম্পর্কে লিখেছেন 'চিত্রকর'-এ। মনে পড়ে যায় 'আলোর ফুলকি'র পুস্তানিতে গাছপালা পাখপাখালির সঙ্গে আছে হুতুম প্যাঁচার ছবি—তাঁরই আঁকা।

"সেই ছেলেবেলা তখন ডুমকায় আছি—মাঝে মাঝে হাটে যাই, একদিন সেখানে মস্ত এক ভেড়া নিয়ে সাঁওতাল যুবক দাঁড়িয়ে। আমার খুব ইচ্ছে ভেড়াটার গায়ে হাত দিই, কিন্তু সাঁওতাল ছেলেটা বল্লে, হাত দিস্‌নি—উল্টে পটাং করে দেবে"। নতুন ম্যুরাল-এ ছোটবেলার এই ভেড়াকে স্থান করে দেবার "এক দুরন্ত ইচ্ছা লালন" করতেন বিনোদবিহারী।

দাদাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষ এর। তিনিই বিনোদবিহারীকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। দেহলীতে প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কালীমোহন ঘোষ তাঁকে জানালেন, রবীন্দ্রনাথ ভর্তির অনুমতি দিয়েছেন। বিনোদবিহারী লিখেছেন, "যে সময় কলকাতা শহরের কোনো স্কুল ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন বালককে ভর্তি করতে চায়নি, সেই ক্ষীণদৃষ্টি-সম্পন্ন বালক রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছে। যে সময় আমার মতো ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর পক্ষে কোনো আর্ট স্কুলে যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল সে সময় রবীন্দ্রনাথের কলাভবনে আমি স্থান পেয়েছিলাম অধ্যাপকের

আপত্তি সত্ত্বেও। নন্দলালের আপত্তি ছিল কারণ "যার চোখ নেই সে আঁকবে কি করে নন্দলাল সেই কারণে প্রথম প্রথম তাঁকে 'সুনজরে' দেখেন নি, যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে মনোযোগী ছাত্র তা জানিয়েছেন। সবাইকে দেখিয়ে দিলেও প্রথম প্রথম তাঁকে যে নন্দলাল দেখিয়ে দেননি তার কারণ তাঁর মনে হয়েছিল ক্ষীণদৃষ্টিশক্তির বিনোদবিহারী "শিল্পজগতে প্রবেশের অনধিকারী।" রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে বলেছিলেন, "যদি ও নিয়মিত আসনে বসে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করে তবে ওকে স্থানচ্যুত কোর না।", চার পাঁচ বিঘত লম্বা একটা ছবি আঁকলেন বিনোদবিহারী, শাল গাছের সারি, কাঠবেড়ালি উঠছে নামছে জমিতে দৌড়াচ্ছে--সতীর্থরা বললেন, ছবির কম্পোজিশন-এ খুব ভুল হয়েছে--ছবিটা তারা তিনটুকরো করলেন।

নন্দলাল নজর ঠিকই রাখতেন কে কী করছে। পরদিন টুকরো ছবি দেখে বিনোদবিহারীকে নির্দেশ দিলেন, "এর পর থেকে ছবি আমাকে দেখাবে, অন্যের পরামর্শে চলবে না", আর তাঁর সতীর্থদের বোঝালেন, ছবির কম্পোজিশন এ কোনো ভুল হয়নি। প্রসঙ্গত শিক্ষকবৃন্দ ও সতীর্থদের কথা একটু বলা যাক।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররা নন্দলালের উপস্থিতির কথা প্রথমে জানলেন এক অঙ্কন প্রতিযোগিতার ঘোষণায়—বিনোদবিহারী এই প্রতিযোগিতার কথা লিখেছেন; আধুনিক শিল্প শিক্ষায় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, বিনোদবিহারী, মনীষী দে প্রমুখ ছাত্ররা এতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতার ফল বেরোনোর আগেই নন্দলাল কিছুদিনের জন্য আশ্রম ত্যাগ করলেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন, এলেন অসিতকুমার হালদার। সঙ্গে তাঁর তিন ছাত্র—অর্ধেন্দুপ্রসাদ, হীরাচাঁদ, কৃষ্ণকিংকর। নন্দলাল কলকাতা-শান্তিনিকেতন-কলকাতা করেছেন কিছুকাল। কলা ভবনের আচার্যপদ গ্রহণ করেন এরপর। বিনোদবিহারী—রমেন্দ্রনাথ, বিনায়ক মাসোজী, বীরভদ্ররাও চিত্রা, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেছেন। এরপর প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ কবিখ্যাতি নিয়ে কলা-ভবনে যোগ দেন। প্রভাতমোহন তার সমসাময়িক ছাত্রদের নাম উল্লেখ করেছেন গুরুস্মরণ'এ, (নন্দলাল সংখ্যা, বিশ্বভারতী পত্রিকা) ১৯২৩ সালে অসিতকুমার কলাভবন ও শান্তিনিকেতন থেকে দূরে সরে যান। নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার ১৯২১এ বাঘগুহা চিত্র অনুলেখনের জন্য বাঘগুহা যান। সেখান

থেকে 'চিঠিতে ছবি', দেওয়াল-চিত্র সম্পর্কে নানাকথা তাঁরা ছাত্রদের লিখতেন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন, তিনি ও বিনোদবিহারী মাটির রং ও ভাতের মাড় দিয়ে তাদের ঘরে (সন্তোষালয়) দুটি চিত্র এঁকেছিলেন। ১৯০৯-এ অজন্তা এবং '২১-এ বাঘগুহা চিত্র-অনুলেখন এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, ভিত্তি-চিত্র, দেওয়াল-চিত্র বিষয়ে নন্দলালের আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিমা দেবীর শিখে-আসা ইতালীয় ভিজা পদ্ধতি ও তাঁর গুরুর লেখা বই এর ব্যাপক অধ্যয়নের পাশাপাশি ভারতীয় ভিত্তি-চিত্র সম্পর্কে অনুধাবন অধ্যয়ন এবং জয়পুরী ফ্রেস্‌কোর আদর্শ ও রূপ-নির্মাণ রীতি—শান্তিনিকেতনে দেওয়াল-চিত্র সম্পর্কে নতুন নতুন উদ্যম—বিনোদবিহারীকে শুধু নন্দলালের অন্যতম সহকারীই বানায়নি, দেওয়াল-চিত্রের মৌলিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীতেও পরিণত করেছে।

অসিতকুমার আশ্রম ত্যাগ করলেন, নন্দলাল কলাভবনের আচার্যের পদ গ্রহণ করলেন। "মৌলিক রচনার কালে পূর্ণস্বাধীনতা, অপরদিকে পর্যবেক্ষণ, পরম্পরা অনুশীলন এইভাবে ছাত্রদের পরিচালিত করার চেষ্টা নন্দলাল প্রথম থেকে করেন। নন্দলাল শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করলেন, কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ দেখালেন না। তাই কলাভবনের প্রথম ছাত্ররা নিজেদের রুচি মেজাজ অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পেলেন।" প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই সে সময় নিজের রুচি অনুযায়ী পরম্পরা বেছে নিয়েছিলেন, কেউ চীনে কেউবা মোগল রাজপুত কেউবা বিলেতী জলরং বা আর্ট জার্নালের পুরানো পাতা উল্টিয়ে রুচি মেজাজ অনুযায়ী, কেউ আবার পরম্পরার উপাদান সংগ্রহ করতেন। চার পাঁচ বছর পরে এসেছেন রামকিংকর। রামকিংকরও এ প্রসঙ্গে বলেছেন ; বিনোদবিহারীর উল্লেখ করেছেন উদাহরণ হিসাবে, "The choice of style was entirely the student's affair, for instance, Sri Benode Mukherji began by cultivating the Chinese style as an element in his design to have access to the spirit of Oriental art, especially the art of India."

ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে নিবেদিতা ওকাকুরার পূর্বেই হ্যাভেল এর উল্লেখ করতে হবে। বিনোদবিহারী আধুনিক শিল্পশিক্ষা গ্রন্থে স্টেলা ক্রামরিশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ভারতীয় ভাবাদর্শের দিকে হ্যাভেল

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ' করেছেন, তেমনি ভারতীয় শিল্পের উপাদান আঙ্গিক নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে ক্রামরিশ ভারতীয় শিল্পীদের কাছে আর এক দৃষ্টিকোণ খুলে দিলেন।" শুধু তাই নয়, ইয়োরোপীয় চিত্রকলার নানা পর্যায় ইমপ্রেশনিজম্ থেকে কিউবিজম্ পর্যন্ত বিশদ আলোচনা ক্রামরিশ এসময় করেছিলেন—আমাদের মনে হয় নন্দলাল যেমন বিদেশ থেকে বই, প্রিন্ট সংগ্রহ করেছেন কলাভবনের জন্য, রবীন্দ্রনাথের উপহার পাওয়া বই এ যেমন কলা ভবনের ছোট্ট গ্রন্থাগার ক্রমে ক্রমে ভরে উঠেছে, বিনোদবিহারী যখন কলাভবনের ছোট্ট প্রদর্শশালা ও গ্রন্থাগারের ভার-প্রাপ্ত অধ্যাপক তখন এই আলোচনার সূত্রেই ইয়োরোপীয় চিত্রকলার বিভিন্ন পর্বের শিল্পীদের বই, প্রিন্ট সংগ্রহ সমৃদ্ধ হয় ক্রমে ক্রমে যা পাঠক বিনোদবিহারী এবং পরবর্তীকালের শিল্প-জিজ্ঞাসার লেখককে তৈরী করেছে এবং অন্ততঃ রাম-কিংকরকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হ'তে সাহায্য করেছে।

প্রসঙ্গত আঁদ্রে কারপেলের উল্লেখ করা যেতে পারে—"কাঠ-খোদাই কাজের প্রবর্তন তারই মধ্যস্থতায় ঘটেছিল"—আঁদ্রে কারপেলে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিত্র-শিক্ষা (বিশেষ করে অয়েল পেন্টিং) এবং উড-কাঠ শেখাতেন। প্রতিমা দেবীর সহযোগিতায় হাতের কাজের নতুন বিভাগ যেমন খোলা হয় তেমনই কলাভবনের ছাত্রদের হাতের কাজ শেখা আবশ্যিক করা হয়। শিক্ষার বিষয় ছিল কাঠ-খোদাই, বই-বাঁধাই, লিথোগ্রাফ, গালার কাজ, অয়েল-পেন্টিং, ফ্রেস্কো, ও আলপনা। রমেন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন, আর হকুসাই এর ছবি দেখেন, তাঁর জীবনী পড়েন। কারপেলে ফ্রাইমান এর শিক্ষা এবং নন্দলালের উৎসাহে রমেন্দ্রনাথ কাঠ-খোদাই-এ বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠেন। এবং অন্তত এপ্রবন্ধে শুধু শান্তিনিকেতনের সে সময়কার কলা ভবনের শিক্ষা, পরিবেশ বিষয়েই এ প্রসঙ্গ টানিনি, উল্লেখযোগ্য, বিনোদবিহারীও কাঠ-খোদাই ছবি করেছেন। এবং এই কাঠ-খোদাই-এও অন্য মাধ্যমের মতই বিনোদবিহারীর নিজস্ব রীতি স্পষ্টই চোখে পড়ে। "এই সময় যে সব ছাত্র ভিত্তি-চিত্র সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়ে-ছিলেন নন্দলাল তাদের উৎসাহিত করেছেন এবং নিজেও ছাত্রদের সঙ্গে এক-যোগে কাজ করেছেন।" বলা বাহুল্য, বিনোদবিহারী এই ছাত্রদের অন্যতম। ১৯২৪-এ নন্দলাল "ভিত্তিচিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা অনুযায়ী চিত্র রচনা

করেন। পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস, কিংবদন্তীর কাহিনী, চরিত্র; সংস্কৃত বাংলা কাব্য, নাটক-দৃশ্যের ছবি আঁকার রেওয়াজ রবি বর্মার আমল থেকেই। (রবি বর্মার ছবিকে ইয়োরোপীয় ধাঁচের দুর্বল, আড়ষ্ট ছবির বেশী মর্যাদা দিতে আমরা রাজী নই)। পৌরাণিক, ইতিহাস-আশ্রিত ছবিকে মর্যাদা দিয়েছেন—পাকা শিল্পী বলেই, অবনীন্দ্র নন্দলাল। অবনীন্দ্র নন্দলালের শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনের ছবি বাদ দিলে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের দিক থেকেও এই জাতীয় ছবি অন্ধ অনুকরণ এবং প্রাণহীন এ অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বিষয়বস্তুতে আপত্তির বড় কারণ দেখি না কারণ যামিনী রায় এবং ক্যালকাটা স্কুলের নীরদ মজুমদার, সুনীলমাধব, কি দক্ষিণের পানিক্করও পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি এঁকেছেন—নিজস্ব অঙ্কন-রীতি এবং আঙ্গিক রীতির গুণেই তা মূল্যবান শিল্পবস্তু। নন্দলালের কলাভবনের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিনোদবিহারী এবং রামকিংকর পৌরাণিক বিষয়কে বেছে নেন নি—"পৌরাণিক চিত্র যে আমার হাতে নেই তা আমি বেশ ভাল করে বুঝেছিলাম এবং সেকথা বন্ধুবান্ধবদের বলতেও কখনো দ্বিধা করিনি।" "এক সঙ্গে থেকেও শিল্পের দিক থেকে ভিন্ন" বিনোদবিহারী সত্যজিৎ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "মিথলজিতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না।" 'চিত্রকর'এ একটা মাত্র ইতিহাস-ঘেঁষা রাজরাজড়ার ছবির কথা বিনোদবিহারী উল্লেখ করেছেন। ছবিটি নন্দলালের প্রশংসা পেলেও এবং বিক্রী হয়ে কিছু টাকা পেলেও বিনোদবিহারী এজাতীয় ছবি আর আঁকেননি; নিজেই বলেছেন, "আশে পাশের দৃশ্য, সাঁওতাল জীবন এই ছিল আমার ছবির বিষয়।" নন্দলালের পৌরাণিক ছবি কি অসিতকুমারের 'রূপক ছবি' বিনোদবিহারীকে সন্তুষ্ট করেনি যদিও দুজনেরই ছবি ক্রমে "মাটির দিকে নেমে" এসেছে, বিনোদবিহারী মন্তব্য করেছেন। আমাদের মনে হয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণের পর নন্দলালের ছবিতে প্রকৃতির আরও বেশী উপস্থিতি এই মন্তব্যের মূলে। অনেক পরে মাটি, প্রকৃতি, লোকজীবনের প্রতি টান যা ওঁদের ছবিতে এসেছে বিনোদবিহারীর ছবিতে তা গোড়া থেকেই—"আমার জীবনে সেটি প্রথম থেকেই দেখা দিয়েছিল।" কলা ভবনের তরুণ শিল্পীদের ছবি, রূপম পত্রিকার অর্ধেন্দ্রকুমার, স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করে। প্রবাসী পত্রিকায় বিনোদবিহারীর 'শীতের সকাল' নামে ছবি প্রকাশিত হ'ল। "আমার দৃঢ়

বিশ্বাস যে শিল্পীর নিজস্ব উপলব্ধি অর্থাৎ যেটি তার মূল প্রেরণা সেটি সে প্রথম জীবনেই পেয়ে যায়।"

যাঁদের সঙ্গে ছবি আঁকা সুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকেই বাইরে চলে গেছেন চাকরীর সন্ধানে। দূরে কোথাও তাঁর পক্ষে চাকরী করা অসম্ভব; সরকারী চাকরীও পাবেন না, বড় সহরে যানবাহনের ভীড়েও তিনি অচল বুঝেই কলাভবনের গ্রন্থাগার ও ছোট্ট প্রদর্শশালার ভার দেওয়া হ'ল। [সত্যজিৎ রায়কে গ্রন্থাগারিক সত্যেন্দ্রনাথের সহকারী একথা বলেছেন।]

এর আগে ছোটদের ড্রইং ক্লাস নিতে সুরু করেছিলেন, বিনোদবিহারীর অকপট স্বীকারোক্তি, ক্লাস পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে 'নিশ্চিন্ত' ছিলেন অর্থাভাবের 'দুশ্চিন্তা' নিয়ে। [কলা ভবনের শিক্ষক বিনোদবিহারী সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই ছাত্রদের মধ্যে—তাঁর পাণ্ডিত্য এবং ছাত্রদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ঝোঁক বজায় রেখে স্ফূর্তিতে সহায়তার কথা সব ছাত্রই স্বীকার করেন।] বিনোদবিহারীর সমসাময়িক অনেকেই তখন চাকরীর জন্য এদিক সেদিক, পরবর্তীকালের নতুন ছাত্র ছাত্রীর ভিড় বাড়লেও বিনোদবিহারী তখন একা। "খোয়াই, সুরুলের শালবন, কোপায়ের ধার—এই সব স্থান তখন আমার প্রায় নিত্য সঙ্গী। ছবিও আঁকি এই সব বিষয় অবলম্বনে। ...গ্রীষ্মের দুপুরে খালি পায়ে, খালি মাথায় যখন ঘুরে বেড়িয়েছি গ্রামের পথে, খোয়াই এর ধারে, তারও অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে দুর্লভ হয়ে উঠেছে এবং অন্যের কাছে এইসব কাহিনী গল্পের মতো মনে হয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটী পড়লে আজও সেই দুপুর ও অন্ধকার রাত্রির কথাই মনে পড়ে।" ঢেউ খেলানো উষর ডাঙার খোয়াই কি তিরতিরে জলের কোপাই-এর ধার, মাঝে মধ্যে কিছু তালগাছ, আশ্রম সীমানার বাইরে তখনকার শান্তিনিকেতন—গ্রীষ্মের ছুটি হলে'ত আশ্রম এলাকায়ই নিঝুম, নির্জন। বিনোদবিহারীর একটি পঙক্তি তাঁর ছবির জন্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, "এই নির্জনতাই আমার দৃশ্য-চিত্রের প্রধান বিষয়।" যেমন মানুষ বিনোদবিহারীর জন্য আর কয়েকটি পঙক্তি স্মর্তব্য, "খোয়াই আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ। ব্যস। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার—ওটাই আমি।" 'বৃক্ষ প্রেমিক' তেজেসচন্দ্রের প্রতিকৃতি হ'তে পারে কিন্ত

প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর আত্ম প্রতিকৃতি। সম্ভবত বন্ধু তেজেসচন্দ্রকে মনে রেখে তেজেসচন্দ্রের আকৃতি আঁকলেও গাছতলার ঐ নির্জনে প্রকৃতি-প্রেমী মানুষটি বিনোদবিহারী স্বয়ং। শীতের সকাল এবং সেতু (The Bridge) ছবিতেও এই নির্জনতা ফুটে উঠেছে! হয়ত বা পরিচিত প্রকৃতিতে যেটুকু, ছবিতে তার চেয়েও অনেক বেশী।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-যুগের মানুষ বিনোদবিহারী বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি আর যদি কিছু না পেয়ে থাকি তবু আমি বলব তিনিই আমার নব জন্মদাতা।" শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি, গ্রন্থ, গ্রন্থগার এবং শিক্ষক নন্দলাল বসু সম্বন্ধে তাঁর স্বীকারোক্তি, "তাই ভাবি আমি শিখলাম কার কাছ থেকে? নন্দলালের কাছ থেকে না লাইব্রেরি থেকে অথবা শান্তিনিকেতনের এই রুক্ষ প্রকৃতি থেকে? নন্দলাল না থাকলে আমার আঙ্গিকের শিক্ষা হতো না, লাইব্রেরি ছাড়া আমার জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হতো না আর প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি উপলব্ধি না করলে আমার ছবি আঁকা হতো না।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলাল চীন ও জাপান ভ্রমণে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে শিল্পীদের নিয়ে গিয়েছেন দেশ-বিদেশের শিল্পধারার সঙ্গে আরও পরিচিত করাবার জন্যই। জাপানে নন্দলাল বসু বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরিচিত হ'ন রাসবিহারী বসুর অনুরোধে নন্দলাল বসু জাপানে তাঁর ছাত্র পাঠান। জাপানে ভারতসংঘের বৃত্তি পেয়ে নন্দলালের আগ্রহে বিনোদবিহারী জাপানে যান। বিনোদবিহারীর চীন জাপান এর শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ বরাবরের। সোতাৎসু তাঁর প্রিয় শিল্পী। প্রবীন শিল্পী টাকেউচি এবং বাংলাদেশে পরিচিত কাম্পু আরাই এর সঙ্গে পরিচিত হ'ন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সাইচে টাকির সৌজন্যে মিউজিয়ামের ডিরেক্টার আকিয়ামার সাহায্যে শিল্পীদের স্কেচ্‌বুক এবং ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন—জাপান এমনকি টোকিও শহরও ভাল করে দেখেননি বিনোদবিহারী, দেখেছেন জাপানী শিল্পীদের স্টুডিও, শিল্পবিদ্যালয়, মিউজিয়াম, এঁকেছেন ছবি। তাঁর ছবির প্রদর্শনীও হয় টোকিওতে। 'শিল্প-সামগ্রী বিক্রেতা' টোকিওতে আঁকা তাঁর বিখ্যাত ছবি। "জাপান থেকে শান্তিনিকেতন ফেরার পর নতুন ক'রে আঙ্গিক চর্চায় আমি লাগলাম।" এসময় প্রচুর ফুলের ছবি আঁকেন। উল্লেখযোগ্য

'পদ্মফুল'। ছাত্রাবাসের ছাদে বীরভূমের গ্রাম-মানুষ-গাছপালার ফ্রেসকো আঁকেন। এই দেওয়াল-চিত্র উল্লেখ ক'রে বিনোদবিহারী বলেছেন, "আমার তুলির টান-টোনের বা রঙের ছোপছাপ দেওয়ার রীতি পূর্বের চেয়ে অনেক বদলেছে।" কলাভবনের ছাত্রী শ্রীমতী লীলাকে বিবাহ করেন বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। বিবাহের পর প্রীতি-ভোজ প্রসঙ্গে চীনা বন্ধু উ ও শ্রীমতী উ এবং চীনা রান্নার প্রসঙ্গ আছে—বিনোদবিহারী লিখেছেন, "রন্ধনবিদ্যাকে শিল্পমর্যাদা দেওয়ার রীতি পৃথিবীর সকল দেশের লোকই স্বীকার করেছে" (চিত্রকর)। এ লেখা প্রকাশের কয়েক বছর পর 'এক্ষণ' পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল বিনোদবিহারীর।

১৯৪৬-৪৭ সালে বিনোদবিহারী মধ্যযুগের সন্ত কবিদের জীবন-ভিত্তিক বিশাল ম্যুরাল শেষ করেন। সহকারী হিসাবে স্ত্রী লীলা দেবী ও ছাত্র জিতেন্দ্রকুমার, সুব্রহ্মণ্যম, দেবকীনন্দনের নাম করেছেন বিনোদবিহারী। এই ম্যুরালটি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেছেন, "বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের দেশে এর চেয়ে মহৎ ও সার্থক কোনো শিল্পকীর্তি রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।" দেওয়াল-চিত্র আঁকছেন শিল্পী অথচ দূরে এসে বারবার দেখার সুযোগ নেই, যতটা আঁকা হয়েছে সমগ্রভাবে দূর থেকে দেখারও উপায় নেই কারণ বিনোদবিহারী দূরে এসে কিছুই দেখতে পান না। বন্ধু সৈয়দ মুজতবা আলীও এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। "তিনি চার হাত দূরের কোন জিনিষ ভালো করে দেখতে পেতেন না। যৌবনে তিনি একখানি বিরাট দেওয়াল ছবি বা ফ্রেস্কো আঁকতে আরম্ভ করেন। বড় বড় চিত্রকররাও সম্পূর্ণ ফ্রেস্কোর পূর্ণাঙ্গরূপ দেখার জন্য বারবার পিছন হটে ছবিটাকে সমগ্ররূপে দেখে নেন। বিনোদবিহারী দূরের থেকে কিছুই দেখতে পান না। তাই তিনি অনুমানের উপর নির্ভর করে একদিকে ছবি আঁকা আরম্ভ, অন্যপ্রান্তে এসে শেষ করতেন।

হিন্দী ভবনের কাজ শেষ করে বিনোদবিহারী কিছুদিন শান্তিনিকেতনের বাইরে থাকা স্থির করলেন। নেপালের শিক্ষাবিভাগ তাঁকে নেপালের প্রদর্শশালা 'যুদ্ধযন্ত্রশালা'র কিউরেটার এর পদে নিযুক্ত করেন। গয়না, কাঠ ধাতুর ভাস্কর্য কিছু থাকলেও অস্ত্রশস্ত্র এবং বন্য পশুর ছাল-চামড়া ছিল প্রধান। এই প্রদর্শশালাকে ঢেলে সাজান বিনোদবিহারী। নেপাল থেকে যে সমস্ত শিল্পবস্তু-ব্যবসায়ীরা

বাইরে নিয়ে যেত, পরীক্ষা ক'রে প্রাচীন শিল্পবস্তু প্রদর্শশালার জন্য রেখে বাকিগুলোর ছাড়পত্রও তাঁকে দিতে হ'ত। কাঠমাণ্ডুতে "মঠ, মন্দির, শ্রাবণ-মেলায় মন্দিরে মন্দিরে বিচিত্র ছবি ও মূর্তির প্রদর্শনী দেখে দিন আমার ভালই কাটছিল।" কারুশিল্পীদের প্রতি আগ্রহ থেকেই নেপালের কাঠ-খোদাই-শিল্পী ও ধাতু-শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে তাদের পরাম্পরাগত কাজ দেখেন বিনোদবিহারী। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কাঠ ও পাথর খোদাইকার শিল্পী কুলসুন্দরের কাছে তাঁর স্ত্রী ও এক ছাত্র কিছুকাল শিক্ষা নেন প্রথাগত ভাস্কর্যে।

নেপাল থেকে ফিরে স্ত্রী ও নবজাত কন্যাকে নিয়ে বিনোদবিহারী যান রাজস্থানের বনস্থলি বিদ্যাপীঠে এবং তারপর মুসৌরিতে—পরিকল্পনা মত মুসৌরিতে শিশু-বিদ্যালয় এবং শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হ'লেও "এভাবে সংসার চালানো যায় না"; তাই স্ত্রী লীলা মুখোপাধ্যায় দেরাদুনের স্কুলে যোগ দিলেন। বিহারের চারুকলা বিভাগের পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়ে বিনোদবিহারী গেলেন পাটনায়—যদিও মুসৌরির প্রাকৃতিক দৃশ্য, আবহাওয়া, অবসর চিত্রশিল্পীর পক্ষে অনুকূল তবু তাঁকে পাটনায় পাড়ি জমাতে হ'ল সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণেই। নূতন পাঠক্রম তৈরী ক'রেও আর্ট স্কুলের শিক্ষাধারার পরিবর্তন করা গেল না। আর্ট স্কুলের বাইরেটা যদিও সাদা চুনকাম করা, কিন্তু স্কুলের ভেতরে গাঢ় অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারকে রক্ষা করার জন্য অধ্যক্ষ মশাই দৃঢ় সংকল্প। একটি অ্যামেচার ক্লাস খুলে, যে কয়জন ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছিলেন তাদের কাজ নিয়ে একটা প্রদর্শনী করা হ'য়েছিল। এছাড়া পুরানো ধাঁচেই সব কিছু চলল। আর্ট স্কুলের সর্বনাশ করতে এসেছেন যিনি তার চোখের জন্য তিনি বেশীদিন সর্বনাশ করতে পারবেন না এই আনন্দে অধ্যক্ষ ও তার সহকারীরা যখন উৎফুল্ল বিনোদবিহারী তখন উদ্বিগ্ন। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়েও, নতুন করা চশমা নিয়েও "তুলির লাইন ঠিক জায়গায় পড়ে না।" শেষ পর্যন্ত দিল্লী যাওয়াই ঠিক হ'ল চোখের জন্য ১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে। শৈশব থেকেই অনিশ্চিতের ছায়া তার সঙ্গী; শৈশবেই ডাক্তাররা চোখে অস্ত্রোপচার করতে বারণ করেছিলেন। "দিল্লীর মস্ত ডাক্তার অপারেশন করলেন। ক'দিন পর স্ত্রী'র হাত ধ'রে বেরিয়ে এলেন নার্সিং হোমের বাইরে। "বাইরে রৌদ্রের উত্তাপ বুঝছি কিন্তু আলো দেখতে পাচ্ছি না।" 'কত্তামশাই' এই তেইশ

বছর বাইরের আলো আর দেখেননি। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই ছবি এঁকেছেন, কোলাজ করেছেন, মোম-পুতুল গড়েছেন, স্মৃতিকথা প্রবন্ধ মুখে মুখে বলেছেন।

—কর্তামশাই-এর চোখে তখন কালো চশমা। যেদিকে তাকান শুধুই অন্ধকার। এই অন্ধকার তার কাছে নতুন। অন্ধকারের অভিব্যক্তিও নতুন। কালো চশমার আগের তিনি এখন কর্তামশাই। আশে পাশে, কর্তামশাইকে জিনিষ জুগিয়ে দেবার জন্য হাজির কেউ না কেউ। কর্তামশাই—কালো চশমার কর্তামশাই—কুর্শিতে বসে। ভাগ্যের লিখন স্পষ্ট যার কাছে সেই কর্তামশাই কখনও গুহাভ্যন্তরস্থিত দীপশিখার মত স্থির। চেষ্টা করছেন এই নতুন জগতকে চেনার, জানার। যে জগৎ তাঁকে প্রতি মুহূর্তে পীড়িত করছে তার সত্য পরিচয় জেনে নেবার। কখনো কখনো জমাট অন্ধকারের চাপে কর্তামশাই হাঁপিয়ে ওঠেন। তাঁর দেহমন ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্থ।

'শ্যামে'র তিনিই কর্তামশাই। শ্যাম ফুল নিয়ে আসে ফুলের বড় বর্ণনা করে। দিল্লীর নার্সিং হোমে 'টুকরো হয়ে যাওয়া' কর্তামশাই একফুলের আকার এর সঙ্গে অন্যফুলের আকারগত পার্থক্যে ফুলের জগৎকে স্পষ্ট অনুভব করেন। এই নতুন জগৎকে চেনা-জানার পালা শুরু হয়—রূপে রঙের অখণ্ড বাস্তবতা টুকরো আকারে ধরা দেয়—তিনি বুঝতে পারেন, নার্সিং হোম থেকে বেরোনোর সময় যেমন আলো দেখতে পারেননি, তাপ পেয়েছিলেন বুঝতে, শুধু তেমনি শুধু আলো নয় রঙ, রঙের সঙ্গে সৌন্দর্যের জগৎও যেন হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজ তিনি শুনতে পাচ্ছেন অন্ধকারে আকারের ঝংকার। নিরেট অন্ধকারের মধ্যে গভীরতার সাক্ষাৎ পেলেন কর্তামশাই।

এক একদিন রাত্রে হঠাৎ ইচ্ছা হয় জোছ্না দেখার—হঠাৎ কাকের কা-কা ডাকে মনে হয় আজ কী কাক-জ্যোৎস্না—মনে পড়ে বালির চর—বড় বড় ঘন পাতাওয়ালা জামগাছ—আর জাম গাছের চেয়েও কাল তার ছায়া। একদিন ...কাগজে গাছের ছায়া ধরার চেষ্টা করেছেন কালি, রঙে, তুলিতে। সকালে রোদ এসে পড়ে চুলে জামায় হাতে পায়ে—শুধু তার বাস যে অঞ্চলে—সেখানে আলো নেই। কিন্তু এখন আর কোন ক্ষোভ নেই কর্তামশাই এর। "আলোর এখন আর তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। অন্ধকার জগতের প্রাণের স্পন্দন, নতুন সৌন্দর্য তাঁর হাতের আয়ত্তে এসেছে।"

শ্যাম একদিন মোম দিয়ে ছোট্ট একটু গরু তৈরী করে এসে বলে, বাবু আমি পুতুল বানিয়েছি। 'আমায় একটু মোম দে, আমিও পুতুল করব।' মোম টিপতে টিপতে ক্রমে আঙুলগুলো বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে, ক্রমে ইচ্ছার ছাপ মোমের উপর পড়তে লাগলো। ছাপে ছাপে অন্য আকার বেরিয়ে এল।

একদিন কত্তামশাই মোম দিয়ে বেড়াল গড়ছেন, এলেন এক সাধুবাবা। বললেন 'ঘরে যদি স্বয়ং ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরও আসেন এবং বলেন তোমার আসন তৈরী, ত' বলবে আমার হাতের কাজ শেষ করি তারপর দেখা যাবে।'

অন্ধকারে একা থাকতে কত্তামশাই অভ্যস্ত। কিন্তু কোথাও আলো নেই মনে হতেই মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, ভয় দেখা দিল, এ ভয় মৃত্যুভয়। নিয়তি বা অদৃষ্ট যেন তাঁর সামনে এসে বলছে, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। কত্তামশাই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করেন, তুমি যেই হও এখন আমি কোথাও নড়বো না। আমার অনেক কাজ। শাশ্বত সৃষ্টি অমর কীর্তি না রেখে আমি যাব না। নিয়তি তাঁকে দেখায় কালপ্রবাহ—"নরনারী সংসার করছে। আবার জলের স্রোতে সব তলিয়ে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে নতুন দৃশ্য, নতুন কলরব। কান্নার হাহাকার—হাসির ঝুলঝুরি।…ভাঙ্গা মঠ মন্দিরের পেছনে পেছনে তৈরী হচ্ছে নতুন মঠ-মন্দির, কিন্তু কিছুই স্থায়ী নয়।"

কত্তামশাই মোমের পুতুল গড়ছেন। এতদিনের করা-পুতুলে নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে। আজ একই মোমের তালে প্রকাশ পাচ্ছে তার অস্তিত্ব। কত্তামশাই ভাবেন, একী আনন্দ। চলচিত্রের মত, কাল-প্রবাহ প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতার পট পরিবর্তন যেন নিয়তি তাকে দেখিয়েছে পুতুল, মোম বা লোহার তৈরী তাতে কিছু যায় আসে না, লয় তার অনিবার্য; কিন্তু "এই আনন্দ এই উপলব্ধি তারও কি লয় হ'বে? তার আনন্দের চিহ্ন রয়ে গেছে মোমের পুতুলে। সবই তলিয়ে যায় সত্য, কিন্তু তীব্র উপলব্ধি বোধ হয় তলিয়ে যায় না।"

দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর মোমের মূর্তি—জীবজন্তু, মানুষের ভাস্কর্য যা বিনোদবিহারী তৈরী করেছেন ভাস্কর প্রভাস সেনের মতে "তা চক্ষুষ্মান ভাস্করদের লজ্জা দেবে।' দৃষ্টিশক্তি হারাবার আগে অন্ততঃ একটি মোমের মূর্তি গড়েছেন এ তথ্যও প্রভাস সেনের। কলাভবনের ছাত্রশিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখেছেন, বিনোদদা বললেন—"রাম, একটা কাজ করতে পারবে? নন্দদাকে আমার এই মূর্তিটা দেখিয়ে আনতে পারবে!' মূর্তিটা হ'ল মোষের পিঠে একটা ছেলে। নন্দলাল খুব খুশী হয়ে নিজের হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখে ডাকলেন তনয়দাকে (স্বর্গীয় তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ) আর তাঁকে দেখাতে দেখাতে বললেন, এই হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি যাকে একবার দেখেছে তা চিরদিনের মত মনে গাঁথা হয়ে গেল, হারিয়ে গেল না।"…

"মোম ফুরিয়ে গেছে। হাতের কাছে একটা কাগজ পেয়ে সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটা মোচড় দিলেন তিনি। সামান্য কাগজ অকস্মাৎ অসামান্য আকার নিয়ে উপস্থিত হ'ল। আবার আর একখানা কাগজ টেনে নেন, এখানে সেখানে আঁকাবাঁকা তেকোনা মোচড় দেন, আর নতুন অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত আকার বেরিয়ে আসে।

"ফ্লোমাস্টার কলমে ছবি আঁকছেন। কেউ বলল দাগ পড়ছে না এই এক অসুবিধা। নানা রঙের কাগজ কেটে কোলাজ করেছেন বিনোদবিহারী। অন্যের সাহায্যে ঠিকঠিক-মত রঙ্ পাওয়া যায় না, ফলে বন্ধ করে দেন। মোমের তাল থেকে হাতে এল কাগজ। জীবনের শেষ বড় ম্যুরাল অবশ্যই ছাত্রাবাসের সিলিং কী চীনা ভবনের সিড়ি কী হিন্দী ভবনের দেওয়াল-চিত্র নয় এ। অন্তর্দৃষ্টির এ এক আশ্চর্য নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। প্রথম জীবনে ছবি আঁকার সময়েও যেমন এ ম্যুরাল-এও তেমনি এসেছে সাধারণ মানুষ— চানাচুরওয়ালা, কাঁধে শাক নিয়ে যাচ্ছে লোক, মেয়ের মাথায় ঝুড়ি বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সব নিজের চোখে-দেখা সাধারণ মানুষ॥" (বিনোদদা)

রামানন্দের লেখাতে জানা যাচ্ছে প্রথম প্রথম ড্রইং করে দিতেন, ছাত্ররা কাগজ কেটে আকার আনত, পরে নিজেই ভাঁজ করে আকার আনতে পারলেন; পুরুলিয়া রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যাপিঠে সেরামিকস্ টাইল তৈরী হবে—জানালেন কাজে যেন কাগজের ভাঁজ থাকে। কিভাবে করতেন এসব বিনোদবিহারী? 'কত্তামশাই'-এ জানিয়ে গেছেন নিজেই।

নিয়তি। পুতুলগুলো তো বেশ করেছ। কত্তামশাই, চোখে কালো চশমা দিয়ে এসব কর কি ক'রে?

কত্তামশাই। আমার জগতে যে আলো আছে, সেই আলোতে এইসব আমি করতে পারি।

—তুমি তো দেখছি মহাপুরুষের মতো কথা বলছ। নিজের আলোর কথা তো মহাপুরুষরা বলে থাকেন।

না না, মহাপুরুষ আমি একেবারেই নই। খুব সামান্য আমার এই আলো। যতক্ষণ পুতুল করি, কাগজ মুড়ি, ততক্ষণ এই আলো থাকে। কাজ শেষ হলেই সব অন্ধকার হয়ে যায়। (রেখাচিহ্ন বর্তমান লেখকের)

'ড্রাগন' ঝাপিয়ে পড়ে কত্তামশাই-এর ওপর। বলে, খুলে দেও রূপরসের ভাণ্ডার, নিয়ে এস তোমার সকল সঞ্চয়।

ড্রাগন। ভিখারীর মত জীর্ণ বস্তু আঁকড়ে না রেখে নতুন রস, নতুন সৌন্দর্য নতুন পাত্রের সন্ধান করতে পার না!

কত্তামশাই। কোথায় আছে নতুন রস, সৌন্দর্য। কোথায় পাব নতুন পাত্র!

ড্রাগন। আমার যাবার সময় হ'ল। রইল তোমার শব্দের ভাণ্ডার।

এই শব্দভাণ্ডার নিয়ে বসেন বিনোদবিহারী। "বলতে দ্বিধা নেই যে চিত্রকর্ম করেই আমি জীবন কাটিয়েছি। সাহিত্যচর্চা শুরু করেছি অনেক পরে।" বলা বাহুল্য, এই শব্দের ভাণ্ডার প্রকৃত জ্ঞানেরও ভাণ্ডার—আশৈশব বই পড়েছেন বিনোদবিহারী—দৃষ্টিশক্তি কম এবং অভিভাবকের নিষেধ সত্ত্বেও। দৃষ্টিহীন অবস্থাতেও তাঁকে বই পড়ে শুনিয়েছেন বন্ধু কন্যা এবং অন্যান্যরা। কলাভবনের ছোট্ট গ্রন্থাগার রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যে সমৃদ্ধ হ'য়েছে। নন্দলালও সেখানে গিয়েছেন—সংগ্রহ করেছেন বই, প্রিন্ট। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বিশেষ করে চীন জাপান-এর বিভিন্ন যুগের চিত্রকলা এবং এই চিত্রকলা বুঝতে যে যে ধর্মদর্শন-এর বই দরকার তার বিস্ময়কর সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন গ্রন্থাগারিক বিনোদবিহারী। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে নন্দলাল লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষের বাছাই চারুকলা ও চিত্রকলার যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন তার আধুনিক শিল্পকলা উল্লেখ করেছেন বিনোদবিহারী—কিন্তু যা উল্লেখ করেননি তা হল এই প্রদর্শনীর ক্যাটালগের ভূমিকা লেখেন বিনোদবিহারী—সমগ্র ভারতের চারুকলা কারু-কলার বিশেষজ্ঞ যিনি সেই যুবা বয়সেই!

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী কম লেখা হয়নি, কিন্তু 'কত্তামশাই' এবং 'চিত্রকর' তুলনারহিত। তালিকাতেই স্পষ্ট হবে স্মৃতি কথা, আত্মকথা জাতীয় লেখা না লিখলেও চিত্রকলা সম্পর্কে তিনি অনেকদিন থেকেই লিখেছেন। এবার নতুন ক'রে শুরু হ'ল—নতুন রস, নতুন সৌন্দর্য। বলা বাহুল্য, নতুন পাত্রে লেখা হ'ল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অত্যন্ত দুর্বল একটি শাখায় নতুন সৃষ্টি, যার মূল্যায়ন একদিন হবেই। 'শিল্প জিজ্ঞাসা', 'মহাভারত ও ভারত শিল্প', 'পট ও পটুয়া'র মত লেখা। 'আধুনিক শিল্প-শিক্ষা'র মত গ্রন্থ। এর আগেই ইংরাজীতে ও বাংলায় অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বেঙ্গল স্কুল, শান্তিনিকেতনের শিল্পী, নন্দলাল সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লিখেছেন।

উল্লেখ করেছি পাঠক বিনোদবিহারীর— ইংরাজী বাংলা পড়তে শেখার পরই বই পেলেই পড়তে সুরু করেন। অভিভাবকেরা, বলা বাহুল্য, উল্টো সুরে গাইতেন—পড়তে বারণ করতেন। তবু ছেলেবয়স বই নিয়েই কেটেছে, 'লাইব্রেরীতে সাজানো বই দেখতে দেখতে নতুন করে বই পড়ার ইচ্ছা জাগল এবং বই পড়া শুরু করলাম নতুন উৎসাহে।' যে কোন পাঠক বিনোদবিহারীর লেখা পড়লে তাঁর পড়াশুনা এবং স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হবেন।

দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত কলাভবনের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হিসাবে শান্তিনিকেতনে বাস করেন। এই সময়ের মানুষ (এবং পাঠক, অবশ্যই এখন শ্রোতা) বিনোদবিহারী সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমরা জানতে পাই বন্ধু সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রুচিরা মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। বছর খানেক শিল্প সম্বন্ধীয় বই, তারপর সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কিত বই পড়ে শোনান তিনি। তিন দশকের শেষ চার দশকে উঁর কাছে চীনা সৌন্দর্য-শাস্ত্র পড়েছিলেন তার উল্লেখ আছে 'চিত্রকর' এ। কলা ভবনের গ্রন্থাগারেও এ সম্বন্ধে প্রচুর পড়েছেন। এই সময়েই ('৬৭) তাওইজমের কিছু বই রুশ সাহিত্য (শেখভ তার প্রিয়) পড়া হয়। ব্যঙ্গাত্মক রচনা সুকুমার পরশুরামের লেখা, তারাশংকরের, প্রেমেন্দ্র শৈলজানন্দ পড়া ছিল—নতুন লেখকদের লেখা গল্প শীর্ষেন্দু, বরেন, দীপেন্দ্রনাথ ইত্যাদি ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে পড়া হয় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের, কালীপ্রসন্নর মহাভারত, বন্ধু মুজতবার দেওয়া। মহাভারতের কাহিনী, সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেম কথা' তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। এ ছাড়া পড়া হয়

পুরাণ, বাৎস্যায়ন, জাতকের ছ'সাতটা খণ্ড। পাঠক বিনোদবিহারীর নানা বিষয় পড়ার, জানার ঝোঁক-এর কথা জানা যাবে এ রচনা থেকে।

এর পর বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে কিছুকাল দেরাদুন এবং আমৃত্যু দিল্লীতে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে বাস করেন। এসময়ের লেখার শ্রুতিলিখন নিতেন রমিতা ঘোষ। 'চিত্রকর' গ্রন্থে বিনোদবিহারীর বেশ কিছু স্কেচ্‌ও মুদ্রিত হয়েছে—এগুলি বেশীর ভাগই ১৯৭৭-এ আঁকা। প্রাকৃতিক দৃশ্য, গরুর গাড়ী, কুকুরের চেন-ধরা মানুষ, ক্রীড়ারত শিশু, একটি আত্ম-প্রতিকৃতিও। তালিকা থেকে এসময়ের লেখার কথা জানা যাবে। শেষ লেখা চীন জাপান ভ্রমণ কাহিনী। ১৯৮০, ১৯ শে নভেম্বর ৭৬-৭৭ বৎসর বয়সে বিনোদবিহারী দিল্লীতে পরলোক গমন করেন।

বিনোদবিহারীর চিত্রকলা বিষয়ে চীন জাপান-এর চিত্রকলা প্রসঙ্গ ও প্রভাব—প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অনেকেই উল্লেখ করেছেন; অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু এবং জাপানী চিত্রকলা সংক্ষেপে আলোচনা করে নিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গে আসব। বস্তুতঃ স্বয়ং বিনোদবিহারী অবনীন্দ্র-নন্দলাল ও জাপান প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা তাঁর নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য, পার্থক্য সত্ত্বেও।

"ভারত ও জাপান এই দুই সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে শিল্পী সমাজকে প্রথম সচেতন করেন ওকাকুরা কাকাজু। ওকাকুরার সংস্পর্শে এসে অবনীন্দ্রনাথ জাপানের আদর্শ অনুযায়ী রেখাঙ্কন চর্চা করেছিলেন। ক্রমে ইউকোহামা, টাইকান, হিসিডা, খাৎসুতা ইত্যাদি জাপানী শিল্পীদের গতায়াত শুরু হয়। এইসব শিল্পীদের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় সোসাইটির উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর পর (১৯০৮)।" (আধুনিক শিল্পশিক্ষা, বিনোদবিহারী)

সত্যজিৎ চৌধুরী অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁর ব্যক্তিগত বিকাশের সেই গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালে তিনি তাইকান-হিশিদার মাধ্যমে জাপানি চিত্রকলায় প্রাচ্য আধুনিকতার একটি নির্ভরযোগ্য আদর্শ পেলেন।"⋯ আধুনিক জাপানী শিল্পের করণকৌশল সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় এক নতুন উদ্দীপনা অনুভব করলেন, চিত্তের অবসাদ ও অসাড়তা কেটে গেল।

' অবনীন্দ্রর ওয়াশ পদ্ধতি হুবহু জাপানী ভেজা-কাগজ পদ্ধতি নয়, কিন্তু তাইকান-এর কাজ দেখেই তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিজস্ব ওয়াশ

পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। (অবনীন্দ্র-শিষ্য এবং বিশেষ করে তাঁদের সাক্ষাৎ শিষ্য অনেকেই অবনীন্দ্র "উচ্ছিষ্ট" ওয়াশ-এ অবনীন্দ্র-সিদ্ধির ধারে কাছেও পৌছোতে পারেন নি)। অবনীন্দ্রনাথ মোগল, য়ুরোপীয় রীতির সঙ্গে দু-এক খাবলা জাপানী রীতি মিশিয়ে ছবি করেছেন অর্থাৎ ওঁর ছবি আসলে ইসলামী চিত্রকলারই নতুন পর্যায় বা কিছু জাপানী কিছু রাজপুত কিছু মোগল উপাদান-এর খিচুড়ি এমন মূর্খ আধুনিক মন্তব্য তথা অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুল সম্বন্ধে উপেক্ষা তাচ্ছিল্য ভাব গত কয়েক দশক থেকেই সুরু হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সঠিক মূল্যায়ন হলো না কেন, এ প্রশ্নের জবাবে বিনোদবিহারী বলেছেন, "রুচি, আদর্শ, উদ্দেশ্য সবই বদলেছে। তাই মূল্যবোধ বিচারের ঔৎসুক্যও কমেছে। আর মূল্যবোধ করতে হলে ছবিগুলি দেখা দরকার। কিন্তু যাঁরা তাঁর ছবি দেখেননি তাঁরাই ছবির মূল্য বিচার করে থাকেন।" ওকাকুরা, জাপানী অন্যান্য শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর প্রভাব মনে রেখেও বিনোদবিহারীর অভিমত "by the dint of his wonderful talent he effected a fusion of western and oriental technique and evolved a new style in painting." নন্দলালও অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন, বিলিতি জল-রঙের কাজ পারসিক ছবি, চীন জাপানী চিত্রকলা, সব থেকেই তিনি কিছু না কিছু নিয়েছেন, তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার উত্তাপে মিলিয়ে গলিয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব মৌলিক। চীন জাপান ভ্রমণ এবং তার আগেই কম্পু আরাই-এর সঙ্গ নন্দলালের ছবিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিনোদবিহারী বলেছেন, "সুদূর প্রাচ্যের শিল্প-পরম্পরা থেকে তিনি আহরণ করেন তুলি চালনার কৌশল। অল্পকালের মধ্যে ভারতীয় শিল্প-পরম্পরা থেকে রেখাত্মক গুণ তিনি আয়ত্ত করেন। এবং চীন জাপান ও ভারতের রেখারীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পথ মুক্ত হয় নন্দলালের প্রতিভার শক্তিতে।" ১৯২৫ থেকেই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে তাঁর ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, এ সেই মাটির কাছে নেমে আসতে থাকা। জয়া আপ্পাসামী এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে প্রাচীন চিত্রকলার দুই ধারা Kung Pi এবং Hsieh Yi-এর উল্লেখ করে বলেছেন, "Nandalal Bose's 'touch painting' can be considered

an adaptation of the Hsieh Yi. Some of his landscapes or sketches done on porous Nepalese hand-made paper or on card come close to the effects of the Chinese." বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলায় সুদূর প্রাচ্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়েও জয়া আপ্পাসামী Hsieh Yi-প্রসঙ্গ তুলেছেন, "painting on porous or unsized papers in a sketchy wet style comparable to the Chinese Hsieh Yi." Nandalal Bose and the Far Eastern Tradition-এ Hsieh Yi প্রসঙ্গে বলেছেন, "In this medium it is necessary to paint very rapidly with a sure knowledge of the behaviour of the brush, paper and ink. There is an immense range of possibilities from very wet to very dry brush work and from very deep to very light tones."—যে কেউ ১৯৪২-৪৩-এ আঁকা বেনারস চিত্রমালার একটি ছবি দেখলেই এ প্রসঙ্গটি বুঝতে পারবেন—ধাপে ধাপে নেমে আসা সিঁড়ি, নদীর বাঁক, দূরে বাড়ী ঘর—নীচের এক কোন থেকে ক্রমাগত বাঁধা নৌকা, চলিষ্ণু নদীতে ভাসমান নৌকা এঁকেছেন বিনোদবিহারী—দ্রুত স্বতঃস্ফূর্ত এই জোরালো রেখা নিজের প্রতি আস্থা এবং তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচয়। অন্য ছবিতেও নৌকা, সিঁড়ি, মানুষ, ছাতা, ঝুপড়ি ঘর সার সার আকাশ প্রদীপ, দূরে ভাসমান নৌকায় কাগজ-কালি-তুলির ওপর অসামান্য আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। 'সূর্যমুখী ফুল', 'পদ্মফুল' ছবিতেও এই গুণের প্রকাশ। এ ছবিগুলি দেখলে চীনা সমালোচকের উক্তি মনে আসে, "Coloring in a true pictorial sense does not mean a mere application of variegated pigments. The natural aspect of an object can be beautifully conveyed by ink-colour, if one knows how to produce the required shades" (The Way of Chinese Painting—Mai mai-Sze)। এই প্রভাব সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। পরিতোষ সেন যথার্থ বলেছেন 'It is only a weak nation that fights shy of influences.' ভারতীয় ভাস্কর্যে চিত্রকলায় বিদেশী প্রভাব আছে। আবার ভারতীয় ভাস্কর্য চিত্রকলা চীন জাপান

এবং দ্বীপময় ভারতের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। পিকাসোর ছবিতে নিগ্রো প্রভাব, হেনরী মুর-এ মেক্সিকান প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তা যেমন পিকাসোর, হেনরী মূরেরই; বা জাপানী চিত্রকলার প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও রেমব্রান্ট, ভ্যান গগ-এর চিত্রকলাকে কেউ নিশ্চয়ই জাপানী ছবি বলবেন না তেমনি অবনীন্দ্রনাথেও কেউ এক খাবলা মোগল রাজপুত এক খাবলা জাপান আবিষ্কার করেন না। নিজস্ব ওয়াশ পদ্ধতি ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথের কৃষ্ণলীলা বা চণ্ডীমঙ্গলে লোকশিল্পের পটের স্পষ্ট প্রভাব এবং নন্দলালের হরিপুরা পোস্টার-এ লোকশিল্পজাত ক্যালিগ্রাফিক লাইন ও জৈনপটের উজ্জ্বল রঙের সাদৃশ্য সত্ত্বেও এ শতাব্দীর এই এক গুচ্ছ শ্রেষ্ঠ ফসলকে কেউ নিশ্চয়ই পট বলবেন না।

প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ ঝোঁক বা বাই কখনও বিভ্রান্তি আনতে পারে। Voice of Silence-এ বুদ্ধ ভাস্কর্য প্রসঙ্গে গ্রীক প্রভাব এত গুরুত্ব পেয়েছে যে পরবর্তী কালের ভারতীয় ভাস্কর্য আলোচনা তেমন গুরুত্ব পায়নি। আর্চার-এর 'বাজার পেইন্টিং অব ক্যালকাটা'তেও তেমনি—একাদশ দ্বাদশ শতকের পুঁথি-চিত্র, পরবর্তী কালের চিত্রিত পাটা, সরা, পট চালচিত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য মনে না রেখে; ভিনসেন্ট স্মিথও অজন্তায় গ্রেকো-রোমান ও পারস্য প্রভাব খুঁজে নিয়েছেন। বিনোদবিহারী নিজে বলেছেন…"absorb করার আমি চেষ্টা করেছি। কোনো influences নেই তা তুমি বলতে পারবে না।… আমার যে চোখ খারাপ ছিল—কোনো optical sensation-এর জিনিষ আমি কোনো জায়গা থেকে নিতে পারি নি, নিই নি।…ঐ যে সোতাৎসু তোবাশু—কিন্তু সমস্ত contour, formal, no colour,…যেখানে line যেখানে contour, form মানে tactile জিনিসটা আমি নিয়েছি।"

বিনোদবিহারীর জীবনী আলোচনায় 'চিত্রকর' থেকে উদ্ধৃতি তুলে আমরা দেখিয়েছি বিনোদবিহারী প্রথম থেকেই বেঙ্গল স্কুল তথা অবনীন্দ্র নন্দলাল শিষ্যদের সঙ্গে স্পষ্ট ফারাক অনুভব করেছিলেন ছবির বিষয়বস্তুর দিক থেকে। পৌরাণিক ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নয়, প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষ তাঁর ছবিতে প্রধান জায়গা নিয়েছে। তরুণ বয়সের আঁকা ছবিতেও বিহার সাঁওতাল পরগণার প্রকৃতি, খেটে-খাওয়া মানুষ এসেছে।

তিরিশের দশকে আঁকা সেতু, বৃক্ষ-প্রেমিক, বনভূমি (woodland) তে একাকীত্ববোধ, নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা ও সঙ্গহীন মুহূর্তের ছাপ আছে। 'চিত্রকর'-এ বিনোদবিহারী বলেছেন 'এ নির্জনতাই বোধহয় আমার দৃশ্যচিত্রের প্রধান বিষয়।' সেতু সম্পর্কে পৃথ্বীশ নিয়োগী বলেছেন—"A personal tragic sense of life is transferred to a familiar object." বৃক্ষ-প্রেমিক-এ জয়া আপ্পাসামী 'Melancholy mood' আবিষ্কার করেছেন। পৃথ্বীশ নিয়োগী এ ছবিগুলি সম্পর্কে বলেছেন "The organisation is compact, modelled forms are rigid and heavy, colours are deep and restrained and space is close with a tactile density."

জাপান ভ্রমণের পর (এবং সম্ভবতঃ ব্যক্তিজীবনে আনন্দের স্পর্শে) কেটে গেল এই melancholy mood. "The dark introspection of the earlier work is finally spent in an openness to the world"—তাই চল্লিশের দশকের সুরুতেই ছাত্রাবাসের সিলিং-এ রঙ রেখার অপরূপ নৃত্যচ্ছটায় হাজির হ'ল আলো-ঝলমলে নীল কাঁকুড়ে মাটি সমেত সবুজ গাছ-পালার ফাঁকে মানুষ, গৃহপালিত পশু, পুকুর নিয়ে গোটা বীরভূমের গ্রাম। চল্লিশের দশকেই আঁকা হয়েছে পদ্ম, স্থলপদ্ম কাশীর ঘাট সিরিজের ছবিগুলি এবং নেপাল সিরিজের কিছু ছবি। বিনোদবিহারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিলগ্ন চল্লিশের দশক। হিন্দী ভবনের ম্যুরালও এই দশকে।

বীরভূমের প্রাকৃতিক দৃশ্য তা রেশমে আঁকা টেম্পেরা মাধ্যমেই হোক বা এচিং কী ড্রাই পয়েন্টই হোক—প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্রে বিনোদবিহারীর নিজস্ব অঙ্কনরীতি সহজেই চোখে পড়ে।

এক সাক্ষাৎকারে চিন্তামনি কর দুই শ্রেণীর শিল্পীর কথা বলেছেন, এ্যাপোলোনীয়ান এবং দিয়োনোসিয়াক ; দৃষ্টান্ত দিয়েছেন নীরদ মজুমদার এবং রামকিংকরের অধিকাংশ কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আবেগ তাড়িত হয়ে করা হ'লেও কোন কোন ভাস্কর্যের আগে অসংখ্য স্কেচ (সোমেন অধিকারী-সংগ্রহ) এবং প্লাস্টার করেছেন—রীতিমত চিন্তা ভাবনা করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর শত শত জলরঙ মাধ্যম-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং বেশ কিছু ভাস্কর্য দিয়োনোসিয়াক শিল্পীরই দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে বিনোদবিহারী রামকিংকরের পার্থক্য সুস্পষ্ট—"আবার

যখন ঘরে বসে ছবি করছেন একটি ছবির আয়োজন চলছে বেশ কিছুদিন ধরে—ছবির নানা অংশ নানা বক্তব্য নিয়ে মনের গভীরে ডুব দেওয়া, কাগজে তুলিতে রঙে প্রস্তুতি। তারপর যখন আসল ছবিটি শুরু করলেন কোনও দ্বিধা নেই কোথাও। প্রতিটি রেখা প্রতিটি তুলির টান সব মনের পটে আঁকা হয়ে আছে। সমস্ত ছবিটির বাঁধুনি নিবিড় নিটোল। ছবির প্রস্তুতি বিনোদবিহারীকে দেখেছি বহু অ্যাবস্ট্রাক্ট খসড়া করে মানসপটের প্রতিটি রঙ রেখার ছন্দোবদ্ধ সংস্থাপনার শ্রেষ্ঠ অবস্থানটি বুঝে নিতে। তারপর ছবিটি আঁকবার সময় সেই সব অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ ও রঙের খেলার স্থান নিয়েছে আমাদের চেনা শোনা মানুষ।"

বিনোদবিহারীর এজাতীয় খসড়া কিছু দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে; বিনোদবিহারীর ছবি সম্পর্কে প্রায় সব সমালোচক যে গুণগুলির কথা বলেন—স্বল্প রঙ ব্যবহার, নিখুঁত জোরালো রেখাঙ্কন, আঁটসাঁট বাঁধুনি,—এই ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষায় তা সম্ভব হয়েছে।

জয়া আপ্পাসামী যে The Santiniketan attitude towards exploration of meterials and adaptablity-র উল্লেখ করেছেন তার প্রমাণ ধরা আছে শান্তিনিকেতনের নানা ফ্রেস্কোতে (এবং ছাপাই ছবিতে)। নন্দলাল বসু তাঁর শিল্পচর্চা গ্রন্থে ২০ পৃষ্ঠা ধরে ফ্রেস্কো এবং তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অজন্তা এবং বাঘগুহা চিত্রের অনুলিপি এবং প্রতিমা দেবীর শিখে-আসা পদ্ধতি, তাঁর গুরুর লেখা The Art of Fresco-Painting অধ্যয়ন, মেক্সিকান ক্রাইমান-এর সঙ্গে আলোচনা নন্দলালকে দেওয়াল চিত্র নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রেরণা যোগায়। এ বিষয়ে নন্দলালের অন্যতম সহযোগী ছিলেন বিনোদবিহারী। এবং ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মন ও বিনায়ক মাসোজী। ১৯২৪-এ গ্রীষ্মাবকাশে নন্দলাল গ্রন্থাগারের ভিতরের ঘরের (দেওয়ালে বলা বাহুল্য, গৌর প্রাঙ্গণের সামনে পুরোনো গ্রন্থাগার) ভাতের মাড়-এ রঙ মিশিয়ে অজন্তার অনুসরণে দেওয়াল-চিত্র আঁকেন। পুরোনো গ্রন্থাগারের দোতলায় (তখন কলাভবন ঐ দোতলায়) দরদালানে ও একতলার দরদালানে জয়পুরী পদ্ধতিতে দেওয়াল-চিত্র আঁকেন—নরসিংলালের তত্ত্বাবধানে আস্তর তৈরী হয়,—নন্দলাল আর শিষ্যরা হাতে কলমে কাজ শিখেছেন, যোগাড়ের কাজ

করেছেন।" নন্দলালের শ্রেষ্ঠ কাজ চীনা ভবনের 'নটীর পূজা।' (শ্রীনিকেতনের 'হলকর্ষণ'-এর সংস্কারের আগের ফটোতেও তাঁর শক্তির স্বাক্ষর বর্তমান)।

"বিশ্বভারতীর নূতন পরিকল্পনার দাবিতে বহু ছাত্রাবাস নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং অনেক ছবি চূনের আস্তরের তলায় ঢাকা পড়েছে। ফটোগ্রাফ নেবার কথাও সে সময় মনে হয়নি"—বিনোদবিহারী লিখেছেন। বহু বাড়ি আজ নিশ্চিহ্ন। দ্বারিক, আদি কুটির, শমীন্দ্র কুটির, লোহিত কুটির, গৈরিক, পিয়ার্সন হাসপাতাল ইত্যাদিতে ফ্রেস্কো ছিল। তখনকার ছাত্রাবাস (সন্তোষালয়)-এ পরবর্তী পর্যায়ের কিছু কাজ এখনও অবশিষ্ট। ফ্রেস্কোর পাশাপাশি যেসব রিলিফের কাজ হয়েছিল তার মধ্যে কালো বাড়ি এখনও টিঁকে আছে। [এ বাড়িটি এবং কলাভবন-এর দুটি ছাত্রাবাস—দেওয়াল-চিত্র রক্ষার জন্য এখনই তৎপর হওয়া দরকার। এমনিতেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। বিনোদবিহারীর উল্লেখযোগ্য ফ্রেস্কো আজ ধ্বংসের মুখে—'জমি'র দোষ-এর চাইতেও বড় কথা হ'ল ছাদের জল-চোয়ানো। [মাননীয় উপাচার্য মহাশয় বিশেষজ্ঞের সহায়তার জন্য তৎপর হ'লে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব] কলাভবনের ছাত্ররা অনেকেই তাদের হোস্টেল সিলিং-এর ছবিটি প্রথম দেখার বিস্ময় আনন্দের কথা বলেছেন (সত্যজিৎ রায়, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়)। স্টেলা ক্রামরিশ এটিকে দেখে বলেছিলেন "এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ ট্রীজ", এ যেন একণ বাশোলী চিত্রকলার পশ্চাৎপটের গাছ একসঙ্গে—পুকুরে হাঁস, মোষ, ধোপা, ধোপার গাধা, গরু, কুকুর, জেলে, চাষী, ছিপ হাতে, জাল-কাঁধে মানুষ, পুকুরে মাছ-ধরা, বাসন মাজার-চারপাশে গাছ আর গাছ—লাল জমির ওপর সবুজের অপূর্ব সমারোহ।

পৃথ্বীশ নিয়োগী বলেছেন, "Calligraphic lines waxing and waning, execute an intricate dance on the archipelago of colours." চীনা ভবনের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির শেষে ঢাকা দেওয়ালে বিনোদবিহারীর আর একটি দেওয়াল-চিত্র আছে (১৯৪২)। চীনা ভবনের পাঠকক্ষ, আশ্রম এলাকা, শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবন, ছাত্র শিক্ষক, কলাভবনের দৃশ্য এতে আঁকা হয়েছে জাপানী স্ক্রীন চিত্রধারা আদলে—কৌতুক স্নিগ্ধ মেজাজে সরাসরি টেম্পারায়—"থেতলানো খেজুর ডাটি ও পরে মোটা শক্ত তুলিতে।" আর একটি কারণেও এ কাজটি উল্লেখযোগ্য—পরে তা আলোচনা করছি। শান্তিনিকেতনের

ছাত্রছাত্রী, কলাভবন, হোস্টেল দেওয়ালেও এঁকেছিলেন ইতালীয় ভেজা-পদ্ধতিতে—দুটি ছবির অঙ্কনরীতির মূড্ ভিন্ন। এটিও ধ্বংসের মুখে। হিন্দী ভবনের ম্যুরাল নানা দিক থেকেই হিন্দী ভবনের উল্লেখযোগ্য দেওয়াল। প্রধানতঃ হিন্দীভাষী এলাকায় মধ্য যুগের যে সব সন্ত সাধক জনজীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং আজও ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ যাঁদের অনেকের রচিত দোঁহাকে পরম আদরের জিনিস মনে করেন—তাঁদেরকে আঁকা হয়েছে এই ম্যুরাল-এ, যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী, সুরদাস, কবীর, রবিদাস, গুরুগোবিন্দ সিংহ।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এইসব সাধক কবির দোঁহাপদ আস্বাদন করতেন এবং ক্ষিতি-মোহন সেনশাস্ত্রী এদের দোঁহাপদ সন্ধানে আখড়ায় আখড়ায় বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। উত্তর ভারতের জনজীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন বিনোদ-বিহারী—জনজীবনে এদের প্রভাব কতটুকু সে সম্বন্ধেও তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। তিনটি দেওয়াল জুড়ে ইতালীয় ভেজা-পদ্ধতিতে চর্বার সাহায্য না নিয়ে সোজাসুজি করা। মূল বিষয় অর্থাৎ সাধু সন্তদের ওপর বিশেষ জোর দিলেও চলিষ্ণু নদী, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার টুকরো ছবি এবং কুটির প্রাসাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দীর ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড সত্তা নিয়ে উপস্থিত। ভারতীয়দের কাছে যেমন ধর্ম আরোপিত কিছু নয়, ধর্মীয় গুরু সহজিয়া সাধক—তাই দেবোপম মানুষ হয়েও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যোগাযোগ এ ছবিতে দেখানো হয়েছে। ঋজু টানটান পৌরুষদৃপ্ত দেবোপম মানুষ—ঐশ্বর্য মহিমায় স্নিগ্ধতায় জনজীবনের কাছের মানুষ এ দেওয়াল-চিত্রে। সঙ্গত কারণেই বিশেষজ্ঞগণ এ ছবির গঠন আঙ্গিক প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা ও গুহামন্দিরের ভাস্কর্যের কথা বলেছেন। এটি ১৯৪৭-এ আঁকা।

এরপর বিনোদবিহারী ম্যুরাল করেন নেপালে-এ প্রবাস জীবনের পর বনস্থলী বিদ্যাপীঠে রাজস্থানে, বিষয়বস্তু নেপালের দৃশ্য চিত্র সাধারণ মানুষ। শান্তিনিকেতনে অন্ধ অবস্থায় আর একটি ম্যুরাল করেন—কলাভবনের বাইরের দেওয়ালে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সহযোগিতায়—সেরামিকস্ টালিতে। 'ইনার আই' তথ্য চিত্রে ও রামানন্দের 'বিনোদদা' প্রবন্ধে এটি সম্পর্কে নানা তথ্য আছে। এখানেও সাধারণ মানুষ, বাঁক-কাধে, ডালা-কাঁধে মানুষ।

বাংলা পুঁথির হরফ সম্বন্ধে কমলকুমার মজুমদার লিখেছেন, "মহাপ্রভু চমৎকার হস্তাক্ষরের খুব কাঙাল ছিলেন"—উদাহরণ হিসাবে চৈতন্য চরিতামৃত থেকে "অক্ষর দেখিয়া প্রভুর মনে সুখ হৈল" উদ্ধৃত করেছেন। "ঠাকুর রামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর ভারী সুন্দর ছিল। ছবির মত করিয়া লেখা বাঙালী লিপিকরদের খুব যত্ন ছিল, লেখার সেই মন ইদানীং আর থাকার কথা নহে। এই ভাবনার শেষ হইয়াছে সেই বিরাট বাঙালী রবি ঠাকুরের মধ্যে, পাঠক, আমরা এহেন মানুষকে লিখিতে দেখিয়াছি। তদীয় টান ছাঁদ দারুণ চাতুর্য মণ্ডিত লেখা দেখিবার !··· তেমনই কয়েকটি টানের তারতম্যে বাঙলা অক্ষরকে আরবী চেহারা দেওয়া যায়—যেমন অবনীবাবু করিতেন।" কিন্তু তবু চীন জাপান এবং পারস্যের মত লেখাঙ্কন বা ক্যালিগ্রাফির চর্চা আমাদের হয়নি। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর এক সময় সব শিক্ষিত বাঙালীর হস্তাক্ষরে পরিণত হয়েছিল। বিচিত্র পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির বিচিত্র নক্সা অথবা ছবি ও বাংলা ইংরাজী হরফে কবিতা অনেকের কাছেই পরিচিত। তবু বিচিত্র ছাঁদের লেখা কিছু চোখে পড়লেও (মহুয়ার নাম-পত্র) বাংলা হরফ তথা ক্যালিগ্রাফি নিয়ে চর্চা তিনি করেননি। ['চিত্ত যেথা ভয় শূন্য'; 'আলো তার পদচিহ্ন'; 'অবসান হোলো রাতি'—হরফ এর ছাঁদ কিন্তু একই]। ধর্মীয় কারণেই মোগল চিত্রিত পুঁথি এবং পুঁথিতে ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক চর্চা। তিব্বতী নেপালী চিত্রিত পুঁথি পাল যুগের চিত্রিত পুঁথি জৈন চিত্রিত পুঁথিতে ছবির সঙ্গে হরফের সুন্দর ছাঁদ সবারই ভাল লাগে। পূর্ব ভারতের উড়িষ্যা, আসামে বঙ্গভূমিতেও বিগত চার পাঁচ শতাব্দীর কিছু চিত্রিত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। হরফের ছাঁদ প্রদেশে প্রচলিত লিপিকরদের সুন্দর, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা-শূন্য ছাঁদ; গত কয়েক শতাব্দীর রাগমালা চিত্রেও ছবির সঙ্গে কবিতা, রাগবর্ণনা দেখা যাবে—হরফ দিয়ে নানা ছাঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু এতেও চোখে পড়বে না। মোগল রাজপুত কাংড়া বা ওড়িয়া পুঁথি-চিত্র দেখেই সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদের সঙ্গে ছবি আঁকেন। ১৮৯৫-এর গোবিন্দ দাসের অভিসার পর্যায়ের পদ সমেত অবনীন্দ্রনাথ যে ছবিটি আঁকেন ক্যালিগ্রাফির দিক থেকে তা উল্লেখযোগ্য। বাংলা হরফ নিয়ে তুলিতে রীতি-মত পরীক্ষা নিরীক্ষা অবনীন্দ্রনাথই করেছেন। পরবর্তীকালে পারস্য মোগল চিত্র-কলার অনুসরণে ফারসী ছাঁদে বাংলা হরফ তাঁর বহু ছবিতেই দেখি (বিশেষ

করে নাম স্বাক্ষরেও)। কৃষ্ণলীলা, প্রধানত চণ্ডীমঙ্গল চিত্রে ছবির সঙ্গে উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নন্দলাল তার কার্ড-স্কেচে চিঠিও লিখেছেন,—স্কেচের পাশে হরফ নিয়ে নানা পরীক্ষা তিনি না করলেও লাইব্রেরীর দোতলায় ফ্রেস্কোর সঙ্গে লেখার জন্য ফরমাস দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে দুপঙক্তি দুপঙক্তি কবিতা লিখিয়েছেন। 'শিল্প চর্চা' গ্রন্থে রেখা অধ্যায়ে প্রায় চার পৃষ্ঠা ক্যালিগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলা হরফ নিয়ে নানা ধাঁচের পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি করেননি। নন্দলাল লিখেছেন, "অক্ষর লেখার বিশেষ কৌশল বহুদিন ধরে বহু আয়াস করে শিখতে হয়"—তুলি কালিতে নিছক কথা লেখা, "ছবির মত করিয়া লেখা" বিনোদবিহারীই করলেন। সুদূর প্রাচ্য চিত্রকলায় ক্যালিগ্রাফি প্রীতি এবং প্রভাব হয়ত এর মূলে। অবনীন্দ্রনাথের মত ফারসী ছাঁদেও বিনোদবিহারী লিখেছেন—"আমি একলা চলেছি ভবে আমার পথের সন্ধান কে কবে।"

চীনা ভবনের দেওয়াল-চিত্র প্রসঙ্গে আমরা বলেছি; আর এক কারণে এই দেওয়াল-চিত্র উল্লেখযোগ্য—তা হ'ল চীনা, ইংরাজী বাংলা হরফ, মনীষীর বাণী, কবিতা, এই দেওয়াল-চিত্রের সঙ্গে আছে। হরফ-কৌতূহলী বিনোদবিহারী, রবীন্দ্র-যুগের মানুষ বিনোদবিহারী কালি তুলিতে নানা ছাঁদে রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান লিখেছেন। 'লিখন তোমার' 'বীণা বাজাও হে মম', 'তুমি জটাভার', 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' ইত্যাদি কবিতা গান লিখেছেন। "জয় তব বিচিত্র আনন্দ"—ক্যালিগ্রাফটি বিনোদবিহারীর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর।

আঁদ্রে কারপেলে তেল-মাধ্যম-এ ছবি আঁকা শিক্ষা দেন। বলা বাহুল্য তেল-মাধ্যম নন্দলালের বিশেষ পছন্দ ছিল না। বিনোদবিহারী তেল-মাধ্যমে-এ কম ছবিই করেছেন—জয়া আপ্পাসামী বলেছেন—He is also one of the first Bengal School painters to start work in oils, though in oil painting he often uses pallate reminiscent of tempara." '২০ এর দশকেও তেল-মাধ্যম-এ বিনোদবিহারী ছবি করেছেন। রামকিংকর করেছেন। পাটনায় পঞ্চাশ-এর দশকের মাঝামাঝি দৃষ্টিশক্তির আরও অবনতি ঘটায় "তুলির লাইন কাগজে ঠিক জায়গায় পড়ে না, লাইন অস্পষ্ট হয়, তাই তেল রঙের ছবি শুরু" করেন। এই পর্বের একটি ছবি ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন

আর্ট এ আসে। (প্লে— তীর ছোঁড়া) কলকাতায় আকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর সংগ্রহে দুটি তেল-মাধ্যম-এর ছবি আছে—একটি বিখ্যাত শাল-বিক্রেতা ছবি।

কলাভবন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উপাদান ও প্রকরণ নিয়ে নিয়ত অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। বলা বাহুল্য, নন্দলাল বসুরও এতে সমান আগ্রহ ছিল। ছাত্র রমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিনোদবিহারী লিখেছেন, 'রমেন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন আর হকুসাই-এর ছবি দেখেন'—রমেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে উড্এনগ্রেভিং ও উডকাটেই প্রধানত ছবি করেন। পিয়ার্সন-এর সংগ্রহে কিছু ছাপাই ছবি দেখে আগ্রহী নন্দলাল এবং কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা সৌভাগ্যক্রমে পেলেন আঁদ্রে কারপেলেকে। তিনি কাঠখোদাই এনগ্রেভিং-এর কাজে দক্ষ।' নন্দলালও ছাপাই ছবি করেছেন—কাঠখোদাই, লিনোকাট, লিথোতে (অর্জুন, পাইনগাছ, মন্দিরা নৃত্য, গোয়াল পাড়ার পথে ইত্যাদি; এছাড়া উল্লেখযোগ্য 'সহজ পাঠ'-এর ছবি)। বিনোদবিহারীর ছাপাই ছবি উডকাট, লিনোকাট, ছাপাই ছবিতেও এসেছে প্রাকৃতিক দৃশ্য, দৈনন্দিন জীবন এবং জীবজন্তু; যেমন কুকুর, শূয়র, ছাগল, চালতাফুল, চাঁদনীরাত, ফুল-হাতে মানুষ ইত্যাদি। তাঁর সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন, "His austere and wellknit woodcuts, whose dimension is rarely large, make him perhaps the finest all-round graphic artist in our country. His prints are intensely felt and executed by methods all his own"। সাম্প্রতিক কালে ছাপাই ছবির বান ডেকেছে—পরিতোষ সেন (যিনি নিজেও ছাপাই ছবি করেন) লিখেছেন—"দুর্ভাগ্যবশত গ্রাফিক আর্টে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টেকনিকের দৌরাত্ম্য চলছে"; 'ভেল্কিবাজি' দেখানোর প্রবণতাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বিনোদবিহারীর এচিং, ড্রাই পয়েন্ট ছবিতে বীরভূমের প্রাকৃতিক দৃশ্যই প্রধান স্থান নিয়েছে। সিল্ক বা কাগজে-আঁকা টেম্পারা জলরঙ-এর বিখ্যাত প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে এগুলিও স্মরণযোগ্য (শ্রীসোমেন অধিকারী সংগ্রহের এচিং ড্রাই পয়েন্ট মনে রেখে)। ১৯৫২-য় মুসৌরীতে আঁকা 'টেম্পল বেল' (টেম্পারা মাধ্যম)-এর পাশে রঙিন লিথো 'টেম্পল বেল' রাখলেই ছাপাই ছবিতেও তাঁর দক্ষতা সহজেই চোখে পড়বে। সমসাময়িকদের তুলনায়

তার এচিং "More spontaneous, freer, bolder, and more original." অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়াম বলেছেন, "he was probably the only artist of his time in India barring Nandalal Bose, who handled these graphic media with originality and distinction".

"তাঁর আনন্দের চিহ্ন রয়ে গেছে মোমের পুতুলে," "মোমের তাল টিপে দিন তাঁর যেমন কাটছিল তেমনই কাটতে লাগল"—স্মৃথে এই মোম ভাস্কর্য এবং কাগজ-কাটা কোলাজ ("আবার আর একখানা কাগজ টেনে নেন") অন্ধত্ব না মেনে বিনোদবিহারীর অনুপম শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন। এক সময়ে 'দেশ'-এর প্রচ্ছদে বেশ কিছু রঙীন কাগজ-কাটা কোলাজ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে পরিতোষ সেন লিখেছেন "আমাদের দেশে যাঁরা কোলাজ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম। তাঁর রচিত আয়তনে ছোট হলেও বেশ কিছু খাশা কোলাজ চিত্র শান্তিনিকেতনে আছে।"

শান্তিনিকেতনে বাটিকের চল শুরু করলেন প্রতিমা দেবীর আগ্রহে নন্দলাল বসু। বিনোদবিহারীর সিল্ক থানে করা বাটিকের চাদর কারুর কারুর সংগ্রহে আছে॥

পাঠপঞ্জি

চিত্রকর : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক শিল্পশিক্ষা : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

Binode Behari Mukherjee : Lalit Kala Akademi.

Abanindranath Tagore and the Art of his Times—Jaya Appasamy.

Moving Focus : K. G. Subramanyan.

The Way of Chinese Painting—Mai-mai sze.

অবনীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব– সত্যজিৎ চৌধুরী।

আমি যাদের দেখেছি—পরিমল গোস্বামী।

মুজতবা রচনাবলী—দশম খণ্ড।

বিনোদ দা—সত্যজিৎ রায় ('দেশ' বিনোদন '৭৮ / বিষয় চলচ্চিত্র)
কথায় কথায়—সত্যজিৎ রায়
বিনোদবিহারী ; সত্যজিৎ রায়, এক্ষণ, শীতবসন্ত '৮১
ভারতীয় শিল্পশিক্ষায় কলাভবন—ধীরেন্দ্র কৃষ্ণদেববর্মন ('দেশ', বিনোদন '৮৩)
শান্তিনিকেতনের ফ্রেস্কো—সুখময় মিত্র (সারস্বত প্রকাশ)—১৩৭৫)
বিশ্বভারতী পত্রিকা—নন্দলাল বসু সংখ্যা (১৩৭৩)
The Visva-Bharati Quarterly : Abanindranath Number—1942 (May-Oct) ; —Nandalal Number 1968-69
What is Indian in Indian Art—Paritosh Sen (Sunday)
কোলাজ—পরিতোষ সেন ('এক্ষণ', '৮৬)
গ্রাফিক্স—পরিতোষ সেন ('এক্ষণ', '৮৭)
Binode Behari Mukherjee—Prithvish Neogy (L. K. Series of Contemporary Indian Art,)
Graphic Art of the Bengal School—Jagadish Mittal (Lalit Kala Contemporary No. 1, '62)
ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা—কমলকুমার মজুমদার ('দেশ', আগস্ট, '৭৮)
শিল্পী বিনোদবিহারী—প্রভাস সেন ('দেশ', ডিসেম্বর '৮০)
বিনোদ দা—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ('দেশ', ডিসেম্বর '৮০)
অন্তর্ভুবনের বিনোদবিহারী—রুচিরা মুখোপাধ্যায় ('পরিচয়', ডিসেম্বর '৮০)
রচনাপঞ্জি সংকলন—কাঞ্চন চক্রবর্তী
সংক্ষিপ্ত চিত্রপঞ্জি—দিনকর কৌশিক ('এক্ষণ')
চিন্তামনি করের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—'সাতকাল' । জুলাই '৮১

শ্রীসোমেন অধিকারী, অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুখময় মিত্র (শান্তিনিকেতন)—এঁদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।

বিশেষ উল্লেখ

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনাপঞ্জি আমরা তৈরী করেছিলাম। কলাভবনের অধ্যাপক কাঞ্চন চক্রবর্তী একটি রচনাপঞ্জি তৈরী করেছেন এবং

তা 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এর বিশেষ বিনোদবিহারী সংখ্যায় থাকবে—শান্তিনিকেতনে আমরা জেনেছিলাম। 'এক্ষণে' অধ্যাপক কাঞ্চন চক্রবর্তীর একটি রচনাপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে, সেই তালিকাতে উল্লেখ নেই এমন কয়েকটি রচনার হদিস দেওয়া গেল :

১. বিনোদবিহারীর প্রথম প্রকাশিত লেখা সম্ভবতঃ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ভারত শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধ। ২. আনন্দবাজার পত্রিকা কংগ্রেস সংখ্যা ১৯৪৮, প্রবন্ধের নাম 'জাতীয় চিত্রকলার নূতন উন্মেষ' (পৃঃ ২৬৭-২৭৬)। ৩. 'উত্তরসূরী' রবীন্দ্র-শতবর্ষ সংখ্যায় বিনোদবিহারীর প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' (পৃঃ ২২৮-২৩০)। ৪. শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের ছবির অ্যালবাম Protima-তে বিনোদবিহারীর ভূমিকা আছে। ৫. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারত কোষ'-এ প্রথম খণ্ড—অবনীন্দ্রনাথ (৮০-৮২ পৃঃ) অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (৬৯ পৃঃ) তৃতীয় খণ্ড—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৫৩-৫৪ পৃঃ) ৬. 'অন্যমন' রামকিংকর সংখ্যায় বিনোদবিহারীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। ৭. গাঙ্গেয়পত্র (সংকলন ৭) পত্রিকায় কয়েকটি প্রশ্নের খুবই সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রকাশিত হয়। (সম্পাদকের প্রশ্নে এবং দেওয়া তথ্যে অবশ্য ভুল আছে)। ৮. Moving Focus-এর মুখবন্ধ কয়েক পঙক্তি মাত্র। ৯. Abanindranath (কলাভবন) থেকে বিশ্বভারতী পত্রিকা: অবনীন্দ্র সংখ্যায় 'অবনীন্দ্রনাথের ছবি' প্রকাশিত হয়। এটির পরিমার্জিত, পরিবর্দ্ধিত রূপ ১৩৮৪-র বৈশাখ-আষাঢ় বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১০. অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিতব্য রবীন্দ্র-চিত্রকলা বিষয়ক গ্রন্থের মুখবন্ধ বিনোদবিহারীর।

সন-তারিখ

বিনোদবিহারী লিখেছেন, "সচরাচর আমি সন-তারিখ ভুলে যাই"—তাঁর এই স্বীকারোক্তি মনে রেখে সন তারিখ নিয়ে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরছি—বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি জট ছাড়াতে পারবেন এবং সংশোধিত হ'তে পারে ভেবে।

সত্যজিৎ রায়কে বিনোদবিহারী তাঁর জন্ম সাল বলেছেন ১৯০৩ (বিনোদদা—দেশ / বিষয় চলচ্চিত্র)। ললিতকলার 'বিনোদবিহারী মুখার্জী' পুস্তিকায়

১৯০৪। জয়া আপ্পাসামী, প্রভাস সেন এবং দি স্টেটসম্যান এর Obituary ১৯০৪ বলা হয়েছে ; এক্ষণ—১৯০৪ ৭ই ফেব্রুয়ারী। সচরাচর সন তারিখ ভুল করলেও বিনোদবিহারী চিত্রকরে লিখেছেন "১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে" তিনি দিল্লি রওনা হন। তারপর অপারেশন এর পর তিনি অন্ধ হয়ে যান। ললিতকলার পুস্তিকায় সাল বলা হয়েছে ১৯৫৬—"after a major operation in 1956 the artist lost his sight completely." প্রভাস সেন ১৯৫৭ বললেও স্টেটসম্যান এর Obituary-তে ১৯৫৬ বলা হয়েছে। জাপান ভ্রমণ সম্পর্কে বিনোদবিহারী লিখেছেন, "আমি ১৯৩৮ সালে কয়েক মাসের জন্য জাপান গিয়েছিলাম"। ললিতকলার পুস্তিকায় "He visited Japan in 1937-38"—এবং "Picture Dealer's Shop" সাল ১৯৩৭। বিনোদবিহারী কি '৩৭ সালে জাপান গিয়েছিলেন ? বিনোদবিহারী নেপাল গিয়েছিলেন কোন সালে ? 'কথায় কথায়'-এ বিনোদবিহারী বলেছেন কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলেন ১৯৪৯, ছিলেন প্রায় তিন বছর ; "52-র winter vacation, সেই সময় চলে এলাম"—। যাওয়ার পর দশহরার ছুটীর কথা আছে চিত্রকর-এ, অক্টোবর মাস ধরতে পারি—দুর্গাপূজার সময় ; ফেরা ৫২-র winter vacation হ'লে তিন বছর তিনি নেপালে ছিলেন। ললিতকলার পুস্তিকায় "In 1951-52 he worked at the Vanasthali Vidyapith in Rajasthan" এটিকে বাতিল করতে হয় তাহ'লে। নেপাল থেকে ফিরে "আমার স্ত্রী ও আমাদের নবজাত কন্যাকে নিয়ে প্রথম গেলাম রাজস্থানের বনস্থলী বিদ্যাপীঠে, বনস্থলী বিদ্যাপীঠের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের" (চিত্রকর) বনস্থলীর ম্যুরাল কী নেপাল থেকে ফিরে আঁকা ? বনস্থলী থেকে মুসৌরীতে যান। ললিত কলার পুস্তিকায় আছে "In 1952 he settled in Mussoorie." '62-র winter vacation'-এ নেপাল থেকে ফিরে,—বনস্থলী থেকে, '৫২তেই তিনি মুসৌরীতে যান ? সংক্ষিপ্ত চিত্রপঞ্জিতে (এক্ষণ) দিনকর কৌশিক লিখেছেন, "বনস্থলী বিদ্যাপীঠ, রাজস্থান কয়েকটি বড় মিউরাল (১৯৫০-৫১)"—বিনোদবিহারী কী শীতকালে কাঠমাণ্ডু থেকে বনস্থলীতে ৫০, ৫১ সাল কাটিয়েছেন— তখন তিনি যুদ্ধযন্ত্রণালার কিউরেটর ; না কি ৫২-র শীতে স্ত্রীকন্যা নিয়ে বনস্থলীতে থাকার সময় এই ম্যুরালগুলি আঁকেন ?

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন; বাঘগুহায় যেয়ে নন্দলাল, অসিত হালদার, সুরেন কর যে চিঠি লিখতেন তাতে উৎসাহিত হয়ে তিনি ও বিনোদবিহারী সন্তোষালয়ে রং, ভাতের মাড় দিয়ে দু'টি ছবি আঁকেন। 'আধুনিক শিল্প-শিক্ষায়' বিনোদ-বিহারী লিখেছেন ১৯২২-২৩ সালে কলাভবনের অধ্যাপকবৃন্দ বাঘগুহা অনুলেখনের জন্য গোয়ালিয়র যাত্রা করেন। এটি ১৯২১ হ'বে। পঞ্চানন মণ্ডল, কানাই সামন্ত, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ ১৯২১ লিখেছেন। জয়া আপ্পাসামীর গ্রন্থে সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদে ১৯২১ হয়েছে ১৯২৪ (পৃঃ ১১৯)। 'আধুনিক শিল্পশিক্ষার' আর দুটি সাল সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ১৯২৩ হবে—".৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী রূপে নন্দলাল চীন জাপান ভ্রমণ করেন" ৬১ পৃঃ) —জয়া আপ্পাসামী, পঞ্চানন মণ্ডল, কানাই সামন্ত, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯২৪-ই লিখেছেন পুরোনো লাইব্রেরীর দেতলা এবং পরে একতলার দেওয়াল চিত্র আঁকবার আগে অর্থাৎ নরসিংলাল আসবার আগেই নন্দলাল দেওয়াল-চিত্র এঁকেছিলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে—দুই আগ্রহী শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, মাসোজী তখন ভ্রমণে। "১৯২৪ সালে গরমের ছুটিতে কলাভবনের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক বদ্রিকাশ্রমে যাত্রা করেন। এই ছুটিতেই নন্দলাল প্রথম ভিত্তি-চিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা অনুযায়ী চিত্ররচনা করেন"—(আধুনিক শিল্পশিক্ষা)—অন্যতম সহযোগী বিনোদবিহারী। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন, ১৯২৩ সালে এপ্রিল মাসে তাঁরা বদ্রিকাশ্রমে যান—('দেশ' বিনোদন—পৃঃ ৪০)।

দশকওয়ারী হিসাব

বিনোদবিহারীর জন্ম কলকাতায়—বেহালাতে মাতুলালয়ে, 'এক্ষণ' সম্পাদক ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ লিখেছেন। "তেরো বছর বয়স অবধি আমি কলকাতাতেই ছিলাম। 'নর্থ ক্যালকাটা"– কিছুদিন গোদাগাড়ি এবং পাকশীতে থেকেছেন—১৯১৭ তে শান্তিনিকেতন ; ১৯২৪-২৫ থেকে একটানা থেকেছেন। সত্যজিৎ রায়কে অবশ্য দেওঘরে কিছুদিন শিক্ষকতার কথা বলেছেন। জাপান যান তিরিশের দশকে (১৯৩৭-৩৮)। চল্লিশের দশকে বিবাহ করেন। (কলা ভবনের এই রক্ষণশীল আবহাওয়ার মধ্যে আমি কলা ভবনের এক ছাত্রীকে বিবাহ করি। বিবাহের সময় আমার বয়স ৪০-এর কাছাকাছি") চল্লিশের

দশকে ছাত্রাবাসের সিলিং-এ চীনা ভবনে হিন্দী ভবনে ম্যুরাল আঁকেন ১৯৪০, '৪২,'৪৭)। বেনারস অনেকবার গেলেও '৪০ এর দশকের সুরুতে বেনারস চিত্রমালা আঁকেন। নেপালে যান চল্লিশের দশকে। ৫০-এর দশকে নেপাল থেকে বনস্থলী (৫১-৫২), মুসৌরী (৫২) দেরাদুন (৫৩) এরপর পাটনা (১৯৫৪-৫৫ থেকে '৫৭) অপারেশান এর পর বনস্থলী '৫৭। আবার শান্তিনিকেতন ফেরেন '৫০ এর দশকেই, ('৫৭র ডিসেম্বর)। '৬০ এর দশক শান্তিনিকেতন। সত্তরের দশকে শান্তিনিকেতন থেকে দেরাদুন ('৭৫, '৭৬) দিল্লীতে '৭৬ থেকে। আমৃত্যু। মৃত্যু—১৯ নভেম্বর ১৯৮০।

১৯২০ থেকে '২৯ একটি লেখার উল্লেখ পেয়েছি। ১৯৩০ থেকে তিরিশের দশকে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে প্রকাশিত হয় The Santiniketan School of Art ; E. B Havell ; The Art of Japan ; Art and Daily life. চল্লিশের দশকে বিশ্বভারতী পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ; শিল্পী নন্দলাল ; শিশুদের ছবি-আঁকা; বিদ্যায়তনে শিল্পকলা; রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য ; এবং বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে The Art of Abanindranath (আনন্দবাজার পত্রিকায় 'জাতীয় চিত্রকলার নূতন উন্মেষ') Tagore : A Chronology of Abanindranath's Paintings, Evolution of Rabindranath's Art ; Teaching of Art to Children ; Art of Gaganendranath Tagore প্রকাশিত হয়। '৫০ এর দশকে বিশ্বভারতী পত্রিকায় শিল্পী উইলিয়ম ব্লেক, জ্যাকব এপস্টাইন। (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী পত্রিকার অবনীন্দ্র-সংখ্যার লেখাটি ১৩৫০-এ প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবতঃ)। এছাড়া রবীন্দ্র চিত্রকলা; রমেন্দ্রনাথের চিত্রকলা ; রূপলেখা (Rupalekha) পত্রিকায় The Artistic Inspiration behind Rabindranath's Paintings প্রকাশিত হয়। '৬০ এর দশক রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের দশক, রবীন্দ্র-চিত্রকলা বিষয়ক কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়—রবীন্দ্রনাথের ছবি-সৃজনী ; রবীন্দ্রনাথের ছবি—উত্তরসূরী ; রবীন্দ্র-চিত্রের ভিত্তি—রবীন্দ্রায়ন (সংকলন গ্রন্থ), '৬০ এর দশকে হিন্দীতে অনূদিত চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী পত্রিকায় ভারতীয় মূর্তি ও বিমূর্তবাদ ; অসিতকুমার হালদার , চিত্রের ভাষা, শিল্প শিক্ষার গতি-প্রকৃতি ; নন্দলাল—দেশ পত্রিকা (এ লেখাটির ইংরাজী

অনুবাদ এ দশকেই বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে প্রকাশিত হয়।) কলা ভবনের নানা স্মারক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় লোক শিল্প, পট ও পটুয়া, World Window নন্দলাল সংখ্যায় Nandalal, the Artist, সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র-প্রদর্শনীর ক্যাটালগে Art of Satyendranath, বিশেষ উল্লেখযোগ্য Lalit kala Contemporary No 1 (1963) এর Abanindranath and His Tradition (মুখবন্ধ সমেত অবনীন্দ্র, নন্দলাল, গগনেন্দ্রনাথ, অসিত হালদার ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার (এবং বেঙ্কটাপ্পা, সমরেন্দ্র গুপ্ত, শৈলেন্দ্র দে-র ছবির সংক্ষিপ্ত আলোচনা) এতে আছে। '৬০ এর দশকেই ললিত কলার পুস্তিকায় Kshitindranath Majumdar প্রকাশিত হয়।

৭০-এ দশকে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় আধুনিক শিল্প-শিক্ষা। দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ চিত্রকর-এর অন্তর্ভুক্ত কত্তামশাই, চিত্রকর, শিল্প জিজ্ঞাসা ৭০-এর দশকে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে। এক্ষণে 'বন্ধু কেলাম্বি' ছাড়া সব লেখাই ৭০-এর দশকে প্রকাশিত হয়, যেমন টেরাকোটা কাজের বৈশিষ্ট্য; মহাভারত ও ভারত শিল্প; রন্ধন শিল্প এবং গল্প কালু ডোমের বংশধর। কলাভবন প্রকাশিত স্মারক-গ্রন্থ Abanindranath-এ অবনীন্দ্র চিত্র (যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় অনূদিত ও সংশোধিত আকারে দুবার প্রকাশিত হয়।) কলাভবন পুস্তিকায় গগনেন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী ৭০-দশকে প্রকাশিত হয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় গগনেন্দ্রনাথ এই দশকেই। 'সপ্তাহ' পত্রিকায় তিনটি রচনা (একটি ব্যঙ্গ নাটক) প্রকাশিত হয়। কাঞ্চন চক্রবর্তী মহাশয় জানিয়েছেন, 'বনভূমি'তে তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়—এই সংকলনগুলির রচনা আমি এখনও দেখিনি। JISOA-তে Gaganendranath প্রকাশিত হয়। (বলা বাহুল্য, দশকওয়ারি এই তালিকায় সব লেখা উল্লেখ করা হয়নি, বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত রচনা, গ্রন্থ পরিচয় ২৫ বৎসরের তালিকায় বেশ কিছু পাওয়া যাবে ১৩৭৬ শ্রাবণ-আশ্বিন। অধ্যাপক কাঞ্চন চক্রবর্তীর রচনাপঞ্জি; জয়া আপ্পাসামীর গ্রন্থে, গ্রন্থ-পত্রপত্রিকার তালিকা দেখা যেতে পারে। আমরাও কয়েকটি রচনার কথা জানিয়েছি। বলা বাহুল্য নয় ভেবে, যাঁরা তাঁর লেখার সঙ্গে খুব পরিচিত নন, তাঁদের জানাচ্ছি ইংরাজী থেকে বাংলা, আবার বাংলা থেকে ইংরাজী অনূদিত তাঁর বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এরকম লেখাও উল্লেখ

করেছি। দশকওয়ারি এই তালিকায় বিভিন্ন দশকে তিনি কি লিখেছেন,— অন্ধতা, অন্ধতার আগে পরে, তিনি যে কি লিখেছেন তার হদিস পাওয়া যাবে। অপারেশন, অন্ধতার (1957) আগেও তিনি প্রচুর লিখেছেন—যেমন চল্লিশের অন্তত: দশটি লেখা প্রকাশিত হয়; অন্ধ হওয়ার পরেই লিখেছেন, এ ধারণা ঠিক নয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ট্রিগার-সুখী

এই মানুষটি একটু শুধু আত্মসুখী,
তাছাড়া আর কোন দোষ নেই,
এই মানুষটি শুধু-একটু ট্রিগার-সুখী,
আর কোনো জন কাছে বসলেই
পিস্তলে তার সল্‌তে জোগায় সুড়সুড়ি কি ?

প্রশ্ন করে জবাব পাই নি, সবাই বলে
বড়্‌ডো ভালো মানুষ ও যে
শৃঙ্খলা চায়, তাই তো মাতে দল-বদলে,
রাত্তিরে শিশুদের টিফিন-কৌটো খুলে
বারুদ খোঁজে !

মানস রায়চৌ

দুটি কবিতা

১. কান্না

তাকে কথা বলতে বারণ করি
হাসতেও,
কেননা আমার ভারি কান্না পায় এই সকালেই
চায়ের পিরিচে ঢাললে মধু, তবু কোনো সুখ নেই
সাধ নেই দুহাত বাড়িয়ে কিছু নেওয়া—

বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার আগে তোয়ালে সাবান
আমাকে দিয়েছে কিছু টান
খুব ভালো ছিলে নাকি ? তবে কেন যাবে ?
উঁইপোকা শত্রুতা দিয়েছে আসবাবে।
তাকে কিছু বলতে হয় না
স্বপ্নে দেখি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর নকল করেছে দাঁড়ে ময়না
আমার গলার স্বর, সে-ও খুব সোজা
রংতো অনেক ছিল ভালো লাগে সবুজ ফিরোজা
মানুষ অঢেল ছিল, ঠিক তার মত কেউ আছে ?
পথে নেমে কেউ কি কখনো কোন শুভদিন বাছে
অবারিত করে রাখি ভিতর বাহির
কান্না ঘিরে গড়ে ওঠে জীবনের আদর্শ সুস্থির।

২, সঙ্গীত

ভয় পেয়ে গেয়ে উঠি : কে আছো ওখানে, তুমি নাকি ?
ভয় পেয়ে রেখে দিই যা কিছু দেওয়ার ছিল বাকি
তারপর অন্ধকার, বুকের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসি
সুরু হোক শিল্পচর্চা, অথবা সে হাসি
জাদুঘরে যা রয়েছে—'আমাকে ছুঁয়ো না ক্ষয়ে যাবো'
এই কথা ঠোঁটে ধরে সেখানে অপেক্ষা করা যাক
ক্যামেরার কাঁচ খুলে। ঠিক দেখা পাবো
পরাক্রান্ত তুলি ও রঙের সীমা, তীক্ষ্নতম বাঁক
ভয় সেই অনাবিল চোখের পাতায় আছে জেগে
ভয় সেই উড়ে যাওয়া স্বরগ্রামে ডানা মেলে বৃষ্টিহীন মেঘে।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

প্লাবন

প্রত্যেক বর্ষায় কেন বাড়ির চারপাশে এত জল জমতে থাকে ?

জলেরই চক্রান্তে যেন রাত্রি এলে ঝলকে ঝলকে
দুর্মর বাতাস ওঠে। মনে হয়, চারদেয়াল ভেঙে
এই বুঝি ঢুকে পড়বে হু হু করে তীব্র জলধারা।
সেই সঙ্গে মধ্যবয়সের স্থিতি, তার চতুঃসীমা
উপড়ে একাকার করে কলকলিয়ে ঢুকে পড়ে যদি
স্মৃতির দঙ্গল নিয়ে বুকের ভিতরে
আকৈশোর সমস্ত যৌবন—

দু'হাতে আপ্রাণ ঠেলে অতর্কিত সেই আক্রমণ
ঠেকাব কী করে ?

কেতকী কুশারী ডাইসন

যেমন একটা লেখা গান

যেমন একটা লেখা গান
অসমাপ্ত,
চার গায়েনের গলা, সুরের ঝুলন,

যেমন একটা নাচের বাজনার রেকর্ড
অসম্পূর্ণ,
যতক্ষণ না আমরা নেমে পড়ি উঠোনে,

তেমনই আমার অসংবৃত, অসম্বদ্ধ সত্তা
চায় যে তুমি এসে পড়ো,
তুমি এসে পড়ো।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

বলি তবে, শোনো

আজ তুমি সারাদিনই গল্প বলে কাটিয়ে দিয়েছ,
গল্প না তো, ভ্রমণ-কাহিনী।

বিপদে পড়েছ তুমি বহুবার জংসন স্টেশনে,
বিপদে পড়েছ তুমি রানীক্ষেতে, সিমলায়, দার্জিলিংয়ে, ঘুমে,
বিপদে পড়েছ তুমি ফাঁকা মাঠে একা হাঁটতে গিয়ে।

অনেক দিনের পর আজ আমার মনে পড়ল,
আমিও ঘুরেছি একা, দীর্ঘকাল বড় একা একা।
তোমাকে বলিনি আমি, সেইসব বৃত্তান্ত বলিনি।

এবারে সময় হল? বলি তবে, শোনো।

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

চেনা অচেনা

একই শহরে আছি, তুমি আমি,
একান্ত স্বজন।
মাঝে মাঝে দেখা হয়; বড়ো চেনা,
বড়োই অচেনা॥

বৃত্ত

মেঘে মেঘে দিন গেল,
আয়নায় বারবার প্রতারিত মুখ।

এবারে সময় হ'লো,
চলো
সময়ের বৃত্ত পার হবো॥

জগন্নাথ বিশ্বাস

গাছ

I stood 'till and was a tree amid the wood
—Ezra Pound

বিশাল বনের রাজ্যে আমি এক নিস্তব্ধ উদ্ভিদ,
অনেক অজ্ঞাত কথা উদ্‌ভাসিত হয়েছে আকাশে,
অনেক জলের শব্দ, জটিলতা, যজ্ঞের সমিধ
অনেক মাটির কান্না আছে শিকড়ের কাছে।
অহল্যার শোক নেই, বীতশোক, জংগম পাষাণে
শুনেছি নিঃশ্বাস তার, অন্ধকার দেবতার তারা
যখন অস্ফুট হয়, বাতাসের নিঃশব্দ আহ্বানে
দেবতার গল্প শোনে, আমি থাকি নিস্তব্ধ পাহারা।
রাত্রির নিবিড় কানে, সূর্যালোকে, রহস্য সবুজে,
যে জন রভসে মত্ত ছায়াঘন পাতার শিবিরে
তেমনি ছিলাম আমি সংগোপনে ঘর নিয়ে খুঁজে
শিকড় ধরিয়ে দিয়ে চারিদিকে অনেক গভীরে।
এবং অনেক সত্য উদ্‌ভাসিত হয়েছে আকাশে,
অনেক জেনেছি আমি গাছের ভিতরে গাছ হয়ে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

আরও একদিন

ঘর থেকে বাইরে
পথ থেকে প্রান্তর
প্রান্তর পার হতেই অরণ্যের সঙ্গে দেখা

ঋজু গাছের মধ্য দিয়ে সবুজ ঘাস ডিঙিয়ে
পাকদণ্ডী পৌঁছে দেয় নীল ঝর্নার কাছে

পাহাড় বেয়ে বেয়ে
পাহাড় বেয়ে বেয়ে
নীল ঝর্না আরও নীল হতে হতে
এক সময় পৌঁছে দেয় নদীর মুখে

উপল উপত্যকায় পা রাখতে রাখতে
নদী আমার হাত ধরে ফেলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ভাসিয়ে নিয়ে যায় দূর থেকে দূরে

ঘর থেকে বাইরে কখন এসেছি
মনে পড়ে না
দু'কূল ছাপানো ভালোবাসায়
ভুলে যেতে হয় শীতলতা

এবং এমনি করে আরও এক দিন
কখন জানি না
ভুবন দোলানো বিশালতায়
সমুদ্র আমাকে ভরিয়ে তোলে
বন্ধনহীন প্রেমে

কালীকৃষ্ণ গুহ

দুটি কবিতা

হে অরণ্যদেব

তোমার স্বর্গোদ্যানে কখনো যাবো না, হে অরণ্যদেব।

আমাদের ক্লান্তি আছে খুব, আমাদের স্তব্ধ জন্মদিনে
সমস্ত শরীরে, মুখে, ধুলো এসে লাগে।

তোমার বিশাল বর্ম, দয়ালু মুখোশ, আমাদের শিশুদের মনে খুব
নির্ভরতা আনে।

অথচ আমরা, সেইসব শিশুদের পিতা, আর্ত বুদ্ধিজীবী, বিভ্রান্ত, কামুক
প্রতিদিন মধ্যরাত্রে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠি।

বঙ্গোপসাগর থেকে হাওয়া আসে

বঙ্গোপসাগর থেকে হাওয়া আসে।
জেনারেটারের শব্দ ছুঁয়ে আসে সন্ধ্যার বাতাস। বিষ নিয়ে আসে।
টি ভি-র এ্যান্টেনা জুড়ে মৃতের মতন ব'সে থাকে
বস্তুত জটিল কাক।
বারান্দায় ব'সে ধীরে ধীরে সবই বুঝতে পারি।
তবু মনে হয় খুব ভালো আছি।
ভাবতে ভালো লাগে কাল-ও অফিস যাবো, হয়তো বিকেলে
এক-মিনিটের জন্য
অঞ্জুর সঙ্গে দেখা হবে।

প্রদীপ মুন্সী

টান

১. কুয়াশা গোধূলি
স্বচ্ছ নুড়িতে রূপোলী আলো
নীচু মেঘে ডালপালা
ডানা ঝাপটায়
পাতা ঝরে
হিমেল পাপড়ির ঘ্রাণ
মাটি টানে
জল টানে

২. প্রাচীন গানের সুর
ফেরে
কুয়াশার ভিতরে
হারানো পাখীর মতন
ছায়া জল
জলে মেঘ
হিমেল পাপড়ির ঘ্রাণ
মাটি টানে
জল টানে

৩. পথে কেউ নেই
কুকুরের ডাক
কে কাকে জড়িয়ে শুয়েছে
কারা কি ভাবে
কে কোথায় যায়
ছায়া অন্ধকার
অন্ধকার ছায়া
রূপালি দাগ
জলে উঠছে
নিভে যাচ্ছে
ধ্বস নামার শব্দ গড়িয়ে পড়ছে
কার পায়ের রেখা মুছে যায়
যন্ত্রণায় ভালবাসায়
কবে কে এসেছিল শুধু
বুকের আলোয়
রূপালি দাগ ধরে
শব্দ গড়িয়ে নেমে যায়
কার পায়ের রেখা মুছে গেল

মাটির গভীর জালে
জলের গভীর জালে

৪. বৃষ্টি পড়ে
নদীর সবুজ পাড় কেঁপে ওঠে
জলের ওপরে মেঘ
মেঘের ভিতরে জল
ব্যাকুল পাপড়ির ঘ্রাণ
জল টানে
কার সুর স্বপ্ন হতে চায়
হিমেল পাপড়ির ঘ্রাণ
জল জানে
জল টানে
জল তো থামে না কখনো
কঠিন সত্যের মতন
ছলনা করে না
বৃষ্টি পড়ে সবুজ নদীতে
কার রক্তের স্বর দিক্‌চিহ্নহীন
জল টেনে নেয়
হিমেল পাপড়ির ঘ্রাণ
ব্যাকুল পাপড়ির ঘ্রাণ
দেরি হয়ে গেল
বড় দেরি হয়ে গেল

পরিমল চক্রবর্তী

অসহায়

বুড়ো বটগাছটার স্বদেশী ছায়ার নিচে
অন্তহীনতার রহস্য নিয়ে
সাদা এক নদী
একলা বইছে, বইছে কালো বাতাস ;
হৃদয়তা তার সর্বাংগে
রোদের স্নেহের মতো ;
কার ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর শুনে
স্মৃতি দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে
হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো
তার প্রত্যাশার সর্বস্বতা নিয়ে ?
আর বটগাছটার পাতায়-পাতায়
একটানা সম্পন্ন মর্মর—
করুণার প্রতিমূর্ত যেন।
অন্য দিকে এক চির কিশোরের
রূপময় দু'টি শান্ত অপরূপ চোখ
ওই বুড়ো বটগাছটার নিবিড় ছায়াকে ভালোবেসে
সব কিছু ভুলে গেছে ;
তাই পড়ে আছে নদীকূলে,
পড়ে আছে অসহায়॥ ... ...

শংকর দে

একটি কবিতা

তিনি যাকে বলতেন দেহময়
তাঁকে জেনে উত্তরণ চাই।

নইলে যে অসমর্থ হাতে ভেঙে যাবে
অঙ্গুরীয় দান, সেই তো মহিমা
দৃষ্টি যাঁকে ছুঁয়ে যায়, সেই তো অশ্রুর মতো
অন্তরে অন্তরে তাঁরই অনালোকে
যেখানে নিদ্রিত চক্ষু রয়েছেন
প্রভু ও পিতার
একই বৃক্ষে কল্পতরু
আমি তাঁকে দূর থেকে দেখি।

বরুণ মজুমদার

আমাকে ডেকো না আর

এখন বুকের মধ্যে সুগভীর ভালবাসা নিয়ে
কে তোমরা ডেকে যাও অতি ব্যস্ত পাহাড়তলীতে ?
রোজকার খেলাশেষে জীবনের শীতের বেলায়
আমাকে ঘুমাতে দাও. আমি বড় ক্লান্ত পিপাসায়।

একদিন পৃথিবীতে সব গান থেমে গেলে জানবো
অচেনা নতুন পাখি এনে দেবে আরক্ত সকাল।
সব সুর যায় যদি থেমে যায়, ভোরের গোলাপ
আনবে নতুন বার্তা, জীবনের অতিরিক্ত গান।

হে আহত প্রসন্নতা, ঘনিষ্ঠ এই বিষাদের ঘরে
উদ্ভাসিত করে দাও তোমার অতৃপ্ত ভালবাসা।
বহুদিন স্বপ্নে আমি জ্যোৎস্নার প্লাবিত প্রান্তরে
জেগে থাকবো সারাদিন একা পথে দূরতম হেঁটে।

এখন বুকের মধ্যে সুগভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে
আমাকে খুঁজো না আর অতিব্যস্ত পাহাড়তলীতে।

দেবী রায়

ভালোবাসা

ভালোবাসার সঙ্গে অদ্যাপি আমার
কোনরূপ বিবাদ নেই
তবুয়ো ভালোবাসা
আমায় ছেড়ে, কোথায় যে চলে যায় !

একটা কালো মেঘ ঢেকে দেয়, সূর্যের মুখ
আপাতদৃষ্টিতে, যাই বোঝা যাক
আমি কী বুঝবো, উদ্‌ভাসিত-সূর্য নেই
এই পৃথিবীর কোথাও ভালোবাসা নেই !

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—অন্ধকার
নিবিড়-নিকষ কালো অন্ধকার
কণামাত্র আলো নেই, এই ছোট্ট-ঘরে আমার !

আমি কী বুঝ্‌বো, আমি কি বুঝবো
এই পৃথিবীর কোথাও ভালোবাসা নেই !

আমার বুকে ভালোবাসাও নেই !

অশোক দত্তচৌধুরী

দুটি কবিতা

কো'নো একদিন

কোনো একদিন
মাথার ওপর আকাশ উঠে এলে,
দু-একটা বাড়ি ডিঙিয়ে হু-হু হাওয়া ছুটে এলে,
তুমি কেন হলুদ আলোর মধ্যে,
আরো নিঃসঙ্গ, আরো একা হ'য়ে যেতে চাও ?

অভিনেত্রী

ফের দেখা হ'লো।
হাজার হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে ওঠে।
ভাখো, আমাদের অর্ধেক শহরতলী আজ কীরকম হঠাৎ ভেসে আসে।
এখন তোমার কিছু মনে পড়ে?
জল দিয়ে নাম লেখা মেঝের ওপর,
দুপুরের হাওয়া তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
বকুলের সই সে-ই কবে মৃত—
শেষ দৃশ্যে চাপা কান্নার মতো মনে হয় আজ তাই তোমার সংলাপ।

কিছু থাকে স্মৃতি,
আর, যদি কোনোদিন মনে পড়ে, আবহমানের স্রোতে কীরকম
উদ্দেশ্যবিহীন এই সব ভেসে চ'লে যায়।

শিশির গুহ

মন্দিরা বেজে উঠলেই

কথা ছিল মন্দিরা বেজে উঠলেই
আমি বাইরে বেরিয়ে আসবো
সাথে থাকবে তোমার অমোঘমন্ত্র,
সেই থেকে বুকের ভেতর দামামা
যুদ্ধজয়ের বিজয় উল্লাস।
উৎসের দিকে ছিল আমার মুখ
আলোর তীব্রতায় স্নান সেরে
দু'চোখের তারা যখন জাগলো
তখন তোমার মন্দিরা বাজছে অনেক দূরে।

আমি এখন নিঃশব্দে তোমার কাছে
ধীর পায়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি
সূর্য্যের দিকে হাত বাড়াবে বলে প্রতিশ্রুতি ছিল
এখন বাজাও তোমার চিরকালের মন্দিরা ॥

যতীন্দ্রনাথ পাল

উত্তাল বাতাসে, স্বগত-সংলাপ

এখন উত্তাল বাতাস দিচ্ছে
জামাটা চেপে
ধরে রাখো ;
কাপড়টা টেনে বাঁধো ;

উত্তাল বাতাস দিচ্ছে
ঝটিপটি গাছগুলো
পুরনো-পাতা ফেলে দিচ্ছে
নিচে :

সুযোগ-সন্ধানী নৌকো ভেসে পড়েছে
অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ;
এই বাতাসের তালে তালে কেউ—
জানলা খুলে সুর মিলিয়ে দিয়েছে, গলা ছেড়ে ;

আথাল-পাথাল বাতাস দিচ্ছে
জামাটা টেনে ধরে রাখো,
উঁহু, তোমার গোঁফ, তোমার ভুরু—
এসব তো মেক্‌-আপ নয়—

তবে, চুপ্‌চাপ থাকো।
বাইরে জোর হাওয়া দিচ্ছে—
দিয়ে চলুক :
বসে বসে শুধু চারদিকের মজাটা ছাখো ॥

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

বান ডাকালি

হেঁটে যাবার পথে হঠাৎ কদমগাছে ফুল
দেখতে পেয়ে অচেনা কার মুখ
ভেসে উঠেছে মনে, এ কি নিছক অকারণ…

'যতই দেখি তারে ততই দহি'

এই প্রথম কদম ফুল কে দিয়েছে
বেদনাময় অসহনীয় জালা, আমার
অবুঝ হৃদয় বান ডাকালি যমুনায় !
কান পেতে অই শোনা যায়
ফুলের মোহন মালা প'রে
কদমতলায় বাঁশি কে বাজায়।

রাখাল বিশ্বাস

তুমি ছিলে না

তোমার যুক্ত করের প্রার্থনা কাঁপছে আজ
চিঠিতে কাঁপছে ক্ষমা, লুপ্ত ভাষা আর তুষারের দিন
আমি শীল লেনে তোমার ঘরের মধ্যে দেখে এসেছি সব

বইয়ের আলমারি, ভাঙা পুতুল, আঁকা ছবি, সুন্দর টেলিভিশন
সেই ঘরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যোদয় দেখব,
প্রতিশ্রুতি ছিল
স্নান করবো রৌদ্রের জলে।

তুমি ছিলে না, সারাঘরময় ছিল শুকনো চুলের গন্ধ, ছিল
গ্রীষ্মের দুপুর, বুকের শূন্যতা, এই শহরের অভিশাপ।

দাউদ হায়দার

মধ্যবিত্তের গল্প

১. ঐশ্বর্য-মণ্ডিত অন্ধকার, আর
হীরকখণ্ডের মতো রাত্রি
এলো আমাদের মধ্যবিত্ত নাগরিক
ঘরে। লগ্ন হলো দু'বাহু। জন্ম-জন্মান্তর মিশে গেল
মৃত্যুর সমীপে।

উন্মত্ত-বন্দী-প্রাণে জাগে আশ্চর্য রূপের শিখা।

দূরে বহুদূরে, বিশ্বচরাচর জুড়ে
কর্ষিত অকর্ষিত মাটিতে
আবিশ্ব একতান।

এদিকে সতর্ক পাহারা, বায়ুমণ্ডলী থেকে
অশ্রুময় সৌরভ পলাতক মুক্তির উচ্ছ্বাসে
আপন বিদ্রোহ
রক্তরাগে রঞ্জিত।

প্রাণবন্ত তারুণিক নেমেছে পথে। পদধ্বনি শুনি

জীবনের। উচ্চৈঃশ্রবা মানুষের গানে
প্রাণ পায় উষর অঙ্গীকার।

দেশে ও দশের মাটিতে, পঞ্চাগ্নি-আলোয়
মিছিলে-সংগ্রামে, যে-হতাশার প্রতিচ্ছবি নিয়ত
আমাদের বন্দী প্রাণে আরো বেশি উন্মত্ত-বন্দী-প্রাণ।

২. দগ্ধ-প্রাণের চৈত্রে অস্ত গোধূলির গান, আর
স্বচ্ছ প্রেমের বিন্যাসে অন্তহীন অন্ধকার। ক্লান্ত তাড়িত মন,
কর্মের প্রহারে ম্লান। অন্ধকার বহে আনে
বিহঙ্গ একা। ঘরে-ফেরা বাঙালী সন্ধ্যা।

এই আমাদের মধ্যবিত্তের সংসার। মুক্তির আশ্লেষে
ক্ষণিক উল্লাসে আনন্দে আর নগ্নবাহুর পেশীতে
জন্মজন্মান্তর।

—আমাদের জীবন-যৌবন বাঁচে, ক্ষুধিত প্রাণে জাগে উন্মত্ত-বন্দী-প্রাণ।

কাজিরুল ইসলাম

ধন্দ

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, আপনার পিঠের এই ফিক ব্যথা সারতে দু'চার দিন সময় নেবে। ব্যবস্থাপত্র মতো ওষুধপত্র খাচ্ছি। এদিকে কয়েকটা ভারি ও বড় দিনও গেলো গড়িয়ে, ঢালু পাহাড়ে পাথর টুকরোর মতো নয়, বরং খাড়া পাহাড়ি পথে অনভ্যাস সমতলী মানুষের পদক্ষেপের মতো। সেই অস্বস্তিকর ব্যথা দিনগুলোর সঙ্গেই সতীর মতো সহমরণে গেলো!

ফলত, আমি পড়ে গেলুম ধন্দের ধাঁধায়: আমার ব্যথাটা সময়ে গেলো, না ওষুধে সারলো?

আমার মাস্টারমশায় গেলো হপ্তায় আমাকে লিখেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি ডাক্তার-বিমুখ মানুষ। তাই কষ্ট ভোগ করছি।

তাহলে আসল কথা কি এই ভোগান্তি ; না ওষুধ, না সময়, যার বশ্যান্ত নিরাময় ?

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

মনের দর্পণ খান খান হয়ে গেছে

মনের দর্পণ খান খান হ'য়ে গেছে
স্মৃতিগুলি সব ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেছে
সেই সব টুকরো ছিটিয়ে পড়ে আছে
দুই জানুর মধ্যে
আমি উবু হ'য়ে লক্ষ্য করছি—খুঁজছি
যদি একটিও অখণ্ড প্রতিবিম্ব
পেয়ে যাই
হয়তো তাহ'লে অতীতের এক কোণে
একটি পা রেখে
(একটা পা তো কোথাও রাখতে হবে—)
আর একটি পা কোথায় ফেলতে পারি
তবেই কখনও এই গোলকধাঁধা থেকে
বেরিয়ে আসতে পারবো
কিন্তু পা রাখতে এতটুকু ঠাঁই পেলাম না
স্মৃতিগুলি উদ্‌ভ্রান্ত
যাকেই মনে করার চেষ্টা করি
তাকেই আর সহজে ধরতে
পারছি না

ধরতে পারছি না সম্পূর্ণ কায়
সব যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে
যেন একটা ইমারত
ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে ঝ'রে পড়ছে
ঝরা ইট-বালি-পাথরে
চাপা প'ড়ে যাবে
আমার বর্তমান আমার ভবিষ্যৎ
আর আমি একটি কায়াহীন
মেরুদণ্ডের মতো
দাঁড়িয়ে থাকবো
সেই ভস্মাচ্ছাদিত প্রান্তরের মাঝখানে
কী বীভৎস
ভাবতে আমার ভয় করছে
ভাবতে ভাবতে আমি নিজেকে
হারিয়ে ফেলছি
ভগ্নস্মৃতির টুকরোগুলি
আমাকে ঢেকে ফেলেছে
আমি চেষ্টা করছি একটা অভগ্ন স্মৃতি
খুঁজে পেতে
হয়তো তাহ'লে অতীতের এক কোণে
একটি পা রেখে
আর একটি পা ধীরে ধীরে বাড়াতে
পারবো—

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

তিনি ছিলেন, আমি······

অন্ধগলির বাসিন্দা !   এই—
হাঙরের দাঁতে লুটোপুটি খাওয়া অস্তিত্ব   এই
দিনকে দিন উবে যাওয়া স্বপ্ন   আর
পেশলজৈবিক খিদের হা
চাইছো কোন্ পরিত্রাণ এই
নঞর্থক শরীর বহন
থেকে ?

এই দেশ তার মাটি   এখানেও ফুল
ফোটে   ফুটতে পারে যেথায় আর—
অরোগ সফলতার হাজার পুষ্প   এই
স্বপ্নে পিতামহ উচ্ছল
ছিলেন   পিতা
উজ্জ্বল ছিলেন   একদিন তিনি
বোমার ভয়ে খোড়া ট্রেঞ্চে হুমরি খেয়ে
পড়েছিলেন   আমি
দেখিনি

আমি দেখিনি তাঁর
পরাজিত মুখ   তাঁর মুখের জটিল
রেখার সংকোচন   তাঁর
অনিদ্রার ক্লান্তি   অশক্ত শরীর
কেমন কোরে টেনে নিচ্ছেন   রুগ্ন
শিরাফোলা পা
কেমন কোরে টেনে নিচ্ছে তাকে
কোনদিকে ?

তিনি ছিলেন স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে জড়িয়ে তিনি
তারার দেশের গল্প শুনতে
ভালোবাসতেন ঠাকুমা
রূপকথার সোনার ঝাঁপি খুলে বসতেন
সন্ধেয় বাবা
ঘোড়া ছোটাতেন ডানার ঝাপটায় ছিটকে
পড়তো রোদ পড়তো বৃষ্টি পড়তো
তারার গুঁড়ো তিনি
ছুটতেন

অন্ধগলির আকাশ জুড়ে তার
ঘোড়া ছুটতো তার
স্বপ্ন ছুটতো
ঘোড়া থেকে নেমে
পিতামহের শাল দোশালা গায়ে
জড়িয়ে ব্যবহৃত চটি পায়ে
গলিয়ে অন্দরে
ঢুকে যেতেন খুব স্বচ্ছন্দে -
অবলীলায়

পায়ের তলার মাটিতে তখনো চিড়
ধরেনি চিড়
ধরলো একদিন মুখ
থুবড়ে পড়লো মাটিতে সেই
ঘোড়া
অনেক শাখা প্রশাখার অশথ
ভেসে গেলো স্রোতের টানে খড়কুটোর
মতন তিনি
অনভ্যাসে—

সামাল দিতে পারলেন না

আমাকে তিনি এই
অঙ্কগলির বাণিজ্যা কর রেখে
গেলেন   আমি—
হাঙরের দাঁতে লুটোপুটি খাওয়া অস্তিত্ব
দিনকে দিন উবে যাওয়া স্বপ্ন   আর—
পেশল জৈবিক খিদের হা-র দাবি মেটাতে
গিয়ে ঘুরে
মরছি

এই দেশ   তার—
মাটি   এখানেও ফুল
ফুটতে পারে মেধার আর
অরোগ সফলতার হাজার পুষ্প   ভুলে
যাচ্ছি
ক্রমশ

তিনি ছিলেন স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে
জড়িয়ে   আমি
দুঃস্বপ্নে

তরুণ সান্যাল

প্রভু আমার—

রক্তে আয়না ঘুরিয়ে ধরছো
ঠিক কি তোমার ছায়া ভাসছে, প্রভু,
ঊর্ধ্বে দেখছি গতিময়তায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড
তারাখচিত ধূমকেতুর ঝাঁটায়—

নীচে অমিত নদী পাহাড় জ্রুরেখা কুঞ্চিত
তৃণভূমির বনভূমির ফুল ফোটায় ঝরায়
এ কোন রূপচ্ছটায় পথ হাঁটায় !

এমনি তবু প্রস্ফুটন বীজের
এমনি বাড়ে মহীরুহের বয়স
এমনি সময়ভাঙা এমনি বাঁক পেরিয়ে দৃশ্য—
এমনি জমে নিসর্গের মধুতে মৌচাক
ত্রিভুজ এই উপদ্বীপে ঘুমিয়ে আছে ঊষা
ওহে রাখাল শুনতে পাচ্ছি শিঙা নাকি সে বাঁশি
ঘোড়ার পায়ে ফেনা ফাটানো সমুদ্রের ডাক !

অথচ রাধা রাসমঞ্চে ডাইনে চূড়া হেলে
অপর্যাপ্ত ফুল আধারে দুপা
শিউরে উঠছে শিরাজটিল নরদেবের দেহ—
যেখানে তুমি পা দেবে আছে বিষকাঁটার ফণা
কাঁটারও বুকে নীল বিদ্যুৎ ফোটে,
সে ফুলে যেতে মৌমাছির কেমন সন্দেহ।

তোমার জন্যে শরীর-মনে
ভুল করা বা ভুল না-করা সুখ
রাধার জন্য চাঁদের জন্য
কুরুক্ষেত্রে রথের রশির জন্য আকাঙ্ক্ষা—যে
প্রভু আমার সখা আমার
ওহে আমার কৃষ্ণ আমার যীশু
সমস্ত দিন নূপুর কিংবা শিকল হয়ে বাজে।
এমনি করে বয়স গড়ায়
চড়ায় দেখছি ঠেকেছে নৌকাও
এমনি চড়নদার বাওয়া যার নিছক বৈঠাখেলা,
সমস্ত রাত শুনছি বালুচরের হি-হি হা-হা

মধ্যআকাশ গোল চাঁদে ধোয়
তোমার আলো ঠিকরে জ্যোৎস্না
একাই এলাম পূর্ণিমাতে
অমাবস্যায় তেমনি একা যাওয়া ॥

অনুরাধা মহাপাত্র

অসীমে

অসীমে কেমন যাবো, বাঁকা ঘাড পাটাতনে নিঃসাড় সাতনদী নৌকোর দিকে
ঘড়ির আয়ুর দিকে চেয়ে এই মহিষরঙের অন্ধকারে তরঙ্গকে পিছলিয়ে
যেতে দেখে আরও এক তরঙ্গের রক্তবমি মুখে, ভালোবাসবার কথা
মনে রেখে বৃশ্চিকের, মিথুনের আশ্চর্য আকাশ ও বসন্তের
কুসুম তুলবো জানি, বালিকাটি ঋতু ফুলে তখনো
আসেনি, তার অনন্ত আবেগে ফোলা দিগন্তের বেণী
ধাতু মুছে নিতে বলো ঠাণ্ডা মুখ থেকে, জামরুল পেড়ে নিতে
তুমি, এত রেণু শরীরের চরাচরে, মঞ্জরী গো, মনে নেই ?
বয়সে কি বড় বলে তিনি ?   যাই, অসীমের দিকে যাবো
বউল তো খসে গেল, অন্ধকারে আকাশের উনুনের গাঢ় রাঙা মুখ !

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাসন

থেকে থেকেই বাসন কোসন
ঝনঝনিয়ে উঠছে,
আলসের পায়রা-জোড়
ছিটকে যাচ্ছে এদিক-সেদিক,

হাত থেকে কলম,
পড়িমরি ক'রে দৌড়চ্ছে
ঘরমুখো শব্দ,
প্রতিবেশীর জানলা

কত্তামশাই
দূরদর্শী পুরুষ ছিলেন,
কাঁচের গেলাস ছুঁতেন না ;
সারাজীবন আঁকড়ে থাকলেন
নিজস্ব পাথরের বাটি।
চোখ বোঁজবার আগেই
পুরোনো সিন্দুক ঘেঁটে
বার ক'রে দিয়েছিলেন
খাগড়াই কাঁসার বগিথালা
আর জামবাটি,
বলেছিলেন,
টোল খাবে, তবু ভাঙবে না।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হ'লেও
কাচের বাসন কিনিনি
কত্তামশাই,
আপনার দেওয়া টোল-পড়া থালায়
দুবেলা দুমুঠো খাচ্ছি,
শুধু আপনার নিজস্ব
পাথরের বাটিটা
আমরা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

কান্তিপ্রকাশ গুপ্ত

অসনাক্ত সেই তিনজন

আজ রাত্রে এই মাত্র
তোমাদের তিনজনের সাক্ষাৎ পেলাম।
প্রথম, তোমার মুখ দেয়ালে ফেরানো ;
দৃশ্যমান ছিল শুধু তোমার স্ফীত পৃষ্ঠদেশ,
কালো রেশমী আলখাল্লায় ঢাকা
একটা বিষণ্ণ শবাধার যেন।
দ্বিতীয়, তোমার মুখ
তোমারই দুই বিশাল হাতের পাতায়
ঢাকা ছিল।
বাম হাতের অনামিকায়,
স্পষ্ট মনে আছে,—
ঘসা কাঁচের মতো ধূসর
একটা মস্ত পাথরের আংটি।
আর তৃতীয়, তোমার মুখে আঁটা ছিল
নক্শা-আঁটা একটা কাঠের মুখোশ।

তোমরা কারা? অ-সনাক্ত কোন্ তিনজন?
যেই হও,
কুয়াশার অস্বচ্ছ পর্দায়
নির্বিরোধ সাময়িক অবস্থানের পর
ঘুমের ভিতরেই তোমরা
নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছ।
একটা অস্পষ্ট প্রত্যাশার মতো
শুধু মনে হচ্ছে,
আগামী সূর্যোদয়ে

তোমরা আবার ফিরে আসবে—
তিনটে শঙ্খচিল, তিনটে শালিখ
অথবা তিনখানা টেলিগ্রাম হ'য়ে

আসবে তো ?

মযহারুল ইসলাম

নির্মোহ তৃষ্ণার সুখ

(সদ্যপ্রয়াত নীহাররঞ্জন রায়-কে)

আমরা যেমন দেখি, বাইরে থেকে যেমন
নিজেকে দেখি, অতীতের পথ-বেয়ে-আসা পৃথিবীকে,
আকাশে মেঘের খেলা, গাছে গাছে নবজাতকের সঞ্জনন
সব কিছু মোদিত প্রবাহে লীন—আমরা যেমন দেখি,
অথচ ভেতরে ভেতরে নিরন্তর এক গভীর সংজ্ঞায়
কাঁটাতার-সমুন্নত সুদুর্লঙ্ঘ্য বন্ধনের, শৃংখলের অধিবাস ;
সব কথা ঝড়ে পড়ে যায়, সব অনুভূতি
চারদিকে পাথরের মমী নিরুপায়-ক্ষত মজ্জায় মজ্জায়।

কেউ কেউ এ-রকম নয়
আমাদের চেয়ে কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে শুধু নিরলস
সঞ্চয়ের কাজে নিবেদিত—আর কিছু নয়, মর্মর-শিল্পীর
নিমগ্ন নিপুণ হাতে কেবলি স্ফটিক'চোখ হৃদয়ের গায়ে গায়ে
সতত বসিয়ে যায় নক্ষত্রের মত, মননের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
ভাস্বর দীপ্তির আঁখি, নির্মোহ তৃষ্ণার সুখে উড়ে
দেখে যায় জগতের সঙ্গোপন সব অলি গলি
জীবনের গান শোনে— ছন্দে রাগে নিয়ন্ত্রিত ইমারত
যখন সংঘাত।

সময়ের বুনোনিটি ঠাসা, বড়ই পিনদ্ধ তাই
নক্ষত্রের আলো চেয়ে দেখা সেও দু'দশ ইঞ্চের মত
লবণাক্ত ঘামের আড়ালে চাপা পড়ে
কিছুই করবার নেই। অকস্মাৎ ঘণ্টা বেজে ওঠে

দুঃখ নেই।

আমাদের আশে পাশে ছড়ানো পথের অন্ধকারে
নক্ষত্র সজাগ প্রহরায়।

অশোককুমার মহান্তী

অগ্রজ কবির প্রতি

এইভাবে কখনো কখনো তুমি আমাদের স্মরণ করলে
আমরা আনন্দিত হই
আনন্দই সর্বাংশে সত্য এই যদি হয় তবে
আমরা আনন্দ না পেয়ে থাকতে পারি না
তুমি স্মরণ করলে যেমন আনন্দ বাড়ে তেমনি স্থির উদ্যম

আমরা কেউই চোখের মণি খুঁজে দেখি না
দৃশ্যমান জগতে যতসব প্রপঞ্চের খেলায় আমরা মত্ত থেকেছি বহু দিন
আর, এখন এই উত্তর আঠাশে বৃক্ষের মূল শেকড়
আবিষ্কার করতে পারি না কিছুতেই
মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কেবল নিরাশ্বাস ক্লান্তি জমে

ঈশ্বরকে বলেছি, এসো, আমার ফুলবাগানের সর্বকনিষ্ঠ কুঁড়িটি
ফুটিয়ে দিয়ে যাও
এখনো পশ্চিমে বেলা পড়তে কিছু বাকি
ঈশ্বর কথা শোনে না

তবু আনন্দই সর্বাংশে সত্য   এই যদি হয়   তবে
আমি নিশ্চিত ঐ সর্বকনিষ্ঠ কুঁড়িটিকে ফোটাতে চেষ্টা করব
তুমি স্মরণ করলে সেই স্থির উত্তম বাড়ে।

[কবি অরুণ ভট্টাচার্যের একটি চিঠি পেয়ে আমার এই স্থির অনুভব গড়ে ওঠে। এবং কবিতাটি সেই অনুভবের ওপর রচিত।]

সুব্রত রুদ্র

উপোসের মাঝখানে

মশারি ছিটকে বেরিয়ে এসে
কাল আমি
নিজের গায়ে অ্যাসিড ঢেলেছি।

আজ রোদের তাপে আবার জ্বালা ধরাচ্ছে
পেটের ভিতর
সেই জ্বালা তৈরি হচ্ছে
যত রোদ ওঠে তত জ্বালা বাড়ে
যত হাঁটি তত জ্বালা বাড়ে।

মাটি ভরা কলসীর সঙ্গে দড়ি বেঁধে
উপোসের মাঝখানে ডুবি।

সুরজিৎ ঘোষ

গল্পের প্রয়োজনে

গভীর গল্পের প্রয়োজনে
সম্পূর্ণ আকাশ আজ নীল রং করা হ'লো,
মাটির সামর্থ্য ছিল বুক চিরে কাকচক্ষু জল।

বুনো আগাছার ঝোপ, ঘাস পাতা পেরিয়ে জঙ্গল
দেখবার জন্য যারা ছুটে গেল
তাদের আসল কাজ ঠিকেদারি, গাছমাটি পুকুরের ঘাট
কীভাবে প্রস্তুত করে খুব নীল আকাশের নিচে
সাজিয়ে রাখতে হয় গভীর গল্পের প্রয়োজনে
কেবল তারাই সেটা জানে।

সন্ধ্যার ছায়ায় ঘরে খুঁটি পড়লে একপায়ে ভর,
অন্ধকার টপকে এসে ঢুকে পড়লো মণ্ডপের মাঝে
তুমুল উৎসাহ নিয়ে ঘিরে ধরলো এক্কা দোক্কা খেলার সঙ্গীরা
তারপর গল্প শুরু হলো।

বড় বড় নতুন চোখের সামনে খুলে গেলো মস্ত জাদুঘর
বুলবুলি খাচ্ছে ধান, ঘাটে স্নান করে কলাবউ
পক্ষীরাজ থমকে আছে সোনার কাঠির অপেক্ষায়
তখন ক্লান্ত সব ঠিকেদার ছায়ার বাইরে শুয়ে নিঃসাড়ে ঘুমায়।

অরুণা মুখোপাধ্যায়

এই শিশু চারাগাছ

দর্পহারী বালক
তোর অঙ্গুলি ধরে উঠে এলে
সাজ হয় আশ্চর্য সূর্যাস্ত ;

শতমূলে মৃত্তিকা প্রবিষ্ট হয় এই শিশু চারা গাছে।
তুই আর একবার বল্
প্রায়োপবেশনে
ক্ষত হও নীত হও কোন্ বিশালের কাছে
তোর ঐ পাপবিদ্ধ চোখ আর
ভুবন-ভোলানো হাসি নিয়ে।

অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ

আজ দশদিনের দিনশেষ,
মুখ জুড়ে দিয়ে প্রতিমা-গড়া
শেষ করলাম।
গত ন'দিন ন'টি মুখ
পাখির গর্ত থেকে, ঝর্নার সাদা
ফেনা থেকে, দুঃখহাসির
শিশুগন্ধ থেকে
নিংড়ে নিয়েছিলাম।

শেষ মুখের জন্য চিন্তার
অন্ত ছিল না। চোখ খুলে দেখি,
তুমিই এগিয়ে দিলে
ঘাতকের চোখ-আঁটা প্রবঞ্চকের
হাসি-মাখা শেষ মুখ।

রথীন সেনগুপ্ত

ভাঙা খিলানের পাশে

ভাঙা খিলানের পাশে বিষণ্ন নির্জন হাত
'গথিক' কি দিয়েছিল অমন সুষমা?
নয়নে মোহন দীপ্তি, ওষ্ঠে-চিবুকে মদালসা
সব অঙ্গীকার ভুলে
গার্হস্থ্য অমা
কেন রেখেছো কলিত কাল স্বপ্নের ভিতরে সারারাত?
নিবিড় পদ্মের বনে
দোলে কোন্ কৃষ্ণ নাগমণি—
খেলাচ্ছলে, শুধু খেলাচ্ছলে?

তুলসী মুখোপাধ্যায়

যতোবার

যতোবার গাণ্ডীব হাতে ছুটে যেতে চাই
মাংসাসী প্রেমিকার মতো অসম্ভব অপরূপ হেসে
আপোষ খুব দ্রুত এসে সামনে দাঁড়ায়:
দুই হাতে গুঁজে দেয় নিদারুণ সন্ধির প্রস্তাব
যুদ্ধের পোশাক ভোলে সম্মোহিত লাজুক প্রেমিক

যতোবার মুখোমুখি ছিলা টান উদ্যত সংহার
ভয়ংকর প্রভুর মতো ডান হাতে চাবুক নাচিয়ে
সমর্পণ আমাকে বলে, হাঁটু গেড়ে বোসো
যুদ্ধের পোশাক ফুঁড়ে
শোঁ শোঁ করে উড়ে যায় দশ লক্ষ বিনীত প্রণাম

শক্তিব্রত ঘোষ

চৈত্র

চৈত্র বনে বনে   এস্‌প্লানেডে।

রোদের কার্ণিশে রক্ত লেগে আছে,
যে দাম চেয়েছিলে দিয়েছি,
যে তুমি দাবী কর বিনিময় ;
তরুণ করবী যে সঙ্গে আছে, তারে
সহজে দিতে পারি, যদি চাও ;
দিতেই হয় যারে, দিতেই হয়।

চৈত্র বনে বনে   অলিন্দে।

চিত্রিতা চট্টোপাধ্যায়

সে শুধু ঘুমিয়ে থাকে স্বপ্নের ভেতরে

নবীন যৌবনে সে শিরীষকে ভালবেসেছিল
শিরীষ ভুলেছে তাকে সে কিন্তু এখনো ভোলে নি
শিরীষকে খুঁজে পেতে আজো ফেরে নগরে প্রান্তরে-
গভীর অরণ্যে যায়, ছুটে যায় পাহাড়ে বন্দরে।
অনেক শিরীষ দেখে,—এ শিরীষ সে শিরীষ নয়
সময় গড়িয়ে যায় সব শ্রম ব্যর্থ মনে হয়।
তারপর অকস্মাৎ কবে যেন স্বপ্নের ভেতরে
অজস্র শিরীষ ফোটে অজস্র শিরীষ ঝরে পড়ে
শিরীষের মৃদু স্পর্শে শিরীষের নরম সৌরভে
সে শুধু ঘুমিয়ে থাকে চিরদিন স্বপ্নের ভিতরে।

রমেন আচার্য

ফুলকির তামাটে চুম্বন

এই ধবধবে গিলে-করা জীবনযাত্রার এক কোণে
ফুলকির মৃদু তামাটে চুম্বন প্রকাশ্যে এসেছে। কবেকার
এই উপহার! উদ্যান সজ্জার ছুতোয়
এই ভাবনা নিয়ে খেলা প্রায়শই
অসম্পূর্ণ থাকে।

শহর বিমুখ ওই প্রপাতের কাছে গিয়ে ভাবি
ওই আত্মতৃপ্ত সাদা জলোচ্ছ্বাস—সেকি জানে
এই কথা! জানে মেঘময় অভিমানী টিলা!

নাকি এই তামাটে দুঃখই শুধু মানুষের একমাত্র
করমুক্ত আয়। যা এলোচুলে ফুটে ওঠে কবিতায়। জানে তার
অলীক স্পর্শ ও চুম্বনে।

কানাই কুণ্ডু

পারলাম না প্রভু

পারলাম না হে, আর পৌছোতে পারলাম না
সীমানার বাইরেই থেকে গেলাম

তোমার সাম্রাজ্যের সিংহ দরোজায়
দুটো ক্ষুধার্ত নেকড়ের পাহারা
ফাঁক ফোকরের ব্যবস্থাও আছে
কেবল কুশলী লোকেরা জানে
ভেতরে অনন্ত ইচ্ছাপূরণের জাদু
হাতের মুঠোয় ধরা যেতে পারে চাঁদ

এবং চাঁদি
রাজ পালকের গলায় সোনার শেকল ঝুলিয়ে
নিরন্তর খেয়ালে রাখা যায়
হারেমের ডানাকাটা পরী সহজেই হতে পারে
অংকশায়িনী
স্বয়ং তোমাকেও সারমেয় বিলাসে
কেনা যায়

তাই পারলাম না প্রভু
সীমানার বাইরেই থেকে গেলাম।

মোহিত চক্রবর্তী

গোপনিকা

তোমার জন্যে টিয়েপাখি রঙের শাড়ি
হাসনুহানা
বাবুই বাসা চন্দনেশ্বর পাহাড় থেকে
শাদা পাথর
শিউড়ি থেকে শতমূলীর মোরব্বা আর
নলেন গুড়ে
প্রহরগুলোয় নকশা-আঁকা যেমন খুশি
তেমন থাকা
যায় না বলেই সুখে থাকো বালিশটাকেও
কোন শরতে
নরম রোদে ছুঁইয়ে রাখা, তবু কি প্রেম
মিথ্যে হলো
তোমার কাছাকাছি থেকেও বানভাসি দিন
সব ফুরলো!

শিখা মল্লিক

নাতাশা

যতক্ষণ মানুষ
ততক্ষণ একটা কাক তার পাশে
কি খেলা খেলবি বল পুঁতবি কোন্ বীজ
সবি তো আবেশের আনন্দে পুরনোকে ডাকা
তাদেরকে নিয়েই মাতামাতি দাপাদাপি
ক-দিন বাদেই সেই আবার যন্ত্রস্থিত হওয়া
ক্লান্তি বাড়ে দীর্ঘশ্বাসে ভাঙ্গে কাঁচ
তবুও কি রেহাই আছে
দূর থেকে কানে আসে নাতাশার ডাক—
না-তা-শা না-তা-শা না-তা-শা !
এদেরি জন্য মনে হয়
ভুলগুলো ভুল নয়
রাগ নয় রাগ
যেন আলো

তাই আলোয় মেতে-ওঠা।

অভিজিৎ ঘোষ

ঘুম

বেদনা ও বিষাদ জেগে আছে—থাকুক—কাল দেখা হবে ;
এখন মায়াকাজলের ঘুমে যেতে চাই একা একা

স্বজন বান্ধব বন্ধু পরিজন অনেক আছে, পিছু টান ;
কি হবে এদের কথা ভেবে

এরা ছাইপাঁশ, সংসারের আগাছা, প্রাণ
এঁদের তেমন চায় না

এখন এই অব্দি থাক্‌, কাল রবিবার, কাল ছুটি
কাল দেখা হবে—টুপটাপ ঝরে পড়বে নানা কথা
এখন ঘরে অন্ধকার জমেছে
কোনো নিত্যকর্ম বাকী নেই
এখন চাই ঘুম
মায়াকাজলের গাঢ় ঘুম···

অলককুমার চৌধুরী

কোনদিকে পা বাড়াই

কোনো সমর্পণ নয় আজ
সহজ স্বাধীন—
প্রতিমার মুখ থেকে গর্জনতেলের এক
অপার্থিব পেলবতা ভেঙে
উঠে আসে চৌচির অসংখ্য বলিরেখা
মনের ভিতরে চলে জড়িবুটি নিয়ে এক
মাদারীর খেলা

কোনো ঘৃণা নয় আজ
বিশুদ্ধ আগুন—
মসলিনে ঢাকা রামধনু ভিজে আকাশের গায়
ছবি হয়, মুছে যায়
হাতছানি নিয়ে ডাকে নাচঘরে
রেশমী ঘাগরার ঘের

আঁরণ্য-প্রতিভা ভুলে ভিজে বেড়ালের থাবা
চকিতে লুকিয়ে ফেলে ধারালো নখর

কোনো সমর্পণ নয় সহজ স্বাধীন তাই
কোনো ঘৃণা বিশুদ্ধ আগুন—
আমি আজ কোন্‌দিকে
পা বাড়াই!

শিখা সামন্ত

বাঁশি

ওই বনকল্‌মীর ঝাড়, লতাগুল্ম
ধুতুরা ফুলের ওই বাঁশি—
ওই চরাচর জুড়ে জেগে ওঠে চাপ চাপ ছায়া
ওই কৃষ্ণ জল-রাশি, গভীরে আর এক ভুবন
বড়ো বড়ো চোখ মেলে কুমারী মেয়ের মতোন
ওই বৈভব, ঐ সাড়ম্বর মুক্তোমালা
ওই থাক্‌
ওই ব্যপ্ত চরাচর, নীল নভোমালা
ওই কৃষ্ণা জলরাশি, চলে যেতে দাও
ওই কল্‌মীর মন শত আঁচড়ের দাগ রেখে
চলে যায়
ওই ঝাড় লণ্ঠন, সাড়ম্বর মুক্তোমালা
ও থাক
বেদমার ওষ্ঠ জুড়ে ঝড় ওঠে কুরুক্ষেত্রের মাঠে
শব্দরা এসো ছুটে যাই

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ভোরে

কাকভোরে তুমি প্রতিদিন মুখ দেখ জাদুকরী মনের আয়নায়
যতোটুকু আলো প্রয়োজন, ততটুকু এসে পড়ে মুখের ছায়ায়,
রেখাগুলি চিনে নাও, দেখে নাও কতোখানি ক্ষয়ক্ষতি ছিল গত রাতে
দুঃস্বপ্নেরা ভেসে গেছে ঘুমে কাদা ঘোলাজল বুকের প্রপাতে।

বিপথ গামিনীমন গ্লানিমোচনের সুখে সদাচার সুচারু ভাষণ
বিপন্ন বিশ্বাস ছুঁয়ে এই ভোরে অভাগার কে বলো আপন?

জহর সেন মজুমদার

নদী

একটা লোক হাঁটুগেড়ে বসে আছে নদীর কাছে
আমি লোকটাকে দেখছিলুম নদীকে নয়
একটা মেয়ে জল ছুঁয়ে বসে আছে নদীর কাছে
আমি মেয়েটাকে দেখছিলুম নদীকে নয়

এই অবেলায় চারিদিক ফাঁকা। আমার চারপাশে
কেউ নেই। সেই লোকটি কিংবা মেয়েটি এখন কোথায়।
চোখ চেয়ে এখন আমি শুধু নদীটিকে দেখি। একমাত্র নদীটিকে।

কমলেন্দু দাক্ষিত

ধনী

পৃথিবীতে যারা ধনী তারা ঋণী
দায়বদ্ধ সকলের কাছে
সংসারের ঐশ্বর্য বাড়ে জতুগৃহে
অনেক উত্তাপ নিয়ে মানুষের জ্বর আসে
সুরু হয় ভাঙচুর অন্তরালে
ইথারের ঢেউএ কান পেতে কম্পনের শব্দ শোনা যায়
হঠাৎ বিস্ফোরণে তীব্র আঁচে মাখনের মতো
দেহ গলে যায়, আকাশের সারা অঙ্গে নীল ফোস্কা
সূর্যের ছেঁদায়, সেই ক্ষত প্রতিভাত সমুদ্রে গোস্পদে
দ্বৈপায়ন মানুষের বিমূর্ত কামনা তাই
অন্তর্জলি রজকের পাটাতনে।

ব্রত চক্রবর্তী

সে কেন একাই

'নিঃসঙ্গতাই মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম কথোপকথন'—
একথা বলার সময় তার মুঠোয় ধরা ছিল বিষ।

সে মরে গেল—তবু নিঃসঙ্গতা রইল,
মৃত্যু রইল,
অনেক মানুষের পাশে একাকী মানুষের
কেঁপে-ওঠার বিপন্নতা রইল,
তবে তো সে একাই কেবল মরল অর্থহীন ভাবে।

সে মরে গেল তবু তো দু'টি মানুষের মধ্যবর্তী শূন্যতায়
সেতু গড়বার কোনো উদ্যোগ নিলো না পৃথিবী!

সে তবে একাই কেন ঝরে গেল জীবনের বৃন্দগান থেকে?

নিখিলকুমার নন্দী

ছিল বুঝি

দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পার হয়ে এসেছ কখন
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন বিকেল গড়িয়ে পড়ছে
গঙ্গাগোদাবরী সিন্ধুজলে ঘামে অশ্রুজলে গাল ও কপাল ;
আর কেন ?
শীর্ণজীর্ণ শরীরটা রাখো কোলে, হে উদ্‌ভ্রান্ত, শান্ত হও ঘুমোও নীরবে
ব'লে যে-মহিলা ধীরে নত হন তিনি তারা-খচিত আকাশ
মোলায়েম মিহি গন্ধফুলে এলোখোঁপার বাতাস আঁচল-ওড়ানো ;
এখনও কি খসে, ওড়ে ?
ঝঙ্কার-ঝঞ্ঝনাভারী অহঙ্কারী ছেঁড়া মেয়েমানুষের ভীড়ে
তিনি শুধু ইতস্তত একা।
তাকে ছেড়ে থাকা এই বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত জীবনে,
এই সাংঘাতিক বঞ্চনায়
সর্বব্যাপী, আরেক বঞ্চনা ভেবে, মানুষটা আত্মঘাতী, ঘুমোলো কি
সত্যিই ঘাসে
আকাশে বাতাসে জেনে সেই মানুষীর সেই মনীষার স্বার্থব্যর্থহীন
কোল, যা কোমল সংরাগে সংরাগে।
ছিল বুঝি ছিল বুঝি কোনোদিন বহুকাল আগে, এখন যা ঘাস ;
আকাশ বাতাস পুষ্পশ্বাস।

সাগর চক্রবর্তী

পরণ কথা

আমার দিদিমা দিদারা ছিলেন খুব আমুদে।
রাজ্যের পরণকথা আর রূপকথা ছিলো তাঁদের দখলে।
আঁতুর ঘর আর রান্না ঘর করতে করতে
কেঁকে যেতেন তবু মুখ থেকে হাসি

মুছতো না ; কপালের কমলা সিন্দুর ভোরের নদীর ওপর
ভিজে-ভিজে লাল সূর্যের মতো জ্বলতো।
আমার দিদিমা দিদাদের হাতে নোয়া শাঁখার সাথে
বেজে উঠতো সন্ধ্যায় তুলসীতলায় শাঁখ। তাঁদের
হাতের তেলোতে লেগে থাকতো
দুধের আর মাছের আর শাকসব্জির
তাজা গন্ধ ; তাদের জানা অগুন্তি পরিষ্কার শোলোক ছিলো।
আমি এখনও
আকাশে ফিনিক দিয়ে চাঁদ উঠলে
মাঠের ভিতর একা, বেশীরাতে
খই ফোটা জোছনায়
আমার শরীর থেকে তাঁদের গন্ধ উঠে-আসা টের পাই।
আমার দিদিমা দিদারা রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে
মাটিকে সাগ্রহে ছুঁয়ে
প্রণাম করতেন। তারপর সূর্যকে…

গোপাল ভৌমিক

আমি

নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী নই
গেরুয়া ও কমণ্ডলুধারী,
নিজের জৈবিক স্বার্থে
সাজতেও পারি না ভিখারী
যেহেতু আমি যে এক দায়বদ্ধ সামাজিক জীব
হাঁড়ি-কাঠে গলা দিয়ে
মনে মুখে যত বলি শিব শিব শিব
ভীরুতার অবসান হয় না কিছুতে।

নিশ্চিত সত্যের দিকে দুহাত বাড়িয়ে
অনিত্য এ দুনিয়ার
ততোধিক অনিশ্চিত সুখ দুঃখ
ভোগ করি তারিয়ে তারিয়ে
এমন সাহস নেই বলে
প্রায় যাই চোখ দুটি জলে ওঠে
এবং প্রতীতি হলে প্রতিকারে অপারগ আমি
হয়তো বা ভেসে যাঁয় জলে।

অতীন্দ্র মজুমদার

ঘরে-ফেরার কবিতা

১. আর নয়। এইবার ফেরার সময়॥

কতোটুকু দেখা হ'ল পৃথিবীর—কতোটুকুই বা!
বুড়ো হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পোষা কুকুর
মাঠভরা ট্যুলিপের সমারোহের মধ্যে দিয়ে—
আকাশ—মস্ত স্ফটিক গম্বুজ—তার ওপারে
কি আছে হয় কল্পনা করি—নয়তো একবারও ভাবি না—
তার চেয়ে বরং চেয়ে চেয়ে দেখি
জলে নামছে শিশু সমুদ্রের আহ্বানে॥

মাঠে জমলো জল। পাখিরা নামলো আকাশ থেকে,
গোল হয়ে ঘিরে বসে ধুয়ে নিল গা—তারপর
উড়ে গেল যব গাছের মাথায় জল ছিটিয়ে॥

দেখা হল তো সবই। এখন পার হচ্ছি প্রণালী,
খেয়া জাহাজে; বিকেল মুছে দিচ্ছে সন্ধ্যা।
ওপাশের ডেকের মহিলা দম বন্ধ করে বমি চেপে আছে,

পুরুষ দেখছে না—দেখলে গা ঘোলাবে।
আমি ভাবছি কারমেলিয়ার কথা—একুশ বছর আগে
যাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে এসেছি মেঘলা বিকেলে॥

প্রণালী পার হচ্ছি—দূরের তীর ধনুকের মতো বাঁকানো
ঝাপসা ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে হেলসিংবর্গের ফেরি॥

২. চলতে চলতে কোথায় যাবি? আর কতো দূর—
এই পৃথিবীর সঙ্গীহীনের দলে,
কোন্ ছায়াহীন মরুভূমির ওয়েশিসের পারে—
কিংবা সুদূর ঘরের পাশের নাভ্রিস্ক ছাড়িয়ে
জলজলে সেই মধ্যরাতের তারার আলোয় দীপ্ত তুন্দ্রাভূমি;
বল্গা হরিণ দল বেঁধে যায় বার্চ বনে শিঙ ঘষে;
নাচে তুষার-তটিনী তার অনঙ্গ মুদ্রায়—
যেখানে নীল সমুদ্র নাই অথবা সেই সমুদ্র তো আকাশ।
বাতাস কাঁপে দারুণ শীতে, ঝাঁপ দিতে চায় সূর্যের আগুনে,
চলতে চলতে কোথায় যাবি? কোন্ জনহীন
শুব্ধ গাঁয়ের শেষে
নীরবতার তীরের গুচ্ছ পিঠের ঝোলা
বাদামী রঙ তূণে॥

চলতে চলতে কোথায় যাবি? কোন্ ব-দ্বীপের ঝোপে—
যেখানে ওই শূন্য আছে পূর্ণ প্রেমে পাগল—
কোনখানে গান ছড়িয়ে দিবি সিঁদুর-মাখা মেঘে
কোনখানে তোর নীড়ে কাঁপে রাতের পদ্মদল।
কোথায় যাবি দূরের প্রেমে দূরে
ভোরের প্রেমে রাতে—
চোখ মেলে দেখ্ ঘর এসেছে দূরের রাস্তা দিয়ে
ডান হাতে তার দিনের জ্বালা, মধ্যরাতের চুমো
এনেছে বাম হাতে॥

ঠুম্‌রী গানের ঐতিহ্য

একদা ঠুমরীগানের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "......আশঙ্কা হয় এই যে, ইহার লোকরঞ্জকতা শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া কোন সময়বা ধ্রুপদ খেয়ালকে সিংহাসনচ্যুত করে।"[১] সত্যদ্রষ্টা মানুষ ছিলেন তিনি। তাই তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। যে-ঠুম্‌রী গান আগে দরবারে স্থান পেত না, যে-ঠুম্‌রীগান ওস্তাদরা গাওয়া দূরের কথা শুনতে পর্যন্ত ঘৃণা করতেন, সেই গান আজকের দিনে যে-কোন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানে একটি প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু বলে গণ্য করা হয়। মেহ্‌ফিলে ধ্রুপদ-খেয়াল-এর পর একটা ঠুম্‌রী না থাকলে যেন ষোলকলা পূর্ণ হয় না। সমঝদার শ্রোতারা যেন কি-একটা অভাববোধ করেন। এমনকি সাধারণ শ্রোতারা কোন ওস্তাদের ঠুম্‌রীগান না-জানাকে যেন একটা গুণের অভাব বলে মনে করেন। ধ্রুপদ-খেয়ালের উৎপত্তি নিয়ে যেমন পণ্ডিতরা গবেষণা চালিয়েছেন এবং নানা গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় বিশদ আলোচনা করেছেন, ঠুম্‌রী গান নিয়ে কিন্তু তেমন কিছু হয় নি। অথচ আধুনিককলে এ গানের জনপ্রিয়তার সঙ্গে অন্য কোন গানের তুলনাই চলে না। তবু ঠুম্‌রী গান নিয়ে বিশেষ আলোচিত না-হবার প্রধান কারণ মনে হয় দু'টি—প্রথমতঃ সঙ্গীতগুণীরা ও সঙ্গীতশাস্ত্রীরা এই গানকে কখনও শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করেন না। তাঁরা এই গানকে 'রঙিন' গানের শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ, ঠুম্‌রীগানের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে সঙ্গীতের 'অচ্ছুৎ' সমাজে। সুতরাং এহেন গানকে গোঁড়া সঙ্গীতশাস্ত্রীরা বা ওস্তাদেরা সঙ্গীত-শাস্ত্রের তালিকাভুক্ত করবেন, একথা কল্পনা করা ধৃষ্টতামাত্র। যাই হোক্, সব শিল্পের যেমন একটা ইতিহাস থাকে, শিল্প হিসেবে সঙ্গীতেরও একটা ইতিহাস থাকবে, একথা বলা বাহুল্য। বর্তমানকালে ঠুম্‌রীকে যখন সঙ্গীত হিসেবে গণ্য করা হয় (তা শাস্ত্রীয় হোক আর অশাস্ত্রীয়ই হোক), তখন অবশ্য তার একটা ইতিহাস থাকবে এবং আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আমাদের সীমিত

তথ্যরাশি থেকে এই গানের জন্মইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

এ প্রসঙ্গে আমরা উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর স্বনামধন্য দু'একজন সঙ্গীতগুণীদের ঠুম্‌রী গান সম্পর্কে উক্তিগুলির উল্লেখ করব এবং তার থেকে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব। এছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতেও 'ঠুম্‌রী'গানের উল্লেখ নেই।

প্রথমেই দেখা যাক্ উনবিংশ শতাব্দীর বরেণ্য সঙ্গীতগুণী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (১৮৪৬-১৯০৪ খৃঃ) ঠুম্‌রী গান সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন: "যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে, এবং আদ্ধা-কাওয়ালী ও ঠুংরী তালে গীত হয়, তাহাকে ঠুংরী গান কহে।...লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ঠুংরী গানের অতিশয় আদর হয়; এবং প্রসিদ্ধ শোরীও সেই দেশের লোক; এই জন্যই অনেকের বিশ্বাস যে, শোরী ঠুংরী রাগের না হউক, ঠুংরী গান প্রণালীর উদ্ভাবক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ শোরীকৃত টপ্পা হইতে ঠুংরী গানের রীতি অনেক পৃথক। তবে অবস্থা দৃষ্টে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, শোরীর টপ্পা আরোও সংক্ষেপ করিয়া লওয়াতে, তাহা হইতে ঠুংরী গানের উদ্ভব হইয়াছে।"[২] এখন তাঁর বক্তব্য থেকে আমরা কতগুলি জিনিষ পাই—১. ঠুংরী টপ্পার রাগিণীতে গাওয়া হয়। তার মানে টপ্পা যে-সব রাগ-রাগিণীতে গাওয়া হয়, ঠুম্‌রীও সেইসব রাগ-রাগিণীতে গাওয়া হয়। অর্থাৎ পিলু কাফী, মাণ্ড্, ভৈরবী, সিন্ধু, বারোয়াঁ, খাম্বাজ ইত্যাদি লঘু প্রকৃতির রাগ-রাগিণীতে গাওয়া হয়। ২. আদ্ধা-কাওয়ালী ও ঠুংরী তালে গাওয়া হয় এই গান। আদ্ধা-কাওয়ালী তাল আমাদের অজানা নয়, কিন্তু ঠুম্‌রী তাল? ভারতের কোথাও আমরা ঠুম্‌রী তালের প্রচলন আছে বলে জানি না, একমাত্র বাংলা দেশ ছাড়া; আসলে ঠুংরী বা ঠুম্‌রী কোন তালের নাম নয়। তখনকার দিনে ঠুম্‌রী গান কয়েকটি বিশেষ তালের ওপর (যেমন কার্ফা, দাদ্‌রা ইত্যাদি) বিশেষ ছন্দে গাওয়া হত, তাকেই ঠুংরী বা ঠুম্‌রী তাল বলা হত। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। ৩. লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ঠুম্‌রী গানের খুবই আদর। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ অতুলপ্রসাদ সেন। গ্রাম বাংলার ছেলে তিনি। বাল্যকাল থেকে যিনি বাংলার পল্লীসঙ্গীত,

কীর্তন প্রভৃতি গানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত এবং অভ্যস্ত ছিলেন, তিনিও কর্মোপলক্ষে লক্ষ্ণৌ গিয়ে ঠুম্‌রী গানের প্রতি এতখানি আকর্ষিত হয়েছিলেন যে, তাঁর রচিত এবং সুরারোপিত গানগুলির অর্ধেকেরও বেশী ঠুম্‌রী রীতি আশ্রিত। নিশ্চয় লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ঠুম্‌রী গানের ব্যাপক প্রসার এবং এই গানের একটা আঞ্চলিক স্বকীয়তা না থাকলে অতুলপ্রসাদ এই গানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতেন না। ৪. শোরী মিঞার টপ্পা রীতি থেকে ঠুম্‌রী গানের রীতির পার্থক্য অনেক। যাঁরা এই দু'প্রকার গান শুনেছেন তাঁদের কাছে এই পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই সহজ। তা'ছাড়া দু'রীতি সম্পূর্ণ পৃথক বলে দু'রীতির নামও স্বতন্ত্র। সুতরাং কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবিষয় সবাই আমরা একমত। ৫. সর্বশেষে লেখক জানিয়েছেন যে শোরী মিঞার টপ্পা গানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে যে নতুন রীতির গানের উদ্ভব হয় সেটাই সে যুগের ঠুম্‌রী গান। আমরা তাঁর এই মন্তব্যকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। এখন এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক্। প্রথমেই আমরা দেখি শোরী মিঞা-কৃত টপ্পা গানের বয়স কত? এ প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি, শোরী-সৃষ্ট টপ্পা রীতির আগেও কিন্তু টপ্পা গান ছিল। তখন এর নাম ছিল 'টপা' গান। এ খবর আমাদের জানিয়েছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী এবং ঔরঙ্গজেবের দরবারের গুণী এবং সঙ্গীতদর্পণ-কার ফকীরউল্লাহ্ সাহেব। যাই হোক শোরী মিঞার টপ্পার বয়স অনুমান করতে পারি তাঁর (শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের) গ্রন্থের (গীতসূত্রসার ১ম ভাগ) পাদটীকা থেকে। তিনি লিখেছেন, "প্রায় ৭৬ বৎসর অতীত হইল গোলাম নবী (শোরী মিঞা) ৫০ বয়ঃক্রমে লক্ষ্ণৌ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।[৩] তাঁর এই মন্তব্য থেকেই আমরা গোলাম নবী বা শোরী মিঞার অনুমানিক জন্ম ও মৃত্যুকাল পেতে পারি। গীতসূত্রসার গ্রন্থের (১ম ভাগ) প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ। সুতরাং শোরী মিঞার আনুমানিক জন্মসন (১৮৮৫—৭৬-৫০)=১৭৫৯ খৃস্টাব্দ এবং মৃত্যু আনুমানিক ১৭৫৯ খৃঃ+৫০ বৎসর=১৮০৯ খৃস্টাব্দে। কাজেই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমানে ঠুম্‌রী গানের জন্ম ১৮০৯ খৃস্টাব্দের পরই হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর অনুমান যে সত্য নয়, তার প্রমাণ হিসেবে আমরা ফকীরউল্লাহ্ রচিত "রাগদর্পণ" গ্রন্থে (আনুমানিক ১৬৩০ খৃঃ) এবং মীর্জা খাঁর রচিত "তুহ্‌ফাতুল্ হিন্দ্" গ্রন্থে (১৬৫০ খৃঃ-১৬৭৫ খৃঃ) ঠুম্‌রী

গানের উল্লেখের কথা বলতে পারি। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র এই গ্রন্থ দুটির সঙ্গীত-বিষয়ক অধ্যায়গুলি অনুবাদ করেছেন। তিনি তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের (মুঘল-ভারতের সঙ্গীতচিন্তা) মুখবন্ধে লিখেছেন—"মীর্জা খাঁ এবং ফকীরউল্লাহ্—উভয়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে টপ্পা এবং ঠুংরী বেশ পুরাতন গীত।"[৪] সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে ঠুম্‌রী গান শোরী মিঞার টপ্পার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়। তাছাড়া ঠুম্‌রী চল্ বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদেও যে প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণের অভাব নেই। স্বয়ং রাধামোহন সেনদাস তার "সঙ্গীততরঙ্গ" (১৮১৮ খৃঃ) গ্রন্থে ঠুম্‌রী গানের দু'একটি নমুনা দিয়েছেন। যেমন

ঠুংরী—আড়া তেতাল[৫]

শ্যামের বিরাগ রাধে! —করিছ কেমনে। ধ্রু।
গোপীর সমাজে বসি, সহাস্য বদনে॥
শ্যামের প্রেম-কাঞ্চন—কলঙ্কে জালিয়া,
সাধের সাঁচে ঢালিলে সোহাগে গলিয়া,
মোহনালঙ্কার করি, পরিলে মননে॥
মনো-যন্ত্রী—মর্ম্ম-রূপ যন্ত্র বাজাইয়া,
অনুরাগ-আলাপনে মোহিত হইয়া,
শ্যাম-গুণ গান করে মধুর ধরণে॥

সুতরাং শোরী মিঞার টপ্পার অনুকরণে বা অনুসরণে পরবর্ত্তীকালে ঠুম্‌রী গানের জন্ম হয়েছে, এমন অনুমান কোনভাবেই সঙ্গত নয়।

বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রাচীন সঙ্গীতগুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ মত পোষণ করে লিখেছেন: "ঠুম্‌রী, টপ্পারই শ্রেণীভুক্ত।"[৬] কিন্তু তাঁর মত গ্রহণযোগ্য কিনা উপরোক্ত আলোচনা থেকেই তা বোঝা যাবে।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বহু বাংলা সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থে "ঠুম্‌রী" রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। 'ঠুম্‌রী' রীতির গানের সঙ্গে অল্পবিস্তর আমরা সবাই পরিচিত। অথচ 'ঠুম্‌রী' রাগিণীর সঙ্গে? না, কোন ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রীয় গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। তবে কেন বাংলা দেশে 'ঠুংরী' রাগিণীর উল্লেখ পাই, অথচ এর রূপ পাই না কেন? আসলে

'ঠুম্‌রী' কোন এক বিশেষ রাগিণীর নাম নয়। 'ঠুম্‌রী' রীতির গান যে-সব রাগিণীতে গাওয়া হোত, সেই রাগিণীগুলিকে বাংলাদেশে 'ঠুংরী' রাগিণীতে আখ্যায়িত করা হ'ত। সঙ্গীততরঙ্গকার রাধামোহন সেনদাস 'ঠুংরী রাগিণীর ধারা'র উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

> ঠুংরী নামে—শ্যাম-কল্যাণের প্রমোদিনী।
> জাতি-লক্ষণেতে সম্পূরণ বিধায়িনী॥
> রূপের আঁধার দুই—বারোয়া বেহাগ।
> গানের সময় নিশি কিম্বা দিবা-ভাগ॥[৭]

স্পষ্টতই এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেকালে বাংলায় 'বারোয়া" এবং "বেহাগ" রাগে ঠুম্‌রী গাওয়ার রীতি ছিল এবং এই দু'টি রাগ বা রাগিণীকে 'ঠুংরী' রাগিণী বলা হত। অবশ্য অন্যান্য রাগ-রাগিণীকেও হয়ত বলা হত। যাই হোক্, এবারে প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক্।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী—২য় খৃষ্টাব্দ) থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে-কোন সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করে আমরা ঠুম্‌রী গানের উল্লেখ পাই না। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এই সময়কাল ব্যাপী একে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (অবশ্য এখনও একে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় না)। আবার ফকীরুল্লাহ্‌র "রাগদর্পণ" (১৭ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) গ্রন্থে বারোয়া-সম্পর্কিত ঠুম্‌রী গানের উল্লেখ দেখি। অথচ আবুল ফজল তাঁর "আকবরনামা" এবং "আইন-ই-আকবরী"তে (১৭শ শতাব্দী) শাস্ত্রীয় গীতিধারার বাইরেও যে-সব রীতি ছিল, তিনি তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঠুংরীর উল্লেখ করেননি। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে, ঠুম্‌রী গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। কাজেই ঠুম্‌রী গানের জন্ম তার কিছু আগে হওয়া স্বাভাবিক। আর সে গানের কদর যখন রাজদরবারে অথবা নগরবাসীদের কাছে প্রাথমিক অবস্থায় হয়নি, সুতরাং তাকে লৌকিক গীতিধারার অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচিন হবে না। এছাড়া এই অনুমানের পেছনে আরেকটি কারণ হল যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বা সঙ্গীতবেত্তা এই গানকে "রঙীন গান" (লঘু সঙ্গীত) রূপেও

উল্লেখ করেননি। সুতরাং যে গান শাস্ত্রীয় নয়, আবার লঘুসঙ্গীতও নয়, তাকে লৌকিক বা পল্লীগীতির পর্য্যায়ভুক্ত ছাড়া আর কি করা যেতে পারে।

এখন দেখা যাক্‌ 'ঠুম্‌রী' শব্দটি থেকে এই গানের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি-না। 'ঠম্‌কী' শব্দটির অর্থ এক বিশেষ ছন্দের চলন। নৃত্যশীলা রমণীদের বিশেষ ছন্দের চলনের ক্ষেত্রেও 'ঠুমক্‌' বা 'ঠম্‌কী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ডি. ভি. পুলস্কর গীত সেই বিখ্যাত ভজন গান—"ঠুমক্‌ চলত রামচন্দ্র" গানটিতে ঠুমক শব্দটি বিশেষ ছন্দে গমন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, 'ঠম্‌কী' শব্দ অপভ্রংশে ঠম্‌রী বা পরবর্ত্তীকালে ঠুম্‌রী গান হয়েছে। কাজেই এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না যে, 'ঠুম্‌রী' গান প্রাথমিক অবস্থায় নৃত্যসহ পরিবেশিত হ'ত।

মধ্যযুগের শেষপাদে বহু প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে 'ঠুম্‌রী তালের উল্লেখ দেখা যায়, যদিও 'ঠুম্‌রী' নামে কোন শাস্ত্রীয় তাল নেই। যে সকল পদকর্তা তাঁদের রচিত গানের শীর্ষদেশে 'ঠুম্‌রী' তালের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা কিন্তু 'ঠুম্‌রী' তালের কোন সর্বমান্য ঠেকা বা মাত্রা-সমষ্টির উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ 'ঠুম্‌রী' তালকে ৬ মাত্রার তাল হিসেবে, কেউ আবার ৮ মাত্রার তাল হিসেবে, আবার কখনো কখনো ১৬ মাত্রার তাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং অবস্থা বিশেষে অনুমান করা যায় যে, 'ঠুম্‌রী' একটা বিশেষ ছন্দের নাম, তালের নাম নয়। 'ঠুম্‌রী' একটি লঘুচালের গান। কাজেই সেই লঘু চালের গানে ব্যবহৃত লঘু প্রকৃতির তালগুলিতে এক বিশেষ ছন্দ-প্রকরণ করা হ'ত বলে মনে করা যেতে পারে। আমি অবশ্য বর্তমানকালের প্রচলিত ঠুম্‌রীর কথা বলছি না, বলছি ঠুম্‌রীর শৈশব অবস্থার কথা। যাই হোক্‌ লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্‌ (যাঁকে অনেক আধুনিক পণ্ডিতগণ ভুলক্রমে 'ঠুম্‌রী' গানের জনক বলে মনে করেন)-এর স্বরচিত ঠুম্‌রী গানের উল্লেখ করে, এই গানের ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকদের অবহিত করছি—

| | | |

ব ব ছো ০ ড়্‌ চ লে ০ ল খ্‌ নৌ ০ ন গ রী ০

| | | |

ক লু হা ০ হু আদ ম্‌ ০ প র ক্যা ০ গু জ রী ০"[৮] ইত্যাদি

অর্থাৎ প্রতি চার মাত্রায় ৩টি করে অক্ষর এবং ১টি অবগ্রহ আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উনবিংশ শতাব্দীর ঠুম্‌রী তালের বা ঠুম্‌রী অঙ্গের বহু বাংলা গানে এই প্রকার ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৩৭-১৯১৯ খৃঃ) রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

" | | | | ",৯

প্র ভু মং ০ গ ল শা ০ ন্তি সু ধা ০ ম য় হে ০ ইত্যাদি।

অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গানটির কথা ধরা যাক—

" | | | | ",১০

শু ভ ক ০ র্ম প থে ০ ধ রো নি ০ র্ভ য় গা ন্ ইত্যাদি।

মোট কথা উপরে প্রদর্শিত ছন্দটি উনবিংশ শতাব্দীতে অথবা তারও আগে ঠুম্‌রী জাতীয় গানে বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই ছন্দের ব্যবহার উত্তরভারতের যে-কোন অঞ্চলের লোকগীতিতে অতি প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে, একথা লোকসাহিত্যের বা লোকসঙ্গীতের গবেষকরা একাধিকবার প্রমাণ করেছেন। তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনার জাল বিস্তারিত না-করেও বলা যায় যে, 'ঠুম্‌রী' গানের উৎসটি লুকিয়ে আছে উত্তরভারতের লোকসঙ্গীতের মধ্যে এবং অবশ্যই লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে। বাংলা দেশের লোক-সঙ্গীত ও কীর্তনগানের মধ্যেও প্রাচীনকাল থেকে এই ধরণের ছন্দ-প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে উপরে বর্ণিত ছন্দটি অত্যন্ত লঘু বলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তেমনভাবে ব্যবহার করা হ'ত না বা এখনও ব্যবহার করা হয় না। এই ছন্দটিকে সংস্কৃতকাব্যে 'তোটক' ছন্দ বলা হয়।

অনুমান হয় 'ঠুম্‌রী' গানের শৈশব অবস্থায়, দরবারের নটীরা উচ্চাঙ্গ ও শাস্ত্রীয় নৃত্যগীত পরিবেশন করার পর, সমকালীন রীতি অনুসারে হাল্কা গান (অর্থাৎ গজল, টপ্পা, তেলেনা ইত্যাদি চটুল প্রকৃতির গান) পরিবেশন করতেন এবং সেই সময় হয়তো তাঁরা মাঝে মধ্যে দু'একটি হাল্কাচালের 'ঠুম্‌রী' গান নৃত্যসহযোগে পেশ করতেন। তবে হয়তো বিশুদ্ধ পল্লীসুরে নয়। দরবারে হত বলে গানগুলি রাগাশ্রিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং অনুমান হয়, সেগুলি সবই লঘু-প্রকৃতির রাগ-রাগিণী। পরবর্তীকালে 'ঠুম্‌রী' গান যখন নবাব-বাদশাদের প্রিয় হয়ে উঠল, তখন স্বাভাবিকভাবেই গানের চেহারা ও প্রকৃতিরও

কিছু রূপান্তর ঘটল। গানের মধ্যে রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ-কৌশল, ছন্দবৈচিত্র্য এবং অলঙ্কারের ব্যবহার বেড়ে গেল। 'ঠুম্‌রী' গান ঠিক তখন থেকেই (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দী) একটা পরিষ্কার রূপ গ্রহণ করল। আর সেই রাগ-রাগিণী আশ্রিত ও ছন্দ অলঙ্কারযুক্ত গান নৃত্যসংযোগে গাওয়া সম্ভব হ'ল না বা অসুবিধে দেখা দিল। সুতরাং বসে 'ঠুম্‌রী' গাওয়ার রীতি চালু হ'ল। বসে গাওয়ার ঠুম্‌রী রীতিকে বলা হ'ত "বৈঠ্‌কি ঠুম্‌রী"। কালের অগ্রগতি এবং রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বা নেচে ঠুম্‌রী গাইবার রীতি কালগর্ভে হারিয়ে গেল, আর বেঁচে রইল "বৈঠ্‌কি ঠুম্‌রী"। এ প্রসঙ্গে শ্রী শান্তিদেব ঘোষের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

"ঠুংরীর আসলে উৎপত্তি লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে নবাবী দরবারের নাচের গানের সঙ্গে। এ গানের প্রেরণার মূল উৎস লোক সংগীত। দরবারে স্থান পেয়েই ধীরে ধীরে তার জাতের বাধা দূর হয়ে গেল। দরবারে বেশির ভাগ ঠুংরী হত মধ্য ও দ্রুত লয়ে। কথক ও বাঈজীরাই নৃত্য ও অভিনয়ের সময় এই ধরণের ঠুংরী গায়।"[১১] এরপর ঠুম্‌রী গান শৈশব থেকে কৈশোরে উপনীত হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এ সময় এই গানের উপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এই কাজে এগিয়ে এলেন দরবারের নটী ও সঙ্গীতোপজীবিনীদের পরিবর্তে দরবারের ওস্তাদ ও কলাবন্ত্‌রা তখন ঠুংরী গানে যুক্ত হল 'বোল-বানানা', 'মুরকী', 'গিটকিরি', 'জম্‌জমা' এবং 'মীড়' প্রভৃতি অলঙ্কার এবং খেয়াল গানের মত পদের টুক্‌রো টুক্‌রো অংশ দিয়ে সুরের বিস্তার। এই রীতির ঠুম্‌রী গানের নাম হ'ল "ঠাহকী ঠুংরী"।[১২] এই পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় ধ্রুপদ-খেয়ালের মত ঠুম্‌রীগানের "ঘরানার" উদ্ভব। যেমন, লখ্‌নো-ই ঠুম্‌রী, বেনারসী ঠুম্‌রী, পাঞ্জাবী ঠুম্‌রী ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে "ঠুম্‌রী" গানের আরেক ধাপ উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। বিলম্বিত লয়ের ধ্রুপদ-খেয়ালের মত বিলম্বিত লয়ের ঠুম্‌রী। এই ঠুম্‌রী রীতির প্রধান প্রচারক হলেন ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও। একে বলা হয় "লচাও ঠুম্‌রী"। এই রীতির বৈশিষ্ট্য হল, একই গান প্রথমে বিলম্বিত লয়ে এবং পরে দ্রুত লয়ে গাওয়া। বর্তমানে "লচাও ঠুম্‌রী"র প্রচলন সবচেয়ে বেশি। অবশ্য "ঠাহকী ঠুম্‌রী" এখনও

প্রচলিত। তবে ধীরে ধীরে তা' 'কাজরী' ইত্যাদি গানের সঙ্গে মিশে গিয়ে অভিন্ন হয়ে পড়ছে। এই হল ঠুম্‌রী গানের একটা মোটামুটি ইতিহাস। এরপর আমরা ঠুম্‌রী গানের বিষয়-বস্তু নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

ঠুম্‌রী গানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "ইহার বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার লীলাবর্ণন।"[১৩] শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতনায়কের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণরূপে একমত না হলেও, আংশিকভাবে একমত। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ঠুম্‌রী গানের পদকর্তা যদি হিন্দু হন, তাহলে গানের বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণন। কিন্তু যদি পদকর্তা মুসলমান অথবা অন্য ধর্মাবলম্বী হন তাহলে তিনিও কি গানে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করবেন? ওয়াজেদ্ আলি শাহ্‌র গানের উল্লেখ করা যেতে পারে:

খাম্বাজ ঠুম্‌রী[১৪]

নেমক হারামনে মুলুক বিগাড়া।
হজরত যাতে হৈঁ লণ্ডনকো।
মহল মহল মে বেগম রোয়ে
গলি গলি রোয়ে পাটুরিয়া॥

মোট কথা 'ঠুম্‌রী' হল একটা রীতি। টপ্পার মত এই রীতিতে সাধারণতঃ প্রেম-সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে, তা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম সঙ্গীত বা অন্যান্য বিষয়ের গান হোক্ তাতে কিছু যায় আসে না। এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একটা করুণ-রস সৃষ্টি করা এবং আবেগময় সুরে তা প্রকাশ করা।

উল্লেখপঞ্জী ১. ২. ৩. গীতসূত্রসার (২য়)—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. মুঘলযুগের সঙ্গীতচিন্তা—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। ৫. সঙ্গীত-তরঙ্গ—রাধামোহন সেনদাস। ৬. সঙ্গীত মঞ্জরী—রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭. সঙ্গীত-তরঙ্গ—রাধামোহন সেনদাস। ৮. রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিচিত্রা—শান্তিদেব ঘোষ। ৯. ব্রহ্ম সঙ্গীত স্বরলিপি (১ম খণ্ড) ১০. স্বরবিতান—৪৭, ১১, ১০. রবীন্দ্রসংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। ১৩. সংগীতচন্দ্রিকা—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪. শিশির স্বরলিপি—শিশির কুমার ঘোষ সম্পাদিত।

প্রদীপকুমার ঘোষ

কমলকুমার মজুমদার -এর গদ্য

বেশ কিছুদিন আগে কোনো একটি বাংলা উপন্যাস পড়তে গিয়ে হঠাৎ আমি যেন দীর্ঘ কয়েক যুগ পেরিয়ে গিয়েছিলাম তার গদ্য ভঙ্গিতে। প্রথমে মনে হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো লেখা পড়ছি না তো? পরে চিন্তা করে দেখলাম, এ লেখা বঙ্কিমী তো নয়ই—এমন কি সে যুগেরও নয়। শুধু ওই ভঙ্গি ছাড়া ওই লেখা সর্বতোভাবে আধুনিক যুগের সাহিত্যকেই বহন করছে। তখন স্বভাবত ভাবতে বসলাম—এই লেখার গঠনরীতি লেখক এমন করলেন কেন? তিনি কি কোনো চমক দিতে চেয়েছেন পাঠককে, না বর্তমান আধুনিক-বাংলা ভাষাকে উপহাস করেছেন?

এ দুটোর কোনটাই যে তাঁর উদ্দেশ্য নয়—উপন্যাসটি শেষ করে বুঝতে পারলাম। সেই সঙ্গে মনে হল আমি অভিভূত হয়ে গেছি। আত্মস্থ হয়ে উপলব্ধি করলাম, সত্যি বোধ হয় ঐ উপন্যাসটি এমন ভাষায় ছাড়া রচনা করা যেত না। লেখক নতুন যুগে অনবদ্য এক ঢংয়ে সাহিত্যর দিগন্তকে যেন বিস্তৃত করে ধরলেন।

ভাষার সেই নমনীয় মুগ্ধতার সঙ্গে সুদূরপ্রসারী ছবি আর চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প দিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে লেখক রচনা করেছেন অনবদ্য কিছু ছবি। পর পর প্রতিটি ছবি নিপুণভাবে একই সূত্রে গ্রথিত।

বাংলা গদ্য লিখতে বসে এমন করে ছবি আঁকা আর বিশেষ দেখি নি। এই প্রথম পড়বার আগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাই এমনই অফুরন্ত ছবি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম।

এই উপন্যাসে একাধারে যেমন ছবির সমারোহ ছিল তেমনি কবিতার অপরিসীম অনুভূতি। ওই গথিক রীতির পুরনো বাংলা গদ্য যেন গলে গলে কবিতার রূপ নিয়ে ছবির রঙকে ঝলমলিয়ে তুলেছিল।

লেখকের নাম কমলকুমার মজুমদার। আর যে গ্রন্থটির কথা বললাম তার নাম 'অন্তর্জলি যাত্রা'। কমলকুমার মজুমদার খুব বেশি লেখেন নি। তাঁর রচনা অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় নগণ্যমাত্র। কিন্তু নিজস্ব ঢং ও শিল্পরীতির

বিশিষ্টতায় ওই সামান্ত রচনাই অসামান্ত। তিনি ছিলেন সাহিত্যিকের সাহিত্যিক, কবির কবি। তাই সাধারণ্যে তাঁর তেমন জনপ্রিয়তা ঘটে নি। অথচ লেখকদের কাছে, বিশেষ করে আধুনিক লেখকদের সামনে তিনি ছিলেন উপাস্ত।

বাংলা গদ্যকে সম্পূর্ণত এমন এক বিপরীত পথে নিয়ে গিয়ে তিনি যে নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছিলেন, সেখানে তিনি ছিলেন অধীশ্বর। এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই একই ভাবে নিরলস সাহিত্য সাধনা করে সাহিত্য-জগৎকে আমূল কাঁপিয়ে দিয়ে গেছেন।

কমলকুমার মজুমদারের লেখায় প্রথমত যে প্রসাদগুণ তা হল একজন কবি বা দার্শনিকের অনুভূতিপ্রবণ মানসিকতার সার্বিক উন্মোচন। মায়াময় এক জগতে পাঠককে নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর রচনার ভেতর অবগাহন করিয়েছেন। তাঁর উপলব্ধি, সৃষ্ট চরিত্রের সুখ দুঃখের শরিক করে ফেলেছেন।

কমলকুমার মজুমদার খুব কম লিখলেও লিখেছেন কিন্তু দীর্ঘকাল। এই বহমান সময়ে নিজের লেখায় তিনি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর ওই অননুকরণীয় গদ্যরীতি একদিনে সম্ভব হয় নি। যেমন তিলে তিলে তিলোত্তমা হয় তেমনিই তিল তিল করে কমলকুমার তৈরি করেছিলেন তাঁর এই অবাক গদ্য।

প্রথম জীবনের তাঁর লেখা গল্প লাল জুতো যেমন চলতি সহজ গদ্যে লেখা তেমনিই। এরপর তিনি দুটি সুন্দর গল্প লেখেন 'দেশ' পত্রিকায়। মতিলাল পাদরি ও তাহাদের কথা। এই দুটি গল্পও আজকের বাংলা গদ্যে লেখা। যদিও এখানেও ছবি রচনায় তাঁর শিল্পী মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এরপরই শুরু হয় নতুন গদ্যভঙ্গি। যে গদ্যের তুলনা বিরল বর্তমান বাংলা সাহিত্যে। সবচেয়ে মজার কথা, কেউ এই গদ্যভঙ্গি অনুকরণের চেষ্টা করেন নি, কারণ কমলকুমার মজুমদারের লেখা এককাত্র তিনিই লিখতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

অজয় দাশগুপ্ত

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
প্রেসের ফোন : ৩৫-১০৮৭ । উত্তরসূরি : ৫২-২৪৫২

এই দুনিয়ার সকল ভাল,···

পোলাও ভাল কোর্মা ভাল···

মাছ পটোলের দোল্মা ভাল·

খাস্তা লুচি বেলতে ভাল,···

কিন্তু সবার চাইতে ভাল— ··

পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।

সুকুমার রায় কিন্তু লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন
ভীম নাগের সন্দেশের কথা, যা সবার চাইতে ভাল।

●

কবিতাগুচ্ছ : স্তবক ১

সৌমিত্র দাশ মেঘ মুখোপাধ্যায় কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় শুক্লা দে আলিঙ্গন চক্রবর্তী মানস ভাণ্ডারী নারায়ণ ঘোষ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শঙ্করনাথ চক্রবর্তী অরুণা বসু গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী শুভ্রা ঘোষ অহর সেনমজুমদার সত্যসাধন চেল কৃষ্ণসাধন নন্দী ব্রত চক্রবর্তী।

[৯৩-১০৫]

কবিতাগুচ্ছ : স্তবক ২

কল্যাণ সেনগুপ্ত শান্তিকুমার ঘোষ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় বাসুদেব দেব মনুজেশ মিত্র বিজয়কুমার দত্ত পরেশ মণ্ডল বিমান ভট্টাচার্য মুরারিশংকর ভট্টাচার্য মঞ্জুভাষ মিত্র [১০৬-১১৩]

কবিতাগুচ্ছ : স্তবক ৩

দীপঙ্কর সেন শ্যামলকুমার বিশ্বাস অরুণা মুখোপাধ্যায় সুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব মুখোপাধ্যায় অনিল কর্মকার পার্থ মুখোপাধ্যায় গোকুলেশ্বর ঘোষ ঈশ্বর ত্রিপাঠী কিরণশঙ্কর মৈত্র সুকুমাররঞ্জন ঘোষ সাগর চক্রবর্তী বিপ্লব ভট্টাচার্য সমরেশ দাশগুপ্ত দেবাশিস প্রধান অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় নীনা বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রা অধিকারী বিশ্বনাথ দাস রথীন সেনগুপ্ত কৃষ্ণা বসু গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অভী সেনগুপ্ত অমিতাভ রায় সন্তোষ চক্রবর্তী শান্তনু প্রামাণিক সুকৃতি আচার্য জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী জয়তী রায় শিবায়ন ঘোষ মুকুল চট্টোপাধ্যায় পার্থসারথি ভট্টাচার্য অমরনাথ বসু বিকাশ সরকার নাসের হোসেন আশিস দাস পবিত্র দত্ত শৌভিক রায়চৌধুরী কৃষ্ণা দত্ত [১১৪-১৪১]

কবিতাগুচ্ছ : স্তবক ৪

কবিতাগুচ্ছ : স্তবক ৫

কবিতাগুচ্ছ ; স্তবক ৬

কিছু স্মৃতি

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

৯ বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড কলকাতা ৫০ ॥ ফোন : ৫২-২৪৫২

সৌমিত্র দাশ

কালপুরুষের কটিবন্ধ

আমরা এগারো জন কালপুরুষের দিকে
তাকিয়ে ছিলুম সেদিন রাত্তিরে। তারপর
দশ জন দশ দিকে ছুটে যায়, একজন
কোথায় যে আপাত হারিয়ে নিরুদ্দেশ
আজও তার হদিস পাইনি।

এখন নদীর প্রান্তে একাকার বাঁশবন
জলতলে তার ছায়া ক্রমশঃ হাঁটছে
অচেনা অদেখা কোন
সুবর্ণ-পুরীর খোঁজে!

এ রকম খাপছাড়া বাজি রেখে আমরা সবাই
কালপুরুষের কটিবন্ধে চোখ রাখি
রেখাবদ্ধ করে যাই প্রতিটি ঘরের দরজা ও জানালা–
নেপথ্যে কে যেন বলে ওঠে 'হল না, হল না'
প্রত্যেকে এ ওর দিকে চকিত তাকাই,
'কোথায় পূর্ণাবয়ব!'
চিরদিন অবেলায় সে যেন সুদূর, আহা

ইথারে কাঁপছে মহাজাগতিক রশ্মি

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টির কবিতা

.গরম দুপুরের পর আজ বিকেলে যখন বৈশাখের বৃষ্টি নামল, আশ্চর্য
আবছা খোলা বারান্দায় আমি বসে আছি
চারপাশে আলোর শব্দসুন্দর বর্ষণ
গাছপালার উন্মাদ হুল্লোড়
বৃষ্টির মদ্যপানে দুর্দান্ত দাপাদাপি মাতলামির একশেষ
কোমল সুস্বাদু ঝাঁটে ভিজে যাই
নীল নগ্ন বিদ্যুৎ শিউরে ওঠে অলৌকিক নাচের মুদ্রায়

আমারও গাছগুলোর মত উদ্দাম মাতাল হয়ে
বিদ্যুতের মত নীল নগ্নতায়
নেচে উঠতে ইচ্ছে করে বৃষ্টির মতো নিষ্পাপ সারল্যে

অথচ পরিপূর্ণ কবিতার মধ্যে বসে থেকেও আশ্চর্য
কী আশ্চর্য আমার মনে একটাও কবিতা আসে না
আজ এই বৈশাখের কাব্যময় শব্দ-সুন্দর বিকেলে।

-

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

শীতের সাঁকো

তবে কি জীবনভর খুশি দিয়ে ভরে নেব মুঠি
সে যেমন রেখেছে ভরিয়ে
উত্তাল জীবনযাত্রা, আফিমফুলের ফাঁকে ফাঁকে
বিজাতীয় লোকযান

এইভাবে ভরে থাকা যায়

এইভাবে কোনক্রমে তিলে তিলে ভুলে যাওয়া যায়
আসন্ন শীতের রৌদ্রে কচুরিপানায় ঢাকা মাঠ,
পিপ্পলি, ফুলেল তেল, আমলকির আস্বাদ্য ভেষজ,
দুপুরে ক্লান্তির সুখ ;
'আস্বচ্ছ গানের বেলা এল',
এই বনে ডাকে কেউ ঝরন্ত বাদামতলা থেকে

তাই সে হঠাৎ বুঝি জীবনের কাঁধে ভর দিয়ে
অনায়াসে পার হয়ে গেল এই শীতের সাঁকোটি

শুক্লা দে

প্রশান্ত আগুন

এই মাত্র আমার বুকে ফুটে উঠলো
একটি গোলাপ
এই মাত্র এক ঝাঁক পাখির পালক
বিশিষ্ট সংলাপ পার হয়ে গেল
এক লোহিত সাগর
নির্জন সন্ধ্যার অনুকূলে

কী আনন্দ কী আনন্দ
প্রকৃত পূর্ণের পথে ব্যাপ্ত হয়ে পড়া
কে কোথায় আছ দেখে যাও
আনন্দ আনন্দ কাকে বলে
গুহার ভিতর থেকে কিভাবে ছড়িয়ে যায়
প্রশান্ত যায়

আলিঙ্গন চক্রবর্তী

ফিংগারপ্রিন্ট

কম্পাসের ওপর তার ফিংগারপ্রিন্ট আছে। ছুরির ওপর
তার ফিংগারপ্রিন্ট ছিল। লণ্ঠনের হাতলে তার ফিংগারপ্রিন্ট
থাকবে। সে একজন মানুষ।

কম্পাসের সাহায্যে সে সূর্যোদয় দেখে। সূর্যাস্ত দেখে।
ছুরির সাহায্যে সে মুরগী কাটে। পায়জামার ফিতে
কাটে। লণ্ঠনের সলতে কাটে।

ইদানিং লণ্ঠনপ্রেমী মানুষটা গভীর রাতে মোরগের
শরীরে তার ফিংগারপ্রিন্ট দেখতে পায়। সে এখন
মোরগপ্রেমী।

মোরগের মত সিকি-ভোরে উঠে সে এখন মোরগের
পাশে ঘাড় তুলে দাঁড়ায়। মোরগ ডেকে ওঠে
মোরগীয় ভাষায়। সে একজন মানুষ।

মোরগের পাশে দাঁড়িয়ে ফিংগারপ্রিন্ট মিলিয়ে কিভাবে
সে ডাকবে? কাকে ডাকবে? কোন ভাষায়?

মানস ভাণ্ডারী

অর্গল

সব দরজা বন্ধই থেকে গেলো
কিছুই খোলা হোলো না
জংধরা কপাট খুলবে না কিছুতেই

অথচ আমার জানালার পাশেই
এতো জ্যোৎস্না, থৈ থৈ আকাশ, গাছ, মাঠ, পুকুর
সবকিছুই

কিছুই দেখা হোলো না
একটু দূরেই মালা হাতে যে মেয়েটি অপেক্ষা করছে
সে-ও রইলো অনাবিষ্কৃত
অথবা যে শঙ্খচিলের ডানা জ্যোৎস্না দিয়েছে ধুয়ে
তাকেও তো দেখলুম না

ঈশ্বর! আমার আকাশ শুধু অন্ধকার
সেই থেকে আমার কোনো অর্গলই খুলতে পারি নি

নারায়ণ ঘোষ

চলে যায়

কেউ কেউ চলে যায়।

কেউ চলে গেলে আমি বসে পড়ি
শিথিল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দীর্ঘতর শ্বাস ছেড়ে
চলে যায় ট্রেন
শুকনো রুটির মতো পড়ে থাকে ঝরাপাতাগুলি।
হাত থেকে গড়িয়ে যায় সুতোর মসৃণ গুটি
হারিয়ে যায় খেই

কেউ কেউ এভাবেই চলে যেতে চায়

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

রক্তজবা নারী

বৃষ্টি নামছে······পাহাড়তলির নদী
লাফ দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে অথৈ সমুদ্রে,
রাঙা মাটির টিলায় টিলায়, শালবনে বস্তিতে
ধূসর শৈশব বাতাসে নেচে বেড়ায় গান গায়
বৃষ্টির সাথে তিতিরের সাথে।

বৃষ্টিতে স্নান করে এলোচুলে হেসে উঠছে রক্তজবা নারী

পাপড়িতে লুকিয়ে থাকা মুখর যৌবন
ছিঁড়ে ফেলছে প্রতীক্ষার প্রহর
ছুঁড়ে মারছে তির্যক দৃষ্টি।

বৃষ্টি নামছে······পাহাড়তলির নদী
লাফ দিতে দিতে পৌঁছে যাচ্ছে সমুদ্রে
প্রেমে ভালবাসায় রক্তজবা নারী ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে
প্রতীক্ষার প্রহর।

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যরাত

স্লুইশ গেটের শব্দে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়।
বুকে বড়ো ব্যথা। মনে পড়ে একদিন অইখানে
বেড়াতে গিয়েছি। জ্যোৎস্নায় জলমাটি একাকার।
হু হু হাওয়ায় গান ডুবে যায়। একাকি দেখেছি আমি।

সংগে ছিলো না কেউ কথা শোনবার।
আত্মহত্যা মহাপাপ জেনে মনে মনে এক হাজার
আত্মহত্যা করে অই ফেনা, ঘূর্ণ্যমান জল,
বালির গভীরে আমি শান্তি পেয়ে গেছি।

মাঝরাতে ফিরে আসে দূরের শব্দরা, ক্রমাগত কাছে ডাকে।
ওরা জানে মধ্যরাতে তুমি কাছে নেই।

ঘর ছেড়ে পালাবার এই হোল প্রশান্ত সময়।

শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী

পরবাসে পুতুল মেয়েটি

সারাদিন চাপা বাতাসের ভেতরে শব্দ সারাদিন
সারাদিন পাহাড়তলির কালো আকাশে তোমার ঘরের কাছে
নাচ ভাঙছে মেঘকন্যা
সারাদিন খেলনাচোখে কী বিষণ্ণ দোলা দোল খাচ্ছে ঝিনুক পোষাক
সারাদিন বৃষ্টি আর বৃষ্টির জলে ভাঙা জলের শব্দ শুনছো একা

বড়গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নষ্ট জন্মদাগটুকু ধুয়ে ফেলছে
পরবাসী পুতুলমেয়েটি

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

১. ফণিমনসার দিকে ক্রমে চোখ এগিয়ে যাচ্ছে।

মাথায় রক্ত উঠেছে অনেকক্ষণ
চারদিক দেখে নিয়ে
সে টিপে ধরলো গলা
টগ্‌বগে সোডা লাফিয়ে উঠলো।

ফণিমনসার ঝোপে গত শীতে কিছুটা মৃত্যু, কিছুটা নির্বাসন।

২. উড়নচণ্ডীর লাফ নেই
স্থির তার কথা এইখানে
সেইসব অভ্রদানা সরিয়ে দিয়েছে সব বন্দুকের হিম
আছে ঘুঙুর-পায়ে নদী, পাশে নোটন বুকের
নিঃশ্বাস-পতনের শব্দ
আর এই দেখে উঠে আসছেন কালিদাস
অত্যন্ত হলুদ পাতা হতে।

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

ঋণী ক'রে

'আমাকে চেনার কিছু নেই'—
এই তাঁর শেষ পদক্ষেপ ;
আমিও বুনেছি বীজ, অন্ধকারে
লণ্ঠনবিহীন,
কখনো সে যদি আসে
ঋণী ক'রে রেখে যাবো ঋণ॥

অরুণা বসু

তুমি আসবে বলে

বিশ্বাস করো দেবদূত,
তোমার কথা ভেবে-ভেবে
জাগতে পারিনি
ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে অসহায়
বৃক্ষের মত ঠায় জেগে দাঁড়িয়েছিলাম।
বিশ্বাস করো দেবদূত,
রাত্রির মরুভূমির অন্ধকারে
একটানা তৃষ্ণার হাহাকারে
চেয়েছিলাম তোমার কাছে একটু জল,
রাত পোহাবার প্রতীক্ষায় শুধু।

গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙেছে

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙেছে
নড়ছে কড়া, নাড়ছে কি কেউ
নাড়ছেই তো নইলে এত শব্দ কিসের ?

একটি রাতেই সাতটি নারীর সাতটি চিঠি ?
সাবাস্ যুবক।
একটি নারীর একটি কথায় পাগল আমি
সাতটি নারীর সাতটি কথা ভাববো কখন ?
ধৈর্য বটে যুবক তোমার। একই সাথে
সাতটি নারীর কথাই তুমি ভাবতে পারো।

সপ্তরথীর ব্যূহের ভিতর
একলা কিশোর যুদ্ধ করে,
সাবাস জোয়ান, সাহস বটে
সপ্তরথীর চোদ্দটি তূণ। সাতটি ধনুক
ঈষৎ বাঁকা। সপ্তরথীর ব্যূহের ভিতর
একলা কিশোর যুদ্ধ করে।

সাতটি রূপেই একটি নারী,
দশানন নয় তবুও যে তার দশটি আনন
একটি মুখে হাসছে, যখন অন্য মুখে সাপের ছোবল
খোলস ছেড়ে প্রিয় নারী
পত্নী থেকে মা হয়েছে।

বুকের ভিতর নড়ছে কড়া
বাইরে থেকে ডাকছে কি কেউ
প্রিয়তমা নারীর বেশে বুকের ভিতর শব্দ তুলে
একলা নারী মধ্যরাতে
মনের দোরে কড়া নাড়ে
পাশেই শুয়ে প্রিয় নারী
ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখি।

শুভ্রা ঘোষ

সপ্তকের একটি

যে সব রাতে একটি তারা দেখা যায়
দুর্লভ সেই সব রাত
যে শব্দ অনুনাদ হয়ে যায়
দুর্ভর শ্রুতির আঘাত !

যে আলোক মুকুর হয়ে চোখে আসে
শুধু আলোর মহিমায়
যে বিস্মৃতি স্বপ্ন বয়ে মনে আসে
সে যন্ত্রণা ছোঁওয়ানো ভূমায়।

জহর সেনমজুমদার

মা

শুকনো কলাপাতায় আগুন জ্বালো মা
সেই আলোয় আমি অন্ধকার দেখি
দূরে দিনের পঞ্চমবার বেজে ওঠে আজানের সুর
গাছের পাতায় নৈঃশব্দ্য
মাটির নীচে নিস্তেজ বীজ যেমন জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখে
তেমন আমার দীর্ঘ ক্লান্তি কোথাও যেতে চায়
এখন সন্ধ্যার নীরব পাখী রাতের সঙ্গে গল্প করে
আমি ও মা মা ও আমি

কথা বলা সবসময় ভালো লাগে না চুপচাপ
মায়ের বয়স্ক আঁচলে বেড়ে ওঠে যৌবন

সত্যসাধন চেল

স্বপ্ন

বালিকার ঘুমে নিসর্গ চিত্রের মত, এক স্বপ্ন জেগে থাকে
শহুরে বালক তার নীল ঘুড়ি ওড়ায় আকাশে,
টেলিফোন তার ছুঁয়ে, ওই ঘুড়ি উড়ে যায় দূরে বহুদূরে
মাঝে মাঝে প্রেমহীন হয়ে, সুতো ছিঁড়ে বালকের ঘুড়ি
ফিরে আসে বালিকার ঘুমে, গ্রীষ্মের দুপুরে

বালিকার ঘুম ভাঙে, তবু তার চোখে
নিসর্গ চিত্রের মত স্বপ্ন জেগে থাকে।

কৃষ্ণসাধন নন্দী

ভোল-বদল খেলা

কেউ আর আসে না
মাড়ায় না পথ
খোবনাছেঁচা কুকুর তো নয়
তু করে ডাকলেই কাছে আসবে
এঁটোকাঁটা খাবে—

কেউ কেউ ফিরে যায়।
যাকে পায়ে রাখে
মাথার উপর তুলে তাকেই নাচায়
বার বার।

ভোল-বদল খেলা-খেলা
সমস্ত দিন সমস্ত রাত।

ব্রত চক্রবর্তী

রাজনীতি

ধ্বজা গুটোও তোমার, তবে সঙ্গে যাবো।

রং-তুলি দিয়ে তুমি আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলে কিছু লিখতে
আমি সব দেওয়ালে গিয়ে লিখেছি : বেঁচে থাকতে চাই।

মাইক্রোফোনের সামনে তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে কিছু বলতে
আমি চিৎকার করে বলেছি : জয় হোক মানুষের।

তুমি লক্ষ্য করতে বলেছ মানুষের পিঠে ছাপ-দেওয়া দলীয় নিশানা
আমি আগাগোড়া তাকিয়ে থেকেছি মানুষের মুখের দিকে।

তুমি অভ্যাস করতে বলেছ কৃত্রিমতা, আমি
অভ্যাস করেছি নিজস্বতা ;
তুমি বলেছিলে বিবেক খেলনা, যা নিয়ে খেলে শুধু শিশুরাই
আমি জেনেছি বিবেক ক্লোরোফিল যা মাঠের প্রত্যেক শস্যের সবুজ !

ধ্বজা গুটোও তোমার, তবে সঙ্গে যাবো।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

রাতপাখি

চার্চের বাগানে ব'সে রোজ রাত্রে ডেকে যায়
স্বপ্নাবিষ্ট পাখি।
ফুলের ভিতরে জমে আরো একফোঁটা মধু। অস্পষ্ট মানুষ
তার প্রিয় রমণীকে আরো একটু বেশি ভালবাসে।
নতুন মেঘের জলে খানিক গম্ভীরতর হয় কালোদিঘি।
ঝিনুকের কোষে মুক্তা কেমন নিটোল হয়ে আসে।

আরো কী যে ঘটে যায় নিঃশব্দে, যখন
মানুষের, নিসর্গের বুকে
স্বরক্ষেপ ক'রে যায় সেই মগ্ন পাখি!

শান্তিকুমার ঘোষ

জীবন আমার

জীবন আমার ছিল না
স্ফটিকের সোপান-পংক্তি
উঠতে গিয়ে দেখি মৃত্যু-চিহ্ন
ডায়নোসরের পায়ের ছাপ
অনুভব করি বায়ুস্রোত বৃক্ষ-চূড়ায়
নৈঃশব্দ্যের উপত্যকা
ব্রহ্মকমল ফুটেছে একটি
কী ক'রে।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

সেই হাসি

দূরের নীরব হাসি আকাশের অনেকটাই কাছে মনে হয়
সেই হাসি একফালি মেঘ কিংবা একটাই বক
মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বী সময়
মাঝখানে অন্ধকার
সে কেবল ছুটে আসতে চায়
নীরবতা যখন পাষাণ
আমরা অহল্যা এখন, নিশ্চল পাথর
সময়ের সবটুকু হিসেব মেলে না
জীবনেরই কি মেলে
অবশেষে গোঁজামিল দিয়ে যেতে হয়
শুধু কদিনের জন্যে হাসির রেখাটি
আকাশের গায়ে সাদা মেঘ হয়ে থাকে।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

মার জন্যে

অনেক বয়েস হল মা, তুমিই আয়ু আমার, একরাশ
দিয়েছ কেশের আশীর্বাদ। দুপুর নীলে টাইটুম্বুরা জলে,
জলে তোমার চোখের জলে। সর্বগ হয়ে আছ।
মৃণ্ময়ী হাতের দূর্বাধানে। কোল জুড়ে, অমল
অমৃত দূর্বাধান, ভোর বুকে শিউলি শরতের ভোর
ভরে। নদীতে গিয়েছি আমি কী আবেগে, দূর সমুদ্রে
রুদ্ধশ্বাস কালো মাটির বুক-উঁচু ঘাসে, অসীম মানবতার

আর্তস্বরে। অপার অঘাটায় কুশীর আয়ুকে ফুরিয়ে
উড়িয়ে, হীরামন পাখি তোমায় এনেছে ফিরে।
ভাতের গন্ধ তোমার শরীরে, আমানি ভাতের গন্ধে
তোমার শুভ্র সুধায় তরলতা অগ্নির সত্ত বিশুদ্ধ
তরলে। জলে। ঢেউ কঠিন চিরালী তরীতে। রূপসী নদীর
আঁধার গলিয়ে গীতল বিহানে। যত কলা
পাঠশালার অশেষ বলা, মিছিলে শরকে
আকাশের সূর্য ছেঁড়া, মুঠি তুলে চাঁদপড়ো হিমেল
দ্যুলোকে, মধুময়ী তোমারই মুখ, তোমারই
চক্ষু আলোর অতলে হৃদয়ে, এসেছি ফিরে।
নিরাশী অকাঙ্ক্ষা আয়ুতে আমার আকাশে তারা
দুপুরে নীলে কাছে ও দূরে।

বাসুদেব দেব

এসো, আমার কাছে

এসো আমার কাছে এসো
সেলুলয়েডের নেগেটিভে ঘুম পাড়িয়ে চলে এলে
পাহাড়তলীর ডাকবাংলোয়
সেই আমি পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে আছি
'সেলাম মেমসাহেব'

চমকে উঠো না, ঐ পোড়ো বাড়ির একলা গাছের ছায়ায়
আমি চিরকাল বসে আছি
ঐ পিকনিকের নতুন কাটা মাখনের কৌটোয়
প্রথম চামচের মধ্যে আমি

এসো আমার কাছে এসো
আমি মৃত্যু বা ইতিহাসের কথা ভাবি নি
আমি তোমাদের কথাই ভেবেছি
এসো, আমি এঁঠো করে না দিলে
আগুন তোমাদের ছোঁবে না

মনুজেশ মিত্র

সাপ

যেন সবুজ মখমলে সাবলীল চলে যাচ্ছ
উজ্জ্বল চামড়ার গর্বে
আসলে পাগল নও কারো গন্ধে—
না কোন চাঁপার, কোন সঙ্গিনীর উত্তপ্ত সৌরভে,
যেন এক নতুন কস্তূরীমৃগ।

তাহলে যে আবরণ ফেলে এলে
বাসাংসি জীর্ণানি বলে নয়,
নগ্ন চামড়ার কোন সততা দেখাতে ?
যার নীচে জমে আছে হাজার হিসাবী জট,
সে হিসাব সর্বনাশের গৌরবে ফাটে যেন।
অথচ অস্থির কোন ঠাট নেই,
শুধু এক অমোঘ নিয়তি—
তাই ঢেলে দিতে চাও পৃথিবীর বুকে।
কেন এই শঠ খেলা যখন মাথার
আলো নিজে পুড়ে গেছে,
ছাই পড়ে আছে শুধু। অন্ধ হয়ে আছ।
কেন এই প্রেম তবে ? কেন ?

জেনে রাখো এখন এ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে গেলে
অলক্ষিতে তোমার পিছনে
সারস পাখীর পায়ে ছুটে আসবে কিন্তু এক দ্রুত অন্ধকার,
হাতে তার প্রচণ্ড লগুড়।

বিজয়কুমার দত্ত

রাজপথ

বিদায় নেবার সময়েই
রামধনু ওঠে—
যতক্ষণ ছিল যোগাযোগ,
ততক্ষণই বৃষ্টির আবহ,
মেঘলা আকাশের মুখ ভার

বিদায় মানেই মুক্তি।
যতদিন ছিল দৃষ্টি বিনিময়
ততদিনই ছিল চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ
তোমার মুখে ছিল তারই নিশানা।
তুমি মুখ ফুটে কোনদিন বিদায় চাওনি
তোমার দ্বিধায় ছিল দ্বন্দ্ব।
আমি হাসিমুখে, তার মাঝখানে দাঁড়াই
অসংকোচে বলি, 'তুমি এবার
চেনা রাস্তা ধরেই হেঁটে যাও।'

পরেশ মণ্ডল

সুখ

আয়নায় নিজের মুখ বেশ লাগে
শ্যাভলনের গন্ধে মৃদু স্বাদ
সিনথল সাবানে তেমন নয়
বরং
চারমিনার মনোরম
সকালে চায়ের পর
এক পয়েণ্টে জিইসি পাখা
সমুদ্রের ফেনায় নুন
বেলাভূমি পড়ে থাকে অভিমানে
টাইগারহিলে হিহি শীত
এখানে সুখ নেই
অন্তত সুখ বলে যা জানি
স্ট্রীটল্যাম্পের তলায় ছায়া

বিমান ভট্টাচার্য

অন্য মানে

হাসতে হাসতে কেউ কাঁদায়
আবার কাঁদতে কাঁদতে কেউ হারায়
দুয়ের মধ্যে শুধুই অমিল
একজনার চোখ থেকে
জল গড়ায়
অন্যজন চোখের মধ্যে
জল শুকোয়

কাঁদতে কাঁদতে হাসানোর
অন্য একটা মানে আছে
তফাৎ আছে যেমন
দেখতে দেখতে চলার থেকে
চলতে চলতে দেখার
যেমন অমিল মনে হয়
বাঁচতে বাঁচতে মরার থেকে
মরতে মরতে বাঁচার।

মুরারিশংকর ভট্টাচার্য

কবিতাকণা

কেউ দোলায় না তুই দুলিস
কেউ ভোলায় না তুই ভুলিস
সুখ গেলে তুই হাই তুলিস
শুভ্র কুসুম পায় দলিস।

মঞ্জুভাষ মিত্র

ঘুমের ভিতর কেঁদে উঠলাম যেন বিষন্ন ফুল

ঘুমের ভিতর সহসা হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম যেন বিষন্ন ফুল
জোছনার বুকে ধীর ভাসমান এই তো সেদিন রাতের সাগর পার হয়ে গেছি
এইতো সেদিন বাতায়ন খুলে ছুঁয়েছি জমাট আঁধারের কালো সুন্দর ফুল
তারপরও এই অতলস্পর্শ কান্নার গাঢ় মধুর ভূমিকা। নীল ভূমিদেশে
খয়েরী রঙের দুঃখের ঝরা পাতার করুণ বাতাসে বাতাসে সারারাত ওড়ে

শূন্যসেতুর উপর যে ছিল দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ মায়ামাখা এক উজ্জ্বল ভোরে
সে ফিরে গিয়েছে মাটির ভিতর। বসন্ত দিনে জাগবে আবার বালিকা
নীল ড্যাফোডিল পাঁপড়ি মেলবে : আমি একদিন সাগর-পারের মায়াবিনী
দেশে যাব
স্যাণ্ডউইচ আর ডিম ভাজা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি সকাল বেলায়। তবুও কান্না
শীতের তীক্ষ্ণ বাতাসেরা এল দলে দলে ছুটে বিভ্রমময় স্মৃতির সৈন্যদল
নেপোলিয়নের মুখ মনে পড়ে, ওগো সুন্দর সাগরের বুকে তোমার নির্বাসন
হবে আজ রাতে। টলমল করে সবুজ পাথর মধুর পান্না বুকের ফল
স্মৃতির ভীষণ তীক্ষ্ণ প্রহারে সহসা ব্যাকুল হয় অতিশয় নির্জন রমণী
গোলাপী রঙের ব্যাগের ভিতর শুকনো ফুলের হাজার সরস পাঁপড়িসমূহ
বিশ্ববিদ্যামন্দিরে বক্তৃতা দেব মনস্থ করে রেখেছি শিল্পকলা বিষয়ে
আমাকে গভীর প্রেরণা দিয়েছে বেদনাবহুল সপ্তবিশাল ব্রোঞ্জের নটরাজ
কন্যাকুমারী সমুদ্রতট মনে পড়ে যায় নারকেল বনছায়ার গভীর ঘন আশ্রয় ;
উষার কোমল ভারমাধ্যমে দুঃখ এবং ক্লান্তিকে এইভাবে তুমি জয় করো।

দীপঙ্কর সেন

দেবাশীষদা'কে

মুখে মুখ চেনাশোনা
মুখে মুখ ভালোবাসা অভিমান
জলজ মাছের মতো
দ্বিধাহীন গতি নিয়ে স্বয়ংপ্রতিভূ
জঙ্গল ছেড়ে তুমি ইজারা নিয়েছো গৃহভূমি।

শিকড়ে বিরহ থাকে, ভালোবাসা—
কোনটা গাছের প্রাণ বলো ?

শ্যামলকুমার বিশ্বাস

ফিরে পাওয়া

শল্যবিদের ছুরি-নিরাময়-রোদ পিছে ফেলে
অখিল মিস্ত্রী লেনের বাঁকেই
দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলেটা।
কী যেন একটা অমূল্য কিছু হারিয়েছে সে।

কিন্তু জামার পকেট হাতিয়ে
মনের মধ্যে ডুবুরি নামিয়ে
না পেয়ে খোঁজ,
ছেলেটা কেবল পাগলের মত ঠোঁট কামড়ায়।

অবশেষে যেই বর্গী মেঘেরা ঘিরেছে ব্যোম্
ব্যর্থ প্রয়াসে ঘনঅবসাদ ভরেছে মন—
সুহৃদ বিজুরী হারা-ধন তার খুঁজে দিয়ে যায়
কলেজ স্কোয়ারে ধরা দিয়ে সেই তাজা পংক্তিটি !

অরুণা মুখোপাধ্যায়

যতক্ষণ

যতক্ষণ জলে নামা যায় না ভয়
ততক্ষণই। একবার পা ডোবালে
হাত ছোঁয়ালে স্রোত
অন্তরতম।

যতক্ষণ সুদূর আকাশ অপরিমেয়
ততক্ষণই। একবার উড়াল দিলে
ডানা রাখলে মেঘ
গৃহপ্রাঙ্গণ।

যতক্ষণ সংরুদ্ধ অনল ভীষণ
ততক্ষণই। একবার উষ্ণ হলে
স্পর্শ পেলে শিখা
অন্তরঙ্গ।

শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই নাটকটাই

সেই নাটকটারই কথা। আবার ঘুরে ফিরে
আবার ঘুরে ফিরে। হ্যাঁ সেই নাটকটাই।
আমাদের মাথার ওপর
আকাশের প্যাণ্ডেল, মৃত্তিকার স্টেজ।
আর, একটা পার্ট যখন পেয়েই গেছ
সেটা ভালভাবে যাতে উত্‌রে যায়

দেখো। ডুবিয়ে দিয়ো না
নাটকটাকে। না, একটা কোথায়!

একসঙ্গে

বহু ভূমিকায় রয়েছ তুমি। তোমার
ভূমিকা পালন কর। অভিনয় হয়
যেন যথাযথ। যথাযথ॥

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

পাখি ডাকে

একটি গাছের ডালে পাখি ব'সে, পাখি তার সঙ্গীর নাম
নিজস্ব ভাষায় ডাকে, উচ্চারণে মিশে যায় সুর

সেই ভাষা গাছ বোঝে, গাছের পাতারা, আর ওপরে আকাশ,
বাতাসও, বোঝে নদী নীল জল, শস্যক্ষেত, অরণ্য সুদূর

পাখি তার সঙ্গীকে ডাকে, তার আর্তি উল্লাস
সমস্ত বচনে তার সুর থাকে, মানুষ কেবল

নিজস্ব অর্থ খোঁজে, বিশ্লেষণ, নিজের আদল
তার ডাকে খুঁজে নেয়, বলে গান, শুদ্ধ অবকাশ!

অনিল কর্মকার

অন্ধকারে একা

শয্যাঘরে কেউ নেই কার জন্যে বালিশ সাজাও,
জবানবন্দীর খাতা কে এসে পড়বে ভেবেছিলে?
সাজঘরে মাঝে মাঝে দু-চার ঝলক আলো

এখনো অবশ্য উঁকি মারে,
কথা বলতে বলতে তারা আড়চোখে তোমাকে সামান্য
দেখে নিয়ে
কেমন অভ্রান্ত চলে যায়।

শহরের শেষ প্রান্তে ভাঁটির দোকান পার হলে
হাঁটাপথ আমবন তারপর শালের বনানী দেখা যায়—
বসন্ত ফিরেই গেল, কাকে আজ স্মরণ জানাবে ?

প্রতিদ্বন্দ্বী হাওয়া এসে এখন তোমাকে শুধু ক্রমাগত
তোমাকেই শুধু, প্রদক্ষিণ করে।

হায় বন্ধু, অন্ধকারে একা একা উঠোনে বসো না।

পার্থ মুখোপাধ্যায়

গোপন প্রেমিকের কাছে প্রার্থনা

আর কিছু নয় আমি ভালবাসতে চাই
চিতার সুমুখে আমি ডেকে বলি, গোপন প্রেমিকা
এসো তুমি উদ্ভাসিত হও, যক্ষপুরী
এ'দেশ নরকভূমি, এইখানে স্থিরপ্রাজ্ঞ হও
গোপন মানবী এসো চিতাভূমি সুদূর প্রাচীর
মানুষ পোড়ার ধোঁয়া বড় নয়, চোখ জ্বালা করে
এসো তুমি দুই হাতে সরাও এ'চিতাভস্মরাশি
বিদ্যুৎচুল্লীতে শুয়ে ভালোবাসো গোপন প্রেমিককে।

গোকুলেশ্বর ঘোষ

বাগানবাড়ি

বাড়িটা পুরানো, জরাজীর্ণ, পলেস্তারা খসে পড়ছে, জানালা দরজা
শার্সি হাওয়ায় এখন নড়বড়ে—কিছু মজবুত নেই,
সব আজ আছে, কাল নেই।

বাগানে রক্তজবা—সূর্যের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়সন্নিবদ্ধ
বৃন্তের আলোয় সূর্যমুখী।

বাড়িটার অনেক ঘর—ঘরের ভিতর কোথাও
নীলকান্ত, পদ্মরাগ, কৌস্তুভ, অয়স্কান্ত—
সহস্র মণির সমারোহ—
এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে আবর্তন।

সেই থেকে ঘুরে যাচ্ছে বাড়িটা।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

মহাজন পদাবলী

যে দেশে রজনী নাই সে কি ভালো সে কি ভালো মন্দের ওপার
সেখানে তো যেতে হবে যাবো আমি যাবে তুমি যাবেন সবাই
ঈশ্বর মানে কি তবে পথশেষ সব চঞ্চলতা ছিঁড়ে ভরপুর বিশ্রাম
অর্থাৎ জীবিতপ্রান্ত অর্থাৎ পাহাড়চূড়া ভালোবাসা-রমণীর সহিত শয়ান
বাঁচা সেই দিকে হাঁটা দৌড়ানো বা আস্তে চলা যার যেমন কৃতকর্ম তার
আমার মনমাতাল পথ নারী নিমজ্জিত মন কবিতাও মনের প্রলাপ
এ সংসার ভালো তাই এই জন্ম দেশময় অন্ধকারে আলো জ্ঞান আলো
সখাসখী রোগতাপ লীলারাস যাকে বলে অথবা বিলাস
আমিও ভেবেছি ভালো শিখেছি ভাবীর ভাব
ঈশ্বরের জন্য আরো লাখ জন্ম লোভাতুর থেকে যা

কিরণশঙ্কর মৈত্র

ভার

যখন সে মৃত্যু কামনা করে
তখনও শরীর ভয়ঙ্কর ভাবে বেঁচে থাকে।

স্তন ওষ্ঠ বাহু নিতম্ব পা
জঙ্ঘার মিলনস্থলে অসীম জীবন,
—এই বাঁচাকে নিয়ে সে কি করবে ?

মৃত্যু-কামনায় যখন সে ঘুমিয়ে থাকে
তখনও বেড়ে ওঠে তার নখ,
যোনি ও বাহুসন্ধিতে অন্ধকার,
ধমনীতে নিরন্তর শোণিত-প্রবাহ,
পাকযন্ত্রে সিদ্ধ হয় নতুন পরমায়ু—

এই বাঁচাকে নিয়ে সে কি করবে ?

সুকুমাররঞ্জন ঘোষ

স্বদেশেই

যেখানেই যাবো ভাবি—
সেইখানে ঘরবাড়ি মানুষের স্বদেশ সাজানো।
অথচ কেন যে ঘরছাড়া—
চোখের আড়ালে আমি ছিন্নমূল !
এইটুকু, গৃহস্থালী মানুষের মুখ,
মৃত্যুর দুপারে জন্ম,

এই তো স্বদেশ।

সাগর চক্রবর্তী

ক্রমজায়মান

জল ছাড়া পৃথিবীর আর কিছু বাড়ছে না অথচ জলের
গোপনে, গভীরে ধীরে পলি পড়বার কথা শুনি।

গড়গড়িয়ে ঢালুপথে চলে যাচ্ছে দুপুর। আমিও
ধাক্কা খেতে খেতে যাচ্ছি
গড়াতে গড়াতে যাচ্ছি
যাচ্ছি হয়তো স্থির কোনো জলের দিকেই।

এই রকম যাওয়া আজ, এখন।
লাফ দিয়ে একপাশে ছিটকে সরে যাওয়া নয়।
কবেই তোমার হাত আমার হাতের থেকে আলগা
পৃথক হয়ে গেছে।
ভীড়ের ভিতর আমি তোমাকে খুঁজতে চেয়ে পারিনি
এমন চাপ ছিলো…
—ক্ষমা চাই—ক্ষমা করো!—বলবার ফুরসৎ নেই
সামনে পিছনে পাশে মুখ তুলে তাকাবার হাওয়া নেই!
যেতে যেতে মাথায় রেখেছি হাত চুলে
হাতের মুঠোয় উঠে আসে
জলের তলার পলি— গঙ্গা…গঙ্গা…পলিমাখা নতুন ভুবন
সাদা কয়গাছি চুল…
তোমার মুখের সামনে তোমার চোখের সামনে
দাঁড়াতে পারলে ভালো হতো

বোঝা যেতো

আদিগন্ত পলির জলের নিচে বাড়ছে হুন।
গোপন গভীরে॥

বিপ্লব ভট্টাচার্য

প্রত্যূষের চতুর্দশপদমালা ১১

দূর থেকে নয়, কাছে এসে যেন বলল
অনিমেষ, 'কারো প্রতি গোলাকার চোখ,
কারো প্রতি চিতার আগুনে পোড়া কাক,
বিখণ্ড চাঁদের ছায়া—এই উপহার—
এই উপচার ! লোমকূপ ছিন্ন হোল ;
এখন আবলুস কালো অন্ধকারে মস্ত
আরবী ঘোড়া এখন ছোটাবে—বালকের
ভয় নেই। চাঁদের ছায়ার হাত আর
বালকের চোখ নিকট সংঘর্ষে লিপ্ত'—

অনিমেষ, পুরনো অসির মত আজো
তুমি জং ধরে আছো ! কে তোমাকে আটকে
রাখে—তুমি তবে পারো দেখি, আমরা একটু
ব্যাল্‌কনির টিকিট কেটে বসি ; উপহার,
উপচার ভেঙেচুরে বাঁচাও বালককে।

সমরেশ দাশগুপ্ত

জার্নাল থেকে

আমরা সবাই যাবো
স্মৃতিচারণার অশ্রুচরে
যেখানে বসুন্ধরাও
সকরুণ হলুদ বালিকা।

আমরা সবাই যাবো
দুপুরের খেয়া ঘাটে
যেখানে আকাশ মাটি
স্বপ্নহীন এককালি
সবুজ নৌকোর সমতল।

দেবাশিস প্রধান

আড়াল

শোন হে,
সময় বড্ড চালাক চতুর···
সময় ধরো হে—সময়
চলে গেলে পস্তাবে শেষে।

খেলাধুলা ভালোবাসাবাসি
শেষ না হতেই
অই দ্যাখো আকাশে বোশেখের উন্মত্ত মেঘ
ঝড়ঝাপটের তাণ্ডব তাজ্জব ব্যাপার
মাঝপথেই লণ্ডভণ্ড সব?

লক্ষ্যপথ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না মনে হয়,
বাধায় পুড়ে ধরতে হবে নাগাল
নইলে পড়ে থাকবে সামনের দিন
আগামী সময় ধরা যাবে না কোনদিন।

প্রাকৃতিক অনন্তধারায়
চন্দ্র তারা নদী বৃক্ষে দোলে হাওয়া
কর্মজালে জড়ায় জীবন
এ ভাবেই লক্ষ্যপথে স্থির চলে যাওয়া।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভুল

আমারই দোষ, আমারই ভুল
ভুলের হিসেব নিতে
অবেলাতে বৃষ্টি ঝরাও
এমন দারুণ শীতে !

ভালোবাসার গন্ধ বাতাস
আপন মনে হাঁটা ;
সব ছেড়েছি বনের ধারে
সজোরে দোর আঁটা ।

তবুও ভুল থেকেই গেছে ;
ভুলের হিসেব নিতে
এই অবেলায় বৃষ্টি ঝরাও
একান্ত নিভৃতে ।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জন্মের নতুন ঋতু

বুকের উপর লম্বা দুটি পা
তীক্ষ্ণ নখে কে ছিঁড়ছে কার চুল ?
হেঁকে বলছে—'খা আমাকে খা'—
মূলের ভেতর লুকিয়ে বাঁচে ফুল ।

নদীর বুকে পাথর গোলাপ বাড়ি
ঘর ভেঙে কে খোঁজে কোথায় জল ?

স্বপ্নে এখন ছুটছে হাওয়া গাড়ি
চতুর্দিকে মানুষ মারার কল।

জরায়ুতে আগুন মেখে ভ্রূণ
জন্মদিনের বারুদ খুঁজে পায়
হঠাৎ জাগে দস্যু তাতার ছন
নতুন ঋতুর চপল চল বায়।

মৃত্যু ছিঁড়ে জন্মদিনের ঋণ
শোধ করতে পুষছে বুকে শোক;
ফুলের স্বর্গে বাজছে ভায়োলীন
বসন্তে আজ পাথর বাঁধা চোখ।

এক জনমে হাজার মৃত্যু নাচে—
আগুন নিয়ে জীবন বেঁচে থাকে।

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নৈশ অভিযান

আর কতদূরে যাব?
আরো একটু এগোলেই মনে হয়:
প্রতিপদে চাঁদ গ্রাস ক'রে নেবে!

চলেছে আমাদের জীপ নৈশ অভিযানে,
ধারালো ব্লেডের মতো ফাল্গুনের হাওয়া
ব'সে যাচ্ছে শরীরে, চামড়ায়।

এখানে প্রকৃতি চারিদিকে,
র‍ঁদার মূর্তির মতো স্তব্ধ হ'য়ে আছে,
হেডলাইটের আলোর ভিতরে,

দু-একটি পথভ্রষ্ট, মাঠের ইঁদুর
জমির আশ্রয়ে দ্রুত নেমে যায় ;
টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলি মুখময় ক্ষত নিয়ে
জেগে থাকে।

আরো একটু এগোলেই,
বাঘের হাঁ-এর মতো ভয়ংকর খাদ···
কতদূরে যাব ?····
যেমন, অন্তিমে এসে
সব চলা স্তব্ধ হ'য়ে গেছে।

নীনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়

সময়কে কেটেকুটে
সেলাই করে আবার জুড়ে
কুর্তা করে গায়ে পরি।
অকলঙ্ক শুভ্র সময় আমার
একটি আঁচড়ও পড়েনি গায়ে যার।

ছুটন্ত কাজের জগতে
আমার এই ঢোলা কুর্তা পরে
হঠাৎ যখন গিয়ে দাঁড়াই,
ওরা চমকে ওঠে, বাতাসে পাল-তোলা
নৌকোর মত অনায়াসে ভেসে চলা আমায় দেখে।
ভাবে, এর নোঙর নেই কোথাও।

জামাটা কিন্তু রিভার্সিব্‌ল্‌!
হঠাৎ উল্টে গায়ে দিলে
কেউ আর চিনতে পারবে না।
বেরিয়ে পড়বে কাজ, অকাজ, বাজে কাজ
স্বপ্ন, চিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
প্রেম, অপ্রেম, উচ্চাশা, ভালবাসার বুনট—
নানারঙের অপরিমেয় সুতোয় সুতোয় অসংখ্য জট!

আপাত শান্ত সমুদ্রের নীচে
কুমীর, হাঙর, অক্টোপাস, তিমি
ঝিনুক, শঙ্খ, স্পঞ্জ
আর রঙীন সব ছোটমাছের মেলা
অথচ ওপরে দেখি নীল—শুধু নীল!

চিত্রা অধিকারী

সীমিত

একটি মুঠিতে বলো,
কতটুকু ধরে রাখা যায়!
একটা জীবনে বলো
কতবার মৃত্যু আসে যায়,
যদিও তোমাকে আমি
সারাদিন শুদ্ধ দেখি!
কতক্ষণ, বলো, কতক্ষণ
স্মৃতিদুঃখহরা দিন ধরে রাখা যায়!

বিশ্বনাথ দাস

বোধ

দু'জনেই ভালোবাসাহীন, তবুও বেড়ে ওঠে সংসার
কোল বেয়ে নেমে আসে পবিত্র শিশু
ক্রমশঃ বিন্দুর মতো ফাটল বিস্তৃত হয় সমস্ত উঠোন
স্বামী স্ত্রী দু'জনেই কাঁদে, যে যার শূন্য ঘরে
ভালোবাসার বিকল্প কিছু নেই—একদিন তারা বোঝে
জুতো মোজা পড়ে পালিয়ে যায় ভূতুরে ঝগড়া, দূর অন্ধকারে।

সংঘবদ্ধতা

এসো প্রেম, আনন্দের জন্য এসো।

সমস্ত সময় জুড়ে জমে আছে দীর্ঘ দুঃখ
চিতার থাবার মতো হিংস্রতায়
পুড়িয়ে দাও

আগুন হয়ে এসো

প্রেম হয়ে এসো
প্রোথিত শিকড়গুচ্ছে আঁকড়ে ধরো মাটি
ভালোবাসার জীবন জুড়ে-এনে দাও
সংঘবদ্ধতা

রথীন সেনগুপ্ত

সেই মুহূর্তের কথা

কাচের শার্সি আর মোমবাতি জানে সেই মুহূর্তের কথা।
ঘরের ভিতর ঘরে অনিকেত দীর্ঘ বাসনারা
বাহিরে বাদল, চেটে খায় জানালা দরজা—দেয়ালে স্বরভিলতা
অবিরাম সাম্পান—দিগ্বিদিক দুরূহ রসনা......

ভিতর কপাট ছেড়ে বাহির অঙ্গনে কার খোঁজে
মত্ত মাতাল—এই বোধাতীত মায়া—ও কি বোঝে
এই পাওয়া ধ্বংসের ওপার থেকে ভেসে-আসা শব
চুল-চক্ষু-মুণ্ডহীন বাসনারহিত অবয়ব!

কৃষ্ণা বসু

আমার মা

সমস্ত মাসের মধ্যে মাত্র একবার মার পাশে যাই,
বসি, গল্প করি, টুকটাক; কুশল শুধোই,
তারপর ঢের কর্তব্য করা গেছে ভেবে ব্যস্ত রুটিনের
কাছে সর্বস্বতা গচ্ছিত করে উঠে আসি দ্রুত,
কাজ করি, খুব কাজ করি, অকাজের আবর্জনা
বেড়ে যায় ঢের! বড় কালো ঈষৎ ব্যথিত নিষ্প্রভ চোখ নিয়ে
বাতাসের পাশে মা কি জেগে থাকে?
নাকি বর্ষিয়সী রমণীরও ঢের কাজ আছে,
অন্য সন্তান আছে তার! সামাজিক জীবনের কোলাহল আছে!

আমার কথাই তার খুব বেশি পড়ে নাকো মনে,
শাড়িতে ধোঁয়ার গন্ধ, হাতে হলুদের ছোপ,—
সেই রমণীর ম্লান মুখ বড় বেশি মনে পড়ে
কাজ অকাজের মাঝে মূর্খের মতো এই বেঁচে থাকা জুড়ে।

গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি কোনদিন

প্রাচীন গুহাচিত্রের মতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছো আজ
তোমার গহীন রহস্য ভেদ করে কোনদিন কাছে যেতে চাই
আমার মুহূর্ত কাটে, শেষ হয় আলোছায়া দিন
কোনদিন দেখা হবে বিজন বন্দরে, হঠাৎ একাকী
তখন কি মনে হবে অসম্ভব আয়োজনে প্রস্তুত হয়েছি।

এ সকলি অবিরাম নিপুণ খেলার কথা
তোমার দুহাত থেকে ঝরে যায় সুদূর বাসনা
সহসা রহস্য কাছে আসে, ভেঙে যায় ভয়
অলৌকিক বস্তুর স্বভাব দেখো কত কাছে ডাকে
জটিল সময় শুধু তোমাকেই ম্লান করে—
অস্তিত্ব পেছনে থাকে, চলে যায় রঙিন উচ্ছ্বাস

অথচ স্বপ্নের বিকল্প কোন গূঢ়তম রহস্য আছে কি
তোমার সম্মুখে আমি একদিন স্থির হতে চাই।

অভী সেনগুপ্ত

সপক্ষে

এইভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে, যাক—
ব্যর্থ, অকালমৃত দিন
এইভাবে ঢেউ-এর মাথায় দুলে, ভেলার নিয়মে
তোমাকেই মানুষের কথা ব'লে যেতে হবে—প্রান্তরে যে আছে

জলের অতলে আছে যে দেশ সেখানে তোমার প্রবেশ বন্ধ
রূপোলি, উদ্ধত দাঁতে, শুঁড়ে এখনও রয়েছে মানুষেরই রক্তচ্ছাপ
যে মানুষ চেয়েছিল তীর থেকে কিছুটা গভীরে গিয়ে
তীরের অন্ধতা সারানোর ভেষজ আনবে খুঁজে

এইভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে শুষ্ক অনুসন্ধানে একাকী
হাহাকার ও আগুন লেলিহান ছুটে যায়
কেননা নিখাদ, শোকস্তব্ধ জীবনের আন্তরিক ভাষা
অশ্রুত সংগীতের জন্ম স্পষ্ট এনে দিতে পারে।

অমিতাভ রায়

দু-একটা মুখ

দু-একটা মুখের সামনে দাঁড়ানো যায় না কখনো,
বারবার মনে হয় কোথায় যেন
রয়ে গেছে গাঢ় দাগ, মনে হয়
বড় বেশী ময়লা লেগে আছে শরীরে।

কোন কোন মুখ যেন জলজ দর্পণ—
চোখ পড়লেই মুহূর্তে বোঝা যায়

কোথায় কি ফাঁকি রয়ে গেছে—
আয়নায় নিজের দিকে ফিরলেই
বদলে যায় রেখা, জ্যামিতিক আকার।

দু-একটা মুখের সামনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল
অথচ আজো দাঁড়াতে পারি না।

সন্তোষ চক্রবর্তী

এই যে, দেখুন

এই তো মাছ নড়ছে, দেখুন,
আঁশ ছাড়িয়ে
কলিজার রক্ত নিঙড়ে
বেচে দেবো।
মরা আর বাঁচা এভাবেই জড়িয়ে আছে।

রাত্রে ঠোঙা তৈরি করেছি মাছের
তাজা ডিমগুলো
প্রায় জলের দরে বিকিয়ে যাবে, দেখুন।
সত্য, শিব ও সুন্দরের নামে
নদীনালা খাল-বিল-পুকুর উপসাগর যেন
মাছেদের বাসযোগ্য থাকে।

প্রস্তুত আছে জালনৌকো আর আঁশবটি,
দেখুন।

শান্তনু প্রামাণিক

যদি ভাবি ভূমি যুদ্ধ

যদি ভাবি ভূমি যুদ্ধ হবে—তবে ভূমি যুদ্ধ।
কোন শক্তি নেই দাড়াবার—প্রতিদ্বন্দ্বী ?
হিরোসিমা নাগাশাকি ? শিশুবয়েস !

প্লেনের মধ্যে বার্লিন, লণ্ডন, ভিয়েতনাম
সব আলোচনা স্থগিত, যেহেতু
ভূমি যুদ্ধ হবে।

বাচালতা দূরে যাও, দৈব নির্দেশে, স্থানু,
রাস্তায় সারবদ্ধ মানুষ দাড়িয়ে মিছিলে,
গৃহযুদ্ধ নয়, নয় অর্থহীন আবদার,
যদি ভাবি ভূমি যুদ্ধ হবে—তবে ভূমি যুদ্ধ।

হিটলার, মুসোলিনী, স্টালিন এবং সাতষট্টি বছর
নিশ্চুপ গাছের ছায়ায়—পরাজিত ভঙ্গিতে—
ভূমি যুদ্ধ হবে যদি ভাবি—

সুকৃতি আচার্য

স্মৃতির দুদিকেই

যে যেখানে যেমন ছিলো, তেমনি আছে—
নিসর্গের ছেঁড়া জামা থেকে খসে পড়ে সুতো
সাজানো পর্দার আড়ালে এখনো রাত জেগে বসে,
থাকে সময়ের কঙ্কাল,
জানালার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ডাকঘরের অমল,

তবুও ফুলের রক্ত ও ঘামে বারবার ধুয়ে যায়
ঈর্শার কালো রঙের লোকালয়।

যে যেখানে যেমন ছিলো, তেমনি আছে—
রাত্রির কোলে শুয়ে থাকে একাদশীর ভাঙা চাঁদ
পাখির বুকে বাসা বাধে হেমন্তের হলুদ বিকেল,
স্মৃতির দুদিকেই সুরম্য অট্টালিকা, ভালোবাসার
কণ্ঠস্বর—,
তবুও ফুলের রক্ত ও ঘামে বারবার ধুয়ে যায়
ঈর্শার কালো রঙের লোকালয়!

জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী

ভালোবাসা

প্রেমিক হতে হবে বলে পায়ে ঘুঙুর
বাজিয়ে নেচে যাচ্ছে অন্ধকার রাতের
আকাশ—জটিলকুটীল পথে প্রেমই
একমাত্র গাইড, প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসস্তূপেও
জবাফুলের মত ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়,
পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত…
আপ্তজলের মধ্যে গড়ে ওঠা রান্নার মত
অঝোর ভালোবাসা অঘোরে ঘুমায়
না রাতে, মগ্ন-করে-মুগ্ধ-করে-এমনকি
দুঃখগুলি দুহাতে সরিয়ে নিয়ে যায়
ঠিক, ভালোবাসা…ভালোবাসা,
হে আমার জীবনের শাঁস, হে আমায়
রান্নার নুন হলুদ—হে আমার সব

জয়তী রায়

শূন্য ঘরে

ভেবেছিলাম শূন্য ঘরে
একলা আছি
ভেবেছিলাম খড়ের কুটো
আগলে আছি খরস্রোতে—
ভাঙা দেয়াল, বিবর্ণ রঙ
প্রস্তুতি নেই প্রাত্যহিকের :
যেমন আছি, জলের স্রোতে
একটু ক'রে সময় বাঁচে,
ভেবেছিলাম কেউ কি আছে
সঙ্গে যাবার,
গোধূলি রঙ দিগন্তকে
আবীর রঙে রাঙিয়ে তোলে,
গ্রামীন সময় মুখিয়ে ওঠে—
ইমন রাগে তরঙ্গ রোল
দ্বিধার সাথে জাগিয়ে তোলে
সন্ধ্যেবেলা,
কেউ কি জানে এ কোন খেলার
অট্টহাসি !

শিবায়ন ঘোষ

আর দেখাই হবে না

একটা নয় দুটো নয় বেশ ক'টি শাখাপথ এখানে মিলেছে
বোঝা মুশকিল খুবই, এরপর কোনদিকে যাবো

ছুটো হাত অকস্মাৎ ঠাস করে চড় মেরে গেলো
সে আমার ক্রোধ, বুঝলাম
কাম নামে এক রাঢ়ী বিশালাক্ষী কটমট
চোখে চোখ রেখে স্খলন শেখালো
খুব কালো মদগন্ধী একটা মঙ্গোলিয়ান ঘোটকী
তাৎপর্যপূর্ণ তাকালো

একটা নয় ছুটো নয় ছ' ছটা শাখাপথ এমনই ঘোট পাকিয়েছে ;
পঞ্চাননের সাথে আর আমার দেখাই হবে না॥

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

দাবী

তেমন পাথর কই যা দিয়ে আমার অন্ধ চোখে তুমি
পাথরের চোখ বসাবে
তুমি জানো, পাথরের চোখে কোন অন্যায় স্পর্শ করে না
হাত ছুটি পাথর ক'রে ব'সে আছি
তুমি নদী অন্য পথে ঘুরিয়ে দিতে পারো
তুমি আমার কানের কাছে প্রচার করতে পারো
ভুল সমাচার
আমার হাতের কাছে এনে দিতে পারো
পাথরের বল
যা তুমি বলতে পারো পৃথিবীর নতুন মডেল।
পৃথিবী আর কমলালেবুর মত নেই।
আমাদের সুখ অনিবার্য
আমার পাথর চোখের সামনে

তুমি তুলে ধরতে পারো কোন উন্নতির ছবি
নাহ্‌সনুহ্‌স কোন কৌটোর শিশু
আমি শুধু চুমু খাব কৌটোর শিশুকে

তুমি খুঁজে বের করো তেমন পাথর

পার্থসারথি ভট্টাচার্য

জিরাফ

জীবন মাটির সাথে মাটি হবে
অসাধ্য প্রসব কিছু করে না'ক রুদ্রাক্ষের বীজ
মৃত্তিকায় নষ্ট ভ্রাণ আমাদের যাজ্ঞা ও বৈভবে
এই সব আলোড়ন একদিন হবে জেনে স্তিমিত, খারিজ

আমরা হিমের দেশে পৌছলেই ভুলে যাই
আমাদের মৃদু জরোত্তাপ
পুরু পশমের নিচে হতে চাই গূঢ় নিরাপদ
তৃপ্তি সেকি আচ্ছন্নতা নয়? তন্দ্রাকামী মদ?
নাগাল পাই না যার, সেই স্বপ্ন আমাদের
চিরদিন বিমর্ষ জিরাফ!

অমরনাথ বসু

সুখের জন্ম

সুখের তুমি কি জানো
ভালোবাসার ওই মুহূর্তটুকুর জন্যে……
বুকের ভেতরকার রক্তপ্রবাহ যেন নদী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে

চরাচর জুড়ে নেমে আসে এক ব্যাপক নৈঃশব্দ
শুধু খাঁ খাঁ শূন্যতা
ভালোবাসার তুমি কি বোঝো ?
রাত পোহালেই আর একটা দিন
চতুষ্কোণ ঘরে পা রেখে অনেক কষ্টে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে পড়ে
কেমন করে বেঁচে থাকা সেটাই আশ্চর্য
এ কালের দুঃখদিনে সুখের তুমি কি জানো ?
শুধু বিপদের ঢেউ কেটে কেটে চালাও জীবনের জাহাজ···
জানোই তো দুঃখের প্রদীপ বেশিদিন জ্বলে না···

বিকাশ সরকার

প্রেম ও শোকের কবিতা

বাঁ পাশে আংড়াভাসা নদী ও ডাইনে জঙ্গল।
মাঝখানে জল ও নুড়ি, চরা ফুঁড়ে উঠে আছে
দুর্বিনীত কাশবন···
শাদা কাশের মাঝখানে জবুথবু বসে আছ
উড়ে যাচ্ছে চুল ও তাঁতের শাড়ির আঁচল
এবং
তোমার চশমার কাঁচে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে
আমারই চোখ

ডাইনে ভীষণ জঙ্গলের অন্ধকার ভেঙে ভেসে আসছে
ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ।
গাছের পাতা নুয়ে পড়ে কপট বাতাসে। ঝরে বনজ ফুল।
কোনো রা নেই···
শুধু প্রেমে, শোকে, আংড়াভাসা নদী এলো
তোমার চোখে।

নাশের হোসেন

বন্দী করো

চকিত বাঘের যে-হিংস্রতা সরে গেল
তাকে তুমি বন্দী করো—
বন্দী করো হাতের মুঠোয়, মরচে-পড়া হাতের মুঠোয়,
দেখো যেন না পথেই হারায়—অথবা
তার কাপড় লুটোয়, তার খেয়ালীপনা বড়ই ধূর্ত !
বন্দী করো, চকিত বাঘের যে-হিংস্রতা সরে গেল
তাকে তুমি বন্দী করো

এখন তোমায় দেখতে হবে
কার বুকের মধ্যে আছে আলোর পাথর !
পরা বা অপরা না ভেবেই, পা চালিয়ে, অমন ঋজু পা চালিয়ে
এগিয়ে ত্থাখো
সেখানে কেউ বন্দী কিনা ;
হয়তো পেতেও পারো বারুদ—সে-হিংস্রতা দিতেও পারে চমক—
নিতেও পারে অকস্মাৎ অই হৃদয় তোমার !
তবু—
চকিত বাঘের যে-হিংস্রতা বদলে গেল চোখের সম্মুখে
তুমি তাকে বন্দী করো

আশিস দাশ

দীঘায় অনেক মহিলাকে দেখে

প্রায়দিন সন্ধ্যেবেলা
জল ও বালির ওই সীমারেখায়
শুকনো ঝাউয়ের গায়ে মাথা রেখে
ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো কেন ?
দেখি রুক্ষ চুল ওড়ে ; শাড়ির প্রান্ত ওড়ে উদাসীনতায়,
—ভুলে !

তুমি সরে দাঁড়াও,
ক্রমশ সূর্যাস্ত দেখার এই অনুশীলন
আমি সহ্য করতে পারি না।

পবিত্র দত্ত

তার কথা শুনব তাই

তার কথা শুনবো তাই কান পেতে আছি
হাওয়ার মুখে।
মোটামুটি পরিপাটি ঘর অগোছালো করে রাখি
ইচ্ছে করে ;
টেলিফোন আর ফুলদানিটা জানালার কাছে সরিয়ে রেখে
টেবিলটাকে করে রাখি চৈত্র-সন্ধ্যার ময়দান।
বাহিরে যখন মিষ্টি হাওয়ার নূপুর ধ্বনি
ভিতরে তখন সাগরপারের ঝাউয়ের দোলা
বুঝি দেয়াল ভেঙ্গে ঢুকবে এখন লক্ষ ভ্রমর গুনগুনিয়ে
ওই বুঝি তার পায়ের শব্দ উঠোন পেরিয়ে ঘরে
দীঘির জলে কলমীলতা উঠলো এবার দুলে···

সৌভিক রায়চৌধুরী

প্রার্থনা

আমরা চেয়েছিলাম
বুকভরা বাতাস
একমুঠো চাঁদের আলো
বাধাহীন নদীটির গতি।

তুমি তার বদলে এনে দিলে
পাংশু বাষ্প
প্রাসাদঢাকা বন্দী আকাশ
এবং পাথরের স্থবিরতা।
দুমুঠো ভাতের প্রত্যাশা ছিল আমাদের ;
তুমি তুলে এনে দিলে বিনষ্ট সময়।

কৃষ্ণা দত্ত

পুত্‌লী রে

পুত্‌লী রে—
আমি কখনো কখনো বরফ হয়ে যাই,
শবাধারের বরফ,
যা মৃত্যুর চেয়েও শীতল।

আমি কখনো কখনো আগুন হয়ে যাই,
ঘর-পোড়ানো আগুন,
যা চিতার চেয়েও ভয়াল।

আমি কখনো কখনো পাথর হয়ে যাই

ভাস্করের মূর্তিগড়ার পাথর নয়
নোনাধরা দেয়ালের বোবা বেবুব পাথর।
কিন্তু—
তোর দিকে তাকালেই
        আবার আমার
সব ভুলে মাটি হতে ইচ্ছে করে,
যে মাটিতে কীট কীটাণু মাথা গোঁজে,
চারাগাছ গজায়, ফুল ফোটে,
ফল ফলে॥

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

জ্যোৎস্না ভাসে

চতুর্দিকে জ্যোৎস্না ভাসলে বাঙলা মায়ের মুখ '
উদ্ভাসিত ; হাওয়ায় দোলে আমলকিরই ডাল ;
মায়ের মুখ জ্যোৎস্না ; মায়ের স্নেহভরা বুক
পরম খুশি মিষ্টি প্রহর,—বেদনাহর সকাল।

চতুর্দিকে জ্যোৎস্না ভাসলে খুশির প্লাবন ঝ'রে
ধানের শিসে হাওয়ার নাচন মাতায় গ্রামীণ ঘরে
কাশের বনে হারিয়ে যে যায় শৈশবেরই দিন
জ্যোৎস্না ভাসলে উদ্ভাসিত ভালোবাসার ঋণ !

জ্যোৎস্না ভাসলে উদ্ভাসিত বাঙলা মায়ের মুখ
উদ্ভাসিত জ্যোৎস্না ভাসলে কদমফুলের সুখ ;
জ্যোৎস্না ভাসলে গঙ্গাপদ্মা বাউল ভাটিয়ালী
জ্যোৎস্না ভাসলে দোলায় হৃদয় প্রেমের করতালি ;

বাঙলা মায়ের অঙ্গে জ্যোৎস্না, অঙ্গনে তার দোলা,
চিত্রময়ী বাঙলা আমার যায় না তোমায় ভোলা।

কালীকৃষ্ণ গুহ

সময়

ঘুম পায়।

নিঃশেষিত হ'য়ে যাচ্ছে যে সময়, তাকে মৃতের পাশে রেখেছি—
মৃতের পাশে রেখেছি ক্যালেণ্ডার ও পাতা।

এই সময়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে যে দর্শক—র‍্যাঁবোর মতো—
সে অন্ধ এবং বধির। তবু, জীবিত সে।

একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়বে।

নক্ষত্র

একটি কাক সারারাত ইলেট্রিক তারের উপরে ব'সে তার বাচ্চাদের
পাহারা দেয়, আর

তাদের মাথার উপরে জ্বলতে থাকে অমাবস্যা-রাত্রির নক্ষত্র।

ছুটি

ছুটি শেষ হ'য়ে আসে—
নিঃসঙ্গ দিন।

'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে চোখ তুলে দেখি, বিকেল হ'য়েছে।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্কিডের নৌকো

১. তোমার সঙ্গে রাত্রিযাপন
সমুদ্রে গণ্ডুষ,
কুলোয় না আর হাতে :
তৃষ্ণা আমার মিটবে নাকি
অগস্ত্য মুদ্রাতে ?

২. বোঁটায় বসালে দাঁত
ছড়ায় শীৎকার,
শরীর ফাটিয়ে ওঠে
ফুটন্ত গীজার,
নিখিল ছড়িয়ে যায়
অনন্ত নিখিলে ।

৩, তোমার মায়াবী জিভ
কোথায় না যায় ?
সুড়ঙ্গে ঢাললে যেই
তরল আগুন,
শব্দ ক'রে শরীর ফাটায় ।

৪. উরুর ভিতরে মাপা
মুখ ভেজে স্নানে,
অর্কিডের নৌকো চ'ড়ে
ভেসে যাই অনন্ত উজানে
ভিত নড়ে ভিতভাঙা তোড়ে ।

৫, আঠারোর জোনাকি উধাও
এখন চল্লিশ,
কৃষিখামারের কাছে বিষ
কিনে কি বাড়াল চাষী
দেনা ?
তোমার আঙুলে শুধু
তল্লাশ থামে না।

শিশিরকুমার দাশ

শুধু ভেসে যাওয়া

আজকে কোথাও নেই বন্ধন
এ শুধু প্লাবন, শ্রাবণ বন্য শুধু ভেসে যাওয়া, শুধু ভেসে যাওয়া।
মেঘে মেঘে ওঠে ঘন ক্রন্দন
প্রতিধ্বনিত নীচে অরণ্য ময়ূরের ডাকে ছিঁড়ে যায় হাওয়া
আকাশপাখির শোনো বিধুনন
অগম্য সুখ, দুখ অগণ্য ব্যর্থ সাঁতার, বৃথা ভয় পাওয়া।
জলে ভেসে যায় বন চন্দন
ঘর-অঙ্গন, পাপ ও পুণ্য শুধু ভেসে যাওয়া, শুধু ভেসে যাওয়া॥
বাজে জলে জলে সংঘর্ষণ
এখন কঠিন অসৌজন্য শুধু অলভ্য লক্ষ্যকে ধাওয়া।
ভেঙে ভেসে যায় গভীর গোপন
স্মৃতির তলায় সমাচ্ছন্ন রক্ত দোলানো চোখ মেলে চাওয়া।
টেনে নেয় স্রোত, অতল মরণ
এ দেহ যে তার সুলভ পণ্য শুধু ভেসে যাওয়া, শুধু ভেসে যাওয়া॥

সঞ্জয় মজুমদার

প্রজন্মের পিতা

বাতুল বাতাস তোকে সুগন্ধের মতন ওড়ায়,
নির্ভার গমন এতো—কার্পাসের তুলোই যেন, আমি
আমি ছিন্ন স্তব্ধ বসে থাকি।

হঠাৎ ফেরাস মুখ, আয়নায় রোদ ঠিকরে পড়ে
কোথায় যে পেলি এই ঝিলিক, ছুরির নীল ফলা—
আচম্বিতে চোখ ঢেকে রাখি।

তোকে যে সুঠাম করে পুষে রাখব এমন নির্মোক
গড়তে পারি নি। ছাখ, আমাদের তুঙ্গ গাফিলতি
শব্দময় তালি দিয়ে ঢাকি।

একটু দাঁড়াস তুই বিস্ফোরণ ঘটাবার আগে
ছাখ এই নতজানু ভিক্ষুকের জটাজাল বুকে
তোরই মতন এক সূর্যমুখী ফুটেছিল নাকি!

জগত লাহা

শব্দ-সমুদ্রে আবহমানকাল

তিনি বৃক্ষচ্ছায়ায়
পরিষেবিকার শুক্ল বস্ত্রে আচ্ছাদিত করেছেন নিজেকে
তথাপি মনে হয় যেন উত্তপ্ত গমিত্রে বসে
নদী বা নদীযানের দিকে তাকিয়ে আছেন

যেন আশ্রম তবু অরমণীয় কারাবাস
নদীবক্ষে উথাল-পাতাল জোয়ার
তিনি দেখছেন
দেখে মনে হয় যেন কোনো কূটঘাতী ব্যাঘ্র
এক সহস্র বনজীবী মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করেছে
বিপিনে নেই কোনো সৌগত যুবা
বর্ত্মে কোনো পরিধান-আরক্ষিক

প্রয়োগশালার সৈকতমুখী অলিন্দে দাঁড়িয়ে
তাঁর অনাময় কায়দ্যুতি সন্দর্শন করছিলাম

নিমগাছের শাখায় এক উত্তরবাদী কাক
প্রৌঢ় মহানাগরিকের মতো হাঁ করে চেয়ে আছে
যেন কিছু বলতে চায়

হঠাৎ কা-কা শব্দে সে স্বপ্নভেদী চিৎকার করে ওঠে
আমি এবং তিনি ভীষণভাবে চমকে যাই
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি

শব্দ সমুদ্রে আবমানকাল ভেসে ভেসে যাচ্ছে।

রবীন আদক

আমার চৌদিকে আজও

তুমি নাকি নক্ষত্রের পাড়ায় পাড়ায়
রটিয়ে দিয়েছ
আমার সমস্ত চুল পেকে গেছে! এবং তোমার
বাগানে ফলেছে যত সমৃদ্ধ ডালিম
তাদের রক্তের পুঁতিগুলি

আমার বাঁধানো দাঁতে খেঁতলে কাটি রাতভর
আমি নাকি ছানি-পড়া চোখে
বিপুল আকাশে দেখি দীর্ঘ ছায়াপথ
(আহা ছায়াপথ যেন ক্রিকেটের তৃণহীন পিচ)
যেখানে দাপিয়ে খেলে বাউণ্ডুলে নক্ষত্র-শাবক
সেখানে কি আমি কোনদিন
তর্জনী উঁচিয়ে বলি
আউট, আউট!
তুমি সব জানো
(আমার কানের পাশে রূপালি চুলের গুচ্ছ বাড়ছে বাড়ুক)
তবু কেন রটাও এভাবে
তুমি তো জেনেই গেছ
আমার চৌদিকে আজও প্রত্যহের আনন্দ-ভৈরবী।

অজিত বাইরী

পাথর নামাতে পারি না

সব কথা বলা হ'ল—পথে নেমে তবু
মনে হ'ল, কি যেন হ'ল না বলা, ভার হয়ে রয়ে গেল পাথর;
সে পাথর নামাতে পারি না।

তাই বারবার ফিরে ফিরে আসা, তাই সে কথা
হয় নি বলা, আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাবার, বাঙ্ময়
ক'রে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস সেই চিরকালীন নীরবতা।

যেটুকু বলতে চাওয়া, জানি তার সবটুকু প্রকাশ হবে না
তাই আকাশ, আকাশে মেঘ ছায়া রোদ

এই সমুদ্র, দীর্ঘ সৈকত, ফেনা আর ঢেউ
বার বার ফিরে এসে বসি পাশে,
পথে নেমে ভাবি, হাজার কথার ভিড়ে ভুলেছি প্রধান কথাটাই—
পাথর নামাতে পারি না ॥

রাখাল বিশ্বাস

১. একটি অনন্ত সন্ধ্যা

একটি অনন্ত সন্ধ্যা কাটাবো বলে তোমার কাছে আবার যেতে চাই

গীতবিতানের মধ্যে বসে তুমি কি এখনো সেই
অসুখী গানের সুর ছড়িয়ে দাও ?

যার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কেঁপে ওঠে রক্তমুখী কাক
বর্ষশেষের সূর্য, আর্ত জীবন আর অমলিন মৃত্যুবোধ।

২. তানপুরা

আরো এক সমুজ্জ্বল দিনের জন্য তোমার পবিত্র হাত বাড়িয়ে দাও

একদিন আমাদের পরিচয় সম্পূর্ণ হবে, শহরের কোলাহলের
মধ্যে দাঁড়িয়ে
আমরা একদিন চিনে নেবো আমাদের প্রেম, বোধ, সমগ্রতা।

তানপুরোর তারের ওপর আঙুল রাখো
আর ঠিক তখনই বেজে ওঠে তুষারের রাত, ভাঙা অ্যান্টেনার ছবি
যা শুধু রৌদ্রদগ্ধ এক জীবনের কাছে অভিশাপ হয়ে ঝরে পড়ছে।

৩. ফিরে যেতে হবে

যেভাবে দেখবো বলে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি সে ভাবে দেখা হয়নি আজো
তোমার জীবন ঘিরে সেই এক অলৌকিক দেখা
সূর্যোদয়ের ভিতরে তুমি আজ লুকিয়ে রয়েছো কেন, ওই ক্লান্ত মুখের
পাশে চেয়ে দেখো জীর্ণপাতা উড়ে এসে পড়ে

স্নানের জলে তোমার চুল ভিজে রয়েছে, শাড়ি পা
শরীরে জড়ানো আছে পাপ, সেই পাপ অতিক্রান্ত হলে বুঝতে পারি
শূন্যতা নিয়েই ফিরে যেতে হবে

ফিরে যেতে হবে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস থেকে, পূর্ণতা থেকে, লুপ্ত আলো
আর সমর্পণ থেকে।

বিজয়কুমার দত্ত

শ্রুতিলিখন

চুপ করে থাকলেই, লোড শেডিঙ-এ
আলো জলে বুকের মাঝখানে
মাথা নুয়ে এলে, স্থির কপালে উজ্জ্বল
ঘামের ঝকমকে আভা শীতের আভায়
বসন্তের আঁচ দিয়ে যায়।

শব্দকে দরজার বাইরে যেতে দাও—
বুকে ধরে রাখো
তার কিছু বাঁকানো গড়ন
চুপ করো, শুয়ে বসে সময়ের কোলে

দু দণ্ড জিরিয়ে নাও, দ্যাখো এইবার
কে তোমাকে ঠেলেছে দু'পায়ে
কিংবা, কে তোমার
শত্রু-বন্ধু অযাচিত প্রেমিকের মত
গোপন ঘাতক।

শংকর দে

কয়েকটি কবিতা

১. কে যে আসে, কে কোথায়-যে যায়
কে জানে কোথায় ?
কে আমাকে জানে, জানে না কে ?
কে আমাকে মানে, অভিধানে
শব্দে না সম্মানে ব্যর্থ ফিরে ফিরে কল্প অভিমানে
কে জানে কোথায় ?

২. সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের জন্য কাঁদে।
আমি যে অপৌরুষেয় সেনানী
তোমাদের জন্য কাঁদতে আসিনি পৃথিবীতে
মহৎ মানুষের জন্য চিরদিনই কেঁদে যাবে মাটি।

৩. মানুষের কাছে গিয়ে মানুষের ভাষা শিক্ষা হলো।
মানুষের কাছে গিয়ে কিছু ভুল শিক্ষা ও অরুচি
এই নিয়ে ফিরে যেতে হলো।
মানুষের কাছে গিয়ে মানুষেরই পায়ে নিবেদিত
শুধু দেখা হলো না প্রকৃতি।

৪. হাওয়ায় ও কে ? কাঁদছে তাকে বলো তোমার
কোনো দোষ নেই
হাওয়ায় টানে দুঃখ কষ্ট থাকেই থাকে সেই তোমাকে
হাওয়ায় শাখে ভাসিয়ে কেন ভালোবেসেছি।

সুব্রত রুদ্র

ঘুম

কতরাত কতদিন উপোসে কাটে আমার
আজকাল মাথা ঘোরে
বিছানা থেকে উঠলে

উপোসে কবিতা লেখা যায় না
উপোসে মাথাগরমও হয় না।

উপোসে মাথার ভিতর ঘুম নামে
ভাসাভাসা ঘুম
আরো ভয়ংকর জঙ্গলের স্বপ্ন দেখি।

যতীন্দ্রনাথ পাল

অগ্নিবিদ্ধ মুখ

মাঝে-মাঝে তবু বৃষ্টি নামে আজকাল—
যেন প্রবীনা নারীটি শাওয়ারের নিচে
শরীর রেখেছে
আর যথেচ্ছ জলের অভিযান
লতিয়ে লতিয়ে।

চারদিক নিঃশব্দ
সোহাগী আঙুলগুলি যতদূর যায়
জীবন, জীবন, নাকি,
মরণ মরণ—
এঁকে বেঁকে পাকে পাকে আরামের সাপ
গভীর আবেশে বাঁধে ;

নিষিদ্ধ কুঠুরি বলে কিছু নেই
শরীরের অনেক ভেতর অব্দি শিহরণ :
রভসে প্রবল মউ-মউ ।
সমস্ত দুপুর—
বহুদূরে ভেসে ভেসে চলে··· !

প্রত্যুম্ন মিত্র

ঈপ্সা

গুম্ফার ভিতরে কেউ ছিল না বলেই
তুমি কি সাহসী পায়ে নামলে
কোমল লবনস্বাদু কড়ির পিচ্ছিলে
ঘন বনানীর শ্বাস শূন্যে ও' বৃক্ষে
ছড়ালো নিঃসঙ্গ দীর্ঘশ্বাস ;
খুলে ফেল একবার খুলে ফেল
বল্কল-বাহুল্যময় বাস ॥

মৃণাল দত্ত

দুটি কবিতা

এক.

ছিলাম ঘুমে অসচেতন জেগে উঠলাম তোমার নিগ্রহে,
চিনে নিলাম পরিপার্শ্ব, মানুষজন, ভূ-প্রকৃতি,
আবহাওয়া, লীলাময়ের জগৎ
এবং তোমায়
দেখে নিলাম খুব সচেতন চক্ষু মেলে
হঠাৎ চমকে দেখার মতো দূরের মাঠ, আ-ভূমি রামধনু।

দুই.

কুঁকড়ে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে একজন অপমানে অবজ্ঞায় এবং নিগ্রহে
অন্ধকারে।
একা দিন কাটে তার, রাত্রি অনিদ্রায়, ভয়ে, শঙ্কায় আর আস্থার অভাবে
এবং এভাবে ক্রমে বিষণ্ণতা বোধ থেকে অবচেতনায়
তার মৃত্যু ঘনীভূত হয় দেখছি নিঃশব্দে লোকচক্ষুর আড়ালে।
পৃথিবীর সব জনজীবনের যাত্রা চলে অমলিন
কেবল একজন খুব একা হয়, একা হয়ে পড়ে, একা ন্যুব্জ হয়ে বসে থাকে
পা মুড়ে হাঁটুতে থুত্‌নি রেখে অন্ধকারে—
মৃত্যু তার অপেক্ষায় থাকে।

আনন্দ ঘোষ হাজরা

কোন এক লেখক বন্ধুকে

সঙ্গীদের দূরে ফেলে এসে তুমি তাদের দুঃখের কথা শুনে
ব্যবহারযোগ্য ক'রে তৈরী করো মননের শীত নিবারক
এবং বিক্রয় করো বাজারে আক্রায়।

অন্তত এটুকু করা গেলো ভেবে পাণ্ডিত্যের আত্মপ্রসাদ
রঙিন ফোয়ারা তোলে নাগরিক চৌমাথায় বাহবা-মুখর।

চৌপাহাড়ি জঙ্গলের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়
অবসাদে ধূসর তিত্তির
জলের ওপরে শুধু বৃথা ঘোরে পানকৌড়ি এবং গগনবেড়
পাখিদের ঝাঁক
জলের ভিতরে কোনো মাছ নেই, বনে নেই পোকা বা মাকড়
এই ধ্রুব সত্য কথা জেনে তারা পরস্পর জড়ো হয় মৃত্যুর সমীপে।

যথার্থ বন্ধুরা সব মহিষের শিঙের আঘাতে
ছিন্নভিন্ন হয়ে দূরে প'ড়ে আছে মৃতবৎ হয়তো বা এতোদিনে মৃত;
তাদের দুঃখের কথা বুনে বুনে আন্তরিক ভাষ্যকার তুমি
শিল্পশোভন মেঘ ক্রমশ ঘনিয়ে তোলে চৌমাথায়
নাগরিক মননের শুশ্রূষার প্রয়োজনবোধে;
অথচ তোমাকে বদ্ধ ক'রে নেয় বৃত্তাকার পৌনঃপুনিকতা
নির্গমন বন্ধ ক'রে রেখে দেয় অলৌকিক ঘূর্ণমান
কেন্দ্রের বিন্দুতে॥

সামসুল হক

যদি

পুতুলকে যখন সেই নেকড়েটা নিয়ে যাচ্ছিলো
টুটুলকে জন্ম দিতে তুমি কি তখন খুব ব্যস্ত ছিলে
জন্ম ও জন্মভূমির মধ্যশূন্যতায়
কারা যেন পুতুলকে জবাফুলের মালা পরাচ্ছিলো

আর হেমন্তের অমাবস্যার বাতাসে তখন

একঝাঁক শ্বেতপাথরের পায়রা
টুটুলকে জন্ম দিতে তুমি কি তখন খুব ব্যস্ত ছিলে

মাটির তলায় জবাগাছের শিকড়ের কাছে
খেলাঘর পাতা হলে
নেকড়েটা হয়তো রম্যালাসের গল্পোর সুযোগ নিতে পারতো
আর তুমিও খড়্গের নিশ্চিন্ততায়
টুটুলকে জন্ম দিতে
পুতুলের দিকে মুখ রেখে জেগে উঠতে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমরা হারিয়ে যাই

শেষ ট্রেন ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে গেল
যেমন বিদায় নিয়েছিলাম
কারা ছিল দূর ইস্টিশনে
বেদনার চোখ-লাল জল
আবার পিছন ফিরলে সেই ট্রেন সেই ব্রিজ নেই
আর সহযাত্রী যে আমার ঠিকানা রেখেছিল
সে কোথায় কতদূরে ভবে
আমরা হারিয়ে যাই সকলেই
থাকে ট্রেন, ব্রিজ, জলোচ্ছল দিন ও দিনান্ত

সতীন্দ্র ভৌমিক

পৃথিবী ও আমি

১.

আমার সামনে বিস্তৃত মনোহর দৃশ্য
এই-সে পৃথিবী
যেখানে আমি জন্মেছি বহু কোটি বছরের পর
এবং এই-সে পৃথিবী
যে আমার মৃত্যুর পর
কোটি কোটি বৎসর পার করে দেবে !

কত শত অনুভাবনার স্বপ্নময় প্রদক্ষিণা,
সম্পন্ন গৃহী থেকে খ্যাতনামা ঋদ্ধিমান হওয়া,
সোৎসাহে দীপ জেলে এমন-সব গড়ার মুখে
দেখি সেই ব্যগ্র মন ছেড়ে যায় সব চেনাঘাট

২.

আমার জন্মের আগে এই জল মাটি আকাশ বাতাস
বাগানের ফুল নদীর কলতান মধুর ছিল !
আমার মৃত্যুর পরও সমুদ্র তুলবে ঝড়, ঝরবে
ফুল নানা বৃক্ষসভায় ! দূর নক্ষত্রের সৌন্দর্য
অভ্যর্থনা জানাবে এ পৃথিবীকে তেমনি মধুর !

আমার আগমন ও নির্গমন
এই মহাকালের প্রজাতিপর্বে
মাঠ ঘাট প্রান্তরে ঘাসফুলের মতন
এক অগোচর দৃষ্টান্তর মাত্র !

উত্তরসূরি ১১৪

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

দীধিতি

[শুক্লাকে মনে রেখে]

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা।
আলোর ঘ্রাণ-তর্পনে পতঙ্গেরা সমর্পিত ;
দীধিতি ছড়ায়ে আছ। পল্লবপ্রতিম
করতল দীপ্ত অহংকারে
মুঠো মুঠো ইন্দ্রনীল মনি
ছড়ায়েছো।

অতীন্দ্র মজুমদার

কনখলে

পাথরে-বাঁধ। পাহাড় ভেঙে জল
হঠাৎ নামে বিশাল সমতলে—
ভাসিয়ে নেয় উপল কঙ্কর
সুদূর সেই ভোরের কন্‌খলে।

হাওয়ার আঙুল আকুল উল্লাসে
ঝাউয়ের তারে বাজায় আশাবরী,
বরফে তার জোয়ারী ওঠে কেঁপে
আকাশে ভাসে সুরের ভরাতরী।

চড়াই বেয়ে তোমার গুহাদ্বারে
এসেছি ফের ভোরের কন্‌খলে—
এখনও ওই হৃদয়শিখর ভেঙে
নামে না স্রোত আমার সমতলে।

কে জানে কবে এ দিন যাবে, রাতে
হাজার স্নায়ু হৃদয়ে ঝঙ্কার
বাজাবে, কবে বন্যাবেগে হবে
শিখর সমতলের একাকার ॥

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ষশেষ

বসন্তের সেই প্রহরে শব্দ স্বর তোলে—
মধু মাধব মধু বাতা ঋতায়ব
আয়ুষ্মতী মুখ দেখতে দেখতে সেই স্বর শুনে
মুখের কাছ থেকে আয়না সরিয়ে নেয়—
বাইরের আকাশে ম্লান রেখা
তখনও কথা কয়, মধু বাতা ঋতায়ব—

হাঁপানীর বুকের মত সেই স্থানে
সাদা কাগজের মত শুধু শুক্‌নো প্রহর
মধুমাধবী, কেন এই শব্দ
কে কাকে ডাকে ?

বাইরে একটা পাখী কি নিরন্তর শব্দ করে
যদি তার নাম হয় থ্রাস্‌
কিম্বা লক্ষীর বাহন—
চোখে তার জল গড়ায় ;

পরদিন খবর পাঠায়,
ঘুমের ওষুধ খেয়ে
সেই মেয়েটা মারা গেল।

একদিন তার যৌবন এসেছিল
এবং তখন স্বপ্ন ছিল—
একটি ফুল না অনেকগুলো
ফুলের চারা নিয়ে একটি আঙিনা,
যদি তা-ও না হয়
বেলের চারা রেখে নতুন ক্যাকটাস্‌
নিমের ডাল দূরে
পশ্চিমে হেমন্তের শিশির,
সূর্যের শেষ রেখা
দেবে মহুয়ার গান
কিন্তু—
বেলা যায়
আশ্বিনে গড়ায় মেঘ
কারা বীয়র নিয়ে সামনে দাঁড়ায়।

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

তবু দেখি

ভোরের বাতাস আজ জানালায়
একান্ত সহজভাবে ঘরে এসে বইএর পাতাগুলো
এধার ওধার করে দেয়
এলোমেলো

বুঝতে পারি না, তবু দেখি
ছন্দে এই চঞ্চলতা অকারণ উদ্দেশ্যবিহীন।
ঘুম ভাঙে প্রত্যুষে কখনো বড় আশ্চর্যজনক
হলুদ পালক এক পাখি ডাকে

সমুন্নত কাঁঠালিচাঁপার ফাঁকে ফাঁকে
নিঃসর্ত স্বাধীন।

যেমন হঠাৎ কাক উড়ে যায়
মিছে ডেকে ডেকে, ঐ কোন মেয়ে
মালির বাগানে ফুল পাড়ে
সন্তর্পণে
লজ্জায় আনন্দে অন্যমনে।
আমি চেয়ে দেখি···স্নিগ্ধ শান্ত
শুশ্রূষার মত হাতখানি
ধরতে পারি না তবু। শুধু চেয়ে থাকি

মধুমাধবী ভাদুড়ী

কবি অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি পেয়ে

এ বছরের শেষ চিঠি পেলাম :
'আর দুএকটা দিনও
ধার করা যাবে না
ঈশ্বরের কাছে।

অথচ এ বছরেই আমার
আরো দুটো দিন দরকার,
না হলে এই মরশুমে কত ফুল ফুটল
গোনা যাবে না।

অথচ দিন দুটো পেলে
মরশুমী ফুলের রঙ চোখে নিয়ে

দেখে যেতাম
হাজার বছরের মরচে-ধরা পৃথিবীকে,
ঈশ্বর, তোমার কাছেও শেষ চিঠি আমার।

পরিমল চক্রবর্তী

কিছু স্মৃতি

তোমাকে দেখেছি, কিন্তু দৃষ্টি মেলে ধরিনি কখনো, স্নেহাকর!
তাই আজ অন্ধকারে হৃদয়ের ঘর
আলোকিত ক'রে আমি দুঃখে থাকি।
অবিশ্বাসী সময়কে সাক্ষী রেখে একমনে ভাবি:
সংসারের কল্লোলিনী অন্ধ সমুদ্রের
হিংস্র ঢেউ, কী তৃষ্ণায় মেতেছিলে দৃপ্ত বারেবারে
আবিশ্বপরিধি ব্যেপে খুঁজে পেতে হিরণ্ময় চাবি
কবিতার, কিংবা তীব্র দীপ্ত আভা শিল্প-সবিতার?

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কাছে, তবু কাছে নয়

অনেকটা কাছেই যাওয়া গিয়েছিল কাল,
তোমাদের হলুদবাড়ির কাছাকাছি।

মাত্র চল্লিশ গজ দূরের ত্রিকোণ পার্কে পায়চারি করে
আমার কেটেছে বহুক্ষণ।

তবুও দরজায় পৌঁছে কড়া নেড়ে একথা বলিনি,
'এই যে এলুম। আমারই আসার কথা ছিল।'

মাত্র চল্লিশ গজ যোজন যোজন দূরে
সম্মুখে বিস্মৃত ছিল কাল।

দীর্ঘ রাস্তা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
গতকালই আমার প্রথম।

প্রদীপ মুন্সী

১. স্বদেশ

কোথায় সূর্যের আলো সোনা হয়
গোধূলি হীরে হয় রোজ
সমুদ্রের স্বর গান হয়ে বাজে
কোথায় জলে মুক্তো জলে
কোথায়
বৃষ্টিধারা বিষাদ মুছে দেয়

২. শিকড় জড়িয়ে

শিকড় জড়িয়ে শব্দ উঠেছিল
শান্ত নীরব, কোন ঢেউ নেই
শিকড় জড়িয়ে শব্দ উঠেছিল
খুব সকালের শিশির-ভেজা
কার স্বর
শীতল ডালপালা ছুঁয়ে যায়
হয়ত আকাশের সাথে কথা বলে
শান্ত নীরব, কোন ঢেউ নেই।

৩. এপিটাফ

(মণীন্দ্র ঘটক-কে)

মাটিতে খুঁজো না
পাবে না,

শুধু করুণ রেখার দাগ
ভাঙনের অবশেষ
ঝড়ের হাওয়ার খোঁজ
ঝড়ের হাওয়ায় শোন
ঘণ্টাধ্বনি বেজে যায়
মাটিতে দেখো না,
দূর আকাশে তাকাও।

কমলেশ চক্রবর্তী

রঙিন বর্ণমালায় সংগীত

নিশীথ নেমেছে চারিদিকে
অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে কাগজের শুভ্রতা করেছি
কীটদষ্ট, অথব. বাহার কেমন
হরফের বাগানের খুলেছে
দেখি
কেউ লাল— যেন ঝ'রে যায় তাজা রক্ত
মেরুন অনেকে, হলুদসবুজমেজেণ্টা কোনো কোনো তরুণ অক্ষর
অতসী ফুলের রঙ যার সে-কেমন হাওয়ায় চঞ্চল।

আমিও হয়েছি এক মর্ত্যবৃক্ষ
ডালগুলি ঢেকেছি পাতায় অজস্র পাতায়
সবগুলি চোখ দেখে বিস্ফারিত মর্ত্যের সীমানা
ময়ূরপুচ্ছের মতো দিগন্ত ছুঁয়েছে।

মাথার ওপর ছিলো স্বচ্ছ আবরিত নিঃসঙ্গ চন্দ্রিমা
পাথরের ব্রীড়ানম্র বৃষলীরা ঢালে জল
যেখানে রোপণ করি সঙ্গীতের লতা
আলো আঁধারিতে লতা বেড়ে ওঠে

ছেয়ে ফেলে হরফের বাগানে ও ফুলে।
তারপর সেই দৃশ্য ভয়ঙ্কর, পাঠক, দেখেছি :
একই সঙ্গীত নানা রঙের বিষণ্ণতা, স্ফূর্তি এবং
অগণিত অক্ষরের অসংখ্য পৃথিবী
ফোয়ারার মতো ঝরে পরে।

মানস রায়চৌধুরী

বিপ্রতীপ

সুটকেশের পাশে হাতব্যাগ
ট্রেনের জানলায় মুখ খুব কাছে আসে
তারপর সরে যায়, যেন সঙ্গত্যাগ
অপরিহার্যতাভরা। দূর ভালোবাসে
সংসারবিবাগী কোনও অতীত প্রেমিক
স্থলে জলে বনাঞ্চলে চিহ্ন রাখে, ঠিক
অত্যন্ত কিশোরবেলা, ইস্কুলের নীল
প্যান্ট, স্কার্ট, তারপর সিন্থেটিক সব সাবলীল
এমন কি অন্তর্বাস, তা-ও ওরকম হয়ে ওঠে
যেমন আন্ধার রাতে রজনীগন্ধার গন্ধ ফোটে
হাতব্যাগ বসে আছে সুটকেসের পাশে
সে-ও তো রয়েছে স্থির, অনির্বচনীয় অবকাশে
কথা নয় গান নয় শুধু সঙ্গহারা পাশাপাশি
সমুদ্রতীরের বালি বৃষ্টিতে শুনেছে জলে কতো হাসাহাসি
আসল শব্দের অর্থ, তোমার স্বপ্নের পাশে অনিদ্রা আমার
ভিতরে ঝরেছে বৃষ্টি অথচ বাইরে
রোদ, বিপ্রতীপ ঢোলকে ধামার।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

খেলা-ছড়া

রাস্তার দোকানটা থেকে অভিনেত্রীর ছবি দেখে
চলন্ত বাস ডাইনে রেখে সিগারেটের ধোঁয়া
বেপরোয়া।

জীবনচরিত লিখতে গেলে এড়িয়ে গেলে চলবে না তো:
নগ্ন সত্য, বলে গেছেন আঁদ্রে মরোয়া।

স্বরূপ তবু আঁকবো এবং
মৃত ব্যক্তির কঙ্কালে রং
না দিয়েই তা করতে হবে। বাতাসে ফাঁদ পাতো,
হাওয়ায় আজো কিছুই যায়নি খোয়া

এখনো খুব কথার বিষ
হাওয়ায় তবু ক্যাথার্সিস
সঠিক দুঃখ না হয় যেন কৌতুকে গা-সওয়া।

অর্থাৎ ঐ নগ্ন সত্য ভোগ করে হও অপ্রমত্ত
কোনো কোনো রাজার যেমন পথের মধ্যে শোওয়া।

হেলান দিয়ে লাইটপোস্টে পায়ের চটি ঘষতে-ঘষতে
স্বরূপ তোমার জেনেছে আজ মুক্তির সন্ধান।

ভাবতে যতো কষ্টই হোক মুহূর্তে এই সাতটি স্তবক
জ্বালিয়ে দাও, বলো অমোঘ শিল্পীর সম্মান॥

কবিতাগুচ্ছ : স্তবক ৫

[সারা বাংলা দেশের কবিরা আজ কলকাতার ব্যবসায়ী পত্রিকার দিকে তাকিয়ে থাকে না। তাঁরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হাত খরচ বাঁচিয়ে তাঁরা অসংখ্য ছোট পত্রিকা প্রকাশ করছে, কবিতার কাগজ কবিতারই কাগজ। যাতে থাকে মাঝেমধ্যে আশ্চর্য সব কবিতা। সেই সব কবি এবং কবিতা কলকাতার ব্যবসায়ী পত্রিকার কবিতাকে লজ্জা দেবে।

উত্তরসূরি পত্রিকাই সর্বপ্রথম গ্রামবাংলার এই সব ছোট পত্রিকাকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। বিগত ৭-৮ বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে কলকাতার গ্রামবাংলার অখ্যাত কবিদের আজ উত্তরসূরির পৃষ্ঠায় সম্মানের আসনে বসিয়ে প্রমাণ করেছে—দূর দূরান্তেও ভালো কবিতা লেখা হয়, কবির সম্মান পাওয়া যায়। জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কাব্যে উত্তরসূরির সবচেয়ে বড় অবদান বোধ হয় এখানেই।]

অলোক সোম

অভিশপ্ত ভিটা

আতকা টানে মাচা কাঁপে
শব্দ হলেই তাল পড়বে বিলে—জঙ্গলে—
দু'ভাই ব'সে আছে
নিশিসর্দার

হাওয়ায় হু হু দোলে চাল হাল্কা
জল আর টঙের মাঝে মশালের আলো ওঠে নামে,
দেখে মনে হয় ভূতের ভিটায় রাত্রিবাস
কথা বলছে কারা ফিসফাস : এইমাত্র শোনা—

এখন শুয়ে যারা বাড়িতে বাড়িতে দেওয়ালে তাদের
ছায়া পড়ছে না।
থপ্‌থপ্‌ হেঁটে গেলে ঘরে অভাবের কাঁটা লাগে গায়ে,
তবু ছায়া পড়ছে না!

ঘর থেকে বেরিয়ে বিকেল! হাওয়া দিলে মঞ্চ আর মাচা
কেঁপে উঠবে উত্তেজনায়!
কে টানছে কা'কে?

[আজকাল। দেউলপাড়া, নৈহাটী]

শ্যামলজিৎ সাহা

আক্রমণ-চিহ্ন

মরা-বাঁচার আড়ালে সে ভঙ্গি ছিল না।
যা ছিল নীরব, সবাক ধ্বনির কাছে
তাই সব স্তব, শ্লোক, গাথা ছিন্ন ক'রে
এখন ছড়িয়ে দিল সে-সুখের বিভা।
মসৃণ মৃত্যুর দিকে, বাঁচার সরল
কেন্দ্র থেকে যাকে বলি, 'বন্ধুতা জড়িও'—
সেও আজ দূর প্রতাপদীঘির পথে
পাণ্ডুর ভঙ্গিমা দিয়ে আমাকে ভেবেছে
কোনো ছন্দোময় গাছ—যে বহু দুঃখ-
ভঙ্গির ভেতর পুড়িয়েছে অন্ধকার।
এখানেই তার স্নেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
আনন্দের টিলা থেকে বাঁচার মতন
কিছু বীজ আমাকেই ঝাঁকে পাঠিয়েছে;
পাঠিয়েছে অতর্কিতে তবু মৃত্যুবিষ!

[আজকাল। দেউলপাড়া, নৈহাটী]

হিমাংশু জানা

সুন্দরকে মনে পড়ে

সুন্দরকে মনে পড়লে
ঝাউয়ের পাতা নড়ে।
কতোদিন-দীর্ঘদিন
সুন্দরের সমীপবর্তী হইনি !

সুন্দর কেমন আছে
জেনে এসো, যাও পাখি।

সুন্দরকে মনে পড়লে
ফুটে ওঠে থরে থরে
নক্ষত্রের ফুল।

[মাঝি। ২৮ বি সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা ৬]

সলিল চক্রবর্তী

গান হবে

আলো জ্বালিয়ো না
এখন। পাতারা পরছে অলংকার।
গান হবে
এখন শুধুই গান।

কার শব্দে ভেসে যায়
নদীর অহংকার
নদীর অহংকার
ভেসে যায় কার রক্তে

সম্পদ-সংহার।
করতোয়া নদী ছেড়ে
মলিন পড়েছে জলে…
শংখনীড় এবার কুড়োবে মৃত্যু
মালিনী সংকোচে!

গান হবে
এখন। শুধুই গান।

[মাঝি। কলকাতা ৬

রবীন বাগচী

ছড়া

ভোকাট্টা, ভোকাট্টা,
উল্টোপাল্টা ঠাট্টা,
মাথাতে টাক, গালে তবু
বাদশাহী গাল পাট্টা,
ভোঁতা ছুরির বাহাদুরী,
মুক্তো হীরের বাঁট্টা
আহা, কত মিষ্টি লাগে
দামী ঘোড়ার চাঁট্টা॥

[মাঝি। কলকাতা ৬]

দেবদাস রায়

মানুষের সন্ধানে

অনন্ত এমন একজন মানুষের সন্ধান চাই
যে মানুষ কবিকে বলতে পারে
কবি, তুমি লেখো সে লেখা যা অনেক কথা বলবে।

এমন একজন মানুষের সন্ধান চাই
যে মানুষ খাঁচার পাখিকে
শেখাতে পারে খাঁচা ভেঙে উড়তে।

অন্তত, এমন একজন মানুষের সন্ধান চাই
যে মানুষ সদর্পে নারীকে বলতে পারে
বুঝে-সুজে সঙ্গ দিও, সঙ্গ-সুখে পাওয়া যায়
সঙ্গ-সুখ নারীর সফলতা।

[খাখি। কলকাতা ৬]

পরিচয় বসু

লজ্জা

ন্যাংটা ঘুতুম বিলাই কুতুম সাত ছাওয়ালের মা
ঘুতুম কাপড় পরে না
সাত ছাওয়ালের পরেও পেটে নড়ছে আরেক ছা
সেটা এই মরদের না
মরদ গেছে ভুঁই পেরিয়ে চষতে দূরের গাঁ
এখন কাজও জোটে না
এক ছাওয়ালের গা পচছে বিটির হলো ঘা
তাদের পথ্যি জোটে না
বন্যা গেল জাড় আসছে ঝুপড়ি কপাট হা
জাড়ের কাঁথাও জোটে না
মাটির নীচে রেল বসবে সোনার মরদ যা
আর দিন যে চলে না
হুজুর আমার বাপ ভগবান যা খুশী তাই চা
হুজুর কাউকে ফেরায় না

বাবুর সোহাগ পেটে ঘুতুম দাঁড়িয়ে আছে ঠ
বাবু পয়সা দেবে না ?
জোয়ান বিটির পাছায় কাপড় দিয়ে ঘুতুম ম
ঘুতুম কাপড় পরে না।

[সোপান। কৃষ্ণগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া]

কাজল চক্রবর্তী

সেই সময়

মিন্‌সে তুই নদীর ধারেই নিয়ে এলি !
খেয়া বন্ধ, আকাশে চাঁদ
সারা দুপুর কথায় জন্ম-মৃত্যু মৃত্যু-জন্ম
সব ঠিকানা পাক খেয়ে
পাকিয়ে উঠলো চোরা অম্বল বুকের ভেতর
টক্-টক্ মুখ বিকেল এলো
সূর্য ডুইলো তেইশ বি'র চিলেকোঠায় !

বর্ষার এই ঠিক-সন্ধ্যায় মিন্‌সে তুই
নদীর ধারেই নিয়ে এলি ?

[পারিজাত। ১।১৬ শহীদ নগর, কলকাতা ৩১]

ধ্রুব দে

পৃথিবীর সব হেজে গেছে

সমস্ত তরাই ছেয়ে, এ ভাবেই
এগিয়ে গিয়েছে বন
দুঃখো নেই, পৃথিবীর সব হেজে গেছে

মুখালয় আছে, মুখালয়ে, মুখের—
আলয়ে গাঁথা—কথাহীন

ওরা গাছ পুতলে আমি শীত আঁটো করি
আলগা বুক ডাঁটো করি, তবু
কি তৎপর হেঁটে যাই সামাজিক,
নগরের পথে।

[তূর্য। ই।:৮৭ রামগড় কলকাতা ৫০]

সত্যসাধন চক্রবর্তী

অগ্নি ছাড়া

অগ্নি ছাড়া কেউই নেবে না
এই দেহ।
এই অস্থি মজ্জা মেদ প্রেম দাহ
কেউই নেবে না।

আসলে বিদায় দিতে হবে,
তাই কাছে টানা।
অগ্নি ছাড়া বন্ধু নেই।

অগ্নি ছাড়া কেউই নেবে না
এই দেহ।

[লেখছন্দ। ১৭বি বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা]

বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

বিবর

বহুদিনের মরচে পড়ে থাকা হাড় খুব আস্তে আস্তে খুলে
হিজড়ের মতো শত হাতে বেজে উঠলো পাতালে।
সে শহর ঘেরা ছিল মৃক্তক পাহাড় দিয়ে,

কোথাও নেই কোন জলজ শ্যাওলা ঘেরা দিন,
শুধু মুক্তি শব্দ নীল হ'য়ে বসে আছে গুহায়।
পাতা জড় করে আগুন লাগিয়ে দিয়ে
প্রথমে প্রত্নজীবাস্থি মেরে শৈশব পড়ে নিলাম শরীরে।

মনে পড়ে শহরের নাম ?
এটা ছিল মণিহার গুহা, নিচে ছিল নালন্দা শহর,
কত দস্যু নিয়ে গেছে লুঠ করে সোনা-দানা ; সোনার প্রতিমা।
দড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছি, আশা :
উৎস থেকে যদি কিছু পেয়ে যাই।

[ক্ষমা। রামপ্রসাদ ভিটে, হালিশহর]

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমকাল ১

মুখের ওপর মাছি বসছে চোখের ভিতর অন্ধকার
মা মাসিদের ছেলে ভুলোতে বর্গী আসে চমৎকার
শাঁখারী এক করাত দিয়ে কাটছে অর্থ অনর্থ
ঘুমের ঘোরে চমকে ওঠে মানুষ এবং চৌকিদার
ওহে মশাই দরজা খুলুন ; বাইরে এসো মাসতুতো ভাই
গলায় সুরা সোহাগ ঢেলে বলছে হেঁকে স্বীকৃতি চাই
ঘরের খেয়ে মোষ তাড়াচ্ছে বনের মাঝে সমাজসেবী
কুম্ভমেলায় গান গাইলেন আখড়া জুড়ে হাজার দেবী
এমনি সারা ভারতবর্ষে মাথার দিব্যি দিচ্ছে মাসি
অথচ কেউ দেখছে না তার আঁচল চাপা মুচকি হাসি

[আবাদ। ঘুঘুমারী, কোচবিহার]

দ্বিজেন আচার্য

শ্মশান

আমাকে পোড়াবে বলে
নিয়ে এল শ্মশানের ধারে
বন্ধুগণ চারজন

অথচ কী আশ্চর্য
দেখছি এখন
আমাকে নিবস্ত্র রেখে
অকপটে পুড়ে যাচ্ছে
ওরাই চারজন…

[বেণুকা। বর্ণাল, মেচেদা, মেদিনীপুর]

কার্তিক মোদক

মায়ের মুখ

ছেলেবেলার স্বর্ণচাপা দিনগুলি মনে পড়লে
মনে পড়লে মায়ের মুখ, মাটির কাঁথায় রোদের হাসি
অস্থিমজ্জা গেঁথেই আছে মাঠ জল ছুঁয়ে হৃদয় অবধি
ঘুমের মাঝে ছোটবেলার নদীতীরে শিমুল-তুলো
এবং কিছু স্মৃতিকথা কলমীলতার বন-সুখ-মেঘ
উড়িয়েছিল পেখম চাঁদের উঠোনে ঘন নীল মায়ায়
পরম যত্নে পড়ে আছে খণ্ড পাথর স্বমহিমায়
মনে পড়লে মায়ের কথা দু'চোখ শুধুই জলমগ্ন

[সময়ের স্বরলিপি। রামকৃষ্ণ মিশন রোড, মালদহ]

অরুণ ভট্টাচার্য

সপ্তডিঙ্গা ভাসছে জলে

বাইরে এসো, বাইরে এসো। ডাকছে আকাশ
বইছে হাওয়া। ফুটছে
দোলন চাঁপা
সপ্তডিঙ্গা ভাসছে জলে
দক্ষিণসমুদ্রে
ঝাউ-এর শিহর কাঁপছে বনে
বনবনান্ত।

বাইরে এসো। দ্যাখো ট্রাফিক
সিগন্যালে লাল সবুজ বাতির সমারোহ
ব্যস্ত মানুষ ক্ষুব্ধ মানুষ প্রেমিক মানুষ খঞ্জ ভিখিরী
ছুটছে বসছে আবার ছুটছে
ট্রাফিক সিগন্যাল তাদের
ডাকছে হাওয়ায় হাওয়ায়। দুলছে
প্রেমিক, ভাসছে বালক। বলছে এসো, ঘরের
বাইরে এসো।

বাইরে এসো। শুব্ধ ঘর হিমশীতল
বই-এর ঝাড় আড়শোলা শুব্ধ প্রাচীন
নিবন্ত দীপ
মূর্খ আকাশ, জানালার।
বাইরে এসো, ডাকছে
আকাশ খোলা আকাশ।
কুন্দফুল
হাসছে।

কাশী ২৭ জুন ১৯৬২

বিভূতিভূষণের গল্প ১

[গৌরী দা -কে]

বিভূতিভূষণের গল্প পড়লে একটা বেদনাই
টানটান হয়ে বুক জুড়ে থাকে।
কেন কলমিলতায় শাক্‌লা আর বঁইচিবনে
কাঁটাঝোপের বেড়ার আড়ালে
আকাশের নীচে
আমার প্রথম জন্মভূমি দেখতে পাইনি!
পদ্মবনে গরুর বাথানে লাল বোলতার
গুঞ্জন শুনতে শুনতে কেন
বালকবয়স পার করি নি,
কেন ধানের ক্ষেতে আলের 'পর যেতে যেতে
বসন্তরাত্রে আকাশজোড়া চাঁদের আলোয়
দ্রুতগতি সাপের সাঁতার দেখি নি?

বিভূতিভূষণের গল্প পড়লে এইসব ম্রিয়মান বেদনা
টানটান হয়ে বুক জুড়ে থাকে।

কাশী ২১ মে ১৯৮২

বিভূতিভূষণের গল্প ২

কারো কাছে যাবো না আমি, মা -র কাছেই যাবো।

মাঠের মধ্যে যজ্ঞিডুমুর, মাঠের ধারে আকন্দফুল,
তৃষ্ণার জল কোথায় পাবো, কোথায় ঠাণ্ডা জল।

চিলতেমারি পার হয়ে
তেলকুচো আর সোয়াদিগাছের ঘন নিবিড় ঝোপে
অন্ধকার জড়িয়ে থাকে।

তৃষ্ণার জল কোথাও পেলাম না।

জামতলাতে আঁচল পেতে বসে, ও কে তুই ?
মা গো,
আমায় বুকে নে
তোরই কাছে যাবো আমি, তোর কাছেই ঠিক
পেয়ে যাবো
তৃষ্ণার সম্বল।

কাশী ২৭ মে ১৯৮২
বিভূতিভূষণের 'প্রত্যাবর্তন' গল্পটি থেকে শব্দগুলি ধার করে সাজিয়েছি একটি কবিতার জন্য।

জাতক থেকে

১. সীবলীর ব্রতভিক্ষা

এই মুহূর্তে বসুন্ধরা আমার করতলে, এই মুহূর্তে
আমার বিজন রঙ্গভূমিতে
রক্তপলাশের আগুন
সংগোপন বাহুবল্লরীতে আমার
সহস্র রক্তকণা উদ্দাম।

তুমি অমন স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না, মহাজনক।
আমি চাই না তোমার প্রশান্তি। এই মুহূর্তে জেনো,
বসুন্ধরা আমার করতলে।

তুমি এসো মহাজনক, দ্যাখো
আমার শস্যউদ্ভিন্ন প্রান্তর তোমারই
একান্ত ব্যঞ্জনভূমি। সেখানে
নেই রমণীর সূক্ষ্মতম অঙ্গাবরণ, নেই আরক্ত
পট্টবাস। শুধু চারিদিকে
টাঙানো আছে মায়ামুকুর। আমাদের দুজনার
আনগ্ন ছবি ফুটে উঠবে বলে' সমস্ত বনভূমি শিহরিত।

এসো, এই দেববাঞ্ছিত নগ্নতনু উপভোগ করো।
উপহার দাও একটি শুভ্রসুন্দর
কুন্দফুল।

মহাজনকের দৃষ্টি সেমুহূর্তে মন্দিরের পরপারে।

কাশী ২৪ মে ১৯৮২

২. বণিকপুত্র পূর্ণ এবং মহাসংগীত

মাঝেমধ্যে মন্ত্রধ্বনি কানে আসে। কানে আসে
কলকাতার জলকল্লোলে
শুদ্ধতম বিষাদের ধ্বনি।
একি মন্ত্র, নাকি প্রার্থনা
অথবা কোন দূরাগত সংগীতের শ্রুতিগাথা!

বস্তুত আমার কাছে এই সব ধ্বনি
একই সংবাদ বহন করে;
মন্ত্র বা প্রার্থনা অথবা সংগীত
সবই হৃদয়মূল-উদ্ঘাটিত
রক্তক্ষরণের শুদ্ধতা

বণিকপুত্র পূর্ণ যা নিবেদন করেছিলেন তথাগত-কে।

কাশী ২৬ মে ১৯৮২

৩. নাগকন্যা ও মাতলি

সে কেমন অন্ধকার, মাতলি?

কেমন করে জানাবো তোকে নাগকন্যা, সেই
স্ফটিকবর্ণ আলোকের পরপারে
অমানিশীথের অন্তরাল!

সে কেমন অমানিশি, মাতলি?

কেমন করে জানাবো নাগকন্যা, সেই
অমানিশার নিশিযাপনের সুখ
সেই মিলনরাত্রির অভিষেক!

সে কেমন মিলনরাত্রি মাতলি?

কেমন করে জানাবো ওরে কুন্দফুল,
তুই কীটদংশন জানিস্ নে, তুই
দুঃখসুখের অভিসার চিনলি না, তুই
দিবারাত্রির সংগম বুঝিস্ নে?

মাতলি, মাতলি কেমন করে এই পাতালপুরীর
দীর্ঘ রজনী কাটাবো আমায় বলে দে,
কেমন করে অনন্ত নক্ষত্রবীথি আকাশের নীল
দেখতে পাবো মাতলি, তুই একবার বল্?

নাগকন্যার দীর্ঘশ্বাসে পাতালপুরীর স্ফটিকচত্বরের
স্বেদবিন্দু জমে ওঠে।

কাশী ২৬ মে ১৯৮২

২. ইয়াম্পাতী-পুণ্যক

কর্ণে নবকর্ণি নয়নে কৃষ্ণকজ্জল, প্রত্যায়
একাকিনী নাগকন্যা।

বসন্তবাতাস বৃথাই বহে যায়।

কোথায় কী যেন বুকের মধ্যে বেদনার,
না কি অসহ্য পুলকের ভার
বনকুসুমের সুবাস!

কন্দর্পকান্তি কে তুমি আমার সামনে?

আমি পুণ্যক। আমি তোমার, সুতনুকা।
উদ্ভিন্নযৌবন তোমার
পূর্ণ হবে আমারই উষ্ণ আলিঙ্গনে।

নাগকন্যা কম্পমান বিহ্বল, জানে না সে এখনো
যৌবনের ভয়ঙ্কর রহস্য।

পুণ্যক স্থির তাকালেন, মুহূর্তকাল।
আজানুলম্বিত বাহুতে বন্দী হলেন নাগকন্যা,
আরক্ত বিম্বাধরে
যৌবনের উষ্ণ বেদনার
তীব্র বিদ্যুল্লেখ আনন্দের গাঢ়তা
অনুভব করলেন ইরান্দাতী।

যৌবনের ভয়ঙ্কর রহস্য পূর্ণিমানিশীথে
শুকপাখি হয়ে উড়ে গেল।

কাশী ২৬ মে ১৯৮২

প্রতিদিনের সূর্যওঠায় ক্লান্তি নেই

[রাখাল বিশ্বাস-কে]

অপেক্ষার শেষে অপেক্ষা রয়েছে, ক্লান্তির পরও
ক্লান্তি থেকে যায়। এভাবে পল অনুপল দণ্ড
বহে যায় পরপর, এ ওর গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে
লাস্যময়ী স্নানরতা তিনটি যুবতী যেমন দীর্ঘিকায়।

অপেক্ষার শেষেও অপেক্ষা থেকে যায়
ক্লান্তির পর ক্লান্তি। অথচ ছাখো,
প্রতিদিনের সূর্য-ওঠায় ক্লান্তি নেই
প্রতিমুহূর্তের উদ্ভিন্ন মানবজন্মে অপেক্ষা নেই

মৃত্যুতে বিলীন হলেও নিঃশেষ হয়ে যায় না মানুষ--
মানবজন্ম থেকে যায়।

ক্লান্তির পর ক্লান্তি, অপেক্ষার শেষে অপেক্ষা।
মানবসন্তানের দীর্ঘশ্বাস পেরিয়েও
আমার বাগান সন্ধ্যামালতীর গুচ্ছে গুচ্ছে ভরে ওঠে।

বারাণসী ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন। ৩০ মে ১৯৮২

খাজুরাহো যেতে হলে

খাজুরাহো যেতে হলে এখানে নেমে এসো, পথিক।

এখানে রুক্ষ অনুর্বর ধূলিমলিন রাস্তা
এখানে চারিদিকে উত্তপ্ত বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।
তবু এখানেই নেমে এসো।

তারপর দীর্ঘপথের শেষে, মন্দিরগাত্রে,
অঞ্জলি ভরে পান করো তৃষ্ণার জল, মিটিয়ে নাও
চোখের পিপাসা। ছাখো
হৃদয়ের প্রস্রবন কি করে
উজাড় করে ভিজিয়ে দেয় শুষ্ক বনভূমি।

খাজুরাহোর দীর্ঘ দীর্ঘ অমারজনীর
ধারাস্নানে, পুরুষ, তুমি শেষবার
শালভঞ্জিকা অভিসারিকার দিকে
দৃষ্টি নিক্ষেপ করো।

সাতনা স্টেশন। ৩১ মে ১৯৮২

সাতনা স্টেশনে নির্দেশ রয়েছে : for Khajuraho you are to get down here.

আমার ভারতবর্ষ

আমি ভারতবর্ষ দেখি নি।

অ্যাসেম্বলী হাউজ চিনি, যেখানে
পারিষদদের খেউড় চলে বছরে চারবার।
আমি পাঁচ-তারকা-বিশিষ্ট হটেলে থেকেছি
যেখানে মন্ত্রীরা প্রায়শই খানাপিনা করে থাকেন।
আমি তাজমহলের দিকে দূর থেকে তাকিয়েছি
সম্রাটের অশ্রুবিলাসের জন্য যখন
একটা পাঁচশালা পরিকল্পনার অর্থব্যয় হয়েছিল।
এবার ভেবেছি আমার ভারতবর্ষ দেখবো।

পাথুরে জমিতে দরদর রৌদ্রে
কি করে ফসল ফলায় আনগ্ন মানুষ
হাজার লোকের উদয়াস্ত পরিশ্রমে
কেমন করে মাঠে মাঠে জলদেবার বাঁধ তৈরী হয়,
পাখি ডাকলে কোন্ সুদূর গ্রামদেশে সূর্যদেব স্নিগ্ধ হাসেন
সুনীল সাগরের কিনারে কিনারে
বস্তুপুঞ্জ ঘিরে ঘিরে বাসা বাঁধে মুক্তাদেহ মুলিয়া

এইসব মানবমানবীর কর্মযজ্ঞে
এইসব পাখিদের দেশে
এবার থেকে আমার পদযাত্রা শুরু হবে।

আমার ভারতবর্ষকে আমি কাছে পেতে চাই।

ভুসয়াল ৩১ মে, ১৯৮২

মালা-কে মনে রেখে

আমি রমণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবি
এইমাত্র যে হিজল গাছের ডালপালা দেখলুম
তারই স্মৃতিরেখা এর শাড়ির আঁচলে জড়ানো।

আমি পাহাড় দেখলুম তার গুহাকন্দর তার
ধারাজল তার গূঢ় গোপন বেদনার কথা
তা-ও কি ওই রমণীর মুখে !

সমুদ্রে স্নান করতে নেমে ঢেউ-এর প্লাবনে প্লাবনে
আমি কি সেই রমণীর চূর্ণকুন্তল বারবার
শরীরকে জড়িয়ে ধরছে, বুঝেছিলুম !

রইলো আমার হিজল গাছের ঝাড়
থাকলো নির্বাক পর্বতমালা
দুরন্ত ঝড় বইছে বুঝি আরব সমুদ্রের পশ্চিমে

আমি সেই থেকে স্থির রমণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

জুহু, বম্বাই। ২ জুন, ১৯৮২

নির্মলা দেবির জন্য

পূবের জানালা খুললেই তোমাদের বাড়ি চোখে পড়ে,
হালকা হলুদ রঙ-এর ওপর ঘন সবুজের পাড়
সূর্যদেব আমার জানালায় এসে বাধা পেয়ে
তোমাদের জানালায় কাঁচের ওপর অরুণরেখা বিছিয়ে দেন

আমাদের দুটি বাড়ির মাঝে চওড়া রাস্তা,
তা পার হতে কতটুকুই বা সময় নেয় !

তবুও মনে হয় কতদূর, মনে হয়
আরব্যরজনীর মত তার রহস্যের শেষ নেই।

আমার বাড়ির গোলকচাঁপা তোমাদের বাড়ির গন্ধরাজের সাথে
কত সহজে মিতালি পাতায়। অথচ
আমি তোমার দিকে সহজে চাইতে পারি না।

শুধু সকালবেলা পুবের জানালা খুললে
তোমার জানালা দেখতে পাই।

কী যে রহস্য লুকিয়ে আছে অইটুকু দূরত্বে !

জুহু, বম্বাই। ৫ জুন, ১৯৮২

বিমানবন্দরে যাবার একটাই পথ

জুহুর সমুদ্রতীর থেকে সান্তাক্রুজের বিমানবন্দরে যাবার
একটাই পথ। যখন নিশীথিনী গাঢ়।

সেই পথের ধারে ধারে আরব্যরজনীর রহস্য।
সেই পথের ধারে আকাশ-থেকে-নেমে-আসা
রাত্রিশেষের স্বর্ণকণার প্রতিবিম্ব।

সেই নির্জন পথের দক্ষিণে
মধ্যশহর জনাকীর্ণ বাজার, মুখর চৌপট্টীতে
রঙ বেরঙ-এর পোষাক
কারো মাথায় টুপি, কারো ফেজ, কাশ্মীরী শাল
বা মখমলের।
টুকরো ফলের দোকান, মাংসের।
বাজার লোকজন জুহুর সমুদ্রতীরে যেতে চায়।
যেতে চায় শান্তাক্রুজের বিমানবন্দরে।

সম্ভবত সহস্ররজনীর রহস্যময় স্বপ্নলোক
আরবসমুদ্রের সাইরেণ -এর গানে ধরা পড়বে বলে।

যাত্রা পশ্চিম। ৭ জুন, ১৯৮২

আসবে কথা ছিল

সন্ধ্যেবেলা আসবে কথা ছিল।

আমি জুহুর সমুদ্রতীরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলুম
পশ্চিমপাড়ে সূর্য ডুবলেই তুমি আসবে;
গোল সূর্য টুপ করে জলে নামলো।

তুমি এলে না।

গাছের পাতারা টুপটাপ আমার জানালায় ঝরে পড়ছিল;
ভাবলুম, এবার আসবে।

তুমি এলে না।

মধ্যরাত্রে কে দরজায় ধাক্কা দিল। আমি
ধরমড়িয়ে উঠলুম। ভাবলুম
তুমি এলে।

না, ও কিছু না, বাতাস। জুহুর সমুদ্রতীর থেকে
যে-বাতাস তোমার দরজায় বাধা পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল
আবার আমারই দরজায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো।

তুমি আসো নি। কিন্তু
বাকি রাত্রি আমার গভীর ঘুম এলো। গভীর
নিরবচ্ছিন্ন ঘুম।

বম্বাই। ৮ জুন, ১৯৮২

মন্দিরের পথে

[অন্নপূর্ণা দিদির জন্ত]

মহালক্ষ্মী মন্দির খুঁজতে খুঁজতে শেষপর্যন্ত রেসকোর্সে পৌঁছলুম।

কেউ ভুল বলে নি। যাকেই জিজ্ঞেস করেছি
সবাই বলে, একটাই পথ।
পুরো রেসকোর্স ডাইনে রেখে হাঁটছি
অদূর পশ্চিমে আরব সমুদ্রের জল
পাথরের বাঁধে লুটিয়ে পড়ছে।

রেসকোর্স আর ফুরোয় না। এক দুই তিন
গেটগুলি একটির পর একটি
অস্তসূর্যের আলো ধরে রেখেছে যেন।

কিন্তু আমার পা ধরে গেছে। নিঃশ্বাস
নিতে হচ্ছে ঘন ঘন।
মনে হচ্ছে, এইবার মুখ থুবড়ে পড়বো।

হঠাৎ চোখে পড়লো, মহালক্ষ্মী মন্দিরের
স্বর্ণচূড়া শেষসূর্যের আলোয়।

বিস্ময়ের আরো বাকী ছিল। বাকি ছিল যখন
মন্দির পেরিয়ে আকাশগঙ্গার ছ'তলায়
একাকিনী সন্ন্যাসিনীকে দেখলুম।
পশ্চিমসমুদ্রপারের জানালা খুলে দিতে
একঝাঁক অন্ধকার পাখি হয়ে উড়ে গেল।

স্তব্ধতা ভাঙলো, যখন সন্ন্যাসিনী বললেন,
বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।

বম্বাই। ১০ জুন, ১৯৮২

উত্তরস্মৃতি ১১৪

ইন্দিরা গান্ধী ব্রেজনেভ রীগ্যান মহোদয় সমীপেষু

আমরা সব বসে আছি যে যার গর্তে। মাঝে মধ্যে
মুখ বাড়িয়ে পরস্পরকে ভেংচি কাটি,
ভাবি, কোন্ ভিন দেশের শত্রু এল ঘরে!

এমন সময় বৃষ্টি নামলো, বৃষ্টি
আকাশ-কালো-করা মেঘের জল
দামাল মাতাল ঘনঘোর
ঘনঘন রিমঝিম রে।

আমরা সব পরস্পর কাছে এলুম। পাশাপাশি।

এই বৃষ্টিধারা পশ্চিমখণ্ডে, পূর্বাচলে
এই বৃষ্টি উত্তরমেরু দক্ষিণসমুদ্রে
এই আকাশ-ভেজা বৃষ্টিতে আমরা সবাই পাশাপাশি
স্নান করলুম।

সেই মুহূর্তে মনে হল একই আকাশ আমাদের,
এই অন্তহীন স্তব্ধতায় একই
বেদনার ভাষা আকাশ-জোড়া
আমাদের সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে বলে।

ঘুম ভাঙলে দেখতে পেলুম,
আমাদের পৃথক পৃথক গর্তগুলি ঘন সবুজ লতাগুল্মে
এক নবীন সংসার পেতেছে।

বম্বাই। ১১ জুন, ১৯৮২

বাড়ি, আমার বড় আদরের বাড়ি

ঘণ্টা বাজছে। ছুটি হ'ল।
তারপর একসময় শব্দগুলি এদিকওদিক
গাছপালা ঘরবাড়ির মধ্যে
মিলিয়ে যাবে।

এবার বাড়ি যেতে হবে। বাড়ি।
আর কোথাও নয়, থেমে-থাকা নয়। ট্রেনে

ঊর্ধ্বশ্বাস, উধাও বাতাসের সঙ্গে
পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পার হয়ে
বাড়ির দোরগোড়ায়।

তারপর জন্মভূমির স্মৃতি। লাল পলাশ
ঝরবে খোঁপায়, শাড়ির আঁচলে,
মা-র কোলে মুখ, যেন সেই ছোট্টবেলায়
অঢেল আদর।

বাড়ি। আমার বড় আদরের বাড়ি।

বম্বাই। ১৫ জুন, ১৯৮২

মুখগুলি পরপর

মুখগুলি মনে পড়ছে পরপর।

মাঝেমধ্যে ভাঙছে গড়ছে বালিয়াড়ি,
কখনো বা দর্পণের কাঁচ
ভেঙে চারটুকরো হলে যেমন দেখায়
মুখগুলি।

কিন্তু কেউ হারায় না। জলের অতলে
মুক্তো থাকে ঝিনুকের গভীরে গোপন,
কানে ধরলে সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়।

মুখগুলি মনে পড়ছে বারবার।
শোনা যায়, এমনকি
মুখের ভাষার শব্দ দেখা যায়, দূরশ্রুত ধ্বনির মতন
যেমন শুনতে পাই
গুহাচিত্র আখ্যায়িকাগুলি, যেমন আবিষ্ট দেখি
নবীনা দেবদাসীদের
দক্ষিণমন্দিরে।

মুখগুলি পরপর দেখা যায় মধ্যরাত্রে
স্পষ্ট আকাশ জুড়ে, তারকাখচিত।

তারপর ঘুম আসে, ঘুম।

বম্বাই। ১৬ জুন, ১৯৮২

অক্ষরমালা

তুমি যখন প্লেনে উঠছিলে, আকাশ
কালো করে এসেছিল চারিধার থেকে,
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল
বিমানবন্দর, বসবার লাউঞ্জ, এয়ার-স্ট্রিপ।
মনে হচ্ছিল প্রতিমুহূর্তে, কী ভয়ংকর তোমার
দুঃসাহস, কী ঘনঘটা
তোমার দুই চোখে!

এখন সব নিস্তব্ধ। এই হলঘর এই বইমেলা।
আমার সামনের চেয়ারে

আজ থেকে কেউ বসবে না। শুধু আমি, আমার
কাগজপত্র, বইগুলি, কালো কিছু
অক্ষরমালা।

এইতো কালও সন্ধ্যেবেলা এই সমস্ত অক্ষরগুলি
আমার কাছে কত কথা বলে গেছে।

বম্বাই। ১৮ জুন, ১৯৮২

গুহার সাজঘর

হয়তো কোনদিন তোমার সঙ্গে সেই
গুহার অন্ধকারে যাবো।

হয়তো কোনদিন।

সমুদ্রের নৌকোখানা টালমাটাল দুলতে দুলতে
তীরে ভিড়বে।
তোমার হাত ধরে এক ঝট্‌কায়
দ্বীপের মাটিতে নেমে পড়বো।

তারপর

সেই চিরঅন্ধকার চিররহস্যময়
গুহার সাজঘর।

ইণ্ডিয়া গেট। ১৯ জুন, ১৯৮২

সুভাষ সরকারের জীবনদর্শন

শহর চেনার সবচেয়ে সহজ
রাস্তা আপনি বাতলেছেন
যেদিক থেকে যে বাস আসবে
হাত দিয়ে তা থামাবেন
উল্টো সোজা না তাকিয়ে
গাড়ির মধ্যে ঢুকবেন
যেখানে শেষে থামবে গাড়ি
সেখানে নেমে পড়বেন।

নরিম্যান পয়েন্ট। ২৫ জুন, ১৯৮২

এই রৌদ্রনীলিমায়

সবাই ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে
সবাই।
এই হাওয়ায় আকাশে রৌদ্রে
সমুদ্রতীরে।

পেট ভরে হাওয়া বুক ভরে নিঃশ্বাস
হৃদয় জুড়ে ভালোবাসার গান
চারিদিকে এ কি
সুগন্ধহিল্লোল
বহিল
চারিদিকে।

সবাই ছড়িয়ে পড়েছে যেদিকে চোখ যায়
যেদিকে মন ছুটে শূন্যে

অনন্তে, অশান্ত
বাতাসে।

এই হাওয়ায় আকাশে
এই রৌদ্রনীলিমায় যেখানে
সমুদ্র মিশেছে
দিগন্তে

সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়েছে
সবাই।

বম্বাই। ২৬ জুন, ১৯৮২

আমাদের যেতে হবে

এখন বসন্তকাল। নির্জন দুপুর।
পাখি ডাকলে গাছে গাছে
কেমন যে ব্যস্ততা নামে শরীরের স্নায়ুর ভিতর।

এখন শ্রাবণ-মেঘ। ঝরোঝরো
ছায়া নামে গাছে, ছায়া নামে দীর্ঘতর
নদীর ওপর।
নৌকার ভিতর বসে যুবক-যুবতী
বৃষ্টিধারা দেখে।

'সময়ের হাত ধরে এভাবেই চলে যেতে হয়'।

এভাবেই যেতে হবে কোন এক অজ্ঞাত ঋতুতে
বসন্ত অথবা শীত সবকিছু একপাশে প'ড়ে থাকবে স্থির

যেন এক নির্লিপ্ত দুপুর
গুটিগুটি শুয়ে আছে পুকুরের পাড়ে।

সময়ের হাত ধরে এসো আমরা শেষবার
নিশিযাপনের শেষে সূর্যোদয় দেখি।

বম্বাই। ২৮ জুন, ১৯৮২।

[২৩ জুন প্রকৃতি ভট্টাচার্যের চিঠির মধ্যে একটি লাইনকে ধরে কবিতাটি লেখা]

আমাকে তাড়া করে ফিরছে

সারাদিন বাড়িটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এর দরজাজানালা, ঘরের ভেতর খাটপালঙ্ক
মশারির নীল ফিতে
সব যেন আমাকে লক্ষ্য করছে অবিরত।

আমি পালিয়ে থাকতে চাই আমার ঘরে
থাকতে চাই একান্তে আমার
গোপন কুঠুরীতে। তবু
সমস্ত বাড়িটা যেন আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

কাচা হলুদের ওপর হালকা সবুজের পাড়, যখন
সন্ধ্যার সূর্য বাড়িটার চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ে
আমি আর না তাকিয়ে পারি না।

বাড়িটা এবং আমার দুই চোখ
ভারী বাতাসের মাঝে

একসময় পরস্পর যেন
সোজাসুজি এ ওর দিকে থমকে দাঁড়ায়।

অথচ আমরা আজও অপরিচিত
সমান দূরত্বে।

বম্বাই। ২৯ জুন, ১৯৮২

মালিনী নদীর পরপারে

[সুব্রত রুদ্র কে]

এবার আমরা মালিনী নদী পার হবো।

ওপারে শমীবৃক্ষের বনানী। পাহাড়চূড়ায়
মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি।

বৃক্ষগুলি প্রতিদিন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখে।
মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শোনে।
পাখিদের গুঞ্জন হলে বৃক্ষগুলির পত্রগুচ্ছ
অকারণ খুশি হয়।

মালিনী নদীর পরপারে এইসব রহস্যের কথা
আমার জানা ছিল।

এসো, এবার আমরা মালিনী নদী পার হবো।।

মনমাড। গাড়িতে ১লা জুলাই, ১৯৮২

উত্তরস্মৃতি ১১৪

যেন ভুবন ভরে কান্না

ঘরের চারিদিকে রঙ বেরঙ এর পুতুল।
রাজস্থানী পট, উড়িষ্যার দেবদেউল,
বাংলাদেশের নক্‌সী কাঁথা।
এখানেওখানে সুরুচি শিল্পকর্ম
স্নানঘরে নটরাজমূর্তি।

সমস্ত বাড়িটা বিধাতার কারুকার্য।
যেন ভুবন ভরে রয়েছে প্রাচুর্য
যেন উদ্বেল যৌবন যৌবনোত্তর খুশিতে ঝলমল।

শেষ বেলাকার সূর্যালোক যখন তার
আলতো খোঁপায় পড়ে
বিষণ্ণ চোখ দুটিতে ভেসে ওঠে কিসের ব্যর্থতা,
কান্নায় ভরে ওঠে আকণ্ঠ হাহাকার।

বাগানের সবুজে স্থির বিকেলের প্রতিচ্ছায়া
বিদ্রূপ ক'রে পশ্চিম আকাশের
অন্ধকারে সরে যায়।

লক্ষ্ণৌ। ৫ জুলাই, ১৯৮২

শুধু সবুজ দিগন্তরেখা

সেই মুহূর্তে বুকের মধ্যে জমা হচ্ছিল
একশ ভারী পাথর
সেই মুহূর্তে মুখের কথা ঝরনাধারার মত
উচ্ছল উঠছিল

সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে জলধারা নামবে
কথা ছিল।
কিছুই হয় নি।
নির্ধারিত সময়েই সবুজ পতাকা উড়িয়ে
ট্রেন ছেড়ে দিল।

তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে স্থির
আমার চেষ্টা ছিল, যতদূর
তোমাকে দেখা যায়, দেখবার।

একসময় চারিদিকে শুধু সবুজ দিগন্তরেখা
আর কিছু নয়।

স্নার বেরিলী, ট্রেনে। ১ জুলাই, ১৯৮২

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্যের জন্ম হয় ১৯৩৩ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিং জেলায়। শৈশবকাল জন্মভূমিতে কাটলেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য ও সাংবাদিকতার স্নাতক। সাংবাদিকতায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দশক হিসেবে স্নেহাকর ভট্টাচার্য পঞ্চাশের কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে, নাম "তৃষ্ণার তমসা"। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৮১-র সেপ্টেম্বর মাসে প্রমা প্রকাশনী থেকে, নাম "বধ্যভূমিতে মাতলামি"। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর আরও অজস্র কবিতা ছড়িয়ে আছে। তিনি কবিতা ছাড়া কিছু গদ্যও লিখেছেন। ডিলান টমাসের বেশ কিছু লেখা তিনি অনুবাদ করেছেন।

মূলত তিনি প্রেমের কবি। অবশ্য সে প্রেম তাঁকে দিয়েছে শুধু দুঃখ হতাশা ব্যর্থতা বিচ্ছেদ বেদনাই নয়, জন্ম দিয়েছে নিটোল কবিতা। ঝিনুকের বুকে ব্যথার আঘাত থেকে যেমন সৃষ্টি হয় আশ্চর্য মুক্তো, কবির বুকে ব্যর্থ প্রেম তেমনই সৃষ্টি করে নিটোল অনুভূতিময় কবিতা।

"জীবনে তোমার প্রেমের বাইরে এসে থেকে
একটা বিশাল ঘড়ি আমাকে কাঁটায় বিঁধে দিনরাত চিবোচ্ছে কেবল"

[আমাকে হৃদয়ে তুমি]

একদিকে চূড়ান্ত বোহেমিয়ান অন্যদিকে আশ্চর্য আত্মমগ্ন ছিলেন কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্য। বিখ্যাত পূর্বাশা পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁকে ডিলান টমাস বলে ডাকতেন। ব্যক্তিগত জীবনেও ডিলান টমাসের জীবন যাপনের পদ্ধতির যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল কবির উপরে। তাঁর সহায়তায় "ময়ূখ" পত্রিকার জীবনানন্দ সংখ্যাটি আজও গবেষকদের কাছে পরম আকর্ষণীয়। সময়ের হিসেবে পঞ্চাশের কবি হয়েও নিজস্ব সময়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের কবিতায় তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। একদা জিটিল

ম্যাগাজিন-সম্পাদক কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্য পরবর্তীকালেও লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ অটুট রেখেছিলেন।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্য। বছর খানেক ধরে কবি লাংসের ক্যানসারে ভুগছিলেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধিতেই গত ৬ই বৈশাখ ১৩৮৯ (২০শে এপ্রিল ১৯৮২) মঙ্গলবার বেলা দুটো কুড়ি মিনিটে তিনি পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুর শেষ দিনগুলোতে তাঁকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তবু তাঁর ঠোঁটে লেগে ছিল অকৃত্রিম রহস্যময় হাসি। কোন সহানুভূতি বা অনুকম্পার তিনি শেষ প্রহরেও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কোন এক লিটল ম্যাগাজিনে "স্নেহাকর ভট্টাচার্য অসুস্থ" এই খবর উদ্ধৃতি দিলে তিনি বলেছিলেন, "আমি কি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে তাঁরা খুশিমত সংবাদ ছাপবে!"।

"সব প্রেম মানুষকে সমৃদ্ধ করে না—
এই জীবনের কথা যদি মনে থাকে
পরজন্মে কোনদিন ভালোবাসবো না"

[সব প্রেম মানুষকে]

প্রদীপ রায়চৌধুরী

['উত্তরসূরি'র "কবিতা সংখ্যা" স্নেহাকর-কে নিবেদিত করে উত্তরসূরি পত্রিকাই ধন্য হয়েছে। ব্যক্তিগত কথা ও বেদনাপ্রকাশের স্থান এ-মুহূর্ত নয়। শুধু একটি বড় বেদনার কথা না বলে পারছি না। 'ময়ূখ' ও 'উত্তরসূরি' "জীবনানন্দ সংখ্যা" একত্রে প্রকাশ করব এবং একত্রে সম্পাদনা করব, বহু দুপুর আমরা এই পরিকল্পনা করেছি, প্রকাশকও পেয়েছিলাম। আমারই কর্মব্যস্ততায় এ কাজ স্নেহাকর দেখে যেতে পারলেন না। আমার এই কর্মব্যস্ততার চেয়ে চরম গাফিলতি আর কী হতে পারে! : অরুণ ভট্টাচার্য]

নিজস্ব কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা (২য় খণ্ড) : গ্রন্থবিতান ॥ ৭৩বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। টা. ১২.৫০ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : নির্বাচিত কবিতা ॥ সম্পাদনা : পুলক চন্দ, কথাশিল্প। ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। টা. ১২.০০ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আর এক আরম্ভের জন্য ॥ প্রমা। ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭। টা. ৩.০০ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : এক যে ছিল ॥ বুক ট্রাস্ট। ৩০/১বি কলেজ রো, কলকাতা-৯। টা. ৪.০০ ॥

স্নেহাকর ভট্টাচার্য : বধ্যভূমিতে মাতলামি ॥ প্রমা প্রকাশনী। ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭। টা. ৬.০০ ॥ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : সাবেরি ॥ গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ। ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। টা. ৬.০০ ॥

মলয়শংকর দাশগুপ্ত : পাখি জানে (২য় সং)॥ সোহিনী প্রকাশনী। স্ট্রাণ্ড রোড, কলকাতা-১। টা. ৬.০০ ॥ শান্তিকুমার ঘোষ : পদ্মের ভিতর আলো॥ কবিতা প্রকাশনী। পি-৩৬, সি. আই. টি. স্কীম, ১১৪ এ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা ৪৫। ট. ৫.০০ ॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : রুপুলি মুকুট ॥ ভারবি। ১৩ এ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। টা. ৬.০০ ॥ জীবেন্দ্র সিংহরায় : দ্বিতীয় সুখ ॥ সুবর্ণরেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। টা. ৫.০০ ॥ রবীন আদক : আদিগন্ত প্রবাস ॥ বিশ্বজ্ঞান। ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। টা. ৪.০০ ॥ রবীন সুর : তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ ॥ অরণি প্রকাশন, ১২ মুখার্জিপাড়া লেন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। টা. ৬.০০ ॥ শম্ভু রক্ষিত : পাঠক, অক্ষরগুলি ॥ মহাপৃথিবী, ১১ ঠাকুরদাস দত্ত ১ম লেন, হাওড়া-১। টা. ৫.০০ ॥

কৃষ্ণা বসু : জলের সারল্যে ॥ মহাপৃথিবী। টা. ৬.০০ ॥ অনন্ত দাশ : সময় আমার কণ্ঠে ॥ গৌরব প্রকাশনী। ৩৬ ডি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-২৬। টা. ৪.০০ ॥ শরৎ সুনীল নন্দী : অর্ণব প্রকাশনী ॥ ছাতুবাবু লেন, কলকাতা-১৪। টা. ৩.০০ ॥ মুরলী দে : আমার মোম ॥ ঘাসমাটি প্রকাশনী, ঠাকুরপুকুর, জয়কৃষ্ণপুর, বাঁকুড়া। টা. ৩.০০ ॥ অরুণোদয় ভট্টাচার্য : একটি ভিটে একটি মানুষ ॥ প্রাচী প্রকাশন, এল/৩, লাজপতনগর III, নতুন দিল্লী-১৪।

নতুন দিল্লী-১৪। টা. ৫·০০ ॥ কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় : কলসা পাতায় শব্দ ॥ মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। টা. ৫·০০ ॥ ফিরোজ চৌধুরী : তুমি ॥ স্বরলিপি, ২৩ এ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। টা. ৫·০০ ॥ শ্যামল মুখোপাধ্যায় : রক্তবিন্দু গোলাপ হলো ॥ গীতায়ন প্রকাশনী। ১০-এ বাঘা যতীন রোড, কলকাতা-৩৬। টা. ৫·০০ ॥ অনিল বিশ্বাস : উদ্বেগ উপকূলে ॥ দে বুক স্টোর, কলকাতা-১৩। টা. ২·০০ ॥ আশিস দাশ : তমসার কাছে ॥ মহাপৃথিবী, হাওড়া-১। টা. ৫·০০ ॥ হিমাংশু জানা : জলের দু-পায়ে ঝরে কথা ॥ বিশ্বজ্ঞান কলকাতা-৯। টা. ৪·০০ ॥ অলককুমার চৌধুরী : এমন কথা ছিল না ॥ সীমান্ত, ৬সি স্কট লেন, কলকাতা-৯। টা. ৫·০০ ॥ নিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরী : আরক্ত তিমির ॥ হেমলতা প্রকাশনী। ৭৬ শশীভূষণ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৮। টা. ৫·০০ ॥ সিদ্ধার্থ পাল : স্বপ্নের গঠন ও সাপ ॥ বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯। টা. ৫·০০ ॥ মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : রক্ত যখন উদাসীন ॥ বিষুবরেখা প্রকাশনী। ত্রিবড়া, হুগলী। টা. ৪·০০ ॥

সংকলন গ্রন্থ

ব্রাত্য পদাবলী : সম্পাদনা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ পরিবেশক, উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। টা. ৪·০০ ॥ এই মুহূর্তের কবিতা : সম্পাদনা মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ॥ সমন্বয় প্রকাশনী। ২৭ ডি হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬। টা. ১০·০০ ॥ গাজনের গান : সম্পাদনা তুলসী মুখোপাধ্যায় ॥ অনুভব প্রকাশনী। ২৪/২ আর. এন. দাস রোড, কলকাতা-৩১। টা. ৮·০০ ॥ সজল বন্দ্যোপাধ্যায় পরেশ মণ্ডল মৃণাল বসুচৌধুরী তপনলাল ধর অতীন্দ্রিয় পাঠক অশোক চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৯ ॥ অব্যয়। ৪২ গড়পার রোড, কলকাতা-৯। টা. ৬·০০ ॥ আমাদের ব্যক্তিগত কবিতা : সম্পাদনা বীজেশ সাহা ॥ দেশকাল প্রকাশনী ১৮এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-২। টা. ৫·০০ ॥

কবিতা পুস্তিকা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অরুণ ভট্টাচার্য : এই হাওয়া ॥ উত্তরসূরি। ৭বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০। টা. ৪·০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য :

অনন্ত বাসরে যাবে ॥ উত্তরসূরি, কলকাতা-৫০। টা. ২'০০ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সামসুল হক : ভাতে পড়লো মাছি। ষাটের দশক, কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা। টা. ৩'০০ ॥ শংকর দে : গ্রন্থ নয় ব্যক্তিই বিগ্রহ ॥ ২৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলকাতা-৬। টা. ১'০০ ॥ অলকেন্দুশেখর পত্রী : সুন্দরবাদ ॥ মহাপৃথিবী, হাওড়া-১। টা. ১'০০ ॥ সুব্রত রুদ্র : বেঁচে থাকবে কেন ॥ ১২ অভয় সরকার লেন, কলকাতা-২০ থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। টা. ৩'০০ ॥ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রেমে প্রতিবাদে ॥ সোপান প্রকাশনী। কৃষ্ণগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। টা. ৩'০০ ॥ পার্থসারথি ভট্টাচার্য : মীড় গমক ॥ ভুবনলক্ষ্মী প্রকাশনী। পরিবেশক দে বুক স্টোর, কলকাতা-৯। ট. ৫'০০ ॥ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ; এ বয়স কে পায় ॥ আবর্ত প্রকাশনী। ২।৪৩ নাকতলা, কলকাতা-৪৭। টা. ২'০০ ॥ সুজিত সরকার : ধরে রাখতে চাই ॥ ২৮।২ কাঁটাপুকুর লেন, কদমতলা, হাওড়া ১ থেকে সুনীত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। টা. ২'০০ ॥ প্রশান্ত রায় : বাঙালী চরিত্র ॥ বুক হোম। ৩২, কলেজ রো, কলকাতা-৯। টা. ১০'০০ ॥

কবিতা নিয়ে আলোচনা

প্রবোধচন্দ্র সেন : আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য ॥ অনিমা প্রকাশনী। ১৪১, কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯। টা. ৩০'০০ ॥ জীবেন্দ্র সিংহ রায় (সম্পাদিত) আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশ্লেষণ ॥ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বর্ধমান। টা. ২৫'০০ ॥ অশোক মিত্র : কবিতা থেকে মিছিলে ॥ অয়ন : ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। টা. ১০'০০ ॥ অশ্রুকুমার সিকদার ॥ বাক্যের সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ ॥ দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা. ১২'০০ ॥ সুমিতা চক্রবর্তী : কবি অমিয় চক্রবর্তী ॥ জিজ্ঞাসা, কলকাতা ৯। টা. ১৫'০০ ॥

অনুবাদ কবিতা

লেয়মন্তভের কবিতা : অনুবাদ ও সম্পাদনা, সন্দীপ সেনগুপ্ত ॥ সাধনার বই ৭৮, ব্রড স্ট্রীট, কলকাতা ১৯। টা. ৬'০০ ॥ স্বদেশী ফুল বিদেশী বাহার : প্রণতা চট্টোপাধ্যায় পার্থসারথি ভট্টাচার্য রণিত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥ ভুবনলক্ষ্মী প্রকাশনী ৫।৩এ, কালী বসু লেন, কলকাতা ৬। টা. ৫'০০ ॥